প্রবাহ।

সন্দর্ভ ও সমালোচন।

য় ভাগ। ১লা বৈশাখ। ১২৯০। ১ম সংখ্যা।

স্বায়ত্ত-শাসনের পাণ্ডুলিপি।

(BILL TO EXTEND THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN BENGAL.)

...ভক্ষণে এ পতিত দেশে মহামতি লর্ড ...ণ্ স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ...বা না বুঝি, তথাপি কথাটা শুনিতেও ...। শুনিতে ভাল বলিয়াই আজি, ...তবাসী না হউক, ভারতের শিক্ষিত ... শিক্ষাভিমানী অধিবাসিবৃন্দের আনন্দে ...ধীর। ভারতবাসী আজি বাহু তুলিয়া ...রিপণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে বলিলে ...া কথা বলা হয়; কারণ ভারতের ...ত্রিংশতি কোটী প্রজাপুঞ্জের মধ্যে এক ...টীর অধিক ব্যক্তি স্বায়ত্ত-শাসনের ...াদ রাখে না, অথবা স্বায়ত্ত-শাসন ...টা বাঘ কি ভল্লুক, কিম্বা খাদ্যসামগ্রী— ...ত দিয়া খাইলে ভাল হয়, কি পুড়াইয়া ...লেও চলিতে পারে, তাহা জানে না। ...কলে বুঝুক বা না বুঝুক, ভারতের কতক লোক স্বায়ত্ত-শাসন কি তাহা বুঝিয়াছে, কতক না বুঝিয়াও বুঝার ভাণ করিতেছে এবং আনন্দের রোলে ভারত তোলপাড় করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমাদের এ পোড়া বঙ্গদেশে সকল বিষয়েরই বাড়া-বাড়ি। এখানকার কবি এমন সুযোগ আর হয় না ভাবিয়া, স্বায়ত্ত-শাসনের কবিতায় সাধারণকে (পুলকিত করিতেছেন বলি কেমন করিয়া?) কাড়ে মাড়ে জ্বালাই-তেছেন; গায়ক লর্ড রিপণের স্তুতিগীতে কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলিতেছেন; আর সর্ব্বোপরি, কোন কোন সংবাদপত্র সম্পা-দক, বুঝিয়া না বুঝিয়া, জানিয়া না জানিয়া, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এতৎসম্বন্ধে নির... স্তর চীৎকার করিয়া মানুষ পাগল করির... যোগাড় করিতেছেন। ইহার উপর অ...

দেশহিতৈষিদলের মিটিং—আবার মিটিং—এবং আবার মিটিং আছে। তথায় বাঙ্গালীর মিটিং যেমন হইয়া থাকে তদ্রূপ মস্তক ও পুচ্ছ বিহীন পৌনঃপুনিক দশমিকের ন্যায় বক্তৃতা আছে। সংক্রামক রোগের ন্যায় সেই মিটিং ও সেই বক্তৃতা এক নগর হইতে নগরান্তরে গমন করিতেছে এবং সে স্থান ত্যাগ করিয়া পুনরায় অন্যত্র প্রবেশ লাভ করিতেছে। এইরূপে ভাল হউক, মন্দ হউক, স্বায়ত্ত-শাসন লইয়া একটা ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে।

বাস্তবিক স্বায়ত্ত-শাসন কথাটা বড় সুখের কথা,—বড় খুসীর খবর। সামান্য পিপীলিকাটি হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই স্বাধীনতার ভিখারী। প্রত্যেক মানব স্বাধীনতার প্রার্থী হইলেও সকলকে স্বাধীনতা দিলে মানব সমাজ বিপর্য্যস্ত ও উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহা প্রাচীন মানবগণ ইতিহাসের আলোক দিয়া আপনাদের বংশধরগণকে দেখাইয়া দিতেছেন। অতএব মানবের সুখ ও শান্তির নিমিত্ত সমাজ-শাসন ও রাজ-শাসন অপরিহার্য্য। যে শাসনপ্রণালী ব্যক্তি সাধারণের স্বাধীনতার প্রতি অল্পমাত্রায় হস্তক্ষেপ করিয়া, অথবা তাহাদের সুখের পথে কণ্টক না দিয়া কার্য্য সাধনে সক্ষম, তাহাই শ্রেষ্ঠ শাসন প্রণালী নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

ব্যবহার-শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ব্লাকষ্টোন্ (Blackstone) ইংরাজদিগের ব্যক্তিগত অধিকার প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ, সকলেই স্ব স্ব জীবন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দেহ, স্বাস্থ্য এবং সম্মান নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে পাইবে; দ্বিতীয়তঃ, সকলেরই শারীরিক স্বাধীনতা থাকিবে, অর্থাৎ কেহ কাহারও ক্রীত বা কাহা দ্বারা অবরুদ্ধ হইবে না; তৃতীয়তঃ, স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি সকলেই নিরাপদে ভোগ করিতে পাইবে; ইত্যাদি। * বাস্তবিক বিবেচনা করিলে, মানুষমাত্রেই এতটুকু অধিকার পাইবার নিতান্ত অভিলাষী। সভ্য সমাজমাত্রেরই শাসনপ্রণালী তত্রত্য প্রজাপুঞ্জকে এতটুকু অধিকার নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে দিয়া থাকে। কেবল ক্রীতদাস ও অসভ্য স্বেচ্ছাচারী রাজার প্রজাগণ এই সকল স্বত্বে বঞ্চিত। কিন্তু যাহারা ক্রীতদাস নহে, অথবা যথেচ্ছাচারতন্ত্রের অধীন নহে বলিয়া জানে, তাহারাই ক্রমশঃ অধিকতর অধিকার প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয় এবং উল্লিখিত অধিকার সকল অতি সামান্য ও অবশ্যপ্রাপ্য বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহাদের শাসন প্রণালী তাদৃশ সামান্য অধিকার সকল অক্ষুণ্ণচিত্তে দিলেও তাহাতে তাহাদের পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। ক্রমোন্নতির সহিত প্রজাগণ আপন আপন অভাব, আপন আপন প্রয়োজন, আপনারা যেমন দেখিতে পায়, আপনারা যেমন জানিতে পারে, যাঁহাদের হস্তে শাসনভার সমর্পিত তাঁহারা তেমন পারেন না। এজন্য মানব নিয়ত কাতরতা প্রকাশ করে, আপনি কষ্ট পায়, শাসকগণকেও কষ্ট দেয়। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ (John Stuart Mill) এবম্বিধ শাসন সম্বন্ধীয় ভাল মন্দ তর্ক উভয়ই আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে,—

"—the only government which can fully satisfy all the exigencies of the social state, is one in which the

* Commentaries on the Laws of England. Book. I.

whole people participate; that any participation, even in the smallest public function, is useful; that the participation should every-where be as great as the general degree of the improvement of the community will allow; and that nothing less can be ultimately desirable, than the admission of all to a share in the sovereign power of the state."—ইত্যাদি। *

আমাদের বঙ্গীয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকার বিষয়ে ইহার কোন ন্যূনতা না থাকিলেও, অভাব যথেষ্টই আছে এবং নিয়ত চীৎকার করিবার যথেষ্টই কারণ আছে। দেশের লোক জানে যে, তাহারা ক্রীতদাস নহে, এবং তাহাদের শাসনকর্ত্তাগণ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেন যে তাহারা যথেচ্ছাচার-তন্ত্রের অধীন নহে। কিন্তু হয় শাসনকর্ত্তাগণ বৈদেশিক বা বিধর্ম্মী বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহাদের অজ্ঞতা বা অপটুতা হেতুই হউক, অথবা সহানুভূতি ও সদ্ভাবের অভাব হেতুই হউক, দেশীয় প্রজাপুঞ্জ শাসনপ্রণালীর বৈষম্য, অসুবিধা, বিশৃঙ্খলা নানাদিকেই প্রত্যক্ষ করে এবং তদ্রূপ প্রত্যক্ষ করে বলিয়াই শাসন-কার্য্যের প্রতি সভয়ে ও সকাতরভাবে নেত্রপাত করে এবং যথাসম্ভব যত্নে দূরে থাকিতে ও শাসকদিগের সংস্পর্শে না আসিতে বাসনা করে। এই কারণেই জেতা ও জিত জাতির প্রাণে প্রাণে মিশ খাইতেছে না; কেমন পর পর ভাব রহিয়াছে। সার্দ্ধশত বর্ষ পূর্ব্বে ইংরাজ দেশীয় লোকদিগকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন একণে তাহারা ইংরাজের কৃপায় আর সেরূপ নাই। ইংরাজ তাহাদিগকে শিক্ষা দ্বারা, চেষ্টা দ্বারা, যত্ন দ্বারা যথেষ্ট উন্নত করিয়াছেন। যতই দেশীয়গণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যতই তাহারা জ্ঞান ও শিক্ষাবলে বলীয়ান হইতেছে, ততই তাহাদের অসুবিধা ও অভাব বিষয়ে অধিকতর বোধ জন্মিতেছে এবং ততই তাহারা শাসন-প্রণালীর নিকট অধিকতর করুণা ও কৃপার ভিখারী না হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। প্রজাগণের অভাব, চীৎকার ও তাহাদের বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর অপূর্ণতা কতক পরিমাণে নিবারণ করিতে হইলে রাজকার্য্যের কিয়দংশ প্রজাবৃন্দকে স্বয়ং চালাইতে অধিকার দেওয়া আবশ্যক। সুখের বিষয়, অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন লর্ড রিপণ অত্যল্পকাল ভারতে আসিয়াই প্রজা সমূহের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনরূপ প্রবালপুঞ্জ তিনিই মুক্তহস্তে বিতরণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। বিপক্ষের নিন্দাবাদ, স্বার্থপরের নিরুৎসাহ, কাপুরুষের অসৎ প্ররোচনা, লর্ড রিপণ সকলই উপেক্ষা করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহকে যথারীতি বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন পূর্ব্বক স্বায়ত্ত-শাসন অধীনস্থ প্রদেশে প্রচলিত করিবার শেষ অনুমতি দিয়াছেন। আমাদের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় কলমান্ মেকলে মহাশয়ের হস্তে স্বায়ত্ত-শাসনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় তাহা উপস্থিত করিয়াছেন। বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখের কলিকাতা গেজেটে তাঁহার সে পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইয়াছে।

* Representative Government. Chap. iii.

মাননীয় মেকলে লিখিতেছেন,—

"The object of this Bill is to give the people of Bengal a substantial interest of responsibility in the administration of their own local affairs. At present District Road and School Committees exist, but they have very limited powers and these powers are generally exercised under close official control. The committees cannot be said to offer any attraction to men of education and ability, who desire to participate in the management of public business, and they afford no relief to the Government staff in the administration of the departments of work with which they are supposed to deal." ইত্যাদি।

অর্থাৎ বঙ্গবাসিগণকে আপনাদের স্থানীয়-কার্য্য সমূহ নির্ব্বাহ করিবার অনুরাগী এবং সেই কার্য্যের দায়িত্ব তাঁহাদের হৃদ্‌গত করণ এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। অধুনা জেলায় রোড ও স্কুল কমিটি আছে বটে কিন্তু তৎসমস্তের ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং সে সকল ক্ষমতাও সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রকারে সরকারী শাসনের অধীন। দেশের যে সকল শিক্ষিত ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি সাধারণ কার্য্যের অংশ গ্রহণে অভিলাষী উক্ত কমিটি সকল তাঁহাদিগকে কোনই প্রলোভন দেখাইতে পারে না সুতরাং যে সকল বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ তাঁহাদের দ্বারা হইতেছে মনে করা যায় তাহা না হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের কোন সাশ্রয় বা সুবিধা হয় না।

এতদপেক্ষা মধুমাখা কথা আর কি আছে? প্রস্তুপাঠ করিয়া যাহা শিখিলাম, হৃদয় যে অধিকার পাইবার জন্য লালায়িত, আজি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যত্ন করিয়া সেই অযাচিত রত্ন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কথার ভাবে বোধ হইতেছে যেন এ বিষয়ে আমাদের অনুরাগ নাই, আমরা এ সকল ব্যাপারের দায়িত্ব লই না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট দুঃখিত। আমাদের পাতা চাপা কপালের পাপ পাতাটা বুঝি হঠাৎ উড়িয়া গেল। আরও বলিতেছেন যে, অধুনা ডিষ্ট্রিক্ট রোড্ কমিটি প্রভৃতি যে সকল সভা আছে, তাহার কার্য্য সম্যক্ প্রকারে মাজিষ্ট্রেট মহাশয়দিগের বা তথাবৎ শাসনের অধীন, সুতরাং দেশীয় কৃতবিদ্য বা ক্ষমতাবান লোক সকল সে কার্য্যে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন না। ইহাতে বোধ হয় যে, বর্ত্তমান স্বায়ত্ত শাসন-সভার কার্য্য যাহাতে বিশেষ স্বাধীনভাবে নির্ব্বাহিত হয় এবং দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ তাহাতে যোগ দেন, ইহাই গবর্ণমেণ্টের বাসনা। এক্ষণে মেকলে সাহেবের বিল আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে তাঁহার কাজে ও কথায় কোন ঐক্য আছে কি না।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আমাদের সংবাদপত্র সমূহ এই বিল লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন করিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড (District Board) স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, বা নির্ব্বাচনকারীগণের যোগ্যতা অথবা সেণ্ট্রাল বোর্ডের (Central Board) অপ্রয়োজনীয়তা কিম্বা সার্কল বোর্ডের (Circle Board) আবশ্যকতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা ব্যয় করিয়া তাঁহারা এই গুরুপ্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন না যে, মেকলে সাহেব যে বিল প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা কিছুই নহে; তাহাতে স্বায়ত্ত-শাসনের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না এবং লর্ড রিপণের মহীয়সী কীর্ত্তি এতাদৃশ

অঙ্গহীন, লক্ষ্যহীন, অপরিস্ফুট ও বক্র বিলের দ্বারা যার পর নাই বিকৃত ও কলুষিত হইয়া উঠিতেছে। মেকলে সাহেব দরিদ্র, লোলুপ বঙ্গবাসীগণকে কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে পিত্তল দিয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এখনও মেকলের বিল বিধিবদ্ধ হয় নাই; এখনও সময় আছে, এখনও একবার আশানুরূপ ফল প্রাপ্তির দাবি কর। আমরা কাঙ্গাল, আমরা ভিখারী, আমরা পদানত, আমরা দলিত, আমরা কেবল দয়ার পাত্র বই ত না। আমাদের পক্ষে পিত্তল কম বস্তু নহে তাহা আমরা জানি; কিন্তু উপর হইতে আমাদিগকে স্বর্ণ দিয়া সন্তুষ্ট করিবার আদেশ হইয়াছে, তাহা কই? মেকলে সাহেবের বিলের উপরি উক্ত অংশ পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে, তিনি আমাদিগকে অকাতরে কাঞ্চনই দিতেছেন কিন্তু তাঁহার সমগ্র বিল পাঠ করিয়া বোধ হয় তিনি অতি কষ্টে আমাদিগকে একটু— একটুমাত্র, পিত্তল দিয়া বিদায় করিতেছেন। ভাই বঙ্গবাসি! আপনার দাবি দাওয়া বুঝিয়া লও, কাঞ্চন বলিয়া পিত্তল লইও না, ইহাই আমাদের সানুনয় অনুরোধ।

আমাদের স্থান অল্প, এজন্য বিস্তৃত রূপে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে পারিব না। আমরা দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিব যে, বর্ত্তমান বিল বিধিবদ্ধ হইলে স্বায়ত্ত-শাসন কেবল একটা কথার কথা হইয়া পড়িবে; আর আমরা দেখাইব মেকলে সাহেব স্বায়ত্ত-শাসনের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছেন, তাঁহার বিলে তাহা নাই। তাঁহার বিলে যাহা আছে তাহা যদি স্বায়ত্ত-শাসন হয়, তবে পরায়ত্ত-শাসন কাহাকে বলে তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

স্বায়ত্ত-শাসন রূপ প্রকাণ্ড যন্ত্রের তিনটী অঙ্গ স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রথম Union Committee অর্থাৎ গ্রাম্য সমিতি, দ্বিতীয় Local Board অর্থাৎ স্থানীয় সভা এবং তৃতীয় Central Board অর্থাৎ কেন্দ্র সভা। দেখা যাইতেছে যে, এই যে কেন্দ্র সভা, ইহাতেই স্বায়ত্ত-শাসনের জীবন। বর্ত্তমান স্বায়ত্ত-শাসনের মূল হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কেন্দ্র সভার অবিসম্বাদিত প্রভুতা। কেন্দ্র সভা সর্ব্বত্র স্বীয় ক্ষমতা কিরূপে পরিচালিত করিবে তাহা আমরা নিম্নে দেখাইতেছি;—

১ম। গ্রাম্য সমিতি কেন্দ্র সভার আদেশ ও অনুমতি ব্যতীত গঠিত হইবে না।

২য়। গ্রাম্য সমিতির সভ্যের অপ্রতুল হইলে কেন্দ্র সভা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা স্থানীয় সভা দ্বারা সভ্য মনোনীত করাইবেন।

৩য়। কেন্দ্র সভা স্থানীয় সভার স্থান ও অধিকার স্থির করিয়া দিবেন, সভ্য নির্ব্বাচন করাইবেন এবং কখন কখন স্বয়ংও করিবেন।

৪র্থ। স্থানীয় সভার সভাস্থল এবং কার্য্য প্রণালী ও নিয়মাবলী সমস্তই কেন্দ্র সভা স্থির করিয়া দিবেন।

৫ম। মাসিক ১০০৲ বা তদূর্দ্ধ বেতনের কোন পদ স্থানীয় সভা কেন্দ্র সভার বিনা অনুমতিতে স্থাপিত বা রহিত করিতে পারিবেন না।

৬ষ্ঠ। স্থানীয় সভা কেন্দ্র সভার অনুমোদন ব্যতীত কোন কর্ম্মচারীর পেন্‌সন্ বা পুরস্কার দিতে পারিবেন না, বা রহিত করিবেন না।

৭ম। বর্ষারম্ভের পূর্ব্বে স্থানীয় সভা

আগামী বর্ষের প্রয়োজন ও সম্ভাবিত খরচ পত্রের এষ্টিমেট, সভার বিবরণ, গতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি কেন্দ্র সভায় পাঠাইবেন, তদ্ব্যতীত কেন্দ্র সভা অন্যান্য রিপোর্ট যাহা যখন জানিতে চাহিবেন, তাহাও পাঠাইবেন।

৮ম। প্রত্যেক এষ্টিমেট্ কেন্দ্র সভা মঞ্জুর করিয়া দিবেন।

৯ম। স্থানীয় সভার অধীন পারঘাটের শুল্ক কেন্দ্র সভার দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

১০ম। নূতন পারঘাট কেন্দ্র সভার হুকুম লইয়া স্থাপিত করিতে হইবে।

১১শ। সরভেয়রের বেতন কেন্দ্র সভার অনুমোদন বিনা ধার্য্য হইবে না।

১২শ। হিংস্র জন্তু বিনাশকারীর পুরস্কার কেন্দ্র সভার নির্দ্ধারিত তালিকা অনুসারে দিতে হইবে।

১৩। কেন্দ্র সভা আবশ্যক বিবেচনা করিলে যে কোন সময়ে স্থানীয় সভার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে পারেন এবং স্থানীয় সভাকে কিছুকালের নিমিত্ত উঠাইয়া দিতেও পারেন।

ইত্যাদি। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

মেকলে সাহাবের বিল হইতে কয়েকটী স্থূল স্থূল কথা মাত্র সঙ্কলন করিয়া উপরে লিখিত হইল। কেন্দ্র সভার ক্ষমতা সর্ব্বতোমুখী এবং তাহার সকল ক্ষমতা ও সকল অধিকারের কথা লিখিতে গেলে প্রবাহের ক্ষুদ্র অবয়বে সংকুলান হইবে না। যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, স্বায়ত্ত-শাসন ভার কেবল কেন্দ্র সভাকেই প্রদত্ত হইয়াছে। স্বায়ত্ত-শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য কেন্দ্র সভাই করিবেন বলিলে অত্যুক্তি হইতেছে না। স্থানীয় সভাকে এক প্রকার কেন্দ্র সভার স্থানীয় কেরাণী বা কর্ম্মচারী সভা বলিলেও বলা যায়। সমস্ত বঙ্গদেশের স্বায়ত্ত-শাসন ব্যাপার এই কেন্দ্র সভা ভাঙ্গিবেন, গড়িবেন, চালাইবেন এবং ক্রীড়াশীল বালকের ন্যায় বঙ্গবাসীকে হাসাইবেন, কাঁদাইবেন ও নাচাইবেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, যে কেন্দ্র সভাকে এত ভার অর্পিত করিবার জন্য মেকলে সাহেব অভিলাষী হইয়াছেন, সে কেন্দ্র সভা বস্তুটা কি। আমরা মেকলে সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"The Central Board shall consist of a President and so many members as the Lieutenant-Governor may direct. Such President and members shall be appointed by the Lieutenant-Governor, and shall hold office for a term of five years," &c.

ইহার ভাবার্থ, কেন্দ্র সভায় একজন সভাপতি ও লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর যতগুলি ইচ্ছা করেন ততগুলি সভ্য থাকিবেন। ঐ সভাপতি ও সভ্য লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহারা পাঁচবৎসর কাল কর্ম্ম করিবেন।

ইহা প্রচার হইয়াছে যে একজন সিভিলিয়ান কেন্দ্রসভার সভাপতি এবং আর ২ জন, হয় সরকারী, না হয় বেসরকারী ব্যক্তি উহার সভ্য হইবেন। তাঁহারা সকলেই বেতন পাইবেন, এবং তাঁহারা সকলেই লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেন্দ্র সভা সর্ব্ব প্রকারে গবর্ণমেণ্টের একটা খাস আফিস ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন কেন্দ্র সভার

সমস্ত সভ্যই বেতনভুক্ এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যখন তাহার অর্দ্ধাধিক সভ্য সিভিলিয়ান হইবেন, তখন তাহা যে সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের একটা নূতন আফিষ হইতেছে তাহাতে আর দ্বিমত হইতে পারে না। নির্ব্বাচন প্রণালী কেন্দ্র সভার সভ্যগণকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাহার সভ্যগণকে দেশীয় কার্য্যে অনুরাগ দেখাইতে বা তাহার দায়িত্ব বুঝিয়া লইতে হইবে না, স্থানীয় সভার যে সকল প্রয়োজন তাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহারা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনুরূপ কার্য্য করিবেন। সুতরাং কেন্দ্র সভা কেবল গবর্ণমেণ্টের সভা এবং তাহার কার্য্য সমস্তই গবর্ণমেণ্টের কার্য্য। এই কেন্দ্র সভার হস্তে দেশের স্বায়ত্ত-শাসন সমর্পিত হইল। সুতরাং স্বায়ত্তশাসনটা এক প্রকার গবর্ণমেণ্টের হস্তেই থাকিল। স্বায়ত্ত শাসন নামক আকাশ পাতাল জোড়া শব্দ দেশে ছড়াইয়া দেওয়া হইল, দেশের লোকগুলা হা করিয়া কি না জানি ভাবিয়া চাহিয়া রহিল; ভাবিল তাহারা বুঝি এই স্বায়ত্ত-শাসনের শক্তিতে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বা বরুণ হইয়া পড়িবে; হয়ত অজর, অমর হইয়া সর্ব্বসুখের আশ্রয় হইবে এবং হয়ত এই মহামন্ত্রের প্রভাবে তাহাদের দেশ পারিজাত বিশোভিত, সর্ব্বসুখ-সৌভাগ্য নিকেতন নন্দন কানন হইয়া উঠিবে।. কিন্তু হা কৃষ্ণ, একি বিড়ম্বনা! স্বায়ত্ত-শাসন কোথায়? উত্তর — কেন্দ্র সভায়। কেন্দ্র সভা কি? আবার উত্তর—গবর্ণমেণ্টর একটা অফিষ। তবে স্বায়ত্ত-শাসন কোথায়? আবার হৃদয়ভেদী উত্তর—গবর্ণমেণ্টের একটা আফিষে। বঙ্গবাসি ভ্রাতৃবৃন্দ! আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনরূপ আশা-পাদপে মেকলে সাহেব এই ফল দেখাইলেন। আমাদের ঘোর তৃষা মিটিল না, আমরা মরীচিকায় ভ্রান্ত হইলাম মাত্র। আমাদের সাধের স্বপ্ন কিছুই সফল হইল না।

মেকলে সাহেবের বিলে খুঁত ধরা সহজ নহে। যাহা যাহা আপাত মধুর, শুনিলে প্রাণ জুড়ায়, বাহুতুলিয়া নাচিতে ইচ্ছা হয়, বিলে তাহা সবই আছে। সামান্য গ্রাম্য সমিতিতেও মেকলে সাহেব নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বেসরকারী লোক স্থানীয় সভার সভাপতি ও সহকারী সভাপতি হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পথ, ঘাট, রেলওয়ে প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা কার্য্যের ভার স্থানীয় সভার সভ্যগণকে প্রদান করিতেছেন। এ সকলই লেখা পড়ায় ঠিক্ আছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া, একটু নিবিষ্ট চিত্তে দেখিলে বুঝা যায় যে, এ সকলই কথার কথা, স্থানীয় সভার কিছুই নাই। মনে করুন, স্থানীয় সভা নির্ব্বাচন দ্বারা গঠিত হইল এবং বেসরকারী লোক তাহার সভাপতি হইলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইল? যে সভায় কার্য্য হইবে, তাহা নির্ব্বাচন-গঠিত সভা নহে, তাহার বেসরকারী সভাপতি নহেন। সাক্ষীগোপাল স্থানীয় সভা সকল কেন্দ্র সভার হুকুম তামিল করিবার সভা। তাহা নির্ব্বাচন দ্বারা গঠিত কর, বা নাই কর, সমানই কথা।

গ্রাম্যসমিতি সকল স্থানীয় শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির ভার লইবেন বলিয়া বিল আদেশ করিতেছেন। তত্রত্য খোঁয়াড়

(pound) ইজারা দিয়াই হউক, বা খাসে রাখিয়াই হউক, যাহা আয় হইবে তাহাই তাঁহাদের প্রধান ভরসা। সেই খোঁয়াড়ের সামান্যমাত্র আয় অবলম্বন করিয়া গ্রাম্য সমিতি স্বাধিকৃত স্থানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতি সাধন করিবেন, এতদপেক্ষা হাস্যজনক প্রস্তাব আর কি আছে? তাহার পর স্থানীয় সভার আয় বিবেচনা করিয়া দেখ। রোডসেস্ (Road Cess), খোঁয়াড়ের জরিমানা, পারঘাটের শুল্ক ইত্যাদি সামান্য মাত্র আয় লইয়া স্থানীয় সভা সমস্ত মহকুমাটার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ডিস্পেন্সরি, পথঘাট, ইত্যাদি অগণ্য বিষয়ের উন্নতি করিতে বসিবেন! এ সকল বালক-ক্রীড়া কি না তাহা যাঁহারা এই আশ্চর্য্য বিলের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

শিক্ষা ও ঔষধাদি বিতরণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এ-পর্য্যন্ত যে সকল সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, স্বায়ত্ত-শাসন কার্য্যে পরিণত হইলে আর সেরূপ করিবেন কি না, এবং যদি করেন তাহা হইলেও সে টাকা স্থানীয় সভা সকলের হস্তে দেওয়া হইবে কি না, বিলে তাহা লেখা নাই। বিলে যখন আয়ের সমস্ত উপায় লিখিত হইয়াছে অথচ এ কথার কোন উল্লেখও করা হয় নাই, তখন আমাদের আশঙ্কা হয় যে, হয়ত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এই সকল উপকার হইতে বঞ্চিত করিবেন। জানি না, বলিবার স্থান নাই—কিন্তু মন যেন বুঝিতেছে যে, এই স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের সর্ব্বনাশের একটা প্রধান সুযোগ হইয়া পড়িল। হায়! হায়! হয়ত আমরা উন্মত্ত হইয়া স্থানীয় শাসন-কার্য্যে আমাদের যে কিছু ক্ষমতা ছিল এবং গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে দয়া করিয়া যে সকল উপকার করিতেছিলেন তাহার কতক হারাইতে বসিয়াছি। হয়ত আমাদের হাতেরও গেল, পাতেরও গেল।

স্বায়ত্ত-শাসন নামক ঘোরতর পরায়ত্ত-শাসন বিলে দেশীয় লোকের হস্তে কোন ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই বরং সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে স্থানীয় সভাকে ঘোরতর করতলগত ও নিষ্পেশিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যদি তাহাদের হস্তে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষমতা দেওয়া হইত, যদি তাহাদের স্বাধীনতার কোন পরিচয় পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা বলিতাম পুলিশের উপর স্থানীয় সভার কোনরূপ আধিপত্য না থাকায়, বিলের বিশেষ ত্রুটি। কারণ, দেশে যে কোন কার্য্য করিতে হউক, তদারগ করিতে স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হউক, আদেশ সকল ঠিক হইল কি না জানিবার জন্যই হউক, সংবাদ সুদূরে প্রেরণ বা দূরের সংবাদ আনয়নার্থেই হউক, অথবা কার্য্য বা আদেশ, রাজকার্য্য বা রাজাদেশ বলিয়া অশিক্ষিত লোকের মনে প্রতীতি জন্মাইবার জন্যই হউক পুলিশের সহায়তা সকল সময়েই প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং পুলিশ, অন্ততঃ তাহার কোন কোন কর্ম্মচারী, স্থানীয় সভার না হয় কেবল সভাপতির আজ্ঞাধীন হওয়া আবশ্যক। বিলে তাহার কোনই ব্যবস্থা নাই। যে বিল স্বায়ত্ত-শাসনের নাম দিয়া প্রকারান্তরে এক সুকৌশল-সম্পন্ন পরায়ত্ত-শাসনের সৃষ্টি করিতেছে, সে বিলে এতাদৃশ অধিকার বিষয়ক কোন ব্যবস্থা থাকিবার আশা করা অন্যায়।

মেকলে সাহেব যে একটু একটু সামান্য

ক্ষমতা স্থানীয় সভার উপর অর্পণ করিয়াছেন তাহা কিছুই নহে। তাহাতে কাহার তৃপ্তি সম্ভব? দুধের তৃষ্ণা ঘোলে কখন মিটে? সকল জ্বালার উপর জ্বালা নিরন্তর ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হুজুরদিগের খোঁচা। এত করিয়া যাহা মেকলে দেখাইলেন এক কথায় তাহা সবই মাটী হইতেছে। নিম্নে তাঁহার কথা উদ্ধৃত হইতেছে :—

"The Magistrate of the District and any Sub-Divisional officer within whose jurisdiction any Local Government Circle is situated, shall have power at all times to enter on and inspect, or cause to be entered on and inspected, any immoveable property occupied by, or any work in progress under the orders of the Local Board of such Local Government Circle."

অর্থাৎ,—ম্যাজিষ্ট্রেট্, বা মহকুমার হাকিম যে কোন সময়ে তাঁহার অধিকার মধ্যস্থ স্থানীয় সভার স্বয়ং প্রবেশ করিতে বা অপরকে প্রবেশ করাইতে এবং তদধিকৃত যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি অথবা তদাদিষ্ট যে কোন কার্য্য তদারগ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

আবার—

"If it shall appear to the Magistrate of the District that the execution of any order or resolution of a Local Board within the jurisdiction of such Magistrate, or the doing of any act which is about to be done, or is being done, by such Local Board, is likely to cause injury or annoyance to the public, or to any class or body of persons, or to lead a breach of the peace, such Magistrate may, by order in writing, suspend the execution, or prohibit the doing thereof."

অর্থাৎ,—যদি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার এলাকার অধীন কোন স্থানীয় সভার কোন আদেশ বা মন্তব্য তামিল হইলে অথবা স্থানীয় সভার শেষ হয় হয় বা তখনও চলিতেছে এমন কোন কার্য্যের দ্বারায় সাধারণের বা সম্প্রদায় বিশেষের বা কতকগুলি লোকের ক্ষতি হইতে পারে, অথবা বিরক্তি জন্মিতে পারে কিম্বা শান্তিভঙ্গ ঘটিতে পারে মনে করেন তাহা হইলে তিনি সেরূপ বিষয় তামিল হওয়া বা সে কার্য্য লিখিত আদেশ দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

সকলেই জানেন যে সিভিলিয়ানগণ স্বায়ত্ত-শাসনের বিশেষ অনুকূল বন্ধু নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ লর্ড রিপনের মুখ চাহিয়া বা অন্য কোন কারণে ধীরে ধীরে স্বায়ত্ত-শাসনের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতেছেন; কেহ বা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছেন যে, এ ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা জানেন যে, এ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে ক্রমশঃ তাঁহাদের অবিসম্বাদিত প্রভুতা তিরোহিত হইবে এবং কৃষ্ণকায়, তৈলাক্ত, বর্ব্বর, বাঙ্গালী কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনভাবাপন্ন হইবে। লর্ড রিপন যাহাই বুঝুন, বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণর হইতে নবাগত এসিস্‌টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটটী পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই ভীত ও চমকিতভাবে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন। সেই সিভিলিয়ান্ ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় যখন তখন যে কোন কার্য্য বন্ধ করিতে পারিবেন, আইনে এ কথা

বলিয়া দিতেছে। তাঁহারা যথেষ্ট কারণ উপস্থিত না হইলে স্থানীয় সভার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া যদি আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া তাহা স্বীকার করিব। যে কার্য্য দশ জন লোকের বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের অপ্রিয় বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করিবেন তাহাই বন্ধ করিবেন। এখানে "বিবেচনা করিবেন" এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম সর্ব্বনাশের মূল নিহিত থাকিল। যাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতি করুণ নহেন, যাঁহারা বাঙ্গালীর কোন যোগ্যতা হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না, এবং যাঁহারা, বিজিত জাতি কিয়ৎপরিমাণে সমকক্ষতা লাভ করে ইহা দেখিতে চাহেন না, বর্ত্তমান স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী তাঁহাদের বিবেচনাধীন করা হইল। তাহার পর সম্প্রদায় বিশেষের অপ্রীতির কথা। যে ব্যবস্থা হিন্দুর প্রীতিকর, তাহা মুসলমানের অপ্রীতিকর এবং যাহা মুসলমানের প্রীতিকর তাহা হিন্দুর অপ্রীতিকর; যে ব্যবস্থা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আনন্দজনক, অশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের তাহা হয়ত ক্ষোভের কারণ; যাহা শাক্তের ভাল, তাহা বৈষ্ণবের ভাল নহে, এবং যাহা বৈষ্ণবের ভাল, তাহা শাক্তের ভাল নহে। এই বহুধর্ম্মাক্রান্ত বহুবিধ লোকের বাসভূমি বঙ্গদেশে এমন কোন ব্যবস্থাই হইতে পারে না, যাহা সর্ব্ববাদী সম্মত ও সকলেরই আনন্দজনক। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত লইয়া দেখ। কোন স্থানের ব্রাহ্মণগণ পায়খানায় মলত্যাগ করিতে হইলে আপনাকে অশুচি মনে করেন সুতরাং তাঁহারা গ্রাম-সন্নিহিত প্রান্তরে মলত্যাগ করেন। স্বায়ত্ত-শাসন সভা স্বাস্থ্যের অনুরোধে ব্রাহ্মণগণকে তাদৃশ কার্য্য হইতে বিরত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বিশেষ বিরক্তির সহিত বাধ্য হইলেন, অমনি ম্যাজিষ্ট্রেট এই বিরক্তিকর ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিলেন। একটা রাস্তার উভয়দিকে বৃক্ষশ্রেণী থাকিলে রৌদ্রের বা বৃষ্টির সময় লোকজনের গমনাগমনের সুবিধা হয়, স্থানের শোভা সম্বর্দ্ধিত হয় এবং হয়ত সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব কমিয়া যায় ভাবিয়া স্থানীয় সভা সেই পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ বসাইতে হুকুম দিলেন। চারা আনা হইল, মালি নিযুক্ত হইল এবং স্থান প্রস্তুত হইল। যাহাদের সেই পথের উত্তর ধারে বাটী তাহারা দক্ষিণ-বায়ু বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল এবং উভয় পার্শ্বের লোকেই তাহাদের বাটীতে চোর ও মন্দ লোক প্রবেশ করিবার সুযোগ হইল ভাবিয়া, অথবা তাহাদের বাটীর শোভা নষ্ট হইয়া যাইবে মনে করিয়া, বিরক্ত হইতে লাগিল। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এ কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন। কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কালে স্থানীয় সভা তথাবিধ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বস্ত্র শয্যাদি সমস্ত ভস্মীভূত করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। গ্রামের দরিদ্র প্রজাগণ এ ব্যবস্থায় নিতান্ত বিরক্ত হইল। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলেন। হোলীর সময় কোন স্থানে বড় ওলাউঠার আবির্ভাব হইয়াছে দেখিয়া তত্রত্য স্থানীয় সভা রৌদ্রের সময় চীৎকার করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করা যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করিলেন এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন। কতক লোক এ ব্যব-

স্থায় বড়ই বিরক্ত হইল। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট্‌এ ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিলেন। আর অধিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রস্তাব পল্লবিত করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ সহজেই দেখিতে পাইবেন যে, কোন ব্যবস্থাই সকলের সর্ব্বাংশে প্রীতিজনক হইতে পারে না। এক্ষণে ছিদ্রান্বেষী মাজিষ্ট্রেটগণ এই অপ্রীতির প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া স্থানীয় সভাকে যে প্রতিনিয়ত আপনাদের পদানত করিয়া রাখিতে পারিবেন তাহার সন্দেহ কি?

বাদিত, ধ্বনিত, আন্দোলিত, তর্কিত ও বিতর্কিত স্বায়ত্ত-শাসনের এই পরিণাম। মফস্বলের হুজুরগণের অসীম ক্ষমতা। সম্মুখে ও পশ্চাতে, উর্দ্ধে ও অধোদেশে কেন্দ্র-সভার দ্বারা উৎপীড়িত ও নিরত কৈফিয়ৎ যোগাইতে ব্যতিব্যস্ত স্থানীয় সভার নিষ্কৃতি কিছুতেই নাই।

মহাত্মন্‌ লর্ড রিপণ্‌! দেখ, তোমার সাধের স্বায়ত্ত-শাসন মেকলে সাহেবের হস্তে পড়িয়া কি বিকৃত বেশ ধারণ করিয়াছে? ভাই বঙ্গবাসি! এখনও কি স্বায়ত্ত-শাসনের উজ্জ্বল সতেজ মদিরা তোমার মস্তিষ্ককে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া রাখিয়াছে? এখনও কি তুমি বুঝিতেছ না, যে মেকলে সাহেব যে স্বায়ত্ত-শাসনের চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা ঘৃণার সামগ্রী—আদরের বস্তু নহে; তাহা ক্রীড়াশীল শিশুর চিত্তবিনোদক সামগ্রী—জ্ঞানবান মনুষ্যের তাহা গ্রহণীয় নহে। যদি স্বায়ত্ত-শাসন গ্রহণ করিতে হয়, তবে ভাল করিয়া গ্রহণ কর। নচেৎ আমরা অধীন, বিজিত, দরিদ্র জাতি, এ সুখের নেশায় আমাদের কাজ কি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হও—এ মোহ ত্যাগ কর।

স্থানের অল্পতা হেতু আমরা স্বায়ত্ত-শাসন পাণ্ডুলিপির যথাবিহিত আন্দোলন করিতে পারিলাম না এবং কি প্রণালী অবলম্বন করিলে স্বায়ত্ত-শাসন প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যকরী হয়, তৎসম্বন্ধে এস্থলে কোন মতামত ব্যক্ত করা হইল না। যদি প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাহা হইলে বারান্তরে আমাদের বক্তব্য ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিব।

উপসংহারে বক্তব্য যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালীকে এরূপ ছেলেখেলার জিনিষ করা লর্ড রিপণের বাসনা নহে। যাহা তাঁহার বাসনা নহে, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হয় সে দোষ আমাদের। এখনও উপায় আছে, এখনও সময় আছে। শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণ! এখনও সকলে মিলিয়া সমস্বরে এই বিলের প্রতিবাদ কর, তোমাদের অসন্তোষ ও অতৃপ্তির কথা লর্ড রিপণকে জানাও এবং এতাদৃশ কুটিল নীতির তোমরা অনুগামী হইতে চাহ না, এ কথা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর।

মা ও মেয়ে।

দ্বিতীয় খণ্ড।—প্রথম পরিচ্ছেদ।

রূপনগরের দুই ক্রোশ দক্ষিণে কল্যাণপুর নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামে বড় জোর পনের ঘর লোকের বাস অধিবাসিগণের কতক কৃষিজীবী, কতক

বৈষ্ণব, সুতরাং ভিক্ষুক, কতক সামান্য ব্যবসায়ী। সকলেই নিস্ব এবং কাহারও সামান্য তৃণকুটীর ব্যতীত আশ্রয় স্থান নাই।

এই কল্যাণপুরে সুরূপা নাম্নী এক বৈষ্ণবী বাস করে। সুরূপার স্বভাব চরিত্র বয়সকালে বড়ই মন্দ ছিল। এখন সুরূপার রূপ নাই, যৌবন নাই, মনে কোন অশান্ত প্রবৃত্তি থাকিলেও তাহার প্রকাশ নাই। সুরূপার নিজের কোন সামগ্রী না থাকিলেও, সে পরের মনোরথ সিদ্ধ করাইবার উপায় করিয়া দেয় এবং সেই উপায়ে কথঞ্চিৎ মনস্তুষ্টি লাভ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ফলতঃ সুরূপার আজি কালি ব্যবসায়ই ঐ। রামচরণ ডাক্তার সুরূপার প্রধান মুরুব্বি এবং সুরূপা রামচরণের প্রধান সহায়। অনেক অসাধ্যসাধনে তিনি সুরূপার সাহায্যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

সুরূপার সোহাগিনী নাম্নী এক কন্যা আছে। যথাকালে সুরূপা রাধারমণ দাস নামক এক বৈষ্ণব পুত্রের সহিত সোহাগিনীর বিবাহ দিয়াছিল। রাধারমণ কিঞ্চিৎ লেখা পড়া জানিত। সে বৈষ্ণব দলে মিশিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া চাকরি বাকরির চেষ্টা করে। ক্রোশ দুই দূরে হেমেন্দ্র রায় নামক একজন অতি সৎস্বভাব জমিদারের বাস। রাধারমণ চেষ্টা চরিত্রে হেমেন্দ্র রায়ের সংসারে মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য মুহুরির কর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়। প্রাতে রাধারমণ বাটী হইতে আহার করিয়া কর্ম্মস্থানে গমন করে এবং সন্ধ্যাকালে পুনরায় বাটী ফিরিয়া আইসে।

সোহাগিনীর বয়স এখন ষোল বৎসর। সোহাগিনী সুন্দরী। একে সুন্দরী, তাহাতে পূর্ণ যৌবন উপস্থিত। সুতরাং সোহাগিনী লাবণ্যজ্যোতিতে ঢল ঢলায়মানা। সোহাগিনী সতীত্ব ধর্ম্মের অপার মহিমা জানে। মাতার চরিত্র পূর্ব্বে নিতান্ত মন্দ ছিল, এখনও বড় ভাল নয় তাহা সোহাগিনীর অবিদিত নাই। সোহাগিনী মন্দ আলাপ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ চিন্তা অতি সাবধানতা সহকারে পরিত্যাগ করে। কিন্তু সোহাগিনীর মাতা তাহাতে রাজি নহেন। তিনি কন্যার এমন দেবদুর্লভ যৌবন, এমন সুকুমার শ্রী সকলই বৃথায় যাইতেছে মনে করিয়া দুঃখিতা।

বেলা প্রায় ২টা। সুরূপার একটী পয়স্বিনী গাভী আছে। সুরূপা তাহার সেবা করিতেছে। তাহাকে মানুষের ন্যায় নানাপ্রকার সোহাগ করিতেছে, এবং নানাবিধ মানবোচিত ও মানবাধিক বিশেষণে তাহাকে সম্ভাষ করিতেছে। বড় গ্রীষ্ম, সোহাগিনী ঘরের ভিতর চৌকীর উপর অলসিত ভাবে পড়িয়া আছে।

টুক্ টুক্ করিয়া একটী মানব ছাতা মাথায় দিয়া সুরূপার গৃহ প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরূপা গোয়াল ঘরের ফাক দিয়া দেখিয়া বলিল,—

"এদিকে, এদিকে। কি ভাগ্য!"

লোকটা ছাতা বন্ধ করিয়া গোয়ালঘরে প্রবেশ করিল। সুরূপা বলিল,—

"ডাক্তার বাবু, কি ভাগ্য আজি, এদিকে যে আজি পদধূলি পড়িল!"

তখন আগন্তুক রামচরণ ডাক্তার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন,—

"আর তো পারি না। তোমার বাড়ী আর নাহাক আসিব না। লাভ কেবল জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা। তুমি আমার কষ্ট দেখিতে ভালবাস। আমাকে এমন করিয়া

আসিতে বলার চেয়ে, আসিতে না বলাই ভাল।"

সুরূপা বলিল,—

"কি করি, ডাক্তার বাবু, আমার কি অসাধ! মেয়ে যে কিছুতেই বুঝে না। আমার বয়সে আমি বিস্তর মেয়ে দেখিলাম, কিন্তু এমন একগুঁয়ে কখন দেখি নাই। কি জানি রাধারমণ লক্ষ্মীছাড়া বেটা ওকে কি মন্ত্র দিয়েছে।"

ডাক্তার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"ঐ এক কথা। ও কথা শুনিয়া আর কাজ নাই। বুঝিলাম, তুমি আমার প্রতি সদয় নও। তা ন'লে, এওকি হয়? তুমি পার না কি? তোমার কথা সোহাগ শুনে না, কেমন করিয়া বিশ্বাস করি।"

সুরূপা বলিল,—

"ধর্ম্মস্বাক্ষী, ডাক্তার বাবু, আমার দোষ নাই, আমি পাখী পড়াইবার মত করিয়া প্রতিদিন সোহাগীকে বুঝাই। কত ভয় দেখাই, কত লোভ দেখাই, কত গহনা, কত টাকার কথা বলি কিন্তু সে কোন কথাই কাণে ঠাঁই দেয় না। উত্তরের মধ্যে কেবল কান্না। কি করি বল দেখি ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বলিলেন,—

"আমি ঢের দেখিয়াছি, ঢের জানি। কেন তুমি কি জানন? প্রথম প্রথম ঐরকমই হ'য়ে থাকে। তার পর একবার চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেলে পোষাপাখীর মত উড়ে এসে গায় বসে।"

সুরূপা বলিল,—

"একথা সত্য। আমারও বোধ হয় একবার রাজি করিতে পারিলে আর ভাবনা ভাবিতে হইবে না। কিন্তু সেই একবারই তো শক্ত কথা।"

রামচরণ বলিল,—

"শক্ত কিছুই নয়। তুমি একবার আমাকে সুবিধা করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে দেখাইয়া দিই আমি কেমন কাজের লোক।"

সুরূপা বলিল,—

"তাই ভাল। আজিকে আমি একবার ভাল করিয়া বলিয়া দেখি। কোন ভাল ফল ফলে ভালই, না হয় কালি তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তুমি যা হয় বলিও।"

রামচরণ বলিল,—

"বেশ।"

তাহার পর রামচরণ সুরূপার নিকটে আসিয়া চুপি চুপি অনেক কথা বলিল। উভয়ে অনেক হাসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ছাতা মাথায় দিয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামচরণ চলিয়া গেলে সুরূপা আসিয়া আস্তে আস্তে ঘরের দাবায় বসিল। বসিয়া বসিয়া তুড়ি দিয়া দুইবার হাই তুলিল। তাহার হাই শুনিয়া সোহাগ বাহিরে আসিল। আসিয়া জিজ্ঞাসিল,—

"কাহার সহিত কথা কহিতেছিলি? কে আসিয়াছিল মা?"

সুরূপা বলিল,—

"কেন আসিবে না? কত ভদ্রলোক আমার বাটীতে আইসে, কিন্তু তোর জ্বালায় আর তো কেহ আসিবে না। তুই পোড়ামুখী আপনিও মলি, আমারও মাথা খেলি।"

সোহাগ বলিল,—

"সে কি মা, আমি তোমার কি করিলাম? আমি কি করিতেছি যে আমার

জ্বালায় আর কেহ আসিবে না। তুমি আমাকে গালি দিতেছ কেন?'

সুরূপা বলিল,—

"গালি দিই কি সাধ করে? তুই কোন কথাই শুন্‌বি না, কোন কথাই বুঝবি না। তোর জ্বালায় যে আমি কি করিব তা বুঝিতে পারি না। মরণ হয় তো বাঁচি।"

সুরূপা এইরূপে অনেক আস্ফালন করিতে লাগিল কিন্তু সোহাগ তাহার এতাদৃশ ভাবের বিশেষ কোন অর্থ স্থির করিতে পারিল না। আবার সোহাগ কাতর ভাবে বলিল,—

"আমি কি শুনি না, কি বুঝি না—বল। আমার জন্য তোমার কি জ্বালা হইয়াছে, তা বুঝাইয়া দেও। এত ধূমধাম করিতেছ কেন?"

তখন সুরূপা বলিল,—

"জ্বালা নয়? জ্বালা আর কারে বলে? ডাক্তার বাবুর কথা তোরে রোজ রোজ বলি, তুই পোঁড়ার মুখী আমার কথা শুনিস্?"

সোহাগ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—

"মা—মা—আবার ঐ কথা। আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমার প্রাণ থাকিতে আমি তোমার ওসব কথা শুনিব না। ঐ কথায় যদি তোমার রাগ হইয়া থাকে, তাহাতে আমার হাত নাই। তোমার রাগ হউক, তোমার যাহা হয় হউক, আমি তোমার ওরকম কথা কখনই কানেও ঠাঁই দেব না।"

সুরূপা রাগের ভাণ করিয়া বলিল,—

"কি? এত বড় আস্পর্দ্ধা আমার কথা তুমি কানেও ঠাঁই দেবে না? আমিও যদি বৈষ্ণবের মেয়ে হই তো তোকে আমার কথা শোনাবই শোনাব। অধর্ম্ম হবে—পাপ হবে পোড়ারমুখী তোর মার অধর্ম্ম হয় নাই—তোর দিদিমার অধর্ম্ম হয় নাই। আজি উনি গোবরে পদ্ম হয়েছেন। সকলই উল্টা—সকলই বাড়াবাড়ি। পোড়ারমুখো রেধো! রেধো কাণে কি হরিমন্ত্র দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে, সে রেধোও যা, আর একজনও তা।"

সোহাগ অধোবদনে কাঁদিতেছিল। এক্ষণে কাঁদিয়া বলিল,—

"সে যাই হউক, আমি তাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানি না—জানিতে যেন আমার মতিও হয় না! সে আমার দেবতা। ভগবান করুন তার কাছে আমি যেন কখন অবিশ্বাসিনী না হই।"

সোহাগ রোদন করিতে লাগিল। সুরূপা বলিল,—

"কে সে বেটা, তার কিসের মুরদ? সে একমাসে যা রোজগার করে, তুই এক দিনে তার দশগুণ পাবি। সোণা দানা পরবি, সুখে থাক্‌বি,—তা হবে না!

সোহাগ বাধা দিয়া বলিল,—

"সোণা দানা আমি চাই না। ভিক্ষা করিয়া গাছতলায় রাঁধিয়া খাইব সেও ভাল, তথাপি আমি ধর্ম্মের, বিশ্বাসের মাথা খাইব না। তুমি আর যদি আমাকে ওকথা বল, তাহা হইলে হয় আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব, না হয় জলে ডুবিয়া মরিব।"

সুরূপা বলিল,—

"সতীত্বের কুঁড়ি। দেখি কেমন তোর ধর্ম্ম থাকে। আমি কথা কইলে তোমার সয় না—আমি আর কথা কইব না।"

এই বলিয়া সুরূপা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। সোহাগিনী সেই স্থানে বসিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি ৯টা হইবে। রাধারমণ বসিয়া ভাত খাইতেছে; সম্মুখে সোহাগিনী বসিয়া আছে। ঘরে মিট্ মিট্ করিয়া একটী ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। দরিদ্রের ঘর। তথায় শোভনীয় বা দর্শনীয় বস্তু কিছুই নাই। রাধারমণ জানে সোহাগিনী তাহার ঘরে যে শোভা বিস্তার করিয়া আছে, ভূমণ্ডলে তাহার তুলনা হইতে পারে এমন সামগ্রী কুত্রাপি নাই। আর সোহাগিনী জানে যাহার রাধারমণ আছে, এ জগতে তাহার নাই কি? এমন প্রেমপূর্ণ, এমন মমতাপূর্ণ, এমন আত্মবোধবিহীনতা-পূর্ণ, এমন স্বার্থত্যাগপূর্ণ এবং এমন স্বার্থ-পরতাপূর্ণ যে সংসার বোধ করি দিল্লীশ্বরের সংসার অপেক্ষা সুখ তথায় লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে।

রাধারমণ লোকটা দেখিতে সুপুরুষ। বয়স পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। চক্ষু আরক্ত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। দেহ দীর্ঘ, পরিণত এবং কৃশতা বা রুগ্নভাব বিবর্জ্জিত।

রাধারমণ ভাত খাইতেছে আর সোহাগিনী তাহার সম্মুখে বসিয়া আছে। এক এক গ্রাস ভাত মুখে দিতেছে ও যতক্ষণ তাহা উদরস্থ না হইতেছে ততক্ষণ রাধারমণ থাকিয়া থাকিয়া নিরাভরণা স্বর্ণকান্তি সোহাগিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছে। ভাত খাইবার উপকরন নিতান্ত অল্পই ছিল। সোহাগিনী বলিল,—

"ভাত কি আমার মুখে?"

রাধারমণ বলিল,—

"তরকারি বড় নাই তো। ভাত মুখে দিয়া তোমার মুখপানে চেয়ে থাকিলে কি করিতেছি তাহা ভুলিয়া যাই। কাজেই তরকারির কথা মনেও পড়েনা।"

সোহাগিনী হাসিয়া বলিল,—

"একথা আমাকে আগে কেন জানাও নাই। এমন সহজ উপায় থাকিলে আমি আর তরকারী রাঁধিব কেন? কালি হইতে বেশ করিয়া প্রদীপে জোর আলো করিয়া তোমার সম্মুখে বসিয়া থাকিব, তুমি দেখিও আর ভাত খাইও।"

রাধারমণ বলিল,—

"যদি শ্রম বাঁচাইতে তোমার মন হয়, তাহা হইলে আরও পার। ভাত না রাঁধিলেও চলে। আমি আসিতে আসিতে যে দিন তুমি গল্প করিতে আরম্ভ কর, সে দিন আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে পড়ে না। এ উপায়ে ভাতও বাঁচান যায়।"

সোহাগ বলিল,—

"না, তাতে আমার কাজ নাই।"

রাধাচরণ বলিল,—

"কেন?"

সোহাগ বলিল,—

"তাহলে আমার মদনমোহন রোগা হবে, শুকাইয়া যাবে, অসুখ হবে। তা হবেনা। আমার মদনমোহন খুব ভাত খেলে আমি ভাল বাসি।"

রাধারমণের আহার কার্য্য শেষ হইল। উঠিয়া বাহিরে হাত মুখ ধুইতে গেল। সোহাগিনী পাথরখানি তুলিয়া সেই স্থানে উপুড় করিয়া রাখিল এবং ভোজনাবশিষ্ট সকল বাহিরে ফেলিয়া দিল। রাধারমণ হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া ঘরে আসিলে সোহাগ তাহাকে একটা পান দিল। পান মুখে দিয়া রাধারমণ তামাক সাজিতে বসিল।

প্রদীপের নিকট চকমকির বাক্স লইয়া রাধারমণ বসিল এবং কথা কহিতে কহিতে তামাক সাজিতে লাগিল। অন্যমনস্ক হইয়া রাধারমণ যে ঘরে তামাক থাকে সেই ঘরে কলিকার গুল ঢালিয়া ফেলিল এবং যে ঘরে কয়লা থাকে তথায় তামাক খুঁজিতে লাগিল। তাহার তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার ভাত এবং ভাতের তরকারি সোহাগি তাহার সম্মুখে জাঁকাইয়া বসিয়াছে। সুতরাং রাধারমণের এই দশা। অনেকক্ষণ পরে রাধারমণ বলিল,—

"সোহাগি, আজি কি তামাক ফুরাইয়াছে?"

সোহাগী ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিতেছিল। হাসি চাপিয়া বলিল,—

"হাঁ, নাই হয় ত।"

তখন অগত্যা রাধারমণ চকমকি ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল এবং হুঁকা কলিকা একপার্শ্বে রাখিয়া দিল।

তখন সোহাগী হাসিতে হাসিতে চকমকি হাতে লইয়া রাধারমণকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিল,—

"একি? চক্ষু কোথায় রাখিয়া তামাক খুঁজিয়াছিলে?"

রাধারমণ বলিল,—

"তাই তো, অনেক তামাক আছে দেখিতেছি। আগে দেখিতে পাই নাই, সে তোমারই জন্যে।"

তখন রাধারমণ পুনরায় উঠিয়া তামাক সাজিতে গেল। সোহাগী কলিকায় তামাক সাজিতেছে দেখিয়া রাধারমন একখানি কয়লা লইয়া প্রদীপে ধরাইতে লাগিল। প্রথমে দেখিয়া ঠিক করিয়া হাত, কয়লা ও প্রদীপ যথাসন্নিবিষ্ট করিল। কিন্তু তখনই তাহার নয়ন ও মন যেখানে সোহাগীর অঙ্গুলি তামাক কুচাইয়া কলিকায় দিতেছে তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় তামাকের কৃষ্ণবর্ণ, সোহাগীর নখরের উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ এবং তাহার অঙ্গুলির চম্পকবর্ণ অনিয়মিতক্রমে সমবেত হইয়া মনোহর শোভা সমুৎপাদন করিতেছে। রাধারমণের চক্ষু কি সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও থাকিতে পারে? চক্ষু সেইখানেই গেল। সুতরাং হস্ত ও তৎসংস্পৃষ্ট কয়লা ক্রমে প্রদীপ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সোহাগী এ রহস্য দেখিল এবং প্রবর্দ্ধমান হাস্যের বেগ অতি যত্নে সম্বরণ করিয়া বলিল,—

"কই, আগুণ দেও।"

রাধারমণ তাড়াতাড়ি কয়লায় ফুঁ দিতে গিয়া দেখে কয়লা যেমন কালো তেমনি কালো। সোহাগী হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং রাধারমণের গলা জড়াইয়া ধরিল। রাধারমণ তাহাকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া ফেলিল। উভয়ে অনেকক্ষণ এইরূপ থাকিল। তাহার পর সোহাগী বলিল,—

"তামাক খাও।"

রাধারমণ উঠিয়া তামাক সাজিল। সোহাগী চৌকীর উপর যে মাদুর বিছান ছিল, ভিজা গামছা দিয়া একবার তাহা মুছিয়া ফেলিল। রাধারমণ তামাক খাইয়া শয্যায় আসিয়া বসিল। সোহাগিনীও ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বসিল, বসিয়া ধীরে ধীরে অদ্যকার সমস্ত বৃত্তান্ত রাধারমণকে জানাইল এবং আশঙ্কা ও অভিমান হেতু কাঁদিয়া ফেলিল। সাদরে রাধারমণ সোহাগিনীর নয়নের জল মুছাইয়া দিল এবং বলিল,—

"এত ভাবনা কি? আমি গরিব বটি,

কিন্তু আমি যাঁহার আশ্রিত তিনি দয়ার সাগর। তাঁহার গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। আমার প্রধান ভরসা ঈশ্বর, তাহার পর ভরসা হরেন্দ্র বাবু। আমার কখন মনে হয় না যে আমি সহায়হীন, বা নিরাশ্রয়। তোমার ভয় কি? যখন বিপদ বুঝিব তখন বাবুকে জানাইব, তিনি সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেনও—করিবেনও। ভাবনা কি?"

সেদিন এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা ২॥টা কি ৩টার সময়ে সোহাগিনী আপনার ঘরের ভিতর শুইয়া আছে। একটু ঘুমও আসিয়াছে। বড় গ্রীষ্ম। সোহাগিনীর শরীরের স্থানে স্থানে ঘর্ম্ম বাহিরিতেছে। ললাটে স্থূল স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সকল মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ণায়ত, পরিপুষ্ট দেহ যৌবন শ্রীতে ঝলমল করিতেছে। গ্রীষ্ম ও মানবহীনতা হেতু সোহাগিনীর শরীরের উর্দ্ধাংশ শিথিল-বাস রহিয়াছে। নিদ্রা সুন্দরীর স্বভাব কোমল কমনীয় কান্তিতে যেন আরও কমনীয়তা ঢালিয়া দিয়াছে। সুন্দরীর বদনে পাপসংস্পর্শবিহীনতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে। পবিত্রতা সকল অঙ্গে মাখা রহিয়াছে। সুন্দরী ঘুমাইতেছে।

ধীরে ধীরে, অতি সতর্কভাবে, একজন লোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া সেই অনাবৃত-অবয়বা সুন্দরীর নিটোল সৌন্দর্য্য—ভুবনমোহিনী কান্তি একবার হৃদয় ভরিয়া দেখিল। দেখিবামাত্র তাহার সর্ব্ব শরীর দিয়া তাড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাহার পাশব মূর্ত্তি আরও পশুভাব ধারণ করিল। সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঘরের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল। ধীরে ধীরে আসিয়া সুন্দরীর শয্যায় উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে সুন্দরীর পবিত্র অঙ্গে আপনার দুষ্কৃতি রাগরঞ্জিত, কলঙ্কিত হস্ত সমর্পণ করিল। স্পর্শ মাত্র সোহাগিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বেগে শয্যাত্যাগ করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং ঘরের এক প্রান্তে গিয়া

"একি—একি?—মা—মা"

বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

আগন্তুক হাসিয়া বলিল,—

"ভয় কি? মা কোথায়? সে সব জানে; ভাবনা কি? এদিকে এস।"

সোহাগ বলিল,—

"ডাক্তার বাবু, আপনার একি ব্যবহার? আপনি কোন সাহসে দরজা বন্ধ করিয়া আমার ঘরে আসিলেন? আপনি এখনি চলিয়া যাউন।"

ডাক্তার অচল। চলিয়া যাইতে সে আসে নাই, এক কথায় সে চলিয়া যাইবে কেন? বলিল,—

"যাও যাও করিতেছ কেন? ভয় কিসের? এদিকে এস, তোমার মা সব জানে; সে না বলিলে কি আমি এসেছি।"

সোহাগ বলিল,—

"মা বলিয়া থাকে বলুক, আমি মার কথা শুনিনা। আমার যেমন মন, যেমন ইচ্ছা তেমনি কাজ আমি করিব। আপনাকে আবার বলিতেছি আপনি চলিয়া যাউন।"

ডাক্তার বলিল,—

বস্তুর ইন্দ্রিয় জনিত জ্ঞান সকল স্থলে উহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণায়ক নহে।

প্রাকৃতিকবিজ্ঞানও (অর্থাৎ যে শাস্ত্রে বাহ্য পদার্থের গুণ এবং ক্রিয়ার অনুসন্ধান ও নির্ণয় হয়) উচ্চতম আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা উপর্য্যুক্ত তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। বরং আমাদের অন্তরেন্দ্রিয় কেবল বাহ্য জড়াত্মক পদার্থের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকায়, আমরা আমাদের মানসিক ও জীবাত্মা সম্বন্ধীয় সমস্ত ধারণা একেবারে বিস্মৃত হই ও অবশেষে ঐশ্বরিক সমস্ত ধারণা বিলুপ্ত হওয়ায় আমাদিগের কেবল জড়পদার্থে নাস্তিকতা সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। ব্যবচ্ছেদ (Anatomy) ও রসায়ন (Chemistry) শাস্ত্রের উক্ত প্রকার অযথা অনুশীলন হইলে, উক্ত বিষময় ফল যে অবশ্যম্ভাবী তাহা প্রতিপন্ন করার কোনই আবশ্যকতা নাই। তবে বাহ্যজগতের প্রকৃত জ্ঞান ও অনুশীলন হইলে যে ইহার পরিবর্তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই।

তত্ত্ববিজ্ঞান (Metaphysical Science) বিশুদ্ধ দর্শনশাস্ত্র সম্মত প্রণালীতে অনুশীলন করিলে সীমাবদ্ধ পদার্থদ্বয়ের তত্ত্বজ্ঞান হয় ও অসীম অচিৎ পদার্থের যথার্থ ধারণা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই যে অজ্ঞান তিমির সেই অসীম চিন্ময় পদার্থকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহারও বিনাশ হয়। এই জন্যই আর্য্য বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে "দর্শনশাস্ত্র" কহেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইহাকে "মূল বিজ্ঞান" কহেন। কারণ ইহা সমস্ত বিজ্ঞানেরই ভিত্তি স্বরূপ। এম্ কুজায়েন বলেন যে তত্ত্বশাস্ত্র (metaphysics) মৌলিক নিয়ম-দর্শন; অপর সমস্তই ইহার পরিণাম ও কার্য্য। যে শাস্ত্র সমস্ত পদার্থের কারণ ও প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয় করে তাহাকেই তত্ত্বশাস্ত্র (Metaphysics) কহে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (Physics) রাসায়নিক বিজ্ঞান, (Chemistry) ভূবিদ্যা, (Geology) শারীর বিজ্ঞান, (Physiology) চিকিৎসা বিজ্ঞান, (Medical Science) নীতি বিজ্ঞান, (Moral Science) রাজনীতি, (Polities) ব্যাকরণ, ন্যায়, (Logic) ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, (Theology) ঐতিহাসিক বিজ্ঞান, যতই উক্ত বিজ্ঞানের সহিত ঐক্য রক্ষা করিবে, ততই স্ব স্ব উন্নতি সাধনে সক্ষম হইবে। এই সমস্ত বিজ্ঞানের শেষভূত সত্যসমূহ উক্ত বিজ্ঞানের আত্মজ্ঞান (ontology) নামক অংশান্তর্গত। পদার্থের সংঘটন ও তাহাদিগের রাসায়নিক সংযোগ পরীক্ষা করিতে হইলে উক্ত বিজ্ঞানের মিলন জ্ঞান (cosmology) নামক অংশোক্ত বিধি সমূহ পালন করিতেই হইবে। শারীর বিজ্ঞান ও চিকিৎসাজ্ঞান উক্ত দর্শনের (Anthroposophy) মানবজ্ঞান নামধারী অংশ বিশেষের সহিত বিশেষরূপ সম্বন্ধ। সেইরূপ নীতিবিজ্ঞান ও রাজনীতি মনোবিজ্ঞানের (Psychology) সাহায্য ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রও মনোবিজ্ঞানের (Psychology) সাহায্যাপেক্ষী। ঈশ্বর বিজ্ঞান (Theodicy) নামক অংশ বিশেষই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল। সুদক্ষ ইতিহাস লেখকও মনোবিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়া চলিতে পারেন না। এই জন্যই এম্ কুজায়েন স্থলে স্থলে "ইতিহাস মানব-তত্ত্বের পরিণাম ও কাল পরম্পরা", "ইতিহাস মনোভাবের সহিত বাহ্যঘটনার সম্বন্ধ নির্ণায়ক বিজ্ঞান"

ইত্যাদি উক্তি করিয়া গিয়াছেন। অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে যে, মনোবিজ্ঞান (Metaphysics) সকল শাস্ত্রের মূল ও পরিণাম।

কিন্তু লক্ (Locke) সাহেবের কাল হইতে উক্ত দর্শনের সকল অংশের মধ্যে (Psychology) মনোবিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরব হইয়াছে। উক্ত দার্শনিক স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে "মানববুদ্ধির পর্য্যালোচনাই সকল দর্শনের অনুশীলন। দর্শনশাস্ত্রের এমন কোন অংশই নাই যাহা ইহার উপর নির্ভর করে না ও ইহার আলোক না লইয়া চলিতে পারে।" ষ্টুয়ার্ট (Stewart) সাহেব বলেন, "সকল বিজ্ঞানেরই মূল সত্যসমূহ মনোবিজ্ঞানের সহিত বিশেষরূপে সম্বদ্ধ। জীবনে যে যে বিষয়ের অনুশীলন করা যায়, তাহাদের পরিণাম চিন্তাই হউক, বা কার্য্যই হউক, তাহারা সকলেই যাহাতে মানব মনেরই অনুশীলন হয় সেই সাধারণ বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট।" মরেল (Morell) সাহেবও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহা সমস্ত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সমূহকে একত্র করিয়া সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ জ্ঞান-মন্দির নির্ম্মাণ করে। সুতরাং ইহা সকল বিজ্ঞানের শিরোমণি ও সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ও মূল নির্ণয় কারী। সুতরাং কোনও সময় বিশেষের জ্ঞানোৎকর্ষ বিচার করিতে হইলে, তাৎকালিক মনোবিজ্ঞানের পরিণাম দর্শন করিলেই হইতে পারে; কারণ ইহাই অপর সকল বিজ্ঞানেরই পরিণামভূত। এ প্রস্তাব আর দীর্ঘ না করিয়া আমরা প্লেটোর উক্তি বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াই এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। সেই উক্তিটী এই, "প্রাকৃতিক পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানে যদি কৃতকার্য্য হইতে হয়, তাহা হইলে তদগ্রেই মানসিক বিধি-সমূহের জ্ঞান উপার্জ্জন করা অপরিহার্য্য।"

মনোবিজ্ঞানের অসদ্ব্যবহার ও তাহার পরিণাম।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, মনোবিজ্ঞান স্বীয় বিশুদ্ধতা সত্ত্বেও স্থলে স্থলে ভ্রম দূষিত হইয়া মানবমন হইতে অজ্ঞান-তিমিরের নিরাকরণ না করিয়া বরং স্বজাত ঈশ্বর জ্ঞানকে তিমিরাচ্ছন্ন ও তৎসঙ্গে অন্তরেন্দ্রিয়কে বিপদে ধাবমান করে। সুতরাং কিরূপে এই বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, ও কিরূপে তাহার অপনোদন করা যায়, তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মানবজ্ঞানের বিষয়ভূত পদার্থ সমূহকে অসীম চিৎ, অসীম অচিৎ, সীমাবদ্ধ চিৎ, এবং সীমাবদ্ধ অচিৎ ও ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ভেদে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, সীমাবদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্যক জ্ঞান হইলেই অসীম পদার্থদ্বয়েরও প্রকৃত জ্ঞান হয়।

"সত্য কূপে নিহিত আছে" * এই উক্তিটী প্রকৃত তাহার আর সংশয় নাই। কোন পদার্থের গূঢ়তর প্রদেশে অনুসন্ধান না করিলে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু মিথ্যাতর্কজনক কতিপয় কদর্য্য শক্তি মানবমনে বদ্ধমূল থাকিয়া প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মনকেও পরীক্ষণীয় পদার্থের উপরিভাগে ভাসমান রাখে ও

* "Veritas imputed" Truth lies in a well.
"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"।

তাহার গূঢ়তম প্রদেশে নিমগ্ন হইয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করণে বিলক্ষণ বাধা উৎপাদন করে। সুতরাং এবম্বিধ কুসংস্কারের অপনোদন করা ও মনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসন্ধান করা সত্যপ্রার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই আবশ্যক।

সুদৃঢ় ভিত্তির পত্তন না করিয়াই স্বীয় প্রতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দানে উৎসুক হইয়া দার্শনিকগণ স্থলবিশেষে অসীম চিন্ময় পদার্থের দ্বারা এত মুগ্ধ হইয়া থাকেন যে, সীমাবদ্ধ পদার্থদ্বয়ের অস্তিত্ব একেবারেই বিস্মৃত হন। ইহাতে দ্বিবিধ অনিষ্ট-জনক প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ, সীমাবদ্ধ পদার্থদ্বয়কে হীনপ্রভ অনুভব হওয়াতে তাহাদের অস্তিত্ব সুন্দররূপে প্রতীয়মান হয় না; সুতরাং উক্ত পদার্থদ্বয়ের প্রকৃত গুণপুঞ্জ এক সর্ব্বশক্তিমান্ নিত্যপদার্থে আরোপিত হয়। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা তিমিরাচ্ছন্ন হয় এবং সর্ব্ব মঙ্গলের নিদানভূত পরম পবিত্র পদার্থকেই পাপাসক্ত মানবজাতির দুষ্প্রবৃত্তির নিদানরূপে প্রতিপন্ন করা হয়। স্পিনোজার (Spinoza) মত ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। দ্বিতীয়তঃ, সীমাবদ্ধ পদার্থদ্বয়ের প্রকৃতির অনুভব হইলে তাহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস হয়। কিন্তু তাহাদের পারস্পরিক কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই দার্শনিকগণ ইহা মীমাংসা করিয়া লয়েন যে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছামত স্থল বিশেষে উক্ত পদার্থদ্বয় মিলিত হয়। ইহাতেই বাহ্যজগতের স্বাতন্ত্র্য অন্তরেন্দ্রিয়ে বিলীন হয় এবং পরিণামে সর্ব্বব্যাপী নাস্তিকতা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। বার্কলির (Berkley) মত ইহার উদাহরণ।

অন্যপক্ষে দার্শনিকগণ জড়াত্মক বাহ্যজগতের অস্তিত্বকে এতদূর বিশ্বাস করেন যে, অন্তরেন্দ্রিয়কে উহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাঁহাদের প্রতীয়মান হয় না; সত্য ও ধর্ম্ম বাহ্য পদার্থ হইতেই জাত ও ঈশ্বর স্বীকার মূঢ়-লোকের ধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। হবস্, (Hobbes) কন্‌ডিলাক্, (Condillac) হার্টলি (Hartley) সাহেব এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

এইরূপে আন্তরিক ও বাহ্যিক পদার্থের প্রকৃতি নির্ণায়ক মত সমূহের উক্ত প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া কোন কোন দার্শনিক স্বতন্ত্র মত প্রচারে পরাঙ্মুখ হন এবং কেবল উপর্য্যুক্ত কল্পনা সমূহের দোষ প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত থাকেন। সুতরাং তাঁহারা একেবারে স্বীকার করিয়া লয়েন যে, উক্ত প্রকার পদার্থতত্ত্ব নির্ণয় করা মানবের সাধ্যাতীত এবং অগত্যা উক্তপ্রকার তত্ত্বানুসন্ধানে পরাঙ্মুখ হইয়া অবশেষে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানাভাব পূরণ না করিয়া নিশ্চিন্ত হন। রীড্ (Reid) ও এবারক্রম্বির (Abercrombie) মনোবৃত্তি ঠিক এই প্রকারের ছিল।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে উক্তরূপ প্রমাদের অসদ্ভাব নাই। পরন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে সকল মত স্পষ্ট প্রতীয়মান সত্য, জ্ঞান ও বুদ্ধির বিরোধী সেই সকল মতই দার্শনিকগণ অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া স্ব স্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

লুইস (Lewis) সাহেব তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে বলিয়া গিয়াছেন যে, "পদার্থসমূহের প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়-চেষ্টা

সর্ব্বথা বিফল ও নিরাশজনক হইয়াছে। উক্ত প্রকার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দার্শনিকগণ এক চক্রে ভ্রমণ করিয়া ও একই প্রশ্নের আন্দোলন করিয়া অবশেষে প্রথমাবস্থায় উপনীত হইয়া নিরস্ত হইয়াছেন।" এই জন্যই এই শাস্ত্রের এত অনাদর। ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই অনাদরের যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। "পদার্থ সমূহের তত্ত্বানুসন্ধান সম্বন্ধে সাধারণের যে কুসংস্কার আছে তাহার দুইটী প্রধান কারণ আছে;—(১) উক্ত অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত প্রশ্ন সমূহের মানব বুদ্ধি দ্বারা মীমাংসা হয় না, ইত্যাকার ধারণা। (২) উক্ত বিষয় সমূহের মানবজীবনের সহিত কোন সম্পর্কই নাই।" (ক্রমশঃ)

খদ্যোতপুঞ্জ।

(শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য-ইতিহাস-রহস্য-বিদ্রূপ-কণিকা)

জীব জন্তুর কলম।—কৌশল দ্বারা এক বৃক্ষের কিয়দংশ অপর বৃক্ষে লাগান যায় এবং এক বৃক্ষের গায়ে সময়ে সময়ে ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করিতেও পারা যায়। এইরূপ বৃক্ষ লতার নানাপ্রকার কলমের কথা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রতিপন্ন করিতেছে যে, সময়ে সময়ে জীবজন্তুর শরীরেও কলম হয়।

কথিত আছে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালী দেশীয় অধ্যাপক টেলিয়াকোটস্ (Taliacotius) মানুষের নষ্ট নাসিকা উদ্ধার করিয়া দিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থও আছে। বলোনা নগরের বক্তৃতা মন্দিরে টেলিয়াকোটসের একমূর্ত্তি স্থাপিত আছে; ঐ মূর্ত্তির হস্তে একটা নাক লাগান আছে। এই নাক জোড়া দেওয়া পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বটলর (Butler) তাঁহার হিউডিব্রা (Hudibras) গ্রন্থে অনেক পরিহাস করিয়াছেন। যাহা হউক এই নাসিকাবিৎ অধ্যাপক যদি রাবণ রাজার সমকালে বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে রাক্ষসেশ্বর ও তাঁহার নাসিকাহীনা ভগ্নী পণ্ডিতবরকে সম্মান ও রাজপ্রসাদে বিভূষিত করিতেন।

ডাক্তার জন্ হণ্টর (John Hunter) তাঁহার শোণিত বিষয়ক (Treatise on Blood) গ্রন্থে জীবজন্তুর কলম সংক্রান্ত দুই এক উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি একবার একটা মোরগের পদদেশের কোন অংশ লইয়া অপর এক মোরগের চূড়ায় জোড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বর্লিন নগরের ডাক্তার ডিফেনব্যাক (Dieffenback) জীব জন্তুর কলম করিতে বিশেষ ওস্তাদ। তিনি একবার একটা কৃষ্ণকায় মোরগ শিশুর পালক একটা সাদা পায়রার গলায়, পৃষ্ঠে এবং পুচ্ছদেশে কলম করিয়াছিলেন এবং ঐ পায়রার সাদা পাখাগুলা সেই কালো মোরগের গায়ে লাগাইয়া দিয়াছিলেন।

এই ডাক্তার কখন কখন বিড়াল শিশুর দেহে পায়রার পাখা, কখন বা খরগোসের গায়ে মোরগের পাখা বেশ করিয়া কলম করিয়া দিতেন। একবার তিনি একটা পায়রার গায়ের পাখা তুলিয়া ফেলিয়া তথায় বিড়ালের মুখের অনেকগুলা লম্বা লম্বা গোঁফ বেশ করিয়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন। অধিক কি তিনি এক বন্ধুর কতকগুলি জর কেশ আপনার বাহুতে দিব্য কলম করিয়াছিলেন। এইরূপ নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা ডাক্তার ডিফেনব্যাক আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আমাদের ডাক্তারেরা উল্লিখিত বৃত্তান্ত সকলের অন্ততঃ যদি শেষটীও অভ্যাস করিতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। অনেক সুন্দরী, দেখিতে পাই, অকালে টাকের জ্বালায় বড় কাতর হন। তাঁহারা অনেক যত্ন করিয়া চুল পাতাইয়াও টাক ঢাকিতে সক্ষম হন না। যদি সুকৌশলী ডাক্তার সেই টাকে অপরের চুল কলম করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবসায়ও বেশ চলে, দেশেরও একটা উপকার হয়।

সম্প্রতি সায়ান্টিফিক আমেরিকান (Scientific American) নামক পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরের হাস্পাতালে ডাক্তার লিট্‌ল্‌ আশ্চর্য্যরূপে এক যুবার নষ্ট চক্ষুর উদ্ধার করিয়াছেন। একটী খরগসের বামচক্ষুর তারকা লইয়া ঐ যুবার নষ্ট চক্ষে কলম লাগাইয়া দিয়াছেন। কলম বেশ লাগিয়া গিয়াছে এবং উক্ত যুবক এক্ষণে সুন্দররূপে দেখিতে পাইতেছেন।

জগদ্বিখ্যাত জনসন (Dr. Johnson) এই নূতন প্রকার কলম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "কালে এই সকল পরীক্ষা হইতে কি অত্যাশ্চর্য্য ফল ফলিবে তাহা বলা যায় না। * * * হয়ত অতি সামান্য যত্নে কোন কলম পরীক্ষক আমাদের রমণীকুলকে সারকেশীয় জ্র, গ্রীসীয় নাসিকা এবং বিম্বাধর বিশোভিতা করিয়া দিবেন।"

——০০——

জীবন্ত পাথরের মানুষ।—প্রাণীগণের অস্থি কালে প্রস্তরীভূত হয়; ভূগর্ভে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সজীব মনুষ্যের অস্থি সমূহও প্রস্তরীভূত হয়, একথা অতি বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। ডবলিন্‌ নগরের কৌতুকাগারে(Museum) এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কর্ক নামক নগরবাসী ক্লার্ক নামক একব্যক্তি সজীব অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই অবস্থায় বহুদিন জীবিতও ছিল। যাহারা ক্লার্ককে জানিত তাহারা সকলেই বলিয়াছে যে, এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বে ক্লার্ককে সকলে ক্ষিপ্রকারী ও বলশালী ব্যক্তি বলিয়া জানিত। এক রাত্রে ঘোরতর সুরাপানাদি অত্যাচারের পর ক্লার্ক মাঠে পড়িয়াছিল। উত্থানকালে ক্লার্ক বুঝিতে পারিল, তাহার শরীর কেমন অবশ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ক্লার্কের চক্ষু, চর্ম্ম ও অন্ত্রাদিব্যতীত সকলই প্রস্তর ভাবাপন্ন হইয়া গেল। সাহায্য বিনা আর বসিতে উঠিতে পারিত না; এবং পরিশেষে দেহ আর কোনদিগে নত করিতেও পারিত না। দাঁড় করাইয়া দিলে ক্লার্ক দাঁড়াইতে পারিত কিন্তু নড়িবার চেষ্টা করাও তাহার সাধ্যাতীত হইয়াছিল। তাহার দুই পাটী দাঁত জোড়া লাগিয়া একখান হইয়া গিয়াছিল। তরল খাদ্য তাহার উদরে

চালাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে দাঁত ভাঙ্গিয়া ফাঁক করা হইয়াছিল। তাহার রসনা স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়াছিল এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে সে আর চক্ষেও দেখিতে পাইত না। ডবলিনের কৌতুকাগারে ক্লার্কের প্রস্তরীভূত দেহ সযত্নে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন গ্রীসের দেবতত্ত্বের মধ্যে এতাদৃশ কাহিনী এক আধটা শুনা যায়। আমাদের দেশে গৌতমপত্নী অহল্যা বহুকাল পাষাণী হইয়া ছিলেন।

——০০——

বজ্রাঘাত।—বজ্রাহত হইলে মনুষ্য বাঁচে না এবং যাহার আঘাত অল্প মাত্রায় হয়, সেও যদিও বাঁচে তথাপি অনেক ক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। ল্যান্‌সেট্ (Lancet) নামক চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রে একটী অদ্ভুত বজ্রাঘাতের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। একটী লোক প্রাচীর হেলান দিয়া একটা খোলা জায়গায় বসিয়াছিল, সেই সময়ে সে বজ্রাহত হয়। গলদেশ দিয়া তাড়িত-প্রবাহ প্রবিষ্ট হইয়া তাহার বাহুতে চলিয়া আইসে। বক্ষ, নাভি, নিম্নপেট, জননেন্দ্রিয় এবং সমস্ত পদদ্বয় তাড়িতাক্রান্ত হইয়াছিল। যে যে স্থান দিয়া তাড়িত-প্রবাহ চলিয়াছিল সে সকল স্থান অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল এবং কোন কোন স্থান ছিন্ন বা ছিদ্রযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রায় সমস্ত পরিচ্ছদই নষ্ট হইয়াছিল। গায়ের জামাটা এককালে পুড়িয়া গিয়াছিল। পায়ের জুতার যে স্থান ভেদ করিয়া তাড়িত ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল জুতার সে স্থানটা প্রায় তিন ইঞ্চ ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। এই বর্ণনা পাঠ করিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এ স্থলে অতি সতেজ বজ্রাঘাত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন আক্রমণেও সে ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হয় নাই এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন সময়েই তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত হয় নাই! এরূপ অসাধারণ ব্যাপার আর শুনা যায় না। এ ব্যক্তি স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছে যে, প্রথম যখন তাড়িত তাহার শরীরে প্রবেশ করিল তখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এবং যতক্ষণ তাড়িত তাহার দেহ ছিন্ন, ভিন্ন, দগ্ধ ও দলিত করিতে লাগিল, ততক্ষণ সে তাহার কি হইয়াছে ও কি হইতেছে তাহা পরিষ্কাররূপ বুঝিতে পারিল এবং সেই অচিন্তিতপূর্ব্ব যমযন্ত্রণা সজ্ঞানে তাহাকে সমান ভোগ করিতে হইল। ধন্য তাহার স্নায়বিক শক্তি!

——০০——

একটী ঐতিহাসিক কথা।—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় অনুমান করেন যে, ইন্দ্র চত্বারিংশ আর্য্যাব্দে রোদসী (আধুনিক রোড্‌স্) নামক দ্বীপ অধিকার করেন এবং তথায় কুলিতরের পুত্র শম্বর নামক অসুরপতিকে বৃহৎ পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে বধ করেন। স্বীয় মতের সমর্থনার্থ উক্ত অসাধারণ পণ্ডিত মহাশয় ঋগ্বেদান্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণ সঙ্কলন করিয়াছেন।

"উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্ব্বতাদধি।
অবাহন্নিন্দ্র শম্বরম্॥"

"অর্থ—দাসবংশীয় কুলিতরের পুত্র সুতরাং কৌলিতর শম্বরকে, আর্য্যদলপতি ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ রাজা, বৃহৎপর্ব্বতের অধিত্যকাতে বধ করিয়াছেন।"

এবং

"দিবে দিবে সদৃশী রন্যমর্দ্ধং
কৃষ্ণা অসেধদপ সদ্মনো জাঃ।
অহন্ দাসা বৃষভো বস্নয়ন্তো
দব্রজে বর্চ্চিনং শম্বরঞ্চ॥"

"অর্থ—পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র বাসভূমি এই পৃথিবীর অপরার্দ্ধ অর্থাৎ যে অর্দ্ধে বাস করিতেছি তদন্য প্রদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক এবং প্রতিদিন সমভাব অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি শূন্য কৃষ্ণ সমুদ্রীয় জল সমূহকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণ সমুদ্রের সন্নিহিত জল মধ্যস্থ দ্বীপে দাসদলের অধিপতি শম্বর নামক অসুরকে বধ করেন।"

এতৎ সম্বন্ধে আরও বিশিষ্ট প্রমাণ আছে এবং তৎসমস্তও সামশ্রমী মহাশয় ক্রমশঃ সঙ্কলন করিবেন বলিয়াছেন। যাহা হউক এতাদৃশ ঘটনা সমূহ প্রমাণীকৃত হইলে, ভাষা শাস্ত্রের সহায়তায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে আর্য্য-ইতিহাস গঠন করিয়াছেন, তাহা বৃথা ও সারহীন হইয়া পড়িবে। আমাদিগের ভরসা আছে সামশ্রমী মহাশয়ের ন্যায় সুপণ্ডিত দ্বারা আর্য্যজাতির ইতিহাসের অন্ধকারাবৃত ভাগ আলোকিত হইবে, এবং বিবিধ অজ্ঞাত পূর্ব্ব বা অনালোচিত পূর্ব্ব তথ্য সুপ্রকাশিত হইবে।

—oo—

ষ্টিল পেন।—লৌহ নির্ম্মিত লেখনী আজি কালি বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে। কঞ্চি, খাঁক, বাকারি, কঞ্চিলতা প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা পূর্ব্বে লেখনী প্রস্তুত করা হইত। পিতামহ ব্রহ্মার বাহন মরালরাজ স্বীয় পুচ্ছ এই শুভকর্ম্মে ব্যয়িত করিতে আরম্ভ করার পর হইতে উল্লিখিত লেখনী সকল পেন্সন লইয়া কর্ম্মের বাহির হইতে লাগিলেন। ষ্টিল পেনের আবির্ভাব অবধি ক্রমে ক্রমে হংসের পুচ্ছ ধরিয়া টানাটানি করিবার প্রয়োজন কম হইয়া পড়িতেছে। বোধ হয় অনতিবিলম্বে হংসগণ কাব্য সকলে নায়িকার গতি বর্ণনার উপমান হওয়া ব্যতীত সাহিত্যের সহিত অন্য কোনরূপ সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারিবেন না। ক্ষুদ্র ষ্টিল পেনেরই জয়!

এই ষ্টিল পেন সকল অধিকাংশই বর্মিংহাম নগরে প্রস্তুত হয়। বর্ষে বর্ষে প্রায় ১২০ টন (অর্থাৎ প্রায় ২১৬০ মোন) ইস্পাত কলম তৈয়ার করিতে লাগে। এক এক টনে ১,৯০০,০০০টা কলম জন্মায়। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ বর্ষে বর্ষে কত ষ্টিল পেনই প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইতেছে।

—oo—

বেঁড়ে সিংহের বক্তৃতা, অথবা ভেলা-বাঙ্গালী কুপো কাৎ।

সিংহিগণ ও সিংহ মহোদয়গণ! আপনাদের বড় বড় লেজ আছে, আমার তাহা নাই—আমি বেঁড়ে। আমার পিতা, পিতামহের লেজ ছিল, আমাদের গোষ্ঠিতে বরাবর লেজ ছিল। কেবল আমি বেঁড়ে হইয়াছি। আমাদের বংশে আমি প্রথম বেঁড়ে। আমার এ দশা ঘটিবার কারণ আছে। আমি সংক্ষেপে সে কথা বলিব।

আমার পিতা একদা মান্দ্রাজ প্রদেশে শীকার করিতে গিয়াছিলেন। ঘটনা-সূত্রে তথায় এক কেলে শেয়ালীর রূপে মুগ্ধ হইলেন। প্রবাদ আছে যে পিতা শেয়ালীকে যথা নিয়মে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমি সেই শেয়ালীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি। সিংহের ঔরষে শেয়ালীর গর্ভে জন্ম বলিয়া আমি বেঁড়ে হইলাম। (শ্রোতৃবর্গ উচ্চৈঃস্বরে—

'কুচ্ছি নাই, কুছি নাই, আমাদের মধ্যেও অনেক বেঁড়ে আছে') আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে তোমাদের মধ্যেও অনেক বেঁড়ে আছেন। যাহোক, অলাঙ্গুল ও সলাঙ্গুল সকলে আজ এক হৃদয়ে কাজ করিতে হইবে। (বাহবা, বাহবা, হুরে)।

সিংহিগণ ও সিংহগণ! যে প্রস্তাব আলোচনা করিতে আমরা আজ সহরের এই সাধারণ গৃহে সমাগত হইয়াছি তাহার ভাবার্থ তোমরা অবগত হইয়াছ। আলোচ্য বিষয় যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিবার ভার আমার উপর নহে। আমার পূর্ব্বগামী বক্তাগণ যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার সঙ্গে চুক্তি গালি দেওয়া। শত্রুগণকে গালি দিবার জন্যই আমি কটিবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। তোমাদের সময় অতি মূল্যবান, অধিক সময় না লইয়া আমি সংক্ষেপে আমার কথা শেষ করিব। (হুরে)

ভগ্নি ও ভ্রাতৃগণ! তোমাদের অবিদিত নাই, যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বঙ্গদেশ জয় করিয়া বাঙ্গালী নামে যে জন্তু আছে তাহাদিগকে দাস্যবৃত্তিতে নিয়োগ করেন। এ যাবত কাল বাঙ্গালী আমাদিগের জুতা মাথায় বহিয়া আসিতেছে। আজন্মকাল সিংহের জুতা বহিয়া বাঙ্গালীর মাথায় টাক পড়িয়াছে। (হিপ, হিপ, হুরে) উষ্ণ-রক্ত সিংহগণ, বলিতে লজ্জা হয়, ধমনীতে রক্ত দ্রুত বহে, গায়ের লোম খাড়া হয়, আপনা হইতে দন্ত কিড়িমিড়ি করে, পশুরাজ সভায় প্রস্তাব হইয়াছে যে, সেই বাঙ্গালী জন্তু আমাদের হাকিম হইবে। (ওঃ! ওঃ! কখনই না, কখনই না) বীর-হৃদয় সিংহগণ, লাঙ্গুল নাড়িয়া আবার বল, কখনই না। (কখনই না, কখনই না) কালা বাঙ্গালী—ভেলা বাঙ্গালী সিংহের উপর আইন চালাইবে? যাহা মনে করিলে রাগে সর্ব্বশরীর কম্পমান হয়, তাহা কি তোমরা স্বচক্ষে দেখিবে? (না, না, না)

ভ্রাতৃগণ! বাঙ্গালী জন্তুর সবিশেষ বৃত্তান্ত তোমাদের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। এ সম্বন্ধে আমাকে অধিক বলিতে হইবে না। কেবল দুই চারিটা কথা বলিয়া আমি নিরস্ত হইব।

বাঙ্গালীর অপর নাম বাবু। বাবু দ্বিপদ জন্তু, কিন্তু পাখী নহে। বাবুকে গুতো মারিলে টু মারে; অথচ ভেড়া নহে। বাবুর আস্ফালানী খুব আছে, অথচ ষাঁড় নহে। শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত অথচ শৃগাল নহে। সর্পের ন্যায় বিশ্বাস ঘাতক, কিন্তু সাপ নহে। বাবু এক অপূর্ব্ব জন্তু। বাবু কথা কয়, হাসে, কেঁদে খায়, কাপড় পরে, অথচ মানুষ নহে। যাহা শিখাও তাই শিখে, যাহা বল তাই করে, অথচ পোষ মানে না। বাগে পেলেই যে হাতে খাওয়ায় সেই হাতকে কামড়ায়। (মার, মার, মার, বাঙ্গালীকে) হা, হা, হা! তোমরা মারিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু মারিতে পারিবে না। (কেন পারিব না, অবশ্য পারিব, বাঙ্গালী মারিব) উঁহু, পারিবে না। বাঙ্গালী ভেলা; উহাকে ধরা যায় না; ধরিলেই ফস্‌কিয়া যায়। (সে কি?) তবে শুন। জন্মিবা মাত্র বাঙ্গালীকে সরিষার তেলে চুবিয়া রাখে। তেলের হাঁড়িতে থাকিয়া বাঙ্গালী পুষ্টিলাভ করে। যতদিন পর্য্যন্ত হাঁটিতে না শিখে, তত দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী তেলে ডুবান থাকে। তার পর তেল খাইতে আরম্ভ করে। (ছি! ছি! ছি!—তেল খায়?) হাঁ আমি স্বচক্ষে

দেখিয়াছি বাঙ্গালী কলসী কলসী তেল খায়। (সিংহিগণ—ওমা ছি! জনৈক সিংহী মূর্চ্ছিতা) তেল খায় ও তেল মাখে। (মার বাঙ্গালী) বাঙ্গালীর সর্ব্বাঙ্গে তেল। বাঙ্গালীর মাথা দিয়া তেল গড়িয়া পড়ে। বাঙ্গালীর জুতায় তেল, বাঙ্গালীর হুকায় তেল। (মার বাঙ্গালী) বাঙ্গালী যে চৌকিতে বসে তাহা তেলা হইয়া যায়। ভ্রাতৃগণ, আমাদের আফিসের চেয়ারে এত ছার-পোকা কেন? কেবল বাঙ্গালীর তেলের জন্য। বাঙ্গালীর টাকায় পর্য্যন্ত তেল। বলিতে কি, বাঙ্গালীর মোকদ্দমার কাগজ স্পর্শ করিলে, দশবার সাবান মাখিতে হয়। (মার বাঙ্গালী) বাঙ্গালী হা করিলে মুখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া তেল পড়ে। এক কথায়, বাঙ্গালী তেলা। (ধর কামান, মার বাঙ্গালী) সিংহিগণ ও সিংহগণ, তোমরা কি ইচ্ছা কর, এই তেলা বাঙ্গালী তোমাদের বিচার কর্ত্তা হইবে? (কখনই না, কখনই না, আমরা গোলা চালাইব, তেলা বাঙ্গালীকুল ধ্বংস করিব) আমাদের বিদি বুড়ো কর্ত্তা তাঁহার মত যে আমরা তেলা বাঙ্গালীর দাস হই। সিংহগণ, তোমরা কি বল? (আমরা বুড়োর কথা শুনিব না) সাবাস্! তোমরা যথার্থই সিংহকুল-গৌরব। তোমাদের বীর দাপে আজ বসুধা কম্পমান। (হিপ্ হিপ্ হুরে) তোমরা এক বাক্যে প্রতিজ্ঞা কর যে বুড়োর কথা মানিবে না; বুড়োর বাহা-ত্তরে ধরেছে, বুড়োর কথা শুনিলে রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইবে, সিংহকুলে কলঙ্ক পড়িবে। (হুরে, হুরে, হুরে) বল, বুড়োর কথা শুনিব না। (সকলে দণ্ডায়মান হইয়া — 'বুড়োর কথা মানিব না') ভ্রাতৃগণ, আর একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। (সকলে, 'বল কি প্রতিজ্ঞা, যাহা বলিবে তাহাই করিব') প্রতিজ্ঞা কর যে তেলা বাঙ্গালিকে চিরশত্রু জ্ঞান করিবে। (গাঁ গাঁ করিয়া লাঙ্গুল নাড়িয়া সিংহগণ বীর দাপে লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিলেন; কাষ্ঠ নির্ম্মিত ফ্লোর ভার সহিতে না পারিয়া ধুপ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সিংহ ও সিংহিগণের মর্ম্মভেদী চীৎকারে সহর তোলপাড় হইয়া গেল।)

——০০——

মানুষ পশু।—ঘটনাক্রমে মানব শিশু জনহীন স্থানে আসিয়া পড়িবার নানা প্রকার সম্ভাবনা আছে। সেরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে যদি অরণ্যচর জীবজন্তু শিশুর প্রাণ বিনাশ করে, তাহা হইলে আর কথাই নাই। কিন্তু যদি কোন পশুর যত্নে, না হয় অপর কোন অনিশ্চিত কারণে সেই শিশু জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহার মানবোচিত কোন ভাবই থাকে না এবং তাহার প্রকৃতি সর্ব্বথা বনচর পশুর ন্যায় হইয়া উঠে। এরূপ পশু ভাবাপন্ন মানুষ সময়ে সময়ে অপর মনু-ষ্যের চক্ষে পড়িয়া ধরা পড়িয়াছে। কত হয়ত সেইরূপ বনের পশু হইয়া, বনফল খাইয়া বনের ক্রোড়েই শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে—মানব সংসার তাহাদের চেনে নাই এবং মনুষ্য সমাজ কি তাহা তাহারাও জানে নাই। অদ্য আমরা পিটর নামক বন্যবালকের বিবরণ নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

জর্ম্মণ রাজ্যের অন্তঃপাতী হানোভর প্রদেশ সন্নিহিত অরণ্য মধ্যে এই বন্যবালক পরিদৃষ্ট হয়। তৎকালে এই মানুষ-পশু বানরের ন্যায় চারি হস্ত পদ দ্বারা হাঁটিতে-ছিল, কাষ্ঠ মার্জ্জারের ন্যায় গাছে গাছে

বেড়াইতেছিল এবং তৃণাদি ভক্ষণ করিতেছিল। ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জর্জ তৎকালে হ্যানোভরে অবস্থান করিতেছিলেন। বন্যবালককে সকলে তাঁহারই সমক্ষে আনয়ন করিল। রাজা তখন আহার করিতেছিলেন, তিনি এই বন্যবালককে কিছু খাদ্য দিবার যত্ন করিলেন কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না। সে যেরূপ খাদ্য ভাল বাসে তদ্রূপ দিবার আদেশ করিলে, তাহাকে কাঁচা খাদ্য আনিয়া দেওয়া হইল। সে তাহা পরমানন্দে ভক্ষণ করিল। এই বন্যবালকের বয়স তখন প্রায় ১৫ বৎসর হইয়াছিল। সে একটীও কথা কহিতে পারিত না, কাপড় পরিত না, সোজা হইয়া হাঁটিতে পারিত না, এবং কাঁচা ফল মূলাদি ভিন্ন খাইত না। তাহার মস্তকে দীর্ঘ-কেশ এবং হস্তপদে অতি দীর্ঘ নখ জন্মিয়াছিল। সে আনন্দ ব্যক্ত করিতে হইলে অশ্বের ন্যায় বিকট চীৎকার করিত এবং সময়ে সময়ে নানা প্রাণীর শব্দানুকরণ করিত। একবৎসর পরে জর্জ তাহাকে সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে আইসেন। ইংলণ্ডে আসিয়া তাহাকে কোন প্রকার পরিচ্ছদ পরাইবার যত্ন করা হয়। সে বস্ত্র দ্বারা শরীর আবরণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু শাসন ভয়ে অগত্যা নালকিনারা যুক্ত সবুজ রঙ্গের একটা পোষাক মনোনীত করিয়া লইয়া পরিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে কেবল পদদ্বয়ের দ্বারা সোজা হইয়া হাঁটিতে এবং মানুষের ন্যায় বিছানার উপর শয়ন করিতেও সে অভ্যাস করিয়াছিল। এই সময় তাহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহার 'পিটর' এই নামকরণ করা হয়।

পিটরকে কথা কহিতে শিখাইবার নিমিত্ত যথেষ্ট যত্ন করা হয়, কিন্তু কোন ফল ফলে নাই। অনুমান ৭৩ বৎসর বয়সে পিটরের কাল হয়। বৃদ্ধাবস্থাতেও পিটরের দেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল। পিটর বৃক্ষ লতাদি পূর্ণ স্থান দেখিলে বড় আনন্দিত হইত। নারীজাতির প্রতি পিটর কখনই অনুরাগ দেখায় নাই। সে বড় আগুন ভাল বাসিত, এবং যে ঘরে থাকিত সে ঘরের চিম্নিতে গ্রীষ্মকালেও আগুন বোঝাই করিত। উজ্জ্বল সামগ্রী দেখিলে পিটর বড় প্রীত হইত। যাহাদের সঙ্গে পিটর একত্রে থাকিত তাহাদের কাহারও প্রতি সে কখনও কোন অত্যাচার করে নাই। তাহার রক্ষক ও শিক্ষককে সে বড় ভাল বাসিত। পিটর বহুকাল লোকালয়ে বাস করিয়া মনুষ্যের রীতি নীতি সকলই অভ্যাস করিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাক্‌যন্ত্র এমন বিকৃত হইয়াছিল যে, সে জীবনে আর অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে নাই।

শিবের বাঁদরামি।—রাজ-প্রসাদে আমি শিব হইয়াছি। টাইটেল রূপ ধুম সেবনে ভোঁ। ছিল ছেলে শিখান তার, হ'লাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য! তার উপর বংশ মর্য্যাদা। নেসার ঝোঁকে যদি কিছু বেলয় বলি, আপনারা নিজগুণে মাপ করিবেন। আমি জগৎ শেঠের বংশোদ্ভব। যে জগতশেঠ ওমির্চাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়া এবং আফিমখোর মিরজাফিরকে রস্তা দেখাইয়া বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজ্য স্থাপনে সাহায্য করেন, আমি সেই জগতশেঠের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। সেই মহাপুরুষের রক্ত আমার ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে। আমি নিজে সরকারের ঘরের খাঁই নৌকর। হুজুর. আমি নিজে ক্রীতদাস, এবং আমাদের জাতি ক্রীত.

দাসের জাতি। ক্রীতদাসের জাতি—ভেড়ার জাতি—হুজুর, আমি ভেড়া! ইতিহাসের পূর্ব্ব হইতে হিন্দু জাতি দাসত্ব করিয়া আসিতেছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমানের দাসত্ব করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা ইংরাজের দাসত্ব করিতেছি। দাসত্ব আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। বিশেষ হিন্দুর নিকট রাজাই দেবতা—ঈশ্বর। হুজুর বড়লাট সাহেব, ও মাননীয় ইলবার্ট সাহেবজি, আপনারা আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার মনস্থ করিয়াছেন আমরা তাহার যোগ্য পাত্র নহি। যাহারা ক্রীতদাস, তাহাদের উপর এত অনুগ্রহ কেন? হুজুর, জেনাব, এত দয়া করিবেন না, আমরা এত দয়ার পাত্র নহি। আমরা চিরকাল আপনাদের জুতা বহিয়া আসিতেছি, জুতাই বহিব। দেবতাদিগের জুতা মস্তকে ধরিলে শরীর মন পবিত্র হয়, চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়। ইংরাজের জুতায় হিন্দুর গৌরব। আমরা আবার ইংরাজের উপর হাকিমত্ব করিব! কি ভয়ানক! একথা মুখে আনিলেও পাপ। দেবগণ! আপনাদের এ অসীম অনুগ্রহের কথা চিন্তা করিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে। এত দয়া—এত অনুগ্রহ! উঃ ভাবিতে ভাবিতে আমার মস্তিষ্ক ঘুরিয়া এক দিকে পড়িয়া গেল, আমার অন্তঃকরণ আর এক দিকে পড়িল, মধ্যস্থলে আমি সাক্ষিগোপাল দাঁড়াইয়া আছি! হুজুর বক্তৃতা করা আমার অভ্যাস নহে। বিশেষ আপনাদিগের দয়া দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। ভাবিতে ভাবিতে আমার মস্তিষ্ক এক দিকে পড়িল, আমার অন্তঃকরণ আর এক দিকে পড়িল! কি বলিতে ছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি। আমার মস্তিষ্ক এক দিকে অন্তঃকরণ আর এক দিকে! জল খাব! আমি টাইটেল রূপ ঘুম পাবে, ভোঁ—কি বলিতেছি কিছুই ঠিক নাই! আমার মস্তিষ্ক এক দিকে, অন্তঃকরণ আর এক দিকে। জ—ল খা—ব। (ধুপ্)

বিদ্যুল্লতা।

(উপন্যাস)।

বিদ্যুল্লতা পিতাকে অনেক দিন দেখেন নাই। ভগ্নী হেমলতার জন্য পাত্র মনোনীত করিয়া পিতাকে সংবাদ দিয়াছেন, আজ তাঁহার আসিবার কথা আছে, তাই বিদ্যুল্লতা সোৎসুক চিত্তে পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বিদ্যুল্লতা শ্যামনগর নিবাসী ৺রাধাকান্ত ঘোষের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ। তাঁহার বয়ঃক্রম উনবিংশতি বৎসর—তিনি বিধবা। যে দেশে বিধবা মহিলার পক্ষে ইহলোকের সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিবার ও আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার বিধি, যে দেশে বিধবার রূপই বিষম অনর্থকর ও কামনরূপ, সে দেশের কোন বিধবার রূপ

বর্ণন করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। বিশেষতঃ আমাদের বিদ্যুল্লতার সেই অনুপম স্বর্গীয় রূপরাশি, সেই বসন্ত কালের নবপল্লবিত ব্রততী-শোভন সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌকুমার্য্য বর্ণনার অতীত। বিদ্যুল্লতা যখন প্রাতে স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিধান করেন, আর তাঁহার আলুলায়িত কুন্তলদাম পৃষ্ঠে লম্বিত হইয়া পড়ে, তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রকৃতিদেবী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার সে সুন্দর পবিত্র ভাবের তুলনা মর্ত্যলোকে অতি দুর্লভ।

বিদ্যুল্লতা ভাবিতেছেন—'পিতা এখনও কেন আসিতেছেন না।' দেখিতে দেখিতে বেলা অবসন্ন হইয়া পড়িল তথাপি পিতা আসিলেন না।—তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হইলেন। শ্রাবণ মাস—পারাপারের পথ—ভাবনা হইবারই কথা। বিদ্যুল্লতা গৃহে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। প্রতিবাসিনী মাসতুতো ভগিনী স্বর্ণলতার বাটীতে গমন করিলেন।

স্বর্ণলতা আপন শয়ন কক্ষে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। বিদ্যুল্লতা বাহির হইতে ডাকিলেন,—"স্বর্ণ!" স্বর্ণলতা অমনি ব্যস্তে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং "দিদি গা—এস" বলিয়া সাদরে বিদ্যুল্লতার হাত ধরিয়া কক্ষ মধ্যে লইয়া গেলেন। উভয়ে একাসনে উপবেশন করিলেন। এক সরোবরে পাশাপাশি দুইটী ফুল ফুটিল!

স্বর্ণলতাও সুন্দরী। তিনি সালঙ্কৃতা সধবা, তাঁহার সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতে বাধা নাই। কিন্তু আমরা যাহাকে সুন্দরী বলিব পাঠকের চক্ষে তিনি যে সুন্দরী হইবেনই হইবেন একথা বলিতে পারি না। সকলের রুচি একরূপ নহে—সৌন্দর্য্য বোধ সমান নহে। রুচিবিশেষে আবার বিচার্য্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মনোহারিতা বিষয়ে নানা মত হইয়া পড়ে। সুতরাং অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন দর্শকের নয়নে সুরূপাও কুরূপা এবং কুৎসিতাও সুন্দরী বলিয়া বোধ হয়।

বিদ্যুল্লতা ও স্বর্ণলতা একত্রে বসিয়া আছেন। স্বর্ণলতা পতিসোহাগিনী, সুচারু বসন ভূষণে ভূষিতা—বিদ্যুল্লতা পতিবিরহবিধুরা, নিরাভরণা, শুভ্রবসনা। অথচ দুই জনেরই অতুল সৌন্দর্য্যরাশি যৌবন সহযোগে যেন উথলিয়া উঠিতেছে। সূর্য্যরশ্মি উদ্ভাসিত প্রফুল্ল কমলের ন্যায় স্বর্ণলতার মুখকমল দেখিলে নয়ন মন এককালে পরিতৃপ্ত হয়। বিদ্যুল্লতার সুচারু বদনকমল ও প্রফুল্ল কিন্তু হৃদয়াশ্রিত বিচ্ছেদ বিষাদরূপ মেঘের ছায়াপাতে ঈষৎ ম্লান—দেখিলে দর্শকের নয়ন মন সুন্দরীর সেই প্রফুল্লতা ও ম্লানতা মিশ্রিত বদনে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের বিকাশ দেখিতে পায় এবং দেখিবামাত্র সেই মুখখানি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়।

বিদ্যুল্লতা কাতরভাবে কহিলেন,—"বাবা এখনও আসিলেন না—মন বড় উদ্বিগ্ন হইল, বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না—তাই ভাই তোমার কাছে আসিয়াছি।"

স্বর্ণলতা। আমার সৌভাগ্য—দিদি,—তুমি ত প্রায়ই আসিতে পার না,—বিশেষতঃ ইনি বাটী থাকিলেত প্রায়ই আইস না; তা মেশো মহাশয় কেন আসিলেন না?

বিদ্যুল্লতা। কি জানি ভাই—আমি ত তাই ভাবিতেছি।

স্বর্ণলতা। প্রায় সন্ধ্যা হল—তবে আজ বুঝি আসিলেন না।

বিদ্যুল্লতা। তাই ত ভাই তোমায় মিছামিছি জলখাবারের উদ্যোগ করিতে বলিয়া কষ্ট দিলাম।

স্বর্ণলতা। তার আর কষ্ট কি, দিদি?

বিদ্যুল্লতার পিতা কন্যাদান করিয়া অবধি রাধাকান্তের বাটীতে জল গ্রহণ করেন না। এই জন্য বিদ্যুল্লতা স্বর্ণলতাকে পিতার জন্য খাবার প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন।

বিদ্যুল্লতা। সে যা হউক, আসিলে বড় ভাল হইত, হেমার সম্বন্ধটা এক প্রকার স্থির হইয়া যাইত।

স্বর্ণলতা। ভাল দিদি, আমি বলি হেমের বিবাহ ও বাটীর শশী ঠাকুরপোর সহিত না দিয়া, তোমার দেবরের সহিত দাও না কেন?

বিদ্যুল্লতা। আমি কি ভাই সে চেষ্টা করি নাই—তা ঠাকুরপোর মত হয় কৈ?

স্বর্ণলতা। কেন, তিনি ত তোমার কোন কথায় অমত করেন না।

বিদ্যুল্লতা। তা সত্য—কিন্তু ও কথা পাড়িলেই নিরুত্তর হইয়া যান।

স্বর্ণলতা। (ঈষৎ হাস্য করত) যেমন আমাদের সুরূপা—

বিদ্যুল্লতা। কেন?

স্বর্ণলতা। উনি আবার তাহার বিবাহ দিবার কথা পাড়িয়াছিলেন।

সুরূপা স্বর্ণলতার দাসী বলিলে বলা যাইতে পারে। বাল্যাবস্থায় সে বিধবা হইয়াছিল, তখন তাহার মা বাপ কেহই বাঁচিয়া ছিল না। স্বর্ণলতার স্বামী তাহাকে অনাথিনী, নিরাশ্রয়া ভাবিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। সে সেই অবধিই স্বর্ণলতার বাটীতে অবস্থিতি করিয়া আসিতেছে। তাহার প্রতি স্বর্ণলতার স্নেহ ত হইতেই পারে। তাহার সরল প্রকৃতি দেখিয়া বিদ্যুল্লতাও তাহাকে যারপরনাই স্নেহ করিয়া থাকেন; এমন কি, সময়ে সময়ে ভাল খাদ্য দ্রব্য, ভাল বসন থালা তাহাকে দিয়া আনন্দ লাভ করেন। সুরূপা বিদ্যুল্লতাকে মায়ের মত ভক্তি করে, মা বলিয়া ডাকে, এবং কখন কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইলে সে বিদ্যুল্লতাকে তাহার জন্য বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইদানীং স্বর্ণলতার প্রতি তাহার একটু অভিমান জন্মিয়াছে। স্বর্ণলতা স্বামীর নিকট তাহার পুনর্ব্বার বিবাহের কথা উত্থাপন করিতেছেন। বিধবা হইলে যে আর বিবাহ করিতে নাই তাহা বিদ্যুল্লতাকে দেখিয়া সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছে। সে আর বিবাহ করিবে না, তবু সেই কথার বারম্বার উল্লেখ হেতু তাহার অভিমান। সুরূপার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর হইবে।

বিদ্যুল্লতা কহিলেন, মেয়েকে যে আজ দেখিতে পাইতেছি না?

স্বর্ণলতা ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, আজ আবার সে রাগ করিয়া মাসীর বাটী গিয়াছে

"কেন অকারণে তাহার মনে কষ্ট দাও স্বর্ণ" বলিয়া বিদ্যুল্লতা সস্নেহে স্বর্ণলতার পানে চাহিলেন। স্বর্ণলতার সরলতা মাখান চক্ষু দুটী ইতিপূর্ব্বে আনন্দে উৎফুল্ল ছিল; বিদ্যুল্লতার কথায় ঈষৎ ম্লান হইল—স্বর্ণলতা অপ্রতিভ হইলেন। বিদ্যুল্লতা তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "দেখ স্বর্ণ, যাউক ভাই ও কথা, বাবা দরিদ্র হইয়াছেন ভাবিয়া সর্ব্বদা অসুখী থাকেন,—মহত্তের পতন হইলে যন্ত্রণার শেষ থাকে না। আগেকার কথা সকল মনে পড়িলে

তিনি নির্জ্জনে বসিয়া রোদন করেন। তোমার বিবাহ উপলক্ষে, শুনিতে পাই, বহির্ব্বাটীতে বসিয়া কত দিন কাঁদিয়াছেন।” বলিতে বলিতে বিদ্যুল্লতার বদনমণ্ডল বিষাদগ্রস্ত হইয়া আসিল।

বালিকাগণের বিবাহ সম্বন্ধে আজকাল মাতা পিতার যে ঘোরতর শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা মনে পড়ায়, সরলস্বভাবা স্বর্ণ বলিয়া ফেলিল, “দিদি, হয়ত আমাদের দেশে কুমারী হত্যা প্রচলিত হইবে! এদেশে কেন এত রমণীর জন্ম হয়?”

বিদ্যুল্লতা ও স্বর্ণলতা উপস্থিত দেশাচার সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, অকস্মাৎ স্বর্ণলতার স্বামী গিরীশচন্দ্র ত্রস্তে সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রমণীদ্বয় নিঃসঙ্কোচে অন্যমনে বসিয়াছিলেন; অজ্ঞাতে, অনবধানে তাঁহাদের গাত্রের ও বক্ষের বসন ঈষৎ বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গিরীশ বাবুকে দেখিবামাত্র উভয়েই অত্যন্ত অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইলেন এবং ব্যস্তত্রস্ত গাত্র আবরণ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। বিদ্যুল্লতা অবগুণ্ঠন মধ্যদিয়া স্বর্ণলতার পানে একবার চাহিয়া তখনই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। স্বর্ণলতার দ্বিগুণ লজ্জা হইল, দশনে জিহ্বা দংশন করত ‘ছি, ছি ছি, একটু সাড়া দিয়া আসিতে হয়’ বলিয়া স্বামীকে মৃদু ভৎ-সনা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গিরীশ চন্দ্রও অপ্রতিভ হইলেন অথচ বিদ্যুৎবৎ বিদ্যুল্লতার রূপ লাবণ্য দর্শনে এককালে চমকিত ও বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তিনি যেন একবারে এত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ কখন দেখেন নাই। কি সুন্দর মুখ খানি! দেহাবয়বের কি সুকোমল গঠন! চলনের কি চমৎকার লালিত্য! এমন সুকুমারী স্বর্ণপ্রতিমা রমণীকেও দেশাচারের কঠোর শাসনে নিতান্ত ম্রিয়মানা হইয়া থাকিতে হইতেছে! কি দুঃখ! গিরীশ তাহাই ভাবিতেছিলেন, স্বর্ণলতার ভৎসনা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

গিরীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘উনি কে স্বর্ণ?’

‘তোমায় বলিব কেন? ছি ছি ছি, কি করিলে বল দেখি, দিদি আমায় কত কি বলিবেন?” বলিয়া স্বর্ণলতা একটু অভিমানিনী হইলেন। গিরীশ আর কথা কহিলেন না, দেখিয়া স্বর্ণলতা অমনি স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলেন, ‘রাগ করিলে? আমি বলছি। উনি ঘোষেদের বড় বউ, আমার রাঙ্গাদিদি।’ গিরীশ বিস্মিত ভাবে, ‘কি বিদ্যুল্লতা! তিনি অমন হইয়াছেন?’ বলিয়া আবার নীরব হইলেন। স্বর্ণলতা মনে করিলেন, রাঙ্গাদিদির বৈধব্য দশা দেখিয়া তাঁহার স্বামীর মনে বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি মনে মনে স্বামীকে শত ধন্যবাদ দিলেন এবং সানুনয়ে বলিলেন, ‘একটু বস, দেখি দিদি বাড়ী গেলেন নাকি।’ যাইবার সময় স্বর্ণলতা একবার স্বামীর দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ তুমি ধর্ম্মাত্মা, পরদুঃখে কাতর, তুমি প্রীতির ভাণ্ডার; যে সকল গুণে মনুষ্য মনুষ্য নামের যোগ্য হয়, তোমার হৃদয়ে সে সমুদায়ই আছে, তুমিই আমার ইষ্ট দেবতা।

গিরীশ চন্দ্র চক্ষে চসমা দিয়া মুক্ত

বাতায়নের নিকট বসিয়া সন্ধ্যার তেমন অল্পালোকেও একখানি কি পুস্তক দেখিতেছেন। স্বর্ণলতা নিকটে দাঁড়াইলেন। গিরীশ কথা কহিলেন না, স্বর্ণলতা ভাবিলেন তাঁহার স্বামীর চিত্ত পাঠে নিমগ্ন, তাঁহাকে বিরক্ত না করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

গিরীশ বাবু কি সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাস্তবিকই পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন? আমরা জানি, পুস্তকে নয়ন নিয়োজিত রহিয়াছে বটে অথচ মন তাহাতে নাই,—কোথায় ভ্রমণ করিতেছে, এমন অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকে। গিরীশ বাবুর মন এখন চিন্তামগ্ন। তিনি কি কারণ বশতঃ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণ নাই।

যে গৃহে কেবল যুবক কর্ত্তা, আর যুবতী কর্ত্রী, সে গৃহে কর্ত্তার পক্ষে দণ্ডে দণ্ডে ভার্য্যা দর্শন এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। দেখা কর্ত্তব্য বলিয়া না হউক, না দেখিয়ে থাকিতে পারেন না। যুবক কখন সানুরাগে যুবতীর চিবুক স্পর্শে হাসির কথা বলিয়া, হাসির লহর তুলিয়া বিধুমুখে হাসি দেখিয়া, আনন্দে গলিয়া যান, আর কখন চুপি চুপি লুকাইয়া আসিয়া কৌতুক ছলে আমোদ করিয়া যান। তার পর গৃহকার্য্যের পরামর্শ করা সর্ব্বদাই আবশ্যক হইয়া থাকে, যুবক তদুপলক্ষে ভার্য্যার শ্রীমুখ দর্শনের সাধ মিটাইয়া যান। এ বাটীর মধ্যে গিরীশ বাবুই কর্ত্তা, স্বর্ণলতাই কর্ত্রী। বাটীতে থাকিলে, গিরীশ বাবুও প্রয়োজনে অথবা নিষ্প্রয়োজনে সর্ব্বদা অন্তঃপুরে আসিয়া স্বর্ণলতার সহিত আমোদ কৌতুক করেন। বলিতে পারি না, কি কারণ বশতঃ এখন তিনি সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিভ্রান্তাকে দেখিবেন বলিয়া? তাঁহার এ অপবাদ ঘোষণা করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

গিরীশ চন্দ্র মিত্র ধনশালী যুবা পুরুষ বটেন কিন্তু, তাঁহাকে পাপাচারী বা পাপমতি বলিয়া কেহ কখনও সন্দেহ করে নাই। তিনি অতি সুশিক্ষিত ও বিদ্বান। মিষ্টভাষী ও সদাচারী, পরোপকারী ও প্রকৃত দেশহিতৈষী। তাঁহার রুচি মার্জ্জিত, মন উন্নত ও চরিত্র নির্ম্মল। এই সকল গুণে তিনি দেশে প্রভূত যশঃ ও মান লাভ করিয়াছেন। আর্য্যধর্ম্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস, ঈশ্বরে তাঁহার অচলা ভক্তি। সত্যে তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা এবং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প। ধর্ম্মানুরাগহেতু সকলের নিকট তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। আবার স্বর্ণলতা যেরূপ পতিগতপ্রাণা ভার্য্যা, গিরীশ চন্দ্রও তেমনি স্বর্ণলতাকে যার পর নাই ভালবাসিতেন। তাঁহার সংসার সুখের সংসার।

ধন্য গিরীশ চন্দ্র! তোমার ন্যায় সৌভাগ্য কাহার? তোমার ন্যায় প্রকৃত সুখী জগতে কয় ব্যক্তি? ধন সম্পদ, বিদ্যা বুদ্ধি, মান সম্ভ্রম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সদা চিত্তপ্রসাদ, স্বর্ণলতার ন্যায় সুন্দরী পতিপরায়ণা সাধ্বী ভার্য্যা—এ সকল কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখিও, গগনে চন্দ্রের ষোড়শ কলা পূর্ণ হইলেই, কৃষ্ণপক্ষে আবার তাহার হ্রাস আরম্ভ হয়। মেদিনীতলে নদীতে জোয়ার পরিপূর্ণ হইলেই ভাঁটা হইয়া থাকে।

গিরীশ চন্দ্র ভাবিতেছেন, "আজ আমার মন এমন হইল কেন? আমার মন সদাই প্রকৃতিস্থ, 'সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে', তবে আমার হৃদয়বেগ আজ উজান

বহিল কেন? হায়! কিসের জন্য এখন আমার হৃদয় এত ব্যাকুল?"

গিরীশ কখন নারীর রূপে মুগ্ধ হন নাই, রূপজ মোহে আকৃষ্ট হন নাই,—কর্ত্ত-ব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাহীন হইয়া উন্মত্ত হন নাই। যদি কখনও কাহারও রূপে মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তবে সে কেবল স্বীয় পত্নী স্বর্ণলতার পরিপুষ্ট রূপছটায়। একদিন স্বর্ণ-লতা বিলম্বিত কুন্তলদাম কবরিত করিবার মানসে সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া যখন ঈষৎ বক্র স্থঠামে বসিয়া ঘন কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ চম্পক-বিনিন্দিত অঙ্গুলি সঞ্চালনে যেন যমুনার জলে বিজলী খেলাইতেছিলেন, তখন গিরীশ গবাক্ষ মধ্যদিয়া স্বর্ণলতার তৎকালীন অপূর্ব্ব রূপভঙ্গিমা দেখিয়া একবারে মোহিত হই-য়াছিলেন। আর একদিন স্বর্ণলতা কবরী বন্ধন করিয়া দর্পণে মুখ ও তাম্বুলরাগ রঞ্জিত ওষ্ঠাধর দেখিতেছিলেন, পশ্চাতে গিরীশ চুপি চুপি আসিয়া দাঁড়াইলে, তাঁহারও কৌতূহল বিকশিত মুখ সেই মুকুরে প্রতি-ফলিত হইলে, স্বর্ণলতা অমনি ঈষৎ হাস্য করিয়া পশ্চাৎ দিকে বক্রভাবে অপাঙ্গ দৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বঙ্কিম ভাব ও সহাস বিলোল কটাক্ষ দেখিয়া গিরীশের মন আর একবার মুগ্ধ হইয়াছিল। এইরূপে, পূর্ব্বে গিরীশ যখনি রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—তখনি তাঁহার রূপতৃষ্ণা মিটিয়াছিল। তিনি কখন পরকীয়া নারীর রূপে মুগ্ধ হন নাই, রূপ-মরীচিকায় কখন বিড়ম্বিত হন নাই, সুতরাং পিপাসা অপরিতৃপ্তির যন্ত্রনা কি জানিতেন না! তিনি কখনও কোন প্রলোভনে পড়েন নাই, সুতরাং ঠেকিয়া শিক্ষা তাঁহার কিরূপে হইবে! তিনি বুঝিলেন, এই তাঁহার বিষম পরীক্ষার সময়!

গিরীশ আবার ভাবিলেন, "বিদ্যুল্ল-তার বৈধব্যদশা দেখিয়া কি আমার অন্তরে সহানুভূতির উদয় হইতেছে? না, তা নয়। তাহা হইলে আবার দেখিবার ইচ্ছা হইবে কেন? এই ইচ্ছার মূলে অবশ্যই পাপ আছে। হায়! এতদিনে আমার হৃদয়ে পাপ-স্পর্শ হইল!

গিরীশ অমনি "দয়াময় পিতা" বলিয়া প্রার্থনায় বসিলেন। নয়নাশ্রু দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)।

খাদ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

এক্ষণে দেখা যাউক, কোন্ খাদ্য কত পরিমাণে আহার করিলে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, কেবল চাউল ও দাউল, (খিচড়ি) ঘৃত, লবণ ব্যবহার করিলেই উত্তমরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যাইতে পারে। যথা—

১ম তালিকা।

খাদ্য।	পরিমাণ।	যবক্ষারজান।	অঙ্গার।	লবণ।
চাউল	৭ ছটাক	৫০ গ্রেন	২৪৩৪	—
দাউল	৭ ,,	১৯০ গ্রেন	১৩৩৭	—
ঘৃত	১/২ ,,	—	৩১৫	—
লবণ	১/২ ,,	—	—	৪১০
মোট	১৫ ছটাক	২৪০ গ্রেন	৪৪৪৬	৪৩০

কিন্তু প্রতিদিবস ঐরূপ খিচড়ি ভক্ষণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবে না এবং এক প্রকার সামগ্রী প্রতিদিবস আহার করিলে শীঘ্রই অরুচি হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং অন্য কোন প্রকার খাদ্য যোজনা করিতে হইবে।

২য় তালিকা।

খাদ্য।	পরিমাণ।	যবক্ষারজান।	অঙ্গার।	লবণ।
চাউল	১০ ছটাক	৭০ গ্রেন	৩৫২০	—
দাউল	৩ ,,	৮৪ ,,	৭০২	—
মৎস্য	২ ,,	৪২ ,,	—	—
আনাজ	২ ,,	৬ ,,	৫০	—
তৈল	১/২ ,,	-	৩১৫	—
লবণ	১/২ ,,	—	—	৪৩০
মোট	১৮ ছটাক	২০২ গ্রেন	৪৫৮৭	৪৩০

দ্বিতীয় তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, উহাতেও অঙ্গারের ভাগ যবক্ষারজান অপেক্ষা ১৫। ১৬ গুণ অধিক না হইয়া প্রায় ২২ গুণ হইয়াছে। মৎস্যের পরিমাণ আরও কিঞ্চিৎ অধিক করিলে ঐ দোষ দূর হইতে পারে, কিম্বা মৎস্যের পরিবর্ত্তে মাংস ভোজন করিলেও হইবেক। ভাতের ফেণ ব্যবহার করা হয় না, সেই নিমিত্ত অঙ্গারের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়; ভাতের ফেনে প্রতিসেরে প্রায় ৪০০ রতি বা ১ ছটাক পরিমাণ শ্বেতসার পদার্থ থাকে। বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রবেত্তারা জ্ঞাত ছিলেন যে, ভাতের ফেন পরিত্যাগ না করিলে স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধতা জন্মিতে পারে এবং আহারের পরিমাণ আবশ্যক অপেক্ষা অধিক হইয়া উঠে। দাল আহার না করিলে উহার পরিবর্ত্তে চাউলের ও মৎস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

যদি পূর্ব্বাহ্নে অন্ন ও অপরাহ্নে দেশী রুটী আহার করা অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত পরিমাণ স্থির করা আবশ্যক।

৩য় তালিকা।

খাদ্য।	পরিমাণ।	যবক্ষারজান।	অঙ্গার।	লবণ।
চাউল	১০ (৫) ছটাক	৩৫	১৭৬০	২০
দাউল	৫ (২½) ,,	৭২	৫৮৫	৫০
ময়দা	৮ (৪) ,,	৬০	১৩৫২	৫৬
মৎস্য	৪ (২) ,,	৪২	—	—
আনাজ	৪ (২) ,,	৬	৫০	—
ঘৃত	১ (½) ,,	—	৩১৫	—
লবণ	½ (¼) ,,	—	--	২১৬
মোট	৩২½ (১৬¼) ,,	২১৫	৪০১২	৩৪২

ইহাতে যবক্ষারজান ও অঙ্গারের পরিমাণ প্রায় সামঞ্জস্য মতই আছে। ঐরূপ আহার করিলে স্বাস্থ্য অতি উত্তম থাকে, পরিশ্রমে কাতর হইতে হয় না ও মানসিক বৃত্তি সমুদায় সতেজ থাকে।

যাঁহারা নিরামিষ ভুক্ তাঁহাদিগের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পরিমাণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় করা যাইতে পারে না।

৪র্থ তালিকা।

খাদ্য।	পরিমাণ।	যবক্ষারজান।	অঙ্গার।	লবণ।
চাউল	১৮ (৯) ছটাক	৬৩	৩৫৩৪	৪১
দাউল	৫ (২½) ,,	৭০	৫৮৫	৫০
দুগ্ধ	২০ (১০) ,,	৫০	৩১৫	৫০
আনাজ	৮ (৪) ,,	১২	১২০	—
তৈল	১ (½) ,,	—	৩১৫	—
লবণ	১ (½) ,,	—	—	২১৬
মোট	৫৩ (২৬½) ,,	১১৫	৪২৯৯.	৩৬২

কিন্তু ইহাতে যবক্ষার জানের ও অঙ্গারের পরিমাণ যথোচিত নাই, এজন্য দেহ মধ্যস্থ দাহন ও পরিবর্ত্তন ক্রিয়া উত্তমরূপে হইতে পারে না। সুতরাং তৈলাক্ত পদার্থ অধিক পরিমাণে জন্মিবে ও শরীর স্থুল হইয়া পড়িবে। আরও এই তালিকা মত আহার করিতে হইলে মোট ২৬½ ছটাক কাঁচা খাদ্য আহার করিতে হইবে, এবং রন্ধন ক্রিয়া দ্বারা পরিপক্ক হইলে আরও অধিক বৃদ্ধি হইবে।

কেহ কেহ কেবল দুগ্ধ পান করিয়াই জীবিত আছেন। উল্লিখিত পরিমাণে অস্তিম পদার্থ সমুদায় উদরস্থ করিতে হইলে প্রতি দিবস প্রায় ৴৬ সের দুগ্ধ পান করিতে হয়,

কিন্তু ত… …ঙ্গারের ভাগ অপেক্ষাকৃত অ… থাকে, এনিমিত্ত দুগ্ধের সহিত কটী কিম্বা অন্ন মিশ্রিত করা আবশ্যক। যথা—

৫ম তালিকা।

দুগ্ধ	৩২ ছটাক	১৬০	১৯২০	১৫০
চাউল	৩ ,,	৪২	১১১২	২৫
চিনি	১ ,,	—	৩৭৪	৪
মোট	৩৯ ছটাক	২০২	৪২০৬	১৭৯

অথবা

দুগ্ধ	৩২ ছটাক	১৬০	১৯২০	১৫০
ময়দা	৪ ,,	৬০	১৩৫২	৬০
চিনি	১ ,,	—	৩৭৪	৪
ঘৃত	১ ,,	—	৩১৫	—
মোট	৩৭ ছটাক	২২০	৩৯৬১	২১৪

উল্লিখিত কয়েকটী তালিকাই ৫''-৪' দীর্ঘ ও ১।৫ ভারী ব্যক্তির স্বাভাবিক পরিশ্রমের নিমিত্ত উপযুক্ত। যদি অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা হইলে যবক্ষার জানের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি করিতে হইবে। দেহভার অধিক হইলেও সমস্ত পদার্থই যথোচিত রূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে। সচরাচর দ্বিতীয় বা তৃতীয় তালিকা নির্দ্দিষ্ট আহার করিলেই শরীর সুস্থ থাকিবে, কেবল আহারের উপকরণ মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে আর কিছুই আবশ্যক হইবে না।

উল্লিখিত কয়েকটী তালিকায় মাংসের কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কারণ মাংস এদেশীয় লোকের নিকট বিশেষ আদরণীয় নহে। কিন্তু আমি বলি না যে, মাংস অনাবশ্যক, কিম্বা "সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে মাংসের ব্যবহার কমিয়া আসিবে।" উল্লিখিত তালিকা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মাংসের অভাবে এদেশীয় লোককে অযথোচিত পরিমাণে অঙ্গারক দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হয়; মাংস ভোজন করিলে উহা ঘটিতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদিগের দন্ত ও পাকস্থলীর গঠনের বিষয় অভ্যাস করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, পরমেশ্বর মনুষ্যকে "মিশ্রভুক" সৃজন করিয়াছেন। পাকস্থলীর পাচকরসের প্রধান কার্য্য এই যে, যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থকে জীর্ণ করিবে। মৎস্য ও মাংস ভোজন না করিলে যথোচিত যবক্ষারজানময় পদার্থ উদরস্থ করিবার উত্তম উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, "মাংস না খাইয়া কত লোক সবল, সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইতেছেন।" ইহা সত্য যে কোন কোন ব্যক্তি মৎস্য ও মাংস না খাইয়া সুস্থশরীরে স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হয়েন। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প, এদেশীয় বিধবা স্ত্রীলোকেরা মাংস না খাইয়া সাংসারিক সমস্ত কর্ম্ম সুসম্পন্ন

করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, স্ত্রীলোকের যে প্রধান সাংসারিক ক্রিয়া তাহা তাঁহাদের এককালে বন্ধ হইয়া যায়। গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব করণ ও স্তন্যদান দ্বারা যে কি পরিমাণে শারীরিক যন্ত্রসকলের তেজঃ ক্ষয় হয় তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। বিধবা স্ত্রীলোকদিগের যখন সেই তেজঃক্ষয় হয় না, তখন মাংসাদি খাদ্য আহার করা অনাবশ্যক। আরও বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের মানসিক পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং মানসিক পরিশ্রমের নিমিত্তই মাংস বিশেষ আবশ্যক। "যাহারা অনুক্ষণ মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম করেন মাংস তাঁহাদের পক্ষে উপকারী।" দেখিতে হইবে যে, সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত মনুষ্যের মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। ইহা বলা বাহুল্য যে, ক্রমশঃ পরিশ্রমের বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে সভ্যতার আগমনে মাংস ভক্ষণ কিরূপে হ্রাস হইতে পারে? মানসিক পরিশ্রম বিনা কেহ সভ্যতার সোপানে উঠিতে পারিবেন না, সুতরাং মাংস ভক্ষণ ব্যতিরেকেও সভ্যতার সোপান উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। আধুনিক সভ্য জাতিদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রেই মাংস ভোজন প্রচলিত আছে। কোন কোন সম্প্রদায়ে মাংস ভক্ষণ নিষেধ। কিন্তু কোন জাতীয় অল্প সংখ্যক ব্যক্তি মাংস না খাইলেই যে, দেশ শ্রীহীন হইতেই হইবে এরূপ নহে। বিশেষতঃ মানসিক পরিশ্রম বলে সভ্যজাতি উন্নত হইতেছে ও যাঁহারা মানসিক পরিশ্রম করিয়া স্ব স্ব দেশের উন্নতি করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে আমিষ ভক্ষণ করেন। দুগ্ধ, পনির, ডিম্ব ইত্যাদিও আমিষ বলিয়া স্বীকার করা উচিত। বিশেষতঃ জীবহিংসা করিলে যদি পাপ হয়, তবে গাভী, ছাগী, গর্দ্দভী, বা মহিষীর বৎসের খাদ্য যে দুগ্ধ তাহা আমরা কোন্ নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া ব্যবহার করি। মনুষ্য আপন মাতার ব্যতীত অন্য কোন জীবের দুগ্ধ পান করিবে, ইহা ঈশ্বরের অভিমত কিনা তাহা বলা কঠিন। অনেক সময় দুগ্ধ দোহন করিবার নিমিত্ত গাভীকে নানা প্রকারে বন্ধনাদি দ্বারা যন্ত্রণা দেওয়া হয় ও বৎসকে ঈশ্বর দত্ত খাদ্য হইতে বঞ্চিত করা হয়; যদি আমিষ ভক্ষণ করা ও মনুষ্যের শরীর রক্ষার্থে অন্য জীবকে ক্লেশ দেওয়া মহাপাপ, তাহা হইলে দুগ্ধ, ঘৃত, পনির কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার কেহ কেহ মাংস ভোজন করেন না, কিন্তু দুই বা তদধিক ডিম্ব প্রতিদিবস ভক্ষণ করেন। সেই দুইটী ডিম্ব হইতে দুইটী নূতন জীব হইবার নিয়ম স্বত্ত্বেও কিরূপে সেই ডিম্ব ভক্ষণ করা যাইতে পারে? দেখা গিয়াছে যে হংস ইত্যাদি পক্ষী যে স্থলে ডিম্ব পাড়ে, বহুকাল পর্য্যন্ত সেইখানে গিয়া ডিমে তা দিতেছে মনে করিয়া বসিয়া থাকে। তাহার বিশ্বাস যে সেই ডিম উথায় আছে। এস্থলে সেই ডিম্ব তথা হইতে লইয়া মনুষ্যের ব্যবহার কিরূপে ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে। অতএব মনুষ্য এককালে দুগ্ধ, ঘৃত, পনির, ডিম্ব ও মৎস্য পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ শস্য ও আনাজ ভক্ষণ করিয়া কিরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা করেন, তাহা অবগত না হইয়া কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না।

মাংস ভক্ষণ বিষয়ে ডাক্তার পার্কস যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। 'জান্তব ও ঔদ্ভিজ্জ য়্যালবুমিনেটের রাসায়নিক সমাস অত্যন্ত সদৃশ; এবং তাহারা দেহমধ্যে সমান উদ্দেশ্য সাধন করে। আমিষভুক এবং নিরামিষভুক (যাহারা অন্ন ও দাল আহার করে) তাহারা উভয়েই সমপুষ্ট। ভারতবর্ষে যাহারা অন্ন ও অল্প পরিমাণে দাল ব্যবহার করে, তাহারা অল্প বল ধারণ করে বটে, কিন্তু যাহারা উত্তমরূপে শস্য, অন্ন ও দাল আহার করে, তাহারা শিক্ষিত হইলে আমিষভুকদিগের 'নিকট পরাঙ্মুখ হইবেনা'। এ বিষয়ে ডাক্তার স্মিথ্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার পুস্তকের ১৪৪ ও ১৪৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইতেছে. যথা 'নিরামিষ ও আমিষ এতদুভয় প্রকার খাদ্যে সম পুষ্টিকর সামগ্রী আছে, এবং কতক পরিমাণে ঐ দুই প্রকার খাদ্য পরস্পরের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।' 'উহাদের পুষ্টিকারিতার তারতম্য লোকের অভ্যাসের উপর নির্ভর করাও সম্ভব।' 'কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, মাংসে পুষ্টিকর সামগ্রী সমুদয় যেরূপ সুবিধা ও সুপাচ্যরূপে থাকে, নিরামিষ খাদ্য অর্থাৎ বীজ সমূহেতে এমত অনেক দ্রব্য থাকে যাহাকে বিশেষ প্রকার জীর্ণ করিয়া পরিবর্তন করিলে তবে দেহের পুষ্টি বা জীর্ণ সংস্কার হইবে।' 'পরিপাকের নিমিত্ত মাংস রন্ধন করা আবশ্যক নাই, কিন্তু নিরামিষ খাদ্য রন্ধন করা অতিশয় আবশ্যক, নচেৎ পাকস্থলী উহাকে জীর্ণ করিতে পারিবে ন,' 'উহার উত্তম প্রমাণ এই যে, সমপুষ্টিকর নিরামিষ ও আমিষ খাদ্য ভোজন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিরামিষ ভোজনের পর অপেক্ষাকৃত অধিক মলত্যাগ করিতে হয়।' 'নিরামিষ অপেক্ষা আমিষ খাদ্য শীঘ্র ও সহজে পরিপাক হইয়া থাকে, আরও আমিষ ভক্ষণ করিলে যে পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক করিবে, নিরামিষ ভক্ষণ করিলে তদপেক্ষা অধিক খাদ্য ভক্ষণ করিতে হইবে।' এই বিষয় ডাক্তার কার্পেণ্টারের মত এই যে, আমিষ খাদ্য ব্যবহার করিলে শোণিতের লোহিত অংশ বৃদ্ধি পায়, ও মানসিক বৃত্তি সমুদায় সম্যক্‌রূপে উন্নত হয়। ডাক্তার টাইসিন্‌ও মিশ্র খাদ্যের সপক্ষতা করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুরাও মাংস ভক্ষণ করিতেন, কেবল বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম চলিত হইবার পর হইতে মৎস্য মাংস ভোজনের অনাদর হইয়াছে। এইরূপ যদি আরও কিছুকাল চলে, তাহা হইলে বঙ্গীয় হিন্দুগণ এত হীনবল হইয়া পড়িবেন, যে আর পুণরুদ্ধারের উপায় থাকিবে না। অতএব এদেশে মাংস ভক্ষণ যত শীঘ্র আদরণীয় হয় ততই আমাদের মঙ্গল। কেবল মাংস ভোজন করিয়া মনুষ্য অধিককাল জীবন ধারণ করিতে পারে না, অথচ মাংস ভক্ষণ না করিয়াও জীবন ধারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু নিরূপিত রূপ যবক্ষারজানময় ও শ্বেতসারময় পদার্থ ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই মাংসের অধিক প্রয়োজন, উহার অভাবে এদেশীয় খাদ্যে শ্বেতসারময় সামগ্রীর পরিমাণ অপরিমিত রূপ অধিক হইয়া পড়ে।

ক্রমশঃ।

আমার হৃদয়।

—০০—

প্রকৃতি লো!

খুলে দাও হৃদয়ের পাষাণ অর্গল

ভাসিয়া বেড়াই;

হাসিছে অনন্তধরা

—ফুলময়ী বসুন্ধরা

বাসন্তী আকাশ হতে পূর্ণ শশধর

ঢালিছে অনন্ত স্রোত—চাঁদের কিরণ

সাগর উর্ম্মি মরু হরিত প্রান্তর

প্লাবিত করিয়া যেতেছে গড়ায়ে।

২

মধুর বসন্তকালে—প্রকৃতি-যৌবন

বহিছে বসন্তানিল, ফুটিছে মুকুল,

হাসিছে সরোজ।

আমোদে প্রমত্ত বুকে

প্রাণ খুলে মন সুখে

ঢালিছে বসন্ত-সখা প্লাবিয়া আকাশ

মধুর পঞ্চম তান

সুললিত প্রেম গান

তা'সনে বাজিছে বীণা বনদেবী করে

প্রেমের বাঁশরি যেন গোকুল বিপিনে।

৩

চাঁদের কিরণে—সেই অজস্র ধারায়

ধৌত ধরাতলে,

প্রবীন জীবনে নব যৌবন সঞ্চার

সুখের সময়।

দুলিছে গাছের পাতা কানন বল্লরী

মন্দাকিনী স্রোতে যেন সরলা রূপসী।

লজ্জাবতী লতাচয়

প্রেমামোদে কথাকয়

মধুর সুস্বরে যেন গায়লো যুবতী

কাঁপাইয়া কলকণ্ঠ সুখের যৌবনে।

৪

আমি কিলো! চিরদিন চাপায়ে পাষাণ

বুকেতে আমার

আঁধার অদৃষ্ট লয়ে

আঁধার সঙ্গিনী হয়ে

আঁধারের কোলে শুয়ে থাকিবলো!

আঁধারে?

ধরেছি হৃদয়ে হায় হৃদি দাবানল

মোহের ছলনা।

সুখের যৌবন কাল

অমূল্য রতন

ফুরাইলাম কেন তবে আশার নেশায়?

বহে স্রোত চিরদিন

কালে জন্ম কালে লীন

সুখ দুঃখ জীবনের পরীক্ষার স্থল।

৬

সুখের যৌবন—অমূল্য রতন—

কে চাহে দহিতে শোকের দহনে?

মানব হৃদয়ে প্রণয়ের ছায়া

উঃ দারুণ যন্ত্রণা!

কোথা প্রেম—ভালবাসা?

কোথা স্বর্গ—পবিত্র প্রণয়?

জীবের হৃদয়ে অলীক স্বপন।

মানস সরসে ফুটে সোণার নলিনী—

বৃথা প্রেমের আশায়!

ভাবে সদা—সে,

অতি স্নিগ্ধ জ্যোতি মাখা

পূর্ণ সে শরত রাকা

কিরণে কিরণে হবে প্লাবিত হৃদয়।
উদিল, ফুটিল—হায় শুকাল অকালে
এখন— শিরীষ কুসুম
নাইরে সে আকাশ, নাইরে সে চাঁদ
বিশাল হৃদয় শ্মশান আলয়
প্রেমের প্রতিমা—সোণার নলিনী
গিয়াছে শুকায়ে।
আঁধার হৃদ... করে প্রাণ
ধু ধু করে ... শ্মশান
উঠিছে ... অগ্নি কণা
স্মৃতিলো!
থাক্ হৃদে ঢাকা লতার পাতার
ভাঙ্গাচোরা এই হৃদয়ে মোর
থাক্ থাক্ এ হৃদয়ে সোনার নলিনী
বুকের শোণিত—সুখের ফুল
কাজনাই ভুলনাক স্মৃতিলো আমার,
মুদিয়ে দুইটি আঁখি
চিরদিন মুগ্ধ থাকি
শান্তির সুবর্ণ রাজ্যে—অনন্ত জীবনে।

না—না—স্মৃতিলো! একবার একবার আর
খোল চারুসতি, দেখাও আমায়
হৃদয়ের সেই নন্দন কানন।

* * * *
* * * *
* * * মরি কি সুন্দর
থাক্ থাক্ এ হৃদয়ে সে রূপের স্মৃতি
তা'তেও হৃদয়ে পাব কত সুখ।
ভাঙ্গি।। গিয়াছে আধেক পরাণ,
আধেক রয়েছে, স্মৃতিটুকু লয়ে
তাইরে আজিও ভাসিতেছি সুখে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে—আশার নেশায়।
মানব জীবন তুষারের প্রায়
রজনীর আশা—দিনেতে পালায়
যাক্ রে যাক্—
সব যাক্ মোর কালের উদরে
তার স্মৃতি শুধু পারিনা দিতে।

শ্রীস্ব।

বৈদিকপ্রবন্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

৫—কাবা।

(যম, যমের কুকুর ও যমের কুকুরের মা)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে, যম শব্দে 'নিয়ম' এবং যমের কুকুর বলিতে সেই ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন অদৃষ্ট, যাহাকে পাপ ও পুণ্য কহে, ইহাই হৃদ্গত করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। অতঃপর উক্ত কুকুরের মাতার পরিচয় বেদে যেরূপ বর্ণিত দেখা যায়, সেই কাব্যই বর্ণনীয়।

কুকুর পরিচয় প্রকরণে প্রদর্শিত ১ম মন্ত্রেই উক্ত কুকুরদ্বয় "সারমেয়" নামে ব্যবহৃত দেখা যায় এবং অদ্যাপি কুকুর জাতি সারমেয় বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এই সারমেয় শব্দের প্রকৃত-প্রত্যয়ানুগত অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে 'সারমার পুত্র' বুঝা যায়।

এতদনুসারে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে

ঋগ্বেদ সংহিতার কতিপয় স্থলে 'সরমা' পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী মন্ত্র এই ;—

ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসাঞ্চেষ্টৌ
বিদৎসরমা তনয়ায় ধাসিম্।
বৃহস্পতি ভিনদদ্রিং বিদদ্ গাঃ
সমুস্রিয়াভি র্বাবশন্ত নরঃ॥

(ঋ০সং০ ১, ৫, ১. ৩)

অর্থ ;—ইন্দ্রের অভিপ্রায়ানুসারে এবং অঙ্গিরোগণের লাভের জন্য, সরমা, স্বীয় সন্তানের নিমিত্ত অন্ন লাভ করেন। তদনুসারে বৃহস্পতি (ইন্দ্র) অদ্রি ভেদ করিয়া গোধন সমস্ত লাভ করেন ; ঐ গোধন সমস্তের লাভে উক্ত অঙ্গিরোগণ পুনঃ পুনঃ অতিশয় হর্ষধ্বনি করেন॥

এ সরমা যে কুক্কুরী, তাহাও নিরুক্তকার ভগবান্ যাস্ক ঋষি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—

'সরমা—দেবশুনীন্দ্রেণ প্রহিতা (১১,২৫)'

অর্থাৎ দেবশুনী সরমা ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল বা হইয়া থাকে। এতদনুসারেই বেদচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যাকার ভগবান্ সায়নাচার্য্যও প্রদর্শিত মন্ত্রেরই ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন ; 'সরমা নাম দেবশুনী' অর্থাৎ সরমা পদটী দেবকুক্কুরীর আখ্যা।

এতাবতা সরমা নামে দেবগণের একটী কুক্কুরী ছিল বা আছে, তাহাও এক প্রকার নির্ণীত হইল। এক্ষণে বিবেচনীয় এই সরমাই ঐ সারমেয় দ্বয়ের প্রসূতি কি না?

প্রদর্শিত ঋগ্বেদীয় মন্ত্রটীতে এই মাত্র বুঝা যাইতেছে,যে, 'ঐ সরমা, ইন্দ্রের অভিপ্রায়ানুসারে স্বীয় সন্তানের নিমিত্ত অন্ন লাভ করে' পরং এ বিষয়ের আন্দোলন করিতে হইলে আরও বিশদরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক সুতরাং এখনও গবেষণার এষণা নিবৃত্ত হইল না।

পরে দেখা যায় সামবেদীয় শাট্যায়ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও এতদনুরূপ একটী সুন্দর আখ্যায়িকা রহিয়াছে। যথা—'অঙ্গিরো নামক ঋষিগণের গোধন অপহৃত হয়। পণি নামক অসুরদলপতি উহা অপহৃত করিয়া স্বীয় বলপুর নামক গিরিদুর্গে গোপন করে। উক্ত পণির প্রধান সেনাপতির নাম 'বল' এবং ঐ সেনাপতির নামানুসারেই বলপুর নির্ম্মিত হইয়াছিল। অঙ্গিরা ঋষিগণ মহারাজ ইন্দ্রের নিকটে এই দস্যুতার বিবরণ আদ্যন্ত অবগত করিলে ইন্দ্র, সেই গোধন সমস্তের অন্বেষণার্থ একজন উপচর মনে মনে চিন্তা করিয়া শেষে দেবশুনী সরমাকেই তাদৃশ দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তখন অবসর বুঝিয়া সরমা প্রার্থনা করিল 'রাজন্! এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপে আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আপনি আমা[illegible]কে চিরদিন অন্নদান দ্বারা প্র[illegible] করিবেন।' ইন্দ্র অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। তখন সরমা দূতী মর্ত্ত্যবর্ত্তিনী এক মহতী নদী সন্তরণ করিয়া সেই বলপুরে সমুপস্থিত হইলেন। বলপুরবাসী পণিসৈন্যগণ, তাদৃশ দুরূহতে সামান্যরূপ পরিচিত সেই কুক্কুরীর সমাগম দর্শনে বিস্মিত হইয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলেন ;—

কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্.
দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।

কাম্যেহাতঃ কা পারতস্ম্যাসীৎ

কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি ॥

অর্থ ;—সরমা! কি ইচ্ছা করিয়া এস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছ? এতাদৃশ পথে আসিলে প্রতিগমন করাও সুকঠিন, তাহা কি জান না? আমাদের নিকটে তোমার কি প্রয়োজন এবং কেনইবা আমাদের গুপ্তস্থান সকলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? পথি মধ্যে অবশ্যই মহতী নদী পাইয়াছ, তাহাই বা কিরূপে সন্তরণ করিলে?

সরমা উত্তর করিল ;—

ইন্দ্রস্য দূতী রিষিতা চরামি

মহ ইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্ বঃ।

অতিস্কদো ভিয়সা তন্ন আবং

তথা রসায়া অতরং পয়াংসি ॥

অর্থ ;—আমি ইন্দ্রের দূতী। তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই তোমাদের গুপ্ত স্থান সমস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। পণিদল! তোমাদের দুর্গেই আমাদের নিধিগুলি আছে; তৎসমস্তের পুনর্লাভই আমার এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য। আমার আক্রমণ ভয়েই সে নদীর জলসমস্ত শুষ্ক হইয়া যায় সুতরাং নিরুদ্বেগে তাহা পার হইতে সমর্থ হই।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় রাজকুল-দর্পণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়—মাড়োয়ার বিবরণ।

মরুস্থলী, মরুস্থান, মরুদেশ প্রভৃতির অপভ্রংশে মাড়োয়ার নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষের আর্য্য-শব্দ-সুধা-সমন্বিত নাম গুলি মুসলমান লেখকগণই বিকৃত করিয়াছেন। রাজপুতানার মধ্যে যে কয়টী রাজ্য সন্নিবেশিত আছে, মাড়োয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন। এককালে ইহা শতদ্রু নদীর তীর হইতে সাগরোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে আরাবলী পর্ব্বতশ্রেণী বিস্তৃত থাকিয়া ইহাকে মিবার হইতে পৃথক্ করিয়াছে। উত্তর ও পশ্চিম দিকে এক বিস্তৃত মরুভূমির অবস্থিতি নিবন্ধন বিকানীর ও জসলমের হইতে ইহা পৃথগ্‌ভূত হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় নয় সহস্র বর্গক্রোশ ও লোক সংখ্যা প্রায় বিংশতি লক্ষ হইবে।

মাড়োয়ারপতি রাঠোর বংশসম্ভূত। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে সাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ বিধ্বংসিত হইলে তত্রত্য রাজবংশীয়েরা এই মরু প্রদেশে আগমন পূর্ব্বক উপনিবেশিত হইয়াছিলেন। কি কারণে কান্যকুব্জপতিগণ রাঠোর উপাধি প্রাপ্ত হন, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারা যায় না। কেহ কেহ কহেন, তাঁহারা রথে-

শ্বর নামক দেববিশেষের আরাধনা করত বর প্রাপ্ত হইয়া রথবর নামে অভিহিত হন, সেই রথবর শব্দের অপভ্রংশে রাঠোর শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার মতান্তরে অবগত হওয়া যায় যে, রাজপুতানার ভাষা বিশেষে রাঠ শব্দে মেরুদণ্ড বুঝায়; ইন্দ্রের মেরুদণ্ড হইতে ইহাঁদের উৎপত্তি বলিয়া ইঁহারা রাঠোর নামে পরিচিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, ইঁহারা যে সুবিখ্যাত সূর্য্য-বংশীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

কান্যকুব্জের শেষ রাজা জয়চন্দ্র যবন-করে নিধন প্রাপ্ত হওয়ার অষ্টাদশ বর্ষ পরে তদীয় পৌত্রযুগল শিবজী ও শৈতে-রাম দুই শত সংখ্যক অস্ত্রধারী রাঠোর সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রার ভাণ করিয়া দ্বার-কাভিমুখে গমন করেন। কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপনই তাঁহাদের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এখন যে স্থানে বিকানীর নগর সংস্থাপিত আছে, তাহার দশক্রোশ পশ্চিমে কলুমদ নামক জনস্থানে এক শোলাঙ্কী সামন্ত অবস্থিতি করিতেন; শিবজী প্রথমে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফুলরার ঝারেজা সামন্ত দুর্ব্বৃত্ত দস্যু লাখা ফুলানা শোলাঙ্কী সামন্তের পরম শত্রু ছিল। শোলাঙ্কী শিবজীর সহায়তায় সেই ভয়ঙ্কর দস্যুর উপর জয়লাভ করিলেন; কিন্তু এই যুদ্ধে শিবজী নিজ ভ্রাতা শৈতরামকে হারাইয়াছিলেন। যাহা হউক, দস্যুদমনে কৃতকার্য্য হইয়া যারপর নাই আনন্দ সহকারে শোলাঙ্কী সামন্ত শিবজীর সহিত আপনার ভগিনীর বিবাহ দিলেন। শিবজী অহুলবরপত্তনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু লাখা ফুলানার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি ভ্রাতৃবধামর্ষ নিবন্ধন প্রতি-হিংসাপরবশ হইয়া লাখার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শিবজীর হস্তে লাখা নিধন প্রাপ্ত হইল। ইহাতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও বলবীর্য্যের পরিচয় চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। শিবজী কৃতার্থতা লাভে গর্ব্বিত হইয়া তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন এবং লুনী নদীতীরে মেহুর দাবিদিগকে উৎসন্ন করিয়া জনস্থান সন্নি-বেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে খারধরের গোহিল সামন্ত মহেশদাস তদীয় হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে রাঠোরেরা তথায় বসতি বিস্তার করিল। পাল্লী নামক জনস্থান নিবাসী ব্রাহ্মণগণ মেয়ার ও মিনাদিগের দৌরাত্ম্যে নিপীড়িত হইয়া সাহায্য প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে শিবজীকে সাদরে আহ্বান করে। শিবজী আসিয়া তাহাদের বিপ-দুদ্ধার করিলে তাহারা কৃতজ্ঞতা স্বরূপে তাঁহার বাসের উপযোগী বহুবিস্তৃত ভূমি দান করিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তিনি সেই জনস্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন। দোলপর্ব্বোপলক্ষে যখন সকলেই আনন্দে মত্ত হইয়া আছে, সেই সময়ে শিবজী তাহাদের প্রধান নায়কের প্রাণ বধ করেন। ইহাতে তাঁহার অধিকার আরও বিস্তৃত হইল। এই ব্যাপারের এক বৎসর পরেই শিবজীর মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পুত্র, অশ্বত্থামা, সোনিং এবং অজমল। অশ্বত্থামা পিতৃপদ লাভ করিলেন।

অশ্বত্থামা পিতার প্রদর্শিত পথে পদ চারণা করত বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা ইদর প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক সোনিংকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। অজমল সৌরাষ্ট্র প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। অশ্ব-

খামার মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ডুহর পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি কান্যকুব্জের উদ্ধারসাধনে যত্ন করিয়া অকৃতকার্য্য হন; পরিশেষে পরিহারদিগের নিকট হইতে মণ্ডোর প্রদেশ হস্তগত করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায়পাল পিতৃপদে অধিরোহণ করিয়াই মণ্ডোরপতি পরিহারের প্রাণবধ করত তদীয় অধিকার সমূহ হস্তগত করিলেন। রায়পালের পর তদীয় পুত্র কহ্নল, তৎপর তাঁহার পুত্র জল্হন, তাঁহার উত্তরাধিকারী চেহু, তৎপরে খিহু ক্রমান্বয়ে অধিকার বিস্তারে ব্যাপৃত হন। রাও খিহু কর্ত্তৃক রাজ্য সমধিক বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎপর শিলুকো অধ্যক্ষপদে আরূঢ় হন, তাঁহার পুত্র বীরমদেব জোহিয়াদিগকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে হত হন। বীরমের পুত্র চণ্ড এক জন ইতিহাস প্রথিত বীর ছিলেন। তিনি পরিহাররাজের প্রাণবধ করিয়া মরুস্থলীর প্রাচীন রাজধানী মণ্ডোরনগর প্রাচীরে কান্যকুব্জের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। তিনি নাগোর ও গডবর প্রদেশ স্বাধিকারে আনিয়াছিলেন। ১৪০২ খৃষ্টাব্দে তিনি নাগোরে হত হইলে তদীয় পুত্র রাও রণমল্ল সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি মিবারের বৃদ্ধ রাণা লাখার সহিত নিজ দুহিতার বিবাহ বিধান করিয়া রাণার নিকট যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাণা তাঁহাকে ৪০ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই সময়ে তিনি মিবারের প্রধান সামন্ত রূপে পরিচিত হন। বৃদ্ধ রাণার মৃত্যু হইলে রণমল্লের ভাগিনেয় মুকল সিংহাসনে আরোহন করিলে তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। এমন কি, মিবারের সিংহাসন আপনার আয়ত্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। লাখার জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ড আসিয়া তাঁহার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া দেন। রণমল্ল হত হন, ও তদীয় পুত্র যোধা প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। মিবার বিবরণে ইহার বিশদ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যোধা কর্ত্তৃক যোধপুর নগর সংস্থাপিত হয়, এখন সমস্ত মাড়োয়ার যোধপুর রাজ্য নামে পরিচিত হইতেছে। ১৪৮৯ খৃঃঅব্দে যোধার মৃত্যু হইলে ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ ব্যাপিয়া তদীয় পুত্র সূর্য্যমল্ল, পৌত্র প্রথম গঙ্গা ও প্রপৌত্র দ্বিতীয় গঙ্গা রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় গঙ্গার রাজত্ব সময়ে ভারতে মুসলমান আক্রমণের ঘোরতর আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। মিবার রাণা সুবিখ্যাত সংগ্রামসিংহ বাবরের বিপুল বাহিনীর বিপক্ষে যে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় গঙ্গারাও তাহাতে একজন প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। ১৫৩২ খৃঃঅব্দে দ্বিতীয় গঙ্গার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র মালদেব রাও সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। মালদেব সাহসসম্পন্ন জ্ঞানবান রাজা ছিলেন। মাড়োয়ার প্রদেশের অধিকাংশই মরুস্থল, মোগলদিগের প্রলোভন সামগ্রী তাহাতে অতি অল্পই প্রতীয়মান হইত। সে যাহা হউক, বাবর সে দিকে বড় দৃষ্টিপাত করেন নাই; সেই কারণেই মালদেব ক্রমে ক্রমে রাজস্থান মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া পড়িলেন, মিবারের সংগ্রামসিংহের মৃত্যু হওয়ায় রাজস্থানে মালদেব ভিন্ন বলবীর্য্য সম্পন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। নাগোর ও অজমীর তিনি পুনরধিকার করিয়া স্বীয় রাজ্যে যোজিত করিলেন।

১৫৯৬ খৃঃঅব্দে তিনি ঝালোর, সিবানো এবং ভদ্রার্জুন গ্রহণ করেন; দুই বৎসর পরে বিকানীরের বিকাবংশীয়দিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের অধিকারচ্যুত প্রায় সমস্ত ভূভাগই তিনি পুনরায় হস্তগত করেন। ফলতঃ তাঁহার সময়ে মাড়োয়ার সমধিক গৌরবান্বিত হয়। তিনি অনেকগুলি দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া পরিশেষে যোধপুর নগর বিলক্ষণরূপে দুর্গবদ্ধ করেন। তিনি দশবৎসর কাল অবিশ্রান্ত গতি হইয়া আপনার রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া শেষে তাহা রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। বাবর সাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন সিংহাসন লাভ করিলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা শের সাহ তাঁহাকে সাম্রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন। হুমায়ুন মালদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি নিতান্ত অমুদার ভাবে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতেই হুমায়ুনের অমর কণ্টকে পলায়ন করিতে হয়। মালদেব তাঁহার সহায়তা করিলে শের সাহ কখনও সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারিত না। তিনি এবম্ভূত ব্যবহারে কিছুমাত্র লাভবান হন নাই। অশীতি সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে শের সাহ মাড়োয়ার আক্রমণ করিলে মালদেব পঞ্চাশৎ সহস্র সেনা লইয়া বিলক্ষণ বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শেরকে ভয়চকিত করিয়াছিলেন। চতুর শের সাহ বলবীর্য্যে মালদেবকে বশীভূত করণে অসমর্থ হইয়া চাতুরী প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে বলহীন করিলেন। তখন তিনি শেরের বশীভূত হইলেন। হুমায়ুনের প্রতি মালদেবের অসদ্ব্যবহার আকবরের কর্ণগোচর হইলে তিনি ১৫৬১ অব্দে মালদেবের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া মালাকোট ও নাগোর অধিকার করত বিকানীরের রায় সিংহকে তাহা সমর্পণ করেন। আট বৎসর পরে আকবর আবার মাড়োয়ার আক্রমণ করিলেন; মালদেব নিরুপায় ভাবিয়া সন্ধি প্রার্থনায় আপনার দ্বিতীয় পুত্রকে সম্রাট সমীপে প্রেরণ করেন, কিন্তু আকবর তাহা গ্রাহ্য না করিয়া রায়সিংহকে যোধপুরের সনন্দ প্রদান করিলেন। কিন্তু রায়সিংহ তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমরসংঘটিত হইল মাত্র। ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে মালদেব মানব লীলা সম্বরণ করেন। মালদেবের পুত্র উদয়সিংহ সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক আকবর-করে ভগ্নিদান করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা করেন। তদবধি তিনি মোগল সম্রাটের প্রধান সামন্তরূপে পরিগণিত হইয়া রাজোপাধি প্রাপ্ত হন মীর ভিন্ন তাঁহার সমস্ত হৃত অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হন। সম্রাট তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মালবের কতিপয় সম্পন্ন প্রদেশ তাঁহাকে দান করেন, উদয় ১৫৯৫খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটী অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহার অবতারণা করা যাইতেছে।

একদা তিনি দিল্লি হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করতঃ এক সর্ব্বললাম ভূতা কুমারী ব্রাহ্মণকন্যাকে দর্শন করিয়া সপ্তবিংশতি সংখ্যক মহিষীসত্বেও তাহার প্রতি লোলুপ হইলেন। ব্রাহ্মণ-কন্যার প্রতি সোৎসুক নয়নপাতেও পাতক জন্মে তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন। স্বয়ং ব্যবস্থাবিধায়ক বিচারকর্ত্তা, তাঁহার কৃত কর্ম্মের উপর হস্তার্পণ করা কাহারও সাধ্য নহে, এরূপ বিবেচনা করিয়া সেই কন্যারত্ন লাভের জন্য

নিতান্ত ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। কন্যার পিতা একজন অম্বপন্থী ব্রাহ্মণ, বাই ভিলারায় অন্নমাতার মন্দিরে নিত্য আরাধনা করিয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মদ্যমাংস ব্যবহার করে। রাজার ভয়ে বা ধনরত্নের লোভে কন্যা রাজপ্রস্তাবে সম্মতা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ দেখিল, মৃত্যু ভিন্ন কন্যাকে উপস্থিত কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ একটী হোমকুণ্ড খনন করত কন্যাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক হোম আরম্ভ করিল। বিবিধ মন্ত্র অভিচার প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিল 'তিন প্রহর, তিন দিবস এবং তিন বৎসরের মধ্যে আমার প্রতিহিংসা হুতাশনে দুর্ব্বৃত্ত উদয়সিংহ দগ্ধ হইবে।" এই কথা বলিয়াই স্বয়ং সেই হোমকুণ্ডের প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে লম্ফ প্রদান করিয়া ভস্মাবশেষে পরিণত হইল। এই ভয়ানক ব্যাপার শ্রবণ করিয়া উদয়সিংহ অত্যন্ত ভীত হইলেন, সর্ব্বদা যেন সেই ব্রাহ্মণের ছায়া তাঁহার সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল। পরে ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশিত সময়ে তিনি বিগত জীব হইলেন। ক্রমশঃ

গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচনা ও প্রাপ্তি স্বীকার।

গ্রন্থাবলী। (গদ্য ও পদ্য) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। কালিকাতা ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রিট বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় প্রণীত ২৩ খানি গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। সমগ্র গ্রন্থাবলীর কলেবর প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা হইবে। এই বৃহৎ গ্রন্থের নিয়মিত গ্রাহকগণ ২৲ মূল্য দিলেই গ্রন্থাবলী প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং ইহা যে আশাতিরিক্ত সুলভ হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। গ্রন্থাবলীর মুদ্রাকার্য্য ও কাগজ পারিপাটী হইতেছে।

প্রথম সংখ্যক গ্রন্থাবলীতে রায় মহাশয়ের অবসর সরোজিনী নামক কবিতা গ্রন্থের বহুলাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। অবসর সরোজিনী নূতন গ্রন্থ নহে। সাহিত্যামোদী পাঠকগণ তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই অবগত আছেন। সুতরাং এস্থলে নূতন করিয়া তাহার গুণাগুণ বিচার করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের অক্লান্ত লেখনী নিয়ত গ্রন্থ প্রসব করিতেছে। গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ্যমান ২৩ খানি গ্রন্থ ব্যতীত, তিনি "বীণা" নামক সাময়িক পত্র, ও 'ভারত-কোষ' নামক অভিধান সম্পাদনে এবং বাল্মীকীর রামায়ণের অনুবাদে ব্যাপৃত। অধিক লিখিতে গেলে সকল গুলিই ভাল হইবার কথা নহে। রাজকৃষ্ণ বাবুরও তাহা হয় নাই। তথাপি এই উষ্ণ-প্রধান দেশে যিনি মস্তিষ্কের নিরন্তর এতাদৃশ চালনা করিতে সক্ষম তিনি অবশ্যই সাধুবাদের যোগ্য। আমরা ভরসা করি বঙ্গীয় পাঠকগণ রাজকৃষ্ণ বাবুকে উৎসাহ দিতে ক্ষান্ত হইবেন না।

ভারতীয় রাজকুল-দর্পণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়—মাড়োয়ার বিবরণ।

শূরসিংহ রাজা হইলেন; পূর্ব্ব হইতেই তিনি সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু সময়ে তিনি লাহোরে সম্রাট সেনার নায়কত্ব করিয়া "সেওয়াই রাজা" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি আকবরের অনুজ্ঞা অনুসারে সিরোহীরাজ রাও সুর্তানকে বশতাপন্ন করেন। সুর্তান আপনার রাজ্য নিতান্ত দুর্ভেদ্য মনে করিয়া সম্রাটকে লক্ষ্য করিতেন না। তিনি মদগর্ব্বে এতই মত্ত হইয়াছিলেন যে, প্রখর করদান নিবন্ধন তিনি দিবাকরের প্রতি শরচালনা করিয়াছিলেন। অতঃপর শূরসিংহ গুজরাটের রাজপ্রতিনিধি হইয়া মজঃফরের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি সম্রাটের নিকট হইতে একখানি তরবারী, খেলাত ও কতিপয় নূতন প্রদেশ জায়গীর পাইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি দক্ষিণাপথে যাত্রা করেন, তথায় তিনি তিনটী যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নহবৎ প্রেরণ করেন।

আকবরের মৃত্যুর পর শূরসিংহ ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গজসিংহ উভয়েই জাহাঙ্গীরের নিকট প্রতিপত্তির সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গজসিংহ গুজরাটের পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য যাত্রা করিয়া বহু ধনরত্ন সম্রাট সমীপে প্রেরণ করেন। ইহার পর শূরসিংহ স্বীয় রাজধানী যোধপুরে এবং গজসিংহ সম্রাট সভায় অবস্থিতি করেন। এই সময়েই মিবার সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে। এই ব্যাপারে গজসিংহ যে বিশেষ কোন কার্য্য করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না, কারণ জাহাঙ্গীর আপনার দৈনিক লিপি মধ্যে একবারও গজের নামোল্লেখ করেন নাই। ১৬২০ খৃঃ অব্দে শূরসিংহের মৃত্যু হয়। তিনি মাড়োয়ারের অনেক উন্নতি করিয়া যান; রাজধানী যোধপুর নগর তাঁহা দ্বারা নানাবিধ শোভায় শোভিত হয়; অনেকগুলি কীর্ত্তি অদ্যাপি তাঁহার সৎকার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহারই খনিত শূরসাগর অদ্যাপি মরুপ্রদেশে অপর্য্যাপ্ত জলদান করিতেছে।

গজসিংহ বুরহানপুরের শিবিরে রাজটীকা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি সম্রাটের পক্ষ হইয়া অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিরকিগড়, গোলকুণ্ডা, ফেলেনা, পের্ণালা, গুজনগড়, অশের, এবং সাতারা সমরে গজসিংহ এবং তাঁহার রাঠোর সহচরেরা যথেষ্ট গৌরব লাভ করেন। এই ব্যাপার পরম্পরায় কৃতকার্য্য হইয়া গজসিংহ "দলথাম্না*" উপাধি পাইয়াছিলেন। যে সকল রাজপুতরাজ মোগল সম্রাটের সামন্ত প্রধান রূপে রাজসমীপে উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদের হস্তে সাম্রাজ্যের অনেক ক্ষমতা বিন্যস্ত হইত। মাড়োয়ার রাজদুহিতার গর্ভে

* Dulthumna—barrier of the host.

জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান পরবেজ ও অম্বররাজদুহিতার গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান খুরম জন্মগ্রহণ করেন। উভয় মহিষী আপন আপন পুত্রকে সম্রাট-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিতে অভিলাষিণী হন। পুত্রেরাও আপন আপন দল পুষ্ঠ করিতে যত্নবান হইলেন। পরবেজ অপেক্ষা খুরম সর্ব্বাংশে গুণবান ছিলেন। মিবারের ভীমসিংহ ও মহাবেত খাঁ খুরমের পক্ষাবলম্বন করিলেন। যখন খুরম দক্ষিণাপথে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মনে রাজ্যস্পৃহা বলবতী হয়। তিনি বিদ্রোহী হইবার মনস্থ করিয়া গজের নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিলে গজ সে প্রস্তাবের বিরোধী হন। গজসিংহ-রূপ কণ্টক দূর করিবার জন্য খুরম কৌশলে গজের বিশ্বস্ত অনুচর গোবিন্দদাসকে নিহত করিলে গজ বিরক্তচিত্তে যোধপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; পরবেজ নিহত হইলেন; জাহাঙ্গীর রাজপুতদিগকে আপন পক্ষ সমর্থনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। মাড়োয়ার, অম্বর, কোটা এবং বুঁদীর অধীশ্বরেরা রাজপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলে, খুরম পলায়ন করিলেন। জাহাঙ্গীর অম্বরেশ্বরকে এই যুদ্ধে অধিনায়ক করায় গজসিংহ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন। সম্রাটের আদেশানুসারে গজসিংহ ১৬৩৮ অব্দে গুজরাট যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে ঘাতুক হস্তে প্রাণবিযুক্ত হন। কেহ কেহ অনুমান করেন, সম্রাটের পরামর্শানুসারেই এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। মৃত্যুকালে অমর ও যশোবন্ত নামে তাঁহার দুই পুত্র জীবিত থাকে। জ্যেষ্ঠ অমরসিংহ ইহার চারিবৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাসিত হইয়া দিল্লির দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের লোক ছিলেন। একদা তিনি বহুক্ষণ অনুপস্থিত থাকায় সম্রাট তাঁহার অর্থদণ্ড করেন, তাহাতে তিনি এই উত্তর দেন যে, তিনি মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। অর্থদণ্ডের উল্লেখ করত আপনার তরবারী দেখাইয়া কহেন, ইহা ভিন্ন তাঁহার অপর কোন অর্থ নাই। ইহাতে সম্রাট অধিকতর বিরক্ত হইয়া অর্থদণ্ড আদায়ের জন্য সলাবৎ খাঁর প্রতি আদেশ করিলেন। অমর তৎক্ষণাৎ সলাবতের প্রাণবধ করিয়া সম্রাটকে এরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ পলায়ন না করিলে অমরের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতেন। তখন অমর ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া যাহাকে সম্মুখে পান তাহাকেই বধ করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে জনৈক সামন্ত হস্তে অমর বিগতপ্রাণ হইলেন।

যশোবন্ত সিংহ মাড়োয়ারের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি দুর্জ্জয় সাহসসম্পন্ন বীরপুরুষ ছিলেন। আরঙ্গজীব যখন বিদ্রোহী হন, তখন যশোবন্ত দারার পক্ষাবলম্বন করেন। আরঙ্গজীব সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম পুরঃসর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া দেখিলেন, যশোবন্তের ন্যায় শত্রু বিদ্যমানে কখনই তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিবেন না। তখন তিনি তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য তাঁহাকেই প্রেরণ করেন। মুখে যেমন হউক, যশোবন্তকে আরঙ্গজীব অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। সম্রাটের প্রতিও যশোবন্তের কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। এমন কি, ইনি এক সময়ে সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত করি-

বার উপক্রম করিয়াছিলেন। সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মোয়াজিমকে সম্রাট করিবার যে একটী ষড়যন্ত্র হয়, যশোবন্ত সিংহই তাহার প্রধান উদ্যোগী। এতাদৃশ কারণ পরম্পরায় আরঙ্গজীব তাঁহার উপর যারপর নাই বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে আনাইয়া কাবুলের বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। ১৬৭৮ খৃঃঅব্দে কাবুলে তাঁহার মৃত্যু হইলে, বিশ্বস্ত অনুচর দুর্গাদাসের উপরে তাঁহার বিধবা রমণী ও দুইটী শিশুসন্তানের তত্ত্বাবধারণের ভার পতিত হয়। দুর্গাদাস তাঁহাদিগকে লইয়া কাবুল হইতে ভারতবর্ষে আসিলেন। তাঁহারা দিল্লি নগরে উপস্থিত হইবা মাত্র সম্রাট কর্ত্তৃক বন্দী হন, পরিশেষে দুর্গাদাসের বুদ্ধিকৌশলে পরিত্রাণ পাইয়া যোধপুরে পলায়ন করেন। জ্যেষ্ঠ অজিতসিংহ রাজা হইলেন।

আমরা এস্থলে যশোবন্ত সম্বন্ধীয় একটী অপূর্ব্ব বিবরণের অবতারণা করিতেছি। সম্রাট সাহজেহানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজমুকুটলাভার্থ দারা, সুজা, মুরাদ ও আরঙ্গজীব সকলেই বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করেন। যশোবন্ত দারার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাঠোর সেনাগণ যার পর নাই বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া অবশেষে আরঙ্গজীবের নিকট পরাভূত হয়। বীর-কুঞ্জর যশোবন্ত সমর-বিজয়ে একান্ত হতাশ হইয়া যোধপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মিবারের মহারাণার দুহিতা তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন; তিনি স্বামীর পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একবারে উন্মত্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি যশোবন্তকে পুরপ্রবেশে নিবারণ করিয়া পুরদ্বার রুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। ক্রোধভরে কহিলেন "যশোবন্ত আমার স্বামী নহেন, আমার স্বামী হইলে তিনি কখনও শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইতেন না; মহামান্য মহারাণা এরূপ ভীরু কাপুরুষকে কন্যা সম্প্রদান করেন নাই।" আবার ক্ষণকাল পরে চিতানল প্রজ্বলিত করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, "আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, আমি অনুমৃতা হইব। তিনি শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব।" এইরূপে আট নয় দিবস অতীত হইলে তাঁহার জননী আসিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেন, যে "যশোবন্ত যুদ্ধে পরাজিত হন নাই, তিনি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভের জন্য আসিয়াছেন, গতক্লম হইয়া পুনরায় আরঙ্গজীবের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন।" তখন রাঠোর মহিষী ধৈর্য্যধারণ করিলেন। যে ভূমির অবলাবর্গের মুখে এরূপ কথা সতত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যে সম্যক্‌রূপে বীরপ্রসবিনী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আরঙ্গজীব যখন শুনিলেন, দুর্গাদাসের কৌশলে যশোবন্ত-পরিবার নির্ব্বিঘ্নে যোধপুরে উপনীত হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া আজিমকে তাঁহাদের বিপক্ষে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। আজিমের দৌরাত্ম্যে যোধপুরের দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না; অজিত স্বগণ সমভিব্যাহারে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর তথায় শান্তি সংস্থাপিত হইল, অজিত আসিয়া রাজা হইলেন, যোধপুর পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। অজিত রাজোপযোগী বিবিধ গুণে ভূষিত

ছিলেন। মুসলমানের উপর তাঁহার যৎ-পরোনাস্তি বিদ্বেষ ছিল। মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য মিবারে যে ত্রিপাক্ষিক * সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তিনি তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। অভয়সিংহ ও বকৃতসিংহ নামে তাঁহার দুই নিষ্ঠুর পুত্র ছিল; উভয়ে পিতার বধ সাধনে বদ্ধ-পরিকর হয়। সম্রাটও তাহাতে উৎসাহ প্রদান করেন। দ্বিতীয় পুত্র দুর্বৃত্ত বকৃত-সিংহ অজিতের প্রাণ বধ করিয়া উৎকোচ স্বরূপে সম্রাটের নিকট হইতে গুজরাটের শাসনকর্তৃত্ব পদ লাভ করে। ১৭৩১ খৃঃ অব্দে অজিতের জীবনাবসানে জ্যেষ্ঠপুত্র অভয়সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন, অভয় ও বকৃতসিংহে সততই বিবাদ বিস-ম্বাদ চলিয়াছিল। ১৭৫০ খৃঃ অব্দ অভ-য়ের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র রামসিংহ রাজা হইলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য পিতৃ-হন্তা বকৃতসিংহ তাঁহাকে বিদূরিত করিয়া আপনি রাজপদ গ্রহণ করেন। তিনি তিন বৎসর মাত্র রাজকার্য্য করিয়া রাজো-পযোগী বিবিধ সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়া ছিলেন। তাঁহার পিতৃবধ রূপ দুরপনের কলঙ্ক না থাকিলে, তিনি একজন অশেষ গুণসম্পন্ন রাজা বলিয়া পরিচয় পাইতে পারিতেন। তাঁহার সময়ে যোধপুরের দুর্গ সম্পন্ন হয়। তিনি স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে মাড়োয়ারে যথেষ্ট বিদ্যালোচনা হইয়াছিল। সিংহা-সনচ্যুত রামসিংহের জনৈক কুটুম্বিনী বিষ প্রয়োগ দ্বারা বকৃতের জীবন সংহার করিলে তদীয় পুত্র বিজয়সিংহ রাজা হই-লেন। অনতিবিলম্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে বলীয়ান হইয়া রামসিংহ যোধ-পুর আক্রমণ করেন। বিজয়সিংহ বিজিত হইয়া সমীপবর্ত্তী স্থান বিশেষে আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরধন হরণজীব মহারা-ষ্ট্রীয়েরা অবসর বুঝিয়া রামসিংহকে দূরীভূত করণ পূর্ব্বক যোধপুর অধিকার করিল। ১৭৭৩ হইতে ১৭৮৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাহারা যোধপুর অধিকার করিয়া রাখিলে পরে বিজয়সিংহ অম্বরেশ্বর প্রতাপসিংহের সহায়তায় মহারাষ্ট্রীয়দিগকে মাড়োয়ার হইতে দূর করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি এই সূত্রে আজমীর পর্য্যন্ত অধিকার করেন কিন্তু চারি বৎসর পরে উহা তাঁহার অধিকারচ্যুত হয়। তাঁহার জীবিত ছয় পুত্রের মধ্যে জালিমসিংহ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তরাধিকারী ছিলেন, কিন্তু বিজয় আপন উপপত্নীর সন্তোষ সাধনের জন্য স্বীয় তৃতীয় পুত্র শেরসিংহের পুত্র মানসিংহকে দত্তক রূপে গ্রহণ করেন। মরিবার সময় তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার চতুর্থ পুত্র ভীম-সিংহ ভ্রাতৃগণের বধ সাধন পূর্ব্বক সিং-হাসন অধিকার করেন। মানসিংহ পলা-য়ন পূর্ব্বক ঝালোরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে, ভীমসিংহ ঝালোর আক্রমণ করিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে এই আক্রমণা-বসরে তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হইলে মানসিংহ আসিয়া মাড়োয়ারে রাজা হইলেন। এই সময়ে ইংরাজেরা সিন্ধিয়া ও হোলকারকে পরাজিত করিয়া মানসিংহের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। মানসিংহ গোপনে হোলকারকে সাহায্য করায় এক বৎসর পরেই এই সন্ধি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অম্বরে-

* Tripple alliance between Mewar, Marwar and Jaipur.

শ্বর জয়সিংহ এবং মাড়োয়ারপতি রামসিংহ উভয়ে মহারাণার দুহিতা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হওয়ায় রাজস্থানে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। দুর্দ্ধর্ষ আমীর খাঁ আসিয়া মানের পক্ষাবলম্বন করিল বটে কিন্তু তাহার পিশাচ সদৃশ লোলুপ অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক রাজস্থানের দুরপনেয় অপচয় হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ভীমসিংহের পুত্র ধথলসিংহ আসিয়া যোধপুর আক্রমণ করতঃ পিতৃসিংহাসনে স্বীয় সত্ব সংস্থাপনের উদ্যোগ করিল। রাজ্যের কতিপয় প্রধান প্রধান সামন্ত তাহার পক্ষবল হইলেন। বিষম গোলযোগ দেখিয়া মানসিংহ উন্মাদ রোগের ভান করতঃ স্বীয় পুত্র ছত্রসিংহকে সিংহাসন সমর্পণ করিলেন। ছত্রসিংহের সময়ে ১৮১৮ অব্দে যোধপুর ইংরাজদিগের আশ্রয় লাভ করিয়া আমীর খাঁর দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। ইহার অতি অল্প দিন পরেই ছত্রসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করিলে ভাক্ত উন্মাদ মানসিংহের সমস্ত রোগ দূর হইল; তিনি তখন সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া সামন্তগণের প্রতি নানাবিধ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন। যাহারা প্রকাশ্যরূপে তাঁহার শত্রুতা করিয়াছিল, তাহাদের বধসাধন করিয়া অপরাপর সামন্তবর্গকে কারারুদ্ধ করত তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলেন; ইহাতে প্রায় এক কোটি মুদ্রা তাঁহার কোষাগারে ন্যস্ত হইল। কতিপয় সামন্ত অপমান ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক কোটা, মিবার, বিকানীর ও জয়পুরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ধথলসিংহ সেই সকল অপমানিত সামন্তগণের সহিত মিলিত হইয়া যোধপুর আক্রমণ করিলেন। ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন। ১৮৩৯ অব্দে কর্ণেল সদরলাণ্ড আসিয়া যে সন্ধি করিলেন তাহাতে মানসিংহ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি আর সামন্তগণের সত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। ১৮৪৩ অব্দে মানসিংহের মৃত্যু হইল। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া ধথলসিংহ আসিয়া সিংহাসন অধিকারে যত্নবান হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাজপরিবার, প্রধান সামন্ত ও প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণ অজিতসিংহের প্রপৌত্র আমেদনগরের অধ্যক্ষ তক্তসিংহকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। দুঃখের বিষয় যে তিনিও রাজ্যে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক ইনি সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট উপকার করেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল লর্ড মেয়ো বাহাদুর ১৮৭০ অব্দে আজমীরে যে বৃহৎ দরবার করেন, তাহাতে তক্তসিংহ মিবারের রাজার শ্রেষ্ঠ আসন সম্বন্ধে নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রতিবাদ করায় যার পর নাই অপমানিত হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ অব্দে তক্তসিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র যশোবন্তসিংহ রাজা হইলেন। ইনিই এখন মরুদেশের বর্ত্তমান রাজা। ইনি রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ১৮৭৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি কলিকাতায় আসিয়া আমাদের রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজকুমার স্বয়ং ইহাঁকে নাইট চিহ্নে চিহ্নিত করেন। ইনি দিল্লির বিকটোরিয়া রাজসূয় উপলক্ষে তথায় উপ-

ষ্ঠিত ছিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহার সম্মান সূচক তোপ ১৭ হইতে ১৯ সংখ্যায় পরিণত হয়। স্বরাজ্য মধ্যে ইহাঁর সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা আছে। ইহাঁর প্রধান মন্ত্রী মেহতা বিজয়সিংহ দিল্লি দরবারে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাড়োয়ার রাজ্যের উপসত্ব পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রা, এবং রাজকর ৯৮ সহস্র মুদ্রা। সৈন্যসংখ্যা ৩৫৪৫ অশ্বারোহী, ৫০২০ পদাতি, ২৭০ কামান ও ২৪০ গোলন্দাজ মাত্র।

(ক্রমশঃ)

খাদ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুষ্পদের মধ্যে মেষ, ছাগ, বন্যবরাহ ও মৃগ এবং পক্ষীর মধ্যে হংস, বন্যকুক্কুট, কপোত ইত্যাদি হিন্দুজাতির শাস্ত্রোচিত আমিষ খাদ্য। মাংসে যবক্ষার জানের ভাগ অধিক, শ্বেতসার নাই। তৈলময় পদার্থ প্রায়ই অল্প বা অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়া, মাংস অন্নের সহিত উত্তম রূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা।—

৬ষ্ঠ তালিকা।

খাদ্য	পরিমাণ	যবক্ষারজান	অঙ্গার	তৈললবণ
চাউল	৮	৫৬	২৮১৬	৩২
মাংস	৮	১৪৪	৯৬০	১১২
ঘৃত	—	—	—	—
আনাজ	৪	১২	১০০	২৪
লবণ	½	—	—	২১৬
মোট	২০½	২১২	৩৮৭৬	৩৮৪

ইহাতে যবক্ষার জান ও অঙ্গার যথোচিত পরিমাণে থাকে। এইরূপ আহার করিলে দেহের স্থূলতা বৃদ্ধি পাইবে না, অথচ শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া সমুদয় সুসম্পন্ন হইবে। এদেশে যেরূপ অন্নাহার পদ্ধতি আছে, তাহাতে যবক্ষারজান ময় পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অতি অল্প পরিমাণে মৎস্য বা দুগ্ধ পান করিলে শ্বেতসার যথোচিত পরিমাণ পাওয়া যায় বটে কিন্তু যবক্ষারজান পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই নিমিত্তই মাংস ভোজন বিষয়ে এতদূর অনুরোধ করিতেছি। যবক্ষার জান ময় খাদ্য হইতে শরীরে দুই প্রকার উপকার; যথা, ১ম—ঐ উপধাতু বিশিষ্ট দৈহিক যন্ত্রের জীর্ণসংস্কার। ২য়—তেজঃ উৎপাদন। ঐ তেজঃ পেশী ও স্নায়ু মণ্ডলীর কার্য্য এবং উত্তাপ রূপে পরিণত হয়। জীর্ণসংস্কার অপেক্ষা তেজোৎপাদনেই অধিক পরিমাণে যবক্ষারজান ব্যয়িত হয়।

খাদ্যে যবক্ষারজানের পরিমাণ] অল্প হইলে মাংসপেশী ও স্নায়ুশক্তি হ্রাস হয়; এবং তন্নিমিত্ত অতি সামান্য কারণে শরীর ম্যালেরিয়া জ্বর ও অন্যান্য পীড়া দ্বারা শীঘ্রই আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

যবক্ষারজান ময় খাদ্য।—মানসিক পরিশ্রম কালে বা কঠিন শারীরিক পরিশ্রম

কালে যবক্ষারজান ময় দ্রব্যের ক্ষতি শীঘ্রই জন্মে ; এবং সেই ক্ষতিপূরণ করিবার নিমিত্তই মাংস ভোজনে অনুরোধ করা যায়। কারণ পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে নিরামিষ খাদ্য অপেক্ষা মৎস্য মাংস শীঘ্রই পরিপাক হয়, সুতরাং শীঘ্রই ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। উদ্ভিজ্জ য়্যাল্‌বুমিনেট্ শীঘ্র পরিপাক হয় না, সুতরাং উহা হইতে যবক্ষারজান শীঘ্র বহির্গত হইয়া ক্ষতি পূরণে নিযুক্ত হইতে পারে না, সেই জন্যই অধিক ক্ষণ পর্য্যন্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করা যায় না।

তৈলময় খাদ্য।—তৈলময় খাদ্যের দুইটী প্রধান ধর্ম্ম, ১ম—তেজোবৃদ্ধি, ২য়—তৈলাক্ত পদার্থের বৃদ্ধি।

(ক) তৈলময় খাদ্যের অঙ্গার ও উদ্‌জান, অম্লজান দ্বারা আকৃষ্ট হইলে, উত্তাপ ও গতি শক্তি উৎপন্ন হয়।

(খ) শরীরের স্থানে স্থানে তৈলাক্ত পদার্থ জমিয়া থাকে, সময় বিশেষে ঐ তৈলাক্ত পদার্থ শোণিতের শস্যাগার স্বরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ আহার না পাইলে কি অধিক পরিশ্রম করিলে শোণিত ঐ তৈলাক্ত পদার্থ হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য আহরণ করে ও শারীরিক ক্রিয়া সমুদয় চলিতে থাকে। কিন্তু অধিক পরিমাণে ঘৃত বা তৈল আহার করিলে যবক্ষারজান ময় পদার্থের পরিবর্ত্তন হ্রাস হয়।

শ্বেতসার ময় খাদ্য।—শ্বেতসার ও শর্করা ময় পদার্থ হইতে উত্তাপ উৎপন্ন হয়, এবং অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে শরীরের তৈলাক্ত পদার্থের পরিমাণও অধিক হয়।

ধাতব, উপধাতব ও অস্থিম পদার্থ সমূহ।—জলই প্রধান উপধাতব খাদ্য। জীবন ধারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে জল যে অমূল্যনিধি তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। জল ব্যবহারের এক প্রধান কারণ এই যে, উহা শোণিতকে যথোপযুক্ত রূপে তরল রাখে ও সমস্ত স্থানে পরিভ্রমণ করিবার উপযুক্ত করে, এবং সমস্ত যন্ত্র যথোচিত শিক্ত ও কার্য্যক্ষম করে, নচেৎ তাহারা শুষ্ক হইয়া যায় ও স্ব স্ব কার্য্য করিতে অক্ষম হয়। জল ব্যবহার করিলে শারীরিক ক্রিয়া সমূহের বৃদ্ধি হয়, পরিবর্ত্তন ক্রিয়াও শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে।

লবণ।—লবণ যে প্রাণ ধারণের প্রধান আবশ্যকীয় পদার্থ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। লবণ বিনা প্রায় কোন খাদ্যই সুস্বাদু হয় না এবং যে খাদ্যে লবণের অংশ অল্প তাহা অধিক কাল ব্যবহার করিলে পীড়া উপস্থিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ দ্রব্য সুমিষ্ট? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে এক বিখ্যাত পণ্ডিত উত্তর করেন যে, লবণই সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট ও তিনি তাহার প্রমাণ দিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করেন। লবণ ব্যবহার হেতু দৈহিক ক্রিয়া সমুদয় শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। সকল প্রকার আনাজেই কিয়ৎ পরিমাণে লবণ থাকে। টাট্‌কা আনাজ ব্যবহার না করিলে নানা পীড়া উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য খনিজ পদার্থও খাদ্যের সহিত উদরস্থ হয় ও তাহাদের স্বস্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

জল।—পানীয় জল ব্যতীত কোন খাদ্যই সুপক্ক হয় না। জল যে যে কারণে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে পানার্থেই সর্ব্বপ্রধান। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি কোন মহামূল্য বা সুমিষ্ট সামগ্রী ভক্ষণ করিলেও তাহার তৃষ্ণা

নিবারণ হয় না। যাহাকে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, সময়ে সময়ে তৃষ্ণা নিবারণ না করিলে সে ব্যক্তি কখনই পরিশ্রম করিতে পারে না; যাহাকে বিশেষ মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় তাহারও তদ্রূপ। সময়ে জলপান না করিলে মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী সমুদয় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা প্রতিদিবস গড়ে তিন সের জল দেহ মধ্যে গ্রহণ করি, তন্মধ্যে কিয়দংশ নিশ্বাস দ্বারা ফুস্‌ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করে ও স্নান করিবার সময় লোমকূপ দ্বারা শোণিতে প্রবেশ করে। কতক পরিমাণ খাদ্যের সহিত উদরস্থ হয়, অবশিষ্টাংশ (প্রায় ২ সের) প্রতি দিবস বাহির হইয়া যায়।

জলপান করিবার সময় এককালে অধিক জলপান করা অবিধেয়। আহারের অনতিপূর্ব্বে অল্প পরিমাণে শীতল জল পান করিলে পাচকরস সমূহ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইতে পারে। অধিক পরিমাণে পান করিলে ঠিক বিপরীত ঘটিবে। আহারের সময় অধিক জল পান করা নিষিদ্ধ, কারণ তদ্দ্বারা পাচকরস সমূহ অযথোচিত রূপে তরলীভূত হইয়া যাইবে ও পরিপাক কার্য্য সুসম্পন্ন হইবেনা। অত্যন্ত শীতল বা উষ্ণ জল অধিক পরিমাণে পান করিলে অপকার ব্যতীত উপকার নাই। যবক্ষার জান ময় পদার্থ ভক্ষণ করিলে অল্প পরিমাণ জল পান করা উচিত। অধিক পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাক্তকলেবরে জল পান করা অবিধেয়, ঐরূপ করিয়া কত লোক হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে।

কয়েক প্রকার ফলমূল ব্যতীত, প্রায় সকল প্রকার খাদ্যের পাচ্যতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত রন্ধন করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত রন্ধন দ্বারা খাদ্যের স্বাদ ও সুগন্ধিতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। খাদ্য যত পুষ্টিকর হউক না কেন, জীর্ণ হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত না হইলে, শরীরের কোন উপকারে আইসে না, বরং অনিষ্টপাত করে।

কাঁচা বা স্বাভাবিক খাদ্য মনুষ্যের পাকস্থলীতে সহজে পরিপাক হয় না, এ নিমিত্ত রন্ধন দ্বারা তৎসমস্তকে খাদ্যানুরূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। অনেক খাদ্য কেবল রন্ধন করিলেই ভক্ষণোপযোগী হয় না, সুস্বাদুও হয় না, সুতরাং মনের তৃপ্তি না হওয়ায় আবশ্যকীয় পাচক রস সমূহ নিঃসৃত হয় না, কাজেই অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। এনিমিত্ত কতকগুলি খাদ্য রন্ধন কালে মস্‌লা দ্বারা সুগন্ধিত ও সুস্বাদ যুক্ত করিয়া লওয়া আবশ্যক। তদ্দ্বারা লালা ও অন্যান্য পাচক রস নিঃসারক যন্ত্রের স্নায়ু উত্তেজিত হয়, কৈশিকাজালের শোণিতের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় ও অধিক পরিমাণে রস নিঃসৃত হয় সুতরাং খাদ্য উত্তমরূপে জীর্ণ হইয়া শোণিতের সহিত বিমিশ্রিত হয়। ইহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ খাদ্য জীর্ণ না হইলে, বিসমাসিত ও বিকৃত হওয়ায় নানা প্রকার অনিষ্টকারী বাষ্প ও রস উৎপন্ন হয় এবং পীড়া জন্মে।

রন্ধন দ্বারা সকল প্রকার খাদ্য সমানরূপে পাচ্য হয় না। কোন কোন দ্রব্য রন্ধন দ্বারা অপাচ্য হয়। কোন কোন খাদ্যের সারাংশ রন্ধনকালে পরিত্যক্ত হয়। গুরুপাক খাদ্য, অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক মশলা (যথা—ঘৃত, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচি পিঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, মরিচ ও ধনে ইত্যাদি) মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করা এদেশের পক্ষে অবিধেয়। অনেক সময় খাদ্যের সুগন্ধিতা ও স্বাদ বৃদ্ধি

করিবার জন্য অপাচ্য করা হয়। শীত প্রধান দেশীয় মুসলমানদিগের গুরুপাক খাদ্য বাঙ্গালীর পাকস্থলীর উপযুক্ত নহে। পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ, বোধ হয়, অধিক পরিমাণে পলান্ন, লুচি, কচুরি, ক্ষীর ইত্যাদি গুরুপাক খাদ্য পরিপাক করিতে পারেন, কিন্তু প্রায় ১৫ আনা ভাগ লোক পারেন না। যাঁহারা ঐরূপ খাদ্য পরিপাক করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও বলিতেছি যে এক্ষণে পাকযন্ত্র সমুদয়কে অন্যায় রূপে নিস্তেজ না করিয়া লঘুপাক পুষ্টিকর সামগ্রী ভক্ষণ করিলে, আরও অধিককাল সচ্ছন্দে ক্ষেপণ করিতে পারিবেন। স্বভাবতঃ শীত প্রধান দেশের লোক অধিক পরিমাণে ঘৃত বা তৈলাক্ত খাদ্য আহার করিয়া থাকে, কারণ তাহাদের দেশে শৈত্যাধিক্য প্রযুক্ত অধিক পরিমাণ উত্তাপ উৎপাদক অঙ্গারময় পদার্থ আবশ্যক। তজ্জন্য ঘৃত বা তৈল অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। কাবুলের পার্ব্বতীয় জাতির (যাহারা পেস্তা ও অন্যান্য তৈলময় ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে) রন্ধন প্রথা বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হওয়া কেবল অনুকরণ প্রিয়তার ফল। এই অস্বাস্থ্যকর প্রথা যত শীঘ্র এদেশ হইতে তিরোহিত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল।

চাউল, দাল, ও ময়দার স্বাভাবিক অবস্থায় তৈলময় পদার্থের পরিমাণ অতি অল্প; এ নিমিত্ত ঐ কয়েক দ্রব্য আহার করিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ মাখম বা ঘৃত মিশ্রিত করা বিধেয়। লুচীতে অপরিমিত রূপ ঘৃত মিশ্রিত হয়, তজ্জন্য লুচি গুরুপাক। মাংসে সচরাচর অতি অল্প ঘৃত আবশ্যক করে। কারণ মৎস্য ও মাংসে স্বভাবতঃ কিয়ৎপরিমাণে তৈলময় পদার্থ থাকে।

সময়ে সময়ে মাংস, মৎস্য ও অন্যান্য খাদ্য "বাসি" ব্যবহার করিতে হয়। যাহাতে ঐ সকল খাদ্য রাখিলে অনিষ্টকর না হয়, তাহার উপায় করা উচিত। অদ্যকার মৎস্য, কল্য বা পরশ্ব ব্যবহার করিবার নিমিত্ত কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। জৈবনিক পদার্থ মাত্রই জল, বায়ু ও উত্তাপ সংযোগে বিকৃত হয়, অতএব যদি আমরা ঐ খাদ্য হইতে জলীয় অংশ হ্রাস করিয়া দিই, কিম্বা উহাকে বায়ু হইতে রক্ষা করি, কিম্বা উত্তাপ লাগিতে না দিই, তাহা হইলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। এদেশে সচরাচর মৎস্য ও মাংসে লবণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়, পরে কতকটা জল পড়িয়া গেলে, মৎস্য উত্তপ্ত তৈলে ভাজিয়া লওয়া হয়। লবণ পচন নিবারণ শক্তি বিশিষ্ট ও হরিদ্রাও অনেক ক্ষুদ্র কীট বিনষ্ট করিতে সক্ষম, অতএব ঐ দুই পদার্থই উপকারী। পরে উত্তপ্ত তৈলে ভাজিয়া লওয়ায় ফল এই যে, উত্তপ্ত হইলে মাংস বা মৎস্য মধ্যস্থ বায়ু বিস্তীর্ণ হইয়া বহির্গত হয় ও তৎক্ষণাৎ ঐ পাত্রস্থ উত্তপ্ত তৈল বায়ুর স্থান গ্রহণ করে। মৎস্যের চতুঃপার্শ্বে তৈলময় আবরণ থাকায় বাহ্যবায়ু পুনর্ব্বার উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং পচিতেও পারে না। উত্তাপ প্রাপ্ত মৎস্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। সেইরূপ মাংস কিছুদিন রাখিবার আবশ্যক হইলে এক পোয়া বা অর্দ্ধসের পরিমাণ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ করিতে হয়, পরে একটী পাত্রে খানিকটা ঘৃত দিয়া তাহাতে

মাংসকে ছাড়িয়া দিবে ; পরে আরও কতকটা ঘৃত দিয়া মাংসকে একবারে ঢাকিয়া ফেলিবে, ও ফুটাইবে। একবার ফুটিলে উহাকে অগ্নি হইতে নামাইয়া কোন শীতল স্থানে রাখিবে। মৎস্য বা মাংসকে লবণাক্ত করিলেও অধিক দিন থাকে। দুই সের লবণ, একপোয়া সোরা, ৩০ সের জল একত্র করিয়া তাহাতে মাংসকে মগ্ন করিয়া রাখিতে হইবে, কিম্বা কতকগুলি শুষ্ক লবণ ও অল্প পরিমাণ সোরা লইয়া মাংসে উত্তম রূপে ঘর্ষণ করিতে হইবে, এবং উহা হইতে নিঃসৃত জলীয় পদার্থকে প্রতিদিন পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ঐরূপ লবণ ঘর্ষণ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত শুষ্ক করিলেও মাংস বা মৎস্য অনেক দিন থাকে ; এবং বরফের মধ্যে রাখিলেও উত্তম থাকে।

ব্যঞ্জনে অধিক পরিমাণে গরম মসলা (অর্থাৎ এলাচি, দারুচিনি, জায়ফল, লবঙ্গ কিম্বা পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্) দেওয়া অত্যন্ত অসৎ পরামর্শ। প্রথমোক্ত কয়েক দ্রব্যের পরিমিত ব্যবহারে পাচকরস সমূহ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়, উহারা পাকস্থলী ও অন্ত্রে অপরিমিত রূপে প্রবিষ্ট হইলে উত্তেজক বা প্রদাহ উদ্দীপক গুণ প্রদর্শন করে ও পরে পাকস্থলীর ক্ষীণতা সম্পাদন করে সুতরাং অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত কয়েক পদার্থ অত্যন্ত তৈলময় ও গুরু, জীর্ণ করিতে অধিক সময় আবশ্যক করে। পেঁয়াজ, আদা, সর্ষপ, লঙ্কা, মরিচ পরিমিত রূপে ব্যবহার করিলে পরিপাক শীঘ্র হয় ; অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে প্রথমে উত্তেজনা, পরে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়।

দুগ্ধ।—উত্তম গাভীর দুগ্ধ দেখিতে গাঢ় শ্বেতবর্ণ, অস্বচ্ছ, নীলের আভা শূন্য ; আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৬—১০৩৫। জল মিশ্রিত দুগ্ধ অধিক তরল ; নখের উপর এক ফোঁটা দুগ্ধ স্থাপন করিলে তৎক্ষণাৎ চ্যাপ্‌টা হইয়া যায় ও পার্শ্বদেশে নীলের আভা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৬ অপেক্ষা ন্যূন। উত্তম দুগ্ধে শতকরা ১১.৫ ভাগ কঠিন পদার্থ থাকে, জলমিশ্রিত হইলে উহার পরিমাণ হ্রাস হয়। দুগ্ধ অত্যন্ত গাঢ় করিয়া অর্থাৎ "ক্ষীর" করিয়া ব্যবহার করা স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ। কারণ ক্ষীরে জলের অংশ কম ও পনিরময় পদার্থ অত্যন্ত ঘনীভূত ও অপাচ্য রূপে থাকে। কেহ দুগ্ধপান করিবার পূর্ব্বে উহার সর (সার) পরিত্যাগ করেন—উহা অবিধেয়। কারণ সরই দুগ্ধের প্রধান অংশ, উহাতে তৈলময় ও শর্করময় পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে। ঐ দুই সামগ্রী ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করিলে যবক্ষার জানময় পদার্থ, লবণ ও জলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। যথা, জল ৬৬, যবক্ষারজান ২.৭ শর্কর ২.৮, তৈলময় ২৬.৭, লবণ ১.৮ (স্মিথ)। দধি উত্তম খাদ্য, কিন্তু সকল সময়, কিম্বা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে পীড়া জন্মে। উহাতে ল্যাকটিক অম্লরস থাকে, এনিমিত্ত পাচক ক্রিয়ার সাহায্য করে। ঘোলও অতি সুখাদ্য, গ্রীষ্মকালের অতি উপাদেয় পানীয় ; অনেক পীড়ার পথ্য। ছানা ও তদুৎপন্ন মিষ্ট সামগ্রী সমুদায় ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু ছানা দুগ্ধাপেক্ষা দুষ্পাচ্য, এনিমিত্ত অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। উহাতে যবক্ষারজানের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক ; চিনির সহিত মিশ্রিতাবস্থায় শীঘ্রই পরিপাক হয়। সর

হইতে মাখন ও ঘৃত উৎপন্ন হয়। ঘৃত অপেক্ষা মাখন সহজে পরিপাক হয়; মাখনে জলের ভাগ অধিক, পনিরের ভাগও ঘৃত অপেক্ষা অধিক বোধ হয়, সেই নিমিত্তই বোধ হয়, মাখন অতি অল্পকাল মধ্যেই বিসম্বাসিত হইয়া যায়। ঘৃতে অঙ্গারের ভাগ অধিক, জলের ভাগ অল্প, যবক্ষারজানময় পদার্থ প্রায় নাই। এনিমিত্ত বহুকালাবধি ব্যবহার্য্য থাকে। উত্তম গাভীর দুগ্ধে শতকরা ১১.৫ ভাগ কঠিন পদার্থ থাকে; (১৩.৫৯—স্মিথ) ছাগীর দুগ্ধে প্রায় শতকরা ১৪.৫ ভাগ, গর্দ্দভীর দুগ্ধে (১০.৯১—স্মিথ) ৯.৫ ভাগ কঠিন পদার্থ থাকে। মহিষীর দুগ্ধে সকল প্রকার খাদ্যই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পীড়িতাবস্থায় স্তন্যপায়ী শিশুগণকে গর্দ্দভীর দুগ্ধ পান করাইতে পরামর্শ দেওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, ঐ দুগ্ধ মাতার স্তনদুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকারী। ছাগী, মহিষী ও গাভীর দুগ্ধ অধিক পুষ্টিকর, আবশ্যক হইলে কিয়ৎ পরিমাণে জল ও শর্কর মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অনেক সময় আমাদিগকে এমত স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়, যথায় টাট্‌কা দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সে স্থলে পুরাতন "তোলা" দুগ্ধ পাইলেও যথেষ্ট তৃপ্তি বোধ হয়, এ নিমিত্ত তোলা দুগ্ধ প্রস্তুত করিবার উপায় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। মিশ্রি বা 'দোবরা' চিনি ও অল্প পরিমাণ কার্বনেট্ অব্ সোডার সহিত মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধকে মন্দ মন্দ অগ্নির উত্তাপে ঘনীভূত করিয়া রাখিলে ১০। ১৫ দিবস সচ্ছন্দে থাকিতে পারে। বিদেশীয় দুগ্ধপূর্ণ টিনে যে দুগ্ধ থাকে, তাহাও ঐ রূপে প্রস্তুত করা, এবং উহা হইতে বায়ু নিক্রান্ত করা হয়। ঐ টিন্ খুলিয়া রাখিলেও ১ মাস পর্য্যন্ত উত্তম থাকে, কিন্তু উহাতে প্রায় তৃতীয়াংশ শর্কর মিশ্রিত থাকে। ডাক্তার ডেলির মতে ঐ দুগ্ধ অধিকদিন পর্য্যন্ত শিশুদিগকে খাওয়ান দূষণীয়। তিনি বলেন যে, যে সকল শিশু সন্তান ঐ দুগ্ধ পান করে, তাহারা দেখিতে প্রথমে অতি সুন্দর ও স্থূলকায় হয়, কিন্তু পরে ক্ষুধামান্দ্য, পেটের পীড়া ও কোন রোগাক্রান্ত হইয়া কেহ কেহ অকালে প্রাণত্যাগ করে, যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা স্তন্যপায়ী সমবয়স্ক শিশুগণাপেক্ষা ক্ষীণবল হইয়া পড়ে।

ক্রমশঃ।

ইতিহাসোক্ত নিষ্ঠুরতা।

মানব যতই ক্ষমতাবান হয়, ততই তাহার হৃদয়স্থ বৃত্তিচয় অধিকতর স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। যে ব্যক্তি যাদৃশ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত তাহার তাদৃশ স্বেচ্ছাচারিতার অভিলাষ দেখা যায়। সে যাহা বলে সকলের নিকট হইতে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে চায়, সে জল উঁচু বলিলে যদি কেহ তাহার সমর্থন না করে তাহা হইলে সে বিরক্ত হয়, এবং সর্ব্ব কার্য্যেই প্রশংসা

শুনিতে তাহার কর্ণ প্রস্তুত থাকে। এই জন্যই দেখা যায় যেখানে ধন সম্পদ, যেখানে প্রভুতা সেইখানেই প্রায় অত্যাচার ও স্বাধীনতা বিরাজ করে। মানুষকে আমরা যেমন দেখি বস্তুতঃ মানুষ তেমন নহে। সমাজ-শাসন রাজ-শাসন ও কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্ম-শাসনও বটে, মানুষকে মানুষ করিয়া রাখিয়াছে। যদি এই সকল শাসন অন্তরিত করা যায়, তাহা হইলে দেখিবে কি? দেখিবে যথেচ্ছাচার, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্য সমাজকে বিপর্য্যস্ত ও বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিয়াছে, রোদন ও আর্ত্তনাদ ধ্বনিতে বসুধা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং ক্ষত বিক্ষত হৃদয় লইয়া মানুষ ছুটাছুটী ও মারামারি করিয়া মরিতেছে। তখন মানুষের প্রকৃত চরিত্র, যথার্থ হৃদয়ের ভাব দেখিতে পাইবে এবং তখন বুঝিবে যে, মানুষ মানুষ নহে, ইহারা পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি, অথবা সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক বা শৃগালের সমজাতীয়।

মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞান মানবকে পশু-হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিবার হেতু। কিন্তু সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান যদি যথোপযুক্ত রূপে কর্ষিত না হয়, তাহা হইলে নিকৃষ্ট জীব সকল যে সকল অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা কখনও কল্পনাও করিতে পারে না, মানুষ প্রয়োজন হইলে তাহা সাধিত করিয়া থাকে এবং সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান তাহাদিগকে তখন ইতর প্রাণীগণের অপেক্ষাও ইতর করিয়া ফেলে। এজগতে যে জাতি যতই আধ্যাত্মিক চিন্তা করিয়াছে, সে জাতি ততই মানবত্ব লাভ করিয়াছে। জ্ঞান ও বুদ্ধি যাহারা পরম তত্ত্ব চিন্তায় নিযুক্ত করিয়াছে, তাহারাই অগাধ প্রেম পূর্ণ সংসারের চতুর্দ্দিকে প্রেম-রাজ্য কল্পনা করিয়াছে এবং ভক্তি ও প্রেমে পুলকিত তনু হইয়া তাহারা নিকৃষ্টতর চিন্তা ও বাসনা সমূহকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তাহা যাহারা পারে নাই, যাহাদিগের হৃদয়ে প্রেমের তত্ত্ব মিশ খায় নাই, তাহাদের বিজ্ঞানোন্নতি অপরিমেয় হইলেও, তাহাদের সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ হইলেও, তাহাদের শিল্পকার্য্য অতুলনীয় হইলেও, হৃদয়ে তাহারা পশুই রহিয়াছে এবং অবসর পাইলেই তাহারা আপনার পশুত্ব প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্য জাতির অপেক্ষা উদার প্রকৃতিক, প্রেমিক, শান্তিপূর্ণ জাতি জগতে আর নাই। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দুর ইতিহাস, হিন্দুর দর্শন হিন্দুর যোগশাস্ত্র এবং হিন্দুর কিম্বদন্তী সমূহ কেবল মহৎ চিন্তা, মহান্ ভাব, গভীর অর্থ, অগাধ প্রেম, অতুল ভক্তি ও অবিনশ্বর তত্ত্ব সমূহে পূর্ণ। হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত জনপদ যে বেদ বেদান্ত, স্মৃতি দর্শনা'দি শাস্ত্রের কল ধ্বনিতে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হিন্দু সন্তানগণ বুঝিয়া না বুঝিয়া, জানিয়া না জানিয়া, যে স্বর্ণময় উপদেশ ও শিক্ষা সমূহের কিয়দংশও প্রতিপালন করিতেছেন, সে পুণ্যভূমিতে নিষ্ঠুরতা ও যথেচ্ছাচারের স্থান নাই। জগতে কোন জাতিই আধ্যাত্মিক চিন্তায় হিন্দুর সমকক্ষতা লাভ করে নাই এবং কোন জাতিই অদ্যাপিও হিন্দুর ন্যায় হৃদয়োন্নতি করিতে সমর্থ হয় নাই। যে দেশের শাস্ত্র সমূহ নিস্পৃহতা, পরমন্নতা ও শান্তির শিক্ষা দিতে ব্যস্ত, যে দেশের ঋষি মণ্ডলী

পরব্রহ্মের পরম চিন্তায় উন্মাদ, যে দেশের সত্যনিষ্ঠা রামচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্রের দ্বারা কীর্ত্তিত, যে দেশে মুখের অন্ন পর্য্যন্ত অতিথিকে দিবার ব্যবস্থা, যে দেশে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য পুত্র বধও অকর্ত্তব্য নহে, স্বীয় জীবন দান করিয়া আশ্রিত পালন করা যে দেশের পরম ধর্ম্ম, যে দেশের বৌদ্ধ, যে দেশের চৈতন্য, যে দেশের শ্রীকৃষ্ণ, যে দেশের যুধিষ্ঠির কেবল প্রেম ও সাম্যনীতি শিক্ষা দিয়াছেন, সে দেশ ধর্ম্মক্ষেত্র. তাহার অধিবাসিবৃন্দ প্রেমের মহিমা জানে এবং সকল মনুষ্যকে ভ্রাতৃভাবে—সমান ভাবে দেখায় যে কি আনন্দ তাহা তাঁহারাই বুঝে। সে দেশের লোক নিষ্ঠুর বা অত্যাচারী হইতে পারে না।

আর যে কোন জাতির ইতিহাস বা সামাজিক ব্যবহারে দৃষ্টিপাত কর, কোথাও হিন্দুদিগের তুলনা দেখিতে পাইবে না। বর্ত্তমান সময়ে ধনে, মানে, বলে, প্রভুতায় জ্ঞানে ইংরাজ পৃথিবীর প্রধান জাতি। সেই ইংরাজ জাতির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর—কি দেখিবে? দেখিবে, পরমার্থ চিন্তায় ইংরাজ এক পদও অগ্রসর হন নাই, দেখিবে ইংরাজের হৃদয় এখনও সাধারণ মনুষ্যের সাধারণ হৃদয়, দেখিবে ইংরাজ যে ধর্ম্ম পরম সত্য বলিয়া ব্যক্ত করেন তাহার একটী তথ্যও অনেকে প্রণিধান করিতে সমর্থ হন নাই এবং দেখিবে হৃদয় ধরিয়া বিচার করিলে, ইংরাজ এখনও অনেকটা পশু রহিয়াছেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজের কীর্ত্তি জগত জুড়িয়া ব্যাপৃত হইয়াছে। ইংরাজের বাণিজ্যপোত অতি অগম্য সমুদ্রে বক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে, ইংরাজের বিজ্ঞান ও শিল্প জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে, ইংরাজের বৈদেশিক অধিকার ধারণার সীমা ছাড়িয়া উঠিতেছে, ইংরাজের সাহিত্য সেক্ষপীয়র, মিল্টন প্রভৃতির দ্বারায় অলঙ্কৃত রহিয়াছে, ইংরাজের ধনাগম অচিন্তনীয় হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজদের তুল্য ক্ষমতাশালী। কিন্তু হায়—ইংরাজের হৃদয়? এখনও অনুন্নত, এখনও পশুবৎ এখনও হিন্দুর সহিত তুলনায় অস্পর্শ্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানুষ যতই উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয় ততই তাহার নিষ্ঠুরতা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু হিন্দুর তাহা হয় নাই। ইহ সংসারে মানব কতদূর ক্ষমতাশালী হইতে পারে, হিন্দুগণের রাবণ তাহার পরিচয় স্থল। রাবণকে প্রায় দেবতুল্য—দেবতুল্য কেন দেবাধিক, ক্ষমতাশালী করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র, কালান্তক যম সকলেই রাবণ ভয়ে বিকম্পিত। এ হেন রাবণ চরিত্র নিষ্ঠুরতা কালিমায় কখন কলঙ্কিত হয় নাই। রাবণ অধিকতর প্রভুতা লাভের নিমিত্ত স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চরাচর জয় করিয়াছেন; রাবণ সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ বাসনায় রূপসীগণকে হরণ করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি কাহাকেও অকারণ ক্লিষ্ট, বা যন্ত্রণা দ্বারা পীড়িত করিয়া আপনার নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন নাই। সীতার বিবরণ রাবণ-চরিত্রে নিষ্ঠুরতা বিহীনতা বিষয়ক সুস্পষ্ট নিদর্শন। সুন্দরিশিরোমণি সীতাকে রাবণ করতলগত করিয়াও একদিনও তাঁহার অসম্মতিতে তাঁহাকে কলঙ্কিতা করিতে চেষ্টা করেন নাই, এবং ক্রমাগত সেই পতি-গত-প্রাণা স্বামীর চিত্তপরিবর্ত্তন করাইয়া বাসনা সিদ্ধির উপায় কল্পনা করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

পরের চিত্তের সুখাসুখের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকায় এবং পরকীয় মনে অকারণ ব্যথা দিতে বিশেষ অনমুরাগ হেতু সেই ঘোরতর ইন্দ্রিয় পরায়ণ অমিত পরাক্রম দশানন সীতার প্রতি বল প্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুর অমানুষী ক্ষমতাশালী ও অত্যুন্নত পদ সম্পন্ন লঙ্কেশ্বরও নিষ্ঠুরতা বিলাসী ছিলেন না। হিন্দুর ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু মহাভারত রামায়ণ ও পুরাণাদি পাঠে আদিম হিন্দুগণের বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারা যায়। সেই সকল গ্রন্থে যে যে বিবরণ বর্ণিত আছে, তৎপাঠে হিন্দু চরিত্রের দোষ গুণ অনেক জানা যায়। দেখা যায়, ধর্ম্ম-ভয় সাত্য-নিষ্ঠা, আশ্রিত পালন, সাম্য, সততা, উদারতা প্রভৃতি স্বর্গীয় সদ্গুণ সমূহের ভূরি ভূরি নিদর্শন গ্রন্থ-কলেবর বিভূষিত করিয়া রহিয়াছে। বীরত্ব এবং তদানুষঙ্গিক প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রভৃতিরও যথেষ্ট উদাহরণ ঐ সকল গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইতে পারে। ইন্দ্রিয় পরায়ণতা ও ভোগাভিলাষ প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সমূহেরও পরিচয় বিরল নহে। কিন্তু নিষ্ঠুরতা, পরপীড়নে অনুরাগ, পরের যন্ত্রণায় তৃপ্তি এ সকল নারকী প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল। অধিক কি যুদ্ধ ও শত্রুনিপাত সম্বন্ধেও হিন্দুগণের যে নীতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহার তুলনা আর কোন জাতিতে নাই। শত্রুনিপাত ও রণজয় সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যে কোন উপায় শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় ইংরাজ বা মুসলমানগণ তাহাই অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুগণ নিরস্ত্র ব্যক্তির প্রতি কখনই অস্ত্রক্ষেপ করিতেন না এবং দুর্ব্বল ও হীন প্রাণীগণকে বধ করিয়া কলঙ্ক ক্রয় করিতেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি পরম শত্রু বা যাহাকে নিপাত করা হৃদয়ের চরম বাসনা তাহার সম্বন্ধেও হিন্দু সন্তানগণ চলচ্চিত্ত হইয়া উদারতার পুণ্যময় পন্থা পরিত্যাগ করিতেন না। তাই বলিতেছিলাম যে, আর কোন জাতির চরিত্রে এরূপ দয়াময়তা, পরময়তা ও প্রেম পূর্ণতার পরিচয় নাই।

যাঁহারা হিন্দুগণের প্রগাঢ় ভাব, চিন্তা ও যুক্তি পূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা সমূহের মর্ম্ম সমূহ প্রণিধান করিতে বিশেষরূপ চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য প্রথাকে হিন্দুর মহাকলঙ্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বস্তুতঃ মোটামুটী দেখিতে গেলে ব্রাহ্মণের কি ধর্ম্ম, কি সমাজ সকলের উপর অবিসম্বাদিত প্রভুতা হিন্দুজাতির অত্যাচার ও বৈষম্য বলিয়াই মনে হয় বটে। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা যে সমাজের বিশেষ হিতকর এবং আবশ্যক তাহা যাঁহারা সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিবেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণেরা মনুষ্য জীবনের যাহা যাহা প্রধান ও ভয়ানক কার্য্য তৎসমস্তেরই ভার আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সামাজিক ব্যবস্থা, পারত্রিকের ব্যবস্থা, রাজশাসনের ব্যবস্থা, ব্যবহার শাস্ত্র প্রণয়ন, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ণ, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ, দর্শন ও পরমার্থ চিন্তা এবং মুক্তির উপায় অন্বেষণ কার্য্যে ব্রাহ্মণগণ—কেবল ব্রাহ্মণগণই ব্যাপৃত থাকিতেন। অর্থ, শারীরিক সুখ, ভোগবিলাস এবং ঐহিক যাহা কিছু বাসনা তৃপ্তির অনুকূল সমস্তই তাঁহারা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন। পর্ণ

কুটীরে তাঁহারা বাস করিতেন, বল্কল তাঁহারা পরিধান করিতেন, কুশাসনে তাঁহারা শয়ন করিতেন এবং ফলমূল তাঁহারা ভোজন করিতেন। এরূপ অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার আর কোথায় দেখিতে পাইবে? তাঁহারা মানব সমাজের নিমিত্ত যে অচিন্তনীয় শ্রম ও উপকার করিতেন, তাহার প্রতিদান সম্ভবে না; তাঁহারা এ জগতের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন মানবগণ অনন্ত কালেও তাহার প্রতিশোধ দিতে পারিবে না। তাঁহারা যাহাদের জন্য এই মহান্ উপকার, এই অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার এবং জীবন বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট হইতে তাঁহারা কেবল সম্মান, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এবং আপনাদের প্রতিপালন ও সুখ শান্তির দাবি দাওয়া করিতেন মাত্র। তাঁহাদের কার্য্য বিবেচনায় তাঁহাদিগকে এতাদৃশ অধিকার দিতে যদি কোন সমাজ কাতর হয় বা আপত্তি করে তাহা হইলে সে সমাজ নিতান্তই ঘৃণিত ও কৃতঘ্ন সমাজ। সুখের বিষয় হিন্দু সমাজ পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণের মহদুপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে অজস্র কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করিত। তাহার পর যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা প্রণয়ণ এবং উচ্চ চিন্তা আপনাদের একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহাদিগের অত্যাচার বলিতে হইবে। আমরা তদুত্তরে বলিব যে, সমাজের শ্রেণীবিশেষ এই সকল কঠিন কার্য্যের দায় হইতে সাধারণকে মুক্ত করিয়া এবং আপনারা সেই সকল দায়িত্ব আত্ম স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া অত্যাচারের পরিচয় দেন নাই, বরং বিশেষ উদারচেতা সমাজ হিতৈষী বন্ধুর কার্য্যই করিয়াছিলেন। অত্যুন্নত পরমার্থ চিন্তা বা জ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক বা বৈষয়িক চিন্তা থাকিতে পারে না। এই দুই ভিন্নবিধ চিন্তায় সমসময়ে মনঃসংযোগ করা অসাধ্য। যদি বৈষয়িক চিন্তায় কৃতকার্য্য বা উন্নত হও, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার জ্ঞানোন্নতির ব্যাঘাত ঘটিবে এবং যদি জ্ঞানোন্নতি করিতে অগ্রসর হও, তাহা হইলে বিষয় ব্যাপার অবসন্ন হইয়া পড়িবে। অনেকে বলেন নানাবিধ কার্য্য একসঙ্গে করায় ক্ষতি হয় না, বরং তাহাতে কর্ত্তার ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হয়। কথাটার কিয়দংশ সত্য এবং কিয়দংশ মিথ্যা। যদি কেহ নানাবিধ কার্য্য একসঙ্গে সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে বস্তুতঃই তিনি মহৎ লোক। দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে একই ব্যক্তি নানাবিধ কার্য্য লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। ইতিহাস কাব্য, রাজনীতি, ব্যবসায় প্রভৃতি নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য তাঁহারা একসঙ্গে অবলম্বন করেন এবং সম্পন্ন করেন। তাহাতে মোটামুটী দেখিলে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন (Gladstone) এবং ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লর্ড বীকন্স্‌ফীল্ড, (Lord Beaconsfield) প্রভৃতি ব্যক্তি নানাকার্য্য এক সঙ্গে অবলম্বন ও সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যম ও শ্রম শীলতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু আমরা যে আর্য্য ঋষিগণের প্রসঙ্গ করিতেছি তাঁহারা শাস্ত্র চিন্তায় ও জ্ঞানোন্নতি সাধনে যাদৃশ সক্ষম হইয়াছিলেন এই সকল ইউরোপীয় মনীষিগণ সে সম্বন্ধে তাঁহা-

দের নিকটস্থ হইতেও সমর্থ নহেন। কমত বা মিল, গ্যালিলিও বা নিউটন কেহই হিন্দু অধ্যাপকগণের ন্যায় উচ্চতা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। হিন্দু ঋষিগণ যে সময়ে এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের যে ক্ষীণ দশায় যে সকল মহৎ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, অধুনা ইউরোপীয় চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ যদি তাহার কিয়দংশ আবিষ্করণে সমর্থ হন, তাহা হইলে অবশ্যই প্রশংসা বণ্টন সময়ে আর্য্য কোবিদগণের চরণোদ্দেশে স্তুতি-পরিমল পূর্ণ ভক্তি-সালিকা সাদরে সমর্পিত হইবে সন্দেহ নাই। হিন্দু যাহা দশসহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্থির করিয়াছে, আজি তুমি তাহার কিয়দংশ স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছ বলিয়া তোমাকে কৃতজ্ঞতার উচ্চ সিংহাসনে কেন বসাইব? কিন্তু হিন্দু যাহা যাহা দশসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন তুমি আমি এখনও কষ্টে সৃষ্টে তাহার কিয়দংশও স্থির করিতে সমর্থ নহি কেন? তাহার একই উত্তর। হিন্দু যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু তুমি আমি যাহা আলোচনা করি তাহাতে বহু বিষয়াবিষ্ট চঞ্চল ও ব্যাকুল চিত্ত আমরা স্থিরভাবে সংযোগ করিতে সমর্থ হই না। তাহার ফল—একপক্ষে জ্ঞানোন্নতি কল্পনার অতীত, অপর পক্ষে জ্ঞানোন্নতি ধীর ও মন্থরগামী। তবেই দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রচিন্তা কেবল স্বহস্তে রাখিয়া জগতের এবং মানব সমাজের অতুলনীয় হিত সাধিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যদি তাদৃশ শুভ সাধনোদ্দেশে ভোগ বাসনা সমূহ বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর মস্তিষ্ক বিলোড়নে নিরত না থাকিতেন, তাহা হইলে আজি এই নির্জ্জীব, ক্ষীণ, পরাধীন ভারত কি লইয়া গর্ব্ব করিত ও কি দেখাইয়া জগৎকে বিমোহিত করিত? ভারত পরাধীন হউক, ভারতের সন্তান দুর্ব্বল বলিয়া দলিত হউক, কুশাসনে বা সুশাসনে ভারত জ্বালাতন বা সুখী হউক, নির্ধনতা হেতু ভারতবাসী হাহাকার করুক ভারতের পূজ্যপাদ অতুলনীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী যে রত্নরাশি রাখিয়া গিয়াছেন, রাজা বা রাজপ্রতিনিধি, দস্যু বা দুরাচার, দারিদ্র্য বা দুঃখ কিছুই তাঁহার কণিকাও অপচয় করিতে সমর্থ নহে। মেকলে তীব্রস্বরে ভারতসন্তানকে গালি দিউক, ব্রাম্সন অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ করিয়া আপনার অসারতার পরিচয় দিউক, তাহাতে ভারতবাসীর ক্ষতি নাই। আর্য্যঋষিগণের যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁহাদের ক্ষীণ সন্তানগণ আপনার বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে, শত মেকলের কটূক্তি বা সহস্র ব্রাম্সনের অযথাভাষণে তাহার ধ্বংশ হইবে না।

এক্ষণে আমরা শেষ মীমাংসা করিতেছি যে, ব্রাহ্মণগণেব প্রাধান্য সম্বন্ধে যাঁহারা বিরোধ মত ব্যক্ত করেন তাঁহারা ভ্রান্ত এবং ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ প্রাধান্য অত্যাচার মূলক নহে, কেবল পরোপকার প্রবৃত্তি দূরদৃষ্টি, ও অভিজ্ঞতার ফল।

আমরা যতদূর আলোচনা করিলাম তাহাতে এই বুঝিতেছি যে, জ্ঞান ও বুদ্ধি হিন্দুগণ মহচ্চিন্তায় নিযুক্ত করিয়া অপরিসীম মানসিক উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা চিত্তকে নিরন্তর ধর্ম্ম সুধাপানে ও জ্ঞানামৃত সেবনে বিভোর করিয়াছিলেন। অন্যান্য জাতির ইতিহাস ও চরিত্র যেরূপ নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের

কলঙ্কপূর্ণ কাহিনী ঘোষণা করে, তাঁহাদের ইতিহাস ও চরিত্র তাদৃশ কলঙ্কে কলঙ্কিত নহে।

রোম, গ্রীস, চীন, তাতার প্রভৃতি দেশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া প্রস্তাব পল্লবিত করিবার প্রয়োজন নাই। ভারত-বর্ষের সহিত মুসলমান ও ইংরাজের ভিন্ন আর কোন জাতির বিশেষ সম্বন্ধ নাই। মুসলমান বহুদিন ভারত-ভাগ্য-চক্র স্বেচ্ছায় আবর্ত্তিত করিয়াছেন, এবং ভারত-বক্ষে আপনাদের অনেক কীর্ত্তি-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধ চিরকাল স্মৃতির সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পর সুদূর সমুদ্রান্তবাসী ইংরাজগণ ভারতা-দৃষ্টের নিয়ন্তা হইয়াছেন এবং তাঁহারাও অমপের চিহ্নে আপনাদের বিদ্যমানতা চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিতেছেন। এই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন ভাষাবলম্বী, ম্লেচ্ছ ভাবা-পন্ন জাতিদ্বয় আর্য্য-সন্তানগণের অদৃষ্টনেমি বহুদিন পরিচালিত করিতেছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ক্রমশঃ এই জাতিদ্বয়ের কে কাহার নিকট নিষ্ঠুরতায় হারি মানেন তাহার পরিচয় দিব। ইতিহাস আমাদের সাক্ষী। ইতিহাসের সত্য-সংঘোষক পবিত্র পত্রে যে যে কলঙ্ক-কালিমা এই জাতিদ্বয়ের বিরোধে সাক্ষী স্বরূপে দণ্ডায়মান আছে, তাহাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ক্রমশঃ সঙ্কলিত হইবে। (ক্রমশঃ)

মা ও মেয়ে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামচরণ ডাক্তারের কীর্ত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সন্নিহিত গ্রাম সকলের দরিদ্র অধিবাসিবৃন্দ ভয়ে বড় একটা কোন কথা বলিত না, এবং জানি-য়াও জানিত না। কিন্তু এখন তাহাদের ভয় অনেকটা ঘুচিয়াছে। ভয় দূর হই-বার এক প্রধান কারণ হেমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের ভরসা। তাহারা বুঝে ও জানে যে হেমেন্দ্র বাবুর তুলনায় রামচরণ ডাক্তার একটা কীটমাত্র। সেই হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় যখন ডাক্তারের বিরোধী, তখন ডাক্তা-রের আর নিষ্কৃতি নাই। তাহারা বহুকাল ধরিয়া ডাক্তারের নানা অত্যাচার দেখি-য়াছে ও নীরবে সহ্য করিয়াছে। বহুকালের অন্তর্যাতনা এখন ব্যক্ত করিবার সুযোগ হইয়াছে। তাদৃশ সুযোগ হইয়াছে বলিয়া আজি চারি পাঁচখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বাসী নরনারী কেবল রামচরণ ডাক্তারের চরি-ত্র, তাঁহার দুষ্কৃতি ও তৎকৃত অত্যাচা-রের আলোচনা করিতেছে। তাই বলি-তেছি, আজি রামচরণ ডাক্তারের কীর্ত্তি বড় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আজি ঘাটে পথে কেবল ভাগ্যবান রামচরণ ডাক্তা-রের কথা। রামচরণ ডাক্তারকে হেমেন্দ্র বাবু ধরিয়া লইয়া লইয়া গিয়াছেন; সে বেত খাইতেছে, সে ক্ষতবিক্ষত-কায় হইয়াছে; সকল লোকের মুখে কেবল এইরূপ প্রসঙ্গ।

কেবল রূপনগরে রামচরণের ভবনের

অনতিদূরস্থ একটী ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে অন্ত ভাব। তথায় এক সুন্দরী কামিনী অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যাকুল ভাবে গৃহমধ্যে বেড়াইতেছেন, থাকিয়া থাকিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, আবার তখনই দ্বার বন্ধ করিতেছেন। তাঁহার হস্তের অঙ্গুলি সকল আপনা আপনি নড়িতেছে, সমস্ত দেহটা এক একবার কম্পিত হইতেছে। বহু রোদন হেতু তাঁহার লোচন রক্তবর্ণ হইয়াছে। তিনি ক্ষণে ক্ষণে সজোরে গৃহ মধ্যস্থ যে কোন সামগ্রীকে উত্তর হস্তে ধারণ করিতেছেন এবং ছাড়িয়া দিতেছেন। তাঁহার অস্থিরতার সীমা নাই।

এই কামিনী ক্ষীণাঙ্গী। তাহার দেহের বর্ণ চম্পকের ন্যায় সুগৌর, লোচনদ্বয় আয়ত ও সতেজ। মুখশ্রী অনুপম। সুন্দরীর হৃদয়ে বিজাতীয় জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন তাঁহার বদন পরিব্যক্ত করিতেছে। তিনি অস্থিরতা সহকারে আবার একবার দ্বার খুলিলেন, একবার চারিদিকে চাহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখনই আবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি দ্বার বন্ধ করার অত্যাল্প কাল পরেই দ্বারে মৃদু আঘাত হইল। বাহির হইতে কি বলিল,—

"দরজা খোল।"

কামিনী ব্যস্ততা সহকারে দ্বার খুলিল এবং দ্বার খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—

"কি দেখিলে? কেমন আছেন? মারিয়াছে কি? বড় কষ্ট পাইতেছেন কি? ধরিয়া রাখিয়াছে নাকি?"

যে স্ত্রীলোক সেই ঘরে প্রবেশ করিল, সে প্রথমে স্থির হইয়া বসিল, তাহার পর বলিল,—

"আছেন ভাল।"

কামিনী আবার জিজ্ঞাসিল,—

"আসিতেছেন না কেন? তাঁহাকে কি সাজা দিয়াছে? লোকে বলিতেছে, তাঁহাকে মারিয়া জখম করিয়াছে। কেদারের মা, সত্য করিয়া বল,তাঁহাকে কেমন দেখিলে?'

"তাঁহাকে মারে নাই, জখমও করে নাই। অপমান, তিরস্কার অনেক করিয়াছে। আজি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। বৈকাল বেলা হয় ত আসিবেন।"

তখন কামিনীর হৃদয়-জ্বালা অনেক শান্ত হইল। সে 'অঃ' বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার অস্থিরতা অনেক কমিয়া গেল। তখন সে বলিল,—

"হে ভগবান, একষ্ট তো আর সহে না! যাহাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া ভাল বাসি, যাহাকে সতত হৃদয় মধ্যে রাখিতে পারিলেও তৃপ্তি হয় না, তাহার কষ্টের সংবাদে প্রাণ যায় যে।'

কেদারের মা বলিল,—

"তুমি তো তাঁর জন্য মর, কিন্তু তিনি তোমার কে? তুমি বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা। কত লোভ দেখাইয়া, কত প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া তিনি তোমার ধর্ম্ম, কুল, মান সকলই নষ্ট করিয়াছেন। তোমার আশা কি? তাঁহার নিকট হইতে তেমনি ভালবাসা তুমি চাও। ফল কি দাঁড়াইয়াছে? তুমি এখন দুই দিন অন্তরও তাঁহার একবার সাক্ষাৎ পাইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে কর। তিনি এখন তোমার কাছে আসিতে হইলে ত্যক্ত হন। তাঁহার মন এখন কেবল নূতন নূতন ফুলের মধু খাইতে ব্যস্ত, তিনি এখন কেবল নূতন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, তাঁর জন্য মর কেন?"

কামিনী অনেকক্ষণ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল। তাহার পর বলিল,—

"আমি মরি কেন জানিনা। কে জানে রামচরণ আমার হৃদয়ে কি আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে? আমি এক দণ্ড রামচরণকে না দেখিতে পাইলে সংসার অন্ধকার দেখি—রামচরণ আমার সর্ব্বস্ব। সেই রামচরণ আমাকে মাথায় করিয়া আনিয়া পা দিয়া ছানিতেছে। রামচরণ আমাকে স্বর্গে তুলিয়া এখন একেবারে নরকে ফেলিয়া দিতেছে। রামচরণ এখন আমার পানে একবার ফিরিয়া তাকাইতেও চাহে না—আমি এখন তাহার চক্ষের বিষ হইয়াছি।"

"রামচরণ যদি এখন তোমাকে ঘৃণা করে বুঝিয়াছ, তবে আর তাহার ভাবনা ভাবিয়া শরীর পাত করিওনা। সে শঠ, সে প্রবঞ্চক। কেবল পর মজানই তাহার কাজ। তাহাকে ক্রমে ক্রমে ভুলিতে—মন হইতে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা কর।"

কামিনী বস্ত্রাঞ্চলে নয়নমার্জ্জন করিয়া বলিল,—

"তাহাকে ভুলিব—তাহাকে মন হইতে দূর করিব কেমন করিয়া? হৃদয় চিরিয়া ফেলিলেও তাহা হইতে রামচরণের মূর্ত্তি নষ্ট হইবে না তো। রামচরণকে ভুলিতে পারিব না; রামচরণের নাম, আমার জপ-মালা। তাহার মূর্ত্তি আমার দিবানিশির ধ্যান। আমি তাহাকে ভুলিতে পারিব না। কিন্তু রামচরণের ব্যবহার আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি যাহাকে এমন করিয়া প্রাণ লুটাইয়া ভাল বাসি, আমি যাহার প্রেমের জন্য ধর্ম্ম, কুল, মান সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছি, যাহার চরণে আমি পোষা কুকুরের ন্যায় সতত অনুগত হইয়া থাকি, সে যে আমাকে এমন করিয়া ঘৃণা করে, আমাকে আর পায়ের নখেও স্থান দেয় না, এ কষ্ট আর সহিতে পারি না।"

কামিনী যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেই খানেই বসিয়া পড়িল এবং বসিয়া বসিয়া অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। কেদারের মা বলিল,—

"তুমি ধন্য তাই রামচরণের এই ব্যবহার এতদিন সহ্য করিতেছ। এ জন্য যা হয় একটা উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। রামচরণ তোমাকে যেমন জ্বালাইতেছে, তার তেমনি সাজা হওয়া আবশ্যক। সে যা হয় পরে করিও। এখন উঠ, হাত মুখ ধোও, খাওয়া দাওয়ার চেষ্টা দেখ। আমি এখন আসি।"

কেদারের মা চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা অপরাহ্ন। সূর্য্য পশ্চিমাকাশের নিম্ন ভাগে ঢলিয়া পড়িয়া ক্রীড়াশীল বালকের ন্যায় লালরঙ্গের মেঘের সহিত খেলা করিতেছেন। তাঁহার সমুজ্জ্বল হাস্য এখন আর সমতল ও নিম্নভূমি সকল দেখিতে পাইতেছে না। বৃক্ষ চূড়া, প্রভৃতি উন্নত অবস্থাপন্ন পদার্থপুঞ্জই অস্তোন্মুখ সূর্য্যের প্রশান্ত হাস্য জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিতেছে।

সেই গৃহমধ্যস্থ শয্যায় কামিনী অধোবদনে শুইয়া আছে। তাহার লোচন দিয়া অবিরল জল পড়িয়া উপাধান সিক্ত করিতেছে।

রামচরণ ডাক্তার হেমেন্দ্র নারায়ণের নিকট অব্যাহতি লাভ করিয়া রূপনগর আসিয়াছেন কিন্তু তিনি কামিনীর নিকট আইসেন নাই। কামিনী ভাবিয়াছিল, রামচরণ রূপনগরে আসিয়াই শত কর্ম্ম ফেলিয়া অগ্রে তাহার নিকট আসিবেন। তাহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। রামচরণ বেলা ১০টার সময় রূপনগর আসিয়াছেন, এখনও তাঁহার সাক্ষাৎ নাই। কামিনী আরও ভাবিয়াছিল, তিনি না জানি কতই লজ্জিত হইয়াছেন। হয়ত তিনি আমার নিকট কথা কহিতেই কাতর হইবেন। আমি তাঁহাকে কোন অনুযোগ করিব না। তিনি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলেই আমি পরম লাভ জ্ঞান করি, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই আমি স্বর্গ-সুখ মনে করি। তাঁহার যত দোষ থাক্, তিনি আমার দেবতা তাঁহাকে দোষের কথা বলিয়া লজ্জা দিব না।

কামিনী অনেক আশা করিয়াছিল। অনেক আশায় অনেক ছাই পড়িয়াছে। কোমল হৃদয়ের স্থিরতা, দৃঢ়তা কতক্ষণ থাকে? কামিনী হতাশ হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কামিনীর যখন এই অবস্থা তখন অতি ব্যস্ততা সহকারে সেই ঘরে এক জন লোক প্রবেশ করিল। সে রামচরণ। রামচরণের আগমন মাত্র কামিনী প্রথমে ঘাড় তুলিয়া দেখিল লোকটা কে? সে রামচরণকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া দৌড়িয়া আসিয়া রামচরণের গলা জড়াইয়া ধরিল এবং বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে যত অভিমান ছিল, একটু একটু করিয়া মনে যত রাগ জমিতেছিল, সকলই উড়িয়া গেল।

রামচরণ গলা হইতে কামিনীর হাত ছাড়াইল এবং কামিনীর শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিল। বলিল,—

"আমার কাজ আছে। আমি এখনই যাইব। তুমি ভাল আছ তো?"

কামিনী আবার চক্ষুর জল মুছিল। সে বহুদিন হইতে রামচরণের অনাদর ভুগিয়া আসিতেছে। সুতরাং অনাদর তাহার পক্ষে নূতন নহে। কিন্তু আজি—এই বিপদের পর—এত অপমানের পর—কতদিনের পর কামিনী ভাবিয়াছিল রামচরণ তাহার প্রতি হতাদর করিবে না, রামচরণ তাহাকে মনের সমস্ত জ্বালা জানাইবে এবং সহানুভূতি পাইয়া শান্ত হইবে। রামচরণের কথার ভাব শুনিয়া কামিনী বুঝিল, আজিও রামচরণ সেই রামচরণ। প্রণয়ের সুশীতল সলিল সিঞ্চনে তাহার বিশুষ্ক হৃদয় আজি কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইবে বলিয়া সে আশা করিয়াছিল। বুঝিল আশা সফল হইবে না। এ বুঝা আজি নূতন নহে। বহু দিন—বহুদিন ধরিয়া কামিনী রামচরণের উপেক্ষা, অনাদর ভুগিতেছে। বহুদিন বহু আশায় সে হতাশ হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া তাহার কাতর হৃদয় ক্ষত বিক্ষত ও মথিত হইয়াছে। আজি তাহার সেই ক্ষত বিক্ষত হৃদয় আরও একটু ক্ষত হইল মাত্র। সমুদ্রে শিশির সম্পাতবৎ তাহা গণনায় আইল না। কামিনী বলিল,—

"প্রাণ আমার তোমার ভাবনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। আমি এ কয়দিন স্নান করি নাই, আহার করি নাই, নিদ্রা যাই নাই। তুমি দু দণ্ড বইস, তোমাকে দেখিয়া আমি প্রাণ জুড়াই।"

রামচরণ বলিল,—

"আমার ভাবনায় তুমি স্নান আহার কর নাই, সে তোমার নিতান্ত বোকামি। আমার জন্য ভাবনাটা কি? আমি মরিয়াছি কি? কোন্ বেটাই বা এমন আছে, যে আমাকে কোন কথা বলে? তুমি কি ভাব আমি ছোট লোক?"

কামিনী বলিল,—

"ঈশ্বর করুন তোমার যেন কখন কোন বিপদ না হয়। তুমি যেন অক্ষয় পরমায়ু লইয়া সুখে থাক। লোকে নানা কথা বলে সেই সব শুনিয়াই ভয় হয়, ভাবনা হয়।"

রামচরণ বিরক্ত হইল। বলিল,—

"লোকে কি বলে? লোকে বলে আমি সোহাগীবৈষ্ণবীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, কেমন? খুব করিয়াছি—আবারও করিব। তুমি লোকের কথা শুনিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ। ভাবিয়াছ রামচরণ তোমার হাত ছাড়া হইয়া গেল। কেন রামচরণ কি তোমার কেনা গোলাম? আমি কি খতে পত্রে তোমার কাছে বিকিয়ে আছি? আমি যেখানে খুসি যাইব, যা খুসি তাই করিব, তাতে তুমি কথা কইবার কে? তুমি খাবে, পর্‌বে, থাক্‌বে। আমার উপর হুকুম চালাইতে, বা আমার কথায় কথা কহিতে তোমার ক্ষমতা নাই।"

কামিনী সমস্ত শুনিল। ভাবিল হৃদয় ফাটে না কেন? মানুষ এতও সহিতে পারে? অনেক ক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল,—

"রামচরণ, প্রাণনাথ! অদৃষ্টে এত কষ্ট লেখা ছিল, তাহা আমি জানিতাম না। আমি তোমাকে যে রকম ভাল বাসি তাহা অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কে জানিবেন। হৃদয় যদি দেখাইবার হইত, প্রাণের কথা যদি জানাইবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে রামচরণ, তোমাকে আমার হৃদয়ের ভাব দেখাইতাম, প্রাণের কথা জানাইতাম। আমি হতভাগিনী। দুঃখে আমার জন্ম। আমি অতি বাল্যকালে বিধবা হইয়াছি। ধর্ম্ম, কুল, মান সকলই বিসর্জ্জন দিয়া আমি তোমাকে প্রাণ লুটাইয়া ভাল বাসিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম—তোমার প্রথমকার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, যে আমার দুঃখময় অদৃষ্টে এতদিনে সুখ দেখা দিল। আমি অতুল সুখ-সাগরে ভাসিলাম। কোন ক্ষতিই আমার ক্ষতি বলিয়া মনে হইল না। আমি তোমার কথায় ভুলিয়া, তোমার ফাঁদে পড়িয়া, তোমার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। কিন্তু রামচরণ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি এখন আমার কি দুর্দ্দশাই না করিতেছ? তুমি আমাকে হৃদয়ের হৃদয়ে রাখিব বলিয়া আশা দিয়াছিলে—মনে পড়ে কি রামচরণ? তুমি আমাকে হৃদয়ের একমাত্র রাণী করিবে বলিয়াছিলে—সে কথা মনে আছে কি রামচরণ? তুমি আমার প্রেমের চিরদিন অধীন ও অনুগত থাকিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিলে, কত আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দিয়াছিলে, কত ফাঁদ পাতিয়াছিলে—তাহার কিছুই কি মনে নাই রামচরণ? মনে থাকুক বা না থাকুক, আমি তোমাকে সকল কথা মনে করাইয়া দিতে চাহি না। আমি মন্দভাগিনী—তত সুখে আমার কাজ নাই—আমার তত আশা নাই। কিন্তু রামচরণ, ধর্ম্ম মাথার উপর আছেন। একবার ভাবিয়া দেখ তুমি আমার কি দুর্দ্দশা না করিতেছ? আমি তোমার হৃদয়-রাজ্যে রাণী হইতে চাহি না।

দিনান্তে তোমার চরণ একবার দেখিতে পাইলেই আমি সুখী হই। তুমি সে দেখা দেও কি? দেও না। তোমার মুখে দুইটা মিষ্ট কথা শুনিলে আমি কৃতার্থ হই। তুমি মিষ্ট কথা বলা দূরে থাক, কেবল ঘৃণা, তিরস্কার ও জ্বালার কথা ছাড়া আর কিছু বল কি? বল না। রামচরণ, আমি মানুষ —ক্ষুদ্র মেয়ে মানুষ। আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণে আর কষ্ট সহে না। আমি তোমার পায়ে পড়ি, রামচরণ, হয় আমাকে বধ করিয়া সকল জ্বালার শেষ করিয়া দেও, নয় প্রাণেশ্বর, হৃদয়-দেবতা, আমাকে সুখী কর, আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর।"

এই বলিয়া কামিনী রামচরণের চরণ ধরিয়া বসিয়া পড়িল, এবং অবিরল ধারায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া তাহার চরণ সিক্ত করিতে লাগিল।

পাষাণ—ভীষণ পাষাণময় রামচরণের হৃদয় বিগলিত হইবার নহে। রামচরণ কামিনীর হস্ত হইতে পা ছাড়াইয়া লইল এবং বলিল,—

"কামিনি! তোমার অন্যায় কথা আমি কেমন করিয়া শুনি। আমি তোমাকে কোন্ বিষয়ে অসুখী করিয়াছি বল। আমি তোমাকে আনিয়াছি সত্য—কিন্তু তুমি না আসিলে তোমাকে ধরিয়া আনি নাই। তোমার খাওয়া পরার কোন কষ্ট নাই। গহনা প্রভৃতিতে আমার যেমন ক্ষমতা তোমাকে দিয়াছি, তবে তোমার অসুখ কি? তুমি হাতি ঘোড়া চাহিলে আমি কেমন করিয়া দিব।"

"প্রাণনাথ! ছি, ছি গহনা প্রভৃতির জন্য তোমার এ দাসী কাঁদিতেছে না। তাহা আমি চাহি না। খাওয়া পরা তাহাতেও আমার প্রয়োজন নাই। আমি উপবাস করিয়া থাকিতে হইলেও কাতর হইব না। আমার ভিক্ষা কি? দাসী কেবল তোমাকে চাহে; এ সংসারে, তুমি ছাড়া আর কোন পদার্থে তাহার লোভ নাই। আর তুমি তাহাকে যাহা দিয়াছ, তাহা ফিরাইয়া লও, সে সকলের জন্য সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাসও ত্যাগ করিবে না। তাহার একমাত্র প্রার্থনা—তুমি তাহার হও।"

রামচরণ হাঃ হাঃ শব্দে হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল,—

"মন্দ নয়। এ সুখের সংসার, এ চাঁদের হাট-বাজার, আমি তোমার জন্য ছাড়িয়া দিই। আমি তোমাকে খাইতে দিই, পরিতে দিই তুমি আমার হইয়া থাকিবে, আমার সুখের জন্য তুমি। তোমার হুকুম মতে আমি চলিব, এ আশা তুমি ত্যাগ কর। এ সংসারে তোমার ন্যায় শত শত মেয়ে মানুষ গড়াগড়ি যাইতেছে। আমি কেবল তদ্গত চিত্তে তোমাকেই ধ্যান করিব, এমন আশা যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তবে তোমার ভুল হইয়াছে। যাহা হইবে না, যাহা হইবার নহে, তাহা ভাবিয়া যদি তুমি মনকে কাতর কর, সে দোষ আমার নহে।"

আবার কামিনী নীরবে সমস্ত কথা শুনিল। আবার ভাবিল, মানব-হৃদয়ে এত কষ্টও সহে। বলিল,—

"তবে—রামচরণ—তবে কি আমাদের প্রাণের ভালবাসা নয়? তবে কি আমাদের ভালবাসা বেশ্যার প্রেম। তবে কি আমি, ডাক্তার বাবু, তোমার নিকট গহনার লোভে, খাওয়া পরার লোভে, সতীত্ব, ধর্ম্ম, কুল, মান বিক্রয় করিয়াছি? তবে তোমার উপর আমার অন্য দাবি দাওয়া কিছুই নাই কি?

তবে, রামচরণ, তবে কি আমি তোমার বেশ্যা মাত্র?"

রামচরণ হাসিয়া বলিল,—

"কেমন করিয়া, কি বলিব বল? কে জানে তুমি মনে মনে কত কি ভাব। এখন আমি চলিলাম। আমার দরকার আছে। আবার দেখা হইবে।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রামচরণ ডাক্তার চলিয়া গেল। উত্তরের অপেক্ষা করিলেও উত্তর দিত কে? কামিনীর চৈতন্য তখন কামিনীতে নাই। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কামিনী চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিল ঘরে আর কেহ নাই। তখন উর্দ্ধ-নেত্র হইয়া করজোড়ে কামিনী বলিল,—

"হে দয়াময়, হে পতিতপাবন, হে অনাথনাথ ভগবান্, এ ধর্ম্মহীনা, পতিতা, ভ্রষ্টার প্রার্থনা তুমি শুনিবে কি? হে বিধাতঃ, এ জ্বালা আর সহেনা। দয়াময়! দয়া করিয়া এ দুঃখিনীর জীবনের শেষ করিয়া দাও। মৃত্যু! আমাকে তোমার আশ্রয়ে লইয়া যাও। রামচরণ—পাপিষ্ঠ নরাধম রামচরণ, আমি ক্ষুদ্র বেশ্যা? আমার প্রেম কেনাবেচার সামগ্রী? হৃদয়ের হৃদয় হইতে পবিত্র প্রেম আমি তোমাকে অকাতরে দান করিয়াছি। তুমি মূর্খ, তুমি শঠ, তুমি আমাকে বেশ্যা বলিয়া মনে কর। তোমার প্রদত্ত ভূষণ এই ত্যাগ করিলাম, তোমার বস্ত্র আর পরিধান করিব না, তোমার পাপ অন্ন ইহজীবনে আর উদরে দিবনা। রামচরণ, প্রবঞ্চক জানিও আর আমি তোমার প্রেমের ভিখারিণী নহি। আজি হইতে, রামচরণ—আজি হইতে এই পদ-বিদলিতা, ব্যথিতা কামিনী তোমার প্রবল শত্রু হইল। প্রতিজ্ঞা করিলাম তোমার চক্ষে জল দেখিয়া, তোমাকে যন্ত্রণায় ছটফট্ করাইয়া, তোমার পাপের সমুচিত শাস্তি দিয়া আমি ইহজগত হইতে প্রস্থান করিব।

ক্রমশঃ।

খদ্যোৎপুঞ্জ।

সুদিন ও কুদিন।—মানবের সৃষ্টি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত তাহারা স্থানভেদে ও প্রকারভেদে কোন না কোন কুসংস্কারের দাস রহিয়াছে। হাজার উপদেশ দেও, হাজার বক্তৃতা কর কুসংস্কার এককালে তিরোহিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। শুভ দিন ও অশুভ দিন সম্বন্ধে মানুষ অনেক দিন হইতে নানা দেশে নানা প্রকার কুসংস্কারাবদ্ধ হইয়া আছে। মিসর দেশীয় রাজগণ সপ্তাহের তৃতীয় দিন নিতান্ত কুদিন বলিয়া মনে করিতেন এবং সে দিন কোন বিষয় কর্ম্ম করিতেন না ও সে দিন খাদ্য উদরে হজম হইবে না আশঙ্কা করিয়া সমস্ত দিন কিছু খাইতেনও না। বৃহস্পতি বারে আমাদের দেশে টাকার লেন দেন করা নিষিদ্ধ। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ এ নিয়মে সম্পূর্ণ রূপে

আস্থা না দেখাইলেও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ বৃহস্পতি বারে টাকা ঘরের বাহির করিতে নিতান্ত নারাজ। বৃহস্পতি বারের অপরাহ্ন সর্ব্ব প্রকার কার্য্যের পক্ষে অনুপযোগী বলিয়া লোকের বিশ্বাস এবং 'যদি পায় রাজ্য দেশ, তবু না যায় বিস্যুদের শেষ' ইহাই যাত্রা সম্বন্ধে শাসন। এথিনিয়গণও বৃহস্পতি বারকে ভাল দিন বলিয়া বিশ্বাস করিত না। সে দিন কোন প্রকাশ্য সভা অথবা তথাবিধ ব্যাপার উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই দিন পিছাইয়া দিত। বার্জ্জিল (Vergil) মাসের পঞ্চম দিবস নিতান্ত কুদিন এবং সর্ব্বকার উদ্যমের অনুপযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীসীয় কবিগণ মাসের ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১১শ এবং ১২শ দিন শুভ দিন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রোমীয় পঞ্জিকার শুভ দিন ও অশুভ দিন ক্রমান্বয়ে শ্বেত ও কৃষ্ণ চিহ্নে চিহ্নিত থাকিত। সম্রাট্ অগষ্টস্ নোনেস্ (None's) * দিবসে কোন কর্ম্ম করিতেন না।

এক বারে সম ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটায় লোকের মনে বদ্ধ সংস্কার হইয়া যায়। নিম্নে এতাদৃশ ঘটনা জনিত সংস্কারের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

৮ই সেপ্তেম্বর দিবসে বাবিলন বাসীগণ সলোমনের মন্দির ভস্মীভূত করে। পুনরায় তাহা নির্ম্মিত হইলে সম্রাট টাইটস্ আবার ৮ই সেপ্তেম্বরে তাহা দগ্ধ করেন। সুতরাং ৮ই সেপ্তেম্বর দুর্দ্দিন বলিয়া পরিগণিত। টাইমোলিয়ন তাঁহার জন্ম বারে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যুদ্ধকালে সেই বারের প্রতীক্ষা করিতেন। পঞ্চম চার্লস্ সেণ্ট্ মেথিয়াসের (St. Mathias) দিনে, তৃতীয় হেনরি পেণ্টিকষ্টের (Pentecost) দিনে, পঞ্চম সিক্স্টস্ বুধবারে, ত্রয়োদশ লুই শুক্রবারে এবং ইংলণ্ডের ৭ম হেনরি শনিবারে সম্পত্তি ও সৌভাগ্যের অধিকারী হইতেন। ৪র্থ হেনরির জীবন কালে ১৪ই মে প্রায়ই মারাত্মক বিপদ উপস্থিত হইত।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া বোধ হয় যেদিন একের পক্ষে ভাল, সে দিন অপরের পক্ষে মন্দ। সুতরাং দিনের কোন মাহাত্ম্য আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সম ঘটনা কোন বিশেষ দিবসে একাধিক বার সংঘটিত হওয়ায় লোকের মনে সে সম্বন্ধে একটা বদ্ধমূল সংস্কার জন্মিয়া যায়। কিন্তু সমান তারিখে নিতান্ত বিপরীত ঘটনাও ঘটিতে দেখা যায়। যেদিন পম্পি জল দস্যু ও মিথ্ৰডেট গণকে পরাজিত করেন ঠিক পরবর্ষে সেই দিবস তিনি মিসরে হত হন। দশম লিও যে দিবসে বন্দী হইয়াছিলেন পরবর্ষে ঠিক সেই দিবস মহাসমারোহে স্বীয় পদে বরিত হন।

মহাতেজস্বী আলেকজান্দার এতাদৃশ কুসংস্কারের অধীন ছিলেন না। একবার তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষগণ বলিয়াছিলেন যে, 'জুন মাসে যুদ্ধারম্ভ করা নিষেধ এবং মাসিডনের ভূপতিগণ কখনও তাহা করেন নাই।' আলেকজান্দার তদুত্তরে বলিলেন; ঠিক কথা! সেই জন্যই আমি আদেশ করিতেছি যে, অতঃপর জুন মাসকে দ্বিতীয় মে মাস বলা হইবে।

* রোমকেরা মাস সকলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিত; যথা—কালেণ্ডস, (Calends) নোনেস (Nones) এবং আইডস (Ides)। মার্চ, মে, জুলাই এবং অক্টোবর মাসের ৭ই নোনেস হইত।

বর্ত্তমানকালে ইংলণ্ড যে এত উন্নতির স্পর্দ্ধা করেন, তথাপি তিনিও কুসংস্কারের হস্ত হইতে এককালে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। এখনও স্থানে স্থানে, ভিতরে ভিতরে শুক্রবার ও মাসের ১৩ই তারিখ ভাল দিন নয় বলিয়া নিগৃহীত হয়।

——০•——

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়।"— পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় সকলেই জানেন। আমরা একবার এক পণ্ডিত মহাশয়কে বোধোদয়ের ১ম পাঠের নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছি :—

"আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদায়কে পদার্থ কহে।"

পণ্ডিত মহাশয়ের অর্থঃ—

"ইস্তক জুড়িচড়া তেল চুক্‌চুকে বাবু, নগাইদ রামী ভিখারিণী সকলেরই নাম পদার্থ।"

"পদার্থ ত্রিবিধ; চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ।"

পণ্ডিত মহাশয়ের অর্থঃ—

'বাবু হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত যত পদার্থ সকলেরই হয় চেতন, নয় অচেতন নয় উদ্ভিদ এই তিনের কিছু না কিছু হইতেই হইবে।'

"যে সকল বস্তুর জীবন আছে এবং ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে তাহারা চেতন পদার্থ।"

পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাখ্যাঃ—

'যাহাদের ধড়ে প্রাণ আছে, অর্থাৎ অন্যায় দেখিলে সহিতে পারে না, গালি দিলে রাগ করে, পড়িয়া মারি খায় না, নিজের খুসিতে কাজ করে, নিজে রোজকার করিয়া নিজে খায়, দশজন লোক তাহাদের মুখ চাহিয়া থাকে বই তাহারা কাহারও মুখ চাহেনা, পা থাকিতে খোঁড়া হইয়া গাড়ি চড়ে না, মুখে যাহা বলে কাজে তাহা করে, পরের মুখে ঝাল খায় না এবং নিজের ক্ষমতার উপর অধিক ভরসা করে, তাহাদের নাম চেতন পদার্থ।'

"যে সকল বস্তুর জীবন নাই, যেখানে রাখ সেইখানে থাকে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না, উহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে।"

পণ্ডিত মহাশয়ের অর্থঃ—

যাহারা মুখে ভাত তুলিয়া না দিলে খাইতে পারে না, যতক্ষণ কেহ অনুগ্রহ না করে ততক্ষণ যেখানে ফেলিয়া রাখ সেইখানেই পড়িয়া থাকে, মারিলেও কথা কয় না, নিজের ভাল নিজে বুঝিতে পারে না, যেমন করিয়া চালাইবে ঠিক তেমনি করিয়া চলিবে, পেটের ভাত কেহ না দিলে জুটাইতে পারে না, কেহ জোর দিলে তবে জোর পায়, আফিসের সাহেব ঝাঁটার জোর দেখাইলে তবে কলম চালায়, মদ পেটে গিয়া জোর করিলে তবে নড়ে চড়ে —কথা কয়, গৃহিনী লাথির জোর দেখাইতে পারিলে তবে ভিজেবিড়াল হয় এবং কিছুই জোর না করিলে যাহারা কিছুই করিতে পারে না, তাহারা অচেতন পদার্থ।"

একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্র বলিল,—

"পণ্ডিত মহাশয়! তবে তো ইতস্ততঃ অচেতন পদার্থই অনেক?"

পণ্ডিত বলিলেন,—

"তা আর বলিতে? এদেশটাই অচেতন পদার্থের দেশ বাপু। দৈবাৎ দুই

একটা চেতন পদার্থ দেখা যায়। তাহার পর শুন।"

"যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহারা উদ্ভিদ পদার্থ।"

পণ্ডিতের ব্যাখ্যা :—

'যাহাদের সুবিধামত জন্ম হওয়ায় খাওয়া দাওয়ার ভাবনা ভাবিতে হয় না, কোন দায়ে ঠেকিতে হয় না, চলিয়া বেড়াইবার বা নড়িবার চড়িবার দরকার হয় না, দুটা কথাও নিজে বলিতে পারে না, অপরের চেষ্টায় কিম্বা বাপ পিতামহের অথবা শ্বশুর বা শ্যালক বা ভগ্নিপতির ধনে খায় পরে ও ব্যয় করে, সংসারের যত ঝঞ্ঝাট আছে তাহার কাছেও যায় না, দিব্য নির্ভাবনায় শীতল হইয়া বসিয়া থাকে, এবং নিজে বড় একটা কাহার সহিত মিশেনা, আর অপরকেও আপনার সহিত মিশায় না, তাহারা উদ্ভিদ পদার্থ।'

সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্র আবার জিজ্ঞাসিল,—

"যদি কোন স্থানে এ তিন রকম ছাড়াও পদার্থ দেখা যায়, তাহাদের কি বলা যাইবে ?"

পণ্ডিত মহাশয়ের উত্তর,—

'এ তিন রকম ছাড়া আর পদার্থ নাই। তবে যদি দৈবাৎ কোথাও অন্য কোন রকম পদার্থ দেখিতে পাও, নিশ্চয় জানিও তাহা অপদার্থ।'

—০০—

প্রাতরুত্থান ও বায়ুসেবন।—অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করা আবশ্যক এবং তদনন্তর গৃহনিষ্ক্রান্ত হইয়া বায়ু সেবন করা বড় স্বাস্থ্যবর্দ্ধক বলিয়া চিকিৎসক মহাশয়েরা ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থা বিজ্ঞান শাস্ত্র মতে বিশেষ সুব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা ইহার বিপরীতই দেখি। যে সকল বিলাসী ধনী প্রত্যূষ কি পদার্থ তাহা কখন প্রত্যক্ষও করেন নাই তাঁহাদের অনেককেই আমরা দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, সুস্থ, সবলকায় এবং লাবণ্যযুক্ত দেখিতে পাই। যদি বল ধনিগণের অনেকেরই অকাল মৃত্যু ঘটে, তাহার উত্তরে আমরা এই বলিব যে, প্রায়ই তাঁহারা অনেকে যেরূপ নিরন্তর বহুবিধ মাদক সেবন, সতত কুসংসর্গ ও কদর্য্য চর্চ্চা এবং অপরিমিত রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি অত্যাচার করিয়া থাকেন, বোধ হয়, তাঁহাদের অকাল মৃত্যুর তৎসমস্তই কারণ।

যাহা হউক কলিকাতার বড় লোক (এখানে বড়লোক অর্থে, জ্ঞানে গুণে বড় লোক বুঝিতে হইবে, ধনে বড় নহে) মহলে প্রাতর্ভ্রমণটা বিশেষ চলিত। তাঁহাদের অনেকেই প্রত্যূষে বায়ু সেবন করেন। স্বর্গীয় কবি দীনবন্ধু মিত্রও 'ঊষার সমীর সেবন করিতে করিতে' ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বাটীতে গমন করিতেন, এ কথার পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে বিশেষ ব্যক্ত আছে। অতএব ভাল হউক, মন্দ হউক, আপাততঃ বোধ হইতেছে যে বড়লোক হইলেই প্রাতরুত্থান ও বায়ুসেবন বড় দরকার।

এক ব্যক্তি তাহার পুত্র বড় বেলায় উঠিত বলিয়া প্রথমতঃ স্বাস্থ্য ভঙ্গের ভয় দেখাইয়া, পরে অনুযোগ করিয়া পুত্রকে ভোরে উঠাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই ফল ফলিল না দেখিয়া ভাবিল লোভ দেখাইলে হয়ত সুফল ফলিবে। এই ভাবিয়া পুত্রকে বলিল, 'বাপু, তুমি

ভোরে উঠনা,—দেখদেখি কালি একজন ভোরে উঠিয়া যেমন রাস্তায় বেড়াইতেছে, অমনি পথের মধ্যে এক থলিয়া মোহর পড়িয়া পাইয়াছে। তুমি যদি প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া বেড়াও তাহা হইলে হয়ত তুমিও কোন দিন ঐরূপ মোহর পড়িয়া পাইতে পার।' সুবোধ পুত্র বলিল, 'বাবা, তবে তো ভোরে উঠা বড় দোষ। কারণ যে ব্যক্তি মোহর ফেলিয়া গিয়াছিল সে সকলের চেয়েই আগে উঠিয়াছিল। তাহার ফল এই হইল, যে বেচারার মোহর গুলি হারাইয়া গেল। সে যদি সকলের আগে না উঠিত তাহা হইলে হয়ত তাহার এ লোকসান্ ঘটিত না। অতএব সকলের পরে উঠাই সৎপরামর্শ।' পিতা নীরব।

—oo—

বিদ্যা ক্রয়।—রামহরি দাস নামক এক বর্ণজ্ঞান হীন গণ্ডমূর্খ ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। কিন্তু লোকটা নিতান্ত মূর্খ বলিয়া লোকে তাহাকে বড় একটা আদর অপেক্ষা করিত না। রামহরি যেমন করিয়া হউক, এবং যত টাকা ব্যয় করিয়াই হউক, পুত্র শ্যামলালকে বিদ্বান্ করিবার নিমিত্ত মনস্থ করিল। শ্যামলালের জন্য মাসিক একশত টাকা বেতনে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিল। একদিন রামহরি শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'পুত্র কেমন লেখা পড়া করিতেছে।' শিক্ষক মহাশয় বলিলেন,—'এক রূপ চলিতেছে বটে কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, বালকটীর একটুও মেধা নাই।' রামহরি বলিল, 'সে কি কথা? একটুও নাই কেন? যাহা নাই আজি বাজারের যে দোকান হইতে হউক, তাহা অনেক খানি কিনিয়া দেও। আমার ছেলের কিছু নাই বলিয়া কখন. কষ্ট না পায়।'

শিক্ষক মহাশয় এরূপ গণ্ডমূর্খকে বুঝাইয়া কি হইবে ভাবিয়া 'আচ্ছা' বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

এরূপ রামহরির সংখ্যা আমাদের দেশে অনেক। কিন্তু সকলে ধরা পড়েন না।

—oo—

বরফের পরিচালকতা।—বরফ যে এত শীতল তাহারও তাপ পরিচালন শক্তি আছে। লৌহ ও বরফ এই উভয় পদার্থ আপাততঃ কতই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাপ পরিচালন কার্য্যে বরফ লৌহ অপেক্ষা বড় কম শক্তিবান নহে। ডেপ্রেজ (Despretz) তাপ পরিচালকতা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের শক্তি পশ্চাল্লিখিত সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; স্বর্ণ ১.০০০, প্লাটিনম্ ৯৮১, রৌপ্য ৯৭৩, লৌহ ৩৭৪, এবং টিন্ ৩০৩। এই তালিকা অনুসারে বরফের তাপ পরিচালকতা নির্দ্দেশ করিতে হইলে ৩১৪ হয়।—এথেনিয়ম (Athenæum)

—oo—

নূতন দাস।—বাষ্প ক্রীতদাসের ন্যায় এপর্য্যন্ত মানবের মহোপকার সাধন করিয়া আসিতেছে। রেলের গাড়ি, জলের কল, ময়দার কল, তেলের কল, সুরকির কল, ছাপার কল, পাটের কল, বস্ত্রবয়ন কল প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই বাষ্প দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। সংক্ষেপতঃ বাষ্প আমাদিগকে খাওয়াইতেছে, পরাইতেছে, বেড়াইয়া আনিতেছে, শীতল করিতেছে এবং সর্ব্ব প্রকারে সুখে রাখিতেছে। এই বাষ্প

প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পাথুরিয়া কয়লার প্রচুর প্রয়োজন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত মৃদঙ্গার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তৎসমস্তের গর্ভ যেরূপ ক্রমশঃ ক্ষীন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অচিরকাল মধ্যে পৃথিবীতে মৃদঙ্গার ভাণ্ডার যে শূন্য হইয়া পড়িবে তাহার সন্দেহ নাই। তখন উপায় কি? বাস্তবিক এ বড় বিষম সমস্যা। ভবিষ্যতে কে মনুষ্যের দাসত্ব করিবে পণ্ডিতগণ এ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, তাড়িত সহায়ে বহুবিধ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারা যায় এবং বাষ্পের পরিবর্ত্তে তাড়িত সহজেই ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রধান অসুবিধা ব্যয়বাহুল্য। তাড়িত অবলম্বনে এপর্য্যন্ত যত যন্ত্র প্রস্তুতীকৃত হইয়াছে, তৎসমস্তেরই ব্যয় বাষ্পীয় যন্ত্রের অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং যতদিন তাড়িত যন্ত্রের ব্যয় বাষ্পীয় যন্ত্রের অনুরূপ না হইবে, ততদিন তাহা দ্বারা কোন রূপ উপকার প্রাপ্তির আশা নাই। তবে মানুষের দাসত্ব করিবে কে?

বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, সূর্য্যের তাপই সৌরজগতের যাবতীয় শক্তির প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কারণ। এই সৌরতাপ ভবিষ্যতে মানবের দাসত্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিলে করা যাইতে পারে। যতটুকু শক্তি দ্বারা এক পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধসের ভারী পদার্থ এক ফুট উর্দ্ধে উত্তোলন করা যায় তাহাকে ফুট্-পাউণ্ড (Foot-pound) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এক্ষণে যদি ৭৭২ ফুট্-পাউণ্ড পরিমিত সূর্য্যোত্তাপকে 'ক' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মিনিটে পৃথিবী সূর্য্য হইতে তাদৃশ ২,২৪৭ সহস্র কোটী "ক" পরিমিত তাপ প্রাপ্ত হইতেছে! কি ভয়ানক ও অচিন্তনীয় ব্যাপার! এই অপরিমিত তাপ শক্তির যদি অত্যল্পাংশও মানব বুদ্ধি দ্বারায় ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে যে মহান্ উপকার সাধিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। জন এরিসান (John Ericson) নামক পণ্ডিত এই অপরিমিত শক্তি কোন উপায়ে কার্য্যোপযোগী করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন।

জর্ম্মানি নিবাসী বর্গ (Bergh) নামক চিন্তাশীল পণ্ডিত এই বিষয়ে যে উপায় স্থির করিয়াছেন তাহার দ্বারা সূর্য্যোত্তাপকে অতি সহজেই কাজে লাগান যাইবে বলিয়া বোধ হয়। তিনি গন্ধকাম্ল (Sulphurous acid) ও সূর্য্যোত্তাপ এতদুভয়ের সম্মিলনে অসাধারণ শক্তি সমুৎপন্ন হইবার প্রক্রিয়া স্থির করিয়াছেন। বর্গ সাহেবের আবিষ্কৃত যন্ত্রে গন্ধকাম্ল বর্ত্তমান বাষ্পীয় যন্ত্রের জলের স্থান এবং সূর্য্যোত্তাপ মৃদঙ্গারের স্থান অধিকার করিবে। রাত্রে সূর্য্যোত্তাপের অভাব হওয়ায় যাহাতে কার্য্য হানি না হয়, তদর্থে বর্গ আঙ্গারিকাম্লের (Carbonic acid) সহায়তায় অতি সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছেন।

যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে বর্গ সাহেবের প্রদর্শিত প্রণালী অতি পরিষ্কার ও সহজ সাধ্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, অচিরকাল মধ্যে সূর্য্যদেবের কর মানবের সেবায় নিযুক্ত হইবে! কোথায় দশানন? কোথায় মেঘনাদ?

—oo—

ফুল ও এমোনিয়া।—বায়লেট্ (ঈষৎ

নীলের আভাযুক্ত লাল) রঙ্গের ফুলের গায়ে যদি চুরোটের ধূম দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার বর্ণ ক্রমশঃ সবুজ হইয়া উঠে। ফুলের বর্ণ যতই গাঢ় থাকে, তাহার পরিবর্ত্তিত সবুজ বর্ণও ততই গাঢ় হয়। চুরোটের ধূমে এমোনিয়া থাকে। সেই এমোনিয়াই পুষ্পের এতাদৃশ বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটাইবার হেতু। অধ্যাপক গব্বা (Gabba) নানা প্রকার পুষ্পের বর্ণান্তর সাধনে এমোনিয়ার কীদৃশ শক্তি তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এমোনিয়া সংস্পর্শে নীল, বায়লেট্ ও গোলাপী বর্ণের পুষ্প সবুজ, লাল ফুল কৃষ্ণবর্ণ এবং সাদা ফুল হরিদ্রা বর্ণ হয়। যে পুষ্পে বহুবিধ বর্ণ থাকে তাহার পরিবর্ত্তন দেখিতে বড়ই মনোরম। শীতল ও আবৃত স্থানে রাখিয়া দিলে পুষ্পের এতাদৃশ পরিবর্ত্তিত বর্ণ বহুকাল স্থায়ী হয়।—(*English Mechanic.*)

——oo——

দুগ্ধ।—দুগ্ধ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। এই দুগ্ধ যে নানা প্রকারে দূষিত হইয়া থাকে, আমরা প্রায়ই তাহা ভাবিয়া দেখি না, দুগ্ধ পাইলেই আমরা তাহা সাদরে সেবন করি। পণ্ডিত স্মি (A. H. Smee) দুগ্ধের গুণাগুণ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ গাভী যে ঘাস খায় তাহার দোষ গুণের সহিত তৎপ্রদত্ত দুগ্ধের দোষগুণের বিশেষ সম্পর্ক আছে। পরিষ্কৃত প্রান্তরজাত তৃণভোজী গাভীর দুগ্ধ ও মলিন, পূতিপূর্ণ নিম্নভূমিজাত তৃণাহারী গাভীর দুগ্ধে অনেক প্রভেদ। শেষোক্ত দুগ্ধ ৩৬ ছত্রিশ ঘণ্টার অধিক ভাল থাকে না। এবং তদুৎপন্ন নবনীত শীঘ্রই বিকৃত হইয়া যায়। তাহার পরে জল দেওয়া দুধ খাওয়া বিশেষ দোষ। একতঃ অনির্দ্দিষ্ট স্থানের অপরিষ্কৃত জল পান করা স্বাস্থ্য শাস্ত্রের বিশেষ বিরোধী, দ্বিতীয়তঃ কোন বিশেষ রোগ না থাকিলে জল সংযুক্ত দুগ্ধ পান করায় অনিষ্ট ঘটিবারই সম্ভাবনা। তাহার পর যে গাভীর দুগ্ধ পান করিতে হইবে তাহার তৎকালে কোন ব্যাধি আছে কি না, তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। ব্যাধিযুক্ত গাভীর দুগ্ধ বিকৃত হয় এবং বিকৃত দুগ্ধ সেবনে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। যে দুগ্ধ অনাবৃত অবস্থায় কোন পূতিগন্ধময় স্থান সন্নিধানে থাকে, দেখিতে তাহার কোন দোষ না হইলেও, সে দুগ্ধ যে মন্দ হইয়া যায় তাহার সন্দেহ নাই। স্মি সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ প্রকার দুগ্ধ ১৬০° (ফারেনাইট্) পরিমাণ উত্তাপ সংযুক্ত করিলে তাহা হইতে বিজাতীয় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। তাদৃশ দুগ্ধ সেবনে প্রথমে শিরঃপীড়া পরে উদরাময় জন্মে। যাঁহারা কলিকাতা বা লোকপূর্ণ নগরে বাস করেন উৎকৃষ্ট নির্দ্দোষ দুগ্ধ লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার; কিন্তু তাঁহারা নিকৃষ্ট পীড়াদায়ক, দূষিত দুগ্ধ পান করিয়া শরীরকে ধীরে ধীরে কাতর ও অকর্ম্মণ্য করা অপেক্ষা যদি নির্দ্দোষ দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধ সেবন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে, বোধ করি, অনেক উপকার হইতে পারে এবং হয়ত ক্রমশঃ গোপগণ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ যোগাইবার চেষ্টা করে। যাঁহারা পল্লিগ্রামবাসী তাঁহারা দুগ্ধ সেবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিলেই অনায়াসে নির্দ্দোষ দুগ্ধ লাভ করিতে পারেন।

——oo——

বাতাস ছাঁকিবার মুখোস।—সময়ে

সময়ে ধুম ও দুর্গন্ধময় বাষ্প পূর্ণ স্থানে না যাইলে লোকের চলে না, অথচ তাদৃশ স্থানে যাওয়াও একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক টিণ্ডাল (Tyndall) এক প্রকার মুখোস প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা মুখে লাগান থাকিলে শ্বাস ও প্রশ্বাস কার্য্যের কোনই ব্যাঘাত ঘটে না, চক্ষে ধূমাদি লাগিতে পারে না, এবং ধূম বা দূষিত পদার্থযুক্ত বায়ু শ্বাস যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এই মুখাবরণ নিতান্ত পাতলা, এবং তাহা প্রস্তুত করিতে ব্যয়ও যৎ সামান্য। সুতরাং এই উপায় দ্বারা অনেকের যে প্রচুর উপকার হইবে তাহার সন্দেহ নাই। দমকলের এবং খনি বিশেষের কর্ম্মচারীবর্গের প্রত্যেকেরই এক একটা এই রূপ মুখোস্ থাকা আবশ্যক।

——oo——

উড়িবার চেষ্টা।—মানুষ জলে উত্তম সাঁতার দিতে পারে, জলজন্তুর ন্যায় জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে, ভূপৃষ্ঠে অন্যান্য জীবের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে কিন্তু বায়ু-রাজ্যে তাহাদের বেলুন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে গতিবিধি করিবার কোনই সুযোগ ছিল না। পক্ষীগণ কেমন পাখা নাড়িতে নাড়িতে সুদূর আকাশের উপর দিয়া চলিয়া যায়, কেমন প্রকাণ্ড জনপদ, বনারণ্য স্রোতস্বিনী প্রভৃতি তাহাদিগের দৃষ্টির নিম্নে পড়িয়া থাকে এবং তাহারা যেন উৎকৃষ্টতর—শ্রেষ্ঠতর জীবের ন্যায় জীবলোকের উপরে—তরল বাতাসে নাচিয়া বেড়ায়। সে অবস্থা সুখের অবস্থা বটে—না হইলেও, তাদৃশ অবস্থা অন্ততঃ একবারও সম্ভোগ করিতে মন ব্যাকুল হয়। মানব বহুকাল হইতে বায়ু রাজ্যে পরিভ্রমণের উপায় চেষ্টা করিতেছে।

আমাদের ঋগ্বেদে বায়ুরাজ্যে পরিভ্রমণের একটী বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তৎপাঠে অনুমান হয় যে, অধুনাতন বেলুন আবিষ্কৃত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে আকাশদেশে পর্য্যটন করিবার উপযোগী কোন যন্ত্র আর্য্যগণ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে এক্ষণে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মানুষ উড়িবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। মিল্টনের বৃটনীয় ইতিহাসে এল্মর নামক এক ধর্ম্ম যাজকের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই ব্যক্তি উইলিয়ম অফ নরমণ্ডির আক্রমণ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী ঘোষণা করিয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় ঊর্দ্ধে উঠিয়া নিজে যে কোন্ সময়ে হাত পা ভাঙ্গিবে তাহার কোন ভবিষ্যৎ সংবাদ পূর্ব্বে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। বাল্যকাল হইতেই এই দুরাকাঙ্খ ব্যক্তি হাত পায়ের উপযুক্ত পাখা প্রস্তুত করিয়াছিল। এই সকল পাখার সাহসে এল্মর এক উচ্চ সৌধচূড়া হইতে লাফ দেয়, তখনই প্রবল বেগে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পতিত হয়। তাহাতে তাহার অঙ্গাদি ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অন্ধ বিশ্বাস এতই প্রবল ছিল যে, সে নিজের পশ্চাদ্ভাগে লেজ লাগাইয়া না দেওয়াতেই তাহার এতাদৃশ বিপদ ঘটিয়াছিল বলিয়া ব্যক্ত করিত এবং পাখীর লেজের ন্যায় লেজ তৈয়ার করিতে তাহার ভুল হইয়াছিল বলিয়া দুঃখ করিত।

তুর্ক সুলতান ক্রিমাসল্লান্ ও গ্রীশীয় সম্রাট ইমানুয়েলের কনষ্টাণ্টিনোপল নগরে সাক্ষাৎ ঘটনা স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত এক-

জন তুর্ক প্রকাশ্যরূপে ঘোষণা করিয়াছিল, সে এক উচ্চ গৃহচূড়া হইতে উড়িয়া অন্য এক স্থানে আসিবে। এই অত্যাশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনার্থ তথায় নির্দ্দিষ্ট দিবসে বহুলোকের সমাগম হইল। যথা-সময়ে তুর্ক বহু পরদাযুক্ত ও কুঞ্চিত শ্বেত পরিচ্ছদাবৃত হইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইল এবং বাহুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া বায়ু সংগ্রহ করণাশয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। সমবেত দর্শকগণ নানা প্রকারে হাসি টিটকারী দিতে লাগিল। ইমানুয়েল এই হতভাগ্যকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত যত্ন করিলেন কিন্তু তুর্কের তখন বড়ই উড়িবার সাধ হইয়াছে, সে শুনিবে কেন? কিয়ৎকাল বাহু বিস্তৃত করিয়া থাকিয়া উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তুর্ক বায়ু-সাগরে লম্ফ প্রদান করিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুমাত্রও ঊর্দ্ধগামী না হইয়া সজোরে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল এবং তাহার দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। নোলেস্ প্রণীত তুর্ক জাতির ইতিহাস (Knolles's General History of the Turks) নামক গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

পুরাকালে শ্যাম রাজ্যে একজন ফরাশী রাজদূত সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিনোদনার্থ অধিবাসিবৃন্দ একদিন মনোহর আতসবাজী প্রদর্শন করিয়াছিল। উক্ত প্রদর্শনের পরিসমাপ্তি কালে তাহারা বলিল যে, তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য এখনও প্রদর্শিত হয় নাই। তাহারা বাজীর প্রধান কারিকরকে একটা পিপা সমেত অতি ঊর্দ্ধে উড়াইয়া দিয়া প্রদর্শনের শেষ করিবে। পাছে তদ্দ্বারা প্রধান কারিকরের প্রাণনাশ হয় ভাবিয়া ফরাশী রাজদূত বলিলেন, আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতেই যথেষ্ট আমোদিত ও পরিতৃপ্ত হইয়াছি। অতএব প্রস্তাবিত বাজী আর দেখাইবার প্রয়োজন নাই। সমাগত লোক সকল তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিল যে, তিনি যে আশঙ্কা করিতেছেন তাদৃশ দুর্ঘটনা ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কারিকরের কোনই বিঘ্ন ঘটিবে না এবং এ কার্য্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। তখন ফরাশী রাজদূত আশ্বস্ত হইয়া প্রস্তাবিত বাজী দেখিতে স্বীকৃত হইলেন।

বাজিকরেরা একটা প্রকাণ্ড পিপা আনিল, সেই পিপার উপর প্রধান কারিকর একটা ছাতা হাতে করিয়া আসিয়া উপবেশন করিল। তাহার পর পিপার অভ্যন্তরে কতকটা বারুদ স্থাপিত করিল এবং সঙ্কেত অনুসারে তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ পিপা ও কারিকর বহুদূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। যখন কারিকর ঊর্দ্ধতম সীমায় পৌঁছিল, তখন সে হাতের ছাতা খুলিল, এবং ধীরে ধীরে বিনা আঘাতে ভূতলে অবতীর্ণ হইল। *

এই ব্যাপার কেমন করিয়া ঘটিল তাহা স্থির করিবার জন্য নানা প্রকার কল্পনা হইয়াছে। অনেকে স্থির করিয়াছেন যে ঐ পিপার মধ্যে কোন প্রকার ব্যোমযান স্থাপিত ছিল। বারুদাদির উত্তাপ পাইয়া তদভ্যন্তরস্থ বাষ্প লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিত। তাঁহারা বলেন যে, অধুনা ব্যোমযানের ঊর্দ্ধাংশ যে উদ্দেশ্যে ছাতার ন্যায় করা হয় এবং তদ্দ্বারা যে কার্য্য

---

* যে গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে তাহার নাম, "An account of a Voyage performed by two monks, in the state of a French Ambassador to the kingdom of Siam."

সাধিত হয় কারিকরের হস্তস্থিত ছাতা সেই উদ্দেশ্যে গৃহীত এবং তদ্দ্বারা সেই কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। একথা যদি সঙ্গত হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান ব্যোমযান আবিষ্কারের গৌরব কোথায় থাকিল! ব্যোমযান দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু এ ঘটনা তাহার অনেক পূর্ব্বের।

জন বাপ্তিস্ত দান্তে নামক এক ব্যক্তি পক্ষীর ন্যায় শূন্যরাজ্যে ভ্রমণ করিতে কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি কৌশলে ঠিক নিজশরীরের অনুরূপ এমনি একজোড়া পাখা প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, তদবলম্বনে বাস্তবিকই তিনি এতদ্বিষয়ে তাঁহার কৃতকার্য্যতার পরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে একবার এক উচ্চস্থান হইতে উড়িবার সময় দৈবাৎ একটা পাখা ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি তদ্ধেতু তৎকালে স্বীয় দেহভার স্থির রাখিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন, এবং এক গির্জ্জার উপর সজোরে পড়িয়া গিয়া এমনি আঘাত পাইলেন যে, তাহাতে তাঁহার উরুদেশ ভগ্ন হইয়া গেল।

মরে নামক এক ব্যক্তি ছাতার ন্যায় একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে দুই একবার অতি উচ্চস্থান হইতে বায়ু-রাজ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন। একবার প্রবল বায়ুবেগে তাঁহার যন্ত্র বিপর্য্যস্ত হওয়ায় তিনি এমনি জোরে ভূতলে পড়িয়া যান যে, তাঁহার মুখ, চক্ষু ও নাসিকা দিয়া বহু রক্তপাত ঘটে ও তাঁহাকে বহুক্ষণ অচেতন থাকিতে হয়।

কথিত আছে ১৮০৯ খৃঃ অব্দে বিয়েনাবাসী ডেগান নামক একজন ঘড়ি ব্যবসায়ী এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি যে যন্ত্র নির্ম্মাণ ও কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তিনি নিজকৃত যন্ত্র সাহায্যে শূন্যে উড়িতে পারিতেন, নামিতে পারিতেন এবং পক্ষীর ন্যায় ইচ্ছামত হেলিয়া দুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে পারিতেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এতদ্বিষয়ে মানুষ যে বিহঙ্গমগণের সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই।

সায়াণ্টফিক আমেরিকান নামক সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম যে, একজন পণ্ডিত সম্প্রতি এবিষয়ে এমন এক উপায় স্থির করিয়াছেন যে, তাহাতে মনুষ্য অতি দ্রুতবেগে শূন্য রাজ্যে সহজে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে।

বেলুন অর্থাৎ ব্যোমযানের আবিষ্কার ও ক্রমশঃ তাহার উন্নতির বৃত্তান্ত সকলেই জ্ঞাত আছেন ভাবিয়া এস্থলে তাহা অবতারিত করা হইল না।

মনোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনোবিজ্ঞানের যথার্থ তত্ত্ব ও তদনুসন্ধানের প্রকৃত উপায়।

ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য দর্শনের যে অনিষ্টকর পরিণাম পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের জ্ঞেয় মৌলিক পদার্থ চতুষ্টয়ের প্রকৃত তত্ত্ব ও সম্বন্ধ নির্ণয়েচ্ছা মরীচিকা মাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। সত্য মানব-বুদ্ধি নিরপেক্ষ অমূল্য পদার্থ। ইহা দার্শনিকদের মত-প্রাচুর্য্য দ্বারা পরিবর্ত্তিত বা বিনষ্ট হইতে পারেনা। বরং ঐ মতসমূহের ভ্রান্তিবাহুল্য সত্ত্বেও তাহাদের সকলেরই ভিত্তিভূত সত্য আছেই আছে। সেই শেষাংশে দার্শনিক-গণ একবাদী হইয়াছেন। এই মর্ম্মে ভিক্তর কুজাঁয়েনের একটী সুন্দর উক্তি আছে; তাহা এই—"ভিন্ন ভিন্ন মত সমূহের পরস্পর বিরোধী ভ্রমসকল অবিনশ্বর সত্যকে গুপ্ত করিয়া রাখে এবং দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রকৃত ও অনন্ত সত্য-মূলক প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞান নেত্রগোচর হয় ও সেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান মত প্রাচুর্য্য কোন অংশেই ধ্বংস করিতে পারেনা।"

জনসাধারণের স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা ইহা অভ্রান্ত উপলব্ধ হয় যে, বাহ্য ও অন্তর ভেদে জগৎ দ্বিবিধ। ইহাদের মধ্যে অন্তরেন্দ্রিয় ও জীবাত্মা অথবা মন জ্ঞাতা; এবং বাহ্যজগৎ জড়াত্মক, জ্ঞেয় পদার্থ। ইহাদের যোগেই বাহ্যপদার্থের ধারণা হয়। সুতরাং যে বিজ্ঞান এই দ্বিবিধ পদার্থের মধ্যে অন্তরকে অস্বীকার না করিয়া, বরং আদৌ তাহাদের এককালীন মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়া উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে নির্ণয় এবং ঐ সম্বন্ধের কার্য্য কারণ প্রদর্শন করে, অথচ ঐ দুই মৌলিক পদার্থের মধ্যে কোনটীতে অধিকতর আস্থা ও অপরটীতে অনাস্থা না করে, সেই বিজ্ঞানই অভ্রান্ত ও সত্যমূলক। এই প্রকৃত বিজ্ঞানে এমন কোন ভ্রমের স্থান নাই যদ্দ্বারা উহা পাশ্চাত্য দর্শনের মতে হয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কোন এক প্রসিদ্ধ দার্শনিক বলিয়া গিয়াছেন যে, "বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কখনবা দক্ষিণে, কখনবা বামে বিপথ অবলম্বন করিয়া পরিণামে কতকগুলি মত উৎপন্ন করে। সেই-গুলি দেখিতে গেলে সমভাবে সত্য ও সমভাবে ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সাধারণ দোষ এই যে, তাহারা পরস্পর বিরোধী ও অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞানের ইহাই প্রকৃত বিপদ।" লর্ড বেকন বলিয়াছেন যে, "আমি প্রারম্ভ হইতেই বাহ্যইন্দ্রিয় জনিত জ্ঞানমূলক (Empiric) ও অন্তরেন্দ্রিয় জনিত জ্ঞানমূলক (Rational) তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালী দ্বয় যুগপৎ অনুসরণ করিতেছি। ইহাদের বিয়োগেই বিজ্ঞানের ধ্বংস হয়।"

লেখকের উদ্দেশ্য ও তদনুসরণ প্রণালী।

আর্য্যদর্শন (১) আত্মাতত্ত্বয় বিজ্ঞান (২) (Idealism) ও প্রকৃতিতত্ত্বয় বিজ্ঞান (৩) (Sensualism) এই উভয় বিধ মতের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া ও কোন পক্ষে অযথা প্রবৃত্তি প্রদর্শন না করিয়া মূল পদার্থদ্বয় স্বীকার করে কিনা তাহাই প্রতিপন্ন করা লেখকের মূল উদ্দেশ্য।

বাহ্য জগতের সহিত মানবমনঃ কিরূপে সম্বদ্ধ তাহা প্রথমেই স্থির করা কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করণ মানব বুদ্ধির অসাধ্য বলিয়া, ইহা একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের যথার্থ তত্ত্ব হইতে ইহা সুস্পষ্ট রূপে স্থিরীকৃত হয় যে, মানসিক বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে হইলে অগ্রেই মনঃ ও বাহ্যজগতের প্রকৃতজ্ঞান হওয়া আবশ্যক এবং উক্ত উভয়বিধ পদার্থের পরস্পর সম্বদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত উহাদের স্বতন্ত্র জ্ঞান অর্জ্জন করা যায় না। এই জন্যই পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মোহান্ধকারে পতিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের মানসিক ধারণার প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাহা না করাতেই সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞান এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থায় পতিত আছে। অধিকতর প্রাঞ্জল রূপে স্বীয় উদ্দেশ্য বর্ণন করিতে হইলে মানবজ্ঞানের স্বজন প্রণালী নিরূপন করাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত। প্রথমতঃ বাহ্য পদার্থের কিরূপে জ্ঞান লাভ হয় তাহারই স্থিরীকরণ করা আবশ্যক। সুতরাং প্রণালীকে এস্থলে কারণ (cause) ও কার্য্যাবসর (occasion) ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। কারণ জ্ঞানদায়িনী (Inductive) প্রণালী অনুসারে বাহ্যপদার্থে জ্ঞানের বাস নিরূপণ করাই শ্রেয়স্কর। তাহার পর কার্য্য বিষয় নিরূপণে অগ্রসর হইয়া ইন্দ্রিয় জনিত জ্ঞান কি কি অবস্থা বিশেষে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার মীমাংসা করা যাইবে। এই উপলক্ষে জ্ঞানার্জ্জন কালে মনঃ কর্ম্মশীল বা কর্ম্মহীন থাকে, দর্শনেন্দ্রিয়ের অংশভূত স্বচ্ছ পদার্থে বাহ্য পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি বিপরীত ভাবে প্রতিফলিত হইয়াও কিরূপে দৃষ্টপদার্থের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, মন ও বাহ্যপদার্থের অন্তর্বর্ত্তী কোন পদার্থ স্বীকার্য্য বটে কি না, বর্ণাদি গুণ জ্ঞাতা স্থূল বিষয়ে মনে কি জ্ঞেয় পদার্থে সংশ্লিষ্ট ইত্যাকার প্রশ্নের মীমাংসা

---

(১) আর্য্যদর্শন শব্দে ভারতীয় কোন দর্শন বিশেষ লক্ষিত হইতেছে না। যে সাধারণ শাস্ত্রে সীমাবদ্ধ ও অসীম পদার্থদ্বয় ও তাহাদের পরস্পর সম্বদ্ধ নিরূপিত হইয়াছে তাহাই আর্য্যদর্শন পদবাচ্য। কুজাঁয়েম পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় ইহাকে শ্রেণীভুক্ত করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা সর্ব্বথা বিফল।

(২) যে শাস্ত্রে বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার না করে তাহাকেই (Idealism) আত্মাতত্ত্বয় বিজ্ঞান কহে।

(৩) যে শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানান্তর স্বীকার করেনা তাহাকে (Sensualism) প্রকৃতি তত্ত্বয়বিজ্ঞান কহে।

করা যাইবে। তাহার পর মানবমনঃ ও বাহ্য জগতের সম্বন্ধ নিয়ামক নিয়মাবলী বিচক্ষণ পাঠক স্বয়ং স্থির করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন। তাহার পর অনুসারক (Representative) পদার্থ জ্ঞাতা মনঃরূপ পদার্থের বা জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থের ভাব বিশেষ বা কপোল কল্পিত কোন কাল্পনিক পদার্থ বটে কিনা তাহারই মীমাংসা করা যাইবে। ধারণাবর্গ কিরূপে গ্রথিত হইয়া স্বপ্ন, স্মৃতি, প্রভৃতি ঘটনা উৎপন্ন করে তাহারও নিরূপন করিয়া স্থির করা হইবে। অবশেষে মনঃ বা অন্তরেন্দ্রিয় (৪) যে জীবাত্মা ও বাহ্য পদার্থের মধ্যস্থ কিয়দংশে আন্তরিক স্বতন্ত্র পদার্থ বিশেষ তাহা প্রতিপন্ন করা যাইবে। মনঃ আমাদের ইচ্ছাকার্য্য (volition) ও তদনুগামী গতিরূপ ঘটনার সংযোগ কারী শৃঙ্খলভূত। (৫)

উল্লিখিত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে মানবসাধারণ বুদ্ধি, অন্তর্জ্ঞান (consciousness) ও বাহ্যজ্ঞান, আমার পথদর্শক হইবে এবং উহারা আমাকে যে পথে যাইতে কহিবে, মত গৌরব নিরপেক্ষ হইয়া কেবল সেই নিষ্কণ্টক ও সরল পথে অগ্রেসর হইতে থাকিব।

প্রথমতঃ পাশ্চাত্য দর্শনকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহার সমালোচনা ও দোষোদঘাটন বা গুণাবধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহার পর উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইব। ৬

(ক্রমশঃ)

(৪) পাশ্চাত্য দর্শনে উদৃশ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হওয়াতে যে কুজায়েন বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও দার্শনিকগণকে ইহা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

(৫) পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা কতদূর রক্ষা করিতে পারিব তাহা পরীক্ষা না করিয়া পাঠকগণ যেন বৃথা তিরস্কার না করেন।

(৬) উদ্দেশ্যের ঐক্য না থাকাতে পাঠকগণ বৃথা ক্রোধ করিবেন না। "To attempt to construct a Science of metaphysics is to attempt an impossibility" রূপ উক্তিটী যে ভ্রমাত্মক ও "Psychology will one day rank as a positive science" হুইল সাহেবের এই উক্তিটীর যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করাই লেখকের মুল উদ্দেশ্য।

বিদ্যুল্লতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী সূর্য্যকে মুখ দেখায় না,—কুলবধূ পরপুরুষকে মুখ দেখাইবে না, এই একটি সংস্কার বঙ্গ কুল-ললনার হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে। সুতরাং অকস্মাৎ পরপুরুষের সম্মুখে পতিত হইলে কুলবধূগণ যেমন এক রকম জড়সড় হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের শোণিত শুষ্ক ও হৃদয় কম্পিত হয়। সহসা গিরীশের সম্মুখে পড়িয়া আমাদের বিদ্যুল্লতার তদ্রূপ ঘটিয়াছিল কি না, ঠিক বলা যায় না। তিনি তখনি বাটী আসিলেন।

মনে করিলেন, 'যা খোলা দেখিয়াছেন, তা আর কি হবে!'

সন্ধ্যা হইল। বিদ্যুল্লতার পিত্রালয় হইতে একজন লোক এক খানি পত্র লইয়া আসিল। পত্র-পাঠে বিদ্যুল্লতা জানিতে পারিলেন, পিতা আসিবেন না, স্বাম নগরে হেমলতার বিবাহ দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে। পাত্র ভাল হইলে কি হইবে, পাত্রের পিতার ধনাকাঙ্ক্ষা অসঙ্গত, সে আকাঙ্খা পূর্ণ করা তাঁহার অবস্থার লোকের পক্ষে অসাধ্য। তিনি অগত্যা স্থানান্তরে সম্বন্ধের চেষ্টা পাইতেছেন।

বিদ্যুল্লতা ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন। তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে; পিতা একবার আসিলেন না, সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন না, অমন পাত্র পাওয়া দুর্লভ একবার ভাবিলেন না। আবার ভাবিতে লাগিলেন কাহার সহিত হেমলতার সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন? ভাবনা হইল পাছে মন্দ পাত্রের সহিত হেমলতার বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়া থাকেন! সে রজনী অতি কষ্টে কাটিল।

পরদিন প্রাতে বিদ্যুল্লতা স্বর্ণলতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বর্ণলতা আসিতে আসিতে ভাবিয়া ছিলেন, 'হয়ত দিদি তাঁহাকে কত কি বলিবেন,' আসিয়া দেখিলেন বিদ্যুল্লতা একখানা কাগজ হাতে করিয়া কি ভাবিতেছেন। সম্মুখে আসিয়াই বলিলেন, 'দিদি, আমারই দোষ হইয়াছিল; ক্ষমা কর।' 'কিসের দোষ কিসের ক্ষমা' বলিয়া বিদ্যুল্লতা স্বর্ণলতার হাত ধরিয়া বসাইলেন।

ক্ষণেক পরে বিদ্যুল্লতা বলিলেন, 'বাবা চিঠি লিখিয়াছেন ও বাড়ীর শশী ঠাকুর পোর সঙ্গে হেমার বিবাহ দেওয়া তাঁহার মত নয়। তাঁহারা যে রকম চাহেন সে রকম তিনি দিতে পারিবেন না। তাঁহাকেই বা কি বলিব? জানইত, ভাই, এখন তাঁহার সে অবস্থা নাই। কিন্তু অর্থাভাবে মন্দ পাত্রে হেমার বিবাহ দিবেন, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ত দেখিতে পারিব না। তাই মনে করিতেছি কিছু দিই, গহনা দিব কি টাকা দিব তাই পরামর্শ করিবার জন্য তোমায় ডাকিয়াছি।'

স্বর্ণলতা। তোমাকে কি পরামর্শ দিব, দিদি, তোমা অপেক্ষা কি আমি বেশী বুঝি?

বিদ্যুল্লতা। সে কি ভাই? বলি টাকা দেওয়া কি ভাল দেখায়?

স্বর্ণ। গহনা দেওনা—বেশত।

বিদ্যুল্লতা। আমিও তাই স্থির করিয়াছি, দেখদেখি এই কয়খানি দিতে চাই।' বলিয়া হস্তস্থিত কাগজখানি স্বর্ণলতার হাতে দিলেন।

স্বর্ণলতা গহনার তালিকা দেখিয়া বলিলেন 'বেশ দেওয়া হয়েছে, বরং দুই একখানি বেশী হইয়াছে।'

দুইজনে বসিয়া এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বাহির হইতে কে ডাকিল, 'বড় বউ!'

বিদ্যুল্লতা বলিলেন, 'ঠাকুর পো, যাই, ওঘরে একটু বস।'

স্বর্ণ। তবে দিদি, এখন আসি।

বিদ্যু। এখনই যাবে, তা ভাই কিছু মনে করো না।

স্বর্ণ। মনে জন্ম জন্ম করব।

বিদ্যুল্লতা স্বর্ণলতার হাত ধরিয়া নিকটে

বসাইলেন। স্বর্ণলতা সলজ্জ ভাবে বলিলেন, 'উনি দিনের মধ্যে অনেকবার আমার সেই ঘরে আসিয়া থাকেন, তা তোমাকে সে দিন সে ঘরে বসানই দোষ হইয়াছিল।' বিদ্যুল্লতা বলিলেন, 'দোষ আর কি হইয়াছিল ভাই? আজকাল আমাকে দেখেন নাই, তা দেখিয়া ফেলিয়াছেন। তা হউক, আমার ভগ্নীপতি ত; কথা কওয়া আমোদ আহ্লাদ করিবার কথা। তবে আমার পোড়া অদৃষ্ট!' বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

'দিদি, এ কার ছবি?' বলিয়া স্বর্ণলতা একখানি চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। বিদ্যুল্লতার শয়ন কক্ষে সেই চিত্রখানি শিয়রের উপরে লম্বিত ছিল। যাহা হউক স্বর্ণলতা যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইল না। তিনি জানিতেন না, উহাতে দিদির শোক আরও উথলিয়া উঠিবে।

বিদ্যুল্লতা চিত্রপানে তাকাইলেন, ও অমনি দুই বিন্দু অশ্রু নয়নের কোণ বহিয়া টস্ টস্ করিয়া পতিত হইল। তিনি তখনি চিত্তবেগ সম্বরণ করিয়া গদ গদ স্বরে কহিলেন 'ও ছবি যাঁহার, তাঁহাকে তুমি একবার দেখিয়াছিলে,—আমার বিবাহের সময় দেখিয়াছিলে।' বিদ্যুল্লতা চক্ষু মুছিলেন। স্বর্ণলতা বিদ্যুল্লতার মুখপানে তাকাইয়া বুঝিলেন, সে ছবি খানি কাহার, তাঁহারও চক্ষু দিয়া অশ্রু বহিল, সজল নয়নে তিনি সেই চিত্র পটাঙ্কিত পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা সে চিত্র খানি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই।

চিত্রখানি বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানায় টাঙ্গান থাকিত, বিদ্যুল্লতা দেবরের নিকট ভিক্ষা স্বরূপ চাহিয়া লইয়া আপন শয়ন কক্ষে অতি যত্নে শিয়রে রক্ষা করিয়াছেন। শিয়রে আলেখ্যে যে মূর্ত্তি, বিদ্যুল্লতার হৃদয়েও সেই মূর্ত্তি চিরাঙ্কিত।

স্বর্ণলতা বিদায় হইলেন। বিদ্যুল্লতা অন্যঘরে গেলেন। তাঁহার দেবর রাজেন্দ্রনাথ সেই ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশ বৎসর। তিনি দেখিতে সুপুরুষ। অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল এবং এখন তাঁহাকে বিষয় কর্ম্ম সকলই দেখিতে হইতেছে। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ উপযুক্ত এবং জমীদারী কার্য্যে কুশল হইয়াছেন। এমন কি, প্রভু তরুণ বয়স্ক হইলে কর্ম্মচারীদিগের যেরূপ নানা প্রকার অন্যায়াচরণ ও শঠতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাঁহার কাছে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও হয় নাই। তিনি কিন্তু কর্ম্মচারীদিগের প্রতি কখন নির্দ্দয় ব্যবহার করেন না।

রাজেন্দ্রনাথের সংসারের মধ্যে তিনি, তাঁহার মাতা ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়া বিদ্যুল্লতা। প্রায় এক বৎসর হইল তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, তিনি আর বিবাহ করেন নাই,—পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিও নাই। বাটীতে বালক বালিকার নাম মাত্র নাই। দূর কুটুম্ব লইয়া পরিবার বৃদ্ধি করিবার তাঁহার অভিপ্রায় নহে, কারণ বহু পরিবারে প্রায়ই সর্ব্বদা কলহ বিবাদ হইয়া থাকে, তাহাতে

গৃহস্থের সুখ শান্তির অনেক বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। তাই বলিয়া রাজেন্দ্র অন্নদানে কাতর নহেন। তিনি নিরুপায় কুটুম্ব কুটুম্বিনীদিগকে রীতিমত মাসিক অর্থ সাহায্য করেন। জমীদারীর মধ্যে স্থানে স্থানে যে সমুদয় অতিথিশালা আছে, সেখান হইতে দীন দরিদ্র কখন বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না। পিতৃকীর্ত্তি যাহাতে না লোপ পায়, সে বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে।

রাজেন্দ্রের মাতা পতিপুত্র শোকে এক প্রকার বিহ্বলা। সুতরাং সংসারের সকল ভারই বিদ্যুল্লতার উপর। বাস্তবিকই বিদ্যুল্লতাই কর্ত্রী,—রাজেন্দ্র তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। বিদ্যুল্লতা গৃহ কার্য্যের সকল তত্ত্বাবধারণ করেন, কায়মনে শোকাভিভূতা শ্বাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং রাজেন্দ্রকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করেন। দাস দাসীর প্রতি তাঁহার বিশেষ বাৎসল্য ও কৃপা দৃষ্টি। তাহারা সকলে তাঁহাকে লক্ষ্মী স্বরূপা বলিয়া মানিয়া থাকে। বিদ্যুল্লতা প্রতিবাসিনী বালিকা ও কুলবালাদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা ও সদুপদেশ দেন, সময়ে সময়ে অবস্থা বিবেচনায় অর্থ বা অন্ন দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন।

বিদ্যুল্লতা আসিবা মাত্র রাজেন্দ্র তাঁহাকে একখানি পত্র দিলেন।

বিদ্যু। চিঠি খানি দেখিয়াছ ?

রাজে। হাঁ, দেখিয়াছি।

বিদ্যু। তবে এই কথাই লিখিয়া দিই ?

বিদ্যুল্লতা পত্র খানি খুলিয়া দেখিলেন, পত্র মধ্যে পরিবর্ত্তিত অংশ পাঠ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "এ কি ঠাকুর পো, একি হইয়াছে ?"

রাজেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার যেমন লিখিবার শ্রী, তাই কাটিয়া দিয়াছি। তুমি আমার অনুমতি লইয়া কায করিবে ?

বিদ্যুল্লতা পিতার পত্রের উত্তরে ঐ পত্র খানি লিখিয়া রাজেন্দ্রকে দেখিতে দিয়াছিলেন। তাহার একস্থানে লিখিয়াছিলেন, "হেমলতাকে কয়েক খানা গহনা দিবার জন্য আমার দেবর আমাকে অনুমতি দিয়াছেন," তবে আপনি তাহা কেমনা গ্রহণ করিবেন ? রাজেন্দ্র "অনুমতি দিয়াছেন" এই দুইটী কথা কাটিয়া দিয়া লিখিয়াছেন, "অনুরোধ করিয়াছেন।" তাই বিদ্যুল্লতার যত আনন্দ।

বিদ্যুল্লতা কহিলেন, 'সাধে বলি, ঠাকুর পো, পুরুষের বুদ্ধি এক, আর অবোধ নারীর বুদ্ধি এক! তা বেশ করিয়াছ, তোমারই মুখ উজ্জল হইবে।'

বিদ্যুল্লতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর পো, আমিও তোমাকে একটী অনুরোধ করি, তুমি কেন হেমলতাকে বিবাহ কর না!" রাজেন্দ্র অতি মৃদু ভাবে বলিলেন, "বড় বউ, জান ত ও কথা পড়িলে আমি সুখী হই না—তবে—" এক পা দুই পা করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। বিদ্যুল্লতা দন্তে জিহ্বা দংশন করিলেন, অধর দংশন করিলেন; রাজেন্দ্র তাঁহার সকল অনুরোধ রক্ষা করেন কেবল পুনর্ব্বার বিবাহের অনুরোধটী বার বার কাটিয়া আসিতেছেন।

বিদ্যুল্লতা রাজেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আহা! দেবর যেন জন্ম জন্ম এইরূপই পাই, কিন্তু তাঁহার আবার বিবাহ দিতে না পারিলে সকলই বৃথা। বিবাহের নামে ত একেবারে জ্বলিয়া উঠেন। যাহা হউক যাহাতে তাঁহার পুন-

র্ব্বার বিবাহে প্রবৃত্তি জন্মে সেই চেষ্টাই আমাকে করিতে হইবে, নইলে আর কিসের সংস্কার? আমার শ্বশুরের বংশ—! ওঃ! সেই দুর্ঘটনাই কাল? আমি পাষাণী আজি ও বাঁচিয়া আছি!"

মনোমধ্যে এই চিন্তার উদয় হওয়াতে বিদ্যুল্লতার চিত্তবেগ অসম্বরণীয় হইল, তখনি তথা হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে আপন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন।

বল দেখি, বঙ্গ মহিলাগণ, বিদ্যুল্লতার মত হইতে তোমাদের সাধ যায় কি না? না, তা কখনই যায় না। বিদ্যুল্লতা বিধবা—বিধবা হইতে কাহার সাধ যায়? এমন অপমানসূচক অনুরোধ আমরাই বা করিব কেন? তবে দুর্ভাগ্য বশতঃ যাঁহারা বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, বিদ্যুল্লতার মত হইতে তাঁহাদের সাধ যায় কি না?

তাঁহাদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ বলিবেন "তা সাধ যায়, সংসারের আর সকল ভার লইতে পারি কিন্তু বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা করার ভার লইতে পারি না।" ঠিক কথা। তোমরা এখন লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছ, প্রতিবাসিনী সমবয়স্কা লইয়া শুধু হাস্য কৌতুকে কাল কর্ত্তন করিতে নিপুণা হইয়াছ, পাড়ায় জামাই আসিলে অগ্রে গিয়া নানা রকমের পয়ার কাটিতে, রসিকতা করিতে শিখিয়াছ, বৃদ্ধা শাশুড়ীর বা অন্য গুরু জনের সেবা করা তোমার আর ভাল লাগিবে কেন?

পুত্রবধূ শাশুড়ীকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া সেবা করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে দশকথা শুনাইয়া দিবে, ভারতে এ পাপ পূর্ব্বে ছিল না, তবে কোথা হইতে এ ঘোর পাপ এমন পুণ্য ময় আর্য্য ভূমিতে আসিয়া প্রবেশ করিল?

বিদ্যুল্লতা তুমিই ধন্য। আক্ষেপের বিষয় তুমি বিধবা।

'দিন যায় না ক্ষণ যায়' রমণীমণ্ডলীর এই কথাটী বেশ। কখন কেহ কুক্ষণের কথা অগ্রে ভাবিয়া দেখে না। বিদ্যুল্লতার হৃদয়ে গিরীশ বাবু তাঁহাকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছেন, এ চিন্তা একবারও উদয় হয় নাই। তাহা না হইলে কেন তিনি পুনর্ব্বার স্বর্ণলতার নিকট আসিবেন, কেনই বা সেই দুর্ব্বলচিত্ত গিরীশচন্দ্রের পাপ চিন্তা সম্বর্দ্ধন করিতে আবার দর্শন দিবেন? তাঁহার প্রকৃতি দেব প্রকৃতি, নীচ প্রবৃত্তি অনুভব করা, নীচ প্রবৃত্তি আপন্ন কুজনের অন্যায় লালশা বর্দ্ধন করা তাঁহার প্রকৃতির কার্য্য নহে,—তাঁহার প্রকৃতির অনুমোদনীয় নহে তিনি সাধু সচ্চরিত্র গিরীশচন্দ্রের চিত্ত বিকলতা সন্দেহ না করিয়া, স্নেহাস্পদ স্বর্ণর স্বামীকে অবিশ্বাস না করিয়া, আবার স্বর্ণর নিকট আসিতেছিলেন। গিরীশ সেই সময় সেই পথ দিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্ব্বাটী গমন করিতেছিলেন। আবার সেই অতুল সৌন্দর্য্যাধার রমণী প্রতিমা তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল! তিনি চাহিয়া দেখিলেন কি দেখিলেন তখনই তাহা বুঝিতে পারিলেন না, কাহাকে দেখিলেন চিনিতে পারিলেন না। বিদ্যুল্লতা সরিয়া গেলে, তাঁহার জ্ঞান হইল, তখন বুঝিতে পারিলেন তিনি যাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে বিচলিত চিত্ত হইয়া আছেন, সেই পূর্ণ শশাঙ্ক রূপিণী, বিদ্যুল্লতা তাঁহার নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন। গিরীশ ফিরিয়া বিদ্যুল্লতার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন,—নির্ব্বাক

ও নিষ্পন্দ! পরিশেষে হতাশ ভাবাক্রান্ত হৃদয়ের গভীর তম কন্দর হইতে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, 'হায় বলিলাম না কেন?' বলিয়া, বহির্ব্বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন।

বিদ্যুল্লতা স্বর্ণর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—স্বর্ণ বিমনা, গবাক্ষ দ্বারে বসিয়া রোদন করিতেছেন। তিনি একবারে স্বর্ণর নিকটে গিয়া কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন স্বর্ণ, আজ অমন হইয়া রহিয়াছ? চক্ষে জল কেন?' স্বর্ণ অপ্রতিভ হইয়াও চিত্ত বিষাদ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, 'দিদি, কি জানি কোথাও কারও বিপদ ঘটিয়া থাকিবে নয় আপনা আপনির মধ্যে কে হয়ত নাই।'

'সে কি স্বর্ণ? কিসে বুঝিলে—'

"ওঁর মুখে হাসি নাই, মনে সুখ নাই, আমার সঙ্গেও ভাল করিয়া কথা কন না।"

"তুমিত কোন দোষ কর নাই?"

"আমি কি দোষ করিব দিদি?"

"জিজ্ঞাসা করে ছিলে?"

স্বর্ণ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "হাঁ" কিছুই বলিলেন না।"

"তবে ভাই তোমার উপরই রাগ করেছেন, (একটু হাসিয়া) এমন জানিলে এই মুহূর্ত্ত আমার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখনই যে বলিতাম। তা স্বর্ণ তাঁকে ডাকিয়া পাঠাও—অনেক দিন ওঁর সঙ্গে কথা কহি নাই, তাতে ক্ষতি কি? আজ তোমাদের মনান্তর দূর করিবার জন্য নাহয় কথা কহিব। এখন মুখ মুছে ফেল।"

স্বর্ণ বিদ্যুল্লতার প্রবোধে সত্যই নেত্র মুছিয়া ফেলিলেন, কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া স্বামীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

গিরীশ সশঙ্কিত চিত্তে, মলিন বদনে, বিমর্ষ ভাবে আসিয়া তাঁহাদের নিকট দাঁড়াইলেন। তিনি ভাবিতে ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে বিদ্যুল্লতার সহিত সাক্ষাৎ উপলক্ষে হয়ত তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে বিদ্যুল্লতার সন্দেহ জন্মিয়া থাকিবে, স্বর্ণকে তাহাই বলিয়া দিয়া হয়ত তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন। গিরীশের মুখ পানে চাহিয়াই বিদ্যুল্লতা বুঝিতে পারিলেন সত্যই তাঁহার মনে সুখ নাই। ভার্য্যার প্রতি অভিমান হেতু সদা প্রফুল্লচিত্ত স্বামীও ম্রিয়মান হইয়া থাকেন। মৃদু হাস্য করত অতি স্নেহভাবে গিরীশকে কহিলেন "আমার বোনের উপর আপনার অত রাগ করা কি ভাল দেখায়?"

বিদ্যুল্লতার সেই মধুর হাসি টুকু গিরীশের নয়নে পতিত হওয়াতে পুরুষ-সাধ্য অশ্রু সম্বরণ ভুলিয়া গিয়া তিনি কোমল হৃদয় অবলার ন্যায় দুই চক্ষে দর দর অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন, তাঁহার স্তম্ভিত হৃদয় আবার যেন উথলিয়া উঠিল, বিদ্যুল্লতার মুখ নিঃসৃত কথা কয়টী তাঁহার চিত্তকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যার পর নাই অধীরতায় যেন কি বলিতে যাইতে ছিলেন,—রসনায় আসিল না, শুধু শুষ্ক অধর ওষ্ঠ একবার কাঁপিয়া রহিয়া গেল। তিনি কষ্ট শ্রেষ্টে চাপিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

বিদ্যুল্লতা কাতরভাবে আবার কহিলেন, "কি হইয়াছে বলুন না। দেখুন গিরীশ বাবু, কত কাল আপনার সঙ্গে কথা কহি নাই, আজ এই উপলক্ষে আবার কথা কহিলাম। সে যাহা হউক, আপনার ভাবান্তরে

স্বর্ণ এতক্ষণ কাঁদিতেছিল। কোন অন্যায় করিয়া থাকে, ক্ষমা করুণ আমার কথা রাখুন।”

বিদ্যুল্লতার শেষ কথা কয়টি—“আমার কথা রাখুন” গিরিশের হৃদয়ে বজ্র তুল্য বাজিল,—চিত্তে তাহার প্রতিঘাত হইল। তিনি আর সেখানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া নিকতরে কাঁপিতে কাঁপিতে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিদ্যুল্লতা কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া অতি ক্ষুদ্র স্বরে স্বর্ণকে কহিলেন, “ভাইতি স্বর্ণ ওঁর কি হইয়াছে!” স্বর্ণর চক্ষে অশ্রুজল উথলিয়া পড়িল, বিদ্যুল্লতা বলিলেন, ‘কাঁদিয়া আর কি করিবে স্বর্ণ, ওঁকে ভাল করিয়া যত্ন করিও ; উনিত তোমার তেমন স্বামী নন, একটু মনোরঞ্জন করিলেই তোমার প্রতি.ও অভিমান টুকু ঘুচিয়া যাইবে। এখন আসি ভাই, মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেছে সেখানে না যাই যদি আবার আসিব।’ বিদ্যুল্লতা বিদায় হইলেন।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তিস্বীকার।

বিবিধ-প্রবন্ধ। প্রথম খণ্ড। শ্রীরাজনারায়ণ বসু বিরচিত। সিংহ এণ্ড্ বেনার্জি ক্রেণ্ডস্ কর্ত্তৃক ওরিয়েণ্ট্যাল্ পব্লিশিং এষ্ট্যাব্লিশমেণ্ট হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা। কবপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৲টাকা।

“হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা,” “সেকাল আর একাল” প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত ব্যক্তি। সাহিত্যামোদী পাঠকগণ তাঁহাকে চিন্তাশীল ও সদ্যুক্তি পথাবলম্বী সুলেখক বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় কি, তাহা ভূমিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে জানা যাইবে।

“আমার প্রণীত ‘বিবিধ-প্রবন্ধের’ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা ‘বিবিধ-প্রবন্ধে’ সন্নিবেশিত হইল, কেবল ‘সেকাল আর একাল’ হইল না। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে অধিকাংশ প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয়।”

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মাতৃভাষার প্রতি মমতা অপরিসীম, সুতরাং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী-মুখে যাহা পরিব্যক্ত হয় তৎসমস্তই জাতীয় গৌরবের প্রণোদক, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে নানাবিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপাঠে লেখকের স্বদেশের প্রতি অতুলনীয় ভক্তি, এবং মাতৃভাষার প্রতি অমিত শ্রদ্ধা বিশেষ পরিলক্ষিত হয় এবং তদ্ধেতু গ্রন্থকার মহাশয়কে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধের বিষয় “স্বদেশীয় ভাষানুশীলন।” বর্ত্তমান কালে

শিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণের মাতৃভাষার প্রতি অযথা বিদ্বেষ বিশেষ ঘৃণার কথা এবং দারুণ লজ্জার বিষয়; গ্রন্থকার নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

"বীটন্ সাহেব, যিনি কেমিরণ সাহেবের পর শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন, তিনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরস্থ কলেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন 'কলিকাতার যে সকল যুবা-ব্যক্তি ইংরাজীভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিয়া শ্লাঘা পূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই কহি যে বঙ্গভাষা শিক্ষা করাই তোমাদিগের যশঃ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাঁহাদিগের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছি যে যদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। যদি তোমাদিগের গ্রন্থকর্ত্তা হইবার অনুরাগ ও তদুপযোগী ক্ষমতা থাকে তবে স্বকীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অথবা ইংরাজী গ্রন্থের উত্তম উত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে স্থায়িতর কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। যাঁহারা প্রথমে এই পথাবলম্বী হইয়া কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে।"

"মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচন" এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ। ইহাতে লেখকের কাব্যরসজ্ঞতা, ভাবুকতা এবং সমালোচন কার্য্যের যোগ্যতা বিষয়ক যথেষ্ট পরিচয় আছে। কোন কোন স্থলে লেখকের মত অসঙ্গত এবং তাঁহার মীমাংসা অতিরঞ্জিত বলিয়া আমরা মনে করিয়াছি, তথাপি তাঁহার প্রধান প্রধান মত সমূহের সহিত আমাদের অনৈক্য নাই, অতএব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতদ্বৈধ উল্লেখ করিয়া এস্থলে তর্ক বিতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই।

এডিসন্ স্পেক্টেটরের প্রথমে বন্ধু সমাজের এক মনোহারিণী বর্ণনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসু তাহারই অনুকরণে "আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চিত্র সকল সজীব হয় নাই এবং তাঁহার বর্ণনাসমূহও এডিসনের ন্যায় প্রীতিজনক হয় নাই।

"আর্য্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার" বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শব্দশাস্ত্রের সহায়তায় যে সকল মত স্থির করিয়াছেন, রাজনারায়ণ বাবু বর্ত্তমান গ্রন্থের চতুর্থ-প্রস্তাবে তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে বিশেষ নূতন কথা ও নূতন মত কিছুই নাই।

"তোকম্ পুষেম তনয়ম্ শতম্ হিমাঃ"* "শত হিমঋতু জীবিতবান্ পুত্র ও পৌত্র আমরা যেন পোষণ করি" এইরূপ আশীর্ব্বাদ বাক্য ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। এ প্রকার আশীর্ব্বাদ বাক্য কেবল হিম-প্রধান দেশের লোকদের মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে। যখন এ প্রকার আশীর্ব্বাদ ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের বায়ুমণ্ডলের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গত হয় না, তখন বোধ হইতেছে যে ঋগ্বেদ-রচয়িতাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে এই

* ঋগ্বেদে ১ অষ্টক। ৬৪ সূক্ত। ১৪ ঋক।

আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রচলিত ছিল এবং সেই পূর্ব্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষ অপেক্ষা হিমতর প্রদেশে বাস করিতেন।"

এ মীমাংসা আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। "শত হিমঋতু জীবিতবান্" বলায় আর্য্যগণ কোন হিম প্রধান দেশে বাস করিতেন ভাবিবার কারণ কি? হিম ঋতু অর্থাৎ হেমন্তকালে ভারতবর্ষে চিরকালই রোগ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। অদ্যাপিও সেই সময় লোকের স্বাস্থ্য প্রায়ই নষ্ট হয়। সেই সময়ের কিয়দংশ 'যমাষ্টক' নামে প্রসিদ্ধ। এবং 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' প্রভৃতি কল্যাণ ও পরমায়ু কামনার উৎসব সমূহ সেই সময়েই হইয়া থাকে। পুরাকালে আর্য্যগণ এই দুর্দ্ধর্ষ হেমন্তঋতু নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করা মহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন এবং 'তোকম্ পুষ্যেম তনয়ম্ শতম্ হিমাঃ" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। ইহা হইতে আর্য্যগণ পুরাকালে কোন হিম প্রধান দেশে বাস করিতেন, পরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন, এরূপ মীমাংসা করিবার কোনই কারণ নাই। আর্য্যগণ যে ভারতের আদিম নিবাসী নহেন বেদ হইতে তাহার কোন প্রমাণ সঙ্কলন করা যায় না। ভারতই আর্য্যগণের আদিম স্থান এবং এস্থান হইতে তাঁহাদের শাখা প্রশাখা নানা দিগ্দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা স্বীকার করায় দোষ কি?

"জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা" শীর্ষক প্রবন্ধোক্ত প্রত্যেক কথায় আমরা অন্তরের সহিত অনুমোদন করি। আমরা ঐ প্রস্তাব হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণ কথোপকথন কালে বাঙ্গালার সহিত ইংরাজী শব্দ সকল মিশ্রিত করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন, দিন দিন এইরূপ ভাষাবিকৃতি বৃদ্ধি হইতেছে, জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা ইহার নিরাকরণার্থ সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। যে ভাব বাঙ্গালা ভাষায় সহজে ব্যক্ত হয় তাহা তাঁহারা ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। সদি নামক ইংরাজী গ্রন্থকর্ত্তা রচনা প্রণালী বিষয়ে একটী প্রস্তাব লেখেন তাহাতে বলিয়াছেন 'আমাদের ভাষা অতি উৎকৃষ্ট—অতি সুন্দর ভাষা। ইংরাজীর সহিত জর্ম্মন ভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ অনুরোধে দুই একটী জর্ম্মন শব্দ ব্যবহার সহ্য করিতে পারি, কিন্তু যেখানে বিশুদ্ধ সহজ ইংরাজী শব্দের দ্বারায় মনের ভাব ব্যক্ত হইতে পারে, সেখানে যিনি লাটীন বা ফরাসীয় কথা ব্যবহার করেন, মাতৃভাষার বিষম বিদ্রোহী বলিয়া তাঁহাকে প্রথমে ফাঁসি দিয়া তাহার পর তাঁহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা উচিত।" এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদিগের মধ্যে যদি এপ্রকার স্বদেশ ভাষানুরাগের অণুমাত্র ভাব থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা এক্ষণে কথোপকথন সময় যে প্রকার ভয়ানক অসঙ্গত ও সভ্যরুচি বিরুদ্ধ আচরণ করেন তাহা কখনই করিতেন না। 'বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের অনাটন' কোন কাজের কথা নহে, সে অনাটন বাস্তবিক নহে—তাহা কাল্পনিক। কিছু দিন হইল কতকগুলি দেশীয় কৃতবিদ্য মহাত্মাদিগের যত্নে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে; ভাবী বংশীয়দিগের নিকট ইহাঁরা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যদি বাঙ্গালা ভাষা সত্য সত্যই হীন ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে,

সর্ব্বদা বিশুদ্ধ প্রয়োগ সহকারে কথোপকথন দ্বারায় তাহার উন্নতি সাধন করা প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভাব, বিশেষ বিশেষ পদ ও কার্য্যালয়ের নাম ও কোন কোন গৃহোপকরণ প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে হইলে ইংরাজী শব্দ অপরিহার্য্য, কারণ তাহাদের বাঙ্গালা নাম কিছুই নাই। এরূপস্থলে স্বকপোলকল্পিত নূতন বাঙ্গালা শব্দ অথবা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে কেহ আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যেখানে বাঙ্গালা ভাষায় মনের ভাব সহজে ব্যক্ত হয়, সেখানে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অমার্জ্জনীয় দোষ। হয় তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজী নয় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ব্যবহার করুন, কিন্তু এই উভয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া যেন গোলযোগ না করেন। শিক্ষিতদিগের বর্ত্তমান কথোপকথনের ভাষা অতি বিকলাঙ্গ-ভাষা—অতি বিকৃত অপভাষা এবং আমরা অনুধাবন করি আর না করি, ইহা জ্ঞানী ও সুরুচিসম্পন্ন সভ্য দেশের লোকদিগের নিকট নিতান্ত ঘৃণার্হ ও আমাদিগের জাতি সাধারণ লজ্জাসূচক। আমাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিলে ইউরোপীয় কোন ভদ্রলোক হাস্য না করিয়া থাকিতে পারেন না; আমাদিগের লিখিত ভাষা দৈনন্দিন উন্নতিলাভ করিতেছে, কিন্তু কথোপকথনের ভাষার প্রতি আমাদিগের নিতান্ত অনাদর ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। যতদিন কোন জাতি কথোপকথন ও রচনায় সম্পূর্ণরূপে উপযোগী উন্নত ভাষার অধিকারী না হন, ততদিন সে জাতি উন্নতির পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারেন না। রেবরেণ্ড রিচার্ড সাহেব মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন 'মহোদয়গণ! যে পর্য্যন্ত জাতীয় গৌরবেচ্ছার সঞ্চার না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন জাতির, জাতি-প্রতিষ্ঠালাভ করিবার আশা নাই। জাতীয় ভাষা জাতীয় মনোবৃত্তির স্বাভাবিক নিদর্শন, তাহার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় গৌরব সাধন মনের ভ্রান্তি মাত্র। কোন জাতির উন্নতি পরীক্ষা করিতে হইলে তদীয় ভাষা তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু কার্য্য কারণের পরস্পর সহকারিতা আছে: কোন জাতির স্বাভাবিক নিয়মে ভাষোন্নতির উপায় করিয়া দাও, তাহা হইলেই তাহার স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হইবে। এবং ক্রমে জাতীয় চরিত্র নির্ম্মাণোপযোগী অন্যান্য গুণও সমুৎপন্ন হইবে। হে কৃতবিদ্যগণ! প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষিতা প্রদর্শন করুন। আপনাদিগের মাতৃ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি এ বিষয়ে সমুচিত মনোযোগ প্রদান করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য।

"জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সভ্যগণের মধ্যে আর একটী নিয়ম প্রচলিত থাকিবে। সে নিয়ম এই যে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় পরস্পরকে পত্রাদি লেখেন। কোন জাতির লোকে পরস্পরকে বিজাতীয় ভাষায় পত্র লেখে না। ইংরাজেরা পরস্পর পরস্পরকে ফরাসী বা জর্ম্মন্ ভাষায় পত্রাদি লেখেন না। তবে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতগণ পরস্পর পরস্পরকে ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখিয়া কেন মাতৃভাষার অবমাননা করেন? আমাদিগের ভাষা কি এত দীন যে তাহাতে কোন ব্যক্তি একখানি সামান্য পত্রও লিখিতে পারেন না? যে সকল যুবক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন অথবা

সম্প্রতি বিদ্যালয় ছাড়িয়াছেন ইংরাজী লিখনে নৈপুণ্য লাভের নিমিত্ত পরস্পরের সহিত ইংরাজীতে ইংরাজীতে পত্রাদি লেখা তাঁহাদিগের পক্ষে নিন্দনীয় নহে বরং তাহা আবশ্যকও বলা যায়, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে এরূপ করা উচিত নহে। বিষয়কর্ম্ম ঘটিত যে সকল লিপি ইংরাজীতে লেখা আবশ্যক, তাহাই কেবল ইংরাজীতে লেখা কর্ত্তব্য।"

"বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তি" ও "জাতিভেদ বিষয়ে বর্ত্তমান আন্দোলন" নামক প্রস্তাবদ্বয়ে বিশেষ কোন প্রশংসা বা নিন্দার কথা নাই।

"আশ্চর্য্য স্বপ্ন" নামক প্রবন্ধে সভ্যতা উন্নতি ও সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে অতি সুন্দর কটাক্ষ আছে।

অপরাপর প্রবন্ধের মধ্যে "সমাজ সংস্কার" নামক প্রবন্ধের তৃতীয় প্রস্তাবে লেখকের চিন্তাশক্তি, ভূয়োদর্শন এবং অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

এক্ষণে গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। রাজনারায়ণ বাবুর ভাষা একটু সেকেলে সেকেলে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়বাবুর ভাষার সহিত রামমোহন রায়ের ভাষা মিশাইলে যে ভাবে দাঁড়ায় রাজনারায়ণ বাবুর ভাষাও কতকটা সেই ভাবের বলিয়া আমাদের মনে হয়। সুতরাং ইহার সকল স্থান আমাদের কাণে ভাল লাগে না। স্থানে স্থানে যেন কেমন বাধ বাধ, কেমন নূতন নূতন বলিয়া বোধ হয় এবং যেন চেষ্টা করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হয়। আমরা নিম্নে দৃষ্টান্ত তুলিয়া দিতেছি।

"১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা সাধারণ লোককে অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়া প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাদিগের প্রাচীন পরম শ্রদ্ধাস্পদ সংস্কৃত ও আরবি ভাষাদ্বয়ের বিদ্যালয় সকল প্রধান প্রধান নগরে সংস্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন।"

"যখন ফ্রান্স ও জর্ম্মনিদেশে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল, তখন অমৃতোপম হৃদয়-স্ফূর্ত্ত্য কবিতা, পরকীয় ভাষার দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ, সহৃদয়তা শূন্য কবিদিগের মানস-ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ট্রুবাডর ও মিনিসিঙ্গর্ নামক দরিদ্র পরিব্রাজকগায়কদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া সারল্যসুধাসিক্ত কাব্যদ্বারা প্রকৃতির অকপট পুত্র ইতর লোকদিগের মনোমোহন করিয়াছিলেন।"

স্থানে স্থানে বাক্যে পদ স্থাপন যেন ইংরাজীর অনুরূপ বলিয়া মনে হয়; যথা—

"এমত সময়ে মহাত্মা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ সাহেব, যাঁহার ন্যায় প্যারগ ও ধর্ম্মশীল গবর্ণর্ জেনরেল্ এতদ্দেশে কখন আগমন করেন নাই, ও যাঁহার নিকট বিবিধ মহোপকার জন্য এই দেশ অশেষ কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছে, তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ দিবসীয় রাজ বিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার করিলেন, যে সাধারণ শিক্ষাকর্ম্ম তদবধি ইংরাজীভাষায় সম্পাদিত হইবেক।"

"পরন্তু তাহারা ভ্রান্ত হইবে যে কেবল ভূমি কর্ষণ ও বাণিজ্য করিবার জন্য মনুষ্য এখানে জন্ম গ্রহণ করে নাই, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি আছে যাহার মার্জ্জন ও উন্নতির প্রতি তাঁহার সুখ অনেক অংশে নির্ভর করে।"

শব্দের অপব্যবহার দোষও বিরল নহে; যথা,—

"ঐ সকল যুবকেরা যদ্যপি এই কথা বলেন যে বাঙ্গালা ভাষা অতি অসম্পন্ন হীন ভাষা তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে সিসিরোর সময়ের লাটিন ভাষার ন্যায় কিম্বা লেসিঙ্গের সময়ের জর্ম্মন ভাষার ন্যায় কি আমাদিগের বাঙ্গালাভাষা অসম্পন্ন?"

এখানে 'কিন্তু' পদ লাগে না। এ বাক্যে এবং অন্যত্রও শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় 'যদি' স্থলে 'যদ্যপি' লিখিয়াছেন। কিন্তু এতদুভয়ের যে অর্থগত বিভিন্নতা আছে, তাহা বোধ করি তাঁহাকে আর মনে করাইয়া দিতে হইবে না।

"অনেক ভদ্র সাহেবদিগের সহিত ইঁহার বিশিষ্টরূপ আলাপ আছে।"

এখানে বহুত্বজ্ঞাপক 'অনেক' এবং 'দিগ' উভয়ই থাকিতে পারে না। একটী বাদ দেওয়া আবশ্যক। এরূপ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ বাক্য গ্রন্থে দুর্ল্লভ নহে।

"তিনি বলেন যে, প্রধান ও ভদ্র সাহেবদিগের প্রিয় পাত্র হইবার জন্য ইংরাজী-ভাষাতে বিলক্ষণ বাক্ পটুতা ও সাহেবদিগের রীতিনীতি আচার ব্যবহার বিশিষ্টরূপে জানা ও স্বাধীন মনের চিহ্ন ও সাহস ভদ্রতা রূপে প্রকাশ করা ও সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহাতে জল উঁচু নীচু না করিয়া তিনি যাহা অযুক্ত বলিতেছেন ভদ্রতার সহিত তাহার অযুক্ততার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ দেখান ও তিনি যে বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে সৌজন্যের সহিত তাঁহাকে বিজ্ঞ করিয়া দেওয়া ইত্যাদি গুণ থাকিলে সাহেবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করা যায়।"

এই দীর্ঘ ও জটিল বাক্যে 'ও' পদের নিতান্ত অপব্যবহার করা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ একবাক্য মধ্যে 'ও' বা 'এবং' ব্যবহার করা ভাষার নিয়ম বিরুদ্ধ। বাক্য মধ্যে যে যে স্থলে ঐ সকল পদের প্রয়োজন হয় সে সকল স্থলে [illegible]দ (,) ব্যবহার করিয়া উপসংহার[illegible] 'ও' বা 'এবং' প্রয়োগ করা রীতি। পূর্ব্বোক্ত তাংশে 'সাহস ও ভদ্রতারূপে প্রকাশ লিখিত আছে।'—এটীও একটী বিশেষ ভ্রান্তির উদাহরণ।

বোধ করি ভাষার এবম্বিধ ত্রুটী আর দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

ভাষা সম্বন্ধে যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তৎসমস্তই ক্ষুদ্র দোষ বলিয়া পরিগণিত বা উপেক্ষিত হইবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু এ গ্রন্থের মত, যুক্তি, মীমাংসা ও চিন্তাই আদরের সামগ্রী ও তৎসমস্ত পরিব্যক্ত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব ভাষার দোষ সত্ত্বেও বিবিধ প্রবন্ধ অতি উপাদেয় গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইবার উপযুক্ত। স্থানের অল্পতা হেতু আমরা এই গ্রন্থের বাসনানুরূপ আলোচনা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত রহিলাম। ভরসা করি রাজনারায়ণ বাবু ত্বরায় ইহার ২য় ভাগ প্রকাশিত করিয়া পাঠকগণকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

শৈলবালা। উপন্যাস। একজন পরিব্রাজক প্রণীত। কলিকাতা। বসু প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৮৮। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

অদ্য একখানি উপাদেয় উপন্যাস গ্রন্থ সমালোচনার্থ আমাদের হস্তে উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য আমরা আমাদের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতেছি। পরিব্রাজক মহা-

শয় আর কখন অন্য কোনরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্যোদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থ দেখিয়া তাঁহাকে পুনরায় সাহিত্য সংসারে আবির্ভূত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। গ্রন্থে গ্রন্থকার মহাশয়ের নাম নাই। তিনি পরিব্রাজক বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বোধ হয় কঠোর সমালোচকদিগের দৌরাত্মে তিনি স্বীয় নাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। অন্যের অভিপ্রায় আমাদের পরিজ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু স্বীয় মতামতের উপর অবশ্যই আমাদের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে? সেই জন্যই আমরা অকপট চিত্তে তাঁহাকে অভয় দিতেছি এবং তাঁহার নাম ও পরিচয় জানিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

শৈলবালা উপন্যাস ক্ষুদ্র নহে। ইহাতে পাপের পতন ও পুণ্যের জয় বিবৃত হইয়াছে। পাপময় চরিত্র, ও দুষ্কৃতি রঞ্জিত চিত্র গ্রন্থে বাহুল্য রূপে আবির্ভূত করা হইয়াছে। কিন্তু সুকৌশলী লেখকের নৈপুণ্য হেতু কুত্রাপি পাপ প্রলোভনের সামগ্রী রূপে প্রতীয়মান হয় নাই এবং ঘৃণা ও ক্ষোভ ভিন্ন অন্য কোন ভাব উত্তেজিত করে নাই। সুরপতি সিংহের কন্যা শৈলবালা এই গ্রন্থের নায়িকা, সুরেন্দ্র নামক যুবা গ্রন্থের নায়ক, এবং বিজয়পুর-রাজকুমার অমরেন্দ্র প্রতিনায়ক; এই তিন জনই গ্রন্থের মুল ব্যক্তি। কিন্তু উপন্যাস থাকিতে গল্প বৈচিত্র্য প্রচুর পরিমাণে থাকায়, ইহাতে সুতরাং নানা নরনারী, নানা ঘটনা, নানা স্থান ও নানা বিবরণ আবির্ভূত হইয়াছে। স্থানের অল্পতা হেতু আমরা শৈলবালার গল্পাংশ সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠক মহাশয়দিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিলাম না।

গ্রন্থের আর একটী বিশেষ প্রশংসার বিষয়—ভাষা। পরিব্রাজক মহাশয়ের মাতৃভাষায় বিশেষ অধিকার আছে, আজিকার বাজারে ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যে কাল পড়িয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর ছেলে নির্ভুল বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, ইহাও একটা বিশেষ সুখ্যাতির কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদপেক্ষা অধঃপতনের চিহ্ন আর কি আছে!

তাহার পর এক্ষণে যাহা বলিতে হইতেছে, ভরসা করি, গ্রন্থকার মহাশয় তাহা অপ্রিয়ভাবে গ্রহণ করিবেন না। গ্রন্থের প্রধান দোষ, সংকীর্ণ স্থানে বৃহৎ ও জটিল গল্প সমাবেশ করিবার চেষ্টা। এই মূল দোষ হইতে আনুষঙ্গিক বিস্তর দোষের আবির্ভাব হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থোক্ত কোন্ পাত্র, কোথা হইতে, কোন্ স্থানে, কেন আসিয়া পড়িতেছেন তাহা সকল স্থলে সুন্দররূপে বুঝা যায় না। যেন, বোধ হয়, গ্রন্থকারের বাসনা ও অভিপ্রায়ানুসারে পাত্রগণ নির্দ্দিষ্টরূপে নিরূপিত স্থানে অপেক্ষা করিতেছে —যখন তিনি যাহাকে সম্বোধন করিতেছেন, ও যাহাকে যে আদেশ করিতেছেন, সে তখনই উপস্থিত হইয়া আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিতেছে। ঘটনাস্রোত কখনই এরূপ ভাবে প্রবাহিত হয় না, সুতরাং এতদ্ধেতু অস্বাভাবিকতা দোষ ঘটিতেছে। গ্রন্থকার অনেক স্থলে কেবলই কার্য্য দেখাইয়াছেন, হৃদয় দেখাইতে অবকাশ পান নাই। বর্ত্তমান কালের উপন্যাস এতাদৃশ

প্রণালীর অনুমোদন করে না। আমোদের সহিত শিক্ষা প্রদান যদি উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ঘটনা ও কার্য্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হৃদয়াভ্যন্তরে যে ভাবসমূহ সমুৎপন্ন হয়, তাহা পাঠককে একটু বুঝাইতে চেষ্টা করা সৎপরামর্শ। সকল স্থলে সেরূপ করা হয় নাই বলিয়া, কোন কোন চরিত্রের এবং তৎকৃত কোন কোন কার্য্যের সজীবতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেন তাহারা কোন অলক্ষ্য সূত্রে বদ্ধ হইয়া, অথবা কোন অপরিজ্ঞাত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছে, যেন তাহাদের স্বাধীনতা, সজীবতা কিছুই নাই। কোন কোন স্থলে আনুষঙ্গিক গল্প ও বর্ণনা যেন জোর করিয়া প্রবিষ্ট করান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; যেন মূলের সহিত সে সকল ভাল মিশে নাই বলিয়া অনুমান হয়।

উল্লিখিত দোষ সমূহ প্রধানতঃ ক্ষুদ্র স্থানে বহু ঘটনাপূর্ণ, বহু চরিত্রপূর্ণ জটিল উপাখ্যান বিনিবিষ্ট করায় সংঘটিত হইয়াছে। এজন্য আমরা বিবেচনা করি যে, গ্রন্থকার মহাশয় একটু মনোযোগী হইলে এ সকল ত্রুটী সহজেই পরীহার করিতে পারিতেন।

—. কথিত অসম্পূর্ণতা সত্তেও শৈলবালা যে একখানি সুপাঠ্য উপন্যাস, তাহাতে সংশয় করি না। আমরা গ্রন্থকার মহাশয়কে মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে পুনরায় লেখনী ধারণ করিতে দেখিলে সুখী হইব।

নর-শরীর বিধান। শ্রীআশুতোষ মিত্র প্রণীত। শ্রীরাধাগোবিন্দ কর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। ১৮৮২

বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী মহাশয় 'নরদেহ নির্ণয়' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে যে গ্রন্থ প্রচারিত হয় তৎকালে বাঙ্গালায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নিতান্ত অভাব ছিল এবং শব্দ ভাণ্ডারও নিতান্ত অপূর্ণ ছিল। সুতরাং তৎকালে নরদেহ নির্ণয় প্রণয়ণ করিতে গ্রন্থকারকে অবশ্যই অধিকতর আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান সমালোচ্য গ্রন্থ রাজকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থাপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় হইলেও গুণ গরিমায় তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার ভাষা সরল, এবং প্রণালী উন্নত, নবাবিষ্কার ও নূতন মত ইহতে বিন্যস্ত আছে, এবং সমস্ত প্রসঙ্গই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত গ্রন্থকার যথাবিহিত যত্ন করিয়াছেন। ইহাতে যে সকল চিত্রকার্য্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। এরূপ সরল ও সুসম্পন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ যদি বঙ্গে বর্ষে বর্ষে এক খানি করিয়াও প্রচারিত হয়, তাহা হইলে দেশের বিশেষ লাভ হয় সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া, রক্তের ক্ষতিবৃদ্ধি, শিশুদিগের খাদ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। কঠিন ও নীরস বিষয় অতি সহজ ও মনোরম করিয়া দেখাইতে গ্রন্থকারের বিশেষ দক্ষতা আছে। এইরূপ ক্ষমতাবান লোকেরই বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে হস্তার্পণ করা আবশ্যক।

গ্রন্থের মধ্যে ২।১টী ইংরাজি শব্দ রহিয়া গিয়াছে। যথা 'আমিবা' 'অবলঙ্গেটা' ইত্যাদি। এ সকল শব্দ বাঙ্গালায় লেখা উচিত ছিল। গ্রন্থের ভাষা কোন কোন স্থলে লেখকের অনভ্যাস ও শিথিলতার পরিচয় দিতেছি। ভরসা করি আগামিবারে এ সকল দোষ পরীহার করিতে যত্ন করা হইবে।

খাদ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চাউলই বঙ্গবাসীর প্রধান খাদ্য, কিন্তু কোন্ প্রকার চাউলের কি গুণ ও কোন্ প্রকার চাউল সিদ্ধ করিলে কিরূপ ভাত হয়, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সচরাচর লোকে সিদ্ধ চাউল আহার করিতে ভালবাসে ও নূতন চাউল খাইতে অনিচ্ছুক। কিন্তু কি নিমিত্ত এরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা সবিশেষ কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। কোন কৃতবিদ্য রাসায়নিক শাস্ত্রবেত্তা এই বিষয়টী অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফল সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকাশ করিলে দেশের একটী প্রধান উপকার করা হয়। ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, নূতন চাউল সিদ্ধ করিলে শীঘ্রই অত্যন্ত নরম হইয়া যায় ও মাড় অত্যন্ত ঘন হয় এবং শীঘ্রই জমিয়া যায়। বাস্তবিক নূতন চাউলের ভাত জীর্ণ করিতে অধিক সময় লাগে। নূতন চাউল সিদ্ধ হইলে পরিমাণে অল্পই বৃদ্ধি হয়। পুরাতন চাউল অধিক পরিমাণ জল ধারণ করে ও উহার আয়তন বৃদ্ধি হয়। ১ পোয়া উত্তম আতপ চাউল /১ সের ১০ ছটাক জলের সহিত সিদ্ধ করিলে ৩ পোয়া ভাত ও ৩ পোয়া মাড় উৎপন্ন হয়। ১ পোয়া সিদ্ধ (পুরাতন) চাউল /১ সের ১০ ছটাক জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৩ ছটাক ভাত ও ৮ ছটাক মাড় হইয়াছিল, এক পোয়া মোটা সিদ্ধ চাউল /১ সের ১২ ছটাক জলের সহিত সিদ্ধ করিলে ৸৵০ সাড়ে তিন পোয়া ভাত, /১ সের মাড় উৎপন্ন হয়। এক পোয়া আতপ চাউল ৩ পোয়া জলে সিদ্ধ হইয়া মোটে সাড়ে তিন পোয়া ভাত হইয়াছিল ও মাড় ছিল না। এই সামান্য পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া কোন মত স্থির করা যায় না। কিন্তু ইহা দৃষ্ট হইবে যে, আতপ চাউল অপেক্ষা সিদ্ধ চাউল অধিক জল ধারণ করে ও মোটা চাউল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জল ধারণ করে। চাউল সিদ্ধ করিয়া উহার মাড় ফেলিয়া দেওয়া প্রথা কত কাল চলিতেছে ও কি কারণে পুরাতন বঙ্গবাসীরা ঐরূপ করিতে বাধিত হইয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, এক সের চাউল সিদ্ধ করিলে প্রায় তিন সের মাড় জন্মে, ও প্রতি সের মাড়ে প্রায় ৪০০ শত হইতে ৮০০ শত গ্রেন পর্য্যন্ত শ্বেতসার পদার্থ থাকে; সুতরাং ৩ সের মাড়ে (গড়ে সের প্রতি ৬০০ গ্রেণ) প্রায় ১৮০০ শত গ্রেন অর্থাৎ ২ ছটাক অপেক্ষা অধিক শ্বেতসার থাকে, অতএব ১ সের চাউল পাক করিলে কেবল চৌদ্দছটাক চাউলের ভাত উৎপন্ন হয় এবং যে পরিমাণ চাউল সিদ্ধ করা যায় তাহার আট অংশের এক অংশ পরিত্যক্ত হয়। ডাক্তার পার্কস সাহেব বলিয়াছেন যে, মাড়ের সহিত কিয়ৎপরিমাণ যবক্ষারজানময় পদার্থও বহির্গত হইয়া যায়। একেই ত চাউলে যবক্ষার জানের অংশ অতি অল্প, আবার মাড়ের সহিত তাহার যদি কোন

অংশ পরিত্যক্ত হয় তবে ভাতের পুষ্টি-কারিতার অত্যন্ত হ্রাস হয়, তবে কি কারণে আমরা ভাতের মাড় ফেলিয়া দিই? যদি কেবল শ্বেতসার পরিত্যক্ত হইত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না, কারণ চাউলে শ্বেত-সারের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, এবং যব-ক্ষার জানের পরিমাণ হ্রাস না হইয়া শ্বেত-সারের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে যব-ক্ষার জান ও অঙ্গারের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকিত। চাউল সিদ্ধ করিবার বিষয়ে উপদেশ অনাবশ্যক। ধীরে ধীরে সিদ্ধ হইলেই সুপক্ক হয়। ভাতের সহিত মাখম বা ঘৃত ও লবণ ব্যবহার করা পরামর্শ-সিদ্ধ। কিন্তু যদি কোন ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে নহে। সচরাচর সিদ্ধ চাউল জীর্ণ করিতে অতি অল্প সময় আবশ্যক, প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই অন্ন পাকস্থলী পরিত্যাগ করে। ঘৃতপক্ক পলান্ন কিম্বা পায়সান্ন প্রায় ৩। ৪ ঘণ্টা অতীত না হইলে পাকস্থলী পরিত্যাগ করে না।

দাল।—এদেশে কয়েক প্রকার দাল ব্যবহৃত হয় যথা, মুগ, মাসকলাই, মুসুর, অরহর, ছোলা, মটর ও খেঁসারি। ইহাদের কয়েকটীর সমাস নিম্নে লিখিত হইল।

	জল	যবক্ষারজানময়	শ্বেতসারময়	তৈলময়	লবণ
মুসুর	১১.৮৪	২৫.১৫	৫৯.৮৫	১.২৬	১ ৯২
ছোলা	১১.৩৯	২২.৭০	৬৩.১৮	৩ ৭৬	২.৬০
মাসকলাই	১২.৪৪	২৪.৭৩	৫৮.৭৬	১.৩৬	৩ ১৭
মুগ	১৩.০	২৪ ০	৬০ ০	০	৩
বড় মটর	১১.৭৯	২৭.৯৬	৫৬.৩৬	১ ৪৭	২ ৪৮

উপরোক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হই-তেছে যে বড় মটর দাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যবক্ষার জানময়, মুসুরে তদপেক্ষা কিঞ্চিত অল্প, মুসুরে লবণ অতি অল্প পরিমাণ আছে, তৈলময় পদার্থের পরিমাণ সকলেতেই অতি অল্প।

পশ্চিম বঙ্গদেশে মাস কলাই দাল, ও পূর্ব্ব বঙ্গ প্রদেশে মুসুর ও মটরই অধিক ব্যবহৃত হয়। লোকের বিশ্বাস যে মাস-কলাই অতি স্নিগ্ধকারী ও মুসুর "গরম," ইহাও বিশ্বাস যে মুখ রোচক গুণ বিশিষ্ট। অরহর, মটর ও ছোলা সকলই গুরু ও দুষ্পাচ্য বলিয়া বিখ্যাত। ছোট মটরও অন্যান্য দালের ন্যায় পুষ্টিকর নহে। কি কারণে ঐ সমুদয় দালে উক্ত দোষ বা গুণ আরোপ করা হয় তাহা আমরা অব-গত নহি। উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে বোধ হয় যে মুসুরই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। পূর্ব্ব বঙ্গদেশে উহা সহজেই জীর্ণ হইয়া থাকে। অরহর, মটর ও ছোলার দাল সহজে উক্ত জলের সহিত মিশ্রিত হয় না, ও সিদ্ধ করিলেও কঠিন থাকে, সুতরাং পাকস্থলিতে জীর্ণ হইতে বিলম্ব হয়। প্রায় সকল প্রকার দাল অধিক কাল রাখিলে আর উত্তম রূপে সিদ্ধ হয় না, এনিমিত্ত সর্ব্বদা টাট্‌কা দাল ব্যবহার করা উচিত।

সকল প্রকার দালেই তৈলময় পদার্থের অংশ অল্প, এ নিমিত্ত রন্ধনকালে ঘৃত বা তৈল সংযোগ করা আবশ্যক। চাউলের ন্যায় দালও অতি ধীরে ধীরে মন্দ মন্দ

উত্তাপ দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়। কখন কখন খেঁসারির দালও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ঐ দালের এক প্রধান দোষ আছে, অধিক পরিমাণ বা অধিক কাল ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত রোগ জন্মে, কি কারণে যে এ রূপ হয় তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কিন্তু যে কারণেই হউক না কেন, ইহার অনিষ্টকারিতার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এ নিমিত্ত ঐ দাল ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। দালের যে যে গুণ আছে তাহা অন্য কোন খাদ্যে নাই, সুতরাং দাল ব্যবহার না করিয়া অন্য কোন সামগ্রী ব্যবহার করিলে সম্যোপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই। এ নিমিত্ত প্রতি দিবস নিরূপিত পরিমাণে দাল ব্যবহার করা আবশ্যক, এবং যাহারা অন্ন আহার করে, তাহাদের সকলেরই দাল ব্যবহার করা উচিত।

মৎস্য।—খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে দৃষ্ট হইয়াছে যে, মৎস্য ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যের সাহায্যে নিরূপিত পরিমাণ যবক্ষারজান ও শ্বেতসারময় পদার্থ উদরস্থ করা যাইতে পারে না। মৎস্য না খাইয়া মাংস ব্যবহার করিলে আর সে অভাব থাকে না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাংস এদেশের এক প্রকার অখাদ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। সুতরাং যাহারা মাংস ভক্ষণ করিবে না, তাহারা মৎস্য আহার না করিলে কিরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে। যবক্ষারজানের পরিমাণ যথোচিত না হইলে পরিশ্রম (বিশেষতঃ মানসিক পরিশ্রম) করা অসম্ভব। জীব হিংসা পাপ বিবেচনা করিয়া অনেকে মৎস্য-মাংস ভোজন করেন না। জীব হিংসা করা পাপ কি না, তাহা বলিতেও প্রস্তুত নহি, কিন্তু শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষা যে এক প্রধান পুণ্য কর্ম্ম তাহা বলিতে পারা যায়, সুতরাং শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে যাহা করা আবশ্যক, তাহা কোন মতে পাপ কর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ, ডিম্ব ইত্যাদি ভক্ষণ করাও পাপ। কিন্তু আমাদের মতে শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থ জীব হিংসা পাপ বলিয়া বোধ হয় না, বরং মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও ডিম্ব ব্যবহার না করিয়া শরীরকে দুর্ব্বল ও অসুস্থ করাই পাপ বলিয়া বিশ্বাস, এ নিমিত্ত পাঠকবর্গকে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতে পরামর্শ দিতেছি। মৎস্য ব্যবহার সম্বন্ধে ডাক্তার স্মিথ তাঁহার পুস্তকের ১০৬ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনুবাদিত হইল। 'কোন জাতি আমিষ যবক্ষারজানময় পদার্থের মধ্যে কেবল মৎস্য ব্যবহার করিবে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। এবং উহার সহিত দুগ্ধ ও ডিম্ব ব্যবহার করিলেও সে জাতীয় লোক মাংসাশী জাতিদিগের ন্যায় বল বীর্য্যশালী হইতে পারে না। আরও মৎস্যে অধিক পরিমান ফস্‌ফরস্‌ আছে এ নিমিত্ত যাহারা অধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক চালনা করে কিম্বা যাহারা অত্যন্ত চিন্তা করে, বা মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করে তাহাদিগের নিমিত্ত মৎস্য বিশেষ উপকারী।'

বড় মৎস্য যথা রোহিত, কাতলা, মিরগেল, কালবোস প্রভৃতি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুখাদ্য। মাগুর, শিঙ্গী, পাঁকাল ইত্যাদি শল্কশূন্য মৎস্য সুস্বাদু ও সহজে জীর্ণ হয়, এনিমিত্ত রোগীর পথ্য বলিয়া বিখ্যাত। বাটা ও বড় পুঁটি মাছও উত্তম। অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য সহজে জীর্ণ হইতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে অত্যন্ত কাঁটা থাকায়

আহার করিতে বিরক্তি জন্মে, অথচ কাঁটার সহিত আহার করিলে পেটের পীড়া উৎপন্ন হয়। ইলিস, ভেট্‌কি ইত্যাদি মৎস্যে তৈলময় পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, সুতরাং দুষ্পাচ্য। অল্প পরিমাণে আহার করিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। অনেক সময় ইলিস মৎস্য অত্যন্ত সুলভ হয়, তৎকালে লোকে লোভপরবশ হইয়া অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া পীড়িত হইয়া থাকে। অনাহারে দিনাতিপাত করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ,তথাপি কদাচ পচা মৎস্য ভক্ষণ করিবে না,—উহা উদরাময় রোগের এক প্রধান কারণ।

বাস্তবিক মৎস্য না হইলেও চিঙ্‌ড়ি এদেশের মৎস্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। বড় চিঙ্‌ড়ি, মৎস্য অপেক্ষাও অধিক পুষ্টিকর, কিন্তু যেমন পুষ্টিকর সেইরূপ দুষ্পাচ্য। কিন্তু পরিমিত রূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। ছোট (বাদা) চিঙ্‌ড়ি উদরাময় রোগের জন্মদাতা বা প্রতিপালক। উহার মাংস তত অনিষ্টকর নহে কিন্তু ছাল্ থাকা প্রযুক্ত ঐরূপ ঘটিয়া থাকে।

ময়দা।—অনেকে রাত্রিকালে অন্ন আহার করেন না তৎপরিবর্তে ময়দা বা আটার রুটী খাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে একবার অন্ন ও একবার ময়দা ব্যবহারে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, যে হেতু চাউল অপেক্ষা গোধূম অধিক পুষ্টিকর সামগ্রী। উহাতে যবক্ষার জানময় পদার্থের পরিমাণ চাউল অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু গোধূম সকল ব্যক্তির পাকস্থলীর যোগ্য নহে। অভ্যাস দ্বারা কিরূপ হইতে পারে বলা যায় না, কিন্তু আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে রুটী ভক্ষণ করিলে অনেকের অম্ল-রোগ জন্মে, বোধ হয় অনভ্যাসই তাহার কারণ। অনেক সময় পুরাতন ময়দা ব্যবহার করিয়া পীড়িত হইতে হয়।

সচরাচর দুই প্রকার গোধূম দৃষ্ট হইয়া থাকে, ১ "দুধে", ২ "জামালি"। প্রথমোক্ত গোধূম অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বড়, শ্বেতবর্ণ, ও কোমল; উহাতে শ্বেতসারের পরিমাণ অধিক। দ্বিতীয় প্রকার গোধূমে সুজির পরিমাণ অল্প, উহাতে যবক্ষারজানময় পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে, উহার ময়দা কিঞ্চিৎ হরিদ্রা বর্ণ হয়। এক মন "দুধে" গম হইতে ৵১ সুজি ৷৵৮ ময়দা ৵৮ ভুষি পাওয়া যায়। সুজি এক প্রধান ও বিশুদ্ধ শ্বেতসার, উহা অত্যন্ত লঘু ও সহজে জীর্ণ হয় এনিমিত্ত রোগীকে সময়ে সময়ে সুজীর রুটী ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়। সুজী বাহির করিয়া অবশিষ্টাংশকে পেষণ করিলে, একপ্রকার ময়দা হয়, উহা অত্যন্ত পুষ্টিকর কিন্তু গুরু, কারণ উহাতে যবক্ষার জানময় পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। এইরূপ ময়দা কোন কোন পীড়ার বিশেষ উপকারী পথ্য। সুজী বাহির করিয়া না লইলে ময়দায় শ্বেতসার ও যবক্ষার জানময় পদার্থ যথোচিত রূপে মিশ্রিত থাকে। সেই ময়দা দেখিতে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ অতি কোমল, দুর্গন্ধ ও অম্লতা শূন্য। ময়দা কিছুদিন রাখিলে উহাতে গন্ধ হয়, উহা বিবর্ণ ও অম্লস্বাদ বিশিষ্ট হয়। অনেক সময় এইরূপ পুরাতন ও অর্দ্ধবিকৃত ময়দা ব্যবহার করিলেই পীড়িত হইতে হয় এবং উহাতে অনিচ্ছা জন্মে। "দুধে" গমের ময়দা একেবারে শুভ্রবর্ণ; "জামালি" গমের ময়দা ঈষৎ পীত বর্ণ।

এদেশে সুজির (দানা) বড় বড় রাখা হয় সুতরাং সিদ্ধ হইতে বা পরিপাক করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। উত্তমরূপ পেষণ করিয়া লইলে সহজেই পরিপাক হইতে পারে। সচরাচার যে সুজী ব্যবহৃত হয় তাহাকে ১০। ১২ ঘণ্টা শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে রুটী প্রস্তুত করিলে সহজে জীর্ণ হইবে ও অম্লতা বা অন্য কোন দোষ জন্মিবে না। দুগ্ধ ও চিনির সহিত সিদ্ধ হইলে অতি উপাদেয় খাদ্য হয়। কিন্তু লোভ পরবশ হইয়া অধিক খাইলে অজীর্ণ হইবার সম্ভাবনা। ময়দা হইতে রুটী ও লুচী দুই প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য যে লুচী অপেক্ষা রুটী সহজে জীর্ণ হয়। ময়দার তৈলময় পদার্থের পরিমাণ অল্প এ নিমিত্ত উহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত সংযোগ করা আবশ্যক, সেই নিমিত্তই রুটীতে প্রায়ই অল্প পরিমাণে ঘৃতের প্রলেপ দেওয়া যায় ও তদ্দ্বারা উহার ঐ অভাব মোচন হয়। কিন্তু লুচীতে ঐ ঘৃতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, সেই নিমিত্ত অত্যন্ত দুষ্পাচ্য। কেহ কেহ ৩০। ৩২ খান লুচী খাইয়া জীর্ণ করেন বটে. কিন্তু তন্নিমিত্ত যে রূপ পাচক যন্ত্রের আবশ্যক। তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। শ্বেতসার জীর্ণ করিবার নিমিত্ত লালারস আবশ্যক; আহার করিবার সময় ঐ রস নিঃসৃত হয় বটে, কিন্তু ঘৃত সিক্ত লুচীতে প্রবেশ করিতে পায় না, সুতরাং যতক্ষণ লুচীর অন্তর্গত ঘৃত পৃথক না হয়, ততক্ষণ উহা জীর্ণ হইবার কোন সুবিধা ঘটে না, সুতরাং অনেক বিলম্ব হয়। লালারস, পাকস্থলীর অম্লরস দ্বারা অল্প ঘনীভূত হইয়া যায়, পরে শ্বেতসার বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া বিসমাসিত হয় ও নানা প্রকার বাষ্প উৎপন্ন হয়। অধিক পরিমাণে মোহন ভোগ খাইলেও এইরূপ হইবার সম্ভাবনা। এ সমুদায় কারণেই লুচীর পরিবর্ত্তে অল্প ঘৃত সংযুক্ত রুটীই শ্রেয়ঃ।

ক্রমশঃ

রোজ রোজ মরা।

মরার ভয় বড় ভয়। এমন সোণার সংসার, এমন চাঁদের হাটবাজার এই সব ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, এ ভাবনা বড় ভাবনা। এ সংসারে সব থাকিবে, বসন্তের কোকিল, প্রভাতের বাতাস, পূর্ণিমার চাঁদ, ফুলের সৌরভ, প্রিয়ার মুখ, সকলই থাকিবে,—কেবল থাকিবনা আমি। এ চিন্তা মনে হইলে হৃৎকম্প হয় না, এমন লোক বড় কম। তাই বলিতেছি, মরার ভয়, বড় ভয়।

মরিতে আমরা এত ভয় পাই বটে, কিন্তু মরা ব্যাপারটা যে কি তাহা আমরা বুঝি না; কোন্ টুকুর নাম মৃত্যু তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। শাস্ত্রকারেরা শরীরের নাশকেই মরণ বলিয়াছেন। মোটা মুটী এই বুঝি যে, মানুষ মরিলে তাহার

এই মলয় মারুত সেবিত, সুগন্ধ চর্চ্চিত, অতি যত্নে সংরক্ষিত দেহ নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, পচিয়া গলিয়া ঢোল হইয়া কিম্ভুত কিমাকার হইয়া পড়ে; শেষে হাড় মাস ছত্রছাড়া হইয়া কোথাকার জিনিষ কোথায় যায় তাহার নিদর্শনও থাকে না। তবেই শরীরের নাশকেই মরণ বলিতে হইতেছে।

শরীরের নাশই যদি মরণ হয় তবে আর একটা বিশেষ গোলের কথা উঠি-তেছে। আমাদের এই শরীরটা কি? কতক-গুলা সামগ্রী একত্র করিয়া শরীর যন্ত্র খাড়া হইয়াছে। রক্ত, মাংস, পেশী, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, অস্থি, মজ্জা, বসা প্রভৃতি নানা বস্তু লইয়া এই শরীর। শরীরের নাশ বলিলে ঐ সকল পদার্থেরই নাশ বুঝায়। তাহা হইলে মরণটা কি? না ঐ সকল পদার্থের নাশ। এপর্য্যন্ত বেশ বুঝা গেল। তাহার পর কথা যে, ঐ সকল পদার্থ ঘটিত এই শরীর আজি মরণের পর নষ্ট হইতেছে এবং মরণের পূর্ব্বে আজন্ম কাল সমভাবে চলিয়া আসিতেছে, একথা কে বলিল? শরীর মরণ হেতু আজি নূতন করিয়া নষ্ট হইতেছে না। জন্মের পর প্রতিনিয়ত শরীরের নাশ হইতেছে। আমরা যে শরীর লইয়া জন্মাই, দশ বৎসর বয়-সের সময় আমাদের সে শরীরে পূর্ব্ব শরী-রের কিছুই থাকে না, সে সকল নষ্ট হইয়া যায়। নূতন রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি তাহাদের স্থান অধিকার করে। আবার বিশ বৎসর বয়সের সময় দশ বৎ-সর কালে যে দেহ ছিল তাহার কিছুই থাকে না। এইরূপে শরীরের নাশ রোজ রোজ ঘটিতেছে। তবে কি আমরা রোজ রোজ মরিতেছি?

শরীরের নাশই যখন মরণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন আমরা মরিব বলিয়া আতঙ্কে মারা যাই কেন? আমরা তো এ বয়সে অনেকবার মরিয়াছি, না হয় আর একবার মরিব। রোজরোজই আমরা চুপে চুপে লুকাইয়া মরি, একদিন না হয়, সদরে লোক দেখাইয়া মরিব। তাহাতে ক্ষতি কি?

যদি বল আমরা রোজ রোজ যে মরি সে লুকান মরায় আমাদের শরীর সদরে মরার মত ভয়ানক হয় না। এবং বলিয়া কহিয়া মরা দেখিতে যেমন খারাপ, চুরি করিয়া মরা তেমন খারাপ নহে। মানি-লাম প্রকাশ্যে মরাটা বড় ভাল দেখায় না; আরও মানিলাম যে, প্রকাশ্য মরায় ভাল হউক মন্দ হউক, লোক কিছু কাতর হয়। কিন্তু শেষ ফল ধরিয়া বিচার করিলে ঢাক বাজাইয়াই মর, আর রোজ রোজ চুপে চুপে যেমন মরিতেছ তেমনিই মর, তাহাতে প্রভেদ কিছুই নাই। মরার পর দেহটা হয় কি? কবি রামপ্রসাদের আত্মা আমা-দের ঘাড়ে চাপিলে আমরা বলিতাম

'যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়
লয় হয়ে সে মিশায় জলে।'

তেমনি দেহও লয় হইয়া যাইবে। কিন্তু সে কথাটা ঠিক নয় তো দেহ তো লয় হয় না। দেহের মূর্ত্তির অন্যথা হয় মাত্র, লয় এক বর্ণও হয় না। কতকটা মাটী হয়, কতকটা জল হয় ইত্যাদি রূপে রূপান্তরিত হইয়া যেখানকার দেহ সেইখানেই থাকে। লয় কিছুই হয় না। হয় তো দেহ হইতে নূতন জীব, উদ্ভিদ, ধাতু বা অন্যান্য পদার্থ জন্মে। তাহাকে লয় বলিবে কোন্ হিসাবে? লয় যদি না বল, তবে একথা

বলিতে আপত্তি নাই যে, মরার পর দেহটা রূপান্তরিত হয় মাত্র।

মরার পর দেহ তবে আর এক রকম হইয়া যেখানকার জিনিষ সেখানেই থাকে। চুপি চুপি না বুঝিয়া আমরা যে মধ্যে মধ্যে মরি তাহার ফলও ঠিক সমান। সে মরাতেও লয় হয় না, ঠিক প্রকাশ্য মরার মত দেহ আর এক রকম হইয়া থাকে। তবে পরিণাম ধরিয়া বিচার করিলে স্বগত মরণ ও প্রকাশ্য মরণে প্রভেদ কিছু দেখা যায় না।

তাহার পর যদি বল, স্বগত মরণে আমাদের একটা লাভ আছে। আমাদের শরীর যেমন রোজ রোজ লুকাইয়া লুকাইয়া মরে, তেমনি রোজ রোজ লুকাইয়া লুকাইয়া নূতন শরীর আসিয়া আমাদের লোকসান্ পুরাইয়া দেয়, সুতরাং ক্ষতি আমরা টের পাই না এবং যাহা যায় তাহার জন্য দুঃখ করিবারও কোন দরকার থাকে না। কিন্তু প্রকাশ্য মরণে আমাদের কোন লাভ নাই কেবল ক্ষতি আছে। যে দেহ যায় কিছুতেই সে লোকসান পুরে না। সে যে যাওয়া সেই যাওয়া। এক পক্ষে কোন লোকসান নাই, আর এক পক্ষে বিষম লোকসান। এ বড় শক্ত কথা।

মরণের পর লোকে যে হায় হায় করিবে, আত্মীয়গণ খানিকটা আপনা আপনি করিয়া কাঁদিবে সেও একটা সুখ মনে করিয়া মরণে রাজি হইতে পার না কি? পার না। তুমি বলিবে এমন তৈয়ারি দেহ, এমন পাকা মাল ছাড়িয়া দিলাম কি দুটা মুখের কথা, একটু চক্ষের জলের জন্য? কি দায়! এ লোভে তুমি মরিতে চাহিবে কেন?

মরণে অন্য লাভ কি নাই? কেবলই লোকসান্? না—না, মরণে পরম লাভ আছে। জীবনে এমন কোন লাভ নাই যাহার সহিত সে লাভের তুলনা হইতে পারে। যাঁহার এই সংসার, যাঁহার ব্যবস্থায়, যাঁহার আজ্ঞায়, যাঁহার বাসনায় এই বিশ্বের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটটী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, যাঁহার করুণা ও ক্ষমতার পরিচয় সর্ব্বত্র পরিব্যক্ত রহিয়াছে, যাঁহার মহিমা আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেছি, মরণের পর সেই সর্ব্বলোক পালক, সর্ব্বলোকাশ্রয়, সর্ব্বসদ্‌গুণসমষ্টি ঈশ্বরকে দেখিয়া, ঈশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইয়া আমরা প্রাণ জুড়াইব! এখনও কি বলিবে, মরণে কেবল লোকসান্? মরণে যে লাভ জীবনে তাহার কাণিকাও নাই। আমি এখানে ধর্ম্ম বিচার করিতে বসি নাই। সুতরাং এ কথা আর অধিক বলিবারও প্রয়োজন নাই।

দেখা গেল মরণ যে হঠাৎ আইসে অথবা নূতন করিয়া হয় এমন নয়। মধ্যে মধ্যে আমরা মরিয়া থাকি; সে অজ্ঞাত মরণে লাভ লোকসান্ কিছুই হয় না। অথচ আমরা তাহাতে ভীত বা কাতর নহি। আর যে মরণে আমাদের লোকসানের অপেক্ষা লাভের ভাগ অনেক অধিক, সেই মরণে আমরা অত্যন্ত পিছু পা বরং তাহার নাম শুনিলে কাঁপিয়া উঠি।

প্রাচীন হিন্দুরা এইরূপে রোজ রোজ মরিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহারা 'বার বার ইহ সংসার কারাগারে' যাতায়াত করিতে তাক্ত হইতেন। ধর্ম্মোন্মত্ত, প্রেমোন্মত্ত আর্য্যঋষিগণ মৃত্যুর ভয় করিতেন না; তাঁহারা মৃত্যুর আগমন সুখের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। পরব্রহ্মের সমীপগত হইব

ভাবিয়া মৃত্যু কালে তাঁহারা প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেন। আমরা সেই পুণ্যশীল সাধু-পুরুষদিগের সন্তান। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? আমরা রোজ রোজ না জানিয়া বিনা লোভে মরিব, আর জানিয়া শুনিয়া পরম লাভের জন্য একদিন মরিতে পারিব না?

ভারতীয় রাজকুল-দর্পণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

জয়পুর বিবরণ—প্রথম প্রকরণ।

জয়পুর রাজ্যের উত্তরে বিকানীর, হিসার ও পাতিয়ালা; পূর্ব্বে অলোয়ার এবং ভরতপুর; দক্ষিণে করৌলী, গোয়ালিয়র, বুঁদী, টঙ্ক, মিবার ও অজমীর; এবং পশ্চিমে কিষণগড়, মাড়োয়ার ও বিকানীর। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৪০০০ বর্গ ক্রোশ এবং লোক সংখ্যা প্রায় ১৯,৯৫ ০০০ হইবেক। রাজস্ব প্রায় সাড়ে সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে প্রায় চারি লক্ষ টাকা কর দিতে হয়। সেনা পরিমাণ;—৭৬৮ গোলন্দাজ, ১০,৫০০০ পদাতিক, ৩৫৩০ অশ্বারোহী, ৪০৯৬ নাগা এবং ৭৮টী কামান।

প্রধান নগরের নাম লইয়া যেমন প্রদেশের নামকরণ হইয়া থাকে সেই রূপ রাজধানীর নামানুসারে রাজ্যের নাম হওয়া অসম্ভাবিত নহে। এখন যাহাকে জয়পুর রাজ্য বলা যায় তাহার প্রকৃত নাম ধুন্দার। উহা প্রাচীন রাজধানী অম্বরের নামানুসারে অম্বর রাজ্য এবং বর্ত্তমান রাজধানী জয়পুর নগর হইতে জয়পুর রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

অম্বরেশ্বর সূর্য্যবংশীয়; অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশ হইতে এই বংশ পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। কুশবংশীয় জনৈক ব্যক্তি জন্মভূমি কোশল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোননদীতীরে আসিয়া রোটস দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে (২৯৫ খৃঃ) সুপ্রতিষ্ঠিত নলরাজা রোটস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নরবর রাজ্য সংস্থাপন করিয়া বাস করেন; ইহারই নাম নিষধ রাজ্য। নলরাজ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ পুরুষ সোরাসিংহের পুত্র ঢোল রায় ৯৬৭ খৃঃ অব্দে ধুন্দার রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। সোরাসিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা প্রকৃত উত্তরাধিকারী শিশু ঢোলরায়কে বঞ্চনা করিয়া আপনি সিংহাসন অধিকার করেন। ঢোলজননী ভাবী বিপদাশঙ্কায় পুত্র সমভিব্যাহারে অতি দীন বেশে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান জয়পুরের সার্দ্ধ দুই ক্রোশ দূরে খোগাং নগরে উপনীত হইলেন। তথায় ক্ষুৎ-পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পুত্রকে ভূমিশয়নে রক্ষা করতঃ জননী ইতস্ততঃ আহারান্বেষণ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে এক অজগর প্রকাণ্ড ফণা বিস্তার পূর্ব্বক

ঢোলের মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছে দেখিয়া জননী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এক ব্রাহ্মণ এই বিসদৃশ অথচ ভাবী মঙ্গল সূচক ব্যাপার দেখিয়া শিশুর জননীকে আশ্বস্ত বচনে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "ভয় কি? তোমার পুত্র ভবিষ্যতে অতি কীর্ত্তিমান হইবে।" জননী রাগান্তা হইয়া কহিলেন, "ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার ভাবনা ভাবিয়া কি করিব, আপাততঃ আহারাভাবে জীবন সংশয়।" ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নগর প্রবেশের পরামর্শ দিলেন। ঢোলজননী নগর প্রবেশ করিলে তত্রত্য মিনাসর্দারের জনৈক পরিচারিকার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে তাঁহাকে সর্দারের বাটীতে লইয়া গেলে সর্দার পত্নী তাঁহাকে পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এক দিন তিনি রন্ধন করিলে মিনারাজ রন্ধনী আহার করিয়া যারপরনাই তৃপ্তিলাভ করত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঢোলজননী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ নির্দ্দেশ করিলে, তিনি তাঁহাকে ধর্ম্মভগ্নী ও ঢোলরায়কে ভাগিনেয় রূপে গ্রহণ করিলেন। ঢোল চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলে মিনারাজ তাঁহার দ্বারা দিল্লিতে রাজকর প্রেরণ করিলেন। বালক তথায় পাঁচবৎসর অবস্থানের পর প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দেওয়ালী পর্ব্বের উৎসব সময়ে উপকারী মিনারাজের প্রাণসংহার পূর্ব্বক খোগং অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি দেওসার বৃগুজর সামন্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সামন্তের পুত্রসন্তান ছিল না, একারণ তাঁহার সমস্ত অধিকার ঢোলরায় প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তিনি মৌচ নগরের মিনাদিগকে বশীভূত করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন পূর্ব্বক মৌচের পরিবর্ত্তে নগরের নাম রামগড় রাখিলেন। পরে তিনি অজমীর পতির দুহিতা মারোনীর পাণিগ্রহণ করেন। একদা ঢোলরায় সস্ত্রীক দেবমন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এমন সময়ে একাদশ সহস্র মিনা আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিল। তিনি সেই যুদ্ধে হত হইলে তদীয় গর্ভবতী স্ত্রী পলায়ন পূর্ব্বক এক পুত্র প্রসব করিলেন, তাঁহার নাম কনকল; ইনিই ধুন্ধার রাজ্য অধিকার করেন। কনকলের পুত্র সৈদল মিনাদিগের নিকট হইতে অম্বর জয় করিয়া লয়েন। তাঁহার পুত্র হুনদেব ও পৌত্র কুন্তল উভয়েই মিনাদিগের অধিকৃত বহুতর প্রদেশ হস্তগত করেন। কুন্তলের পুত্র পূজন অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন; চাঁদকবির গ্রন্থে তাঁহার বিবিধ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূজন সম্রাট পৃথিরায়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। পৃথিরাজ সর্ব্বদা অষ্টাধিকশত সামন্ত প্রধানে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, পূজন তন্মধ্যে প্রধান স্থান পাইতেন। তিনি পৃথিরাজের ভগ্নীপতি ছিলেন। পৃথি যে সকল যুদ্ধে জয়লাভ করত ইতিবৃত্তে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, পূজন সে সকলে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। একবার তিনি সাহাবুদ্দীনকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের রাজকুমারী হরণ উপলক্ষে পূজন পৃথির প্রধান পৃষ্ঠবল ছিলেন। আমাদের এই প্রস্তাব এতাদৃশ ক্ষুদ্র আয়তন যে আমরা পূজনের বীর কীর্ত্তির অংশ মাত্রও ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইলাম না। পূজনের পর ক্রমান্বয়ে মালেশী, বিজল, রাজদেব, কীলন,

কোত্তল, জুন্সী, উদয়কর্ণ, নরসিংহ, বনবীর, উধারাম, চন্দ্রসেন ও পৃথিরাজ ধুন্ধারে রাজত্ব করেন। ইতিমধ্যে উদয়কর্ণের তৃতীয় পুত্র বালোজি হইতে একটী বিস্তীর্ণ শাখার আবির্ভাব হয়, তাহার নাম শেখৌত, শেখাবর্ত্তী তাহাদের বাসস্থান। এক্ষণে ঐ ভূখণ্ড প্রায় আড়াই সহস্র বর্গক্রোশ আয়ত হইবে। *

পৃথিরাজের সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে দ্বাদশ জন বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তাঁহাদের বংশাবলীর জন্য দ্বাদশটী প্রদেশ প্রদত্ত হয়; ইহাকে জয়পুরের 'বারকোট্‌রী' কহে। † পৃথিরাজ বৃদ্ধ বয়সে তীর্থযাত্রা করেন। তিনি নিজ পুত্র ভীম কর্ত্তৃক হত হন; এই দুর্ব্বৃত্ত পিতৃহন্তা আবার নিজ পুত্র ঐশকর্ণের হস্তে হত হইলেন। রাজপুত কুলপত্রে এতদুভয়ের নাম পাপের চিত্র বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎপরে বাহরমল সিংহাসনে আরোহন করেন, মোগল সম্রাটের সহিত ইনি সাতিশয় সৌহৃদ্য সূত্রে বদ্ধ হন। ইনি বাবরের সহচারিত্ব করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের পর হুমাউনের সময় পঞ্চহাজারী মন্‌সবদার হইয়াছিলেন। তদীয় পুত্র ভগবান দাস মোগল দরবারে আরও অধিক প্রতিপত্তি লাভ করেন। জাহাঙ্গীরের সহিত ভগবানদাসের কন্যার বিবাহ হওয়ায় উভয়ের আনুগত্য আরও বর্দ্ধিত হয়। রাজপুতের পবিত্র শোণিত এই সময়েই যবন সংস্রবে দূষিত হইল। ভগবানদাস বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার বহুবিধ বীর কর্ত্তির দ্বারা মোগল ইতিহাসপট চিত্রিত হইয়াছে। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র মানসিংহকে দত্তকরূপে গ্রহন করেন। মানসিংহ আকবরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, মানসিংহের ভুজবলই তাঁহার প্রধান সহায়। তাঁহা দ্বারা উৎকল বশীভূত ও আসাম করপ্রদ হয়, তিনি ক্রমান্বয়ে কাবুল, বঙ্গ, বেহার ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এমন কি, মানের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে একদিন মহামনা আকবরও ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। আকবর বিষপ্রয়োগে মানের তিরোধান সংকল্প করিয়া শেষে ভ্রমক্রমে আপনি সেই বিষ গ্রহণে সংসার লীলা হইতে অপসৃত হন। মুসলমান ইতিবৃত্ত মতে ১৬১৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশে মানের মৃত্যু হয়, কিন্তু কুলপত্র পাঠে অবগতি হয় যে, তাহার দুই বৎসর পরে উত্তর প্রদেশের খিলিজিদিগকে দমন করিতে গিয়া তাহাদের হস্তেই নিধন প্রাপ্ত হন। মান-পুত্র রাও ভাও সিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সম্রাট প্রদত্ত পঞ্চহাজারি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন না; অতিশয় পান দোষে তিনি

---

* বালোজি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমৃতসর নামক ক্ষুদ্র প্রদেশ অধিকার করিয়া বাস করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোকল বহুকাল নিঃসন্তান থাকেন, পরে শেখ বুরহান নামক জনৈক মুসলমান যোগীর বরে তাঁহার পুত্রসন্তান হয়, ঐ পুত্রের নাম শেখজী, তাঁহা হইতে তদ্বংশীয়েরা শেখৌত ও অধিকৃত প্রদেশ শেখাবতী নাম ধারণ করে। তদবধি উক্ত সম্প্রদায়ের পুত্রগণ জন্মিবার পরেই বদি ধারণ করিতে হয়, দরগায় গিয়া সেলাম করিতে হয়। জন্মসময়ে কলমা পড়া রীতি হইয়াছে. শেখৌতেরা শূকরমাংস স্পর্শ করে না। রাজপুতের রীতি আছে যে বৎসরের মধ্যে এক দিনও শূকর শিকার করিয়া আহার করিবে, শেখৌতেরা তাহার নামও করে না। ইহারা ক্রমে ক্রমে মোগল রাজার সন্তোষ সাধন পূর্ব্বক যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

† বার কোট্রীর দ্বাদশ সম্প্রদায়ের নাম;—চতুর্ভুজোৎ, কল্যাণোৎ, নথাবৎ, বলভদ্রোৎ, যাঙ্গারোৎ, সুলতানোৎ, পুচাইনোৎ, গুগাবৎ, খুম্বানী, খুম্বাওৎ, শিওবরণপোতা, বন্বীরপোতা।

শীঘ্রই বিগত জীবিত হন। তাঁহার পুত্র মহাসিংহও চরিত্র দোষে দূষিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই কাল কবলে প্রবেশ করেন। মান পুত্র পৌত্রদিগের অনুপযুক্ততার অবসরে যোধপুর-রাজ সম্রাট-দরবারে সমধিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বিকানীর রাজ রায় সিংহের কন্যা যোধ বাইয়ের* অনুগ্রহে মানের ভ্রাতা জগৎসিংহের পৌত্র জয়সিংহ অম্বর সিংহাসন লাভ করেন। ইনি মির্জা রাজা নামে ইতিহাসে বিখ্যাত। জয়সিংহ অম্বরের লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার সাধন করেন। ইনি আরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে বহুবিধ বীরকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছয় হাজারী মন্‌সবদার হন। ইনি বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীকে বন্দী করিয়া আনেন, কিন্তু সম্রাটের উপদেশ মত তিনি যে যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছিলেন, কিতব শিরোমণি আরঙ্গজেব এক্ষণে তাহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন দেখিয়া শিবজীর পলায়নে সহায়তা করিয়া আপনার মহত্ব দেখাইয়া ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বিশ্বাস ঘাতকতার দ্বারা দারার সর্ব্বনাশ করিয়া যে অকীর্ত্তি সংস্থাপন করেন উপরি উক্ত মহত্ব দ্বারা সেই কলঙ্ক কথঞ্চিৎ ক্ষালিত হয়। ফলতঃ তিনি অতিশয় তেজীয়ান পুরুষ ছিলেন, তাঁহার এই দুরন্ত প্রভাব কূটকর্ম্মা নীচাশয় আরঙ্গজেবেরও অসহনীয় হইয়া ছিল। দ্বাবিংশতি সংখ্যক সামন্ত বীর ও দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত অশ্বারোহী তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকায় তিনি এক প্রকার অজেয় রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। দুইখানি কাচপাত্র হস্তে লইয়া তিনি দরবারে বসিতেন, একখানির সিতারা ও অপর খানির দিল্লি নামকরণ করিয়া এক খানি ভাঙ্গিয়া কহিতেন, "ঐ সিতারা ধ্বংস হইল, দিল্লির অদৃষ্ট আমার দক্ষিণ হস্তে, আমি ইচ্ছা করিলেই তাহার ধ্বংস সাধন করিতে পারি।" এই সকল গর্ব্ব ব্যঞ্জক বাক্য আরঙ্গজেবের কর্ণকুহরে সত্বর প্রবিষ্ট হইলে তিনি জয়সিংহকে ইহ সংসারের লীলা হইতে অপসৃত করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন। জয়সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র কীর্ত্তি সিংহকে অম্বরের সিংহাসন রূপ পরম লোভনীয় উৎকোচ দানের প্রতিজ্ঞা করিয়া বিষ প্রয়োগ দ্বারা পিতৃ প্রাণ প্রয়াণের পরামর্শ প্রদান করিলেন। দুরন্ত পুত্র পিতার অহিফেনের সহিত বিষ মিশ্রণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক আরঙ্গজেব তাহাকে কামা প্রদেশ ভিন্ন আর কিছুই দিলেন না। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসিংহ সিংহাসন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু চারিহাজারী মন্‌সদার হইয়া আসাম প্রেরিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বিষণসিংহ সিংহাসনারোহণ করত তিনহাজারী মন্‌সদার হইলেন, কিন্তু তাহাও অধিক দিন ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই।

ক্রমশঃ।

* ইনিও জাহাঙ্গীরের অন্যতর মহিষী ছিলেন।

বাপু হে, আর না।

হে শ্বেতাশ্বদ্বয় সংযুক্ত উন্মুক্ত ফীটন আরোহী, মলয় মারুত সেবিত, প্রশান্ত মূর্ত্তি লোকটী, তুমি কেহে? তুমি ভারত হিতৈষি দেশগতপ্রাণ একজন বাঙ্গালী মহারাজা, কেমন? হে বঙ্গীয় মহারাজ! আত্ম চরিত্র কখনও একবার ভ্রমেও আলোচনা কর কি? কখন স্বপ্নেও একবার স্বীয় কীর্ত্তি অকীর্ত্তির ছবি দেখিতে পাও কি? একবারও বুঝিতে পার কি, তোমার দ্বারা দেশের কত অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, কত ভূস্বামীর অনুকূল এবং দরিদ্র কৃষকপুঞ্জের প্রতিকূল আইন হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে এবং তোমার কায়মনোচিত্তে ইংরাজ অর্চ্চনায় তাঁহাদের চক্ষে বাঙ্গালী চরিত্র কতই ঘৃণিত, কতই অবনত এবং কতই ধিক্কৃত হইয়া উঠিয়াছে? হে বাঙ্গালীকুলতিলক মহারাজ! অনেক প্রতারণা, হৃদয়ের অনেক কপটতা, নীচ-জন-সেব্য অনেক চাটুকারিতা এবং দেশের অনেক সর্ব্বনাশ তুমি সাধনা করিয়াছ—তাই আজি তুমি মহারাজ। প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ বাহাদুর! তোমার জ্বালায় বঙ্গদেশ অনেক জ্বালাতন হইয়াছে; অতএব কৃতাঞ্জলিপুটে অনুরোধ করি—'বাপু হে, আর না।'

আর বাপু তুমি বাঙ্গালী বাবু, ইংরাজি সংবাদ পত্র সম্পাদক হইয়া দেশটা অস্থির করিয়া তুলিলে, তাহা একবার বুঝিতেছ কি? তাহা বুঝিতেছ না, ভাবিতেছ দেশ আমার কে? দেশের যাহা হয় হউক, আমার আত্ম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই হইল। এই জন্যই তুমি দেশের প্রতিনিধি হইয়াও একটা স্বরূপ কথা বলিতে সাহস কর না। যদিবা কখন তোমার সাবধান লেখনী দৈবাৎ একটা প্রকৃত কথা ব্যক্ত করে, তখনই তুমি ভয়ে কাঁপিয়া উঠ, এবং কাঁদিয়া ঢলাঢলি কর। কি উপায়ে রাজপুরুষগণের কৃপা সঞ্চয় করা যাইবে, কিসে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাইবে এই চিন্তায় তুমি ব্যতিব্যস্ত এবং তদর্থে তুমি 'হাঁ'কে 'না' বলিতে এবং 'না'কে 'হাঁ' বলিতে কাতর নহ। তোমার সংবাদ পত্র ভারতের মুখ পত্র। কেমন করিয়া তোমার পত্র এই অত্যুন্নত গৌরব পদবী লাভ করিল? তোমারই তৈল-নিষেক নিপুণতায়। অতএব ধিক্ তোমাকে! তুমি বঙ্গমাতার নিতান্ত কুসন্তান, তাহা মনে মনে বুঝ কি? ইহা সংসারে তুমি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া চলিলে বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ বাপু, পরকাল আছে—সেখানে সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার আছে। তখন তোমার এই বিশ্বাসঘাতকতার কি দণ্ড হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? যদি হে স্বার্থমুগ্ধ সম্পাদক গৌরব, তুমি যথার্থই হিন্দু হও, তাহা হইলে আমরা অনুরোধ করিতেছি, দয়া করিয়া এ বৃত্তি ত্যাগ কর। তুমি অনেক দেখাইলে, আমরাও অনেক দেখিলাম,—'বাপু হে, আর না।'

আর তুমি বাগ্মী মহাশয়, বক্তৃতা বড়ই করিতেছ। তোমার বক্তৃতা শুনিয়া, বক্তৃতা কালে তোমার মুখের ভাব দেখিয়া, বুঝিলাম তুমিই যথার্থ দেশহিতৈষী। দেশের দুর্দ্দশা যদি কখন অপনীত হইবার হয়, সে তোমার

দ্বারাই হইবে। হৃদয়ের ভক্তি সিংহাসনে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার পূজা করিতে লাগিলাম। তাহার পর আবার যে কার্য্য নিতান্ত নীচজন সেব্য, নিতান্ত ঘৃণিত বলিয়া তুমি নিরন্তর উপদেশ দিয়াছ লুকাইয়া লুকাইয়া তুমি তাহারই অনুরক্ত হও কেন বাপু? ছিঃ ছিঃ তোমার চরিত্র এমন কপটতাপূর্ণ! তুমি এমন হীন স্বভাব? তোমার যত তেজ, তোমার যত দৃঢ়তা, তোমার যত লোকানুরাগ তাহা আমরা বুঝিয়া ফেলিয়াছি। তোমার দেশহিতৈষিতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি—'বাপু হে, আর না!'

হে ধর্ম্মাত্মন্! সাজ গোজ করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ দিতে বসিয়াছ? ভাল কাজ বটে। তুমি অতীব দৃঢ়তার সহিত কখন সামাজিক দুর্নীতি সকলের বিরুদ্ধে সদুপদেশ দিতেছ, কখন সনাতন ধর্ম্মের পবিত্র আলোক সকলের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছ, কখন বা স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অথবা স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে স্বীয় মত পরিব্যক্ত করিতেছ। কখন বা বিধবা বিবাহ প্রচারের জন্য উচ্চরবে স্বীয় কণ্ঠ বিদীর্ণ করিতেছ। তোমার পীযূষপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তোমাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেছি। তাহার পর তোমার একি ব্যবহার বাপু? আমরা আবার কখন তোমাকে হিন্দু দেব দেবীর সমীপে মস্তক বিনত করিতে দেখিতেছি, কখন বা হিন্দু সমাজে তোমাকে গোঁড়া হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিতেছি। তুমি স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য বক্তৃতার উপর বক্তৃতা কর বটে, কিন্তু কখন নিতান্ত বন্ধুজনের সমীপেও স্বীয় স্ত্রীকে বাহির করিতে তুমি সাহস কর না, তুমি বিধবা বিবাহ প্রচারের জন্য মারামারি কর, কিন্তু কখন তোমাকে স্বীয় বাল-বিধবা ভগ্নীর বিবাহের নাম করিতেও শুনিনা। অতএব, বাপু, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি তুমি মানব-কলঙ্ক নহ কি? তোমার ন্যায় ব্যক্তি সমাজের ঘোর শত্রু নহে কি? হে ভণ্ডতপস্বী মহাপ্রভু! এরূপ সাধু সাজিয়া প্রতারণা বৃত্তি ত্যাগ কর। একবার আপনার ব্যবহার আপনি আলোচনা করিয়া দেখ, এবং যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, তাহার প্রতিবিধানার্থ অনুতাপে রত হও। তুমি এ ভবসংসারে অনেক খেলা খেলিয়াছ অতঃপর 'বাপু হে, আর না!'

আর তুমি কেহে বাপু? চিন্তামগ্ন গ্রন্থরাশি পরিবৃত লেখনীধৃত কর—তুমি কেহে? বুঝিয়াছি তুমি বঙ্গমাতার ভরসা, তুমি বঙ্গের উন্নতিশীল গ্রন্থকার। মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে তুমি যত্ন করিতেছ, অতএব তুমি ধন্য। মৌলিক লেখক, উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন সুলেখক বলিয়া তোমার খ্যাতি দেশ ছাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কোথায় বাপু, তোমার মৌলিকতা, কোথায়ই বা তোমার উদ্ভাবনী শক্তি? তুমি কোন গ্রন্থ হইতে ভাব চুরি করিতেছ, কোন গ্রন্থ হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া বিষয় সংগ্রহ করিতেছ এবং কোন গ্রন্থ হইতে অলক্ষিত ভাবে অনুবাদ চালাইতেছ! তুমি যে গ্রন্থ কখন বুঝ নাই, যাহা কখন আলোচনা কর নাই, এবং যে গ্রন্থ কখন পড় নাই অথবা চক্ষেও দেখ নাই, তৎসমস্তই তোমার আলোচিত, মীমাংসিত, অধীত, বা আয়ত্তগত বলিয়া ব্যক্ত করিতেছ। ধন্য তোমার সাহস—

ধন্য তোমার প্রগল্‌ভতা। জানিও বাপু, বালির বাঁধ অধিককাল টিকে না। তোমার ন্যায় প্রতারক, চোর গ্রন্থকারের দ্বারা ভাষার কোনই গৌরব নাই। তুমি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছ, অনেক অবিনশ্বর কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছ, এক্ষণে আমরা সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি—'বাপু হে, আর না!'

আর এদিকে তুমি বাপু কোথা হইতে আসিয়া প্রাচীন কীটদষ্ট পুঁথি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছ দেখিতেছি! তুমি মহাশয় ব্যক্তি! কিন্তু বাপু ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল কাজেই আছে, তাহা কি তোমার জানা নাই? মিথ্যা কথায় মহা প্রত্যবায় আছে তাহা কি তুমি বুঝ না বাপু? নিশ্চয়ই তোমার কোন ধর্ম্মজ্ঞান নাই। কত বিদ্যাপতি, কত চণ্ডীদাস, এবং কত কবিকঙ্কণের পুঁথি গড়াগড়ি যাইতেছে, আর তুমি তোমার কীটদষ্ট পুঁথিকে হোমার, বার্জ্জিল, বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, সেক্ষপীর, মিল্টন প্রভৃতির সমতুল্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া রাশীকৃত গ্রাহক সংগ্রহ করিতেছ কেন? তুমি চতুর চূড়ামণি! তোমার বিশেষ জানা আছে যে, প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিলে তোমার কীটদষ্ট পুঁথির গ্রাহক জুটিবে না। অতএব তোমাকে অসৎপথে নামিয়া অপ্রকৃত কথা ব্যক্ত করিতে হইল। 'কেমন, নয় কি? অতএব নিশ্চয়ই তোমার কোন ধর্ম্মজ্ঞান নাই। বুঝিলাম পরকীয় অর্থ দ্বারা আত্মোদর পূরণ করাই তোমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহারও একটা ন্যায়ান্যায় আছে, একটা হিতাহিত আছে। এরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া, এরূপ লোক ঠকাইয়া খাওয়া ঘৃণার কথা নহে কি প্রকাশক মহাশয়? হে লম্বোদর, স্বকার্য্য সাধন নিপুণ, প্রবঞ্চনা পরায়ণ, মাতৃভাষাবৎসল প্রকাশক কুল চূড়ামণি! আপনি অত্যল্প কালমধ্যে যথেষ্ট কীর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন, এক্ষণে আমরা ভবৎসমীপে অবনত মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি 'বাপু হে, আর না।'

আর তুমি যে বাপু প্রাচীন ইংরাজি সংবাদ পত্র অবলম্বনে বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদক হইয়া বসিয়াছ, বল দেখি, তুমি সম্পাদকতার কি জান? সম্পাদকের কর্ত্তব্য কি তাহা তুমি জান না, কিসে কি মত দিতে হয় তাহা তুমি শিখ নাই, যে যে গ্রন্থ, যে যে প্রসঙ্গ বিশেষ আলোচিত থাকিলে সম্পাদক হওয়া যায়, তাহা তুমি কখন দেখ নাই, যে যে লোকের সঙ্গে নিয়ত বাক্যালাপ করিলে সম্পাদকীয় জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতে পারে, তোমার সেরূপ লোকের সমীপস্থ হইবার যোগ্যতা পর্য্যন্ত নাই, তুমি বাপু, এ ঝকমারি কেন করিতেছ? অতি প্রাচীন, গলিত, খসিত সংবাদ তোমার ভূষণ, পরনিন্দা ও কুচর্চ্চা তোমার আদরের ধন, এবং শতবার চর্ব্বিত, পত্রান্তরে বহুবার আলোচিত প্রসঙ্গ তোমার প্রিয় সামগ্রী। ভাবিয়া দেখ বাপু, কাজটা ভাল হইতেছে কি? জীবিকার শত সহস্র উপায় রহিয়াছে। সে সব ফেলিয়া এ দুরাকাঙ্ক্ষা সাগরে তুমি কেন ঝাঁপ দিলে বাপু? গুণগ্রামের উপযুক্ত কোন বৃত্তি, তোমার অবলম্বণ করা আবশ্যক; এদিকে তুমি যথেষ্ট হাত দেখাইয়াছ, 'বাপু হে, আর না।'

ভেছি। মধ্যে আরও দুই একটা গল্প বলিয়া যাই। আমাদের সন্দেহ ছিল মনোমোহন বাবু প্রভৃতি অল্পবয়স হইতে ইংলণ্ডের আচার ব্যবহারে শিক্ষিত; কিন্তু এ দেশের আচার ব্যবহারে শিক্ষিত এরূপ একজন লোক যদি ইংলণ্ডের কোন বিদ্যালয়ে গিয়া দুই এক বৎসর শিক্ষা করে, তবে দেশীয় আচার ব্যবহারে তাহারও অরুচি জন্মিবার সম্ভাবনা কি না। এইরূপ কিছু দিন ভাবাবায় এমন সময়ে উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ডাক্তারী শিখিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে আমরা তাঁহাকে, জিজ্ঞাসা করিলাম যে. 'তুমি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া ধুতি চাদর পরিবে কি না?' তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন যে 'আমিতো আর পাগল হই নাই, আমি অবশ্যই ফিরিয়া আসিয়া ধুতি চাদর পরিব।' বহুদিন পরে পাস করিয়া বিদ্যারত্ন দেশে আগমন করিলেন, আমরা দেখিতে গেলাম, কিন্তু তিনি ইংরাজী পোসাক খুলিলেন না। আমরা বিরক্ত হইলাম, তিনিও আমাদের প্রতি দ্বিগুণ বিরক্ত হইলেন। আমাদের কৌতূহল ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন বিদ্যারত্ন একাকী নিদ্রিত আছেন, আমরা দ্বার ঠেলিয়া তাঁহাকে উঠাইবার চেষ্টা করাতে তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন যে, "তোমরা তো ভারি অসভ্য হে।" পাঠক মনে করিবেন না যে, আমরা আমাদের বন্ধুর নিন্দা করিতেছি। আমরা সরল অভিপ্রায়ে সময়ের স্বভাব বর্ণনা করিতেছি। আমরা মনে করি অতীত কালের ইতিহাস হইতে উদাহরণ না তুলিয়া সময়ের ইতিহাস হইতে উদাহরন উদ্ধৃত হইলে অধিকতর হৃদয়গম্য হইবে। একদিন বিদ্যারত্নকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'দেশের লোকে তোমাকে সমাজে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় কি?' তিনি কহিলেন যে 'যদিও আপাততঃ কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু আমি ইচ্ছাকরিলে সমাজে যথেচ্ছা মিশিতে পারি।' আমরা জিজ্ঞাসিলাম যে, 'তবে মিশনা কেন?' তিনি উত্তর করিলেন যে, 'সমাজে মিশিতে গেলে কিছু যত্ন করিতে হয়, কিন্তু যাহাদের সহিত মিশিব, তাহাদের এমন কি আকর্ষকতা আছে যে, আমি যত্ন করিয়া মিশিতে যাইব?' বাস্তবিক এ কথার অর্থ আছে। আজি কালি সমাজের অর্থ—কতগুলি বেদপুরাণহীন ব্রাহ্মণ, কতকগুলি কুলমাহাত্ম্য-প্রিয় কায়স্থ, কতকগুলি মুখহীনা স্ত্রী এবং অপরগুলি কেরাণী ও কৃষক। একজন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী ইহাদের সহিত কথাই বা কহিবে কি, এবং আলাপই বা করিবে কি? ফলতঃ পল্লী গ্রামে আজিকালি অনেকের বাড়ী হইলেও পল্লীগ্রামে তাঁহাদের সমাজ পাওয়া কঠিন, তবে পল্লীগ্রামের মাঠের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল বলিয়া যদি কেহ বেড়াইতে যান সে ভিন্ন কথা। পাঠক হয়তো রাগ করিয়া কহিবেন যে, 'তবে কি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে হইবে, তবে কি মা মাসীর মুখ দেখিতে হইবেনা, তবে কি বাল্য সহচর পল্লীবাসীদের সহিত আলাপ করিবনা, তবে কি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে মূর্খ বলিয়া ঘৃণা করিতে হইবে?' মহাভারত! আমরা অমন কথা বলিনা। আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে সামাজিকতা ও স্বদেশ প্রিয়তা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী। যখন সামাজিক রূপে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায় তখন স্বদেশের প্রতি ইংরাজী

শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিরক্তি ভিন্ন সুখভাব হইতে পারেনা। কিন্তু যখন স্বদেশ হিতৈষীর চক্ষে দেখা যায়, তখন অবশ্য ভিন্ন প্রকার। তখন 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলিয়া অবশ্যই বোধ হওয়া উচিত। পাঠক হয়তো কহিবেন যে, 'যে সামাজিকতার স্বদেশহিতৈষিতা নাই, সেরূপ সামাজিকতা না থাকাই ভাল।' সে কথার উত্তরে আমরা আপাততঃ ইহাই বলিতে চাই যে প্রাণিবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে মানুষ শব্দের অর্থ সামাজিক জন্তু এবং মনোবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে আগে 'সামাজিকতা পরে স্বদেশহিতৈষিতা।'

পাঠক হয়তো আমাদিগকে বিরক্ত হইয়া কহিবেন যে, 'তোমরাই কি কাগজে লিখিতে জান, আর কেহ জানেনা, এবং তোমরাই কি বক্তৃতা করিতে জান, আর কেহ জানেনা। সমাজেতে তোমাদের অপেক্ষা অনেক বড় বড় লোক আছেন, তাঁহাদের মুখেতে এরূপ কথা শুনা যায় না যে, বঙ্গসমাজ বিদ্বেষের সামগ্রী।'

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, আচ্ছা একে একে দুই একজন করিয়া তাবৎ বড়লোকের নাম করিতে থাকুন (এস্থলে অবশ্য বড় লোকের অর্থ ধনিলোক নহে, যাঁহারা জ্ঞানবত্তা সম্বন্ধে সমাজে পদস্থতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই আপাততঃ বড়লোক বলা হউক)। পাঠক হয়তো প্রথমতঃ কহিবেন যে, দেখ ডক্টর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টান হইয়াও আর্য্যসমাজের মাহাত্ম্য ভুলিতে পারেন নাই, তিনি অদ্যাপি অক্লান্ত চিত্তে বেদ পুরাণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন; দেখ আর্য্যধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এরূপ অসাধারণ মমতা যে সেই মমতার বশে তিনি খৃষ্টধর্ম্মকেও আর্য্য ধর্ম্মের প্রসব বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। হাঁ আমরা স্বীকার করি যে, বিদ্যা, বিশেষতঃ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহন ঋষিতুল্য লোক। তিনি অসাধারণ স্বদেশপ্রিয় কিন্তু তিনি বঙ্গসমাজকে যে ঘৃণা করেন, তাহার সজীব উদাহরণ তাঁহার খৃষ্টানত্ব। পাঠক দ্বিতীয় স্থানে হয়তো ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম উল্লেখ করিয়া কহিবেন যে, দেখ তিনি আর্য্যসাহিত্যের অনুসন্ধানে কত সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকেন, স্বদেশের প্রতি ভালবাসা না থাকিলে কি স্বদেশের সাহিত্যে কখন এরূপ অনুরাগ হয়? পাঠক হয়তো কহিবেন যে ডক্টর মিত্র গরুর গোবরের স্বাস্থ্যকারিতা সম্বন্ধে একঘণ্টা বক্তৃতা করিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহার মতে গোবর উপকারি বলিয়া বঙ্গসমাজে তাহার এরূপ পূজ্যতা হইয়াছে। আমরা অবশ্য ইহাতে মিত্র মহাশয়ের স্বদেশহিতৈষিতার ব্যাখ্যা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার সামাজিকতার প্রমাণ কই? সামাজিক হইতে হইলে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে হয়, কিন্তু মিত্র মহাশয় হয়তো তৎসম্বন্ধে এরূপ অপটু যে, তাঁহাকে প্রণাম করিতে বলিলে তিনি মহীরাবণকে রামচন্দ্রের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিবেন যে, প্রণাম কিরূপে করিতে হয় তাহা তুমি আমাকে দেখাও। গোমাংস সম্বন্ধে মিত্র মহাশয় কহিয়াছেন যে, 'গোমাংস পূর্ব্বে সমাজে চলিত ছিল।' অবশ্য যখন গোমেধ যজ্ঞ ছিল, তখন গোমাংস যে চলিত ছিল তাহার প্রতিবাদ কে করিতে সাহস করিবে? কিন্তু একথা তো সকলেই জানে, তবে মিত্র মহাশয় আজি জোরের সহিত একথা বলিতে যান্ কেন?

ইহাতে কি তাঁহার সামাজিকতার প্রমাণ পাওয়া গেল? তিনি কাহার মুখ চাহিয়া একথা বলিতে গেলেন? তিনি বঙ্গসমাজের মুখ চাহিলেন—না গোমাংস লোলুপদিগের মুখ চাহিয়া বলিলেন? উড়িষ্যার ইতিহাস লিখিতে গিয়া মিত্রমহাশয় একস্থলে কহিয়াছেন যে, 'উড়িষ্যায় যে সকল প্রাচীন মূর্ত্তি আছে তাহাদের কোন কোনটা দেখিলে বোধ হয় যে আর্য্যজাতির মধ্যে পেণ্টলুন চাপকান ব্যবহার ছিল।' আচ্ছা মহাশয়, যদি পেণ্টলুন চাপকান ব্যবহার ছিল, তবে অমরকোষ অর্থাৎ অভিধানে পেণ্টলুন চাপকানের নাই কেন? ফলতঃ মিত্র মহাশয় নিজে পেণ্টলন চাপকান ভাল বাসেন বলিয়া মায়া বশতঃ পেণ্টলন চাপকানের প্রাচীনত্ব স্থাপন করিতে গিয়াছেন, নতুবা আর কিছুই নহে। পাঠক হয়তো কহিবেন যে, সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম করিতে বিস্মৃত হওয়া হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু আচারের অনুসরণ করেন। আমরা স্বীকার করি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় পেণ্টলন চাপকানকে ঘৃণা করেন। কিন্তু তিনি যে বঙ্গসমাজকে ভাল বাসেন না, তাহা তাঁহার বিধবা বিবাহের শেষ পাতায় প্রকাশ আছে——যে স্থলে তিনি ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছেন। ফলতঃ ভাবিয়া দেখিলে মহাত্মা বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় সমাজের সর্ব্বপ্রধান বিদ্রোহী। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রথম বিদ্রোহী, তৎপরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্রোহিগণের উল্লেখ যোগ্য। আমরা প্রথম প্রথম ভাবিতাম যে হয়তো সাহিত্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের রুচি দেশীয়দিগের ন্যায়, হয়তো এসম্বন্ধে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র তাঁহার পথ প্রদর্শক হইতে পারে। কিন্তু যেদিন আমরা তাঁহার সীতার বনবাসের শেষ ছত্র পড়িয়াছি, সেইদিন হইতে সে সংস্কারও গিয়াছে। তিনি এক কথায় সমাজের মর্ম্মে কুঠারঘাত করিয়াছেন। তিনি অনায়াসে কহিলেন যে সীতা ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অন্যেরা দেশীয় রুচির পক্ষপাত পূর্ব্বক এইস্থলে কহিয়াছেন যে, সীতা ধরাতলে প্রবেশ করিলেন। ফলতঃ দেশীয় রুচির অনুসারে নায়ক নায়িকার মরণ বর্ণনা করিতে নাই, অথবা "বর্ণ্যতেপি যদি প্রত্যুজ্জীবনং স্যাদদূরতঃ।" কিন্তু ইংরাজী রুচির অনুসারে মরণোত্তর করুণরস অতি উপাদেয় সামগ্রী। বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষোক্ত রুচির অনুসরণ করিয়াছেন। ফলতঃ স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আধার ও প্রাণ ইংরাজী উপাদানে নির্ম্মিত না হইলেও সিঞ্চিত বটে। পাঠক হয়তো কহিবেন যে, বঙ্গ সাহিত্যসমাজে ডক্টর মহেন্দ্র লাল সরকার গণণীয় না হইলেও তিনি যে একজন লব্ধনামা পণ্ডিত সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই। আমরা স্বীকার করি। আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, সরকার মহাশয় চটী জুতার পক্ষপাতী, শুনা যায় যে তিনি একদিন সার রিচর্ড টেম্পলকে কহিয়াছিলেন যে, 'পেণ্টলন চাপকান পরিয়া আসিতে হয় বলিয়া আমি সর্ব্বদা আপনার নিকট আসিতে কষ্ট বোধ করি।' যদি সরকার মহাশয় বাস্তবিক একথা বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার তেজস্বিতা ও হিন্দু হিতৈষিতা প্রশংসার কথা বটে। পাঠক হয়তো কহিবেন যে সরকার মহাশয় মাংসাহারের প্রতি

এরূপ বিরক্ত যে, তিনি রোগীকে মাংসাহার ব্যবস্থা করিতেই অনিচ্ছুক। আমরা ইহাও স্বীকার করি। আমরা আরও স্বীকার করি যে, ডাক্তার সরকার স্বপ্রণীত ইংরাজী মাসিক পত্রিকার আবরণ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন এবং পত্রিকার অভ্যন্তরে আয্যজাতির চিকিৎসাশাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার সমাজিকতার অন্য প্রমাণে কি প্রয়োজন? আমরা দুঃখের সহিত আবার বলিতেছি যে এ সকল সমাজিকতার প্রমাণ নহে। বাস্তবিক আমরা যে অর্থে সামাজিক শব্দের প্রয়োগ করিতেছি ডাক্তার সরকার সে অর্থে মোটেই সামাজিক নহেন। আমাদের সমাজের একজন অশিক্ষিত লোক তাঁহার সহিত এক মিনিট কথা কহিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি তাহার কথা সহিষ্ণুতা সহকারে শুনিতে পারেন কি না সন্দেহ।

অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল বিচক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাহ্য সামাজিকতা সম্বন্ধেও ইহাঁর অনেকটা অধিকার আছে। কিন্তু ইহা মনে করা উচিত যে, সম্পাদক জাতি দশজনের অন্নে প্রতিপালিত। পাঠক শুনিলে চমৎকৃত হইবেন যে ইংলিসম্যান, ডেলি নিউস্ প্রভৃতির সম্পাদকেরাও এত সামাজিক যে হিন্দুস্থানী সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ হইলেও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎকার পূর্ব্বক অনেক সময়ে অনেক গূঢ় সংবাদ সংগ্রহ করে। কৃষ্ণদাস বাবুও সেইরূপ সামাজিক সন্দেহ নাই। ইনিও ঈদৃশ অন্যান্যের স্ব স্ব ব্যবসায়ের বলে সামাজিকতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ইহাঁদের ইংরাজী শিক্ষার ফল নহে। আর ইহাঁদের অন্তর সামাজিক কিনা সে পক্ষেও সন্দেহ আছে। বরং তৎপক্ষে ইহাঁরা সমাজ হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়। ফলতঃ কর্ত্তব্যের অনুরোধে সামাজিকতা ও স্বভাব বা শিক্ষার বলে সামাজিকতা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ। হিন্দুপেট্রিয়ট আমাদের সমাজের পক্ষপাতী সন্দেহ নাই,* কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবু পক্ষপাতী কিনা তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। বরং হিন্দুপেট্রিয়টের মতামতের সহিত কৃষ্ণদাস বাবুর মতামতের পার্থক্যই দেখা যায়। হিন্দুপেট্রিয়ট বরাবর বলিয়া আসিতেছেন যে, দেশীয় সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের উপকার হইতেছে, কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবু বাঙ্গালা কাগজ ভালবাসেন না, সুতরাং যখন ইডেন সাহেব বক্তৃতা করিলেন যে দেশীয় সম্পাদকেরা অত্যন্ত বদ্‌লোক তখন কৃষ্ণদাস বাবু সভাস্থলে সম্মতি সূচক করতালি দিলেন। ক্রমে হিন্দুপেট্রিয়টের সহিত কৃষ্ণদাস বাবুর এরূপ মতভেদ হইল, যে আমাদের সন্দেহ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু পত্রিকার সহিত লেখকের আকাশ পাতাল সমদূর মতভেদ অধিক দিন থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং হঠাৎ একদিন হিন্দুপেট্রিয়টও কহিলেন যে, দেশীয় সম্পাদকেরা বাস্তবিকই বদলোক। যে দিন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর সভাস্থলে প্রেসআক্টের সমর্থন করেন, তাঁহার পরসপ্তাহের বা পর পর সপ্তাহের হিন্দুপেট্রিয়ট এইরূপ স্বর দেশীয় সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম বিসর্জ্জন করেন। দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল যে এ স্বর হিন্দুপেট্রিয়টের নহে, ইহা কৃষ্ণদাস

* সকল সময় একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রঃ সং।

বাবুর স্বর, ইহা মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের অনুস্বর—অথবা অনুস্বর বলিলে দোষ হইতে পারে—ইহা কৃষ্ণ দাস বাবুর নিজের স্বর বলিলেই ভাল হয়। আমাদের ইহাই শুনা আছে যে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস বাবু এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে সভাস্থলে ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলেও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ধনীর সন্তান, স্বয়ং এক জন আমীর ওমরা লোক, দেশীয় সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে কথা বলিবার জন্য তাঁহার কি মাথা ব্যথা পড়িয়াছিল? বরং আমরা দেখিয়াছি যে, দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে তিনি অনেক সময়ে যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। আর সমাদর না করিলেও অতবড় একজন বড়ঘরের লোক যে অকারণে প্রেস আক্টের সমর্থন করিয়া সমাজের ইতিহাসে জন্মের মত আপনার নাম কলঙ্কিত করিবেন, এরূপ আমরা মনেই করিতে পারি না। কেবল কৃষ্ণদাস বাবু এবং মিত্রমহাশয়ের পরামর্শে তিনি অখ্যাতির ভাজন হইয়াছেন। অথবা কৃষ্ণদাস বাবু কিম্বা মিত্র মহাশয় তাঁহাকে বারণ করিলে তিনি কখনই একাজ করিতেন না।

ফলতঃ হিন্দুপেট্রিয়ট ও কৃষ্ণদাস বাবু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু। হিন্দুপেট্রিয়ট হয় তো বাঙ্গালী, কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবু সম্পূর্ণ সাহেব সন্দেহ নাই। আমরা যাহাকে সমাজ কহি, সে সমাজের সহিত কৃষ্ণদাস বাবু এক রাত্রি বাস করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। প্রবাদ আছে যে, অনরেবল বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুধর্ম্মের বড়ই পক্ষপাতী। হইতে পারে। কিন্তু আমরা তাঁহাকে কখন পূজা বা সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে শুনি নাই। সমাজের সহিত তিনি কতদূর মিশিতে পারেন, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তিনি সাহেব ঘেঁসা বলিয়াই শুনা যায়। পাঠক হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন যে, বঙ্কিম বাবু সমাজপ্রিয় কি না। সে পক্ষে এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে বঙ্কিম বাবু তল্লিখিত গর্দ্দভ নামক প্রস্তাবে সমাজের তাবৎ লোককেই গাধা বলিয়াছেন। ফলতঃ পাঠক যাহারই নাম করিবেন আমি দেখাইয়া দিব যে, তিনি সামাজিক শব্দে উল্লেখ যোগ্য নহেন।

ফলতঃ আমরা যাহাকে বঙ্গসমাজ বলি, সে সমাজ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর উপযোগী নহে। অথচ কৃতবিদ্য বাঙ্গালী দিগের স্বতন্ত্র সমাজ নাই। সুতরাং কৃতবিদ্য বাঙ্গালী, সমাজের মধ্যে থাকিয়াও বনে বাস করিতেছেন। সুতরাং জীবনের একটী যে সর্ব্বপ্রধান সুখ, তাহা তাঁহাদের নাই। বরং অসামাজিক বলিয়া অখ্যাতি হইতেছে। মা কহিলেন যে, 'গুরু ঠাকুর আসিয়াছেন প্রণাম কর।' ছেলে সংস্কৃত কালেজে পড়িয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ শুনিয়াছেন যে, যে সংস্কৃতের বলে গুরু ঠাকুর পূজ্য, তাঁহার তাহাই জানা নাই, তিনি দেখিলেন যে গুরু ঠাকুরের পায়ে জুতা নাই এবং দেহ কৌপীন মাত্রাবশেষ। তিনি দেখিলেন যে, গুরুঠাকুর শিষ্টাচার জানেন না। তিনি দেখিলেন যে গুরুঠাকুর প্রথমেই অর্থ যাচ্ঞা করেন। তিনি দেখিলেন যে, গুরুঠাকুর সাপতাষ্ট ভিন্ন আর কিছুই বলেন না। কাজেই ছেলের প্রাণে আঘাত বোধ হইল। কহিলেন, 'এ গুরুকে কেমন করিয়া প্রণাম করি না?' মা

শুনিয়া ভীত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ সন্তানের কল্যাণার্থ ভীত হইলেন। দ্বিতীয়তঃ পাছে পল্লীবাসীরা জানিতে পারিলে সন্তানের নিন্দা করে তজ্জন্যও অল্প ভীত হইলেন। তিনি ছেলেকে গোপনে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, 'বাবা, তুমি লেখা পড়া শিখিয়াছ বলিয়া সকলে সুখ্যাতি করে, আমার মুখ উজ্জ্বল হয়, কিন্তু এখন সকলে হয়তো বলিবে যে তুমি গুরু পুরোহিতকে প্রণাম করিতে চাও না।' মা কেবল মুখেই যে এইরূপ উপদেশ দিলেন এরূপ নহে। হয় তো তিনি সংসার শূন্য দেখিতে লাগিলেন। ছেলে খৃষ্টান হইবে না তো মনে মনে এই আন্দোলনই তাঁহার অধিক হইতে লাগিল। তিনি হয় তো ছেলের মাসীকে ডাকিয়া রান্নাঘরের মধ্যে সকল কথাই বলিলেন। মাসী হয়তো রাগ করিয়া বলিলেন যে, 'তোরে তো প্রতিদিনই বলি যে ছেলের বিবাহ দে, দেখিতেছিস্ না ছেলে যেন উড়ো উড়ো হয়েছে।' ওদিকে কর্ত্তারা হয়তো বিবাহের পক্ষপাতী নহেন। এখন পাঠক দেখুন ঘরের মধ্যে কেমন আগুণ ধরিয়া গেল। অথচ ছেলের কোন দোষ নাই।

পঞ্চানন বাবু বার বৎসর বয়সে গ্রাম পরিত্যাগ করেন। বিশ বৎসর বয়সে এ, যে পাস করিয়া আসেন। মনে মনে ভারী সুখ হইল। ভাবিলেন এইবার গ্রামে গমন করিব। পল্লীবাসীরা আমাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইবেন। জ্ঞাতি ও বন্ধু কন্যাগণ আমাকে সকলে ছুটিয়া দেখিতে আসিবে। কিন্তু পঞ্চানন বাবুর ভারী ভুল হইল। তিনি ভাবিলেন না যে, তাঁহার বয়স হইয়াছে সুতরাং কুলকন্যাগণ কেহই তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে আসিবে না। তিনি ভাবিলেন না যে, তিনি এ, যে, পাস করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার মনের মত সম্ভাষণ করিবার জন্য পল্লীবাসীরা হয়তো কেহই প্রস্তুত নাই। পঞ্চানন বাবু আনন্দে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে কয়েকজন পল্লীবাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। হয়তো একজন বৃদ্ধলোক অনেকক্ষণ তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল এবং তাঁহার বাড়ী আসিবার সংবাদ থাকাতে এবং অন্যান্য কারণ সম্মিলিত হওয়াতে শেষে তাঁহাকে চিনিতে পারিল। কহিল, 'বাবু, ভাল আছ গা? আহা এস এস।' হয়তো এইস্থানে একবার পুত্রশোক জাগৃত হওয়াতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিল, 'বাবু আমার আর কেহই নাই, যাদের দেখে গিয়েছিলে তারা সব গেছে'—বৃদ্ধ হয়তো ক্রন্দন করিতে করিতে চলিয়া গেল। এই স্থল করুণোদ্দীপক বটে, সুতরাং হয়তো জন্মভূমিবৎসল পঞ্চানন বাবুর মর্ম্মগ্রাহি বটে—হয়তো তাঁহার পঠিত সেক্সপীয়রের কোন এক ভাবের অনুরূপও বটে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত। পরে কেবল বিসম্বাদ ভাবই অধিক। হয়তো পঞ্চানন বাবু দেখিলেন যে আমাদের উপরি লিখিত গুরু ঠাকুরের অনুরূপ একজন বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণ, চটী জুতো বগলে, তড়িতের ন্যায় তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। এত শীঘ্র চলিয়া যাইবার হেতু এই যে, তিনি হয়তো পঞ্চানন বাবুর পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ দেখিয়া ভাবিলেন যে, এ ব্যক্তি দারগা হইতে পারে। কিন্তু যখন দুইপদ

অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক জানিলেন যে, অমুকের পুত্র অমুক যাইতেছে, তখন প্রথমতঃ তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে পুলীসের ভয় গেল, শেষে কুটিল কটাক্ষে পঞ্চানন বাবুর প্রতি দূর হইতে একবার নিরীক্ষণ করিয়া অমতি পরিস্ফুট কটুস্বরে কহিলেন, 'কি তেজ হে, আমাকে প্রণাম করিল না।' পঞ্চানন বাবু অবশ্য এ কথা শুনিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে চিনেন না এবং অপরিচিত লোককে সম্ভাষণ করিতেও তাহার শিক্ষার অধিকার নাই। হয়তো স্বাভাবিক শিষ্টতার অনুরোধে ব্রাহ্মণের নিকট বিনয় প্রকাশ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে সকল সে স্থলে ঘটিয়া উঠিল না। যাহা হউক, ক্রমে পঞ্চানন বাটী প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র কতকগুলি স্ত্রীলোক ভয় চকিতের ন্যায় তাঁহার নয়নপথ হইতে সরিয়া গেলেন। পঞ্চানন বাবু মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহাঁরা কাহারা?' মাতা কহিলেন, 'যিনি সর্ব্বাগ্রে পলাইয়া গেলেন, উনি তোমার বাল্য বিবাহিতাবধূ! তৎপরে যাঁহারা পলাইলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ তোমার জ্যেষ্ঠের স্ত্রী, কেহ তোমার কনিষ্ঠের স্ত্রী, কেহ তোমার সম্পর্কে মামী, কেহ খুড়ি ইত্যাদি!' পঞ্চানন বাবু জিজ্ঞাসিলেন যে, 'মামী, খুড়ি, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের স্ত্রী, ইহাঁরা কাছে আসিতে দোষ কি?' মাতা কহিলেন, 'তুমি বড় হইয়াছ বাবা, উহারা কি তোমার কাছে আসিতে সাহস করে? বিশেষতঃ নকর্ত্তার দাব বড় বেশী, তাহাতে আমাদের বাড়ীর বউঝির বড় শাসন! সে জন্য পাড়ার লোকে আমাদের বাড়ীর বউঝির বড় প্রশংসা করে।' পঞ্চানন বাবু শিষ্ট শান্ত লোক, তিনি মাতার সহিত আর বড় একটা তর্ক বিতর্ক করিলেন না। তিনি বুঝিলেন কেবল মাতা ভিন্ন বাটীর মধ্যে আর কথা কহিবার লোক নাই। সুতরাং তিনি একাকী অন্তঃপুরের মধ্যে যাবৎ দিনযাম বিনালাপে কারাবাসীর ন্যায় যাপন করিলেন। পঞ্চানন বাবুর দুঃখ এই পর্য্যন্ত গেল। কিন্তু বিলাত হইতে যে রামচন্দ্র বাবু সম্প্রতি পাস হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার দুঃখ এই স্থানে আরও কিছু অধিক হইবার সম্ভাবনা ছিল। কারণ তাঁহার স্মরণ হইল যে বিলাতে বাস সময়ে পরিচিত বিবীগণ তাঁহার সহিত ভগ্নী নির্ব্বিশেষে আমোদ প্রমোদ করিত, তিনি আসিবার সময় তাহারা অশ্রুপাত করিয়াছিল, তাহারা স্নেহবশে তাঁহার জুতা ও পরিচ্ছদ স্বহস্তে ব্রস করিয়া দিয়াছিল, তাহারা জাহাজ পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি যে, ইংরাজ জাতির অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতির সন্তান বিবীরা সে ভাব তাঁহাকে কখন প্রকাশও করে নাই, তাহারা তাঁহাকে চিরদিন ভগিনীর ন্যায়, 'মাতার ন্যায়' স্নেহ প্রদান করিয়াছিল! পাঠক বলুন দেখি আজি রামচন্দ্র বাবুর সে কথাটা মনে হইলে, প্রাণ হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিত কি না। তাঁহার নিজের বাড়ীর মেয়েরা তাঁহার সহিত আলাপ করা দূরে থাক্, ঝম্ ঝম্ করিয়া কে কোথায় দৌড়! যেন বাড়ীতে ডাকাইত পড়িয়াছে! পাঠক এখন বলুন দেখি যে, এমন বাটীতে মন টেঁকে কি না। বলুন দেখি এখন ইংরাজি শিক্ষতের দোষ দিবেন কি না।

(ক্রমশঃ)

বিদ্যুল্লতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ কতদিন পরে অপরাহ্নে গিরীশ বায়ু সেবনে বাহির হইয়া জাহ্নবী তীরে উপনীত হইলেন, এবং ধীরে ধীরে একাকী পাদচারণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, জাহ্নবীর কূল প্লাবিত করিয়া বারিরাশি খরস্রোতে অবিশ্রান্ত ছুটিতেছে। নদীবক্ষে স্রোত বেগে তরণী সকল ভাসিতেছে। আরও দেখিলেন, স্রোতের প্রতিকূলে নৌকা চলিতেছে না, নাবিকেরা প্রাণ পণে বাহিতেছে, তথাপি চলিতেছে না, হয় স্রোতাভিমুখে ভাসিয়া যাইতেছে, নয় একস্থানে স্থির রহিয়াছে।

গিরীশ এইরূপ দেখিতেছেন, এমন সময় রাজেন্দ্র ও শশি শেখরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাজেন্দ্রকে দেখিবা মাত্র গিরীশ আবার বিমনা হইলেন। বিদ্যুল্লতাকে আবার তাঁহার মনে পড়িল, হৃদয় অমনি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, চিন্তা প্রবাহ আবার সেই দিকে ছুটিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চিত্ত আর সে প্রবাহের প্রতিকূলে চলিল না। তিনি এতক্ষণ বাহিরে যাহা দেখিতেছিলেন তাঁহার অন্তরেও ঠিক সেইরূপ ঘটিল। যাহা হউক, রাজেন্দ্র ও শশীশেখরের সহিত দুই একটা কথা কহিয়া তখনই গিরীশ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ক্রমে তাঁহার চিত্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন 'বিধাতা, বিদ্যুল্লতাকে কেন

ঘোর নাস্তিকও বিপদে পড়িয়া আস্তিক হইয়াছে, ঈশ্বর 'রক্ষা কর' বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছে, এমন অনেক দৃষ্টান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। অভাব মোচনের জন্যই প্রার্থনা। অভাব বোধ হইলেই হৃদয় হইতে স্বতঃই প্রার্থনা উত্থিত হয়। ক্ষুধা পাইলে অন্ন চাহিব; তৃষ্ণা পাইলে জল চাহিব; বিপদে পড়িলে উদ্ধারের জন্য চীৎকার করিয়া ডাকিব; এবং হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অনুভব করিলে, বলের জন্য প্রার্থনা করিব; ইহাই স্বাভাবিক। প্রার্থনা মাত্রই যে সকল অভাব দূর হয় এমন কথা বলিনা। তথাপি প্রার্থনার উপকারিতা আজ কে অস্বীকার করিবে? হৃদয়ের প্রসন্নতা ও শান্তিলাভ হেতু প্রার্থনার আশু উপকার।

গিরীশ, হৃদয়ে পাপস্পর্শ হইয়াছে অনুভব করিয়া সেই পাপ মোচনার্থে প্রার্থনা করিলেন।

সে প্রার্থনা কতদূর সফল হইল, কে বলিবে? তবে, তিনি কিঞ্চিত শান্তিলাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

সেই রাত্রেই গিরীশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বিদ্যুল্লতার চিন্তা আর মনোমধ্যে স্থান দিবেন না, হৃদয়পটে যে সেই কমনীয় মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা মুছিয়া ফেলিবেন। প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে সে প্রতিজ্ঞা পালন করা কতদূর কঠিন হইবে তাহা আর ভাবিলেন না।

এমন সুন্দরী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন? যদি সৃষ্টি করিলেন তবে তাঁহাকে আমার করিলেন না কেন? যদি আমার করিবেন না তবে তাঁহার তেমন বিমোহন রূপ আমাকে দেখাইলেন কেন? যখন দেখাইয়াছেন, তাঁহাকে আমার করিবার ঈশ্বরের অবশ্যই অভিপ্রায়!

'এঃ! আমি কি পাগল! বিধাতার উপর দোষারোপ করিতেছি! মন, তোমার কি একটুও ধর্ম্মবল নাই? কুপ্রবৃত্তির প্রতিকূলে যাইতে পারিবে না? জানিলাম তুমি একবারে অধঃপাতে গিয়াছ! তোমার আর কিসের গৌরব?

'হায়! মনুষ্যের মন কি এতই দুর্ব্বল? নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি মনের বল সঞ্চয় হয় না? আমি কি এতদিন বৃথায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলাম? এ পাপচিন্তা—পাপ লালসা কি হৃদয় হইতে দূর করিতে পারিব না? সেই পাপমূর্ত্তি হৃদয় হইতে এককালে মুছিয়া ফেলিতে পারিব না? পারিব। নচেৎ এই হৃদ্‌পিণ্ড উৎপাটন করিয়া ফেলিব। ছি ছি ছি, আমি একবারে ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য বিবেচনা হীন হইয়াছি! হৃদয়! এখনও সতর্ক হও!'

এই বলিয়া তিনি নয়ন মুদিলেন কিন্তু হৃদয়ে সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, অমনি বলিয়া উঠিলেন,—

'আহা! সেই সৌন্দর্য্য পূর্ণ যৌবন সুষমা—সেই বিকসিত কুসুম—সেই সুরপুরের পারিজাত! আহা! কি অনুপম সৌন্দর্য্য!'

আবার ভাবিলেন,—

'তাহাতে আমার কি? আমি তাহাতে মুগ্ধ হই কেন? জানি না, তবে এই বলিতে পারি, এ সৌন্দর্য্যে কে না মুগ্ধ হয়? এ সৌরভে কাহার চিত্ত না বিভোর হইয়া উঠে? সৌন্দর্য্যে মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়, আমারও মন আকৃষ্ট হইয়াছে। যে কার্য্যে আমার স্বাধীন ইচ্ছা নাই, সে কার্য্যের জন্য আমি কদাচ দায়ী নহি। কিন্তু এখনও যে আমি সেই মূর্ত্তি ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছি, তজ্জন্য কি আমি দায়ী হইব না? অবশ্য হইব। ছি ছি ছি, কেন আমার মনে এমন পাপ চিন্তার আবির্ভাব হইল! হায় আমার গতি কি হইবে?'

গিরীশ তখনি অমনি আবার প্রার্থনা করিতে বসিলেন, নয়নাশ্রু গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। বলিলেন,—

'পিতঃ, আমার গতি কি হইবে? আমি বাল্যকাল হইতে অতি ভক্তির সহিত তোমার উপাসনা করিয়া আসিতেছি, তোমার প্রতি কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়া আসিতেছি—জ্ঞানতঃ কখন কোন ত্রুটি করি নাই, তথাপি কেন আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ঘুচিল না? কেন আমি সেই পাপরূপে মুগ্ধ হইলাম?—

'পাপ রূপ! আহা সেই অতুল রূপে আমার হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছে!

'একি, মন আবার কোথায় গিয়াছিল? দয়াময়, দয়া করিয়া আমাকে ধর্ম্মবল দাও, আমি পাপচিত্ত আত্মবশে আনি। তোমার কৃপাদত্ত বলে আমায় বলীয়ান কর, মন আমার হৃদয় হইতে এই পাপ চিন্তা দূর করিয়া দাও।

'পাপচিন্তা! সে কি? সুখচিন্তা—সে চিন্তায় কি আনন্দ, কি সুধানুভব অন্যে তাহা কি জানিবে! সেই মোহন মূর্ত্তি যখন চিন্তা করি, তখন আমার প্রতি শিরায়, প্রতি ধম-

নীতে তাড়িৎবৎ কেমন এক অভূতপূর্ব্ব সুখের সঞ্চার হয়!

"ছি ছি ছি, কি ভাবিতেছিলাম! প্রভো আমাকে রক্ষা কর, তুমি যেমন ন্যায়বান্ রাজা তেমনি করুণাময়। পিতঃ! আমি পাপী — অপরাধী। আমাকে দণ্ড দাও, পাপানল হইতে পরিত্রাণ কর।

"বিদ্যুল্লতা, বিদ্যুল্লতা—বিদ্যুল্লতা ব্যতীত আর কেহই এই হৃদয়ানল নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না—প্রাণ জুড়াইতে পারিবে না—তাঁহাকে যদি এখনি পাইতাম—এখনি আমার সকল জ্বালা জুড়াইতে—

'অহো! আমি কি দুর্ভাগ্য! পিতঃ তবে আমার উদ্ধারের উপায় নাই বুঝি! প্রার্থনা করিতে বসিলাম তাহাতেও বারম্বার বিঘ্ন ঘটিতেছে, একান্ত হৃদয় হইতে পারিলাম না।'

গিরীশ অনুতাপ দগ্ধ হৃদয়ে কাতর স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, প্রাণ খুলিয়া ঈশ্বরকে ডাকিলেন,

'কাঙ্গালের ধন, অনাথের নাথ, শক্তিদাতা, আমি বিষাদে মলিন ও বিকারে কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি, একবার দেখা দাও, মলিনতা দূর করিয়া হৃদয়ে শান্তি দান কর।'

এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে গিরীশ একাকী নির্জ্জনে নীরবে অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল। তখন বিমনা হইয়া অন্তঃপুরে উঠিয়া গেলেন।

শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সরল হৃদয়া স্বর্ণলতা অঞ্চল পাতিয়া হর্ম্ম্যতলে শুইয়া আছেন। নিকটে দাঁড়াইয়া,উজ্জল দীপালোকে গিরীশ বনিতার সরলতা ও পবিত্রতা পূর্ণ মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। তাহার মন অনুতপ্ত হইল। তাঁহার হৃদয় হইতে কাতরতার উচ্ছ্বাস বহির্গত হইল,—

'ওঃ আমি কি পাষণ্ড! কি নরাধম! এমন সোণার প্রতিমাকেও হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছি।' গিরীশ তখনই দেখিলেন স্বর্ণলতার ওষ্ঠাধর ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, মন্দ মন্দ হাসি মুখ মণ্ডলে খেলিতে লাগিল। ভাবিলেন, 'প্রিয়া, আমার, স্বপ্ন দেখিতেছেন; এ সময় এমন সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গান হইবে না।' তৎপরেই স্বর্ণলতার মুখে ব্যাকুলতার লক্ষণ দৃষ্ট হইল, ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বর্ণলতা ঈষৎ চমকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পার্শ্বে স্বামীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া, স্বামীর হাত ধরিয়া সেই শয্যায় বসাইলেন ও একটু বিষন্ন ভাবে বলিলেন, 'একটা বড় কুস্বপন দেখিতেছিলাম।'

গিরীশ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'কি স্বপ্ন, স্বর্ণ?'

স্বর্ণলতা স্বামীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন ও ব্যজন করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন—

'আবার যেন আমরা মুঙ্গেরে গিয়াছি, সেবারের মত আবার যেন তোমাতে আমাতে হাত ধরাধরি করিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতেছি। কিছু দূর উঠিয়া আমি কাতর হইয়া পড়িলাম। দুই জনে পাশাপাশি বসিলাম, তুমি আমাকে প্রকৃতির শোভা দেখাইতে লাগিলে। বলিলে, 'দেখ, দেখ, প্রিয়ে, প্রকৃতি অবনীতলে কেমন সবুজ মখমল বিছাইয়া রাখিয়াছে। আর ঐ সুদূর বিস্তৃতা ভাগিরথী এখান হইতে যেন একখানি জরীর পাড় অথবা রজত ঝালরের মত দেখাই-

তেছে।' তখন তোমার সেই স্বভাব বর্ণন আমার কর্ণকুহরে যেন অমৃত ঢালিতেছিল। তাহা দেখিতেছিলাম আর মাঝে মাঝে তোমার সেই প্রেমোজ্জ্বল চক্ষু দুটী দেখিতেছিলাম। আবার দুই জনে উপরে উঠিতে লাগিলাম। তুমি হঠাৎ আমার হাত ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে লাগিলে, আমি ছুটিয়া ছুটিয়া তোমার হাত ধরিতে লাগিলাম, ক্রমে তুমি ছুটিলে, আমি তোমার সঙ্গে দৌড়িতে পারিলাম না। তথাপি তোমাকে চক্ষের উপর রাখিয়া পাছু পাছু ছুটিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ (বলিতে এখনও গা শিহরিয়া উঠিতেছে) তোমার পদস্খলন হইল, তুমি যেই সেই উচ্চ শিখর হইতে নীচে পড়িতে ছিলে, আমিও ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রাঙ্গাদিদী যেন কোথা হইতে আসিয়া অমনি দুইজনকে দুই হাতে লুফিয়া লইলেন। রাঙ্গাদিদীর তখন মাথায় মুকুট ও অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার ছিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।'

গিরীশ শিহরিয়া উঠিলেন ও হৃদয়াশঙ্কা গোপন রাখিয়া বলিলেন,—

'স্বপ্ন, কখন সত্য হয় না। ও স্বপ্ন মিথ্যা তাহার প্রমাণ দেখ, বিদ্যুল্লতার অঙ্গে অলঙ্কার কোথা হইতে আসিল?'

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গিরীশের ত এই অবস্থা। এ দিকে স্বর্ণলতারও আর সে বিকচ কমলের ন্যায় মুখের প্রফুল্ল ভাব নাই। তাঁহার মুখ মলিন ও বিশুষ্ক, দেহে কান্তি ও বর্ণে ঔজ্জ্বল্য নাই। গৃহ কর্ম্মে তাঁহার আর মন লাগে না, পুস্তক পাঠে প্রবৃত্তি হয় না। আহারে রুচি নাই, বেশ বিন্যাসে ইচ্ছা নাই, শয়নে শান্তি নাই, ফলতঃ স্বর্ণলতার মনে কিছুমাত্র সুখ নাই। তিনি সর্ব্বদাই ভাবেন,—তাঁহার তেমন দেবতুল্য স্বামী এমন হইলেন কেন?

আজ স্বর্ণলতা অতি বিষণ্ণ ভাবে একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছেন, 'আমার তেমন স্বামী, এমন হইলেন কেন? যিনি আমাকে পলকে হারাইতেন, দিনের মধ্যে কতবার আমাকে দেখিতে আসিতেন, কেন তাঁহার আমার প্রতি এরূপ ভাবান্তর হইল? কেন তাঁহার আমার প্রতি এরূপ বিরাগ জন্মিল? কি অপরাধে আমি তাঁহার নিকট অপরাধিণী হইয়াছি, কি দোষে আমি আর তাঁহার মনে স্থান পাই না? মরণ, আমি কেবল আপনার ভাবনাই ভাবিতেছি! তিনি কি ছিলেন কি হইয়াছেন? ভাল করিয়া আহার করেন না, মুখে সে হাসি নাই, সদাই বিমর্ষ!

'কোন অসুখ হইয়াছে কি? একটু অসুখ হইলেই ত আমাকে আগে বলেন! বিষয় কার্য্যের কোন গোল? না, তা হইলেও বলিতেন। তবে কি? মনোকষ্ট? কিসের জন্য? কোন নিকট কুটুম্বের মৃত্যু? না, তাত নয়, আমি যে সে দিন পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র হইতে কুশল সংবাদ পাইয়াছি। তবে মনোকষ্ট। কিন্তু কিসের জন্য? এক দিনও সাহস করিয়া, ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। ওঁর মনোকষ্ট!' স্বর্ণলতার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, কয়েক বিন্দু অশ্রু টস্ টস্ করিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আমি যাঁহার সুখে সুখী, তাঁহার কষ্ট যদি দেখিতে হইল, তবে আর আমার বাঁচিয়া সুখ কি?' স্বর্ণলতা স্বামীর ভাবান্তরের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

আমাদের চতুরা পাঠিকারা মনে করিতে পারেন, 'স্বর্ণলতা কি হাবা মেয়ে, এইটী বুঝিতে পারিল না?' আমরাও স্বীকার করি, স্বর্ণলতা তাঁহাদের মত তত চতুরা নহেন। তবে এককথা এই যে, স্বামীর প্রতি স্বর্ণলতার বিশ্বাস অটল,—অসীম। তাঁহার স্বামী যে অন্য নারীতে আসক্ত হইতে পারেন, স্বর্ণলতার মনে এ সন্দেহ হইতেই পারে না। এই জন্যই স্বর্ণলতা স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারেন নাই। না বুঝিয়াও এত ভাবনা!

বাস্তবিক স্বর্ণলতা আজি অকুল পাথার ভাবনা ভাবিতেছেন, এবং একাকিনী নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। এমন সময় পশ্চাদ্দিকে গিরীশ আসিয়া ডাকিলেন,—'স্বর্ণ!'।

স্বর্ণলতা সেই অশ্রুপূরিত লোচনে চাহিয়া দেখিলেন; স্বামীর মুখ দেখিয়া আরও কাঁদিয়া ফেলিলেন। গিরীশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'কি হইয়াছে, কাঁদিতেছ কেন?' স্বর্ণলতা গিরীশের হাত ধরিয়া বলিলেন,—

'নাথ, বল, তোমার কি হইয়াছে? বল, আমার মাথা খাও, বল।' প্রত্যুত্তর অপেক্ষায় স্বর্ণ সজল নয়নে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

গিরীশ একবারে নিরুত্তর, তাঁহার মলিন মুখ আরও মলিন হইল। স্বর্ণলতা স্বামীকে ঈদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—

'নাথ, আমি কি দেখিতে পাইতেছি না, তোমার কি চেহারা কি হইয়াছে?' চোখের কোনে কালিমা পড়িয়াছে? কেবল ভাবিতেছ, মনে কিছু মাত্র সুখ নাই, সদাই বিষণ্ণ। আমি কিছুই বুঝিতে পারি না! বল নাথ, বল কি হয়েছে।'

গিরীশ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, 'এমন কি হইয়াছে, কই কিছুইত না।'

স্বর্ণ। তবে আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি, তোমার পায়ে পড়িতেছি আমায় ক্ষমা কর। স্বর্ণ গলদশ্রু-লোচনে স্বামীর চরণে পড়িতে গেলেন।

গিরীশ। না, না, উঠ, উঠ, তোমার দোষ কি? বলিয়া স্বর্ণলতার হাত ধরিয়া তুলিলেন ও অতি কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিলেন।

স্বর্ণ। তবে বল, আমাকে গোপন করিও না। তোমার মুখে যে হাসি দেখিলে স্বর্গ সুখ তুচ্ছ মনে হয়, সে হাসি আর কেন দেখিতে পাই না? তুমি কি জাননা, আমার অন্য সুখ নাই, তোমার সুখেই সুখ, তোমার দুঃখেই দুঃখ। তুমি কি বুঝিবে বল, তোমার এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে দেখি আর বোধ হয় যেন আমার এক একখানি পঞ্জর খসিয়া পড়িতেছে।

গিরীশ কাঁদিয়া ফেলিলেন, পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন,—

'স্বর্ণ মনে কিছু না কর ত বলি, তোমার কাছে আমার মনের কথা আর গোপন করিব না—'

স্বর্ণ ব্যাকুল ভাবে কহিলেন,—

'বল—কি বল—'

গিরীশের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। গিরীশ অবনত নেত্রদ্বয় স্বর্ণের পানে তুলিয়া কি ভাবিয়া বলিলেন,—

'দিন কতক অপেক্ষা কর সকল বলিব,—আজ বলিবনা—' তাহার পর সাবধানে স্বর্ণলতার আলিঙ্গন হইতে বিযুক্ত হইয়া বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে পাদচারণ করিতে করিতে অনুতাপ শলাকার

বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন ও হৃদয় উচ্ছ্বাস গোপন করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ওঃ স্বর্ণ, স্বর্ণ, স্বর্ণ, তোমার সর্ব্বনাশ করিতেছি। হা বিদ্যুল্লতা, তুমি তোমার ভগিনীর কি সর্ব্বনাশ করিলে? আর না, এখানে থাকিব না। কোথায় যাইব? স্থান পরিবর্ত্তনে চিত্তের পরিবর্ত্তন হইবে? পাপী সর্ব্বত্রই পাপী, পুণ্যাত্মা সর্ব্বত্রই পুণ্যাত্মা। মনই পাপ পুণ্যের মূল, ক্ষুদ্র মন—

চাহিলে রাখিতে পারে ত্রিদিব নিরয়ে
স্বর্গে বসিয়া কিংবা রুধিত নরক—

আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি? ধিক্ আমায়, লোকে জানিতে পারিলে কি বলিবে? লোক লজ্জা ভয় দূরে থাক, আমার ধর্ম্মভয় কোথায় গেল? ছি, ছি, ছি, আমি আর এখানে থাকিয়া লোকের শ্রদ্ধা ভাজন হইবার যোগ্য নহি। প্রণয়শালিনী স্বর্ণলতার স্বামী হইবার উপযুক্ত নহি। তাঁহার নিকটে যাইতে যে যন্ত্রণা।—ওঃ বিদ্যুল্লতা, ওঃ তুমি কি কুক্ষণেই আমায় দেখা দিয়াছিলে।'

ক্রমে উদাস মনে সেই স্থানেই উপবেশন করিলেন। ক্ষণেক নীরব রহিলেন, আবার ভাবিতে লাগিলেন,—'শোক, তাপ পাইলে সকলেই পর্য্যটনে গিয়া থাকে, তীর্থে গিয়া শান্তি লাভ করে। তীর্থের মাহাত্ম্য আছে—আমিও তীর্থে যাইব। মুঙ্গের যাইব, সেখানে বন্ধুবান্ধবের সহবাসে অবশ্যই আমার মনের মলিনতা দূর হইতে পারে। তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্তে ও সদুপদেশে অবশ্যই আমি আত্মজয় করিতে পারিব। মুঙ্গের যাওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, এখানে থাকিয়া কাজ নাই, কল্যই যাত্রা করিব।'

(ক্রমশঃ)

খদ্যোৎপুঞ্জ।

শালগ্রাম শিলা।—১৮৪৮ খৃঃ অব্দে লর্ড ফকলাণ্ড বম্বে প্রদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীও স্বামীর সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ভাইকাউণ্টেস্ ফক্লাণ্ড ভারতাবস্থান কাল বৃথা ক্ষেপণ না করিয়া এদেশীয়দিগের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয় বর্ণনার্থ 'চৌ চৌ' নামে দুই খণ্ডাত্মক এক পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকের ২য় খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় 'শালগ্রাম' বিষয়ে নিম্ন লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে—

"Above all stones, the Shalgramu is held in the highest estimation. Mr. Colebrook, in the 'Asiatic Researches, Vol. vii., p. 241, says that these stones are found in a part of the Gundaci river, within the limits of Nepal. Major More, in his 'Hindoo Pantheon,' says they are black, mostly round, and commonly perforated in one or more places by worms,

or, as the Hindoos believe, by Vishnoo, in the shape of a reptile. Others are violet and oval.

"The possessor of a Shalagramu, observes the same gentleman, preserves it in a clean cloth; it is frequently perfumed and bathed, and the water thereby acquiring virtue is drank and prized for its sin expelling property." It is always placed near persons when they are about to die." * * * *

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—

'সকল প্রকার প্রস্তরের অপেক্ষা শালগ্রামই অত্যন্ত সম্মানিত। মেঃ কোলব্রুক 'এসিয়াটিক রিসার্চ্চেস্,' নামক গ্রন্থের ৭ম খণ্ডের ২৪১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, নেপালের সীমা মধ্যস্থ গণ্ডকী নদীর অংশ বিশেষে এই প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। মেজর মোর তাঁহার 'হিন্দু প্যান্থিয়ন' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই সকল শিলা কৃষ্ণবর্ণ, প্রায়ই গোলাকার এবং কীট দ্বারা অথবা, হিন্দুগণের বিশ্বাসানুসারে, সর্পাকারধারী বিষ্ণু দ্বারা এক বা একাধিক স্থানে ছিদ্রযুক্ত। কতকগুলা আবার নীলাভা যুক্ত লাল বর্ণ এবং চেপ্টা।

ঐ লেখক আরও লিখিয়াছেন যে শালগ্রামের অধিকারী তাহা সযত্নে পরিষ্কৃত বস্ত্রে রক্ষা করে, সতত সুগন্ধ সংযুক্ত এবং স্নাত করে এবং সেই গুণসমন্বিত স্নান জল পান করে এবং পাপ বিনাশকারী বলিয়া আদর করে। এই শিলা মরণাপন্ন ব্যক্তির সন্নিধানে স্থাপিত করে।

একজন স্ত্রীলোক ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের প্রবীন ও পদস্থ ইংরাজগণ তাহা করেন না, বা করিতে পারেন না, ইহা বড়ই নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

—oo—

ব্রহ্মদেশ।—আমাদের একজন পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'ব্রহ্মদেশটা কি? হিন্দু শাস্ত্রোক্ত স্বর্গের সহিত ব্রহ্মদেশের কোন সম্বন্ধ আছে কি না?

'(১) দেশের নাম ব্রহ্মদেশ, (২) রাজধানীর নাম অমরাবতী, (৩) নদীর নাম ইরাবতী, (৪) হস্তীর শ্বেতাবয়ব এবং (৫) অধিবাসী বৃন্দের বেশ ভূষা কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির অনুরূপ। এ সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, কোন না কোন সময়ে হিন্দুস্থানের সহিত ব্রহ্মদেশের অন্ততঃ একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।'

'এ বিষয়ের অনুকূল অথবা প্রতিকূল যুক্তি ও প্রমাণ যদি আপনি, অথবা আপনার কোন পাঠক লেখেন, তাহা হইলে ভাল হয়।'

আমরা পাঠকগণের মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে এই বিষয় আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

—oo—

'বঙ্গবাসী' ও 'পঞ্চানন্দ'।—'পঞ্চানন্দ 'বঙ্গবাসীর' স্কন্ধে গা ঢালিয়াই অনেক মাটী করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার কৃপায় দুইটা যে প্রধান মাটী হইতেছে, তাহা তিনি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ১ম মাটী—বঙ্গবাসী খবরের কাগজ, ২য় মাটী—বঙ্গবাসী জাতি ভাই। এ দুইই মাটী কেন যদি 'পঞ্চানন্দ' সম্পাদক, বা 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য যে, বঙ্গবাসী খবরের কাগজ; খবরের কাগজ

হাতে লইয়া পাঠক নানা বিষয়ক সংবাদ, রাজকার্য্য, বিধি ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার, সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ে সম্পাদকের প্রবীণ মত, ও চিন্তাপূর্ণ যুক্তি সমূহ পাঠ করিয়া আপনার হৃদয়স্থ করিতে বাসনা করে। তোমার কাগজে যদি তরল চিন্তা-পূর্ণ তরল বিষয় বিশেষরূপে স্থান পায়, তাহা হইলে এই অলস দেশের অলস লোক কখন কি কঠিন তর্কপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবন্ধ পাঠ করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিবে? সে সকল প্রবন্ধের 'হেডিং' মাত্র পড়িয়াই ছাড়িয়া দিবে। কাজেই বঙ্গবাসী খবরের কাগজ মাটী। আরও দেখ তুমি আসরে নামিলে খবরের কাগজ রূপে, ক্রমে সুর ধরিলে 'পঞ্চ' (Punch) রূপে। অতএব ভাই তুমি তো আপনাকে আপনিই মাটী বলিয়া জানিতে পারিয়াছ। আর বঙ্গবাসী জাতি ভাই, যাঁহারা 'বঙ্গবাসী' খবরে কাগজ পড়িয়া আত্মোন্নতির বাসনা করেন, 'বঙ্গবাসীর' অধঃপতনের সহিত তাঁহাদেরও অধঃপতন। সুতরাং তাঁহারাও মাটী। সুরেন্দ্র নাথের মোকদ্দমায় অসময়ে 'পঞ্চানন্দের' নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় আমরা এখন বিশেষ ক্ষতি মনে করিতেছি। নিদ্রাভঙ্গ সহকারে তিনি যদি 'বঙ্গবাসীর' ঘাড়ে না চাপিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত।

'বঙ্গবাসী' বা 'পঞ্চানন্দ' যাহাই মনে করুন আমরা আমাদের সরল বিশ্বাস ব্যক্ত করিলাম। অন্যে যাহাই বলুক,—আমাদের বিশ্বাস, অনর্থক অত্যধিক রসিকতার প্রশ্রয় দিয়া শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা মাসিক পত্রের পরকাল খাইয়াছেন। সেই বঙ্গদর্শন আজিও চলিতেছে, তাহাতে সারবান প্রবন্ধ থাকিতেছে না, এমত নহে। বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসও তাহাতে চলিতেছে। তথাপি বঙ্গদর্শনের আর সে আদর নাই। এখন বঙ্গদর্শন মাটী। কেন? বঙ্গদর্শনে এখন আর সে রসিকতা নাই। সে 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল,' সে 'সুবর্ণ গোলক' সে 'দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন,' সে 'গর্দ্দভ স্তোত্র,' সংক্ষেপতঃ সে চ্যাংড়ামি, সে জ্যাঠামি, সে বকামি বঙ্গদর্শনে এখন নাই। সুতরাং ভাবিয়া দেখিলে বঙ্গদর্শনের এখন উন্নতি হইয়াছে। তথাপি বঙ্গদর্শন মাটী—সঙ্গে সঙ্গে আর আর মাসিক পত্রও মাটী। লোকের এখন বিশ্বাস দুহাতে নিরন্তর রসিকতা না ছড়াইলে বৃথায় তোমার মাসিক পত্র! বস্তুতঃ রসিকতার ফাঁদ পাতিয়া গ্রাহক হরিণ গ্রেপ্তার করা এরূপ পত্রের উদ্দেশ্য নহে। তাহার লক্ষ্য—বাসনা অনেক উচ্চ, অনেক শ্রেষ্ঠ। তাহা হইলে কি হয়, বিবেচনার দোষে যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবে মাসিক পত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সেই জন্যই বলিতেছি ভাই 'বঙ্গবাসী,' হয়ত এই 'পঞ্চানন্দ' সম্মিলন হেতু তুমি আপনিও মজিবে এবং আর পাঁচ জনকেও মজাইবে। তুমি ভাই মাসিক পত্র, বা সপ্তাহিক পত্র লিখিতে বসিয়াছ, নানা উচ্চ চিন্তায় তোমার মন নিবিষ্ট থাকিবে, নানা তত্ত্বে, নানা যুক্তিতে, নানা বিচারে তোমার কাগজ পূর্ণ থাকিবে, রসিকতার জল ঢালিয়া দেওয়া তোমার কি শোভা পায়? 'রসিক রাজ' 'সদানন্দ,' 'পঞ্চানন্দ' প্রভৃতি মহাপ্রভুদিগের হস্তে রসিকতার এক চেটিয়া ভার দিয়া সে ক্ষেত্র হইতে তোমার সরিয়া পড়া আবশ্যক।

আমাদের বোধ হয় বঙ্গবাসীর উদ্যোক্তাগণ বিশেষ ব্যবসায় নিপুণ ব্যক্তি। লোকের যাহা হয় হউক, দেশের যাহা হয় হউক, আশু আমাদের কাজ আমার হইলেই হইল, এরূপ সংকীর্ণ যুক্তি অবলম্বন করিয়া যদি এ কার্য্যে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভ্রান্তি হইয়াছে। রসিকতা চির দিন সমান চলে না। সময় বিশেষে, মনের অবস্থা বিশেষে রসিকতা আপনি বাহির হয়। ইচ্ছা পূর্ব্বক রসিকতা করা যায় না। তাহা হয় না বলিয়াই 'পঞ্চানন্দ' নিয়ম মত বাহির হইবেন না বলিয়া কবুল করিয়াছিলেন, এবং 'বঙ্গদর্শনও' কিছু দিনের পর আর রসিকতা যোগাইয়া উঠিতে পারিলেন না। অতএব ইহা স্থির, কালে 'পঞ্চানন্দ' 'বঙ্গবাসীর' গলা জড়াইয়া আর হাসির লহর তুলিতে পারিবেন না। তখন পাঠকগণ বঙ্গবাসী হাতে করিয়াই বলিবেন, 'এঃ 'পঞ্চানন্দ' কৈ? বঙ্গবাসী মাটি।' অতএব এখন হইতে সাবধান হওয়াই ব্যবসায় হিসাবেও সৎপরামর্শ।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা হয়ত 'বঙ্গবাসী' বা 'পঞ্চানন্দ' বিরুদ্ধ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা কিন্তু সরল ভাবে আমাদের মনের কথা ব্যক্ত করিলাম মাত্র। একবার এই কারণে বাঙ্গালা মাসিক পত্রের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, আবার বাঙ্গালা সংবাদ পত্রেরও তেমনি করিয়া সর্ব্বনাশ না ঘটে, ইহাই আমাদের বাসনা। বঙ্গবাসী সুলভ সংবাদ পত্র। এরূপ সংবাদ পত্র দ্বারা দেশের সমূহ উপকার হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই আমরা সময়ে সময়ে বঙ্গবাসীর ভ্রান্তি বা ত্রুটী দেখিলে সেটী বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি। বঙ্গবাসী সর্ব্ব প্রকারে আদর্শ সংবাদ পত্র রূপে পরিগণিত হইলে আমরা আন্তরিক সুখী হইব।

—০০—

নূতন শিক্ষা।—সুরেন্দ্র নাথের মোকদ্দমা উপলক্ষে কেহ কেহ নিম্নলিখিত রূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন,—

১।—যাহাদের আমরা বালক বলি তাহারাই প্রবীণ।

২।—ভারতবর্ষ এক দেশ নহে, এ কথা মিথ্যা।

৩।—সকল ইংরাজ ইংরাজ নহে।

৪—কোন কোন ইংরাজের উদর ও মস্তকে সর্ব্বদা সাম্য থাকে না।

৫।—ইংরাজ গির্জ্জায় যায় বটে, কিন্তু অনেকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম বুঝে না।

৬।—আমরা যাঁহাকে হিন্দু পেট্রিয়ট্ বলি তিনি নিজে তাহা স্বীকার করেন না।

৭।—কোন কোন খবরের কাগজে ঠিক কথা বলা মহাপাপ বলিয়া জানে।

৮।—ধনবানের মিত্র হইতে হইলে দেশের শত্রু হওয়া আবশ্যক।

৯।—ধর্ম্ম কেবল লোক দেখাইবার জন্য।

১০।—যাঁহাদের লোকে গৌরবে বড় বলে এখন তাঁহারা নিতান্ত ছোট।

১১।—স্বার্থপর ও বড় লোক প্রায় সমার্থ।

১২।—খোষামোদ পটুতা ও বুদ্ধিমত্তা একই কথা।

—০০—

রাজশাসনের উদ্দেশ্য।—কোন ব্যক্তি শাসন সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন অবৈধ আচরণ করিলে তাহাকে

তথাবিধ কর্ম্ম হইতে ভবিষ্যতে নিবৃত্ত রাখিবার নিমিত্ত বিচারক দণ্ড বিধান করেন। দণ্ড বিধানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যে একজনের পরিণাম দেখিয়া অপরাপর সকলে সাবধান থাকিবে এবং আত্ম ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবে।

সুরেন্দ্র নাথের বিচারে এ সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে কি?

বলা বাহুল্য যে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদ হাসিতে হাসিতে ঘোষণা করিতেছে—'না—না—কিছুই—না।'

—oo—

হাসিব না কাঁদিব?—সুরেন্দ্র নাথের বর্ত্তমান অবস্থা শোকের কি সুখের বিষয়? আমরা এখন কাঁদিব না হাসিব? এ প্রশ্নের একই উত্তর। সুরেন্দ্র নাথের বিপদ হইলে অবশ্য কাঁদিবারই কথা। কিন্তু তাঁহার আজি সম্পদ ভিন্ন বিপদ নাই তো। তিনি আজি ভারতবাসীর দেবতা। তাঁহার পুণ্যময় নাম আজি আবাল বৃদ্ধ বনিতার রসনায় বিরাজ করিতেছে। এ নশ্বর জীবনে এতদপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? অতএব সুরেন্দ্র নাথের বর্ত্তমান অবস্থা পরম আনন্দেরই হেতু। আরও আনন্দ, তোমরা রণজিতের পতন শুনিয়াছ, মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ পড়িয়াছ, চিতোরের সর্ব্বনাশ জানিয়াছ, সিপাহী বিদ্রোহ শুনিয়াছ, পলাশীর সমর জ্ঞাত আছ কিন্তু কখন ভারতের এমন সজীবতা, তৈলঙ্গী ও দ্রাবিড়ী, পারসী, ও মাড়ওয়াড়ী, শিখ ও মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া ও আসামী, হিন্দু ও মুসলমান সকল ভারতবাসীর এমন একপ্রাণতা কখন দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, বা পড়িয়াছ কি? না। অদ্য সুরেন্দ্র নাথের ব্যাপারে ভারতে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব কাণ্ড সংঘটিত হইল। অদ্য সকলে সমস্বরে সুরেন্দ্র নাথের জয়ধ্বনি ঘোষণা কর। অদ্য ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ, প্রাণ ভরিয়া হাস।

—oo—

ধর্ম্মহানি হইতেছে কি না?—হাইকোর্টে শালগ্রাম শিলা লইয়া যাওয়ায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে কি না, এ সম্বন্ধে যাঁহাদের এখনও মতভেদ দেখা যায় নিশ্চয়ই তাঁহারা বাতুল। যখন বঙ্গের শিরোভূষণ স্বরূপ স্মার্ত্তকুল চূড়ামনি ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রমুখ নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী এ কার্য্য অবৈধ বলিয়া প্রকাশ্য সভায় মত প্রদান করিয়াছেন, তখন আর কাহার এ বিষয়ে সন্দেহ করা, বা তর্ক বিতর্ক করা নিতান্ত প্রগল্‌ভতা ও পাগ্‌লামী। হিন্দু পেট্রিয়ট সময়ে সময়ে এ ব্যাপারে স্বীয় মত দিতে অগ্রসর হন। এতাদৃশ প্রসঙ্গে তাঁহার মত দিবার যে কি অধিকার আছে, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। অপর লোকে কিন্তু তাঁহার ঈদৃশ সাহস দৃষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না।

বাঞ্ছনীয় জীবন।—সেক্সপীর বলিয়াছেন,—

"Let all the ends thou aim'st at be thy country's,
Thy God's, and truth's."
(Henry viii., Act iii., sc. 2).

অর্থ—

'তোমার যত বাসনা সকলই দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য এবং সত্যের জন্য লক্ষিত হউক।'

হিন্দুপেট্রিয়ট এবং আর আর যে সকল মহাত্মা আপনা আপনি জাতীয় প্রতি-

নিষিদ্ধ পদ গ্রহণ করিয়াছেন, ভরসা করি তাঁহারা উক্ত কবি বাক্যটি পাঠ করিয়াছেন ও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

—●○—

মানবজীবন।—একজন পণ্ডিত মানবজীবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তত্ত্ব সমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন,—'গড়ে মানবের জীবনকাল আটাইশ বৎসর মাত্র। সিকি ভাগ মনুষ্য সাত বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মরিয়া যায় এবং অর্দ্ধভাগ সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হয়। এক হাজারের মধ্যে কেবল একজন মাত্র এক শত বৎসর পরমায়ু লাভ করে। এক শতের মধ্যে গড়ে ছয়জন মাত্র পঁয়ষট্টি বৎসর বাঁচিয়া থাকে এবং পাঁচশতের মধ্যে একজনের অধিক লোক আশী বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে না। স্থির হইয়াছে যে, পৃথিবীর যত লোক সংখ্যা তাহার মধ্যে প্রতিদিন ৯০,০০০ জন কালগ্রাসে পতিত হয় এবং প্রতি ঘণ্টায় ৩,৭০০ জনের জীবনলীলা ফুরাইয়া যায়। তাহা হইলে প্রতিমিনিটে ৬০ জন, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে একজন লোক ভবরঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করে। কিন্তু মানবের জন্ম দেখিলে বুঝা যায় যে, মৃত্যু হেতু লোকসংখ্যার ক্ষয় হইতেছে না। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের ভাগ অধিক। অবিবাহিত লোকাপেক্ষা বিবাহিত লোক অধিক দিন জীবিত থাকে। পূর্ব্বকালাপেক্ষা বর্ত্তমান কালে সভ্য জনপদে লোকের জীবনকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইতেছে।

—●○—

দেশীয়গণের অযোগ্যতা।—দেশীয়গণ জ্ঞান, বুদ্ধি ও শিক্ষা প্রভৃতিতে ইংরাজ জাতির অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট, অতএব তাহারা ইউরোপীয়গণকৃত অপরাধের বিচার করিতে সর্ব্বথা অযোগ্য। মহামতি 'ইংলিশম্যান'-সম্পাদক ও তাঁহারই দলভুক্ত ব্রান্সন, কেস্বুইক প্রভৃতি মহাপ্রভুগণ কলিকাতা হইতে এই ধুয়া ধরিলেন। ক্রমে এই ধুয়ার প্রতিধ্বনি ভারতভূমির যে যে স্থানে স্বার্থসিদ্ধি বাসনার সাম্যাবতার শ্বেত মহাপুরুষগণ বাস করিতেছেন সে সকল স্থান হইতেই সমস্বরে সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ সাগরবারি অতিক্রম করিয়া সেই প্রতিধ্বনি স্বাধীনতার রঙ্গভূমি ইংলণ্ডেও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আঠার বৎসর পূর্ব্বে একজন অতি বিচক্ষণ, পক্ষপাত বিবর্জ্জিত, পণ্ডিত ইংরেজ ভারতবর্ষীয়গণের জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"Many of those who have had experience in the colleges and schools established by the Indian Government, are ready to acknowledge that in quickness of apprehension, in retentiveness of memory, in a happy talent for learning languages, and for mastering the truths of science, Hindoo students are not a whit behind English students of the same age. Indeed, it is very generally admitted that, up to a certain age, young Hindoos are, it anything, quicker and more intelligent than Europeans. In the common concerns of life the natives of India exhibit no deficiency of intellect. In all matters of business, in everything affecting their own interest, they display great practical acuteness. As bankers and shopkeepers they are not only clear-headed, but they have the spirit of patient perseverance in a high degree. While Hindoo lawyer—what shall I say of him,

but that he is one of the subtlest of living mortals ?"*

ইহার ভাব এই ;—

"ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত স্কুল ও কালেজ সমূহ সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন যে, সত্বর বিষয়-গ্রহ, দীর্ঘ ব্যাপিনী স্মৃতি-শক্তি, ভাষা শিক্ষা ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব সমূহ আয়ত্ত করণের আশ্চর্য্য ক্ষমতা সম্বন্ধে হিন্দু ছাত্রবর্গ সমবয়স্ক ইংরাজ ছাত্রগণের অপেক্ষা এক বিন্দুও পশ্চাদ্-পদ নহে। বস্তুতঃ একথা অনেকেই স্বীকার করেন যে, একটা নির্দ্ধারিত বয়স পর্য্যন্ত হিন্দু বালকেরা ইংরাজ বালকাপেক্ষা সমধিক ক্ষিপ্রবুদ্ধি ও চতুর থাকে। জীবনের সতত প্রয়োজনীয় ব্যাপার সমস্তেও ভারতবর্ষ-বাসীগণ কোন রূপ জ্ঞানহীনতা দেখায় না। সকল প্রকার বিষয় কর্ম্মে এবং স্বার্থ সংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ে তাহারা যথেষ্ট তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। মহাজনী ও ব্যবসাদারী কার্য্যে তাহাদের কেবল স্থির বুদ্ধি নহে, অপিচ প্রচুর পরিমাণে সহিষ্ণুতা সংযুক্ত অধ্যবসায়ও দেখা যায়। আর হিন্দু আইন ব্যবসায়ীর কথা কি বলিব ?—তিনি অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি মানবমণ্ডলীর অন্তর্ভুত।'

প্রায় বিংশ বৎসর পূর্ব্বে একজন সরলমনা ইংরাজ ওতপ্রোত ভাবে দেশীয়গণের সহিত মিশিয়া, তাহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, জ্ঞান বুদ্ধি বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া যে মন্তব্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পশ্চাদাগত ইংরাজগণ ভালরূপ না দেখিয়া এবং আবশ্যকীয় সংবাদ না সংগ্রহ করিয়াই অদ্য উচ্চৈঃস্বরে সম্পূর্ণ রূপ বিপরীত মত ঘোষণা করিতেছেন। যদি ইতিহাস সত্য হয়, যদি মানবজাতির বিগত কাহিনী বর্ত্তমান ব্যাপারের নিদর্শন হয়, তাহা হইলে বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবাসী যেরূপ ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও ক্ষমতাবান হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাহারা স্বার্থান্ধ, যাহারা ছিদ্রান্বেষণার্থ বদ্ধপরিকর, যুক্তি বা প্রমাণ তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন ?

—oo—

ভারতবাসীরা কেমন লোক।—নীতি-মার্গ ভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, কলুষিত স্বভাব, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক ইত্যাদি বহুবিধ সুমধুর সংজ্ঞা আজি কালি 'ইংলিশম্যা'নের' দলবল ভারতবাসীর বিশেষণ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সত্য কথাই যাঁহাদের ভূষণ, অকারণ পরনিন্দা যাঁহারা ঘৃণার কার্য্য বলিয়া বোধ করেন, খৃষ্ট ধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ যাঁহারা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং অসাধারণ ধর্ম্ম বুদ্ধি হেতু যাঁহারা অত্যুচ্চ ধর্ম্ম যাজকের পদে সমাসীন, সেরূপ শ্রদ্ধাস্পদ ইংরাজ, হিন্দু চরিত্র সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা একবার এ সময়ে দেখা মন্দ নহে। আমরা নিম্নে মহামান্নীয় বিশপ হিবারের (Bishop Heber) উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"The Hindoos are lively, intelligent, and interesting. The national temper is decidedly good, gentle, and kind. They are sober, industrious, and affectionate to

* The Domestic Life, Character, and Customs of the Natives of India. By James Kerr, M.A., Late Principal of the Hindoo College, Calcutta, p. 9.

their relations, faithful to their masters, and easily attached by kindness."

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ ;—

'হিন্দুগণ সজীবতাময়, বুদ্ধিমান এবং প্রেমাস্পদ জাতি। তাহাদের জাতীয় চরিত্র সর্ব্বতোভাবে উত্তম, কোমল এবং করুণা-পূর্ণ। তাহারা মিতাচারী, পরিশ্রমী এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহবান, প্রভুর বিশ্বাস ভাজন এবং সহজেই দয়া দ্বারা বশীভূত।'

আজি কিন্তু কোন কোন ক্ষিপ্ত ইংরাজ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বিশপ হিবারের বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া আপনাদের উন্মত্ততার সবিশেষ পরিচয় দিতেছেন ?

—০০—

দেশীয়গণের চরিত্র।—বর্ত্তমান কালের কতকগুলি হীনপ্রকৃতিক ইংরাজ ভারত-বাসীর চরিত্রগত দোষই কেবল দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন। কিন্তু তাহাদের চরিত্রে যে সকল মহান্ গুণ আছে, যে সকল গুণের সমীপস্থ হওয়া ইংরাজের সাধ্য নহে, সেগুলির কথা একবারও মনে করিতেছেন না। এরূপ পক্ষপাত, এরূপ এক-দেশদর্শিতা ও সংকীর্ণ হৃদয়তা যে নিতান্ত ঘৃণার্হ বিষয় তাহা কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন? আমরা ইংরাজ-গণের এতাদৃশ একদেশদর্শিতা বিষয়ক নিম্নলিখিত সরস্নোক্তিটি কার সাহেবের অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"We carry with us to India a standard of character formed on the European model. It is in a great measure an ideal standard, tinged with the illusions of youth. Any deviation from this ideal we are apt to regard as a defet. This is judging much as Baebr the Turcoman did. When Baber came to India, he found nothing to his liking. Everything was different from what he had been accustomed to at home. Besides certain defects in minds and manners which he observed, he says the Hindoos have *no good horses, no good flesh, no ice or cold water!* He forgot to add that they had a fertile soil, a sunny sky, corn and oil in abundance, delicious fruits, gold, silver, and precious stones."

ইহার ভাবার্থ ;——

'ইউরোপীয় আদর্শানুসারে চরিত্রের ওজন স্থির করিয়া ইংরাজরা ভারতবর্ষে আসিয়া থাকেন। সে ওজন প্রায়ই যৌবনের ভ্রমাত্মক দৃষ্টিপূর্ণ কাল্পনিক ওজন। ইংরাজরা সেই কাল্পনিক চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা দেখিলেই তাহা অপূর্ণতা বলিয়া মনে করেন। এ বিচার অনেকাংশে সুলতান বাবরের বিচারের অনুরূপ। যখন বাবর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি এখানে তাঁহার মনের মত কিছুই দেখিতে পান নাই। তিনি স্বদেশে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন এখানে সেরূপ কিছুই দেখিলেন না। লোকের মনের এবং আচার ব্যবহারের কোন কোন হীনতার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, 'হিন্দুদের উত্তম ঘোড়া নাই, আহার্য্য মাংস নাই, বরফ বা শীতল জল নাই।' তাঁহার বলিতে ভুল হইল যে হিন্দুদিগের উর্ব্বরা ভূমি আছে, সৌর-করোজ্জ্বল আকাশ আছে, প্রচুর পরিমাণে শস্য এবং তৈল আছে, উপাদেয় ফল আছে এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকাদি আছে।'

যদি লজ্জা থাকে, যদি এখনও দুকান কাটা না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 'ইংলিশম্যানের' দলের অধোবদন হইয়া অথবা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া ধিক্কৃত বদন প্রচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। তোমরা আপন আপন ক্ষুদ্র জ্ঞান ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া যে সময় হিন্দু চরিত্রের অপূর্ণতার কথা উল্লেখ করিয়া ঘৃণা বা কটূক্তিকর একবার সে সময় ভাবিয়া দেখ কি, যে তাহাদের চরিত্রে যে স্বর্গীয় মহত্ব, যে অপার্থিব উদারতা এবং যে অসামুখী পরমযতা আছে, বহুকাল শিক্ষা ও অনেক তপস্যা করিলেও তোমরা তাহার নিকটস্থ হইতে পারিবে না ?

মা ও মেয়ে ।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন গড়াইতে গড়াইতে চলিল। দিনে দিনে মিলিয়া সপ্তাহ, সপ্তাহে সপ্তাহে মিলিয়া মাস এবং মাসে মাসে মিলিয়া বৎসর চলিতে লাগিল। এক, দুই করিতে করিতে ক্রমে তিন বৎসর হইয়া গেল। পিতৃহীনা, দুঃখিনী, মরণাপন্না শরৎকুমারীকে আমরা সেই দারিদ্র্য দুঃখ নিপীড়িত রুগ্ন শয্যায় ফেলিয়া আসিয়াছি। পাঠক! একবার সেই নিরাশ্রয়া বালিকার সন্ধান লইতে আপনার মন ব্যাকুল হইতেছে না কি ?

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে রূপনগরে দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভবন-প্রাঙ্গনে একটী ভুবনমোহিনী বালিকা আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে। বালিকার অবিন্যস্ত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি পৃষ্ঠাচ্ছাদন করিয়া ঘাসের উপর পড়িয়া লুটাইতেছে। বালিকার দেহ লাবণ্যে ঢল্ ঢল্ করিতেছে। উজ্জ্বল, আয়ত, প্রশান্ত লোচনদ্বয় স্থির ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বালিকা বাম হস্তে ভর দিয়া ঈষদ্বক্র ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। বালিকার বয়স দ্বাদশ অতিক্রম করে প্রায়। অনেক ক্ষণ সেইরূপ ভাবে বসিয়া থাকার পর বালিকার নয়ন যুগল যেন অশ্রুজল হইয়া উঠিল। বালিকা দীর্ঘনিশ্বাস সহ 'মাগো' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া আবার একবার আকাশের পানে চাহিল, চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—

'একটী—দুইটী—তিনটী তারা ফুটিয়াছে। এখনই আরও কত ফুটিবে। শুনিয়াছি তারাতেও মানুষ থাকে। যাহারা এখানে মরিয়া যায় তাহারা গিয়া কি তারায় মানুষ হইয়া বাস করে ?—'

বালিকার কথা শেষ হইতে না হইতে এক বৃদ্ধা নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

'শরৎ! মা তুমি এখানে? একি মা, চক্ষু ভার কেন?'

এই বলিয়া বৃদ্ধা শরতের লোচনদ্বয় অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া দিলেন। তখন শরৎকুমারী বৃদ্ধার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল,—

'না মা, আমি তো কাঁদি নাই।'

বৃদ্ধার বর্ণ সুগৌর—মূর্ত্তি ভক্তিজনক। তাঁহার হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ভূষণ, সীমন্তে সুবিস্তৃত সিন্দূর বিন্দু ও ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে এক উল্কি-তিলক শোভা পাইতেছে। বৃদ্ধার পরিধান বস্ত্র মলিন। নবীন পাঠিকারা যাহাই মনে করুন, আমি এই প্রাচীনার মূর্ত্তিকে ভক্তিজনক বলিয়া ফেলিয়াছি। বস্তুতঃ সেই সরলতা পূর্ণা শান্তি স্বরূপার প্রবীণ অবয়ব যথার্থই ভক্তির উত্তেজক। এই প্রবীণা দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মণী—করুণাময়ী।

করুণাময়ী শরৎকুমারীর আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—

'চুলগুলা কি অমনি করিয়া রাখিতে হয়? এক গাছ দড়ি দিয়াও কি বাঁধিতে নাই? চুলগুলা মুড়ো মুড়ো হইতেছে যে।'

শরৎকুমারী হাসিতে লাগিল—কথার কোন উত্তর দিল না। করুণাময়ী আবার বলিলেন,—

'খাওয়া দাওয়া মনে নাই! চল, ভাত খেতে হবেনা?'

শরৎ বলিল,—

'না মা, আমি হয়ত আজি খাব না। শরীর কেমন কেমন বোধ হইতেছে।'

করুণাময়ী সোৎসুক ভাবে বলিলেন,—

'সে কি মা, শরীর খারাপ বোধ হইতেছে! দিনে বুঝি ঘুমিয়েছিলে?"

"না মা, দিনে তো ঘুমাই নাই।"

"চুল বুঝি ভাল করিয়া শুখাও নাই?"

"না মা, চুল তো বেশ করে শুখিয়েছিলাম।"

"তবে কি জানি কেন, শরীর আবার খারাপ হলো। চল এখান থেকে, আর হিম লাগিয়ে কাজ নাই।"

মা ও মেয়ে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

শরৎকুমারীকে আমরা সেই বিপন্ন দশায় দেখিয়াছিলাম। সে রাত্রি সেইরূপ ভাবেই কাটিয়া যায়। পরদিন প্রাতে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় শরৎকুমারীর পীড়ার অবস্থা দেখিতে যান। তিনি মরণাপন্না শরৎকুমারী একাকিনী শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পান। তাঁহারই অপরিমেয় যত্নে ক্ষুৎপিপাসা পীড়িতা শরৎকুমারী কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়। কিন্তু সুলোচনা কোথায়? সে সংবাদ শরৎকুমারী জানে না, কেহই জানে না। দীননাথ চট্টোপাধ্যায় সাধ্যমত অনুসন্ধানে ত্রুটী করিলেন না, কিন্তু কোনই সন্ধান হইল না। কত লোক কত কথাই বলিতে লাগিল; সঙ্গত অসঙ্গত কতই অনুমান করিতে লাগিল। সকলই অনুমান মাত্র, কার্য্যতঃ কোন সন্ধানই হইল না। তখন দীননাথ চট্টোপাধ্যায় অগত্যা সে আশা ত্যাগ করিলেন। তাহার পর অনাথিনী, আশ্রয়হীনা, দারিদ্র্য-দুঃখ-নিপীড়িতা ব্যাধিক্লিষ্টা শরৎকুমারীকে আপনার বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। নিঃসন্তান দীননাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ব্রাহ্মণী করুণাময়ী পিতৃ মাতৃ হীনা শরৎকুমারীর পিতা মাতার স্বরূপ হইলেন। বস্তুতঃ জনক জননী সন্তানকে যেরূপ স্নেহ ও যত্ন করিয়া থাকে,

তাঁহারাও শরৎকুমারীকে তাহাই করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত হীন, সুতরাং শরৎকুমারীকে তাঁহারা অননুভূত পূর্ব্ব সুখ অন্বেষিত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অপরিমিত আন্তরিক স্নেহ যদি দেবদুর্লভ সামগ্রী হয়, তাহা হইলে শরৎকুমারীর সে সুখের সীমা ছিল না।

পিতাকে শরৎকুমারী চক্ষের উপর মৃত্যুকবলিত হইতে দেখিয়াছিল সুতরাং মনকে এক প্রকার বুঝাইতে পারিয়াছিল। কিন্তু সেই স্নেহময়ী জননী, যিনি অনন্য কর্ম্মা হইয়া নিয়ত শরতের মস্তক সমীপে বসিয়া থাকিতেন, যিনি আপনি না খাইয়া শরতকে খাওয়াইয়া সুখী হইতেন, যিনি শয়নে স্বপ্নে প্রতিনিয়ত শরতের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন — শরতের সে জননী আজি কোথায়? বালিকা শরৎকুমারী জননীর চিন্তা হইতে মনকে একবারও বিরত করিতে পারে নাই। তিন বৎসরের অধিক হইল সুলোচনার সন্ধান নাই। এই সুদীর্ঘ কালও শরৎকুমারীর চিত্তকে প্রশমিত করিতে সক্ষম হয় নাই; দীননাথ ও করুণাময়ীর চেষ্টাও সফল হয় নাই। বালিকা এখন সর্ব্বদা সেই চিন্তা করুক না করুক, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার চমকিয়া উঠে এবং এক একবার দৌড়িয়া বাহিরে আইসে—মনে হয় বুঝি মা কথা কহিতেছে, বুঝি মা আসিয়াছে। বালিকার আশা এক দিনও সফল হইল না।

ঘর খানি যাহার নিকট বন্ধক ছিল সে তাহা বেচিয়া লইয়াছে। তথাপি শরৎকুমারী সেই স্থানটায় প্রায়ই যায়। তাহার মনে হয় যদি মা ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে সেই স্থানেই আসিবেন। কিন্তু তাহাকে না দেখিতে পাইয়া হয়ত আবার চলিয়া যাইবেন। বালিকার দুরাশা!

বালিকা শরৎকুমারী এক্ষণে যৌবন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। শরীর ও মন ক্রমশঃই পরিণত হইয়া উঠিতেছে। প্রাবৃটকালে প্রবাহিণী যেরূপ প্রতিদিনই পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ শরৎকুমারীর শরীর যৌবন সমাগম হেতু দিন দিন অধিকতর লাবণ্যযুক্ত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গঠন ক্রমেই অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে।

দীননাথ চট্টোপাধ্যায় দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে শরৎকুমারীর বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। শরৎকুমারীকে কেহ বিবাহ করিতে চাহে না। এমন অপার্থিব সৌন্দর্য্য, এমন সৎস্বভাব, এমন বুদ্ধি, এমন কন্যারত্ন কেহ বিবাহ করিতে চাহে না? চাহে না, তাহার কারণ আছে। শরৎকুমারীর জননী নিরুদ্দেশ। সে সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলে। এমন অবস্থায় কোন্ সাহসী পুরুষ সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়া এই দেবদুর্লভ কুমারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে? সুতরাং দীননাথ চট্টোপাধ্যায় বহু চেষ্টাতেও শরৎকুমারীর বিবাহার্থ পাত্র স্থির করিতে পারেন নাই। পিতৃমাতৃহীনা দুঃখিনী বালিকার জীবনে একমাত্র সুখের আশা আছে—সে আশা বিবাহ। হায়! অভাগিনী শরৎকুমারীর অদৃষ্টে সে সুখও কি ঘটিবে না?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রেই শরৎকুমারীর একটু জ্বর হইল। একটুই হউক আর অনেকই হউক,

দীননাথ ও করুণাময়ী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। প্রাতে উঠিয়াই তাঁহারা চিকিৎসার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী ধীরে ধীরে করুণাময়ীকে বলিল,—

'মা, আমার অসুখ বেশী নয়। হয়ত আপনিই সারিয়া যাইবে। বাবাকে ব্যস্ত হইতে বারণ কর।'

এ স্থানে পাঠকগণকে বিদিত করা বিধেয় যে পিতৃমাতৃহীনা শরৎ এক্ষণে পিতৃ মাতৃ স্থানীয় দীননাথকে পিতা এবং তাঁহার পত্নীকে মাতা বলিয়া ডাকে।

সেদিন কাটিয়া গেল বটে কিন্তু শরৎকুমারীর অসুখ আপনি সারিয়া গেল না। তখন দীননাথ একজন চিকিৎসক ডাকাইয়া রীতিমত চিকিৎসা না করাইলে নয় বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু ডাকা যায় কাহাকে ? এক রামচরণ ডাক্তার—তাহাকে তো কোন ক্রমেই ডাকা হইবে না। তবে আর আছে কে? রাজারহাট প্রভৃতি দূর স্থান হইতে চিকিৎসক আনাইলে চলে, কিন্তু অনেক অর্থের প্রয়োজন। সেরূপ সম্ভাবনা কৈ? দীননাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় করুণাময়ী আসিয়া বলিলেন,—

'তুমি যদি একটু কষ্ট করিতে পার তাহা হইলে এখনই ডাক্তার পাওয়া যায়।'

দীননাথ জিজ্ঞাসিলেন,—

'আমি একটু কেন, অনেক কষ্ট করিতে পারি, কিন্তু ডাক্তার কোথায় ?'

করুণাময়ী বলিলেন,—

'শুভোর মার সঙ্গে এখনই পথে দেখা হইয়াছিল। সে বলিল তার বাপের বাড়ি আনন্দপুরের জমিদার হেমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের বেটা, কি ভাল নামটা বলিল?—কলিকাতার থেকে ভারি যোগ্য হয়ে দেশে এসেছে। সে বড় মানুষের ছেলে, পয়সার তো ভাবনা নাই। কি কাঙ্গাল, কি বড়মানুষ সে সকলকে ঘর থেকে ঔষধ দিয়ে যত্ন করে চিকিৎসা কচ্চে। তার অনেক যশ শুনিলাম। তুমি সকল মত ছেড়ে দিয়ে তার কাছে যাও।'

দীননাথ অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন,—

'অসম্ভব নয়। হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় অতি মহাশয় ব্যক্তি। আমার ব্রহ্মোত্তর জমি লইয়া যখন আমিনেরা গোল তুলিয়াছিল, সেই সময় আমি একবার তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। তিনি আমার পরিচয় লইয়া যেরূপ যত্নে আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং আমার জমি যেরূপ সহজে খালাস দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি যে অতি মহৎ লোক তাহার আর কথা নাই।'

করুণাময়ী বলিল,—

'তবে তো তোমায় জানা শুনাও আছে। তবে তুমি তাই যাও।'

দীননাথ বলিলেন,—

'যাইব বটে, কিন্তু এতদূর বড়মানুষের ছেলে কষ্ট করিয়া আসিবে কি?'

করুণাময়ী বলিলেন,—

'তার যখন এমন দয়ার শরীর তখন আসিতেও পারে। ভাল গিয়াই তো দেখ।'

দীননাথ বলিলেন,—

'আচ্ছা, তাই ভাল। তুমি আমার ভাত বাড়।'

দীননাথ আহারাদি সম্পন্ন করিয়া একটী জীর্ণ ছাতা ও একগাছি বংশ যষ্টি হস্তে লইয়া, মাথায় একখানি গামছা দিয়া, এবং কোমরে একখানি চাদর বাঁধিয়া রূপনগর হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী আনন্দপুর গ্রাম উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

মা ও মেয়ে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রায় সেই সময়েই দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় শরৎকুমারীকে দেখিবার নিমিত্ত রূপনগরে দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে আগমন করিলেন। তিনি দেখিলেন শরৎকুমারী ভালই আছেন। অন্নাহার ব্যবস্থা করা হইল। তাহার পর দেবেন্দ্র নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'চিকিৎসার পুস্তক কিছু পড়িয়াছিলে কি?'

শরৎকুমারী সলজ্জ ভাবে বলিলেন,—

'একটু একটু পড়িয়াছি।

দেবেন্দ্র। হোমিওপ্যাথি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি?

শরৎকুমারী বলিল,—

'বোধ হয় পারিয়াছি।'

তাহার পর দেবেন্দ্র নাথ বলিলেন,—

'বিষয়টা বড় শক্ত। যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহা আমাকে বলিলে আমি বলিয়া দিতে চেষ্টা করি।'

দীননাথ বলিলেন,—

'তুমি যাহা বুঝিয়াছ, বাবুকে বল। যদি কোন জায়গায় ভুল থাকে বাবু বলিয়া দিবেন এখন।'

শরৎকুমারী লজ্জায় বদনাবনত করিলেন। করুণাময়ী বলিলেন,—

'তাহাতে দোষ কি মা? বল না কেন?'

শরৎকুমারী ধীরে ধীরে অতি অল্প কথায়, সেই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে যতদূর বুঝা যায় তাহা ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া দেবেন্দ্র নারায়ণ বিস্ময় মনে করিলেন। তিনি কখনই এত দূর প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি শরৎকুমারীকে আরও এক খানি হোমিওপেথিক পুস্তক প্রদান করিলেন ও সময়ে সময়ে ভাল ভাল পুস্তক পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন এবং তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার পর হাসিতে হাসিতে শরৎকুমারী ও করুণাময়ীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—

'চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত হয়ত কত শতবার সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আপনাদের সহিত হয়ত আর সাক্ষাৎ ঘটিবে না। আপনারা আমাকে আপনার লোক বলিয়া জানিবেন এবং যখন আমাকে কোনরূপ আবশ্যক পড়িবে, তাহা বলিতে সঙ্কোচ করিবেন না।'

করুণাময়ী তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শরৎকুমারীর বদন বিমর্ষ হইয়া গেল।

দেবেন্দ্র নারায়ণ বাহিরে আসিলেন। দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেবেন্দ্র দীননাথকে 'শরৎ কে এবং তাহার বৃত্তান্ত কি' সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। দীননাথ তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ জানাইলেন এবং যে কারণে এখন পর্য্যন্ত শরতের বিবাহ হয় নাই তাহাও জানাইলেন। দেবেন্দ্র বলিলেন,—

'বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু শরৎকুমারীর মাতার ভালরূপ সন্ধান হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি একবার এ সম্বন্ধে সন্ধান করিব। আপনি সে সময়ে এ কথা আমার পিতা ঠাকুরকে জানাইলে বোধ হয়, বিশেষ উপকার হইত। যাহা হউক, আমি অদ্যই গিয়া তাঁহাকে এ কথা জানাইব; বোধ করি তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না।'

দেবেন্দ্র নারায়ণ ভাবিতে ভাবিতে অশ্বারোহণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল, যে ব্যক্তি শরৎকুমারীর স্বামী হইবে, এ জগতে সেই ভাগ্যবান।

সেই দিন প্রদোষকালে শরৎকুমারী ঘাসের উপর বসিয়া রহিয়াছে। আজি কিন্তু তাহার দৃষ্টি আকাশে নাই, আজি তাহার চিত্ত তারা গণনায় নিযুক্ত নহে। আজি তাহার মনে স্বতন্ত্র প্রকার চিন্তা প্রবাহ দেখা দিয়াছে। সে চিন্তার নাম কি তাহা সে জানে না, কেন মনের এ ভাব হইল তাহা সে বুঝে না, এ ভাব কিসের অঙ্কুর তাহাও সে জানে না, তথাপি তাহার চিত্ত-ক্ষেত্র আজি অভিনব চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত। এ চিন্তার পরিণাম সুখ কি দুঃখময় তাহা বালিকা এক একবার ভাবিতেছে, আবার তখনই সে ভাবনা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতেছে। বালিকা ভাবিতেছে,—'মানুষ তো সকলেই, কিন্তু দেবেন্দ্র নারায়ণ আশ্চর্য্য মানুষ! এত দয়া, এত পরোপকার প্রবৃত্তি, এমন বিনয়, এত শিষ্টাচার, এত পাণ্ডিত্য, এক সঙ্গে আর কাহার আছে? দেবেন্দ্র নারায়ণ সাধারণ মনুষ্য নহেন। তিনি মানুষের মধ্যে দেবতা।'

বলা বাহুল্য যে শরৎকুমারী দেবেন্দ্র নারায়ণের গুণের বিশেষ পক্ষপাতিনী হইয়াছে।

বালিকা আবার ভাবিতেছে,—'যাহারা সর্ব্বদা এই দেবতার কাছে বাস করিতে পায় তাহারাই সুখী। যাহারা দেবেন্দ্রকে আমাদের বলিতে পায় তাহাদের কি অতুলানন্দ। তাহারা জীবনে স্বর্গসুখ অনুভব করে।'

বলা বাহুল্য যে শরৎকুমারী দেবেন্দ্র নারায়ণের নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়াছেন।

বালিকা আবার ভাবিতেছে,—'তাঁহার সহিত ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না। হায়! আমার রোগ এত শীঘ্র সারিল কেন? রোগ না সারিলে প্রতিদিনই তো তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া সুস্থ থাকার অপেক্ষা তাঁহাকে নিত্য দেখিতে দেখিতে চিরদিন রোগ শয্যায় পড়িয়া থাকাও ভাল। চেষ্টা করিয়াও তো রোগ করা যায়। আমি তাহাই করিব।'

বলা বাহুল্য যে শরৎকুমারী দেবেন্দ্র নারায়ণকে অজ্ঞাতসারে স্বীয় চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন।

এই সকল ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে চিন্তা তরঙ্গ ক্রমশঃ রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। শরতের মনে হইল,—

'মা যদি থাকিতেন তবে আজি তাঁহার এই দেবেন্দ্র নারায়ণকে দেখিয়া, না জানি, কত সুখই হইত। বাবার মৃত্যুর পর এমন লোক আর আমরা দেখি নাই। হায়! আজি মা কোথায়? আজি মা এই দেবতার কতই বর্ণনা করিতেন; আমি তাঁহার মুখে

দেবেন্দ্রের কতই সুখ্যাতি শুনিয়া, কতই পুলকিত হইতাম, আবার মার যদি বা কোন কথা বলিতে ভুল হইত, আমি তাহা বলিয়া দিতাম। মা গো! বাবার মৃত্যুর পর, তোমার অন্তর্ধানের পর, তোমার এ অভাগিনী কন্যা আর একদিনও আজিকার মত আনন্দ পায় নাই। এ সময়ে মা আমার কোথায় রহিলে? তুমি আইস মা, আমি আজি তোমার গলা জড়াইয়া মুখে মুখ রাখিয়া দেবেন্দ্র নারায়ণের কথা বলি।'

দুঃখিনী বালিকা অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সপ্তাহ অতীত হইল। বেলা প্রায় তিনটা। দীননাথ বাটী নাই, খাজনা আদায় করিতে গিয়াছেন। করুণাময়ী রান্নাঘরের মধ্যে অঞ্চল পাতিয়া শুইয়া আছেন। ঘরের ভিতর দুইটী সুন্দরী বসিয়া কথোপকথন করিতেছে। সুন্দরীদ্বয়ের একজন শরৎকুমারী, অপরা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা, কল্যাণপুরের স্বরূপা বৈষ্ণবীর কন্যা সোহাগী। সোহাগী কতকগুলি বঙ্গসাহিত্যের উৎকৃষ্ট পুস্তক লইয়া আসিয়াছে। পুস্তকগুলি অতি উত্তম কাগজে জড়ান এবং তাহার উপর রেসমী ফিতা দিয়া বাঁধা। সকল পুস্তকের উপরই লাল কালীতে অতি পরিষ্কার অক্ষরে লিখিত,—

'শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে উপহার স্বরূপে প্রদত্ত হইল।'

শরৎকুমারী বলিলেন,—

'আমি কি বলিয়া কি বলিব? আমাকে যে তাঁহার মনে আছে, ইহা আমার নিতান্ত সৌভাগ্য। আর কি বলিলে ভাল হয়, তাহা আমি জানি না। তুমি ভাই, ভাল করিয়া যাহা বলিতে হয় বলিও।'

সোহাগিনী বলিল,—

'আমি কেমন করিয়া বলিব? আমার সঙ্গে তো তাঁর দেখা হবে না।'

'তবে তোমাকে বই দিল কে?'

'আমার স্বামী তাঁহার কাছারিতে কাজ করেন। তিনি স্বামীকে বড় ভালবাসেন, বিশ্বাসও করেন। আমাদের বাড়ী কল্যাণপুর। স্বামীকে তিনি এই বই গুলি দিয়া বলিয়া দেন যে, কোন বিশ্বাসী মেয়ে মানুষের হাত দিয়া এগুলি তোমার কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, এবং তুমি কেমন আছ সে খবরও বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। স্বামী পাছে অপর কোন লোকের দ্বারা ঠিক্ বাবুর মনের মত কাজ না হয়, এই ভয়ে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।'

শরৎ সোহাগীর হাত ধরিয়া বলিলেন—

'তবে তো ভাই, তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করিয়াছ।'

সোহাগ বলিল—

'তোমার জন্য ভাবিয়া তো করি নাই। বাবুর কাজ আমার স্বামীর করিতেই হইবে, আর স্বামীর করিতে হইলে কাজেই আমারও করিতেই হইবে। ইহাতে আমার বেশী কিছুই করা হয় নাই।'

'আমার খবর তুমি জানিয়া গেলে। কিন্তু যে দেবেন্দ্র বাবু আমাদের মত কাঙ্গাল দুঃখী লোকদের এত দয়া করেন, যিনি আমাদের এত অনুগ্রহ করেন, তাঁহার কোন খবর তো আমি

জানিতে পারিলাম না। তুমি তো সেখানে কখন যাও না।'

সোহাগ বলিল,—

'কেন যাইব না? আমি প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ী যাই, সেখানে খাই দাই থাকি। তাছাড়া আমার স্বামীর মুখে তাঁহাদের খবর রোজ পাই। তুমি বাবুর কথা কি জানিতে চাও, বল। আমি সব খবর দিতে পারিব।'

তখন শরৎকুমারী একে একে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল। তিনি কেমন করিয়া লোকজনের সঙ্গে কথা কহেন, তাঁহার স্বভাব কেমন, তাঁহার দয়া কেমন, তিনি কেমন করিয়া খান, কতক্ষণ পড়েন, সমস্তদিন কি কি করেন, তাঁহার পিতৃ-মাতৃভক্তি কেমন, ইত্যাদি নানা কথাই শরৎকুমারী জিজ্ঞাসা করিল এবং সোহাগী তাহার যে যে উত্তর দিতে লাগিল, তাহা নিজের মনের মত হওয়াতে দেবেন্দ্রের প্রতি দেবতা বলিয়া যে ভক্তি ছিল, সেই ভক্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং ভক্ত যেরূপ ভাবে হরি-গুণ-গাথা শ্রবণ করে শরৎ সোহাগীর কথা সকল তদ্রূপ ভাবে শ্রবণ করিতে লাগিল।

রাধারমণ সোহাগীকে বলিয়াছিল, যে, 'বাবু মেয়েটিকে বড় ভালবাসেন বোধ হয়।' সোহাগী বুঝিল,—'ছুঁড়িটা বাবুকে বড় ভাল-বাসে—নিশ্চয়।'

তাহার পর সোহাগী বলিল,—

'তবে এখন আমি আসি'

শরৎ বলিল,—

'তা হবে না ভাই,—দেবেন্দ্র বাবুর এত দয়ার কথা মা শুনিয়া কি বলেন তাহা না শুনিয়া তোমার যাওয়া হবে না। দাঁড়াও মাকে ডাকি।'

এই বলিয়া শরৎকুমারী করুণাময়ীকে ডাকিয়া আনিয়া, সমস্ত কথা বলিল এবং অতি আহ্লাদ ও গৌরব সহকারে একে একে তাঁহাকে পুস্তকগুলি দেখাইল। করুণাময়ী সমস্ত দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

'আমরা কাঙ্গাল। আমাদের যে তিনি এত দয়া করেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা তাঁহারই আশ্রিত।'

সোহাগী করুণাময়ীকে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিল। করুণাময়ী বলিলেন,—

'তা কি হয়? তোমার একটু জল খাইয়া যাইতে হইবে। আমরা গরিব, আমাদের ঘরে তো আর কিছু নাই। চারিটী চালভাজা আর একটু গুড় আছে, তাই খেয়ে একটু জল খাও।'

সোহাগ বলিল,—

'মা ঠাকুরাণী আমি আপনার দাসী। দাসীকে যা ইচ্ছা হয় দেন।'

সোহাগের জলখাওয়া হইলে সে বিদায় হইল। তাহাকে বিদায় দিবার নিমিত্ত শরৎকুমারী ও করুণাময়ী ভবনদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। সোহাগ দৃষ্টির সীমা ছাড়াইয়া গেলে, শরৎ ভাবিলেন, 'দেবেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে যে কুমারীর বিবাহ হইবে, সে না জানি কত যুগ যুগ কত তপস্যাই করিয়াছে।' তাঁহারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই রামমতি নাম্নী এক অর্দ্ধ-বয়সী প্রতিবেশিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

'তোমাদের বাড়ী থেকে ও মেয়ে মানুষটা চলিয়া গেল, ও কে গা?'

করুণাময়ী বলিলেন,—

'ওর বাড়ী কল্যাণপুর, ও বৈষ্ণবদের মেয়ে।'

'ওমা! এতদূর থেকে একলা তোমাদের বাড়ী কেন এসেছিল? কৈ আর তো কখন ওকে দেখি নাই।'

'না, আর কখন ও আসে নাই। একটু দরকারের জন্য আজি এসেছিল।'

'কল্যাণপুরে বৈষ্ণবদের যে পুরাণ জ্বরের ঔষধ আছে, তাই বুঝি শরতের জন্য ওকে দিয়ে আনাইলে।'

'না, তা নয়। ও একজন লোকের কাছ থেকে এসেছিল।'

'কার কাছে থেকে? কৈ কল্যাণপুরে তোমাদের জানা শুনা কেহই নাই তো।'

'না, কল্যাণপুরের কোন লোকের কাছে থেকে আসে নাই।'

'তবে কোথাকার লোক? যার কাছে থেকেই হউক কোন অমঙ্গল না হলেই হলো মা। আমাদের এই কথা।'

তাহার পর যেন নিজে নিজে বলিতে লাগিল,—

'ওদিকে তোমাদের কে আছে? হবে কেহ আছে। আমরা কি সব জানি? আনন্দপুর—আনন্দপুর থেকে তো ও আসে নাই গা?'

করুণাময়ী বলিলেন,—

'হাঁ—তাই বটে।'

'হাঁ—হাঁ। রাজা বাবুর কাছে থেকে বুঝি? কিছু দিয়েছে কি গা? আহা হউক হউক। আমাদের কি, আমরা শুনিলেই সুখী। কি দিয়েছে? দুটাকা দশটাকা হবে কি? তা হবে বৈ কি। তার যে দয়ার শরীর—বাপের কত টাকা। দেবতা ব্রাহ্মণে তাদের বড় ভক্তি। যেমন করে হউক দুটাকা পেলেই হলো মা।'

করুণাময়ী বলিলেন,—

'না, টাকা কড়ি কিছু দেয় নাই।'

'তবে জিনিষ পত্র বুঝি? তা তাই হউক, যেমন করে হক দুটাকার উপকার তো হবেই। সংসার দুদিন সচ্ছল তো হবেই।'

'সে রকম কোন জিনিষ নয়। শরৎ বড় পড়িতে ভাল বাসে, তা তাকে খান কতক বই দিয়েছে।'

রামমতি চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিল,—

'শরতকে বই দিয়াছে, তা দিক। শরৎকে বড় ভাল বাসে বুঝি? তা আর বাস্‌বেনা? বই দিয়েছে—হয়ত তার ভেতর আরও কত কি আছে। তা দেখ গে মা। আহা হউক। আমি যাই।'

এই বলিয়া রামমতি একটু বক্র হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। মা ও মেয়ে দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সোহাগ খানিকটা দূর যাইতে না যাইতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষতল হইতে একটী পুরুষ মানুষ আসিয়া তাহার নিকটস্থ হইল এবং বলিল,—

'এত দেরি যে?'

সোহাগ বলিল,—

'যাহার প্রতি বাবুর এত টান, বাবুর চাকরের বারমেসে মুনিব তাহার কাছে গিয়াই চলিয়া আসিতে পারে কি?'

যে পুরুষকে সোহাগী এ কথা বলিল বলা বাহুল্য যে সে ব্যক্তি রাধারমণ। রাধারমণ বলিল,—

'তুমি আমার রাইরাজা। ঠাট্টা যাউক। এখন দেখিলে কি?'

'দেখিব কি? দেখিলাম জীবন্ত সরস্বতী।'

'বটে? তাইত। বাবুর যেন একটু বিশেষ অনুরাগ বলে বোধ হয়, এদিকে কি রকম দেখিলে?'

সোহাগী বলিল,—

'তোমার বাবুর কি তাহা জানি না, কিন্তু এদিকে অগাধ ভালবাসা।'

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে স্বামী ও স্ত্রী পথ চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় দুই দিন শরৎকুমারীর চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিলেন এবং সোহাগী একদিন কয়েকখানি পুস্তক লইয়া দীননাথের বাটীতে আসিয়াছিল, এই মূল বৃত্তান্ত ক্রমশঃ রূপনগরের লোকের মুখে মুখে ভয়ানক রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা হইয়াছে যে, শরৎকুমারী ও দেবেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছে। দীননাথ ও করুণাময়ী তাহা জানেন ও তাহার উৎসাহ দিয়া থাকেন। লোক সুও আছে, কুও আছে। সু লোকেরা প্রথম প্রথম এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল যে, 'শরৎকুমারী নিতান্ত বালিকা।' কিন্তু কু লোকেরা এক কথায় ইহার খণ্ডন করিয়া দিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে, যে, 'এগার বৎসর বয়সে এখন লোকের ছেলে হয়, সুতরাং শরৎকুমারীর ছেলের মা হইবার বয়স হইয়াছে।' সুলোকেরা আরও বলিয়াছিল যে, 'দেবেন্দ্র নারায়ণ অত্যন্ত সচ্চরিত্র লোক।' তাহার উত্তরে কুলোকেরা বলিয়াছিল, 'একে বড় মানুষের ছেলে, তাহাতে বয়স কাল। এরূপ দোষ ঘটিলে সেটা তার পক্ষে বড় নিন্দার কথা নহে, তাহাতে তাহার চরিত্রেরও দোষ হয় না।' কাজেই কুলোকদিগের জয় হইল। তাহার পর এই ভয়ানক কথা নানারূপে পল্লবিত হইতে লাগিল। সুলোকের কেহ কেহ বলিল, 'দোষ তো ঘটকেরই কথা, এত বড় মেয়ে কখন আইবুড় রাখা সাজে?' কুলোকের কেহ কেহ বলিল,—'এত জানা কথা। মার ঐ কীর্ত্তি—মেয়ে তার নাম রাখিবে না? আইবুড় না রেখে হবে কি? কে ঐ কীর্ত্তিধ্বজা আপনার ঘরে লইবে?' কেহ কেহ বলিল,—'মেয়ে মানুষকে লেখাপড়া শিখাইলেই এইরূপ বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে।' এ অপবাদের প্রমাণও অনেক পাওয়া গেল। একজন বলিল,—'দেবেন্দ্র বাবু যে শরৎকুমারীকে পত্র লেখে এবং শরৎকুমারীও যে দেবেন্দ্র বাবুকে পত্র লেখে তাহা আমার খুড়ির মামাত ভগ্নী বেশ জানে।' আর একজন স্বাক্ষী দিল,—'একদিন দেবেন্দ্র বাবুর একজন লোক এক তোড়া টাকা লইয়া দীননাথের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা আমাদের মেজোবৌর মাসতুতো ভাই স্বচক্ষে দেখিয়াছে।' আর একজন বলিল,—'শরৎকুমারীর গলায় একদিন এক ছড়া আশ্চর্য্য, প্রায় দু হাজার টাকা দামের মুক্তার মালা হরের মা ভাল করিয়া দেখিয়াছে।' একজন বলিল,—'গত অমাবস্যার দিন ঘোর অন্ধকার রাত্রে আমাদের নসিরাম দেখিয়াছে, একজন লোক দীননাথের বাটী হইতে বাহির হইল। লোকটার হাতে হাতির দাঁতের ছড়ি, গলায় সোণার হার, পায়ে বার্নিস করা জুতা। লোকটার কাছে নসিরাম যাইতে না যাইতে লোকটা আম গাছের আড়ালে যোল বেহারার এক পাল্কি ছিল, তাহাতে উঠিয়াই আনন্দ-

পুরের দিকে চলিয়া গেল।' অতএব এত অকাট্য প্রমাণ থাকিতে গ্রামের লোকেরা কেমন করিয়া একথা অবিশ্বাস করিবে? কেহই অবিশ্বাস করিল না। সুলোকও ক্রমে কুলোক হইয়া পড়িল। কথা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ দীননাথের কর্ণে ক্রমে এই নিদারুণ কথা আসিয়া পৌঁছিল। তিনি অবাক্ হইলেন। সত্যই বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল। লোকগুলা এখন বৃদ্ধকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমাদের রাম চরণ ডাক্তার দীননাথ চট্টোপাধ্যায়কে একঘরে করিবার প্রধান উদ্যোগী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার রাগের প্রধান কারণ (১) দীননাথ শরতের পীড়ার সময় তাঁহাকে ডাকে নাই। (২) হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় তাঁহার প্রবল শত্রু। সেই হেমেন্দ্র নারায়ণের পুত্র দীননাথের প্রধান সহায়। অতএব দীননাথকে অপমান করিতে পারিলে প্রকারান্তরে হেমেন্দ্র নারায়ণকেও অপমান করা হয়। দলাদলির ঘোঁট পাকিতে লাগিল। নিরপরাধী, পরদুঃখ কাতর দীননাথ নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি নয়টা কি দশটা হইবে। দীননাথ ফুস্ ফুস্ করিয়া করুণাময়ীকে কি কথা বলিতেছেন। শরৎকুমারী শুইয়াছিল। দীননাথ মনে করিয়াছিলেন শরৎ ঘুমাইয়াছে। শরতের ঘুম আইসে নাই। দীননাথের অস্ফুট কথার মধ্য হইতেও শরৎকুমারী দুই একবার নিজের নাম শুনিতে পাইল। তাহার বাবা তাহার কথা কি বলিতেছেন শুনিবার জন্য তাহার বড়ই আগ্রহ হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া অন্তরালে থাকিয়া শুনিতে লাগিল। দীননাথ বলিতেছেন,—

'এখন উপায় কি?

করুণাময়ী বলিলেন,—

'উপায় আর কি? লোকে একটা মিথ্যা কথা লইয়া আমাদিগকে এমনি করিয়া কখনই কষ্ট দিতে পারিবে না। ধর্ম্ম তো আছেন।'

দীননাথ বলিলেন,—

'আরে কথা যে মিথ্যা সে তো তুমি বলিলে আর আমি বলিলাম, লোকে তো তা বলে না।'

করুণাময়ী বলিলেন,—

'লোকে অমনি বলিলেই হইবে? লোকে জানুক, শুনুক, দেখুক। কোন দোষ পায় তখন বলুক, আমাদের যে সাজা দিতে চায় দিউক—আমরা ঘাড় পেতে নেব।'

দীননাথ বলিলেন,—

'তাতো বটেই। দুদিন দেবেন্দ্র বাবু আমাদের বাড়ী এসেছিলেন, শরৎ পড়িতে ভাল বাসে বলে মেয়ে মানুষের হাত দিয়ে একদিন তিনি কয়েকখান বই শরতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই তো মোট কথা। কিন্তু লোকে কত কথাই বলিতেছে—লোকে বলিতেছে দেবেন্দ্র বাবু আমাদের কত টাকা দিয়েছে, শরৎকে কত গহনা দিয়েছে, প্রায়ই রাত্রে আমাদের বাটীতে আসে—আর মাথা মুণ্ড কি আর বলিব?'

করুণাময়ী বলিলেন,—

'এমন অন্যায় করিয়া কষ্ট দিয়া লোকের যদি সুখ হয় হউক। ভগবান আছেন, ইহার বিচার তিনিই করিবেন। আমরা গরিব, আমরা নিঃসহায়। কিন্তু

তাহা বলিয়া লোকে আমাদের কষ্ট দিয়া যে ভগবানের বিচারেও পার পাইবে, তা কখনও মনেও ভেবোনা।'

দীননাথ বলিলেন,—

'হা ভগবান্, বৃদ্ধকালে আমাকে কি বিপদেই ফেলিলে? নিজের ছেলে নাই, পিলে নাই, একটা পরের মেয়ে লইয়া শেষটা কত কষ্টই পাইতে হইল। জীবনটা দুঃখেই কাটিল। যাহা হউক দুঃখে কষ্টে শাকান্ন খাইয়া দিন কাটাইতে ছিলাম। নিরাশ্রয় পরের মেয়েকে আনিয়া আশ্রয় দিলাম। ভাল কাজই করিলাম। তাহার কি এই পুরস্কার? শরৎকুমারী যে আমার একমাত্র আদরের ধন—আজি তাহারই জন্য আমার এই লাঞ্ছনা। আজি সে যদি আমার ঘরে না থাকিত, তাহা হইলে তো কোন কথাই হইত না। যদি যথাসময়ে তাহার বিবাহ হইত, তাহা হইলেও তো কোন গোল উঠিত না। হায়! এখন করি কি?'

সমাজ ভীত, ধর্ম্ম ভীত, নিরীহ ব্রাহ্মণ আপনাকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিয়া স্বামী স্ত্রীতে বসিয়া নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহারা কত কথাই বলিতে লাগিলেন, কত ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর নিতান্ত ক্লান্ত ও হতাশ ভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ।

প্রভাত গান।

(১)

প্রভাতে উঠিরে গাও রে গান
মধুর মধুর ছাড়িয়ে তান।
স্বরের লহরী দশ দিক্ ভরি
উঠে যেন যথা অমর নগরী
অধির করিয়া দেবের কাণ।
মাগ আশীর্ব্বাদ পূরিলে রে সাধ
উলাসে নাচিবে ব্যথিত প্রাণ।

(২)

এখনও যামিনী নয়রে বিগত,
এখনও জ্বলিছে মরকত কত,
মাথার উপরে নভঃ শোভা করে,
দেখ চেয়ে দেখ গগন পথ।
দেখ চেয়ে দেখ পূরব গগনে,
হাসে শুকতারা প্রফুল্ল-আননে,
দেখরে কেমন, মৃদুল কিরণ
ক'রে বিকীরণ, ভুষিছে নয়ন,
জ্বলিছে যেন বা হেন লয় মন
গগন শিরসে অমূল রতন!
প্রভা নেহারিয়ে প্রদোষে এখন
প্রমোদে নাচেনা কাহার প্রাণ?
গাওরে গাওরে প্রভাত গান।
ভেদি রসাতল, ভরি ধরাতল,
পূরিয়া গগন, উঠুক তান।
মাগ আশীর্ব্বাদ, পূরিলেরে সাধ,
উলাসে নাচিবে ব্যথিত প্রাণ।

৩

ভারতের নিশা পোহাইবে কবে,
কবেরে দুখের আঁধার ঘুচিবে?
ভারত-গগনে, মৃদুল কিরণে,
উজলিবে শুক বিনাশিয়ে দুখ
কবেরে আবার ডুবিবে আঁখি?
'দুখ নিশাভোর হইল এখন
আমোদে সকলে হওরে মগন'
বলিতে বলিতে, হাসিতে হাসিতে,
কবেরে আবার করিবে সুখী?
তোল এই তান, পুরিয়া বিমান,
কররে বধির দেবের কাণ।
ভকতি যোগেতে গাওরে গান।
মাগ আশীর্ব্বাদ, পুরিবেরে সাধ,
ঘুচিবে বিষাদ, লভিলে প্রসাদ
দেব আশীর্ব্বাদ না হয় আন,
গাওরে গাওরে প্রভাত গান।

৪

দেখরে দেখরে মেলিয়া নয়ন,
ভাতিল কেমন অতুল বরণ,
ধরিল কি বেশ পুরব গগন,
আছেত নয়ন, দেখনা চেয়ে,—
সুহাসিনী ঊষা, পরি বেশ ভূষা,
নিজ নিরুপমা, রূপের সুষমা
দেখাতে জগতে, বিমানের পথে
দেখরে আসিল অরুণে লয়ে।
নিরখি অরুণে ঊষা-সহচর,
আমোদে মাতিয়া বিহগনিকর,
সুমধুরস্বরে ধরিল তান,
বিমোহিল মন শ্রবণ প্রাণ।
মাতেনা রে তাতে কাহার প্রাণ?
ঊষা সমীরণ, বহিছে এখন,
পেয়েছে সকলে নবীন জীবন,
সকলেই দেখ পুলকিত মন,
গাও সবে তবে প্রভাত গান,
অমনি করিয়া সুললিত তান,
ধর সবে মিলে হয়ে একতান,
তোষে যেন তাতে দেবের কাণ,
নাচে যেন তাতে দেবের প্রাণ।
মাগ আশীর্ব্বাদ পুরিলেরে সাধ,
উলাসে নাচিবে ব্যথিত প্রাণ।

৫

হবে কিরে পুনঃ ভারতে আবার
অরুণ উদয় অই সে প্রকার?
কভু কিরে পুনঃ ঘুচিবে আঁধার?
হরষে সকলে মগন হবে?
কবে রে সে দিন হইবে কবে?
বিহগে যেমন গাইতেছে গান,
অমনি করিয়া ধরিয়া সুতান
কবেরে আবার খুলিয়া প্রাণ,
ভারত তনয়, করি জয় জয়,
গাইবে ভারত-যশের গান।
হবে প্রতিধ্বনি নগরে, কান্তারে,
পর্ব্বত শিখরে, সাগর অন্তরে,
কেন্দ্রে কেন্দ্রে হবে ধ্বনি অবিরাম,
সকলেরই মুখে ভারতের নাম
কবে রে শুনিয়া মাতিবে প্রাণ?
ধনী কি দরিদ্র, বলী কি দুর্ব্বল,
বারেক মিলিত হইয়ে সকল,
ধর এই তান, পুরুক বিমান,
গভীর শবদে উঠুক তথায়,
দেবগণ যথা সুখে নিদ্রা যায়।
জাগাইয়া দেবে মাগ আশীর্ব্বাদ,
ঘুচিবে বিষাদ, লভিবে প্রসাদ,
দেব আশীর্ব্বাদ না হয় আন,
সকলে মিলিয়া গাওরে গান,
তোষে যেন তাতে দেবের কাণ,
নাচে যেন তাতে দেবের প্রাণ
গাওরে গাওরে প্রভাত গান।

৬

দেখরে আবার দেখা দিল রবি,
মরি কি সুন্দর সমুজ্বল ছবি,
আকাশের হাস, অবনী উলাস,
দেখরে আবার দেখরে চেয়ে।
নালের উপর, দেখ থরে থর
হাসিল সলিলে, নলিনীনিকর,
দেখরে, প্রভাত কিরণ পেয়ে।
ধীর সমীরণে দেখরে কেমনে
ধীরে ধীরে দোলে উলাসে ফুলের রাণী,
আহা সরসী কি রূপের খণি !
সুধা সমস্বাদু উথলিছে মধু
নলিনী হৃদয়ে, ছুটেছে ঘ্রাণ।
তাহে অলিকুল হয়ে সমাকুল,
ধাইল সকলে ত্যজি অন্য ফুল,
সুধাসম মধু করিতে পান।
দেখ মধু পানে হইয়া বিভোর
উড়িছে পড়িছে কতই ভ্রমর,
কেহ বাসে ভরা নলিনী হৃদয়ে
পড়িয়া রয়েছে হারায়ে জ্ঞান।
গুণ গুণ গুণ গুঞ্জরে ভ্রমর,
নলিনীর শোভা, ভ্রমরের স্বর,
মোহিল শ্রবণ মোহিল অন্তর,
প্রমোদে মাতিয়া নাচিল প্রাণ।
শুন শুন অই অলি করে গান,
শুন রে কেমন উঠিয়াছে তান,
অমনি করিয়া ধরিয়া সুতান
গাওরে সকলে প্রভাত গান।
তোষে যেন তাতে দেবের কাণ,
নাচে যেন তাতে দেবের প্রাণ,
মাগ আশীর্ব্বাদ পুরিবে রে সাধ
উলাসে নাচিবে ব্যথিত প্রাণ।

৭

"কবে রে আবার ভারতের কবে
যশের নলিনী বিকসিত হবে ?
কবে রে আবার বাসেতে তাহার
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাবে ?
সে বাসে বিভোর হয়ে নিরন্তর
জগত ভিতর মানব নিকর
তার গুণ গান কবে রে গাবে ?"
তোল এই তান পুরিয়া বিমান
কর রে বধির দেবের কাণ,
ভকতি যোগেতে গাও রে গান,
বারেক সকলে হয়ে একতান
গাও রে গাও রে প্রভাত গান।
পুরাকালে হেথা মহাঋষিগণ
সূর্য্যের উদয়ে করি বেদ গান,
সুমধুর স্বরে পূরা'ত গগন,
মোহিত হইত দেবের কাণ,
নাচিত তাহাতে দেবের প্রাণ।
নাহিরে সেকাল ভেঙেছে কপাল,
এখন সকলে কাঁদনি গাও।
মানসিক দুঃখ, উঘ করি মুখ,
তার স্বরে দেবগণে জানাও।
এ ব্রহ্ম মুহুর্ত্ত উপাসনা কাল,
সকলে মিলিয়া গাও সুরসাল,
করযোড়ে শেষে মাগ আশীর্ব্বাদ,
ঘুচিবে বিষাদ লভিবে প্রসাদ
দেব-আশীর্ব্বাদ না হয় আন,
গাওরে গাওরে প্রভাত গান।
গাও সুরসাল ঘুচিবে জঞ্জাল
পুরিয়া বিমান উঠুক তান,
তোষে যেন তাতে দেবের কাণ,
নাচে যেন তাতে দেবের প্রাণ।
মাগ আশীর্ব্বাদ পুরিবে রে সাধ
উলাসে নাচিবে ব্যথিত প্রাণ।

শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় রাজকুল-দর্পণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

জয়পুর বিবরণ,—দ্বিতীয় প্রকরণ।

১৬৯৯ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত নামা জয়-সিংহ অম্বর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মির্জা রাজা জয়সিংহ হইতে এই জয়সিংহকে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাঁর নামের পূর্ব্বে "সওয়াই" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে *। ইনি রাজটীকা ধারণ করিবার ছয় বৎসর পরে আরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। সম্রাট সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি আজিম পুত্র বেদরবক্তের পক্ষাবলম্বন করেন। ঢোল-পুরের যুদ্ধে আজিম ও তৎপুত্র বেদরবক্ত গতাসু হইলে সাহ আলম বাহাদুর সাহ সম্রাট হইলেন। এই সমর ব্যাপারে তিনি জয়সিংহের প্রতি বীতানুরাগ হইয়া অম্বর প্রদেশ শাসনের জন্য জনৈক শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করেন কিন্তু সমরপ্রাজ্ঞ সাহসী জয়সিংহ নিষ্কোষিত অসি হস্তে পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক সম্রাট পক্ষীয় সমস্ত লোককে বিদূ-রিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে পরস্পরের মঙ্গল কামনায় মাড়োয়ারপতি অজিতের সহিত তিনি এক সন্ধি সংস্থাপন করি-লেন।

জ্যোতির্বিদ্যায় জয়সিংহ যার পর নাই পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট মহম্মদ সাহ বার্ষিক পঞ্জিকার ভ্রমসংশোধনের ভার ইহাঁরই উপর সমর্পণ করেন। ইনি গণিত সম্বন্ধীয় বহুবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যন্ত্র বিজ্ঞান ও সাঙ্কেতিক কৌশল প্রণয়ন দ্বারা জয়সিংহ বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন; সেই সকল প্রক্রিয়ার আলোচনা করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর পরম বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন। ইনি অনেকগুলি মানমন্দির প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া যান। তন্মধ্যে অদ্যাপি দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, কাশী ও মথুরার মান্‌ মন্দির অদ্যাপি ভগ্নদশায় বর্ত্তমান আছে। এই সকল মানমন্দিরে তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। জয়সিংহ ইউক্লিডের বিখ্যাত জ্যামিতি গ্রন্থের সংস্করণ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছিলেন।

ধুন্দারের বর্ত্তমান রাজধানী পরম-শোভাসম্পন্ন জয়পুর নগর তিনিই সংস্থা-পিত করেন। এবম্বিধ নাগরিক সৌন্দর্য্য ভারতবর্ষের আর কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না। ইহার রাজপথগুলি প্রশস্ত এবং সরল রেখার ন্যায় পাতিত। যেখানে এক রাজ পথে অপর রাজপথ আসিয়া মিলিত হইয়াছে অথবা উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই স্থান সমকোণ সমূহে বিভক্ত। এই নগর সংস্থাপন ব্যাপারে বিদ্যাধর নামক জনৈক বঙ্গদেশবাসী গণিত ও জ্যোতিষ

* "সওয়া" শব্দে এক এবং একের এক চতুর্থাংশ বুঝায়। সওয়াই বিশেষণে অভিহিত হইয়া জয়-সিংহ যশের পূর্ণমাত্রা অতিক্রম করিয়াছেন।

বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিত জয়সিংহের সহকারিত্ব করেন। শ্রুত হওয়া যায়, জ্যোতিষ ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে জয়সিংহ যত গবেষণা করেন, বিদ্যাধর ব্রাহ্মণের নিকট তিনি তাহার অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

তিনি যে কেবল এই সকল বিদ্যালোচনায় রাজকার্য্যে শিথিলতা প্রদর্শন করিতেন, কেহ যেন এরূপ অনুমান না করেন। তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে পরমপ্রাজ্ঞ ছিলেন। প্রজা লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি তিনি ক্ষণকালের জন্যও উদাসীন ছিলেন না। স্থানে স্থানে অনেক অতিথিশালা সংস্থাপন করিয়া তিনি পান্থদিগের মহোপকার সাধন করেন। এদিকে মোগলদিগের গৃহবিবাদ ওদিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়, এই সকল গোলযোগে তখন ভারতবর্ষ ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু তিনি তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া কেবল অম্বরের উন্নতির দিকেই লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি তিন বৎসর মাত্র শান্তিসুখ ভোগ করেন। মহম্মদ সাহ সম্রাট সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহাকে আগ্রা ও মালবের শাসন কর্ত্তৃত্বে বরণ করেন। এই সময়ে তিনি জেজিয়া কর স্থগিত করাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বার মালবের শাসন কর্ত্তৃত্বে বরিত হইয়া দেখিলেন, পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল বেগ সম্বরণ করা সুকঠিন, তখন তিনি তাহাদের সহিত সন্ধি করেন। নাদির সাহের দিল্লি আক্রমণ ও তদানুসঙ্গিক নানাবিধ নিষ্ঠুর ব্যাপার সম্পাদন সময়ে রাজপুত রাজেরা নির্লিপ্ত থাকিয়া বিলক্ষণ বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছিলেন।

জয়পুরের ইতিবৃত্ত লেখক রাজপুত কবিগণ জয়সিংহকে এক শত নয় গুণবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ তিনি বিবিধগুণে ভূষিত ছিলেন. তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহাঁর শরীরে দোষ ছিল না একথা বলিতে পারি না, দোষ শূন্য মনুষ্যের আবির্ভাব সম্ভবনীয় নহে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখন কখন পিশাচের ন্যায় ব্যবহার করিতেও ইনি কুণ্ঠিত হন নাই। বিজয়সিংহ জয়সিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বিজয়-জননী পুত্রের বিপদাশঙ্কা করিয়া স্বীয় পিত্রালয়ে পলায়ন করেন এবং পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে দিল্লির রাজ সভায় প্রেরণ করেন। বহুতর উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক বিজয়সিংহ উজীর কমরুদ্দীন খাঁয়ের প্রিয়পাত্র হন। অম্বরের একটী সুন্দর প্রদেশের নাম বসোয়া, বিজয়সিংহ সেই বসোয়া লাভের প্রার্থনা করিলে, উজীর জয়সিংহের নিকট তাঁহার অনুরোধ জানাইলেন। জয়সিংহ সম্মত হইলে বিজয়ের লোভ দ্বিগুণিত হইল, তিনি পাঁচ কোটী মুদ্রা ও পাঁচ সহস্র অশ্বসেনা যোগাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অম্বর রাজ্য এককালে প্রার্থনা করিলেন। মোগল সম্রাট লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইলে সনন্দ লিখিবার আদেশ হইল। জয়সিংহের বন্ধুবর্গ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। জয়সিংহ পত্র পাঠান্তে তাহা নাজিরের হস্তে অর্পণ করিলে সুকৌশলী নাজির কহিল, "অর্থ বা বল প্রয়োগে ইহার কোন প্রতীকার হইবে না, কৌশলে দুর্ব্বৃত্তকে ঠকাইতে হইবে।" পরে এই বিষয় মীমাংসার জন্য সামন্তবর্গ একত্রিত হইয়া জয়সিংহকে কহিলেন "যদি আপনি সন্তুষ্ট চিত্তে বিজয়কে বসোয়া

প্রদেশ সমর্পণ করেন, তবে আমরা ইহার মীমাংসা করিয়া দিব।" জয়সিংহ অকপট হৃদয়ে স্বীকৃত হইলেন। তখন তাঁহারা বিজয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বসোয়া লইয়া ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। এই প্রস্তাবে বিজয় স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "আমি বসোয়া পাইলেই সন্তুষ্ট হইব, কিন্তু জয়সিংহের কথার উপর আমার কিছু মাত্র আস্থা নাই।" সামন্তবর্গ "সীতা রাম" শব্দে শপথ করিয়া কহিলেন, "যদি জয়সিংহ প্রতিজ্ঞা মত কার্য্য না করেন তবে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিব।" পরে সাঙ্গনেরার নগরে উভয় ভ্রাতার পরস্পরের মিলনের প্রস্তাব হইল। বিজয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রক্ষার জন্য কতকগুলি সম্রাট সৈন্যও আগমন করিল। যখন জয়সিংহ সভাস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রাতৃসাক্ষাতে যাত্রা করেন, তখন নাজির গিয়া বিনীত বচনে প্রার্থনা করিল যে, উভয় ভ্রাতার শুভ মিলন ব্যাপার দেখিবার জন্য স্বয়ং রাজমাতা আসিতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। জয়সিংহ সামন্তবর্গের অনুমোদন প্রার্থনায় তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাঁহারা কহিলেন, "ইহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।" নাজির তিন শত দোলা প্রস্তুত করিয়াছিল, প্রত্যেক দোলায় দুই দুই জন অস্ত্রধারী বীরপুরুষ রক্ষিত হইল; রাজমাতার নির্দ্দিষ্ট দোলায় উগ্রসেন নামক বিখ্যাত ভট্টীবীর সংস্থাপিত হইল। ক্রমে ক্রমে সাঙ্গনেরারের রাজপ্রাসাদে আসিয়া দোলাগুলি প্রবেশ করিলে নাজির আসিয়া কহিল, "রাজমাতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" জয়সিংহ এবং সামন্তবর্গ উঠিয়া অগ্রসর হইলেন, পথিমধ্যে উভয় ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল; জয়সিংহ বিজয়কে আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে বসোয়ার দানপত্র সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "যদি তুমি অম্বরের সিংহাসন প্রার্থনা কর, আমি তাহাতেও সম্মত আছি, আমি বসোয়া মাত্র লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব।" এবম্বিধ সদয় ব্যবহারে যার পর নাই পুলকিত হইয়া বিজয় অবনত মস্তকে উত্তর করিলেন, "আমার সমস্ত অভাব সংপূরিত হইয়াছে।" একণে তাঁহারা উভয়ে মাতৃসন্নিধানে যাইতে লাগিলেন। দ্বারে উপনীত হইয়া জয়সিংহ অস্ত্র ত্যাগ করত কহিলেন, "এখানে আর ইহার প্রয়োজন কি?" বিজয়সিংহও তদনুরূপ করিলেন। তাঁহারা পুরপ্রবেশ করিলে নাজির দ্বার রুদ্ধ করিলেন। বিজয়সিংহ রাজমাতার ক্রোড়ের পরিবর্ত্তে ভীমপরাক্রম ভট্টীর করালকবলে পতিত হইলেন। তিনি বন্দী হইয়া দোলারোহণ পূর্ব্বক অম্বরে নীত হইলেন। জয়সিংহ সামন্তবর্গের নিকট একাকী উপনীত হইলে তাঁহারা "বিজয়সিংহ কোথায়" জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়সিংহ আপনার উদরে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "হামারা পেটমে, আমরা উভয়েই বিবর্ণ সিংহের পুত্র, যদি আপনাদিগের এরূপ অভিলাষ হয় যে, বিজয় রাজা হইবেন, তবে আমাকে বধ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করুন। আপনাদের নিষ্কৃতির জন্যই আমি এ কার্য্য করিলাম; বিজয় যদি রাজা হয়, তবে অনধিককাল মধ্যে সে আমার ও আপনাদের শত্রু হইয়া বধ সাধনে কৃতকার্য্য হইত।" সামন্তেরা আর কি করিবেন, ধীরে ধীরে

নির্বাক্ হইয়া চলিয়া গেলেন। শিবিরের বাহিরে বিজয়ের রক্ষীস্বরূপে সম্রাটের দুই সহস্র অশ্বসেনা অবস্থিত ছিল, তাহাদের সেনাপতি "বিজয়ের কি হইল" জিজ্ঞাসা করিলে জয়সিংহ কহিলেন, "সে সম্বাদে তোমাদের প্রয়োজন কি? তোমরা পলায়ন কর, নতুবা তোমাদের অশ্ব কাড়িয়া লইব।" তাহারা দেখিয়া শুনিয়া আস্তে আস্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অতঃপর বিজয়ের কি হইয়াছিল তাহার কোন নিগূঢ় সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

জয়সিংহের বিবরণ সম্যক্‌রূপে বিবৃত করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের অবতারণা করিতে হয়। ইদানীন্তনের মধ্যে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহাতে কেবল তাঁহার অহঙ্কারেরই পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ এই যজ্ঞাশ্ব তাঁহার রাজধানীর সীমা অতিক্রম করিয়াছিল কি না তাহাই সন্দেহস্থল। জয়সিংহ অত্যন্ত মাদকসেবন করিতেন। ইনি চুয়াল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে পরলোক যাত্রা করেন; ইহাঁর তিন পত্নী ও অনেক গুলি উপপত্নী সহমৃতা হয়। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চাও সেই চিতায় আরোহণ করে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ক্রমশঃ।

খাদ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মাংস।—যে দেশে অন্নই প্রধান খাদ্য, তথায় মেষ মাংসাপেক্ষা ছাগ মাংসই ব্যবহৃত হওয়া উচিত; কারণ অন্নাহার দ্বারা শরীরে অযথোচিত পরিমাণ অঙ্গারক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়; মেষ মাংসেও অধিক পরিমাণ তৈলময় পদার্থও থাকে, সুতরাং অন্নের সহিত মেষ মাংস আহার করিলে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ অঙ্গারময় পদার্থ ব্যবহার করা ঘটে, তাহাতে 'গরম' হইবার সম্ভাবনা। ডাক্তার স্মিথ বলেন যে, 'মেষ মাংসাপেক্ষা ছাগমাংস অধিক পুষ্টিকর'।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে অত্যধিক পরিমাণে গোমাংস ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত ইণ্ডএরিয়ান্ (Indo-Aryan) পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩৫৪—৩৮৮ পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তৎকালে এদেশে অপেক্ষাকৃত অল্প লোক বাস করিত, সমস্ত ভূমি কর্ষণ করিবার আবশ্যক হইত না, ভূমির উর্ব্বরতাও অধিক ছিল এবং বোধ হয় কৃষিকর্ম্মের নিমিত্ত ঘোটক ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে ঐ সকল ঘটনা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে যে কোন প্রকারে গোজাতিকে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহারই উপায় করা উচিত। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত বলীবর্দ্দ ব্যবহার হইয়া থাকে, উহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন পশু ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনাও নাই। গাভী যে আমাদের মহোৎ

পকারী জীব তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যে যে কারণে ইউরোপ দেশে ঘোটক মাংস ব্যবহৃত হয় না, সেই সমুদায় কারণেই এ দেশে গোমাংস ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

মাংসের মধ্যে কুক্কুট, হংস, কপোত ইত্যাদি পক্ষীর মাংস সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অত্যন্ত পুষ্টিকর ও পরিমিতরূপ আহার করিলে সহজে জীর্ণ হয়। প্রায় সর্ব্বপ্রকার আনাজ অপেক্ষা মাংস শীঘ্র ও সহজে জীর্ণ হয়,কিন্তু এদেশে যেরূপে মাংস পাক করা হয়, তাহাতে অজীর্ণ হইবারই সম্ভাবনা। অত্যন্ত ঘৃত সংযুক্ত হইলে পাচক রস সমূহ মাংসের মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতে পায় না, মাংস যত সামান্য মস্লাযুক্ত হয়, ততই মঙ্গল। যে জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহাকে ১০।১২ ঘণ্টার অধিক পূর্ব্বে বধ করা উচিত নহে। সে জন্তু কোন প্রকার পীড়িত কি না তাহা প্রায় অনেক সময় তাহার আকার, চলন, ও ক্ষুৎপিপাসাদি দেখিয়া স্থির করিতে পারা যায়। মাংস টাট্‌কা কিনা,তাহা তাহার বর্ণ ও গন্ধ দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে। মাংসকে অধিক উত্তাপ দ্বারা সিদ্ধ করিলে কঠিন ও অপাচ্য হয়, এ নিমিত্ত ধীরে ধীরে মন্দ মন্দ উত্তাপ দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে। লবণ, জিরেমরিচ, তেজপাত, হরিদ্রা ও অল্প পরিমাণ ঘৃত ব্যতীত মাংসে অন্য কোন মস্লা আবশ্যক করে না।

ডিম্ব।—হংস প্রভৃতি পক্ষীর ডিম্ব অতি পুষ্টিকর খাদ্য কিন্তু গুরুপাক। উহাতে গন্ধক ও ফসফরস্ অধিক পরিমাণে থাকে, এ নিমিত্ত জীর্ণ না হইতেই বিসমাসিত হইয়া গন্ধক উদজান নামক বাষ্প উৎপাদন করে। ডিম্ব কাঁচাবস্থায় অল্প লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে শীঘ্র জীর্ণ হয়, রন্ধন দ্বারা কঠিন ও দুষ্পাচ্য হইয়া উঠে। অর্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ ২।৩ মিনিট উষ্ণ জলে রাখিয়া অল্প মাখন, লবণ ও গোল মরিচ মিশ্রিত করিয়া আহার করিলে সকল প্রকার দোষ খণ্ডিত হয়; অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীকেও ঐরূপ ডিম্ব দেওয়া যাইতে পারে। যাহাদের পাকস্থলী নিস্তেজ, তাহাদের ডিম্ব ভক্ষণ নিষিদ্ধ। সুস্থ শরীরে ২।৩ টার অধিক খাইলেই অজীর্ণ হইবার সম্ভাবনা। পুরাতন ডিম্ব ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। টাট্‌কা ডিম্বের মধ্যদিয়া আলোক দৃষ্ট হয়, পুরাতনের উপরি ভাগ পরিষ্কার ও উহা জলে ভাসমান থাকে। ডিম্ব অধিক দিবস রাখিতে হইলে কাষ্ঠের গুঁড়া, কিম্বা লবণের মধ্যে রাখিলে কিম্বা তৈল লেপন করিয়া রাখিলেও উত্তম থাকিতে পারে। অপরিমিত রূপ ডিম্ব ভক্ষণ করিলে পিত্ত বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ডিম্বে অধিক পরিমাণ গন্ধক থাকায় সহজে জীর্ণ হয় না এবং সহজে জীর্ণ না হইলে শীঘ্রই গন্ধক উদজান নামক বাষ্প উৎপন্ন হয় ও উদর স্ফীত হয়।

আনাজ।—বঙ্গবাসীরা যত প্রকার ও যে পরিমাণে আনাজ ব্যবহার করে, বোধ হয় অন্য কোনও দেশে সেরূপ করে না। দুঃখের বিষয় এই যে অধিকাংশ আনাজই প্রায় জল ও কিঞ্চিৎ দুষ্পাচ্য সামগ্রী বিশিষ্ট, সুতরাং অধিক পরিমাণ আহার করিয়া উদর স্ফীত হইলেও শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না। যত প্রকার আনাজ ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই বাস্তবিক উপকারী বলিয়া বোধ হয়। যথা কয়েক প্রকার আলু, কচু,

কাঁচকলা, বেগুণ, পটোল, বাঁধাকপি, ওলকপি, ডেঙ্গোডাঁটা, দুই প্রকার কুমড়া, লাউ, সীম, মটরশুঁটি, বরবটী, ও পেঁপে। কয়েক প্রকার আলু, কচু, কাঁচকলা ও কাঁটালের বীচিতে, শ্বেতসার ময় পদার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডেঙ্গোডাঁটা, বিলাতি কুমড়া, লাল আলু, বীট ও গাজর ইত্যাদিতে অধিক পরিমাণে শর্করময় পদার্থ আছে। এ নিমিত্ত রোগ বিশেষে নিষিদ্ধ। সীম, বরবটী ও মটরশুঁটী অতি পুষ্টিকর পদার্থ; উহাতে যবক্ষারজানময় পদার্থের পরিমাণও অধিক, সুতরাং সময়ে সময়ে দালের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। শাকের মধ্যে বাঁধাকপি, পালঙ্ ও পুঁই খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত নটে, সজনে ইত্যাদি শাক ভক্ষণ করিলে শরীরের উপকার না হইয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। শাকের হরিদ্বর্ণ বিশিষ্ট অংশ পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না। উচ্ছে, করলা ও পাকা পটোলের বীজ মহাপকারী বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবে। কচি পটোল, পেঁপে, ডুমুর, কাঁচকলা ও কুমড়া ইত্যাদি কয়েকটী বিশেষ বিশেষ রোগের পক্ষে উপকারী বলিয়া বিশ্বাস আছে। এই সমুদায় আনাজে খনিজ ও লবণময় পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে, এই নিমিত্তই উহাদিগের আদর। আলুতে খনিজ পদার্থের পরিমান অল্প। সকল গোল আলু সমান পুষ্টিকারী নহে। যে প্রকার আলু অপেক্ষাকৃত অধিক ভারী তাহাই সেই পরিমাণে পুষ্টিকর। নূতন অর্থাৎ টাট্‌কা তরকারী ব্যবহার না করিলে পীড়া উৎপন্ন হয়।

ফল।—এদেশে অনেক প্রকার সুখাদ্য ফল জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই উৎকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা; আম্র, লিচু, পেঁপে রম্ভা, আনারস, কমলালেবু, আতা, দাড়িম্ব, বেল ও নারিকেল; এতদ্ব্যতীত পেয়ারা বিলাতি কুল, খেজুর, ফুটী, তরমুজ ইত্যাদিও সময়ে সময়ে খাওয়া যায়।

আম্র।—আম্র অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কয়েক প্রকার মাত্র স্বাস্থ্যপ্রদ। যে আম্রে 'আঁ'স' নাই, সুমিষ্ট বা অল্প মধুর, এবং যাহাতে কোন প্রকার কীটের চিহ্ন নাই, তাহাই ভক্ষণ করা উচিত। পরিক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, যে আম্রের আঁ'স উদরাময় রোগের প্রধান উদ্দীপক। এই নিমিত্ত আঁ'সযুক্ত আম্র ভক্ষণ করিতে হইলে কেবল তাহার রস বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া উচিত। আম্রসত্ত ও দুগ্ধ একত্রিত করিলে অতি উপাদেয় খাদ্য হয়।

লিচু।—লিচু যদিও এদেশের আদিম ফল নহে, তথাপি এক্ষণে উহাকে বিদেশীয় ফল বলা যাইতে পারে না। সুপক্ক লিচু অতি সুখাদ্য, কিন্তু অধিক খাওয়া উচিত নহে।

পেঁপে।—পেঁপে বিজাতীয় নাম হইলেও ইহা এক্ষণে দেশের উত্তম ফল। উহার পাচক ও রেচক শক্তি আছে। রোগ বিশেষে কাঁচা পেঁপের তরকারী, ও পাকা পেঁপে ঔষধ মধ্যে পরিগণিত হয়।

রম্ভা।—রম্ভা নানা প্রকার, উহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শ্বেতসার ও শর্করময় পদার্থ আছে, এ নিমিত্ত গুরুপাক।

আনারস ও কমলালেবু।—আনারস ও কমলালেবু অতি উপকারী ও সুস্বাদু ফল।

আতা, দাড়িম ও বেল।—আতা ও দাড়িম

দোষ শূন্য ফল। বেল বিশেষ উপকারী ফল ও ঔষধ। কাঁচা বেল দগ্ধ, মোরব্বা ও শুষ্ক করিয়া খাইলে পুরাতন আমাশয় রোগের উপকার হইয়া থাকে, সে বিষয়ের অনেক প্রমাণ দর্শান যাইতে পারে। উহার রক্ত শোধক ও ধারক গুণ আছে। বৃক্ষ-পক্ক বেল সরবৎ করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ ও নাড়ী পরিষ্কার হয়।

খেজুর।—খেজুর অত্যন্ত পুষ্টিকর বটে, কিন্তু অতিশয় গুরু-পাক। ইহা ত্বক সহিত ভক্ষণ করিলে পেটের পীড়া উৎপন্ন হয়।

পেয়ারা।—উত্তম অল্পবীজ বিশিষ্ট পেয়ারা সচরাচর দৃষ্ট হয় না; উহা বাস্তবিক উত্তম ফল। সচরাচর যে পেয়ারা দেখা গিয়া থাকে, তাহার ত্বক ও বীজ সম্পূর্ণ অপাচ্য, সুতরাং পেটের পীড়া উদ্দীপক।

কাঁঠাল।—কাঁঠাল অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত। উহা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও দুষ্পাচ্য।

নারিকেল।—পাকা নারিকেল অত্যন্ত তৈলময় পদার্থ বিশিষ্ট এ নিমিত্ত দুষ্পাচ্য। ডাব অতি উত্তম পানীয় ও খাদ্য। উহার জল অত্যন্ত স্নিগ্ধকারী এ নিমিত্ত কোন কোন পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। নারিকেল স্বয়ং দুষ্পাচ্য হইলেও অন্যান্য খাদ্যের পরিপাক কার্য্যে সাহায্য করে, এ নিমিত্ত অতি অল্প পরিমাণে আহার করা উচিত। পাকা নারিকেলে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ তৈল আছে।

বিদেশীয় ফলের মধ্যে দ্রাক্ষা ফলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, আকরট্ ইত্যাদি অত্যন্ত দুষ্পাচ্য ও তৈলময়। অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই রোগ জন্মিবে।

টাট্‌কা ফল যেরূপ উপকারী, অপক্ক বা অধিকপক্ক ফলও সেইরূপ অপকারী। অম্লরস বিশিষ্ট অপক্ক ফল খাইয়া কত লোক অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তাহা কে গণনা করিবে?

ইক্ষু।—ইক্ষু ফল নহে, কিন্তু ফলের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্যমাত্র যে উহা জল ও শর্করময় পদার্থপূর্ণ। এ নিমিত্ত স্নিগ্ধকারি, তৃষ্ণানিবারক ও পুষ্টিকর। কিন্তু অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

মিষ্টান্ন।—বঙ্গদেশীয় মিষ্টান্নের তালিকা অতি বৃহৎ। সর্ব্বপ্রকার মিষ্টান্নের নাম ও গুণ ব্যাখ্যা করা আমাদের অসাধ্য। কয়েকটী প্রধান প্রধান ও উপকারী মিষ্টান্নের নাম ও গুণের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

মিষ্টান্নের উপকরণ চিনি, বা গুড়, ছানা, ময়দা, সুজি, ঘৃত, নারিকেল, ক্ষীর, বেশম ইত্যাদি। সুতরাং উহা অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর; কিন্তু যেরূপ পুষ্টিকর, সেইরূপ দুষ্পাচ্য।

সন্দেশ ও রসগোল্লা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। উহা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুখাদ্য এবং অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে খাইলেও পীড়া হয় না। টাট্‌কা গজা ও জিলেপীও অতি উত্তম সামগ্রী। পুরাতন হইলে সহজে জীর্ণ হয় না। টাট্‌কা বুন্দে ও মিঠাইও মন্দ নহে; কিন্তু অধিক খাইলে পেটের পীড়া হইবার সম্ভাবনা। মোহনভোগ সকলের পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না। চন্দ্রপুলি ও রসকরা অতি সুস্বাদু বটে, কিন্তু দুই তিনটার অধিক ভক্ষণ করিলে বুকজ্বালা ও অম্ল দোষ উপস্থিত হয়।

তাহাতে নারিকেলের তৈলময় পদার্থ থাকে বলিয়াই বোধ হয় সহজে জীর্ণ হয় না। খাজা, সীতাভোগ, সরপুরিয়া অল্প পরিমাণে খাওয়াই উচিত।

এই সমুদয় খাদ্য ভিন্ন আরও কতকগুলি সামান্য খাদ্য প্রায় প্রতিদিবস অধিকাংশ লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকে। যথা ; মুড়ি, চাউলভাজা, খৈ, চিড়েঁ, মোয়া মুড়কি ইত্যাদি। এই সমুদয় দ্রব্যের মধ্যে গুণের তারতম্য আছে। টাট্‌কা মুড়ি, খৈ, চিড়েভাজা অতি লঘু ও সহজে জীর্ণ হয়, কিন্তু ঐ সমুদয় সামগ্রীই টাট্‌কা না হইলে (নিওনো) উহার মধ্যে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করে ও উদরস্থ হইলে লালা দ্বারা সহজে পরিপাক হয় না। টাট্‌কা মুড়কি, মোয়া ইত্যাদিও এক প্রকার মন্দ নয়। চাউল ভাজা অত্যন্ত কঠিন ও দুষ্পাচ্য।

এ দেশে নানা প্রকার পিষ্টক ব্যবহৃত হয়। বৎসরের মধ্যে দুই একদিন স্বাদ পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্তে অল্প পরিমাণে খাইলে অনিষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত দিবস কেবল পিষ্টকাদি আহার করিলে যে পীড়া হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব অনুরোধ বা লোভ পরবশ হইয়া অধিক পরিমাণে পিষ্টক ভক্ষণ করা অবৈধ।

খাদ্যের বিষয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি আনুষঙ্গিক বা সহকারী খাদ্যের বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক।

লেবু।—কাগুজী ও পাতী লেবু এই দুই প্রকারই আহারের সময় ব্যবহৃত হয়। লেবুর গন্ধ অতি উত্তম, উহার রসে সাইট্রিক্ য়্যাসিড নামক অম্ল পদার্থ আছে, এবং উহার ত্বক্ (খোসা) অত্যন্ত ক্ষুধা উদ্দীপক। নুন লেবু, লেবুর আচার ইত্যাদি সামগ্রী অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অত্যন্ত উপকারী।

আচার ও কাসুন্দি।—অনেকের এরূপ অভ্যাস যে আচার বা কাসুন্দি না হইলে আহারে তৃপ্তি বোধ হয় না। অল্প পরিমাণ ব্যবহার করায় উহাতে উপকার আছে।

এ দেশে অনেক প্রকার মস্‌লা ব্যবহৃত হয়। পরিমিত রূপে ব্যবহার করিলে উপকার ব্যতীত অপকার নাই। সচরাচর গোলমরিচ, লঙ্কা, ধনে, জিরা, তেজপাত, হরিদ্রা ও শর্ষপ ব্যবহৃত হয়। কখন কখন আর্দ্রক, পলাণ্ডু, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, জায়ফল ও জৈয়িত্রী ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয়। মসলার প্রধান গুণ এই যে, উহা পাচক যন্ত্র সমুদায়ের অধিক রস নিঃসারণ করতঃ উহাদের পাচিকাশক্তি বৃদ্ধি করে। উহারা উত্তেজক গুণ বিশিষ্ট, এ নিমিত্ত অধিক ব্যবহার করিলে পাকযন্ত্রের প্রদাহ হইবার সম্ভাবনা, কিম্বা অধিক পরিমাণে দূষিত পাচকরস উৎপন্ন হইয়া পরিপাক কার্য্যে ব্যাঘাত ও উদরাময় রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

অম্ল।—আহারের সহিত অম্ল ব্যবহার করা সমস্ত বঙ্গদেশের অভ্যাস। আহারের শেষভাগে কিঞ্চিৎ অম্লরস বিশিষ্ট সামগ্রী ভক্ষণ করিলে তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে খাদ্য জীর্ণ হইবার ব্যাঘাত জন্মে।

তাম্বুল।—আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। এই প্রথাটি অতি স্বাস্থ্যকর। পানে যে সমুদয় মস্‌লা থাকে, তাহাদিগের সাহায্যে খাদ্য অপেক্ষাকৃত শীঘ্র জীর্ণ হয়। সুপারি চর্ব্বণ কালে প্রচুর

লালা নিঃসৃত হয়, উহা উদরস্থ হইয়া শ্বেত-সারময় পদার্থের জীর্ণ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। লালা রসের সাহায্য ব্যতিরেকে চাউল ইত্যাদি খাদ্য জীর্ণ হইতে পারে না। খয়ের দ্বারা মুখ সুগন্ধযুক্ত ও সুরঞ্জিত হয়। চুণ দ্বারা অতিরিক্ত অম্লরস বিনষ্ট হয়।

সমাপ্ত।

খদ্যোৎপুঞ্জ।

ঋণ পরিশোধের নানাবিধ প্রথা।—একজনের ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ যাহা কিছু দেয় থাকে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাহাই ঋণ নামে অভিহিত। হিন্দুগণ ঋণকে বড় ভয় করিতেন। ঋণ পরিশোধ না করিয়া মৃত্যু হইলে হিন্দুগণ আপনাদিগকে নিতান্ত পতিত বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের সন্তানেরাও পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিতেন এবং যতদিন উক্ত পিতৃঋণ পরিশোধিত না হইত, ততদিন পিতার পরলোকগত আত্মা মুক্ত হইবে না বলিয়া মনে করিতেন। অধমর্ণের দেহাবসানের পর তাহার আত্মা নরকে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিবে বলিয়া শাসন আছে।

ইংরাজদিগের ঋণ সম্বন্ধে হিন্দুগণের ন্যায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে নিয়মিত সময়াবসানে অধমর্ণের দায় মুক্তি হইত না। বস্তুতঃ তামাদি প্রথা একটা কলঙ্কের কথা। যাহা আমি ধারি তাহা আমি আজিও ধারি, কালিও ধারি। কোন প্রকারে ৩ তিন বৎসর কাটাইয়া দিলে উত্তমর্ণের আর দাওয়া থাকিবে না, এ ব্যবস্থা সংসারিক দৃষ্টিতে বিশেষ সুবিধাজনক হইলেও ন্যায় দৃষ্টিতে কখনই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। হিন্দুরগণের ঋণের জন্য পুরুষ হইতে পুরুষান্তর আপনাদিগকে সমান দায়ী জ্ঞান করিতেন। তাহার পর বিত্ত হীনতা (Insolvency) হেতু সমস্ত দায় হইতে রাজানুগ্রহে নিষ্কৃতি লাভ করাও কখন সঙ্গত নহে। একজন ঋণ করিয়া হয়ত অপব্যয় করিয়া সম্পত্তি নষ্ট করিল, কিম্বা বুদ্ধি ও বিবেচনায় দোষে সর্ব্বস্বান্ত হইল, কিম্বা প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জিত অর্থ-গোপন করিল, তাহার পর সকল প্রকার দায় হইতে মুক্তি লাভার্থে নিঃস্ব ও নিরুপায় বলিয়া রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইল। তাহাকে মুক্তি দেওয়ায় সে ব্যক্তির যথেষ্ট উপকার হইল বটে, কিন্তু যাহারা কষ্টার্জ্জিত অর্থ-দ্বারা তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল তাহারা সকলেই ফাঁকে পড়িল। তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য কোন হিসাবে মারা যায় এবং কেন ঋণী তাহার জন্য আজীবন কাল দায়ী থাকিবে না, ন্যায় যুক্তির দ্বারা তাহা বুঝান যায় না। ইংরাজদিগের সমাজে ঋণ দ্বিবিধ; এক, সম্মানার্থ ঋণ (Debts of Honour); দুই, আইন সঙ্গত ঋণ (Legal debts) সম্মানের ঋণ অবশ্যই শোধ দেওয়া আবশ্যক, আইনের ঋণ

ফাকি দিতে পারিলে বিশেষ অপৌরুষ নাই। কিন্তু হিন্দুগণ কখনই এতাদৃশ প্রভেদ ধারণা করিতেও পারিতেন না। যাঁহারা পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য সমস্তও ঋণ বলিয়া জানেন এবং যাহা বর্ত্তমান সভ্যতার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত, তাহাও যাঁহারা ঋণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের বিবেচনায় সকল ঋণই সমান। আমরা অধুনা ইংরাজ শাসনাধীনে স্থাপিত এবং ইংরাজগণের বিধি ব্যবহার দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং ঋণ সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা আমাদের মনে ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিতেছে।

সত্য বটে চার্ব্বাকাদি মতে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' ধার করিয়াও ঘৃত খাইবে, এরূপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এ সকল মত কখনই সমাদৃত বা সাধারণ্যে পরিগৃহীত হয় নাই। লাটীন ভাষায় একটী প্রবাদ আছে, 'qui nummos non gestat in bursa, mel saltem habeat in bucca.' ইহার ইংরাজী অর্থ এইরূপ,—'He who has no money in his purse, ought at least to have honey in his mouth.' ইহার বাঙ্গালা ভাবার্থ,—'যাঁহার বাক্সে টাকা নাই, অন্ততঃ তাঁহার মুখেও মধু থাকা আবশ্যক। এ সকল মত অবশ্যই ঘৃণার্হ।

স্যাম ফুট (Sam foote) নামক একজন বিখ্যাত ঋণী ঋণ শোধ না দেওয়ার অনেক গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছে। সে বলে যাহার ঋণ আছে, সে লোকটা যে বড় লোক তাহার সংশয় থাকে না। যদি সে বড় লোক না হইবে, তাহা হইলে তাহাকে লোক এত ধার দিয়াছে কেন? বিনা পয়সায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ঋণ একটা সুন্দর কৌশল। ঋণ ব্যবসায়ে হিসাব রাখিবার দরকার হয় না; পরে খাটে, আমরা সুখে থাকি। চোর ডাকাইতের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিতে হয় না—কারণ ধার করিতেছি আর খরচ করিতেছি, চোরে চুরি করিবে কি? ইহাতে লোভ দমন করে, এবং সদাশয়তা বাড়াইয়া দেয়—কারণ পরের ধনে কে না সদাশয় হইতে পারে? ইহাতে সাম্য সংস্থাপন করে, কারণ যাহার অধিক আছে, তাহার নিকট হইতে ধার লইয়া তাহার অধিকের ভাগ কমাইয়া দেওয়া হয়। সংক্ষেপতঃ, জীবন-কালে ঋণী সকল ব্যক্তিরই মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং মরণান্তে অনেকেই তাহার জন্য আন্তরিক দুঃখ করে—কারণ তাহাদের পাওনা মাটী হইল।

এই স্যাম ফুট ফর্দ্দিশ (Fordyce) নামক এক দেনদারের জিনিষ পত্র প্রকাশ্য নিলাম কালে রোজ রোজ হাঁটাহাঁটি করিয়া একটীমাত্র বালিষ খরিদ করিয়াছিল। তাহাকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিয়াছিল,—'দেনার জ্বালায় কয় দিন ভাল ঘুম হইতেছে না। এই বালিষের গত মালিক এত ধার সত্ত্বেও ইহা মাথায় দিয়া বেশ নিদ্রা যাইত। যদি ইহা মাথায় দিয়া আমারও ঘুম হয়, এই আশয়ে ইহা কিনিলাম।'

অব্রে (Aubrey) প্রণীত জীবনী মধ্যে বুসেল (Bushell) নামক এক বিখ্যাত ঋণীর বর্ণনা আছে। এই ব্যক্তি যখন মরিয়া যায় তখন ১২০,০০০০ টাকা ধার রাখিয়া যায়। বোধ হয়, পৃথিবী মধ্যে ইহার তুল্য ধার করিবার বিদ্যায় ওস্তাদ কেহ ছিল না। এ ব্যক্তি অসীম চতুরতা ও প্রলোভন দেখাইয়া লোককে আপনার ফাঁদে ফেলিত। কেবল যে সরল লোকেই

ইহার কুহকে পড়িত এমন নহে। অতি-ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক ব্যক্তি সকলও ইহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিত না।

লেইস্ প্রণীত মিময়র গ্রন্থে ট্রসলর নামক এক ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। এই ব্যক্তি যখন ঋণের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত, তখন সে লুকাইয়া থাকিয়া মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিত। তাহার পর সমস্ত দেনা তামাদি হইলে আবার বাহির হইয়া নূতন ঋণের চেষ্টা করিত।

বগেলা (Vaugelas) নামক ফরাশী কবি মৃত্যুকালে উত্তমর্ণগণের হস্তে দেহ সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং ঐ দেহ শব-ব্যবচ্ছেদকগণের নিকট বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন।

দেনার জন্য জেলে পুরিয়া রাখা বিশেষ যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয় না। জেলে রাখিয়া পাওনাদারের টাকা মাটী করার অপেক্ষা ঋণীকে উপার্জ্জন করিয়া ঋণ শোধের চেষ্টা করিতে দেওয়া, বা তাহার কোন রূপ সদ্যুক্তি তাহাকে বলিয়া দেওয়া, বা তাহাকে উপযুক্ত শাসন সহকারে এমন কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যাহাতে তাহার জীবিকা চলিতে পারে, অথচ দেনাও শোধ হইতে পারে, অথবা তদ্রূপ কোন প্রতিকার চেষ্টা করা বোধ করি সমধিক শ্রেয়ঃ।

ইতালির অন্তঃপাতি পাডুয়া নামক স্থানে ঋণীর শাস্তির এক আশ্চর্য্য উপায় আছে। তত্রত্য মন্ত্রী সভা গৃহের সমীপে এক খণ্ড প্রস্তর পতিত আছে। যে ব্যক্তি ঋণ লইয়া তাহা পরিশোধ করিতে অক্ষম, তাহাকে সর্ব্ব সমক্ষে তাহার পশ্চাদ্ভাগ উলঙ্গ করিয়া সেই প্রস্তরের উপর রাখা হয়। ইহাতে দুই উপকার হয়। প্রথমতঃ সে ব্যক্তি নিতান্ত লজ্জিত ও অপমানিত হয়, দ্বিতীয়তঃ সর্ব্ব সাধারণে ঋণীর দুর্গতি দেখিয়া অকারণ বা সঙ্গত্যতিরিক্ত ঋণ করিতে বিরত হয়।

ব্রউটন তাঁহার গ্রন্থে (Broughton's Letter from a Maharatta Camp) লিখিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যখন উত্তমর্ণ কোন ক্রমেই টাকা আদায় করিতে না পারে, তখন সে অধমর্ণের বাটীতে গিয়া 'ধরণা' দেয়। তখন তাহার অনুমতি বিনা কেহ বাটীর ভিতর যাইতে, অথবা বাটী হইতে বাহিরে আসিতে পারে না। যতক্ষণ তাহার টাকা আদায় না হয়, ততক্ষণ সে নিজে কিছুই খায় না এবং তাহার অধমর্ণও দ্বারে উপবাসী লোক ফেলিয়া কিছু খাইতে পারে না; শেষে যখন ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে, তখন যেমন করিয়া হউক টাকা যোগাড় করিয়া এই বিষম উপবাসের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

পারসিবাল তাঁহার সিংহল বৃত্তান্ত (Percival's account of the Island of Ceylon) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যদি কোন সিংহলবাসী কাহারও নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে না পারে, তাহা হইলে সে তাহার নিকটস্থ হইয়া আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখায়—কখন কখন করেও। এরূপ করিলে অধমর্ণ উপায় থাকিলে কখনই টাকা না দিয়া আর থাকিতে পারে না, কারণ তাহাদের দেশাচার প্রচলিত নিয়ম এই যে, কোন ব্যক্তি যদি অপর কাহারও মৃত্যুর

কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার নিজের জীবন সে জন্য দায়ী হইবে।

—oo—

প্রাণদণ্ড।—মণ্টেগু প্রাণদণ্ড বিষয়ক গ্রন্থে (Montagu on the Punishment of Death) লিখিয়াছেন যে,সাধারণতঃ বিশ্বাস, যে কোন বিষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে তাহার শুভাশুভ ফলও বৃদ্ধি হয়; এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। যখন কাপ্তেন কুক ওমাই নামক অসভ্য ব্যক্তিকে ইংলণ্ডে লইয়া আসিলেন, তখন ওমাই ইংলণ্ডে আসিয়া দেখিল যে, ঘোড়াকে চাবুক মারিলে আরও বেগে দৌড়ায়। এতদৃষ্টে সে অনুমান করিল চাবুক মারা বাড়াইয়া দিলে ঘোড়া তীরের ন্যায় ছুটীতে পারে। আইন প্রণেতাগণও ঠিক ওমাইয়ের প্রণালীতে মীমাংসা করিয়া থাকেন। আইন প্রণেতাগণের শাস্তি দিবার অধিকার নাই, কেবল শাস্তির পরিমাণ বিধিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাঁহারা স্থির করেন, শাস্তির পরিমাণ বাড়াইলে অবশ্যই তাহার শুভ ফলও বাড়িবে। সকল সময়ে তাঁহাদের মনে থাকে না যে, কোন কোন বিজ্ঞানের ন্যায়, ব্যবহার শাস্ত্রেও দুই ও দুই মিলিয়া চারি হয় না।

—o—

অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি।—সার কেনেলম্ ডিগবি (Sir Kenelm Digby) একজন মনুষ্যের কুক্কুরাদি জীবের ন্যায় অসাধারণ ঘ্রাণশক্তির বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন*। লিজ নামক স্থানে এই ব্যক্তির জন্ম হয়, এজন্য সাধারণ লোকে ইহাকে লিজের জন বলিয়া ডাকিত। যখন জন নিতান্ত বালক সেই সময়ে দেশে বড় যুদ্ধ হয় এবং সৈনিকেরা গ্রাম দগ্ধ করিতে ও লুটিতে আসিতেছে সংবাদ পাইয়া প্রজাগণ যথাসাধ্য দ্রব্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়া ঘোরারণ্যে পলায়ন করে। যতদিন সৈন্যেরা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে এতদ্বিষয়ক প্রকৃত সংবাদ তাহারা না পাইল ততদিন তাহারা সেই বনেই থাকিল। সৈনিকেরা গ্রাম লুণ্ঠন শেষ করিয়া প্রস্থান করিলে প্রজাগণ গ্রামে ফিরিয়া আসিল, কেবল জন নামক বালক আসিল না। বালক জন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীত হইয়াছিল এবং সকলকে ছাড়িয়া বহু দূর বনে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যদি কখন বা গাছের ফাক দিয়া কোন মানুষ দেখিতে পাইয়াছে, বা কাহারও আওয়াজ পাইয়াছে, সে তাহা সৈনিক মনে করিয়া আরও অধিক দূরে পলায়ন করিয়া লুকাইয়া ছিল। পিতা মাতা কোন ক্রমেই সন্তানের সন্ধান না পাইয়া অগত্যা ফিরিয়া আসিল। তাহার পর জন বনের ফল মূল খাইয়া বহু দিন সেই বনে বাস করে।

কিছুদিন এই বনে বাস করিতে করিতে জনের অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি জন্মে। সে খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ বুঝিয়া তাহার স্বাদ কিরূপ তাহা বলিয়া দিতে পারিত এবং কোথায় সুখাদ্য ফল মূল আছে, তাহা বহুদূর হইতে গন্ধ দ্বারা জানিতে পারিত। একবার শীতকালে সেই বনে যৎপরোনাস্তি খাদ্যাভাব ঘটায় জীব জন্তু অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতে থাকে। জন নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান

* যে গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে তাহার নাম, of Bodies, and of Man's Soul, to discover the immortality of Reasonable Souls; with two Discoveries, of the Powder of Sympathy, and of the Vegetation of Plants, by Sir Kenelm Digby, Knight.

তাহার আহার্য্য সংগ্রহের সহায়তা করে। সে রাত্রিকালে বন ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত প্রান্তরে যে সকল গরু ও শূকর পাল চরিবার নিমিত্ত বাঁধা থাকিত, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত এবং বাছিয়া বাছিয়া দুর্ব্বল পশু আপনার আহার্য্য রূপে গ্রহণ করিত। তাহার এরূপ ধূর্ত্ততা অধিক দিন চলিল না। একদিন সে মনুষ্যের চক্ষে পড়িয়া গেল। যে তাহাকে দেখিল সে তাহার উলঙ্গ ও লোমাবৃতাবয়ব দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তাহার পর জনকে ধরিবার নিমিত্ত বহুবিধ যত্ন করা হইল কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অবশেষে জাল পাতিয়া জনকে ধরিয়া ফেলিল। অল্পকাল পরেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, যাহাকে তাহারা ধরিয়াছে সে কোন নূতন প্রকার জীব নহে, একজন মনুষ্য। জন আবার মনুষ্য সমাজে আসিয়া পড়িল। সে কথা কহিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে আবার সে নূতন করিয়া কথা কহিতে শিখিল।

মনুষ্যালয়ে এবং মনুষ্য সহবাসে কিছুকাল বাস করার পর জনের সুতীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া গেল। সাধারণ মনুষ্যাপেক্ষা ঘ্রাণ সম্বন্ধে তাহার কোন ইতর বিশেষ থাকিল না। একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক (জন আজীবন এত দুঃখ পাওয়ায় এবং তাহার এতাদৃশ অবস্থান্তর হেতু) তাহাকে বড় অনুগ্রহ করিত। জন যখন যাহা প্রয়োজন হইত ঐ স্ত্রীলোকের নিকট চাহিয়া লইত। কিন্তু যদি কখন ঐ স্ত্রীলোক সম্মুখে না থাকিত, তাহা হইলে জন যে খানে সে স্ত্রীলোক আছে, কুকুরের ন্যায় গন্ধ শুঁকিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইত। জন বলিষ্ঠ ও পরিণত দেহ সম্পন্ন পুরুষ ছিল।

প্যারাডাইজ্ লষ্ট্ বিক্রয়।—জগদ্বিখ্যাত কবি মিল্টনের ‘স্বর্গ ভ্রষ্ট’ নামক অত্যদ্ভুত মহাকাব্যের স্বত্ব বিক্রয় পত্র *

* "These Presents made the 27th day of April, 1667, between John Milton, Gent. of the one part, and Samuel Symons, printer. of the other part. Witness that the said John Milton, in conse. of five pounds to him now paid by the said Samuel Symons and others the considera-cons herein menconed, hath given, granted. and assigned, and by these presents doth give, grant, and assign, unto the said Saml Symons. his Executors and Assigns, all that Book. Copy, or Manuscript of a Poem. entitled Paradise lost, or by whatsoever other title or Name. the same is or shall be called or distinguished. now lately licensed to be printed, together with the full benefit, profit, and advantage thereof; which shall or may arise thereof. And the said John Milton, for him his Executors and Admrs doth covenant with the said Saml Symons and Ass. that he and they shall at all times hereafter, have, hold and enjoy the same and all impressions thereof accordingly, without the lett or hindrance of him the said John Milton, his Extors or Assignees. or any person or persons, by his or their consent, or privity. And that he the said John Milton, his Excetrs or Admrs or any other, by his or their means or consent, shall not print or cause to be printed, or sell, dispose or publish, the said Book or Manuscript, or any other Book or Manuscript of the same Tenor or Subject, without the consent of the said Saml Symons, his Executors or Assines, in considera-con whereof he the said Saml Symons. for him, his Executors and Admrs doth covenant with the said John Milton, his Executors and Ass. well and truly to pay unto the said John Milton his Executors and Admrs the Sum of five pounds of lawful English money, at the end of the first impression, which the said Saml Symons his Executors or Assignees shall make and publish of the said Copy or Manuscript, which impression shall be accounted to be ended when thirteen hundred Books of the said whole Copy or Manuscript, imprinted, shall be sold and retailed off to particular reading customers. And shall also pay other five pounds unto the said John Milton, or his Assignees, at the end

পাঠ করিলে কিঞ্চিদধিক দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সাহিত্যানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আজি এ বঙ্গদেশে বঙ্গীয় সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও উন্নতির সহিত দুইশত বর্ষাগ্রে ইংলণ্ডের অবস্থার তুলনা করিলে আমাদের হতাশ বা ক্ষুণ্ণ হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। প্যারাডাইজ্ লষ্ট্ তৎকালে যেরূপ বিক্রয় হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল তাহার কিছুই হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ইংলণ্ডে সাহিত্যানুরাগ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। শেক্ষপীরের সময়ে এবং বহুকাল পরেও তিনি যথোপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হন নাই। এডিসনের স্পেক্টেটর এবং সার ওয়াল্টর স্কটের ওয়েভার্লি ইংলণ্ডে অধ্যয়নানুরাগ বৃদ্ধি করার মূল। এই অধ্যয়ন স্পৃহা যতই বলবতী হইতে লাগিল, এবং যতই সুবিজ্ঞ সমালোচকগণ লোকের গ্রন্থ নির্ব্বাচনের সহায়তা করিতে লাগিলেন, ততই ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ সমাদৃত হইতে লাগিল। যাঁহারা মনে করেন ইংলণ্ডে দর্শন বিজ্ঞানাদির গ্রন্থও অধুনা প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয়, তাঁহারা ভ্রান্ত। মিলের মহাসমাদৃত ও পরীক্ষার্থীগণের অবশ্য পাঠ্য ন্যায়শাস্ত্রের (Logic) দশম সংস্করণ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। হার্বর্টার স্পেন্সারের কোন কোন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের অধিক হয় নাই। আলেক্জাণ্ডর বেন্ ও ষ্ট্যান্লী জেভন্সের গ্রন্থসমূহও নিতান্ত ধীরে ধীরে বিক্রীত হয়। হোয়েট্লির লজিক, বেকনের নোভম অরগেনম্ প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ সকলের ক্রেতা অতি অল্প। এসম্বন্ধে বঙ্গদেশের অবস্থা নিতান্ত হীন। একতঃ ঐ সকল গ্রন্থের ন্যায় উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ বঙ্গভাষায় নিতান্ত বিরল। অপরতঃ যাহাও আছে তাহা বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয় না, সুতরাং তাহার পাঠক নাই। উৎকৃষ্ট পুস্তক ও পত্রিকা যেমন কেন অবস্থা হউক না, পাঠ করিতেই হইবে, দেশের লোকের এরূপ সংস্কার না হইলে জাতীয় সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভাবিত নহে। ইংলণ্ডে বিজ্ঞানাদি না হইলেও, উপন্যাসাদি সুখপাঠ্য পুস্তক যে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয় তাহার সন্দেহ নাই।

---

of the third imppression, to be in like manner accounted. And that the said three first impressions shall not exceed fifteen hundred books or volumes of the said whole Copy or Manuscript a piece. And, further, that he the said Saml Symons, and his Excetrs Admrs and Asss, shall be ready to make Oath before a Master in Chancery, concerning his or their knowledge and belief of, or concerning the truth of the disposing and selling the said Books by retail as aforesaid, whereby the said Mr. Milton is to be entitled to his said money, from time to time, upon every reasonable request in that behalf, or in default thereof, shall pay the said five pounds agreed to be paid upon every impression as aforesaid, as if the same were due, and for and lieu thereof. In Witness whereof, the said partys have to this writing indented interchangeably sitt their hands and Seales the day and yeare first above written.

"JOHN MILTON.

"Sealed and delivered in the presence of us
"JOHN FISHER,
"BENJAMIN GREEN, Servt. to Mr. Milton."

—০০—

শারদীয় উৎসব।

—০০—

সুখের শরত কাল আজি প্রবাহিত।
দেখিলাম প্রকৃতিরে হাস্যময়ী কলেবরে,—
কি যেন অপূর্ব্ব সুখে সকলে মগন!
সুনীল আকাশ হায়! চন্দ্র-কর মাখি গায়
ধীরে ধীরে চলে যায় শুভ্র মেঘগণ,
রাশি রাশি চন্দ্র-করে ধরে সবে খেলা করে
যেন সব দেব-বালা ক্রীড়ায় মগন।
যেই বঙ্গ চির তরে হাসিতে দেখিনি যারে
কেন আজি সেই বঙ্গ প্রফুল্ল আনন?
দুখের নয়নাসারে জানা'ত যে বিধাতারে,
নিশির শিশির বিন্দু করিয়া বর্ষণ;
আজি বেশ হেরি তার বিশুষ্ক সে অশ্রুহার
কেন শোভে নব রঙ্গে চির অভাগিনী?
আসিছেন বঙ্গালয়ে আজিকে আদরে যেয়ে
জগতের দুখহরা ত্রিলোক জননী।
তাই বুঝি অনুমানি বঙ্গ চির পরাধিনী
গাহিতেছে সুখ-গান চাঁদিমা নিশায়।
বহু কাল যে যন্ত্রণা সহিয়াছে পরাধীনা
খুলিয়ে মনের দ্বার বলিবে তাঁহায়।
জগত জননী বিনা, কে আছে গো পতিহীনা
কে আছে তাহার আর বলিবে গো যায়?
হয়েছে সকলি হত পতি পুত্র আদি যত;
বলিতে মনের কথা কেহ নাই হায়।
এদিকে কৈলাসে হায় অপর্ণা জানিল তায়
মনো দুখ কথা সব বুঝিল হৃদয়ে,
কি বিষম দুখে যেন যোগে মগ্ন ত্রিনয়ন
মেলিলা নয়ন ত্রয় আকুল হইয়ে।
জননী বলিয়া হায় মনে কি পড়েছে মায়
মনে কি পড়েছ দেবি বঙ্গ দুখিনীরে?
কাঁদিয়া নয়ন ত্রয় বুঝি দেবী অন্ধ হয়
এই কি মা ভুলে থাকা দুখিনী মায়েরে।
পাষাণী পাষাণ-মেয়ে তোমার যে মুখ চেয়ে
আছে মা গো ত্রিনয়নী আশা হৃদে লয়ে
মা বলে মা কোলে করে, লইবেক তোরে ঘরে
নিজ করে সাদরেতে নয়ন মুছায়ে।
বিধাতা ঠেলেছে পায়, আর কে মা আছে হায়
সোণার বাঙ্গালা তব হয়েছে শ্মশান,
পাষাণী এতেও তোর, ভাঙ্গেনি যোগের ঘোর
মা বলিয়া মনে বুঝি নাহি সে বয়ান?
নিত্যই দেখেছি তায় বিজন বিপিনে হায়
উন্মাদিনী বিষাদিনী ফেলে অশ্রু-ধার,
ছিন্ন ভিন্ন হেম-হার, নাহি সে আকৃতি তার
নাহিক সে কোহিনুরে খচিত আকার।
"কোথা গো মা! ওমা উমা, নয়ন মুছায়ে দেমা
বৎসরেক শোকে মগ্ন আছি তোমা বিনা।
আজি তবে যাও সতী যাও মাগো শীঘ্রগতি
দেখ গিয়ে বিষাদিনী বেঁচে আছে কি না।

বৎসরেক গত হল আবার শরত এলো,
আবার গগনাঙ্গনে রজত মেখলা
আবার মানবগণ পরি নানা আভরণ
কুল ফুল পরিমলে করিতেছে খেলা
ছোট ছোট ফুল গুলি, বাতাসেতে দুলি দুলি
ভাবিতেছে করে পদে লইবে আশ্রয়,
আজি সব ব্রজবাসী সুখে সবে হাসি হাসি
মন প্রাণ খুলে গায় স্তুতি গাথা চয়।

অশ্রুময় তিন আঁখি দেব ত্রিনয়ন দেখি
জিজ্ঞাসিল আশুতোষ অতি দুখভরে

"ইচ্ছাময়ি কেন আজি নয়নেতে অশ্রু রাজি
প্রবাহিত অকস্মাৎ কি ভাব অন্তরে?
চঞ্চল তোমার হিয়া তুষ্ট করি কি বা দিয়া?
কিম্বা কোন দোষে তুমি আজি এ তাপস

*   *   *

বল দেবি দয়া করি কি ভাবে হে শঙ্করি!
পূজিলে সন্তুষ্ট হবে তোমার মানস"

তবে দেবী ধীরে ধীরে নয়নের অশ্রুটিরে
মুছিলা জানাতে দেবে দুঃখের বেদন।
বলিলা বিষণ্ণ স্বরে আশুতোষ জটাধরে
"তিনটি দিবস তরে যাব বঙ্গালয়
আবার আসিয়ে তব চরণ আলয়ে লব
পুনর্ব্বার বৎসরেক যাবনা কোথায়।"
"তুমি দেবী ইচ্ছাময়ি যাও তবে কৃপাময়ী
তুমি গেলে গৃহে আর রবনা হেথায়।"
বহিল এ সুখ বাণি স্বর্গে দেবী মন্দাকিনী,
বহিয়ে এবার্ত্তা বিশ্ব আনন্দে ভাসায়।
শুনিলেক বঙ্গবাসি, আজি বঙ্গ পৌর্ণমাসী—
প্রতি ঘরে তাই আজি আগমনি গান;
সেই স্বরে তুলি তান বহিল মঙ্গল গান
এই বঙ্গ এত দিনে পূর্ণ মনস্কাম।

Mrs K. M. Dutt.*

বৈদিকপ্রবন্ধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৬—কাব্য।

[যম, যমের কুকুর ও যমের কুকুরের মা]

ইন্দ্র নামক দেব-রাজের দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত মহামান্য সরমা কুকুরী, বলপুর নামক গিরি-দুর্গ-বাসী পণি-সৈন্যগণের পূর্ব্বোক্ত অগ্রাহ্য ভাব ব্যঞ্জক জিজ্ঞাসার উত্তরে কথিত রূপ সত্য অথচ অপরিস্ফুট এবং জিজ্ঞাসাকারীদের মর্ম্ম পীড়ক ও স্বীয় প্রভুর মাহাত্ম্যসূচক বর্ণনা করিলে, পণি-সৈন্যদিগের তাহাতে কিছুমাত্র বিষণ্ণভাব হওয়া দূরে থাকুক বরং আরও উপেক্ষা-বুদ্ধি প্রবল হইল; তাহারা এবার বিদ্রূপোক্তির দ্বারা দূতীকে লজ্জিত, অবমানিত ও আচ্ছন্নমতি করিতে চেষ্টা করিল। যথা;—

কীদৃঙ্ঙিন্দ্রঃ সরমে কা দৃশীকা
যস্যেদং দূতীরসর পরাকাৎ।
আগচ্ছান্ মিত্রমেনা দধাম্য-
থা গবাং গোপতি র্নো ভবাতি॥

* লেখিকার অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আমরা এস্থলে তাঁহার নাম ইংরাজিতে সন্নিবিষ্ট করিলাম। তিনি উক্ত কবিতা সন্দর্ভের সহিত একখানি ইংরাজি পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এই: "Sir,—I request you to insert my name in English. * * *." আমরা লেখিকা মহাশয়ার এতাদৃশ অসঙ্গত অনুরোধও উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলাম না।—প্রঃ সং।

অর্থ ;—সরমে! তুমি যার দূতী হইয়া এতদূর হইতে এই দুর্গম স্থানে আসিয়াছ, তোমার সে ইন্দ্র কিরূপ? বলি দেখ্‌তে কেমন? আসুন তিনি, তাঁহাকে আমরা মিত্র বলিয়া স্বীকার করিব; তাহা হইলেই তিনি সুতরাং আমাদের রক্ষিত গোধন-সকলের আধিপত্য করিতে সমর্থ হইবেন॥

এই কাকূক্তির দ্বারা প্রথমতঃ ইন্দ্রকে নগণ্য করা হইল, তিনি গৌতম-শাপে সহস্র-ভগ-যুক্ত-শরীর * হওআ অবধি অতি বীভৎস-দর্শন, ইহাও স্মরণ করান হইল ও তৎসঙ্গ, স্ত্রীলোকের দৌত্যে পাপ-প্রণয়ের সদ্‌ভাবও অসম্ভব নহে, ইহা প্রকাশ করত সরমাকে লজ্জিত করিবার চেষ্টা পাওআও হইল। পরে ইহাও বোধিত হইল যে, এখানে তাঁহার আগমন মাত্রের বিলম্বতা—আসিবামাত্র পূর্ব্ব শত্রুর যেরূপ উপযুক্ত পুরস্কার হওআ উচিত তাহার ন্যূন হইবে না, অথচ মৈত্রীই যে বীরপুরুষগণের বশ করিবার একমাত্র উপায়, ইহাও এতদ্দ্বারা অপ্রকাশিত থাকিল না।

উল্লিখিত প্রকার কাকূক্তিতে গভীরধী পূত-হৃদয়া সরমা, কিছুমাত্র ক্ষুব্ধা হইলেন না, অধিকন্তু শত্রুগণ, সত্য বলিয়া স্বীকার করুক বা না করুক, আত্ম-প্রভুর যথার্থ পরিচয় দানেও কুণ্ঠিতা হইলেন না এবং কিরূপে স্বীয় সাহসিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষের হৃদয়-সাগরে বাড়ব প্রজ্বলিত করিতে হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্যই যেন এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন;—

নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎ স

যস্যেদং দূতী রসরং পরাকাৎ।
ন তং গূহন্তি স্রবতো গভীরা
হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বে॥

অর্থ ;—আমি যাঁহার দূতী হইয়া অতি-দূর হইতে এখানে আসিয়াছি, তাঁহাকে যথার্থরূপে আমি জানি না, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত মহিমা জানিতে বা বর্ণনা করিতে আমি সমর্থ নহি; পরং এইমাত্র বলিতে পারি যে, তিনি বধ্যগণকে বধ করিতে অতি নিপুণ; আরও জানি যে, এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত স্রোতস্বতী এক হইয়াও তাঁহাকে বলে অভিভূত করিতে পারে না;—হে পণি-সৈন্যগণ! তোমরা যে তাঁহা-কর্ত্তৃক হত হইয়া চিরনিদ্রা লাভ করিতেছ, ইহাও আমি প্রত্যক্ষই দেখিতেছি॥

চতুরা দূতী, স্বয়ং কিছুমাত্র উত্তপ্তা না হইয়া বরং জলধরপটলের ন্যায় শীতল বায়ুর সহযোগেই সহসা অসীম বৈরি-বলে উল্লিখিত রূপ বজ্রক্ষেপ করিলে এককালে চতুর্দ্দিক হইতে দাববহ্নির ধূম উদ্‌গীরিত হইতে লাগিল। যথা ;—

ইমা গাবঃ সরমে যা ঐচ্ছঃ
পরি দিবো অন্তান্‌ সুভগে পতন্তী।
কস্ত এনা অব সৃজাদযুধ্ব্যু-
তাস্মাকম্‌ আযুধা সন্তি তিগ্মা॥

অর্থ ;—সুন্দর ভাগ্যবতি! সরমে! যে সমস্ত গোধনকে পাইতে ইচ্ছা করিতেছ, (নভোমণ্ডলের দিকে অঙ্গুলি দেখা-

---

* ইহাও কাব্যে প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিবার মানস থাকিল।

ইয়া) দেখ,—দ্যুলোকের অন্ত ভাগ হইতে (অর্থাৎ, যে স্থান হইতে বৃষ্টি হয়, সেই জল স্থান হইতে) চতুর্দ্দিকে অবিচ্ছিন্ন জলধারার ন্যায় এই সকল পতিত হইতেছে। কিন্তু বিনা যুদ্ধে, কাহার সাধ্য ইহাদিগকে গ্রহণ করে? (স্ব স্ব হস্তস্থিত শস্ত্র সমস্ত দেখাইয়া) আরও দেখ, আমাদের আয়ুধ সমস্ত কেমন তীক্ষ্ণ!

এতাবতা, আমাদিগকে যুদ্ধে জয় করে, এরূপ কেহই নাই সুতরাং গোধন সমস্ত গোপনে রক্ষিত থাকিলে ত দূরের কথা,—সম্মুখে থাকিলেও ইন্দ্র লইতে পারেন না, অথচ তুমি মনে করিতেছ, অপহৃত গোধন সমস্তের পুনঃপ্রাপ্তি বৃষ্টি-ধারার ন্যায় সুলভ; ইহা তোমার দুরাশা মাত্র।

সরমাকে 'সুন্দর ভাগ্যবতী' বলিয়া সম্বোধন করা ব্যঙ্গোক্তি মাত্র, অর্থাৎ তুমি নিতান্ত হীন-ভাগ্য যে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক হীনবল যে ইন্দ্র, তাহার দৌত্যে আসিয়াছ। 'বৃষ্টির ন্যায় পড়িতেছে, গ্রহণ কর' ইহাও অতি ব্যঙ্গোক্তি। তোমার গর্ব্ব-গর্ব্বিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে আমরা কিছু মাত্র ভীত হইবার নহি (১), অপহৃত গোধন সমস্ত বিনা যুদ্ধে প্রাপ্তব্য নহে (২), আমাদিগকে যুদ্ধে জয় করাও তোমার প্রভুর সাধ্য নহে (৩)। এই তিনটিই এ মন্ত্রের বক্তব্য। এইরূপে সেই দাব-দগ্ধ অরাতি-অটবী হইতে দিগ্দিগন্ত প্রসারী, জ্বালা-জ্বলন্ত ধূম উদ্গীরিত হইতে থাকিলে, প্রচুর বারিধারা-সিঞ্চন দ্বারা তখন উহার নির্ব্বাণে যত্ন কে করিবে? প্রত্যুত প্রভঞ্জন-বলা সেই অবলা-কুল-মুখোজ্জ্বলা সরমা, তাহাদের মদ-মত্তীকৃত স্কন্ধ সমস্তের ভঞ্জনার্থই যেন প্রলয়-প্রভঞ্জন প্রসব করিতে সমুদ্যতা হইলেন, বলিলেন,—

অসেন্যা বঃ পণয়ো বচাংস্য
নিষব্যাস্তন্বঃ সন্তু পাপীঃ।
অধৃষ্টো ব এতবা অস্তু পন্থা
বৃহস্পতির্ব উভয়া ন মৃড়াৎ॥

অর্থ;—পণি-সেনাগণ! তোমাদের এই বাক্যগুলি সৈনিকগণের মুখের উপযুক্ত নহে এবং তোমাদের এই পাপ-শরীর গুলিও আমার প্রভুর বাণ সহ্য করিবার উপযুক্ত নহে; এই পথ, তোমাদের গমন-ভার বহন করিতে অসমর্থ; আমাদের প্রধান সেনাপতি, সুপ্রসিদ্ধ বৃহস্পতি, (ইহাও প্রবন্ধান্তরে বর্ণিত হইবে।) তোমাদের এবং তোমাদের রাজার—উভয়েরই সুখের আশা সমূলে ছেদন করিবেন॥

১ম। যেহেতু, দূতের সহিত বার বার এতাদৃশ ব্যঙ্গোক্তি বীরপুরুষগণের অকর্ত্তব্য,—এ বীরধর্ম্ম তোমরা অবগত নহ, সুতরাং তোমরা বীরও নহ। ২য়, যেহেতু তোমরা গোধন অপহরণকারী তস্করদল—অতএব পাপী, এবং যে হেতু আমার প্রভু সম্মুখযোধ বীরবৃন্দের সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তদুপযুক্ত অব্যর্থ অস্ত্র শস্ত্রই তাঁহার আছে; তোমাদের ন্যায় তস্কর-দলের প্রতি তাদৃশ অস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করা 'মশা মারতে কামান পাতার ন্যায়' অযোগ্য; তোমরা তস্কর, তস্করের সহিত যুদ্ধ নহে, প্রত্যুত রাজ শাসন আবশ্যক। ৩য়, তোমরা চিরদিন নানাবিধ পাপ করিয়া আসিতেছ, তোমাদের পাপ-ভারাক্রান্ত দেহ সমস্ত বহন

করিতে ভগবতী বসুন্ধরা ক্রমে অসমর্থা হই-য়াছেন বলিয়াই অসমসাহসে চৌর্য্য করি-য়াছ। ৪র্থ, আমার মুখে সন্ধান পাইয়া যাবৎ সেনাপতি বৃহস্পতি না আসিতে-ছেন, তাবৎ কালই তোমাদের ও তোমাদের প্রভুর জীবন-সুখের সীমা। এ মন্ত্রে এই চারিটী অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দুঃখ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চানন বাবু কহেন যে, আমি স্ত্রীর সহিত কথা কহিয়া সুখ পাইনা, কারণ স্ত্রী ইতিহাসও জানে না, অলঙ্কারও জানে না, সংসারের অপর কোন সংবাদও জানে না। সে জানিবার মধ্যে কেবল শাশুড়ীকে জানে, ননদকে জানে এবং দেবরকে জানে। সুতরাং কথা কহিতে হইলে কেবল তাঁহা-দেরই কথা আনিয়া ফেলে। একজনকার কথা বার বার বলিতে গেলে কাজেই তাহার ভাল মন্দ সকলই বলিতে হয়। সুতরাং স্ত্রীর সহিত অধিক আলাপ করিলে পরি-ণামে গৃহ বিচ্ছেদ সম্ভাবনা হয়। পঞ্চা-নন বাবু ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক, সুতরাং তিনি হয় তো ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। কিন্তু বিলাত হইতে যে রামচন্দ্র বাবু আসিয়া-ছেন, তাঁহার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া আগত জিজ্ঞাসিলে স্ত্রী কথা কহি-লেন না। কারণ ঠাকুরুণদিদীরা তাঁহাকে শিখাইয়া দিয়াছেন যে, স্বামী অনেক দিনের পর আসিয়াছেন, প্রথমে অভিমান করিয়া কথা কহিওনা, পরে কহিও যে, 'তুমি অনেক দিনের পর ঘরে আসিয়াছ, আমার জন্য কি অলঙ্কার আনিয়াছ বল।' রামচন্দ্র বাবু ব্যাপার দেখিয়া আকাশ হইতে পতিত হইলেন। তিনি আর ধৈর্য্য সম্ব-রণ করিতে পারিলেন না—হয় তো ঐ খানে ঐখানেই অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "I never came across such an unmannerly crea-ture." আচ্ছা পাঠক! ধর্ম্মতঃ বলুন দেখি রামচন্দ্র বাবু অপরাধী কিনা। তাঁহার স্ত্রী নিরপরাধী কিনা, সে বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে। বর্ত্তমানে আমাদের এই পর্য্যন্ত বক্তব্য যে, রামচন্দ্র বাবুর অপরাধ নাই, বরং তাঁহার দুঃখ দেখিবা আমাদের মমতা হয়। পাঠক আপনার হয় তো হাসি আসিতেছে, কিন্তু রামচন্দ্র বাবুর চক্ষে জল আসিতেছে, ইহা আপনার মনে করা উচিত। আমরা দেখিয়াছি যে, কত উচ্চ অন্তঃকরণের লোক, কত সুশিক্ষিত লোক এই সকল কারণে বেশ্যানুরাগী হইয়া গিয়া-ছেন। কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কুলস্ত্রী অপেক্ষা বেশ্যাদের জ্ঞানবত্তা অধিক। একথা বলিতে আমাদের হৃৎকম্প হইতেছে। হয় তো আমরা কি সর্ব্বনাশের কথাই বলিয়া ফেলিলাম। হয় তো আমরা বেশ্যা

সক্তদিগকে অনুযোগ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, আমরা বেশ্যা-দিগকে ঘৃণা করিয়া থাকি,—আমরা বেশ্যা-সক্তদিগকেও ঘৃণা করিয়া থাকি, আমরা কুলস্ত্রীদিগকে মনে মনে স্নেহ ও সম্মান করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা করি কি? সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সমা-লোচন স্থলে তাহা কিরূপে গোপন করিতে পারি। পিতা মাতারা এ সকল বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এই জন্য বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এক জন বড়লোক বিবী নিযুক্ত করিয়া পুত্র-বধূকে নৃত্য শিক্ষা করাইতে ছিলেন। তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি কহি-লেন যে, 'আমার পুত্র বিলাত গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বধূকে ইংরাজী রীতি শিখাইয়া রাখিতেছি।' আমি সরল মনে প্রীতিপূর্ব্বক কহিলাম যে, 'উত্তম করিতে-ছেন।'

সকল কথা নিজে বলিলে পাঠকের মনঃপুত না হইতে পারে, অতএব মধ্যে মধ্যে দুই একটা নজীর দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। ঘোররবা নামে এক রাক্ষসী ছিল, তর্ক-শাস্ত্রে তাহার অসাধারণ অধিকার ছিল। সে একদিন রাজা বিক্রমাদিত্যকে সভা-মধ্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ তোমাকে একটি সমস্যার অর্থ করিয়া দিতে হইতেছে, তাহা এই,—'জীবিতকালে আমার সহিত যে ব্যক্তি বাক্যালাপ করে নাই, সে, আমি আজি মরিবার পর, কাঁদে কেন?'" বিক্রমাদিত্য কহিলেন, 'আমি তোমার কথার অর্থ বুঝি-লাম না।' রাক্ষসী বিকট হাস্যে কহিল, 'মহারাজ, তোমাকে এক সপ্তাহ মেয়াদ দিতেছি, যদি ইতিমধ্যে সমস্যা পূরণ না করিতে পার, তবে আমি তোমার সমস্ত সভাপণ্ডিতের ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তপান করিব। তুমি তখন আমার প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে পারিবেনা।' রাক্ষসী এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইল সভাস্থলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এক দিন যায়, দুই দিন যায়, তিন দিন যায়, ক্রমে সমস্ত সপ্তাহই যায়, সমস্যার অর্থ আর হয় না। কারণ পণ্ডিতেরা সকলেই অর্থ করিলেন যে, যাহার সহিত বাক্যালাপ নাই, সেতো শত্রু, সে আবার আমার মরণে শোক করিবে কেন? ফলতঃ কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও পরাজয় স্বীকার করিলেন। সভামধ্যে একজন বাঙ্গালী ছিল, সে কহিল যে, 'আমি সমস্যার অর্থ করিতে পারি। কেননা আমাদের বাঙ্গালা দেশে এইরূপ ব্যবহার আছে যে, সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকেরা জীবিতকালে বাক্যালাপ করেনা, অথচ মরণের পর বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিয়া থাকে।' বিক্রমাদিত্য আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন যে, 'যে ব্যক্তির সহিত কথা নাই, আলাপ নাই, হাস্য পরিহাস নাই, তাহার সহিত স্নেহ-বন্ধন কিরূপে হয়?' বাঙ্গালী কহিল যে 'কিরূপে হয় তাহা আমি জানিনা, অথচ হয় এরূপ জানি।' অনন্তর রাক্ষসী আসিলে তাহাকে ঐ কথাই বলিয়া দেওয়া হইল। রাক্ষসী সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

শাস্ত্রকারেরা কহেন যে, যেমন সত্যকথা না বলা দোষ, সেইরূপ সত্যকথা চাপিয়া রাখাও দোষ। অতএব সকল কথা খুলিয়া বলাই ভাল। আমাদের একজন সহা-ধ্যায়ী সর্ব্বদাই অনুযোগ করিতেন যে, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অন্যান্য

স্থান অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশে কিছু বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য প্রদেশে সেলাম করিলেই যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ ও শিষ্টাচার রক্ষা হয়। বাঙ্গালা দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত না করিলে চলেনা। বাস্তবিক পাঠক বলুন দেখি যে, ডন টানায় যে কষ্ট, সষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট কিনা। অথচ জামাতা সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত না করিলে অভিমানে শ্বশুর শাশুড়ীর অশ্রুবর্ষণ হয়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে গিয়া কাহার কাহার মুখ থুবড়িয়া গিয়াছে। যদি দেহ একটু হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং শরীরে বল কম হয় তাহা হইলে সষ্টাঙ্গ প্রণিপাতকারীর উত্থান কালে যথেষ্ট পরিশ্রম বোধ হইয়া থাকে, বোধ হয় একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আর যৎকালে কেবল পাঁচী-ধুতীর ব্যবহার ছিল, জামা ও জুতার মোটেই ব্যবহার ছিলনা এবং পেণ্টুলন চাপকানের নাম পর্য্যন্ত জানা ছিল না সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত তখনকার উপযোগী ছিল। এখন সকলই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কিরূপে চলিত থাকিতে পারে? ফলতঃ ভাগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানীরা নমস্কারের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ভাগ্যে ইংরাজ ও মুসলমানেরা সেলামের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, নতুবা বাঙ্গালা দেশে বিনয় প্রকাশ উনবিংশ শতাব্দীতে অসাধ্য হইয়া উঠিত। তথাপি গুরুজনকে প্রণাম করা এক প্রকার রহিত হইয়া গিয়াছে, কেননা গুরুজনকে নমস্কার বা সেলাম করা চলেনা অথচ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত অনুপযোগী হইয়াছে, সুতরাং গুরুজনকে কোন্ রীতিতে প্রণাম করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের দেশের একজন বড়লোক সর্ব্বদাই এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, আমার ইচ্ছা যে আমি আমার পরিবারের মধ্যে একটী সহজ প্রকার প্রণামের প্রথা প্রবর্ত্তিত করি। দেখ ইংরাজের ছোট ছোট ছেলেরা পিতামাতাকে কেমন সুন্দর অভ্যর্থনা করে, দেখ হিন্দুস্থানীর ছেলেরা পিতামাতাকে দিনের মধ্যে কেমন সুন্দর দুই তিনবার সেলাম করিয়া থাকে, আমাদের ছেলেরা কিছুই করে না। কিরূপে করিবে বলুন, বৎসরে একবার নন্দ মহোৎসব হয়, তাহাতেই লোকে অস্থির, কেননা নন্দমহোৎসবে গড়াগড়ী না দিলে চলেনা। কিন্তু সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের প্রথা চলিত থাকিলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় গড়াগড়ী আবশ্যক হয়।

অথবা শুধু সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নহে। কখন কখন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে হয়, কিন্তু মানুষ দেখা যায় না। যাঁহাকে প্রণাম করিতেছি তাঁহার ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। একজন প্রণাম করিবে আর একজন পরিচয় দিতে থাকিবে। শাশুড়ী দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছেন, জামাতা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি কহিয়া দিতেছেন "দিদী ঠাকুরুণ, তোমার জামাই তোমাকে প্রণাম করিতেছেন।" বিজয়া দশমীর দিন অনেকের নিকট প্রণিপাত করিতে হয়, তন্মধ্যে যার জানা লোককে স্থলবিশেষে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সঙ্কেতে প্রণাম করা হইয়া থাকে। আমাদের স্ত্রীলোকেরা অমুক লোক প্রণাম করিতে আসিতেছে শুনিলেও দৌড়িয়া গৃহের ভিতর পলাইয়া

যান্, অথচ তাঁহাদিগকে প্রণাম না করিলে নানা কথা উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহা হউক্ এরূপ প্রণামে কখন কখন সুবিধা হইয়া থাকে। কারণ যাঁহারা পরিশ্রম, কিম্বা ধুলির ভয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা বাস্তবিক প্রণিপাত না করিয়া যদি কেবল মুখে এইরূপ বলেন যে, 'দাদাঠাকুর, আপনাকে প্রণাম করিতেছি' তাহা হইলেই বা কে ধরিতে পারে?

ফলতঃ আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ব্যবস্থার এক্ষণে নানা কারণে বাস্তবিক অনুসার বিহীন ও সময়ের অনুপযোগী হইয়াছে। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, এখনকার লোকে 'চীলে' প্রণাম করিয়া থাকে। তাঁহার মতে শঙ্কর চীল যতক্ষণ উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায় ততক্ষণ লোকে তাহাকে প্রণাম করিয়া থাকে, কিন্তু যে মাত্র স্বার্থ প্রকাশ করে, অর্থাৎ ছোঁ মারিয়া হাত হইতে মাছ লইতে আইসে তৎক্ষণাৎ তাহার উপর মার মার শব্দে ইষ্টক বর্ষণ হয়। এখন ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব সম্মান নাই, অথচ তাঁহাকে প্রণাম করা হইয়া থাকে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, যে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করা হইয়াছে, তাহাকেই আবার উৎপীড়ন করা হইতেছে। এক চণ্ডালকে একজন ধনীর যেমন উপাসনা করিতে হয়, একজন ব্রাহ্মণকে তাহার অপেক্ষা কম্ করিলে হয় না। দত্তকের পেয়াদা ব্রাহ্মণকেও গ্রেপ্তার করে এবং মুসলমানকেও গ্রেপ্তার করে। ক্ষুদ্র ঋণদায়ে উভয়কেই সমান ভাবে গ্রেপ্তার করাইয়া থাকে। অথচ সেই শূদ্র আবার সেই ব্রাহ্মণকেই প্রণাম করিয়া থাকে। আবার ব্রাহ্মণ মহাশয়ও হয়তো দত্তকে গ্রেপ্তার হইতেও সম্মত, তথাপি প্রণাম পরিত্যাগে সম্মত নহে। জমিদারের শূদ্র নায়েব অধীন ব্রাহ্মণ গোমস্তাকে এইরূপ পাঠ লিখিতেছেন যথা—

"পূজ্যবর শ্রীযুক্ত——বন্দ্যোপাধ্যায় পূজ্যবরেষু—প্রণাম পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ—পরে তোমাকে বারম্বার সতর্ক করাতেও তোমার হুঁস হইল না। পদাতিককে পাঠান যাইতেছে। ইহার সহিত পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। অন্যথা হইলে সমূহ বিপদ জানিবে। এক তাগিদ সহস্র তাগিদের ন্যায় জ্ঞান করিবে।" দেখুন এদিকে পূজ্যবর পাঠ হইতেছে, নিম্নে সেবকস্য বলিয়া দস্তখতও হইতেছে, অথচ পত্রের মর্ম্ম কেমন কর্কশ হইয়াছে। হয়তো পদাতিককে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে সহজে না আইসে ধরিয়া লইয়া আসিবে। গোমস্তা ব্রাহ্মণ পত্রের যে উত্তর দিতেছে তাহাও বোধ হয় এস্থলে অপ্রদৃশ্য নহে, যথা—

"পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয় পরম কল্যাণবরেষু পরে হুজুরের রাজলক্ষ্মী শ্রীশ্রী স্থানে সতত প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে এ অধীনের মঙ্গল পরং— হুজুরের পরওয়ানা প্রাপ্তে চালান সহ পদাতিককে পাঠান হইল। অধীনের গৃহ শূন্য হইয়াছে, দুই এক দিন বিলম্বে হুজুরে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত নিবেদন করিতেছি। হুজুর মালীক নিবেদন ইতি।" দেখুন এদিকে কল্যাণীয় পাঠ হইতেছে, এদিকে অধীনতার এক শেষ প্রদর্শন করা হইতেছে। বাড়ীতে স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে তথাপি প্রকাশ করিয়া শূদ্র প্রভুকে বলিতে সাহস হইতেছে না।

ফলতঃ বর্ত্তমান সমাজে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ বিড়ম্বনা হইয়াছে। আমরা এই জন্য বলি যে অত ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় আবশ্যক হইতেছে না। এস ব্রাহ্মণ এস, এস শূদ্র এস। এখন পরস্পরের মনের কথা বোঝা গিয়াছে। এস সমান সমান হই, এস প্রণিপাত ও আশীর্ব্বাদ পরিত্যাগ করিয়া সেকৃহ্যাণ্ড ও গুড্মর্ণিং করি। এস সমান সমান চেয়ারে বসিয়া যাই।

ফলতঃ আজিকালি সমাজের যেদিকে চাহি সমস্তই যেন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ সমাজ ও স্বভাবের সামঞ্জস্য হয় না। সুতরাং কিছুতেই সুখ বোধ হয় না। বিশ বৎসর পূর্ব্বে সমাজ ও স্বভাবের সমঞ্জস্য ছিল। সুতরাং তখন সামাজিকের সুখবোধ ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত দুর্গোৎসবের আনন্দ বর্ণনা করিতেছেন, এবং যাঁহারা দুর্গোৎসবের আনন্দ গ্রহণে অধিকারী তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যথা:—

'কালাপেড়ে ধুতি পরা দাঁতে মিশী গাল ভরা
ঠোঁট রাঙ্গা তাম্বুলের জলে।
গোরতোলা জুতা পায়, রঙ্গীন অঙ্গাই গায়,
পাড়াগেঁয়ে বাবুভেয়ে চলে॥"

কই সে পাড়াগেঁয়ে বাবুভেয়ে দল? আহা ইহারা যখন বাড়ীতে উপস্থিত হইত, তখন হুল স্থুল পড়িয়া যাইত। একদিকে প্রণাম ও আলিঙ্গনের ধুম, অন্যদিকে সহাস্য রসাভাস, গানবাজনা, আমোদ ও প্রমোদে এক একটী বৈটকখানা পরিপূর্ণ হইত। ইহারাই নবমীর বলিদানের সময় দুর্গার সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া লোমাঞ্চোদ্রেক করিত। সম্পর্কীয় বালকের কেহ জুতা, কেহ কাপড়, কেহ অলঙ্কারের জন্য আবদার প্রকাশ করিলে ইহারা তাহাতে বড় আনন্দ অনুভব করিত। কিন্তু এখন আর এ সকলে আনন্দ বোধ হয় না। এখন কোন বালক দৌড়িয়া সম্মুখে আসিয়া আবদার করিতে দেখিলে, তাহাকে অশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। গায়ে ধূলি থাকিলে, তাহাকে স্পর্শ করিতে কষ্ট বোধ হয়। ঠাকুর দাদা নাতিনীকে তামাসা করিলে তাহাকে অসভ্য বলিয়া মনে হয়, কখন কখন বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক নিষেধ করিতেও ইচ্ছা হয়। এখন আর দুর্গোৎসবের বাজনা শুনিলে নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয় না। এখন গ্রাম্য সমাজকে বিজন বলিয়া মনে হয়।

> "Yet not the landscape to mine eye
> Bears those bright hues that once it bore,
> Though evening with her richest dye
> Flames o'er the hills on Etricks shore
> The quiet lake, the balmy air,
> The hill, the stream, the tower, the tree
> Are they still such as once they were
> Or is the dreary change in me."

হায়! এই ভয়ানক পরিবর্ত্ত কাহার? একি আমার, না আমার সেই সমাজের? পাঠক! আমরা দুঃখ করিতেছি না। আমাদের পরিবর্ত্ত ভালই হইয়াছে। তবে এই জন্য দুঃখ করিতেছি যে, আমাদের কিছুই পছন্দ হইতেছে না, সে স্ত্রীকেও পছন্দ হইতেছে না, সে ভাইকেও পছন্দ হইতেছে না। সকলকেই নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব আমরা অতি দুঃখী হইয়াছি। ইহা একটি বিষম অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ যাহাদের সহিত সর্ব্বদা এক গৃহে বাস করিতে হইবে, তাহাদের প্রতি অষ্ট প্রহর বিরক্ত হইলে চলিবে কেন। অথচ আমরা শিক্ষাবশে বিরক্ত হইতেছি। আমরা যে বিরক্ত হইতেছি

তাহা আমাদের শিক্ষার দোষ নহে, তাহা আমাদের শিক্ষার ফল। আমরা যাহাদের প্রতি বিরক্ত হইতেছি তাহাদেরও দোষ নহে, কারণ তাহারা আমাদিগকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বিরক্ত করে না। তাহারা দৈববশত বিরক্তিকর হইয়াছে। তাহারা যদি কহে যে, তুমি একাকী শিক্ষিত হইলে কেন, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক সঙ্গে শিক্ষিত না হইলে কেন? তবে অবশ্য সে কথার উত্তর নাই।

আমি।

(পঞ্চম পত্র।)

এক লাঠিতে সাত সাপ।

বন্ধু বান্ধবকে পত্র লেখা কি কাহারও পত্রের উত্তর লেখা আমার কোষ্ঠিতে লেখে না। তবে যিনি অপরাধ গ্রহণ করেন না, নিতান্ত পায়ে রাখেন, তাঁহার নিকট হইতেই মধ্যে মধ্যে এক আধ খানা পত্র পাই। আজ এক খানা পত্র পাইলাম। পত্র খানার মর্ম্ম তোমাদিগকে শুনাইয়া দি—

——"দেশের এমন হেঙ্গাম—এমন ডামা ডোলের সময় 'চিৎকরা চঞ্চু' মহাশয় যদি নিদ্রিত রহিলেন, তবে তাঁর 'বক্তিমে' আর কোন্ কালে কি কাজে লাগিবে?"

ভদ্র লোকের পত্রের উত্তর দান একটা অপকর্ম্ম বা অধর্ম্ম হইলেও, এ পত্র খানার উত্তর দিতে হইল। কেন না পত্র-লেখক অকালে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া যে বে-আদবী করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে একটু শিক্ষা দিতে হইবে। অকালে নিদ্রা ভঙ্গের কথা শুনিয়া তোমরা যেন মনে করিও না যে, আমি কুম্ভকর্ণের ন্যায় ছ মাস ধরিয়া নিদ্রা গিয়া থাকি। আমি শেষ নিশায় নিদ্রিত হইয়া পর দিন পূর্ব্বাহ্ণ আটটা পর্যান্ত ঘুমাই। এই আটটার মধ্যে যিনি আমার নিদ্রা ভঙ্গ করেন, আমি তাঁহার উপর ঝাড়ে চটিয়া যাই। গত নিশায় নিদাঘ পীড়ায় উত্যক্ত হইয়া বহির্ভাগে নিদ্রিত হই,—সুতরাং পত্র লেখকের পত্র লইয়া ডাক্ হরকরা সহজেই আমাকে গ্রেপ্তার করিল। সে তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিল, তাহার দোষ কি? যত দোষ পত্র লেখকের। এই জন্যই পত্র লেখক আমার কোপ-দৃষ্টির পথিক হইয়াছেন। হরকরার কঠোর চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম, মশারির তিনটী কোন খুলিয়া আমার গায় জড়াইয়া গিয়াছে,—জালে জড়ান পুরুষ সিংহ 'আমি' শয্যায় শয়ান রহিয়াছি।

তোমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঠক, কারণ জিজ্ঞাসা ও যুক্তি জিজ্ঞাসা তোমাদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। যেখানে বুদ্ধি খাটিবেনা, সেখানে বুদ্ধি খাটাইবে,—যেখানে জ্ঞান চলিবে না, সেখানে জ্ঞান চালাইবে,—যেখানে তর্কের স্থান হইবে না, সেখানে তর্ক ছড়াইবে। নিজের বুদ্ধিকে

কষ্টিপাতর ও নিজের জ্ঞানকে তুলা-দণ্ড মনে করা তোমাদের আর একটী শিক্ষাজ। শোনা (১) মাত্রেই ঐ পাতরে কসিয়া এবং ঐ দণ্ডে ওজন করিয়া লইয়া থাক। যাহা আপনার জ্ঞান বুদ্ধিতে ধরিবে না, তাহা অগ্রাহ্য কর। তোমাদের জ্ঞান,—তোমাদের বুদ্ধি,—তোমাদের যুক্তির অতীত বিষয়ের অস্তিত্ব তোমাদের মনে স্থান পায় না। ফলতঃ তোমরা বড় "কে-ও" নও। তোমাদের সহিত কথায় কথায় কারণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কথা কহিতে হইবে। আমি শেষ নিশায় নিদ্রিত হইয়া বেলা আটটা পর্য্যন্ত ঘুমাই, তোমরা অবশ্যই তাহার কারণ জানিতে চাহ। আফিঙ্গের নেশা যতক্ষণ না ছুটে, ততক্ষণ নিদ্রা হয় না। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে একটু অহিফেণ সেবন করিয়া থাকি,—রাত্রি তিনটার এ দিকে সে ঝোঁক্ কাটেনা। কাজেই শেষ রাত্রি ভিন্ন নিদ্রা হয় না। আবার এই স্থলে তোমাদের সম্ভাব্য ভ্রম সংশোধনের প্রয়োজন হইল। তোমরা নিশ্চয়ই মনে করিবে, কমলাকান্ত কাঁচা আফিং খাইয়া দপ্তর সাজাইয়াছেন,—আমিও সেই কাঁচা আফিং খাইয়া পত্রের জবাব লিখিতেছি। ক্রমোৎকর্ষই জগতের স্বভাব। সে কেলে কমলাকান্ত কাঁচা আফিং খাইতেন,—আমি তাহাপেক্ষা উন্নতিশীল,—ক্রমোৎকর্ষ-বিধায়িনী প্রকৃতির স্রোতে ভাসমান—আমি পাকা আফিং খাইয়া থাকি। পাকা আফিং খাই শুনিয়া তোমরা নিন্দা করিবে,—কর। কিন্তু পক্ব অহিফেণ-সেবন বিষয়ে আমার প্রচুর অকাট্য যুক্তি আছে, তোমরা অপ্রাকৃত তত্ত্ব বিচার কালেও সেই রূপ অকাট্য যুক্তি সকল ব্যবহার করিয়া থাক। দুই একটা শোন। অপক্ক আর পক্ক। সকলেই বলিবে, অপক্কাপেক্ষা পক্ক ভাল। পাকা আম ফেলিয়া কে কাঁচা আম খায়? পাকা আফিং খাইবার এই অকাট্য প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি এই;—একদা গৃহিণী বলিলেন,—"ঘরে এত দুধ হয় যে, তোমাতে আমাতে খাইয়া উঠিতে পারি না, প্রাণ ধরিয়া ২।১ সের বিলাইয়া দিতেও পারি না। অতএব তুমি কাঁচা আফিং ছাড়িয়া পাকা আফিং ধর,—আমিও দুধ মারিয়া ক্ষীর করিতে আরম্ভ করি। ক্ষীরই পক্ক অহিফেণ সেবীর পরম পথ্য।" গৃহিণীর এই যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব মনোনীত হইল। কেননা এক দিকে দুধ গুলার গতি,—অন্য দিকে কমলাকান্তের উপর টেক্কা দেওয়া হইল।

পত্র প্রেরক নিজ পত্রে আমাকে "চিৎ-করা চঞ্চু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমার সোপাধিক প্রকৃত নাম-"রাসভ রাজ চীৎকার চুঞ্চু"। এই নাম ও উপাধি কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এবং কি রূপে ঐ উপাদেয় নাম অপভ্রষ্ট হইয়া "চিৎকরা চঞ্চু" রূপে পরিণত হইয়াছে, ১২৮৯ সালের, পৌষ মাসের, ৯ম সংখ্যক প্রবাহে আমার "শুষ্ক-বীজ" নামক বক্তৃতাংশের শিরোভাগে তাহা সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। আমি শুনিয়াছিলাম, ঐ শুষ্কবীজে কোন কোন পাঠকের দন্ত ভগ্ন করিয়াছে। তরুণ পাঠকবৃন্দের অকালে দন্ত ভগ্ন হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম; কিন্তু "শুষ্কবীজ" খাইতে কাহার রুচি হইবে না, চীৎকার চঞ্চু তাহা জানিতেন এই জন্যই তাহার "শুষ্কবীজ" নাম রাখিয়াছেন। যাহা হউক, পত্র প্রেরক অবশ্যই জানেন, আমি বাঙ্গালা বক্তৃতার ব্যবসায়

(১) শুনি সকল।

নানা কারণে বহুদিন হইতে ত্যাগ করিয়াছি। বিশেষতঃ বক্তৃতার পুরাতন কীটাকুলিত কাগজ গুলি প্রবাহে ভাসাইয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবাহও ভাতের কাটি বহিতে "পিছ পা" হইলেন দেখিয়া গৃহিণীর পাদস্পর্শ পূর্ব্বক দিব্য করিয়াছি যে, এজন্মে আর বাঙ্গালা বক্তৃতার "ব" মুখে আনিব না, কেবল পক্ক অহিফেণ, ক্ষীর ও নিদ্রা এই ত্রিবর্গই জীবনের সম্বল করিয়া কাল কাটাইব। গৃহিণী বলিলেন, উত্তম, কেননা তাঁহার বিশ্বাস, কেবল লেখা পড়া করিয়াই আমি অধঃপাতে যাইতেছিলাম। কিন্তু সংঘাতিক রোগ যদি শফৎ করিলেই সারে, তবে ভাবনা কি ?

রাত্রির অধিকাংশ যে অনিদ্রায় কাটে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যতক্ষণ অনিদ্রা, ততক্ষণ কোন বালাই নাই; আমার কুকথায় পঞ্চমুখী গৃহিণী আগম নিগম ব্যাখ্যা করেন, আমি সমান "হুঁ" দিয়া যাই। পরের কথা—কি দেশের কথা মনে আসিতে চাহিলে জোর করিয়া তাড়াই;—কেবল নিজানন্দময় চৈতন্যসুখ অনুভব করি। নিদ্রাকালে রোগে ধরে। আফিংখোরের ভাগ্যে বিধাতা সুষুপ্তি লেখেন নাই;—কেবল স্বপ্নময়ী তন্দ্রায় মন আচ্ছন্ন হয় মাত্র। কল্য এই তন্দ্রাবেশ মাত্রেই বোধ হইল, প্রলয়কাল উপস্থিত! রাশি রাশি কৃষ্ণমেঘ গগন ব্যাপিল,—আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা প্রকাশ পাইতে লাগিল,—মৃদু গম্ভীর ঘন ঘন জীমূতনাদের মধ্য হইতে একবার ব্রহ্মাণ্ডস্তম্ভনকারী বজ্রধনি হইল,—বিশ্বব্যাপক আলোক দ্বারা নয়ন ঝলসিয়া গেল; পরক্ষণে মনুষ্য কলরব শুনিতে পাইলাম। সেই কলরব একটী স্পষ্ট বাক্যে পরিণত হইল। বাক্য এই,—"যাহারা ব্রাহ্মণ ভূমি ভারতের হিন্দুবংশে জন্মিয়াছে, অথচ আর্য্যঋষি বংশ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের অবমাননা করে,—তাহাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল।" আমি সেই তন্দ্রালু অবস্থাতেই চমকিয়া উঠিলাম,—ভাবিলাম, ঐ বজ্র ঘুরিয়া আসিয়া আমার মাথাতেও পড়িবে; কেননা যে বাটীতে বস্তুর ঝি, গজোধ্যাপায় ঠাকুরাণী হইয়াছিলেন, আমি সেই বাটীতে ফলাহার প্রহার করিয়াছিলাম। তবে ভরসা এই, ভগবান্ ভক্তের মন দেখেন, বাহ্য ক্রিয়া দেখেন না। আমি যে কেবল মিষ্টান্ন ও আম্রের লোভে ফলাহার করিয়াছিলাম, তিনিত তাহা দেখিতেছেন। স্বপ্নের গতি বিচিত্র! এমন ফলাহারের কথা ছাড়িয়া চকিতবৎ মহারাষ্ট্রে গমন করিলাম। ভাবিলাম, বাইজী বিধবা হইয়া বিলোম সঙ্করের স্পর্শরূপ পাপ হইতে ভারতকে রক্ষা করিয়াছেন।

"মরিল মেয়ে উড়িল ছাই,
তবে মেয়ের গুণ গাই।"

উত্তমই হইয়াছে। আবার ভাবিলাম,—বাই ঠাকুরাণী বিলাত গিয়াছেন, হয়ত আবার সাহেব বিবাহ করিয়া বসিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইতিমধ্যে চটিজুতা পায়, মোটাচাদর গায়, চসমা নাকে, শ্মশ্রুধারী একটী মনুষ্য আমার নিকট আসিয়া কহিলেন,—"গুলিখোর, নেসার ঝোঁকে আবোল তাবোল বকিতেছ,—জাননা কি যে, ভারতীয় আশ্রমধর্ম্ম ও জাতিবৈষম্য স্বাভাবিক নয়? তাই তাহার পক্ষপাতী হইয়া হিন্দুর ন্যায় বোকামি ও পাগলামি করিতে হইবে?" আমি কহিলাম, মহা-

ত্বন্, আমি গুলিখোর এবং হিন্দুরা বোকা ও পাগোল সত্য ; কিন্তু ভারতীয় জাতি বৈষম্য ও আশ্রমধর্ম্ম স্বাভাবিক না হইলেও যে স্বাভাবিকবৎ কার্য্যকারী, শ্রীপাদ তাহা বুঝেন না কেন ? এবং বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবের ঠেলাঠেলি ও তাহার শেষ দশাতেই বা শ্রীপাদের বুদ্ধিকণিকা প্রবেশ করে না কেন ? ভীষ্ম দ্রোণ সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া যে পাণ্ডব রণপয়োধির পার পান নাই, কর্ণাশ্বত্থমা কি সেই সাগর পার হইবেন ? প্রভু, গুলিখোরের কথা আপনি না বুঝুন, আপনার পুত্র পৌত্র বুঝিবেন যে, ভারতে ভারতীয় জাতিবৈষম্য ও আশ্রমধর্ম্ম বিরোধী মতের স্থান হইবেনা। শ্মশ্রু ও চসমাধারী পুরুষ "দূর বাতুল" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

চিরকাল পল্লীগ্রামে বাস করি ; কিন্তু স্বপ্নে দেখিতেছি যে, কলিকাতার সভাবাজারে রাজবাটীর নিকট এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা খরিদ করিয়া তাহার ত্রিতল গৃহে শয়ন করিয়া আছি। গৃহিণী গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "কত ঘুমাইবে ? উঠ,—একবার বাতায়নে মুখ দিয়া দেখ,— কলিকাতা সহর রসাতলে গেল।" যেন উঠিয়া দেখিতেছি,—শত শত লোহিত পতাকা রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রবল পবনে আন্দোলিত হইতেছে,— প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্বেত ও লোহিত অশ্বযোজিত ব্রাউহেম্, ফিটন্, চেরিয়ট্ প্রভৃতি শত শত শকট এক শ্রেণীতে ধীরে ধীরে চলিতেছে,—শকটরাজীর পশ্চাতে নানাবিধ মনোহর দেশী ও বিদেশী বাদ্যোদ্যম হইতেছে, চলিষ্ণু নাট্যগৃহে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে,—তৎপশ্চাৎ রত্নখচিত ক্ষৌমমণ্ডিত স্বর্ণাবৃত সুখাসনে উপবিষ্ট এক অদ্ভুত মূর্ত্তি পুরুষ গমন করিতেছেন। পুরুষটীর সকলই মানুষের মত, কেবল মস্তকে ও স্কন্ধদ্বয়ে শতাধিক সর্পফণা বিস্তৃত করিয়া বহ্নি শিখার ন্যায় চঞ্চল, বিভঙ্গ, লোল জিহ্বা পুনঃ পুনঃ বাহির করিতেছে। আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—একি শিবের বিয়ে ? গৃহিণী একটু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"বক্তৃতা করা ত্যাগ করিয়াছ বলিয়া কি খবরের কাগজ পড়াও ত্যাগ করিয়াছ ? ও যে সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে।" আমি কহিলাম,—তুমিই আমার খবরের কাগজ, আমিত তোমার মুখেই দেশের খবর পাই। বাস্তবিকও, স্মৃতির ব্যবস্থা দিয়া এবং দিন ক্ষণ দেখিয়া দিয়া আমার গৃহিণীই আমার পিতার নাম রাখিয়া ছিলেন। ভাল আমি যে শুনিয়াছি, সুরেন্দ্র বাবু ফটকে ? আর যদি সুখাসনোপবিষ্ট পুরুষ শিব নহেন, তবে উঁহার মাথায় অত সাপের চক্র কেন ? এবং এত জাক জমকই বা কেন ? গৃহিণী কহিলেন, "লালমোহন বিলাতে গিয়া দুই মাসের সাতদিন থাকিতে সুরেন্দ্রকে খালাস করিয়াছে, তাই দেশের লোকে এইরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। থিয়েটার বাড়ীতে গিয়া বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিবে। অনন্তদেবের বরে, উঁহার স্কন্ধে ও শিরে অহিফণা দেখিতেছ।" আমি কহিলাম, প্রিয়ে, কিরূপে এবং কিজন্য সুরেন্দ্র বাবু এতগুলা সাপের চক্র পাইলেন, আমি সেকথা পরে শুনিব। আজ কাল দুই টাকা দরে বোম্বাই আমের 'শ' বিক্রয় হইতেছে এবং এদের যখন এত আনন্দ, ও যখন আমসত্বের ধুতিচাদর বড়বাজারে আমদানী হইয়াছে তখন থিয়েটারে

গিয়া একটা গোছাল গোছের জলাহারও দিতে পারে। আমি সুব্রাহ্মণ, আমাকে উক্তরূপে ভোজন করাইয়া আমসত্তের পোসাক পরাইয়া ছাড়িয়া দিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব আমাকে ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে হইল। গৃহিণীকে এই কথা বলিয়া সেই লোক যাত্রার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম।

থিয়েটার বাড়িতে গিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে উচ্চাসনে বসাইয়া অনেকে সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল,—অনেকে দণ্ডায়মান রহিল। গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বাহিরে ব্যোম্ ছুটিতে লাগিল। অশ্বের হ্রেষা ও লোকের গোলযোগে সহর তোলপাড় হইতে লাগিল। এমন সময়ে বৃহৎ বৃহৎ বহুসংখ্যক কাষ্ঠের সিন্দুক সুরেন্দ্র বাবুর পুরোভাগে স্থাপিত হইতে লাগিল। আমি মনে করিলাম, ঐ সকল মঞ্জুষার মধ্যে নিশ্চয়ই দধি ও ক্ষীরের হাঁড়ি এবং বহুতর মিষ্টান্ন আছে। সুরেন্দ্র বাবু একবার দেখিয়া পরিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন। আম ও আমসত্তের কাপড় গুলা হয়ত, ঐ সকল সিন্দুকের মধ্যেই আছে, নয় পশ্চাৎ আসিতেছে। ইতিমধ্যে একজন এক তাড়া কাগজ ও কতকগুলি চাবি সুরেন্দ্র বাবুর হস্তে প্রদান করিল। সুরেন্দ্র বাবু কাগজ গুলি বারকত নাড়িয়া চাড়িয়া জনৈক পার্শ্বোপবিষ্ট আত্মীয়কে পাঠ করিতে আদেশ দিলেন। আমি, ভাবিলাম, বক্তৃতা আরম্ভ হইল দেখিতেছি,—তবেইত ফলার মাত্রায় উঠিল! আত্মীয় মহাশয় পাঠ আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ দুইখানি পত্র শেষ করিলেন। পত্রদ্বয়ের প্রথম খানির মর্ম্ম এই,—

"আপনার (সুরেন্দ্র বাবুর) কারাবাসে শোকার্ত্ত হইয়া ভারতের দুই লক্ষ লোক শোক-চিহ্ন (Black Ribon) ধারণ করিয়াছিল; আমরা সেই সকল কৃষ্ণ ফিতা যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া এই সকল সিন্দুকে বোঝাই করিয়াছি। একবার চাবি খুলিয়া অবলোকন করুন।"

দ্বিতীয় পত্র খানির মর্ম্ম এই,—

"আপনার কারাবাসে আমরা পঁচিশ সহস্র ভারতবাসী সর্ব্বপ্রকার বিলাস দ্রব্য, বিশেষতঃ সকল প্রকার মাদক সেবন ত্যাগ করিয়াছিলাম। অদ্য আমাদের সেই কঠোর ব্রতের উদ্যাপন হইল। এই অভিনন্দন পত্রের সহিত সেই পঁচিশ সহস্র লোকের স্বাক্ষর দেখিবেন।"

এই পত্র দুই খানি শুনিয়া সুরেন্দ্র বাবু অবশ্যই যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন,—"আমাকে যে আপনারা এত ভাল বাসেন, আমি তাহা জানি না। কিন্তু আমি যে এত ভাল বাসিবার উপযুক্ত নহি, তাহা বিলক্ষণ জানি। আমি দেশের জন্য যদি কিছু করিতে পারিয়া থাকি, তাহা কর্ত্তব্য বোধে করিয়াছি, তজ্জন্য এরূপ মানবদুর্লভ পুরস্কারের প্রত্যাশা স্বপ্নেও করি নাই। আমি ও আমার কারাবাস অতি সামান্য ঘটনা; কিন্তু এই উপলক্ষে আপনারা যে ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহা ভারতগগনের দ্বিতীয় ধ্রুবতারা। আপনারা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকৃত শত শত, এবং দ্বিতীয় পত্রের স্বাক্ষরকারী মহাত্মগণ সহস্র সহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।" দুইখানি পত্র এবং সুরেন্দ্র বাবুর শীলতা, ইহার কিছুতেই ফলারের একটি কথাও নাই দেখিয়া সত্বর সেস্থান ত্যাগ করিলাম। গৃহে আসিবামাত্র গৃহিণী কোঁচার কাপড় ধরিয়া "আমার

জন্য কলারের কি আনিয়াছ, দাও” বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, কলার মাথায় থাকুক, অতগুলা সাপের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিলাম, ইহাই যথেষ্ট; ভাল, সুরেন্দ্রের মাতায় ও ঘাড়ে অত সাপের চক্র কিরূপে হইল, বলনা।

গৃহিণী কহিলেন,—“সুরেন্দ্র ফাটকে গিয়া অনন্ত চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনন্তদেব মনে করিলেন, সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, ‘বরং বৃণু’ সুরেন্দ্র কহিলেন, ‘আমি কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিনা, আপনি যদি আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করুন।’ অনন্তদেব “তথাস্তু” বলিয়া কহিলেন, ‘যে দিন খালাস হইবে, সেই দিন শ্বেত-শত্রু দংশন করিবার জন্য তোমার শিরে ও অংস দেশে অষ্টোত্তর শত অহিফণা বহির্গত হইবে।’ সুরেন্দ্র বাবু আজ খালাস হইয়াছেন, তাই অদ্য তাঁহাকে চক্রধারী দেখিতেছ।” আমি কহিলাম, ঐ চক্রের দুই একটা ফিরিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে ফের্ কামড়াইবে না ত? গৃহিণী কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। স্বপ্নের বিচিত্রাগতি! গৃহিণী যেন আমাকে ত্যাগ করিয়া নরিস্ সাহেবকে বিবাহ করিয়াছেন। সাহেবের মস্তক ও গণ্ডদেশ শোণিতসিক্ত দেখিয়া তিনি হাপুস্ নয়নে রোদন করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারি নাই, মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাই। একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, মেম সাহেব, তুমিইবা কাঁদ কেন—আর তোমার সাহেবের মাথা ও গাল দিয়াই বা রক্ত পড়ে কেন? কি রোগ হইয়াছে? মেম সাহেব কহিলেন,—“রোগ ত কিছুই দেখিতে পাই না,—যেদিন বিলাত হইতে সুরেন্দ্র বাবুর খালাসের হুকুম আসিল—সেই দিন হইতেই সাহেব নিয়ত মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু দুই হাত দিয়া ছিন্ন করিতেছেন,—আর রক্ত ধারা বহিতেছে।”

মেম্ সাহেবের কথা শুনিতেছি,—এ দিকে রাজপথে শত শত ঢাক এক কালে বাজিয়া উঠিল এবং পাঁঠার “ভ্যা—ভ্যা” শব্দে কর্ণ বিদীর্ণ হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা কি? কারেই বা জিজ্ঞাসা করি,—আমার ডেলিনিউস্ ও দিন-পঞ্জিকা রূপিণী গৃহিণী গৃহে নাই,—তিনি নরিস্ সাহেবের বিবি হইয়াছেন। দৌড়িয়া দরজায় গিয়া যাহারে সম্মুখে পাইলাম, তাহারেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইল্‌বার্টের বিল পাস্ হইয়াছে বলিয়া কলিকাতার যাবতীয় হিন্দু অধিবাসী কালীঘাটে পূজা দিতে যাইতেছে এবং ঐ বিলের বিপক্ষে যত লোক শত্রুতা করিয়াছিল, প্রত্যেকের অনুকল্পে এক একটি পাঁঠা বলি দিবে। ইংলিস্‌ম্যান্, জ্যাক্সন, ষ্টিভিন্সন্, টমসন্ প্রভৃতির অনুকল্পে এক একটি কালাস্তরের মহিষ আনিয়াছে। পাঁঠার পাল দেখিয়া আমার চাকভেল্‌কি লাগিল, চ্যাঁ—ভ্যা রবে কানে তালা ধরিল। ভাবিলাম, এত পাঁঠার দুই একটা মুড়ি বা দুই এক খানা ঠ্যাং না পাইবার কথা নয়; অতএব সেই জনতার অনুগামী হইলাম। চৌরঙ্গীর নিকটবর্ত্তী হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষে কতকগুলি সাহেব বিবির মৃতদেহ লম্বিত ও তাঁহাদের প্রত্যেকের গাত্রে এক একখানি কাগজ লাগান রহিয়াছে, দেখিলাম। ঐ সকল কাগজে “বাঙ্গালী হাকিমের বিচারাধীন হওয়াপেক্ষা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ” লেখা রহিয়াছে। এই ঘট-

নাটি দেখিয়া ভাবিলাম, এইগুলি খাঁটি জিনিস,—আমাদের মত ভাল মাহা সাহেবের "সং" নহে।

এই সময়ে একবার চট্‌কা ভাঙ্গিয়া গেল। ভাবিলাম, আজকি ছুট্‌য়া গণিতে ভুলিয়াছি? একটুকও ঘুম হইল না—কেবলই এলো মেলো স্বপ্ন দেখিতেছি, বড়ই বায়ু বৃদ্ধি হইয়াছে,—"বায়ুনাং বিচিত্রা গতিঃ।" গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিলাম, মরিস্ সাহেবের সঙ্গে কেমন ঘর করা করিলে? তিনি ত আর "মুক্তি মণ্ডপে" যান নাই; ২।১ বার য়াঁ। ওঁঃ করিয়া কদলীকাণ্ড সদৃশ বামহস্ত খানি আমার বক্ষে নিঃক্ষেপ করিলেন তাহাতেই আমার, পতিব্রতা ব্রাহ্মণীকে স্লেচ্ছের ঘরে প্রেরণ করা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল। আমি পুনঃ প্রায়শ্চিত্তের শঙ্কায় বাহিরে গিয়া শয়ন করিলাম। আবার তন্দ্রা,—আবার স্বপ্ন। যেন গৃহিণী বলিতেছেন,—"বসিয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরায়, অনেক দিন হইল কর্ম্মের জন্য বেঙ্গল আফিসে আবেদন করিয়াছিলে,আর একবার কেন চেষ্টা করনা।" আমি তাঁহার কথায় কখন ঔদাস্য করি না। পরদিনই ধড়া চূড়া বাঁধিয়া বেঙ্গল আফিসে গেলেম। কেমন যে যাত্রার ফল, যাইবা মাত্র সেকরেটারি সাহেব কহিলেন,—"তোমাকে ডেঃ মাজিষ্টরি দিবার জন্য পূর্ব্বতালিকা হইতে তোমার নাম বাহির করা হইয়াছে, ঐ পদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ কি না?" আমি তৎক্ষণাৎ কহিলাম, মহাশয় আপনার অনুগ্রহে কিছুতেই অপ্রস্তুত নহি। কিন্তু মনেং ভাবিতে লাগিলাম, বর্ত্তমান সময় কালা আইন পাসের পরবর্ত্তী,—বড় ভয়ানক—যেন বৃশ্চিক লাঙ্গুল সর্পের আবাস ভূমি। যদি কোন সাহেব-সম্পর্ক শূন্য স্থানে পাঠাইয়া দেয়, তবেই রক্ষা;—নচেৎ কোন ক্যাণ্টনমেণ্টের কাছে দিলে হয়ত চন্দ্রহাস-পরিশোভিত-পরিকর গোরাচাঁদ আসামীর হাতেই প্রাণটা যাইবে। সাহেব আবার কহিলেন,—"নূতন আইনে তোমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে;—কিন্তু সরধান—যেন ইউরোপীয় আসামীর আপিলের স্রোতে ভাসিয়া যাইওনা। তোমাকে দুই সপ্তাহের মধ্যে কোন মহকুমায় যাইতে হইবে।" আমি মনে মনে ভাবিলাম, তাহারা শুধু আপিল করিয়া ক্ষান্ত হইলে বাঁচি। প্রকাশ্যে কহিলাম, সত্য ও ন্যায়ের উপাসনার ত্রুটি হইবেনা, তবে অদৃষ্টের ফল অপরিহার্য্য।

এই সপ্তাহের মধ্যেই চুয়াডেঙ্গা যাইবার আদেশ এবং সমস্ত নদীয়ার আব্‌গারি পর্য্যবেক্ষণের ভার পাইলাম। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই, শুঁড়িদের এক এক দরখাস্ত পাইলাম। তাহার মর্ম্ম এই, "সুরেন্দ্র বাবু যে দুই মাস কারাগারে ছিলেন, ঐ দুই মাসে আমাদের কারবার একরূপ বন্ধ ছিল,—বিক্রয় অতি অল্পই হইয়াছে। বেচা কেনা না করিয়া পুরা খাজনা দিতে হইলে আমরা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইব। অতএব দয়া করিয়া আমাদের ইজারার টাকা কমাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়,—হুজুর মালিক।" ভাবিলাম,—খাজনা কমাইব এবং সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাসে এদেশীয়গণ যে দুঃখী হইয়াছিলেন, তাহা সাহেবদিগকে জানাইবার জন্য সাহেবিধরণের কাল ফিতা পরা হইয়াছিল, কিন্তু এই দরখাস্ত খানি যখন সাহেবদিগের গোচর হইবে তখন যে কেবল কাল ফিতার কাজ করিবে এমন নহে,—কালসাপ হইয়া তাঁহাদিগকে কামড়াইবে।

তারপর একদিন রেলের গাড়ীতে যেন কোথা যাইতেছি। পাশের কামরায় দুইটী সাহেব কথোপ কথন করিতেছেন। আমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেছি। অন্তত্তর কহিতেছেন,—“এত কাঁদাকাটি, এত গালিগালাচ এত ভয় মৈত্র্য প্রদর্শন,—এত বাঙ্গালীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা গেল,—কিছুতেই কিছু হইলনা; ইলবার্ট বিল পাস হইয়া গেল। শুনিতেছি, আমাদের মধ্যে অনেকে এদেশের সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়া কারবারাদি ছাড়িয়া দিয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন আমি ২। ১ দিনের মধ্যে জাহাজারোহণ করিব।” অন্যব্যক্তি কহিলেন,—“আমি শুনিতেছি, আমাদের মধ্যে কতিপয় নর নারী নেটিব বিচারপতির বিচারাধীন হইবার আশঙ্কায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমার বিবেচনায় তোমারও জাহাজারোহণ না করিয়া তাঁহাদের অনুগমন করা উচিত। স্বদেশে আবাস ও আজীব না পাইয়া ভারতে আসিয়াছ,—ভারতের খাসজলে শরীর পোষণ করিতেছ এবং চিরকাল পুরুষানুক্রমে বসিয়া খাইবে, তাহার সংস্থান করিতেছ। অথচ এদেশের ভাল দেখিয়া চক্ষু টাটাইয়া মরিতেছ। বরং তোমরা বিচারকালে স্বজাতি পক্ষপাতে সর্ব্বদাই বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়া থাক। আমি পঞ্চাশ বৎসর এদেশে আসিয়াছি,—কখন কোন নেটিব্ বিচার পতিকে অন্যায় বিচার করিতে শুনি নাই। কেবল গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসান না দিয়া ন্যায়ান্যায় চিন্তাকর,—কালের গতি পরিদর্শন কর,—এবং তোমার স্বদেশীয় ইংরাজকুলতিলকগণ এবিষয়ে কিরূপ অভিমতি ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা সন্ধান কর। জুলুমাসের কনটেম্ পোরারি রিভিউটা ভাল করিয়া পড়িও। আমার মতে তোমাদের এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়, একটু ধর্ম্মপানে তাকাইয়া ভালমানুষ হও,—যাহাতে অপরাধী হইয়া নেটিভ বিচারকের হাতে পড়িতে না হয়, সকলে সেইরূপ চরিত্রগঠনের কেন চেষ্টা করনা। তোমরা মনে করিলে কি না পার?—যখন জিদ্ বজায় করিবার জন্য প্রাণদিতে পার, তখন তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। তোমরা বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া দেশে না গিয়া,—গলায়দড়ি না দিয়া এই প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমরা অপরাধী হইবেনা।...ইত্যাদি।” শুনিতে শুনিতে গৃহে গমন করিলাম। আজ বাড়ীতে আমার আদরের সীমা নাই। কোন পুরুষে যে চাকরী করে নাই,—আমি আজ বাঙ্গালীর বহুসাধনের ফল স্বরূপ সেই হাকিমী পদে অভিষিক্ত! পূর্ব্বে যারা ভাল করিয়া কথা কহিতনা আজ তাহারা আমার দ্বারে উপস্থিত। বাহিরে গিয়া দেখি! দশ বারটী ভদ্রলোক আমার দর্শনাভিলাষী, তন্মধ্যে তিনজন জমিদার এবং অবশিষ্ট গুলি স্কুল মাষ্টার। একজন জমিদার দিগের মুখ পাত্র হইয়া কহিলেন,—“মহাশয় কামারের কুমার বৃত্তি দেখিলে গাত্রজ্বালা করে, শুনিতেছি, নাকি! একজন সেকেলে স্কুল্ ইনিস্পেক্টার রেণ্টবিল সম্বন্ধে কি রিপোর্ট লিখিয়াছেন এবং আমাদের এককালে মাথা খাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন? যদি সত্য হয়, তবে আমরা তদ্বিষয়ে কি করিব পরামর্শ চাই।” আমি কহিলাম, কেন আপনারা চিরকালের জন্য জমিদারী পত্তনি দিয়া বৈধব্য স্বীকার করিতে পারেন,—

ক্লার্কের রিপোর্ট অসত্য হয় কেন? তিনি কহিলেন,—"মহাশয়, আমাদের মধ্যে কয়জন জমিদারী পত্তনি দেয়? যাহারা দেয় তাহারা বাস্তবিকই বিধবা স্ত্রী। কিন্তু যাহারা প্রজার ও নিজের মঙ্গলের জন্য প্রজার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চায় এবং শ্রম করিতে কাতর নহে, ক্লার্ক সাহেব কি তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিবার প্রস্তাব করেন নাই?" আমি বলিলাম,—তিনি রিপোর্টে অনেক এলোমেলো বলিতে পারেন কিন্তু এড্‌সার এলোমেলো শুনিবার লোক নহেন। একজন মাষ্টার বলিলেন,—"আমরা সমস্ত কলিকাতা ও উপকণ্ঠস্থ স্কুলের মাষ্টার সকল এক সভা করিতেছি; ভারতবর্ষের যাবতীয় স্কুলের মধ্যে যেখানে যেখানে লেথব্রিজ্ সাহেবের পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহা উঠাইয়া দেওয়াই সভার উদ্দেশ্য,—আপনাকে প্রিজাইড্ করিতে হইবে।" "চোরা চায় ভাঙ্গাবেড়া"—স্বীকার করিলাম। ব্রিজ্ বাহাদুরেরও কিন্তু বেজায় স্পর্দ্ধা! ছোটলাট্ মহারাণীও কম পাত্র নন,—ভূতাবিষ্ট সর্ষপ!! ইত্যাদি প্রকার,

"ছেঁড়া চটে শুইয়া—নাথ টাকার স্বপন" দেখিতেছিলাম,—এমন সময়ে আপনার পত্র প্রেরকের পত্রবাহক গিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ করিল। যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে,—তবে এমন কর্ম্ম যেন আর না হয়।

মনোবিজ্ঞান।

পাশ্চাত্য দর্শনের বিচার।

ভূমিকা।

দর্শনশাস্ত্র মাত্রেরই কর্ত্তব্য বিষয় গুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ১। স্বস্ব উদ্দেশ্য নিরূপণকরণ। ২। দর্শন শাস্ত্রোদ্দিষ্ট বিষয় সমূহের স্থিরীকরণ। ৩। স্বস্ব তর্কের মূল স্থিরীকরণ। ৪। কোন স্থান হইতে বিচারের সূত্রপাত হয় তাঁহার নিরাকরণ। ৫। অনুসন্ধান প্রণালীর প্রকৃতিনির্দ্দেশ করণ। ৬। অনুসন্ধানের প্রকৃত উপায় স্থিরীকরণ। ৭। বিচারের সীমা সংস্থাপন। ৮। অনুসন্ধানের ফল ধার্য্যকরণ। ৯। সর্ব্বব্যাপিকা নিয়ম অবধারিতকরণ। এবং ১০। মানসিক ভাবব্যঞ্জক পদার্থ স্থিরীকরণ।

১। দর্শন সম্বন্ধীয় বিচারের প্রকৃত পক্ষে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

(ক) মানব সাধারণের কোন অভাব মোচন্ বা (খ) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কোন দোষ সংশোধন। এই উভয় বিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে অস্তিত্বকশতঃ শেষোক্ত উদ্দেশ্যটিকেই দার্শনিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করা যায়। সুতরাং উদ্দেশ্য কপোল কল্পিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, বিচারকের মন হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ স্থিত ইপ্সিত ফললিপ্সা জনক বস্তু বিশেষ।

২। অনুসন্ধানের বিষয়ভূত পদার্থও

পূর্ব্বমত উল্লেখাভেদে দ্বিবিধ ফলতঃ একমাত্র। দার্শনিকগণ জন সাধারণের সুখ ইচ্ছাকরিয়া থাকেন এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে সুখ লাভ হয়। সুতরাং বাহ্যপদার্থের সহিত মনঃ এই পদার্থের কিরূপ সম্বন্ধ ও কিরূপে এই সম্বন্ধ উৎপন্ন হয় তন্নিরূপণকরণই দর্শনের এক মাত্র বিষয়। এই বিষয়ের আন্দোলন প্রকৃত নিয়মে করা হইলে মানব চরম জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

* এতৎ সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিবার উদ্দেশ্য রহিল।

৩। মানবজ্ঞানের মূল নিরূপণ করাই উপযুক্ত বিষয়ের ভিত্তি স্বরূপ। কিরূপে বাহ্য পদার্থের জ্ঞান লাভ হয় তাহাই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মূল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

৪। কোন স্থান হইতে বিচারের সূত্রপাত করা হইবে ইহা অবধারণে বিশেষ সতর্ক হওয়া অপরিহার্য্য। স্থল বিশেষে অনুসন্ধানের ফলকৃত বিষয়ের সহিত ইহার প্রভেদ প্রতিপন্ন করিতে দার্শনিকগণ বিস্মৃত হন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিষয় ও মূলের সহিত ঐক্য সংস্থাপন করিতে হইলে "ইন্দ্রিয় জ্ঞানই" বিচারের সূত্র স্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে।

৫। বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে বিচার প্রণালীর প্রকৃতি নিরূপিত হয়। সুতরাং প্রকৃতি পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন সম্ভাবী পদার্থের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করিতে হইলে (explicative) অনুশীলনী প্রণালী অপরিহার্য্য এতৎ সম্বন্ধে লর্ড বেকনের (Lord Bacon) উক্তিটীর উল্লেখ করা আবশ্যক, "মানব অপেক্ষা উচ্চতর জীবনে পদার্থের প্রথম বিচারেই তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া স্পষ্ট প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতে পারে; কিন্তু মানবগণ একে একে পরিহার করিয়া সুতরাং প্রথম হইতে অস্বীকার করণ দ্বারা অবশেষে স্বীকার করিতে ও তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন। সুতরাং প্রাকৃতির প্রণালীর বিপরীত ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালী পরিধাবিত হয় কারণ "স্বভাবের যাহা প্রথম মানবের তাহা প্রথম নহে" (what is first to nature is not first to man).

৬। দার্শনিক অনুসন্ধানের প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানের প্রকৃত উপায় দ্বিবিধ প্রণালীর সমষ্টিভূত। প্রথমতঃ নানা জ্ঞানাত্মক ও দুর্ব্বোধ্য পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল পদার্থে উপনীত হইয়া পরে সকল পদার্থ হইতে ক্রমশঃ গুরুতর পদার্থে উপনীত হওয়া সংক্ষেপ আরোহী ও অবরোহী (Inductive and deductive) প্রণালীতে অনুসন্ধানকরাই সত্য লাভের প্রকৃত উপায়। ইহাতে প্রথমতঃ আবিষ্ক্রিয়া ও শেষে বিশেষ বিবরণ প্রদর্শন করিতে হয়।

৭। Lord Bacon (লর্ড বেকন) বলিয়াছেন "a cripple in the night path will beat araca in the wrong one" অর্থাৎ একজন খঞ্জ ব্যক্তি প্রকৃত পথ অনুসরণ করিয়া বিপথগামী একজন ক্ষিপ্রা আরোহীকেও পরাজয় করিতে পারে"।

---

* "It may perhaps be competent to angles or superior intelligences to determine the form or essence directly, by affirmation from the first consideration of the subject; but it is certainly beyond the power of man, to whom it is only given to proceed at first by *negatives*, and in the last place to end in *affirmatives*, after the exclusion of every thing else."

আধুনিক বিজ্ঞানের নেতা Des Cartes (ডেকার্টস্) বলিয়াছেন "It is not so essential to have a fine understanding as to happy it equally" অর্থাৎ "সুন্দর বুদ্ধি থাকা অপেক্ষা প্রকৃত পথে ইহাকে পরিচালিত করা গুরুতর আবশ্যকের বিষয়। সুতরাং বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রকৃত পথের সীমা সংস্থাপন করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য।

৮। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফল অনুশীলনের উদ্দিষ্ট বিষয় নিরূপণ। সূত্রের গুণাগুণে ফলের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

৯। মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধিই এই সর্ব্ব ব্যাপিকা শক্তি। ইহাকে সর্ব্বাগ্রে কুসংস্কার বিবর্জ্জিত করা আবশ্যক। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইহাকে স্থাপিত করা সময়ে সময়ে উত্তেজিত করা ও প্রকৃত রূপে ইহাকে সীমাবদ্ধ করা অপরিহার্য্য।

১০। এতৎ সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে ইহাই বক্তব্য যে নবভাব ব্যঞ্জক নূতন শব্দের সৃষ্টি করা স্থল বিশেষে হিতকর বটে। কিন্তু যদি প্রচলিত ভাষায় উক্ত ভাব প্রকাশক কোন শব্দ থাকে তাহা হইলে নূতন বাক্য সৃষ্টি করা যে নিতান্ত অনিষ্টকর তাহার সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ।

গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তিস্বীকার।

দোললীলা। (গীতিনাট্য) শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত। কলিকাতা মণিরাম যন্ত্রে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পাথুরিয়া ঘাটা রাজবাটী হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে, ইহার অভিনয় দেখা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অধ্যয়ন করিয়া এই মাত্র অনুমান হয় যে অভিনয় কালে ইহা রসোৎপাদনে সক্ষম হইবে। ইহার স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব আছে। যথা;—

"অতি অন্তর্পণে, সখি, চাও কুসুমের পানে;—
হানিলে কঠিন দৃষ্টি, বিষম বাজিবে প্রাণে।
চাঁদ যথা চায়, চাও ফুল-পানে;
মলয় যেমতি বুলায় সে হাত, চুম্বে কুসুমবয়ানে।

দুই একস্থানে মেলী প্রভৃতির সূক্ষ্মভাব পূর্ণ কবিতাও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—

"নয়ন গলিয়ে যায় সুনীলিম গগনে"
"চলে জল অবিরল, জ্বলি জ্বলি তপনে।"

দুঃখের বিষয় আমাদের বাজারে আজিও এরূপ কবিতার দর দাঁড়ায় নাই। শুনিতেপাই মেলীওয়াউস্ওয়ার্থ বাঙ্গালী যুবক ভাল বাসেন একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালী ভাব চিরকাল বৈভবাপেক্ষা শব্দ ও ছন্দ বৈভবের বিশেষ অনুরাগী। বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সেই চিরন্তন সংস্কার সহজে ছাড়িতে পারিবেন এমন মনে হয় না,

দোললীলার স্থানে স্থানে ইংরাজির গন্ধ বড় প্রবল। যথা ;—

"তারের ভিতরে কি সুন্দর ছবি
রঙিতেছে প্রাণ সখি!"

প্রচলিত অপর গ্রন্থের অনুকৃতি ও ইহাতে আছে। যথা ;—

"কেন না হইলি তুহুঁ নীলিম গগন,
প্রাণধন?'
থাকিতাম নীলিমায় মেলিয়ে নয়ন
অনুক্ষণ।
তব অঙ্গে তারা গুলি ফুটিত যখন
অগণন,—
হৃদয়ে চাঁদের ধারা বহিত কেমন
পূর্ণিমায়!
ধরিতাম হৃদি পাতি তরল কিরণ,
শ্যামরায়।
পূর্ণিমার প্রেম-জলে করিতাম স্নান
কুতূহলে;
থাকিতাম ডুবি কুমুদিনীর সমান,
সেই জলে।"

যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের 'কেন না হইনু আমিযমুনার জল' ইত্যাদি কবিতা মনে থাকিতে পারে। তাঁহারা দোল লীলার উদ্ধৃত কবিতা যে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত কবিতার রূপান্তর তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।

দোল লীলা গীতিনাট্য শ্রীকৃষ্ণের একটী প্রধান লীলা অবলম্বনে লিখিত না হউক, তদুদ্দেশ্যে লক্ষিত। প্রসঙ্গতঃ এই গীতি নাট্যে কৃষ্ণ চরিত্রের আর একটী প্রধান লীলা সমানীত হইয়াছে। বস্ত্রহরণরূপ স্বতন্ত্র লীলা ও ইহার সঙ্গে মিশ্রিত করা হইয়াছে। এরূপ করায় গ্রন্থের রসভঙ্গ, লক্ষ্যহানি এবং নাটকত্বে ব্যভিচার ঘটিয়া যায়। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা ঘটিয়াছে।

সঙ্গীত রঞ্জন। প্রথমখণ্ড। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা গিরিশযন্ত্র। মূল্য।০ চারি আনা।

এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থখানি এক শত দ্বাদশটী ঈশ্বর বিষয়ক গীতে পূর্ণ। গান সুর লয় সংযুক্ত না হইলে তাহার সৌন্দর্য্য বুঝা যায় না। পড়িয়া বুঝিলাম সঙ্গীতরঞ্জনের গানগুলি সরল বটে, তবে তাহাতে বিশেষ নূতনত্ব বা বর্ণনার বিশেষ চমৎকারিত্ব কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। দুই একটী গান কোন কোন প্রচলিত গানের রূপান্তর মাত্র বলিয়া মনে হইল।

চিন্তামালা। কাব্য। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীজীবনচন্দ্র ভক্ত বিরচিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা। কর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা।

এই ক্ষুদ্র 'কাব্যে' (২) বিশেষ প্রশংসার কোন বিষয়ই দেখিতে পাইলাম না। নিন্দার বিষয়ের অসম্ভাব নাই।

গীতি কবিতা। প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র রায় বিরচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভার আদেশে, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য

সভা হইতে শ্রীরাজরাজেন্দ্র চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কলিকাতা সাহিত্য প্রেসে, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

"নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা।
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে! ও" (ঞ)

ইত্যাদি সর্ব্বজন পরিচিত, নির্ব্বাপিত স্মৃতি প্রদীপ্ত কারী সঙ্গীত এই গ্রন্থ চতুষ্টয়ের প্রথম ভাগের অন্যতর ভূষণ। এই গীতের যে বিশেষ মাধুর্য্য আছে তাহা বঙ্গবাসী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে অধুনা কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন। প্রথম ভাগের অপর গীতের নাম "ভারত বিলাপ।" এই গীতে বিশেষ নূতনত্ব না থাকিলেও মিষ্টতা যথেষ্ট আছে। আমরা নিম্নে ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি;—

"ছি! ছি! আজি, এ কুৎসীত বেশ পরে
কি সুখে সকলে ঘুম যাও ঘরে।
ধর প্রীতি মনে, বদি দেশ বলে
ভাসরে সকলে ভাস অশ্রুজলে।
ত্যজরে ত্যজ আত্ম. সুখের কথা
ত্যজ আমোদ ভোগ বিলাস বৃথা।
পর কষ্ট বিভূতি, শরীর গণে
চল চৌদিক সাধন আহরণে।
গত কালের ভারত, পাপ ফলে
ধোও শোণিত বা নয়নের জলে।
থুইয়ে নিজ দেশ, মলিন মুখে
ভজনায় কি পৌরুষ স্বার্থ সুখে।
পরিবেষ্টিত, শাবক সঙ্গিগণে
পশু ও প্রতি পালন পায় বনে।
পশু সঙ্গে চরে, নর ভূমিতলে
সুধু উন্নত এক মহত্ব বলে।
যদি মানুষ, মানুষ নাহি হলে
ফল লাভ কি মানুষ নাম নিলে।
নর লক্ষণ হীন, নরাঙ্গ পরি
কি হবে তনু ভার লয়ে বিচরী।
যদি কাজ হতে, কিছু নাহি হবে
কর জীবন ধারণে ক্ষান্ত সবে।
ডুবি যাক্ জলে, তব বাস যথা
ভুলি যাক্ সবে তব নাম কথা।
কভু যেমন কেহ, না পায় করে
খুঁজি ভারত নামক দেশ ভবে।"

দ্বিতীয়ভাগে তাজমহল নামক গীত প্রথমে স্থান পাইয়াছে। সাজিহান বাদশাহের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি, পৃথিবীর অন্যতর বিস্ময়াবহ সামগ্রী, স্থপতি কৌশলের বিচিত্র নিদর্শন এবং প্রেমের দৃঢ়তার সজীব সাক্ষী তাজমহল দেখিলে কল্পনা হীন ব্যক্তির চিত্তক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ নানা ভাবতরঙ্গ প্রবাহিত হয়। রায় মহাশয় সেই তাজমহল অবলম্বনে যে গীতি রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রতিষ্ঠার অযোগ্য হয় নাই। এই গীতের একস্থানের একটী মাত্র ভাব পাঠকগণের গোচরার্থ উপস্থিত করিতেছি ঃ—

"কোন দিন এই স্থানে এর জনকেরে
প্রণমিত লোকরাজ্য লুটিয়া ভূতল।
কিবা না সম্ভবে দেখ এমন জনেরে
সুখে তার মুখ আজি লোটে ধরাতল॥
কাহার প্রাঙ্গনে বসি কে করে বিহার
কাহার কুসুমবন কে করে চয়ন।
কাহার প্রস্তুত অন্ন কাহার আহার
নির্ম্মম কালের হা! কি অদ্ভ বিতরণ।"

দ্বিতীয়ভাগ মধ্যস্থ অন্যান্য কবিতা বিশেষ প্রশংসা যোগ্য নহে। সে গুলি অপেক্ষাকৃত নির্জীব অপেক্ষাকৃত সাদা

খাটা। 'বিজ্ঞান উৎসব' নামক গীতে অনেকটা উচ্চ অঙ্গের কল্পনা আছে। নিম্নোদ্ধৃত গীতে অতি সুমিষ্ট শ্লেষের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা ;—

"সে রে বিদায় ভারতে আজি হোরি।
আর এ ভূমে তুই নস্ অধিকারী॥ ধ্রু॥
নিয়ে যা দূরে তোর ঐ যমুনা বংশী,
ভ্রমর কোকিল শুকশারী।
শুনিব 'ফ্লুট, সুখে, ভাসিয়া 'টেম্‌স, বুকে,
লাগেনা ভাল এ যত কালো কানাই॥ ১॥
নিয়ে যা খুলে এই ঘাঘরি চুনরী,
উড়নী কাঁচুলী লাল শাড়ী।
'গাউন, 'বনেট, পরি, নাচিব চাখড়ি মেখে,
ভেঙ্গে ফেলা কুৎসিত ও রঙ্ পীচকারী॥ ২॥
যারে বাগান হতে মালতী মাধবী,
কাঞ্চন কিংশুক আজি ছাড়ি।
আসিবে বিগ্‌নোনিয়া,হাসিবে সোণার মেরি,
ভালনা তোদের রঙ্ সৌরভ ভারি॥ ৩॥
হওরে নীরব আজি মন্দিরা বীণা,
মুরজ যা চলি দেশ ছাড়ি।
নাচিব কেবল 'বুটে, শুনি 'ড্রম্‌. 'ক্লারিনেটে,
পরিবনা আর পায়ে ঘুঙ্গুর বেড়ী॥ ৪॥
আজিরে সে তোর ঐ গুঞ্জর কুহুতে,
মলয়ে মধুর রস নাই।
গাইবে 'নাইটিঙ্গেল, মধুর 'রাবিন, কাণে,
চুম্বিবে কোমল 'গেল, বরফ বিদারী॥ ৫॥
যালো সরিয়া দূরে ললিতে ও রাধে,
তোরা কেউ যে ভালনা নারী।
আসিবে 'হেলেনা,'ইবা, মোহিবে সে'র‍্যানা,
'রোজী, তোদের মলিন মুখ দেখিতে নারি। ৬
কেনেরে অলি ঘুরি ঘুরি এই ফুলে,
বসিছ লাজেরে পরিহারি।
ওকি! গুন্ গুন্ কাণে, ছাড় সর যাও দূরে,
'আসিছে বিলাতি কত প্রজাপতি শারি॥'

তৃতীয় ভাগের প্রথমেঃ,—

"নিরখি স্মৃতির পট করয়ে শুনি।
গত কাহিনী সে বৃন্দাবন ও॥

ইত্যাদি সুদীর্ঘ কবিতা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই কবিতার অনেক স্থানই ভাবের প্রাচুর্য্য, ভাষার লালিত্য শব্দের মধুরত্ব, কল্পনার সমাবেশ প্রভৃতি বৈভব সম্পন্ন। তবে এরূপ ভাবের বর্ণনা সুদীর্ঘ হইলে মিষ্টতার লাঘব ঘটে। আমাদের আশঙ্কা হয় অনেক পাঠক হয়ত ইহার দীর্ঘতা হেতু মনোযোগ ও ধৈর্য্য সর্ব্বত্র সমান ভাবে রাখিতে পারিবেন না, সুতরাং সকল স্থলের মিষ্টত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন না। 'বারানসী,' নামক গীতে মিষ্টতার অভাব আছে।

পূর্ব্বে যে সকল কবিতাআলোচিত হইল তাহার অনুরূপ কোন কবিতা চতুর্থ ভাগে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে সমস্তের কোনটীই অপাঠ্য বা নিতান্ত ভাবশূন্য নহে। আমরা গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় প্রণীত স্বদেশানুরাগ পূর্ণ গীতের একটু একটু নমুনা দেখাইয়াছি, এক্ষণে চতুর্থ ভাগোদ্ধৃত নিম্ন লিখিত ক্ষুদ্র গীত দ্বয় তিনি নরনারীর প্রেম বিষয়ে কেমন মধুর সরল ও ললিত গীত রচনা করিতে পারেন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। যথা ;—

নূতন যতবার দেখি, ও মুখ রূপরাশী॥
নামিটে প্রাণের সাধ, পিয়ে তবু পিপাসী॥
মনের এই বাসনা, করি সদা উপাসনা,
পরায়ে প্রণয় ফুলে, মিলন স্রোতে ভাসি॥
অভিমান মেঘে ভাল, শোভিয়াছে মুখ শশি॥
আকুল আঁখি যুগলে, আতট সলিল রাশি॥
নিশ্বাসেতে থর থর, বহিছে প্রলয় ঝড়,
অধর বাঁধুলী মরি!,প্রবাহে খেলিছে ভাসি॥'

রায় মহাশয়ের হৃদয় স্বভাবতঃ স্বদেশ ও স্বজাতি বৎসল সুতরাং তাঁহার অধিকাংশ গীতে অকপট হৃদয়ভাবব্যঞ্জক অশ্রুচিহ্ন বারি লক্ষিত হয়। মনুষ্য মধ্যে এমন পবিত্র নয়নবারির সমাদর করেন্য এরূপ লোক অতি বিরল।

স্থানাভাব হেতু প্রবাহের বর্ত্তমান সংখ্যায় বিদ্যুল্লতা উপন্যাস কিয়দংশও প্রকাশ করিতে পারা গেলনা। আগামী সংখ্যায় কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইবে।

রাত্রি ৭ টা—৭॥০ টার সময় দীননাথ বাটীতে ফিরিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি শরৎকুমারীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

'মা কেমন আছ?'

শরৎকুমারী বলিল,—

'আমি ভাল আছি বাবা।'

তাহার পর দীননাথ শরৎকুমারীর কপালে একবার হাত দিয়া এবং হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—

'হাঁ, জ্বর এখন নাই। কি খাবে মা?'

শরৎ বলিল,—

'বাবা, খেতে কিছুই ইচ্ছা নাই।'

'তবেই তো রোগের শেষ আছে। একটু ঔষধ পেটে পড়া চাই।'

করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'যেজন্য গিয়াছিলে তাহার কি হইল?'

দীননাথ বলিলেন,—

'সে কায সফল হইয়াছে। কালি বেলা ১০টার মধ্যে দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় শরৎকে দেখিতে আসিবেন। আহা! কি চমৎকার লোক। সার্থক লেখাপড়া শিখেছে। রূপে কার্ত্তিক, গুণেও আশ্চর্য্য। বয়স কি? বড় জোর ২২।২৩। কথা যে মিষ্ট তা আর কি বল্‌বো? হমিওবতী বলে এক রকম নূতন চিকিৎসা উঠেছে, দেবেন্দ্র বাবু তাই শিখেছে। কত লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া যে রোজ দেখে, কতজনকে ঔষধ দেয় তার সংখ্যা নাই। যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে।'

করুণাময়ী বলিলেন,—

'এমন বড়মানুষের ছেলে এতদূর হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিবেন, তা আমাদের তাঁকে একটু বসিতে দিবার জায়গাও নাই।'

দীননাথ বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন,—

'আমরা গরিব জানিয়াই তিনি আসিতেছেন। আমাদের কি সাধ্য তাঁকে সন্তুষ্ট করি।'

হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিবার জন্য দীননাথ বাহিরে আসিলেন।

শরৎকুমারী করুণাময়ীকে বলিল,—

'কালি জমিদারের ছেলে আমাদের বাটীতে আসিবেন। তাঁহাকে বসাইবার আসনের জন্য তুমি ভাবিতেছ। আমি যে কাঁথা খানি তৈয়ার করিয়াছি, সেই খানি পাড়িয়া তাঁহাকে বসিতে দিলে হয় না মা?'

করুণাময়ী বলিলেন,—

'সেত ভালই হয়। তারও যে খানিকটা বাকি আছে।'

'অতি সামান্য বাকী আছে, আমি আজি রাত্রেই সেটুকু সারিয়া রাখিতেছি।'

'না মা, তাতে কাজ নাই। তোমার এই জ্বর। এর উপর আবার পরিশ্রম করিলে হয়ত অসুখ বাড়িবে।'

'আধ ঘণ্টায় হবে মা, কোন ক্ষতি হইবে না।'

'কি জানি? ভয় হয় পাছে অসুখ বাড়ে।'

'কোন ভয় নাই মা। তুমি বল, আমি তাহলে সেটুকু করে রাখি।'

'পার—কর।'

তাহার পর শরৎকুমারী উঠিয়া সিন্দুক হইতে সেই চমৎকার শিল্প কৌশল সংযুক্ত কাঁথা বাহির করিল। তাহাতে যেরূপ সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য ছিল তদ্দৃষ্টে দূর হইতে সেখানি জামিয়ার প্রভৃতির ন্যায় উচ্চ মূল্যের সামগ্রী বলিয়াই ভ্রম জন্মে। শরৎকু-

মারী সূচ সুতা প্রভৃতি লইয়া অবশিষ্ট কার্য্য সমাপনার্থ বসিল।

চট্টোপাধ্যায় ও গৃহিণী আহার সমপনান্তে শয়ন করিলেন। শয়নকালে তাঁহারা শরৎকুমারীকে কাঁথা রাখিয়া শয়ন করিবার জন্ত অনেক করিয়া বলিলেন। শরৎকুমারী, 'এই হইল, এখনই হইবে' প্রভৃতি বলিয়া শয়ন করিল না। বাকি কাজটুকু সারিতে রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। তখন শরৎকুমারীর মাথা ঝম্ ঝম্ করিতেছে, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শরৎকুমারী সেই অবস্থায় অবসন্ন ভাবে শয্যায় পড়িয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা ৮॥০ সময় দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভবনদ্বারে অনেক গোল। বলিষ্ঠ অত্যুচ্চ অশ্বারোহী একযুবাপুরুষ ভবনদ্বারে উপস্থিত। যুবার পায়ে উজ্জ্বল বিলাতী জুতা ও শুভ্র মোজা, পরিধান অতি পরিষ্কার ধুতি, গায়ে হরিদ্রাবর্ণের চীনাকোর্ট, এবং কোমরে কুঞ্চিত চাদর বাঁধা। যুবার মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত ও সৌম্য, দেহ পরিণত ও বলিষ্ঠ, বদনমণ্ডল বিশেষ জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক। সেই অশ্বারূঢ় যুবক বিশেষতঃ সেই অস্থির, উজ্জ্বলকায় অশ্ব দেখিবার নিমিত্ত তথায় অনেক বালক, যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তি সমাগত হইয়াছে। বালকেরা যখন অশ্ব যেদিকে মুখ ফিরাইতেছে, যখন যে রূপে পুচ্ছান্দোলন করিতেছে, যখন যেরূপে ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত করিতেছে, তদ্গতচিত্তে তাহা দর্শন করিতেছে এবং অতিশয় আনন্দ ও কৌতূহল প্রকাশ করিতেছে। অনেকগুলি স্ত্রীলোক বৃক্ষান্তরাল হইতে অশ্ব ও অশ্বারোহী পুরুষকে দেখিতেছে এবং ফুস্ ফুস্ করিয়া নানারূপ বর্ণনা করিতেছে। ফলতঃ নরনারী সকলেই যেরূপ আগ্রহ সহকারে এই দৃশ্য দর্শন করিতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, এদৃশ্য তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়জনক।

একজন লোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিয়া দিল। তিনি বাহিরে আসিবামাত্র যুবা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং দীননাথের সমীপগত হইয়া তাঁহাকে বিনীত ভাবে নমস্কার করিলেন। অশ্ব রক্ষক অশ্ব লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। বালক বালিকা বহুদূরে থাকিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিল।

দীননাথ যৎপরোনাস্তি সমাদর সহকারে যুবককে সঙ্গে লইয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার এতাদৃশ ক্লেশ স্বীকার হেতু আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও কতকগুলি পল্লিবাসিনী স্ত্রীলোক ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। দীননাথ ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া বলিলেন,—

'ইনিই দরিদ্রপালক প্রাতঃস্মরণীয় হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র—দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়। ধনে মানে কুলে শীলে ইহাঁদের সমান আর কে আছে? ব্রাহ্মণি, আজি আমাদের কুটীর পবিত্র হইল। ইনি অশেষ বিদ্যা শিখিয়া গরিবের উপকারের জন্য ডাক্তারিও করিতেছেন।'

দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিলেন। করুণাময়ী বলিলেন,—

'ভগবান তোমাকে চিরজীবি করুন। আমরা গরিব দুঃখী, আমাদের আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কি উপায় আছে?'

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—

'আমাকে সন্তান বলিয়া মনে করিবেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদ আমার সকল মঙ্গলের হেতু।'

দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মহামাননীয় সর্ব্বজন পরিচিত মহেন্দ্র নারায়ণের একমাত্র পুত্রের এতাদৃশ কোমল স্বভাব ও এতাদৃশ অচিন্তিত পূর্ব্ব ভদ্রতা দেখিয়া দুই একজন পল্লিবাসিনী স্ত্রীলোকের নয়নে আনন্দাশ্রু আবির্ভূত হইল। কেহ কেহ বা মনে মনে, কেহ কেহ বা প্রকাশ্যে বলিল,—

'বাবা তুমি চিরজীবি হও, বাবা তুমি ক্রোড়পতি হও।'

দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শরৎকুমারীর স্বর্ণকান্তি তাঁহার নেত্র-পথে পতিত হইল। তিনি অবাক্ হইলেন। দরিদ্রের কুটীরে এমন স্বর্ণকমল কে আশা করে? দেবেন্দ্র বুঝিলেন এরূপ রূপরাশি আর কখন তাঁহার চক্ষুগোচর হয় নাই; তিনি আজি আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'ইহাঁরই কি অসুখ হইয়াছে? কি অসুখ?'

দীননাথ অসুখের বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। তাহার পর করুণাময়ী বলিলেন,—

'বাবা, তুমি আজি আসিবে কিন্তু আমরা কাঙ্গাল মানুষ কোথায় তোমাকে বসিতে দিব বলিয়া ভাবিতেছিলাম। মেয়ে আমার ঐ কাঁথা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। ওতে একটু কাজ বাকি ছিল। ওতেই তোমাকে বসিতে দিতে হইবে মনে করিয়া বাকি কাজটুকু শেষ করিয়া সারিয়া রাখিবার জন্য মেয়ে কালি রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত জাগিয়াছেন, তাতেই আজি অসুখ বেড়েছে।'

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

'এই কাঁথা এঁর তয়েরি? এযে অতি চমৎকার!'

শরতের বদন লজ্জাযুক্ত হইল। ধীরে ধীরে শরৎ নয়নদ্বয় মুদিলেন। দেবেন্দ্র বুঝিলেন যে পীড়িতা কেবল ভুবনমোহিনী সুন্দরী নহেন,—তিনি অসাধারণ শিল্পনিপুণা।

তাহার পর বলিলেন,—

'রাত্রি জাগিয়া অন্যায় করিয়াছেন। আমার জন্য এরূপ কষ্ট করিয়াছেন বলিয়া আমি আরও দুঃখিত হইতেছি; আমার জন্যই আজি তবে উহাঁর অসুখ বাড়িয়াছে।'

শরৎ আরও লজ্জিতা হইলেন।

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

'হাত দেখি।'

দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘড়ি খুলিয়া তাহার সহিত মিলাইয়া হাত দেখিলেন, তাহার পর জিহ্বা, তাহার পর চক্ষু ইত্যাদি নানাবিধ পরীক্ষা করিলেন এবং নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর সমভিব্যাহারী একজন লোককে ঔষধের বাক্স আনিবার নিমিত্ত বলিয়া পাঠাইলেন। একজন লোক একখানি সুপরিষ্কৃত তোয়ালে বাঁধা একটী সুন্দর বাক্স আনিয়া দিল। বাক্সের উপর দুইখানি বড় বড় ইংরাজি পুস্তক এবং ৪। ৫ খানি ছোট ছোট বাঙ্গালা পুস্তক ছিল। দেবেন্দ্র বাক্স খুলিয়া বলিলেন,—

'যে ঔষধ দিতেছি তাহা খাইতে কোন কষ্ট নাই। আজি নিয়মমত ঔষধ খাইলে, কালি আর কোন অসুখ থাকিবে না।'

দীননাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'এ কি ডাক্তারি ঔষধ বাবু ?'

দেবেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন,—

'আজ্ঞা হাঁ, এ ডাক্তারি ঔষধ বটে। ইহার নাম হোমিওপেথি। এ চিকিৎসা বড় সোজা, অথচ বড় উপকারী। আপনারা যদি শিখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমি এর বাঙ্গালা পুস্তক দিতে পারি। তাহা পাঠ করিলেই সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন এবং চিকিৎসাও অনেক শিখিতে পারিবেন।'

দীননাথ বলিলেন,—

'আমি আর বুড়া বয়সে কি শিখিব বাবু? শরত মা, তুমি তো দিন রাত্রি পড়, তুমি এ বই পড়িবে কি ?'

ব্রীড়া-নম্র-বদনা শরৎকুমারী চুপ করিয়া রহিলেন।

দেবেন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞাসিলেন,—

'উনি পড়িতে জানেন ?'

করুণাময়ী বলিলেন,—

'জানেন বই কি? কত রামায়ণের কথা, কত মহাভারতের কথা, কত মেঘনাদের কথা, মা কত কথাই আমাদের বই পড়িয়া বুঝাইয়া দেন। বই নিয়ে আর স্থচ নিয়ে মা দিনরাত্রি ব্যস্ত। ওঁর প্রায় এক সিন্ধুক বই।'

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

'তবে উনিই পড়িবেন। এ বিদ্যা ওঁরই শিক্ষা করা আবশ্যক।'

এই বলিয়া দুইখানি পুস্তক দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহার পর রোগীর পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন এবং বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—

'হয়ত কালি একবার আসিব।'

তাহার পর শরতের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

'আজি যেন আবার শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিও না। অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন পড়িও না। কাঁথা শেলাই করিতে হয়, ভাল হইয়া করিও। আমি এখন আসি।'

শরৎ লজ্জা সহকৃত ঈষদ্ধাস্য সহ বদন বিনত করিলেন।

ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিয়া দেবেন্দ্র বাহিরে আসিলেন। দীননাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া এবং সন্নিহিত ব্যক্তি সকলের প্রতি প্রীতি পূর্ণ হাস্যসহ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেবেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিলেন।

দীননাথ কৃতজ্ঞতা সূচক দুই একটা কথা বলিবেন মনস্থ ছিল, কিন্তু তাহা বলিবার আর সময় হইল না। দেবেন্দ্রনারায়ণের অশ্ব সবেগে ছুটিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন,— অদ্য তাঁহার সুপ্রভাত; অদ্য তিনি যে বালিকা দেখিলেন, তিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রমণীরত্ন। (ক্রমশঃ)

গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তিস্বীকার।

হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিত্রাবলী। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন, (একটী নূতন কবিতা সহিত) কলিকাতা আর্টষ্টুডিও হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতায় আর্টষ্টুডিওর আবির্ভাব দেশের উন্নতির একটী চিহ্ন তাহার সন্দেহ নাই। আর্টষ্টুডিও প্রতিষ্ঠা কাল হইতে এতাবৎ কাল সময়ে সময়ে হিন্দু দেবদেবীর অনেক সুরঞ্জিত প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসমস্তের অধিকাংশই বিশেষ প্রশংসা যোগ্য হইয়াছে। কেবল কয়েকখানি যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাবের সংমিশ্রণে একপ্রকার 'জগাখিচুরি' রকম হইয়া পড়িয়াছে। যাহাই হউক ষ্টুডিও যাহা করিয়াছেন তাহা ইতিপূর্ব্বে এ দেশে স্বপ্নের অগোচর ছিল। ষ্টুডিও আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিত্রাবলী নাম দিয়া নিয়মিত রূপে বর্ষ মধ্যে ৬ খানি ছোট ও ৬ খানি বড় একুনে ১২ খানি সুরঞ্জিত চিত্র প্রকাশ করিবেন বলিয়া বিগত কয়েক মাসাবধি ষ্টুডিও বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন। সমালোচ্য চিত্র খানি সেই চিত্রাবলীর ১ ম সংখ্যা।

যে চৈতন্য ভক্তির পরম তত্ত্ব এবং মুক্তির সহজ উপায় দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং যাঁহার মধুর মৃদঙ্গ সহকৃত হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যাবাসী হিন্দু ও মুসলমান, নর ও নারী, বালক ও বৃদ্ধ উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল, নবদ্বীপে সেই মহাপুরুষের সঙ্কীর্ত্তন এই চিত্রের বিষয়।

এই চিত্র দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষু প্রেমাশ্রু সমাকুল হইয়াছিল। চিত্রখানি মনে করাইয়া দিল, এই শ্রীভ্রষ্ট হীন বঙ্গদেশ আজি নগণ্য। কিন্তু বঙ্গদেশ যদি কোন বিষয়েরই গৌরব করিতে না পারে, এবং বঙ্গসন্তান যদি কোনই গর্ব্বজনক বিষয় দেখিতে না পায়, তথাপি বিচার স্থলে যদি তাহারা চৈতন্যের অপূর্ব্ব চরিত্র কীর্ত্তন করিতে পারে, অথবা তাঁহার সেই মোহন চিত্র প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে এবং তাহারা জ্ঞানবানগণ কর্ত্তৃক অবশ্যই সমাদৃত হইবে। ভক্তির কি অসাধারণ ক্ষমতা এবং সাম্যমন্ত্রের কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, তাহা মহাপ্রভু প্রতি কার্য্যেই সতত দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রেমোন্মত্ত গৌরাঙ্গ হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত দল বল সহ বাহির হইয়াছেন, তাহার মৃদঙ্গ-ধ্বনি যাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে সে তখনই আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইতেছে—শাস্ত্র চিন্তা নিমগ্ন অধ্যাপক ব্যস্ততা সহ হস্তস্থ পরম পবিত্র পুঁথি পদ-বিদলিত করিয়াই বাহিরে আসিতেছেন, রাখাল গাভী সকলের দশা কি হইবে তাহা ভুলিয়া গিয়া অমনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে, কৃষক হল ও বলীবর্দ্দ ত্যাগ করিয়া করতালি দিতে দিতে দৌড়িতেছে, গৃহকর্ম্ম নিরতা পুরস্ত্রী যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনি অবস্থায় বাহিরে আসিতেছে, ভাল করিয়া অঙ্গাচ্ছাদন করিতেও তাহার মনে হইতেছে না; ক্রীড়াশীল বালক অনেক সকলই ভুলিয়া গিয়া হরিপ্রেমপরায়ণ সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে নাচিতে ছুটীতেছে; রোগী গড়াইতে গড়াইতে বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে এবং ভক্তগণ পদসম্পৃক্ত রজঃ সুখের মূল জ্ঞানে ভক্তি সহকারে মাথায় মাখিতেছে ও উদরস্থ করিতেছে; প্রেমালিঙ্গন বদ্ধ যুবক যুবতীর বাহু শিথিল হইয়া যাইতেছে, তাহাদের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন

খুলিতেছে, তাহারা পার্থিব প্রেম, সৌন্দর্য্যরূপ সকলই ভুলিতেছে এবং সেই হরিনামামৃত পান করিয়া হৃদয় পবিত্র করিবার নিমিত্ত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। কি চমৎকার ব্যাপার! কি অপূর্ব্ব কাণ্ড! আমাদের এই পরপদাহত—দলিত—দুর্ব্বল বঙ্গেই কি এই অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল?

আর্টষ্টুডিও কৃত মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন বিষয়ক চিত্রখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। যাহার যেরূপ ভাব হওয়া আবশ্যক তাহা চিত্রে উত্তম রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রখানি আয়তনে বড় সুতরাং বাঁধাইয়া রাখিলে এবং ভিত্তি গাত্রে লম্বিত হইলে ইহা যে বিশেষ শোভাজনক হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমাদের যে সকল কুল-পুরুষেরা কথোপকথন কালে পনের আনা ইংরাজী না বলিয়া থাকিতে পারেন না, বাঙ্গালায় দুই ছত্র এক খানি পত্র লিখিতে হইলে যাঁহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিতে হইলে যাঁহারা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হন, তাঁহারা বাঙ্গালা বিষয়ের, বাঙ্গালী কৃত, বাঙ্গালা ছবি (?) দিয়া ঘর সাজাইতে চাহিবেন কি? তাঁহারা এমন কাপুরুষ নহেন!

সংকীর্ত্তন চিত্রের সহিত একটী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল কবিতা দেওয়া হইয়াছে। কাজটা ভাল হয় নাই। হিমালয়ের বোধ জন্মাইবার নিমিত্ত যদি পথপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র এক উপলখণ্ড প্রদর্শিত হয়, অথবা প্রচণ্ড দাবানল বুঝাইবার নিমিত্ত যদি ক্ষুদ্র এক খদ্যোতিকা উপস্থাপিত করা হয়, অথবা নায়েগ্রার জলপ্রপাত হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত ভৃঙ্গার বিমুক্ত জলের তুলনা করা হয়, তাহা হইলে তদ্রূপ কার্য্য যেরূপ হাস্যাস্পদ হয়, বর্ত্তমান অঙ্গহীন, অস্ফুট, নির্জীব কবিতা দ্বারা এই অচিন্তনীয়, কল্পনাতীত ব্যাপার বিবৃত বা ব্যক্ত করাইবার চেষ্টাও তাদৃশ অযৌক্তিক। যদি এই যথার্থ কবিত্বোপযোগী বিষয়ের সহিত কবিতা নিতান্তই দিতে হয় তাহা হইলে তজ্জন্য ক্ষুদ্র কবির ক্ষুদ্র লেখনীর শরণাপন্ন হওয়া নিতান্ত অবিবেচনার কর্ম্ম। এ কবিতা লিখিতে মিল্টন, কালিদাস বা শেক্ষপীয়ের আবশ্যক।

—oo—

বৈষয়িক তত্ত্ব। (রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য জ্ঞান প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানাবিষয়ক মাসিক পত্র) ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। তাহিরপুর দাতব্য-কৃষিকার্য্যালয় হইতে শ্রীরামপ্রসাদ তালুকদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা —সত্যযন্ত্রে শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার-কর্ত্তৃক মুদ্রিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

কি অভিপ্রায়ে এই নূতন পত্র খানি সাহিত্য সংসারে আবির্ভূত হইল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশে ব্যক্ত আছে;—

"সংক্ষেপে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, সাংসারিক জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়-কার্য্য সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আলোচনা ও আন্দোলনের জন্য এ পত্রিকা প্রকাশ করা যাইতেছে এবং যে যে বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বঙ্গের পার্থিব সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই বিষয়ের প্রতি আমাদের অধিক দৃষ্টি থাকিবে।"

সুতরাং বৈষয়িক তত্ত্বের উদ্দেশ্য যে অতি উচ্চ তাহায় আর কোনই সন্দেহ

নাই। এক্ষণে দেখা যাউক বৈষয়িক তত্ত্ব প্রথম সংখ্যায় উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃত-কার্য্য হইয়াছেন।

'রাজনৈতিক বর্ণপরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধ সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। লেখক স্বীয় অভিপ্রায় সরল ভাবে ব্যক্ত করিতে বিশেষ নিপুণ। এই প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিত আছে, 'রাজনীতি শাস্ত্রের সর্ব্ব-প্রথম পাঠ' স্বদেশানুরাগ।' আমরা একথায় অনুমোদন করি না। স্বজাতিপ্রিয়তাই রাজনীতির মূল ভিত্তি। যদি লেখক মহাশয় স্বদেশানু-রাগ ও স্বজাতি প্রিয়তা সমার্থ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার শব্দার্থ-বিশ্লেষণে ভ্রান্তি ঘটিবে। আর এক স্থানে দেখি-লাম,—

"যেমন ভাষার বর্ণমালায় "ক" বাদ দিয়া, "খ" হইতে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শিক্ষার সুবিধা হয় না, তেমনি রাজনীতি বর্ণমালারও "ক" প্রথম অভ্যাস না করিলে সমস্ত শ্রম অনর্থক নষ্ট হয়।"

এ তুলনা বড় ভাল হয় নাই। 'ক' না হ-ইয়া 'খ' যদি প্রথম হইতে বর্ণমালার আদ্যক্ষর রূপে পরিগণিত হইত, তাহা হইলে কোনই দোষ বা অসুবিধা ঘটিত না। কিন্তু রাজ-নীতির যাহা মূল ভিত্তি তাহা অপরিবর্ত্ত-নীয়—সভ্য বা অসভ্যাবস্থায়, প্রথমে বা শেষে সর্ব্বকালেই তাহা সমান। হৃদয়ের স্বজাত প্রবৃত্তি ২০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে যেমন ছিল, আজি তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও তেমনিই থাকিবে।

"প্রভার সহিত দুই ঘণ্টা (রাজনৈতিক উপন্যাস)" এই নাম দিয়া এক অদ্ভুত প্রবন্ধ প্রকাশিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ 'প্রভার সহিত দুই ঘণ্টা' ইহার অর্থ কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না এবং ইহা ইংরাজি কি বাঙ্গালা তাহা আমরা মীমাংসা করিতে পারিলাম না। দেব পূজা কালে পুরোহিত মহাশয়ের বাম করে যেরূপ ঘণ্টা শোভা পায়, প্রভার সহিত সেইরূপ দুইটী ঘণ্টা ছিল এবং সেই ঘণ্টা থাকায় কি হইয়াছিল, বা তৎসংক্রান্ত অন্য বৃত্তান্ত যদি প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় হয় তাহা হইলে ইহা বাঙ্গালা বটে। কিন্তু যদি দুই ঘণ্টা পরিমিত কাল প্রভার সহিত কথোপকথন বা অবস্থানাদি বর্ণন করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এটী খাটি ইংরাজি হই-য়াছে। প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝিলাম ইহা ইংরাজিই বটে। যদি লেখক মহাশয় 'প্রভার সহিত দুই ঘণ্টা' না লিখিয়া 'Two Hours with Prava' লিখিতেন তাহা হইলে লোকের বুঝিতে কষ্ট হইত না। সম্পাদক এই ইংরাজি শিরোনাম যুক্ত প্রবন্ধের একটা ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে,—

"বৈষয়িক তত্ত্বের অনুষ্ঠানপত্রে উপ-ন্যাস কাব্য ইত্যাদির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আমরা এরূপ আংশিক মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে অসার কল্পনাজাত উপ-ন্যাস নবন্যাসাদি হইতে এই পত্রিকাকে যত-দূর সম্ভব দূরে রাখা হইবে ;—এবং এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় উপন্যাস আদি কখন প্রকাশ করিতে আমাদের ইচ্ছাও ছিল না।"

তাহার পর নানারূপ অনুরুদ্ধ হইয়া, কারণে ও অকারণে, দায়ে ঠেকিয়া এই উপন্যাস প্রবন্ধ করা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় উপন্যাসের যতটুকু নমুনা এবার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, ইহা ছেলেমি হইতেছে। আমাদের বোধ

হয়; এরূপ উপন্যাস লিখিয়া কাগজের অবয়ব পূরণ করা নিতান্ত অবৈধ। ইহাতে রাজও নাই, নৈতিকও নাই এবং উপও নাই, ন্যাসও নাই। ইহা এক অদ্ভুত সামগ্রী। সম্পাদক মহাশয় 'অসার কল্পনাজাত উপন্যাসের' অন্ততঃ একটা সুপাঠ্য পরিচ্ছেদও প্রকাশ করিতে পারিলেন না। ইহা বস্তুতঃই দুঃখের বিষয়। তাঁহার জানা উচিত যে 'উপন্যাস কাব্য' অতি উচ্চ বিষয় এবং যাহার ইচ্ছা সেই তাহাতে হাত দিবে ও সার ওয়াল্টার স্কট বা উইলিয়াম শেক্সপীর বা কালিদাস হইয়া পড়িবে, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। তিনি যাহা 'অসার' মনে করিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে তৎসমস্তের অপেক্ষা শিক্ষাবিধায়ক ও জ্ঞানবর্দ্ধক গ্রন্থ আর কি আছে? এক হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, লীয়ার পাঠ করিয়া হৃদয়ের যে উন্নতি হইবে, মানব চরিত্রে যে অভিজ্ঞতা জন্মিবে, এবং স্বীয় অপূর্ণতা যেরূপ হৃদ্গত হইবে, বৈষয়িক তত্ত্ব শতবর্ষ নিরন্তর বক্তৃতা করিয়াও তাহা সাধিত করিতে পারিবেন না। দৃষ্টান্ত উপদেশ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। কাব্য উপন্যাস কেবল শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত সকলের সারসঙ্কলন মাত্র। অতএব কাব্য উপন্যাস বর্ত্তমান কালে,— সহৃদয়তার অভাব হেতু এই দুর্দ্দশার সময়, আমাদের প্রধান আলোচ্য হওয়া উচিত। তাহার প্রতি অননুরাগ দেখাইলে কেবল আপনার অপূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। ভাল নাটক, ভাল উপন্যাস এরূপ পতিত দেশের লোকের পাঠার্থ, স্বয়ং লিখিতে না পারিলেও, নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

'গোয়ালিনীর সুমিষ্ট উত্তর' নাম দিয়া সেই সর্ব্বজন জ্ঞাত, চিরপ্রচলিত, শুষ্ক রসিকতার অবতারণা কেন করা হইল, তাহা বলিতে পারি না। 'রাজা নবালচাঁদের দান' প্রবন্ধেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলাম না। কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক জীর্ণ সংবাদ কেন সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না।

'রেসমের ব্যবসায়', 'গৃহস্থালী', 'গোয়ালঘর' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি এ পত্রের বিশেষ উপযোগী এবং প্রশংসনীয়। 'বাঙ্গালা দেশের জন্য নূতন লাভকর ব্যবসায়' শীর্ষক প্রবন্ধ সকলেরই পাঠ করা উচিত। লর্ড রীপণের জীবন চরিত ক্রমশঃ বৈষয়িক-তত্ত্বে প্রকাশিত হইবে; এবার কেবল তাহার সূচনা এবং লর্ড রীপণের একখানি ছবি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ছবি খানি অতি সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু সে প্রশংসা কলিকাতা আর্ট-ষ্টুডিওর প্রাপ্য।

'বৈষয়িক তত্ত্বের' অবয়ব ডিমাই ৪ পেজী ১০ ফর্ম্মা। ইহার মুদ্রাকার্য্য পরিষ্কার রূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

'বৈষয়িক তত্ত্ব' যদি সর্ব্বজন প্রয়োজনীয় প্রবন্ধাদি অধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত করেন, এবং অনর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা হইতে বিরত হন, তাহা হইলে বাস্তবিকই ইহা দ্বারা একটা বিশেষ অভাব বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা। বৈষয়িক তত্ত্বের ভাষা সর্ব্বত্রই পরিষ্কার। আমরা অন্তরের সহিত এই অভিনব পত্রিকার ক্রমোন্নতি কামনা করি।

মরিয়া বাঁচা।

সংবাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, সম্প্রতি কলিকাতার অন্যতর ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত বি, সি, এস্, মহাশয়ের আদালতে একটী রুগ্না স্ত্রীলোক উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ স্ত্রীলোকের আবেদন এই যে, কয়েক দিবস পূর্ব্বে তাহার বসন্ত হয়; তাহার পীড়ার অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া উঠে—অবশেষে সে মৃতবৎ হইয়া পড়ে। যে বাটীতে সে ভাড়াটীয়া রূপে বাস করিত, সেই বাটীর লোক তাহার মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া সৎকারার্থে তাহাকে কলিকাতার নিমতলা ঘাট নামক শবদাহন স্থলে লইয়া যায়। তথায় গঙ্গার সুশীতল বায়ু লাগিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক তাহার শরীরে ক্রমশঃ জীবনের চিহ্ন দেখা যায়। তাহার পর সে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হয়। সে সেই অবস্থায় বাটী ফিরিয়া আইসে। কিন্তু গৃহস্বামিনী তাহাকে ভূতাশ্রিতা মনে করিয়া বাটীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই এবং তাহার জিনিষ পত্রও ফিরাইয়া দিতে চাহে নাই। সে নিরুপায় হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার জিনিষ পত্র উদ্ধারার্থে রাজকীয় সহায় প্রার্থনায় উপস্থিত।

এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিস্ময়জনক হইলেও নিতান্ত বিরল নহে। আমরা এতাদৃশ দুই একটী ঘটনার বিবরণ প্রাচীন জনগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। কৃষ্ণনগরে এক বস্ত্রব্যবসায়ী দীর্ঘকাল জ্বর ভোগের পর হঠাৎ একদিন মৃতবৎ হয়। তাহাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া আত্মীয়গণ তাহার দেহ যথারীতি বন্ধন করিয়া ৩ ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরস্থ শ্মশান ঘাটে লইয়া যায়। তথায় মরার বন্ধনাদি বিমুক্ত করিয়া সঙ্গের লোকজন অদূরে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিল; কেবল একজন শবের দেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়া রহিল। ইত্যবসরে সেই সংজ্ঞাশূন্য দেহে জীবন দেখা দিল। ভয়ে সঙ্গের লোক জন যে যে দিকে পাইল পলাইয়া গেল। তাহার পর সেই ব্যাধি-ক্লিষ্ট কাতর ব্যক্তি বহু কষ্টে, নানা উপায়ে বাটী ফিরিয়া আসিল। এই মূল প্রসঙ্গ যদিও লোক মুখে নানা প্রকার পল্লবিত ও নানা বৈচিত্র্য সংযুক্ত হইয়াছে, তথাপি অমূলক অংশ সকল পরিত্যাগ করিয়াও যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা অতীব বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। এই বৃত্তান্ত সেই পুনর্জ্জীবিত ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি।

বস্তুতঃ সময়ে সময়ে দেহ এমন ভাবাপন্ন হয় যে, তখন তাহাকে মৃত বলিয়াই বোধ হয়। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রকারেরা মৃত্যুর পর অন্ততঃ দ্বাদশ দণ্ড অপেক্ষা করিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে এরূপ মরিয়া বাঁচা সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করে এবং ইংরাজি গ্রন্থ বিশেষে এতাদৃশ ঘটনার, এমন কি ইচ্ছা মৃত্যুর, দৃষ্টান্ত পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে মৃত্যুর পর দেহ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে হঠাৎ

মৃতবৎ অবস্থা ঘটিলে বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। কারণ প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তিকে মুক্ত বায়ু মধ্যে দিয়া বহুক্ষণ বহন করা হয়, তাহার পর তাহাকে নদী-তীরে শায়িত করান হয়, তথায় তাহাকে শীতল জলে স্নান করান হয়, তাহার বদনে অগ্নি-বর্ত্তিকা প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে চিতানলে দগ্ধ করিবার আয়োজন করা হয়। যদি তাহার দেহে কিঞ্চিৎমাত্রও জীবনী শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে এই সকল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সে শক্তি উত্তেজিত করাই সম্ভব। কিন্তু মৃত্যুর পর দেহ ভূমধ্যে প্রোথিত করা যাঁহাদের ব্যবস্থা, সে জাতির মধ্যে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নিতান্ত সৌভাগ্যশালী না হইলে, পুনর্জ্জীবিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আমরা সুবিখ্যাত ব্ল্যাক্‌উড্‌স্ ম্যাগাজিন্ (Blackwood's Magazine) নামক মাসিক পত্র হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটী সংগ্রহ করিলাম ;—

যাঁহার জীবনে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল তিনি নিজের কাহিনী নিজে বর্ণনা করিতেছেন :—

"কিছু দিন হইতে আমি জীর্ণ জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার দেহের শক্তি বিগত হইতে লাগিল। কিন্তু যতই আমার জীবনী-শক্তি অন্তর্হিত হইতে লাগিল, ততই আমার জ্ঞান তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম, চিকিৎসক আমার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইতেছেন এবং বন্ধু বান্ধবের বিষণ্ণ বদন দেখিয়া ও অস্ফুট কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, ইহ জগতে আমার কাল পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

এক দিন অপরাহ্ণ কালে চরম কাল উপস্থিত হইল। [illegible] হইতে লাগিল এবং [illegible] শাঁ শাঁ [illegible] হইতে লাগিল। কিয়ৎ[illegible] বিজাতীয় গোলমাল আমাকে বিচেতন করিল। সেই গোলমাল ভাবটা তখনই অন্তরিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান ও চৈতন্য সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাগত হইল। কিন্তু কোন প্রকার দৈহিক শক্তি আমার থাকিল না। চারিদিকে পৌরজনেরা আমার মৃত্যু হেতু রোদন করিতে লাগিল। আমি সকলই বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু আমার এমন শক্তি নাই যে, একবার হাত নাড়িয়া, কি একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বা একবার চক্ষের পাতা বুজিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিই যে, আমি জীবিত আছি। কিয়ৎকাল পরে একজন আত্মীয় আমার নিকটস্থ হইলেন এবং আমার মুখে হাত দিয়া আমার চক্ষু বুজাইয়া দিলেন। বিশ্ব সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার হইয়া গেল। কিন্তু আমার জ্ঞান ও শ্রবণ শক্তির কোনই অন্যথা হইল না।

লোকের কথা শুনিতে না পাওয়ায় বুঝিতে পারিলাম যে, আমার বন্ধু বান্ধবগণ প্রস্থান করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে অন্ত্যেষ্টিকগণ (undertakers) সমাগত হইয়া আমাকে সমাধির উপযুক্ত পরিচ্ছদে আবৃত করিল এবং আমাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া তাহারা যথেচ্ছা দেহটা নাড়া চাড়া করিল। তাহাদের তৎসাময়িক হাস্য পরিহাস ও কৌতুক শুনিয়া ও তাহাদের হৃদয়হীনতা দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম।

বন্ধু বান্ধবের দেখা আরম্ভ হইল। তিন দিন আমাকে সেইরূপে ফেলিয়া রাখিল। তৃতীয় দিনে একজন বন্ধু বলিলেন, 'ঘরে পচা গন্ধ বাহির হইয়াছে।'

সমাধি-পেটিকা (coffin) অনীত হইল, আমাকে তুলিয়া তাহার ভিতরে রাখিল। আমার একজন বন্ধু সেই কাষ্ঠময় বাক্সের ভিতর আমার মাথায় একটা বালিশ দিয়া দিলেন, তাঁহার নেত্র-নিঃসৃত এক বিন্দু অশ্রু আমার মুখের উপর পড়িল।

বাক্সের ডালা বন্ধ করিবার পূর্ব্বে যে যে আমাকে ভাল বাসিত সকলে আসিয়া জন্মের শোধ আমাকে একবার দেখিয়া লইল। তাহার পর সকলে চলিয়া গেল। তখন অন্ত্যেষ্টিকগণ বাক্সের উপর ডালা চাপাইয়া দিল, তাহার পর স্ক্রু দিয়া ইহকালের মত ডালা আঁটিয়া ফেলিল।

তাহার পর আমাকে সেই অবস্থায় একা ফেলিয়া রাখিয়া সকলেই চলিয়া গেল। বুঝিলাম এখনও আমার সমাধি হয় নাই—এখনও আমার ভরসা আছে।

সমাধির সময় উপস্থিত হইল। সমাধি-পেটিকা তুলিয়া স্কন্ধে লইয়া চলিল। বহু সংখ্যক লোক আমার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরে সকলে স্থির হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে সমাধি পেটিকা নামাইয়া কবরের মধ্যে স্থাপিত করিল। তখন আমার অবস্থা? বর্ণনা করিয়া তাহা কি বুঝা না যায়? একবার নড়িবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না।

তখনই সেই সমাধি পেটিকার উপর কয়েক মুষ্টি মাটী পড়িল। তাহার পর কোদাল দিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া মাটি ফেলিয়া সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিল। আমি কোন চেষ্টা করিতে পারিলাম না। আমার জীবন্ত সমাধি হইল। কোদাল দ্বারা উপরকার মাটী চাপিয়া সমান করিতে লাগিল তাহারও শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাহার পর সকলই নিস্তব্ধ হইল।

কতকাল সেইরূপ অবস্থায় থাকিলাম তাহা আমি জানি না—জানিবার কোনও উপায়ও ছিল না। মনের কি অবস্থা তাহা কি বলিব? এই দেহ এখনই পচিতে আরম্ভ হইবে, কীটকুল আসিয়া মহানন্দে আমার এই দেহ ভোজন করিতে থাকিবে! এই আমার অনন্ত শয্যা—বাহ্য জগতের সহিত আর আমার সম্বন্ধ নাই। এইরূপ চিন্তায় যখন আমি মগ্ন, তখন হঠাৎ একটা শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। মনে ভাবিলাম বুঝি মূষিক আমার দেহ গ্রাস করিতে আসিতেছে। শব্দ ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইতে লাগিল। ভাবিলাম হয়ত আমার বন্ধুগণ হয়ত আমার সজীব সমাধির বিষয় জানিতে পারিয়াছে এবং আমাকে উদ্ধারার্থে কবর খনন করিতেছে। কি মধুর আশা।

শব্দ থামিল। কে যেন আমার গলায় হাত দিয়া ধরিল, জন দুই লোক আমার মাথা ও পা ধরিয়া আমাকে বাহিরে আনিল। সুশীতল উন্মুক্ত বায়ু আবার আমার দেহ স্পর্শ করিল। লোকেরা আমাকে লইয়া গিয়া একটা কি জিনিষের উপর ফেলিল। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, সেখানা গাড়ি। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, সমাহিত ব্যক্তির দেহ বিক্রয় করিয়া যে শ্রেণীর লোক জীবিকা পাত করে, এ দুই ব্যক্তি সেই শ্রেণীর লোক।

গাড়ি চলিয়া চলিয়া এক স্থানে আসিয়া থামিল। লোক দুইটা আমাকে গাড়ির মধ্য হইতে বাহির করিয়া আনিল;

তাহার পর আমার দেহের বস্ত্রাদি সমস্ত খুলিয়া আমাকে উলঙ্গ করিয়া একটা স্থানে রাখিয়া দিল। অনুমান হইল একটা কুঠরির মধ্যে এক খান টেবিলের উপর আমাকে শুয়াইয়া রাখিয়াছে। অভ্যাগত দুইজন লোকের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে সেই রাত্রে শিক্ষার্থীগণের পরীক্ষার্থে আমার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে।

আমার চক্ষু তখনও বন্ধ, সুতরাং আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু পায়ের শব্দে ও কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিলাম যে, শিক্ষার্থীগণ্ সমবেত হইতেছে। অবশেষে শিক্ষক আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ছুরিকার দ্বারা মৃত দেহ খণ্ড খণ্ড করিবার পূর্ব্বে শিক্ষক মহাশয় একবার শিক্ষার্থীগণকে মৃত শরীরে তাড়িতের ক্রিয়া দেখাইতে অভিলাষী হইলেন। তদর্থে তখনই তথায় তাড়িত যন্ত্র স্থাপিত হইল। তাড়িত প্রবাহ আমার স্নায়ু-মণ্ডলকে বিষম আন্দোলিত করিল। ছাত্রগণ আমার শরীরে তাড়িতের কার্য্য দেখিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। দ্বিতীয়বার আমার দেহে তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত হইবামাত্র আমার নেত্রদ্বয় খুলিয়া গেল, কিন্তু আর কোন রূপ শক্তি পুনরাগত হইল না। আমার রোগকালে যে চিকিৎসক মহাশয় আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, আমি প্রথমেই তাঁহারই মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম; দেখিলাম অনেক ছাত্রও আমার পরিচিত। অনেকে আমাকে চিনিতে পারিল এবং দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি কিন্তু আগেও যেমন মরা, তখনও তেমনি মরা।

মৃত শরীরে তাড়িতের কার্য্য পরীক্ষা শেষ হইলে শিক্ষক ছুরিকা গ্রহণ করিলেন এবং তাহার অগ্রভাগ আমার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিলেন। আমার সমস্ত শরীর জ্বালায় অধীর হইয়া উঠিল, আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। উপস্থিত লোক সকল চীৎকার করিয়া উঠিল, আমার মরণের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, আমার বিলুপ্ত শক্তি সহসা পুনরাগত হইল। আমাকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত বহুবিধ যত্ন করা হইল এবং প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে আমি মরণের পূর্ব্বে যেমন ছিলাম, তেমনি হইয়া উঠিলাম।

ফরাসী ভাষায় 'কাজেস্ সিলিবিস্' (Causes Celibes) নামক এক অতি কৌতুহল জনক পুস্তক আছে। ঐ পুস্তকে ফরাসী আদালতের বিস্ময়াবহ মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। এই মনোহর গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে নিম্নলিখিত অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

প্যারীস্ নগরে দুই জন বণিক পরস্পর নিতান্ত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের একজনের একটী পুত্র, অপরের একটী কন্যা সন্তান ছিল। সেই বালক বালিকার হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই পবিত্র প্রণয় অঙ্কুরিত হয় এবং কালে সেই প্রণয় সম্বর্দ্ধিত হইয়া অবিচ্ছেদ্যভাব ধারণ করে। যখন যুবক যুবতী বিবাহ-পাশে বদ্ধ হইয়া ভূতলে স্বর্গ-সুখ সম্ভোগের কল্পনায় চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন, সেই সময় একজন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বৃদ্ধ যুবতীর পা[illegible]র্থ উপস্থিত হইলেন। যুবতীর জনক [illegible] ধনসম্পত্তির লোভ ত্যাগ করিতে [illegible] কন্যাকে নবাগত পাত্রের হস্তেই স[illegible]লেন। যখন বিবাহ হইয়া গেল তখন [illegible] ভিন্ন অপর

কাহারও বিষয় চিন্তা করা মহাপাপ মনে করিয়া যুবতী পূর্ব্ব প্রণয়ীর সহিত সাক্ষাতাদি চিরকালের নিমিত্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু হৃদয়কে দমন করা তাদৃশ সহজ কার্য্য নহে। অবক্তব্য ক্লেশ-ভারে সুন্দরীর হৃদয় প্রপীড়িত হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ নানাপ্রকার ব্যাধি আসিয়া কামিনীর কোমল কায়া অকালে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। সুন্দরীর মৃত্যু ও সমাধি হইল। তাঁহার পূর্ব্ব প্রণয়ীর দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি হৃদয়ে এক দুরাশা পোষণ করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ছিলেন। সে আশা—সুন্দরীর সম্ভাবিত বৈধব্য। কিন্তু অকাল মৃত্যু হেতু সকল আশাই বৃথা হইল। যুবকের মনে হইল, যুবতীর একবার ভয়ানক মূর্চ্ছা হইয়াছিল, সে মূর্চ্ছায় মৃত্যু লক্ষণ সকলই প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সে ভাব বহুক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল। যুবক ভাবিলেন হয়ত এবারও সেইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া তিনি সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং সমাধি রক্ষককে উৎকোচ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া কবর হইতে শব উত্তোলন করিলেন। তাহার পর নানাবিধ যত্ন ও বহুপ্রকার প্রক্রিয়ায় সুন্দরীর সেই শীতল শরীরে পুনরায় উষ্ণতা এবং ক্রমশঃ অন্যান্য জীবনের লক্ষণ আবির্ভূত হইল। প্রণয়ী যুগলের আনন্দের ও সুখের সীমা রহিল না। তাঁহারা বিবাহ করাই স্থির করিলেন, কিন্তু পাছে ফ্রান্সে থাকিলে কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। দশ বৎসর কাল ভিন্ন রাজ্যে বাস করার পর তাঁহাদের অন্তরে স্বদেশ দর্শনের বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। ফ্রান্সে আগমনের অত্যল্পকাল পরে সুন্দরীর পূর্ব্ব স্বামী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে আপনার স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারিলেন। তিনি আপনার স্ত্রীর দাবি করিয়া বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন। যখন স্ত্রীর পূর্ব্বস্বামী স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে স্থির নিশ্চয় করিয়া তাঁহার সমাধি করিয়াছেন, তখন এ স্ত্রীর উপর তাঁহার সর্ব্বপ্রকার স্বত্ব ও অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং যে ব্যক্তি সে স্ত্রীকে কবর হইতে তুলিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে, সেই এক্ষণে স্ত্রীর প্রকৃত অধিকারী ও স্বত্ববান বলিয়া প্রণয়ী যুবক আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। কিন্তু বিচারকেরা এরূপ যুক্তি অসঙ্গত মনে করিলেন। পাছে বিচারকেরা কোন অপ্রীতিকর আদেশ দেন, এই আশঙ্কায় যুবক যুবতী জন্মের মত জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিলেন।

এক্ষণে অস্বাভাবিক উপায়ে মৃত্যুর পরও যে সময়ে সময়ে মানুষ বাঁচিতে পারে তাহার একটী ঘটনা নিম্নে লিখিত হইতেছে। সার্জ্জন গ্লবর (Surgeon Glover) এই ঘটনায় বহুযত্নে মৃত দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই কর্ত্তৃক এই ব্যাপার প্রচারিত হইয়াছে;—

আয়রলাণ্ডের অন্তপাতী কর্ক নগর নিবাসী প্যাট্রিক রেড্ মণ্ড্ নামক এক ব্যক্তির ফাঁসির আদেশ হয়। যেদিন ফাঁসি হইবে তাহার পূর্ব্বরাত্রে ডাক্তার গ্লবর, ডাক্তার স্লে এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ঘটনাক্রমে একস্থানে উপস্থিত ছিলেন। ডুবিয়া মরা বা ফাঁসি দ্বারা মরা লোককে বাঁচাইবার যত উপায় হইতে

পারে তাহা সেই সভায় প্রসঙ্গত: আলোচিত হইল। সলিভান নামক সেই মণ্ডলীস্থ একজন ভদ্রলোক প্রস্তাব করিলেন, কল্য যাহার ফাঁসি হইবে, তাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে হইবে। গ্লবর স্বীকৃত হইলেন। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে রেড্‌মণ্ডের ফাঁসি হইল। প্রথম ৩।৪ মিনিট কাল রেড্‌মণ্ড্ নড়িয়া ছিল। তাহার পর ২৯ মিনিট কাল সে ফাঁসি কাষ্ঠে সমান লম্বিত ছিল এবং জীবনের কোন চিহ্নই তাহাতে বর্ত্তমান ছিল না। তাহার পর সেই মৃত-দেহ ফাঁসি কাষ্ঠ হইতে নামাইয়া সন্নিহিত প্রান্তরে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় ডাক্তার গ্লবর তাহার একটী শিরা কাটিয়া দেখিলেন রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া এককালে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং রক্ত সকল চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে। বহুলোক সমবেত হইয়া বেলা দুইটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত তাহার শরীরের নানাস্থানে নিরন্তর নানা-বিধ উত্তেজক ঔষধ মর্দ্দন করিতে লাগিল; তাহার পর ডাক্তার গ্লবর বায়ুকোষে একটা ছিদ্র করিয়া ধীরে সুকৌশলে তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে মৃতদেহে অল্প অল্প রক্তের গতি হইল এবং বাহুমূলে একটু ক্ষীণ নাড়ী বুঝা যাইতে লাগিল। এমন সময় সংবাদ আসিল যে, রাজ-বিচারে যাহার প্রাণ-দণ্ড হইয়াছে তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করা হইতেছে শুনিয়া রাজকর্ম্মচারী দেহ লইয়া যাইবার জন্য কয়েকজন সৈনিক পাঠাইয়া দিতে-ছেন। এই সংবাদ পাইয়া লোক সকল দ্বিগুণিত যত্নে রেড্‌মণ্ডের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহাদের পরিশ্রম ক্রমেই সফল হইতে লাগিল। রেড্‌মণ্ডের দেহে যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালন আরম্ভ হইল। বক্ষ দেশস্থ ছিদ্র-পথ দিয়া অনেক রক্ত বাহির হইতেছে দেখিয়া ডাক্তার গ্লবর সুকৌশলে তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর একটা উত্তে-জক ঔষধ বারম্বার রেড্‌মণ্ডের বদনে ও নাসিকায় প্রক্ষেপ করিতে করিতে সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

পাছে রাজদূতগণ রেড্‌মণ্ডকে কাড়িয়া লইয়া যায় এই আশঙ্কায় শুশ্রূষাকারিগণ তাহাকে চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে গ্রামা-ন্তরে বহন করিয়া লইয়া গেল। তথায় রেড্‌মণ্ডকে একটা আস্তাবলের মধ্যে ঘাস পাতিয়া বসাইল। এই স্থানে রেড্‌মণ্ড্ অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ উষ্ণজল ও সুরা পান করিল। তাহার সর্ব্বশরীর নিরন্তর ঘর্ষণ হেতু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল। গ্লবর তাহাকে এই অবস্থায় তাহার বন্ধুদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া আসিলেন। দুই দিনের পর রেড্‌মণ্ড্ সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইয়া উঠিল। সে রাজদূতদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার আশয়ে পরদিন ৪ ক্রোশ হাঁটিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। সে জীবনের অবশিষ্ট কাল স্বচ্ছন্দ শরীরে ক্লেয়ার কাউণ্টীতে বাস করিয়াছিল।

নিম্নলিখিত ব্যাপারটী সার আষ্টলি কূপার (Sir Astley Cooper) বক্তৃতা কালে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, সময়ে সময়ে মানবের এমন অবস্থা হয় যে, মরা বাঁচা উভয়েরই বাহির। আমরা স্থির নিশ্চিত মৃত্যুর পর জীবন প্রাপ্তির কয়েকটী দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিলাম। এক্ষণে না মরা, না বাঁচার একটী ঘটনা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

সার আষ্টলি কূপার বক্তৃতাকালে

বলিতেছেন, "যে ঘটনা আমি উল্লেখ করিতেছি তাহা শারীর বিধান শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা উভয়তঃই অতীব বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। বিগত যুদ্ধের সময় একজন লোককে রাজকীয় জাহাজে গ্রহণ করা হয়। যখন জাহাজ ভূমধ্যসাগরের মধ্যে তখন ঐ ব্যক্তি দৈবাৎ একদিন জাহাজের ছাত হইতে ডেকের উপর পড়িয়া যায়। তাহাকে তুলিয়া দেখা গেল সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অচেতন। জিব্রালটারে জাহাজ পৌঁছিলে তাহাকে তত্রত্য হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ রাখা হইল। সে কয়েক মাস অচৈতন্য অবস্থায় তথায় থাকিল। জিব্রালটার হইতে ডলফিন নামক জাহাজে করিয়া তাহাকে ডেপ্‌টফোর্ড নামক স্থানে লইয়া আসা হইল—সে তেমনি অচেতন। সে স্থান হইতে সরটমাস্‌ নামক হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া তাহাকে ক্লাইন নামক ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে রাখা হইল। তের মাস কয়েক দিবস সে ব্যক্তি না মরা না বাঁচা অবস্থায় থাকিল। তাহার নিশ্চয়ই জীবন ছিল, কিন্তু কোন প্রকার ইচ্ছা, বা জ্ঞান, বা কোন কার্য্যক্ষমতা এককালে ছিল না। বর্ষাধিক কাল এইরূপ ভাবে থাকার পর ডাক্তার ক্লাইন তাহার মস্তকের কোন স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। একদিন বেলা ১ টার সময় ক্লাইন সাহেব অভিপ্রেত স্থানে অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেন। তাহাতে অতি বিস্ময়জনক ফলোৎপত্তি হইল। বেলা চারিটার সময় সার আষ্টলি কুপার সেই ব্যক্তির শয্যা-পার্শ্বে গিয়া দেখিলেন সে উঠিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম শরীরের কোন স্থানে তাহার বেদনা বোধ হইতেছে কি না, সে তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিল। ৪ দিন পরে সে বেড়াইতে ও কথা কহিতে আরম্ভ করিল। সে আত্মবৃত্তান্ত সমস্তই বর্ণনা করিল কিন্তু তাহার পড়ার দিন হইতে অস্ত্র-প্রয়োগের দিন পর্য্যন্ত বর্ষাধিক কালের মধ্যে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বিন্দু বিসর্গও সে বলিতে পারিল না। এই সুদীর্ঘকাল জগতের সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক ছিল না। দৈহিক ও মানসিক শক্তি ধরিয়া বলিতে গেলে এই তের, চৌদ্দ মাস কাল সে ব্যক্তি মরিয়াছিল বলাই সঙ্গত।

মরিয়া বাঁচার নানা প্রকার উদাহরণ আমরা পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এক্ষণে এ সম্বন্ধে একটী জাপান দেশ প্রচলিত উপাখ্যান অবতারণা করিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। সে উপাখ্যানটির সহিত মরিয়া বাঁচার একটু সম্বন্ধ আছে।

করিয়া প্রদেশে চোয়াং নামক পুরুষ এবং হান্‌সি নাম্নী স্ত্রী বাস করিত। এই যুগলের দাম্পত্য প্রেমের সীমা ছিল না। তাহাদের অগাধ প্রেম ও অতুল আনন্দ দেখিয়া সন্নিহিত লোক সকল তাহাদের হিংসা করিত। চোয়াং যখন যেখানে যাইত হান্‌সি তথায়ই ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগমন করিত, এবং হান্‌সি যখন যে আমোদ আহ্লাদে থাকিত, চোয়াং সঙ্গে না থাকিলে তাহার সে সকল কিছুই ভাল লাগিত না। তাহারা পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইত। তাহাদের চুম্বন আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রণয় জ্ঞাপক কার্য্যের বিরতি ছিল না বলি-

লেই হয়। সংক্ষেপতঃ, তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া তাহাদিগকে প্রেমিকের আদর্শ বলিয়াই মনে হইত। এমন অতুল প্রেম কখনই বিনষ্ট হইবার নহে।

একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে চোয়াং একাকী গ্রামের পার্শ্বস্থ গোরস্থানে উপস্থিত হইয়া এক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতে পাইল। দেখিল, একটী শুক্লবসনা সুন্দরী যুবতী পাখা লইয়া যত্ন সহকারে একটী গোরের উপর বাতাস দিতেছে। চোয়াং কোন প্রকারেই এ ব্যাপারের রহস্যভেদ করিতে সমর্থ না হইয়া ধীরে ধীরে সুন্দরীর সমীপগত হইয়া তাঁহার এবম্বিধ কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অশ্রু-ভারাবনত নয়না সুন্দরী বলিলেন, 'মহাশয়, আমার দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমার স্বামীর আজি ২দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। এমন রূপবান, এমন গুণবান, এমন প্রেমিক স্বামী কেহ কখন দেখে নাই। আমাকে স্বামী যে কত ভাল বাসিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; আমিও তাঁহার সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ছিলাম। স্বামী মৃত্যুকালে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, হৃদয়েশ্বরি! অন্ততঃ যত দিন আমার কবরের মৃত্তিকা না শুষ্ক হয়, ততদিন তুমি অন্য বিবাহ করিও না। আমি স্বামীর আদেশ কেমন করিয়া লঙ্ঘন করি? গোর আপনা আপনি শীঘ্র শুষ্ক হইবে না ভাবিয়া আমি অতি যত্নে তাহাতে বাতাস দিতেছি।' চোয়াং শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং মনে মনে যুবতীর বিবাহার্থ ব্যস্ততা দৃষ্টে একটু হাসিল। বলিল,—"আপনাকে শোক-কাতর দেখিতেছি, আপনি আমার বাটীতে আসুন, তথায় আমার স্ত্রী আছেন, তিনি আপনাকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিবেন।' চোয়াং স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়া হান্‌সির নিকট সমস্ত ব্যাপার ব্যক্ত করিল। হান্‌সি শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, 'আমি এরূপ স্ত্রীলোককে কখনই বাটীতে স্থান দিব না। যাহার প্রেমের একটুও দৃঢ়তা নাই, যে স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার বিবাহের নিমিত্ত ব্যস্ত হয়, যে স্বামীর নাম স্মরণ করিয়া জীবন কাটাইতে চাহে না, যে স্বামীর অতুল প্রেমের মহিমা কিছুই বুঝে না সে পাপীয়সীর আমি মুখ দেখিতে চাহি না। সে এখনি আমার বাটী হইতে দূর হউক।' হান্‌সি কোন প্রকারেই এরূপ পাপীয়সীকে গৃহে স্থান দিতে স্বীকার করিল না; অগত্যা বিধবা স্থানান্তরে চলিয়া গেল। চোয়াং সশঙ্কিত ভাবে এই স্ত্রীলোকের ব্যবহার দেখিয়া নিজের অদৃষ্টে না জানি কি বলিয়া একটু ভয় ব্যক্ত করিল। এ কথায় হান্‌সির অভিমানের সীমা রহিল না। হান্‌সি কাঁদিয়া, মাথা খুঁড়িয়া, আছড়িবিছড়ি করিয়া একটা তুমুল কাণ্ড কারখানা করিল। হান্‌সির অগাধ প্রেম—সে প্রেমে কি এ সন্দেহ শোভা পায়?

বিধবা বিদায় হওয়ার এবং হান্‌সির অভিমান শান্ত হওয়ার অনতিকাল পরে চোয়াংয়ের একজন প্রিয় শিষ্য বহুদিন পরে গুরু দর্শনার্থ উপস্থিত হইল। স্বামী ও স্ত্রী বহুদিন পরে শিষ্যকে দেখিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন এবং ভোজের আয়োজন করিয়া দিলেন। মহানন্দে ভোজ চলিতেছে। চোয়াং এবং হান্‌সির আনন্দের সীমা নাই। তাঁহাদের মুখে, কার্য্যে, কথায় অপার ভালবাসা, অকৃত্রিম প্রীতি মাখা। এমন অনুরক্ত পবিত্র দম্পতী আর কি হয়?

কিন্তু ভগবান্ সকল সুখে বাদী হইলেন। হঠাৎ চোয়াং পক্ষাঘাত রোগে জীবনহীন হইয়া পড়িয়া গেল! কত চেষ্টা, কত যত্ন, কত চিকিৎসা হইল, কোনই ফল হইল না। চোয়াং আর বাঁচিল না। বিধাতার বিড়ম্বনা! হান্সি প্রথমতঃ শোকে অধীর হইয়া পড়িল। কয়েক ঘণ্টা পরে একটু আশ্বস্ত হইয়া স্বামীর শেষ উইল পাঠ করিল। পরদিন হান্সি জগতের নিয়ম, মৃত্যুর অপ্রতিবিধেয়তা প্রভৃতি জ্ঞানের কথা কহিতে লাগিল। তৎপর দিন হান্সি গুরু-বিয়োগ কাতর শিষ্যকে প্রবোধ দিতে লাগিল এবং তৃতীয় দিনে—আর কি বলিব—গুরু-পত্নী ও শিষ্য পরস্পর বিবাহিত হইবার পরামর্শ স্থির করিল। বাটী হইতে শোক-চিহ্ন সমস্ত অন্তরিত করা হইল এবং দেশাচার অনুসারে যতদিন চোয়াংয়ের সমাধি না হয়, তত দিনের জন্য তাহার দেহ একটা সমাধি-পেটিকায় স্থাপিত করিয়া একটা নিকৃষ্ট প্রকোষ্ঠে ফেলিয়া রাখিল।

বিবাহের মহা ধূম লাগিয়া গেল। গন্ধ দ্রব্যে ভবন আমোদিত, আলোকমালায় সর্ব্বত্র সুসজ্জিত। হান্সি অতি মহার্হ পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে শরীর সাজাইয়াছেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বামীও বিগত গুরুর বেশভূষা দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আনন্দের সীমা নাই। হান্সি সাজিয়া গুজিয়া নব প্রণয়ীর নিমিত্ত ভবনাভ্যন্তরে অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে একজন ভৃত্য ব্যস্ততা সহ আসিয়া সংবাদ দিল, 'সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বরের মূর্চ্ছা হইয়াছে। বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে যদি কোন মৃত মনুষ্যের হৃদয় লইয়া তাঁহার হৃদয়ে ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বাঁচিবার আশা করা যায়।' হান্সি ভৃত্যের অবশিষ্ট কথা শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়াই এক দা হস্তে লইয়া যে ঘরে চোয়াংয়ের মৃত দেহ ছিল, তথায় ছুটিল, এবং বিশেষ ব্যস্ততা সহ সমাধি পেটিকার তালা খুলিয়া ফেলিল; কিন্তু খুলিয়া দেখিল কি? দেখিল চোয়াং নড়িতেছে! হান্সির হাত হইতে দা পড়িয়া গেল। সে লজ্জায় ও ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল। চোয়াং ধীরে ধীরে বাক্স মধ্যে হইতে বাহিরে আসিল এবং স্ত্রীকে বিস্ময় সহকারে তাহার এত দূর পরিচ্ছদ পারিপাট্য এবং এরূপ লজ্জিত ভাবের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া আরও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। চোয়াং অন্য লোকের মুখে সমস্ত শুনিবার অভিপ্রায়ে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিল এবং সর্ব্বত্র অতি সমারোহের ও আনন্দের চিহ্ন দেখিয়া অবাক্ হইতে লাগিল। তাহার পর একজন ভৃত্য সমস্ত ঘটনা চোয়াংকে জানাইল। ভৃত্যের কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া চোয়াং মনে করিল এবং হান্সির নিজ মুখ হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনার্থ তাহার সন্ধানে প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিল। চোয়াং গিয়া দেখিল হান্সির ঘরে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে! হান্সি এত বিশ্বাসঘাতকতা, এত প্রতারণা ও এত শঠতার পর স্বামীকে মুখ দেখাইব কেমন করিয়া ভাবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে!

চোয়াং কোন প্রকার শোক প্রকাশ করিল না। সেই জীর্ণ সমাধি পেটিকা পুনঃসংস্কার করিয়া তাহাতে হান্সির মৃতদেহ স্থাপিত করিল। এত বিবাহের আয়োজন নিষ্ফল যাওয়া তো যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া

চোরাং সেই রাত্রেই সেই পাখাওয়ালী স্ত্রীকে বিবাহ করিল! মানুষের প্রেম কত-দূর পাকা, কতদূর গাঢ় তাহা এ নবদম্পতী বেশ শিখিয়াছিল, সুতরাং তাহারা জীবনে কখন অগাধ প্রেমের গল্পও করে নাই—কখন অসুখীও হয় নাই!

ভারতীয় রাজকুল-দর্পণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

(জয়পুর বিবরণ,—তৃতীয় প্রকরণ)

এই সময়ে মিবার, মাড়োয়ার ও জয়-পুর তিনটী প্রধান রাজপুত রাজ্যে মিলিত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়া শত্রু-হস্ত হইতে আপনাদের রক্ষা সাধন করিতে লাগিল। এই সময়েই শেখাবতী অম্বরের নিকট করদ রূপে গণ্য হইল। এই সময়ে যদি জাঠেরা প্রবল হইয়া না উঠিত, তবে জয়পুর রাজ্য সম্বর হ্রদ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরী সিংহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সৌন্দর্য্যসম্পন্ন প্রদেশ, পূর্ণ ধনা-গার, কার্য্যদক্ষ মন্ত্রীসমাজ ও সুশিক্ষিত সেনার অধিকারী হইলেন। কিন্তু বহু-বিবাহজনিত পাপে বড় গোলযোগ বাধিয়া গেল। জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়মানুসারে ঈশ্বরী সিংহই জয়সিংহের প্রকৃত উত্তরাধিকারী; কিন্তু জয়সিংহ যে মিবার-রাজ-কুমারীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার গর্ভে মধু-সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। জয়পুর-রাজ শল-দীয়ের কন্যা-গ্রহণ সময়ে যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়েন, তদনুসারে মধুসিংহই জয়সিং-হের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন। তথাপি যদি ঈশ্বরীসিংহ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক না হইতেন, তাহা হইলেও তিনি স্বীয় পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন; কিন্তু তিনি অতি ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন। আবদালী আক্রমণ সময়ে তিনি উপরি-উক্ত দ্বিবিধ দোষের পরিচয় দিয়া আপন স্ত্রীর নিকটেও তিরস্কার লাভ করিয়া-ছিলেন। সে যাহা হউক, জয়সিংহ ভবি-ষ্যৎ ভাবিয়া মধুসিংহকে অতুল সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন। মধুসিংহের মাতুল মহারাণাও তাঁহাকে অনেক সম্পত্তি দান করেন, অধিকন্তু তদানীন্তন প্রবল মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত হুলকারকে মধুর স্বত্ব বজায় রাখিবার সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়া উৎকোচ স্বরূপে বহু অর্থ প্রদান করেন। এই সূত্রে রাজস্থানে মহারাষ্ট্রীয় শত্রু প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে।

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মধুসিংহ অচিরকাল মধ্যে আপনার ভুজ-বলের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। যদি জাঠদিগকে দমন করিতে ব্যতিব্যস্ত না হইতেন, এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন, তবে তাঁহার

সিংহাসন লাভ করিল; তখন জয়পুর সিংহাসনে মধুসিংহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জারুণ জোয়াহির পুষ্কর গমন সময়ে অনুমতি ব্যতিরেকে জয়পুরের মধ্য দিয়া গমন করে। মধুসিংহের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হওয়ায় তিনি সে সময় শয্যা-গত ছিলেন, তাঁহার মন্ত্রিসভায় হরসহায় ও গুরুসহায় দুই জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহারা জাঠ সামন্তের এবম্বিধ বিসদৃশ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া মধুসিংহের নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। মধু প্রতিবিধানের আদেশ প্রদান করিলে জাঠ-সামন্তকে পত্র লেখা হইল, যেন সে আর এরূপ ব্যবহার না করে। গর্ব্বিত জোয়াহির সে পত্রের প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না, আবার জয়পুরের মধ্য দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। তখন জয়পুর সামন্তেরা সমবেত হইয়া জাঠের বিপক্ষে গমন করিলেন; যদিও শেষে তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু সামন্তের পতনে তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। রতনসিংহ জাঠ-সামন্ত হইল, তৎপরে কেশরীসিংহ, নেউলসিংহ ও রণবীরসিংহ ক্রমান্বয়ে জাঠ-সামন্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মধুসিংহ সপ্তদশ বৎসর রাজত্বের পর উদরাময় রোগে গতাসু হইলেন। তিনি অনেকগুলি নগর নির্ম্মাণ করেন তন্মধ্যে রিন্থম্বোর দুর্গের নিকটবর্ত্তী মধুপুর সমধিক বিখ্যাত। বিজ্ঞান-চর্চ্চা সম্বন্ধে তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন; তাঁহার সময়ে জয়পুর বহুপণ্ডিতের আবাস-স্থল হইয়া পবিত্রপুরী বারাণসীরও দর্প-চূর্ণ করিয়াছিল।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক পৃথ্বি সিংহ জয়পুর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তাঁহার বিমাতার তত্ত্বাবধানে সমস্ত রাজকার্য্য হইতে লাগিল। ফিরোজ নামক জনৈক হস্তীপকের সহিত ঐ বিমাতার অবৈধ প্রণয় জন্মে, সেই সূত্রে ফিরোজ মন্ত্রীসভায় প্রবেশাধিকার লাভ করে। তাহাতে সামন্তেরা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া রাজ-সভা পরিত্যাগ করত স্ব স্ব অধিকারে গমন করেন। বিমাতা নিজ-পুত্র প্রতাপের জন্য সিংহাসন লাভে লোলুপ হন। নয় বৎসর রাজত্বের পরই পৃথ্বির মৃত্যু হয়, বিষ-প্রয়োগে তাঁহার জীবন বিনষ্ট হইল বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন। পৃথ্বি-পুত্র মানসিংহ গোপনে ঐ দুর্ব্বৃত্তা রাণীর নিকট হইতে অপসারিত হইয়া গোয়ালিয়রে পলায়ন পূর্ব্বক জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রতাপের সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন রহিল না। প্রতাপ অতিশয় সাহসী ও জ্ঞানবান ছিলেন, তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিবার জন্য যোধপুরের রাজার সহিত সন্ধি সূত্রে মিলিত হইয়া ঐ দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদিগকে চোঙ্গা নামক স্থানে এক যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কিন্তু এই পরাজয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা আরও প্রজ্বলিত হইয়া দ্বিগুণতর বলে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। ইহাদিগের উপদ্রবে দেশ উৎসন্ন হইতে লাগিল, প্রতাপ সমরে অবতীর্ণ হইয়া উপর্য্যুপরি দুই বার পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করেন। বার্ষিক করস্বরূপে বিপুল ধন নির্দ্ধারিত করিয়া সন্ধি সংস্থাপিত হইল। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে প্রতাপের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র জগৎসিংহ রাজা হইলেন। ইনি অত্যন্ত অকর্ম্মণ্য ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন বলিয়া ইহাঁর রাজত্ব ১৬ বৎসর কাল মধ্যে জয়পুরের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইল। ১৮১৮ খ্রী

হস্তেই মহারাষ্ট্রীয়েরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িত। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে জয়পুরের সীমা হইতে দূর করিয়া দিবেন; কিন্তু দ্বারস্থ শত্রু জাঠেরা তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে দেয় নাই। এইস্থলে প্রসঙ্গতঃ জাঠদিগের বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে।

জাঠেরা ষট্‌ত্রিংশ রাজকুলের অন্তর্গত। ইহারা পূর্ব্বে কৃষি-ব্যবসায়ী ছিল, কিন্তু ভূস্বামীর দৌরাত্ম্যে হল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্র-চালনায় প্রবৃত্ত হয়। যে ব্যক্তি স্বদেশীয়-বর্গের মধ্যে একতা বিধান পূর্ব্বক নিষ্ঠুর ভূস্বামীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তাহার নাম চূড়ামন। আরঙ্গজীবের সিংহাসন-লোলুপ পুত্র-পৌত্রগণের পরস্পর সমরাবসরে জাঠেরা থুন ও সিনসিনি নামক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অনতিকাল মধ্যে দস্যু-নামে পরিচয় লাভ করে। ফলতঃ কখন কখন সম্রাটের আবাসস্থলেও তাহারা দস্যুবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তখন সম্রাট সভায় সায়দেরা সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। তাহারা জাঠ-দমন জন্য জয়সিংহকে আদেশ প্রদান করায় তাহাদের থুন ও সিনসিনি দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। এখন জাঠদিগের নিতান্ত শৈশব সময়, তথাপি তাহারা যেরূপ প্রতাপে তাহাদিগের মৃণ্ময় দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। জয়সিংহ দ্বাদশমাস যার পর নাই পরিশ্রম করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া অবরোধ উঠাইয়া লইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই চূড়ামনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও যমস্বত্ব ভাগী বদনসিংহ নিজকৃত কোন দুষ্কৃতির জন্য চূড়ামন কর্ত্তৃক বহুকাল কারারুদ্ধ থাকে; পরিশেষে জয়সিংহ ও অপরাপর জাঠ সামন্তের অনুরোধে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন। বদন পলায়ন পূর্ব্বক অম্বরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তত্রত্য নরপতিকে বিবিধ প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া থুন দুর্গ অবরোধ করিতে অনুরোধ করে। তদনুসারে অম্বরেশ্বর সসৈন্যে সমাগত হইয়া থুন অবরোধ করেন। ছয় মাস অবরোধের পর দুর্গ ভূমিসাৎ হইলে চূড়ামন ও তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র মোখনসিংহ পলায়ন করে। বদনসিংহ জাঠদিগের অধীশ্বর হইল; দীগ নামক সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে অম্বরেশ্বর জয়সিংহ কর্ত্তৃক তাহার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইল। বদনের বহু পুত্রের মধ্যে সূর্য্যমল, শোভারাম, প্রতাপ সিংহ এবং বীরনারায়ণ এই চারিজন সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিল। বদনসিংহ বহুতর রাজকীয় প্রদেশ স্বাধিকারে আনিয়াছিল। সূর্য্যমল বদনের উত্তরাধিকারী, হইয়া সিংহাসন লাভ করে, প্রতাপ ওয়ার প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া তথায় একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

সূর্য্যমল দুর্ব্বলপ্রকৃতি বা হীন সাহসের লোক ছিল না—প্রথমেই সে কায়মা নামক জনৈক কুটুম্বের হস্ত হইতে ভরতপুর দুর্গ কাড়িয়া লয়। এই ভরতপুরই পরে জাঠদিগের রাজধানী হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে সূর্য্যমল দিল্লি আক্রমণের চেষ্টা করে, এই দুরাশায় তাহার জীবন নষ্ট হয়। তথায় মৃগয়া সময়ে কতিপয় বালোচী অশ্ব-সেনা তাহার জীবন সংহার করে। তাহার পাঁচ পুত্র—জোয়াহির, রতন, নেউল, নাহর ও রণজীৎ; এতদ্ভিন্ন হরদেও বকস্‌ নামে তাহার এক পালন পুত্র ছিল। জোয়াহির

অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট জয়পুরকে আশ্রয় প্রদান করেন। দুই বৎসর পরে সেই সন্ধি ভাঙ্গিয়া যায়। এ বিষয়ে ইংলণ্ডে বহু আন্দোলন হইয়া পুনঃসন্ধির জন্য অনুজ্ঞা আইসে। জগৎসিংহ কিছু দিন সন্ধির কথায় স্বীকৃত হন নাই কিন্তু যখন হুলকার ও আমির খাঁর দৌরাত্ম্যে দেশ উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইল তখন অনন্যোপায় হইয়া ইংরেজদিগের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে সেই সন্ধি সংস্থাপিত হইয়া নিয়ম হইল যে, ইংরেজেরা জয়পুর রক্ষা ও তাহার শত্রু-দমন করিবেন; মহারাজা ইংরেজ-প্রাধান্য স্বীকার, ইংরেজের পরামর্শ লইয়া সমস্ত রাজকার্য্য, প্রয়োজনমত সৈন্য সাহায্য এবং ৮ আটলক্ষ টাকা বার্ষিক করদান করিবেন। সামন্তবর্গের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া তাঁহাদের হৃত ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইল। সার্ ডেবিড্ অক্‌টারলোনী কর্ত্তৃক এই সন্ধি বিধি বদ্ধ হয়।

অপুত্রকাবস্থায় জগৎসিংহের মৃত্যু হইলে নরবরের পদচ্যুত রাজপুত্র মোহন সিংহ রাজ-পদে মনোনীত হইলেন। জয়পুরেশ্বর প্রথম পৃথিরাজ হইতে মোহন সিংহ চতুর্দ্দশ পুরুষ। রাজধানীর প্রধান নপুংসক নাজির মোহন রাম কর্ত্তৃক মোহন সিংহ রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহাতে রাজ্যের সমস্ত লোকেই অসন্তুষ্ট হইল, সামন্তবর্গ বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব অধিকারে গমন করিলেন। মৃত জগৎসিংহের অন্ততমা রাণী গর্ভবতী ছিলেন, ১৮১৯ অব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে সেই গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে রাজ্যের তাবৎ লোকে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এই শিশু তৃতীয় জয়সিংহ নামে অভিহিত হইয়া জননীর তত্ত্বাবধানে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ঐ রমণীর চরিত্র অত্যন্ত দূষিত ছিল; তাহার উপপতি ছটু রামের ক্ষমতাই অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়িল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত মন্ত্রী রাউল বাইরি লাল পদচ্যুত হইলেন, দুরাচার ছটুরাম মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইল; তাহারই অনুচরবর্গে রাজ-সভা পরিপূর্ণ হইল, যথেচ্ছাচারিতার সহিত রাজকার্য্য চলিতে লাগিল, ইংরাজরাজের প্রাপ্য কর বন্ধ হইয়া গেল। ১৮৩৩ অব্দে রাণীর মৃত্যু হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপ অরাজকতা চলিয়াছিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আর উদাসীন না রহিয়া একজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীকে জয়পুরে প্রেরণ করিলেন। ১৮৩৫ অব্দে ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমে জয়সিংহের মৃত্যু হইল; ছটুরামের কৌশলে বিষ-প্রয়োগে মৃত্যু হওয়াই সাধারণে অনুমান করেন। এজেণ্ট গবর্ণর কর্ণেল আলবিস সাহেব এই সমাচার শ্রবণ করিয়া তদন্ত করিতে জয়পুরে উপস্থিত হইয়া ছটুরাম ও তদনুচরদিগকে পদচ্যুত করত রাউল বাইরিলালকে পুনরায় মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহাতে এজেণ্টের বিপক্ষে একটী চক্রান্ত হইল, তাঁহার জীবনের প্রতি আক্রমণ হইতে লাগিল, এবং তাঁহার সহকারী হত হইলেন। হত্যাকারীগণ ধৃত হইয়া জীবন-দণ্ডে দণ্ডিত হইল, চক্রান্ত-কারী ছটুরাম ও তদনুচরবর্গ চিরজীবনের জন্য চুনার দুর্গে অবরুদ্ধ হইল।

রামসিংহ নামে জয়সিংহের এক পুত্র হয়, ঐ পুত্র ১৮৩৩ অব্দে জন্ম-গ্রহণ করে; সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় তাহার বয়ঃক্রম দুই বৎসর। রামসিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহার সময়ে মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত এজেণ্ট গবর্ণরের দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

পাঁচ জন প্রধান সামন্ত সভারূপে নির্ব্বাচিত হন। সভ্যেরা অতি সুন্দররূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সৈন্যসংখ্যার হ্রাস, সতীদাহ, দাসব্যবসায় ও শিশুহত্যার নিবারণ হইল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রাপ্য কর কমাইয়া বার্ষিক কর ৮ লক্ষের পরিবর্ত্তে ৪ লক্ষ করিয়া দিলেন। ১৮৫৭অব্দে মহারাজা রামসিংহ স্বহস্তে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়া জটিল বিষয়ে এজেণ্টের সহিত পরামর্শ করত রাজ-কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাউল বাইরি-লাল স্বভাবতঃ অলস ও অপরিমিত ব্যয়ী ছিলেন বলিয়া এজেণ্টের পরামর্শে মহারাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তদীয় ভ্রাতা কার্য্য-দক্ষ ও সুবিজ্ঞ ঠাকুর লছমন সিংহকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিলেন। মহারাজের শিক্ষক পণ্ডিত শিবদীন কর-সংক্রান্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন থাকিয়া চিরদিন তাঁহাদের প্রার্থনা চরিতার্থ করিয়াছেন। সিপাহী-বিদ্রোহ সময়ে ইংরাজদিগের অনু-কূলে অনেক সাহায্য করায় পুরস্কার স্বরূপে কোটিকাশিম পরগণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজা রামসিংহ অতিশয় যোগ্য ভূপতি ছিলেন; প্রজার মঙ্গল সাধনের জন্য সততই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি ও সংস্কৃত কালেজ, বালিকা-বিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয় প্রভৃতি অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার সৎকীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। তিনি প্রজার বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর প্রায় অশীতি সহস্র মুদ্রা, পূর্ত্তকার্য্যে প্রায় পঞ্চ লক্ষ, এবং চিকিৎসা, ঔষধ প্রভৃতির জন্য প্রায় চতুর্লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেন। ১৮৬৮ অব্দের দুর্ভিক্ষ সময়ে রাজপুতনীয় দুস্থ প্রজার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্মান তোপ ১৭ হইতে ১৯ করিয়া দেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি দত্তক গ্রহণের অনুমতি পাইয়াছিলেন। তিনি গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সেলে দুইবার সভা-রূপে মনোনীত হন, এবং ১৮৭৫ অব্দে রেসি-ডেণ্টের প্রতি বিষ-প্রয়োগ অপরাধে বরদা-পতি দুর্ভাগ্য মল্লার রাওয়ের বিচার-ভার যে মিশ্র সভার উপর প্রদত্ত হয়, তিনি তাহার মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন। ঐ বর্ষের ডিসেম্বর মাসে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ কলিকাতায় আসিলে মহারাজা রামসিংহ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। দেশীয় রাজাগণকে অভ্যর্থনা ও 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' উপাধি দান সম্বন্ধে যে দুইটী মহতী সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি উপ-স্থিত ছিলেন। রাজকুমার কলিকাতায় তাঁহার বহুসম্বর্দ্ধনা করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের চতুর্থ দিবসে জয়পুর উপস্থিত হইয়া মৃগয়া-সুখে যৎপরোনাস্তি সন্তোষ-লাভ করেন। রাজকুমার যে কয়দিন জয়পুরে ছিলেন, মহারাজের আতিথ্যে যথোচিত সন্তুষ্ট হইয়া-ছিলেন। রাজকুমার এইখানে স্বনাম-বিখ্যাত টাউন হলের ভিত্তি স্বহস্তে সংস্থাপিত করেন। ১৮৭৭ অব্দে দিল্লি নগরে যে ভিক্টোরিয়া রাজসূয় হয় তাহাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন; সেই মহতী সভায় তিনি "কৌন্সেলর অব দি এম্প্রেস" এই উপাধি লাভ করেন, এবং সম্মান তোপের সংখ্যা ১৯ হইতে ২১ হয়। তিনি পূর্ব্বেই "গ্রাণ্ড কম্যাণ্ডর অব ইণ্ডিয়া" এই শ্রেষ্ঠ উপাধি পাইয়াছিলেন, এক্ষণে ১৮৭৮ অব্দের ১লা জানুয়ারিতে "অর্ডার অব দি ইণ্ডিয়ান এম্-পায়ার" হইলেন। মহারাজের সম্পূর্ণ নাম

এই;—"হিজ্ হাইনেস্ শিরমদী রাজাহাই হিন্দুস্থান, রাজ রাজেন্দ্র, শ্রীমহারাজাধীরাজ সওয়াই সর রামসিংহ বাহাদুর, নাইট গ্রাণ্ড কম্যাণ্ডর অব দি মোষ্ট একজলটেড্ অর্ডার অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া, কৌন্সিলর অব দি এম্প্রেস্," ইত্যাদি। ইনি প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ প্রজার জীবন মরণের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ভূপতি। ইঁহার সময়ে ফতেসিংহ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি মৃত্যুকালে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া যান। সেই দত্তক পুত্র অতি অল্প দিন হইল স্বহস্তে রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখানকার রাজকার্য্য অতি সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

চামেলি-মালা।

(ইতিবৃত্ত মূলক গীতি-কাব্য।)

পূর্ণিমার নিশা অবসান প্রায়,
শীতল উষার বায়
ধীরে ধীরে আসি, ঢলিয়া পড়িছে
সাধের কুসুম গায়।
শশাঙ্ক মলিন, ভাবিছে কেমনে
বিদায় নিশায় দিবে—
আবেশে অলস, বুঝে নাই নিশা
সুধাংশু এখনি যাবে!
পূরব আকাশে, উজ্জল তারকা
কাঁপিছে কে জানে কেন?
শশীর সোহাগ, নিশি অনুরাগ
সহেনা হৃদয়ে যেন!
অম্বর ভবন, শ্বেত সৌধ মালা
নীরব নিস্তব্ধ আজি—
স্তবধ অম্বর, স্তিমিত আলোক
স্তবধ বিটপী-রাজি।
আজি দুই মাস, অম্বর অধিপ
ত্যজেছে জীবন লীলা,
সাধের অম্বর, প্রমোদ ভবন
সুখের সংসার খেলা।

বিষাদের নীরে, ভাসাইয়ে হায়,
ননীর পুত্তলি বালা,
বৃন্ত-বিরহিত কুসুম-কলিকা,
ভূতলে চন্দ্রিমা কলা!
মেঘেতে বিজলী, তরু-কোলে লতা,
মহিষী পতির সনে
সহমৃতা সতী. দিয়াছে আহুতি
যৌবনে জীবন ধনে!
হায়রে বালিকা, কতই কাঁদিল
ফিরাতে পিতায় মায়,
কতই কুসুম, সমর্পিল বালা
তুষিবারে দেবতায়।
নিষ্ঠুর দেবতা, না করিল দয়া
সরলা অবলা-তরে,
কিশোর বয়সে, অম্বর কুমারী
ডুবিল অকূল নীরে!

* * * * * * *

বুন্দি-অধিপতি রাজ্যচ্যুত হয়ে
একটী মহিষী সনে

সন্ন্যাসীর বেশে, গহন কাননে
পশেছে বিষণ্ণ মনে।
শিশু তনয়েরে, সমর্পিয়া হায়,
অম্বর-অধিপ করে;
যতনে পালিত, কালে রণধীর
অমর-বিক্রম ধরে!
বীর রণধীরে, সঁপিবে কুমারী
হৃদয়ে বাসনা ছিল,
সে সাধ পুরাতে, নিষ্ঠুর শমন
হায়রে নহিক দিল!
নিদাঘের শেষে, হবে পরিণয়
আনন্দে মগন সবে—
কে জানিত হায়, হেন বজ্রপাত
অমেঘ অম্বরে হবে!
অম্বর-কুমারী, সুষুপ্তা শয্যায়
নিকটে নিদ্রিতা সখী,
মুদিত কুমুদ, ভাবিয়ে চন্দ্রমা,
আদরে চুম্বিছে আঁখি!
বাতায়ন-পাশে, ফুলের বাগানে
ফুটেছে চামেলি ফুল,
প্রভাত-সমীর, দোলাইছে ধীরে
সজল জলদ চুল।
সহসা বালিকা, চমকি উঠিল,
শিহরি সখীরে ধরে!
চমকিয়ে সখী জিজ্ঞাসে সাদরে
ধরিয়া কমল করে—
"একি একি সখি! কি হয়েছে বল,
চমকি উঠিল কেন?
গগণের পানে, কি দেখিছ সখী
বিলোল কটাক্ষে হেন?"

"হায় একি সখি! কহিব কেমনে?
চেয়ে দেখ ঐ উজল গগনে—
দেখিছ না ঐ উজল বিমান!
পাইছ সুরভি পারিজাত ঘ্রাণ?"
"কি স্বপন বল, পেয়েছ কি ভয়?
স্বপনের দেখা সত্য কভু নয়!"

"ভয় নহে সখি! পুলকেতে প্রাণ,
সিহরি উঠিছে, হারায়েছি জ্ঞান।
সহসা আকাশে উজলি বিমান,
রতন-মণ্ডিত দেবতার যান,
দ্বাদশ তরুণ, সহস্র বিজলী,
ত্রিদিব-আলোকে দিগন্ত উজলি,
স্বর্গীয় সৌরভে মাতিল পবন,
উজলিল ঐ সুনীল গগন!
নিমেষ বিমান হেথায় আসিল,
পুলকে পরাণ পাগল হইল!
কি দেখিনু সখি রথের ভিতর?
দিব্য বাস পরিধান দেব কলেবর,
বিশাল লোচন আনন্দ উজ্জল,
ত্রিদিবের জ্যোতিঃ পবিত্র বিমল,
কনক-কুসুম সিংহাসন পরে,
বসিয়ে জনক রথের ভিতরে।
বামেতে জননী রূপে সু বালা,
শোভিছে গলায় পারিজাত মালা।
মৃদু মধু হাসি অধরে বিকাশ,
উজল ললাট! নয়নে বিলাস।
মধুস্বরে মাতা কহিলা আমায়,—
"শুনিবি কেন মা এসেছি হেথায়,
হায় সরমের কথা কহিব কেমনে?
চায়রে দানব দেবেন্দ্র আসনে!
দিল্লীর অধিপ জাতিতে যবন,
চায় মা লভিতে অম্বর ভবন!
শুধু তাহা নয়! চায় মা তোমায়,
আসিছে অসুর অমৃত-আশায়।
ওরূপ মাধুরী শুনিয়ে পাগল,
ধাইছে পতঙ্গ চুম্বিতে অনল!

সাবধান যেন জানে না যবন,
শুধু নামে নহে অম্বর ভবন।
রাতি নাই আর উঠ সুরবালা
গাঁথগে সাধের চামেলির মালা।
আদরে যতনে গাঁথিয়ে মালায়,
রণধীর গলে দোলাইও তায়।
সাবধান। পুনঃ শুন সুরবালা
রণধীরে দিও চামেলির মালা!'

নীরবিলা মাতা। জলদ সুস্বরে
কহিলা জনক, কাঁপায়ে অম্বরে—
জলধি পুলিনে বাঁশরীর ধ্বনি,
মৃদুল মধুর নীরবে যেমনি,
প্রতিধ্বনি করে জলধি গভীর,
তেমতি সে ধ্বনি মধুর গম্ভীর—
'সাবধান। যেন জানে না যবন,
শুধু নামে নহে অম্বর-ভবন।
সাবধান। পুনঃ শুন সুরবালা।
রণধীরে দিও চামেলির মালা।'

প্রতিধ্বনিময় হইল গগন,
প্রতিধ্বনিময় নৈশ সমীরণ।
'সাবধান যেন জানে না যবন,
শুধু নামে নহে অম্বর ভবন।'
পুলকে পরাণ আকুল করি,
অম্বরে সুস্বরে গাইল অপ্সরী।

'সাবধান যেন জানে না যবন
শুধু নামে নহে অম্বর ভবন!
সাবধান! পুনঃ শুন সুরবালা!
রণধীরে দিও চামেলির মালা!'

সহস্র অপ্সরী সুকণ্ঠ মিশায়ে,
গাইল সে গীত আনন্দে মাতিয়ে।
সহসা বিমান গগনে উঠিল।
অভাগিনী হায় পড়িয়া রহিল!"

উত্তরিল সখি, "ভয় কিলো তার?
রণধীর বীর হবে আর কার?
বিবাহের দিন বহুদূরে নয়,
পূর্ণিমা নিশিতে হবে পরিণয়,
ফলিবে বাসনা পূর্ণ হবে আশা!
ঘুচিবে বিষাদ, মিটিবে পিপাসা!
এ অতুল রূপ এ নব যৌবন,
আমরি তখন দেখাবে কেমন।
রণধীর-কণ্ঠে মরি সুরবালা,
চাঁদের গলায় যেনরে চপলা।
প্রহরী হইবে আপনি মদন,
দূর হতে হেরি পলাবে যবন!"

"সত্য সখি! নহে আশার ছলনা,
নিশ্চয় তোমার পুরাব বাসনা!
পিতার আদেশ, জননীর সাধ,
পুরাব স্বজনি, ঘুচিবে বিষাদ!
আসুক আসুক! দেখুক যবন,
শুধু নামে নহে অম্বর-ভবন!
বাগানেতে চল হয়েছে বেলা।
গাঁথিগে সাধের চামেলি মালা!

(ক্রমশঃ)

বিদ্যুল্লতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গিরিশ মুঙ্গের যাইবেন, স্বর্ণলতাকে বলিয়াছেন কিন্তু কেন যাইবেন তাহা বলেন নাই। স্বামী যাহা করিতে চাহেন স্বর্ণলতা সে কার্য্যে কথনই প্রতিবন্ধক দেন না। পূর্ব্বে যখনই গিরিশ প্রবাসে গিয়াছিলেন, স্বর্ণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন—এবার তিনি ভার্য্যাকে লইয়া যাইবেন না, তাই স্বর্ণ ভাবিতেছেন—

"এত দিন পরে আমার পতি-বিচ্ছেদ ঘটিল। ওঃ, কেমন করিয়া সহ্য করিব। এখন হইতেই বুকের ভিতর যে কেমন কেমন করিয়া উঠিতেছে! সে খানে গিয়া কি ওঁর কোন অসুখ হইবে? সঙ্গে যাইতে চাহিতেছি, লইয়া যাইবেন না। ওঁর যাহা অভিরুচি তাহাই করুন, ভগবান রক্ষা করিবেন।"

স্বর্ণলতার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল,—স্নেহময় হৃদয়, ভাবী অমঙ্গল বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, কাঁদিয়া উঠে, জ্বলিয়া উঠে, আরও যে কি করিয়া উঠে কথায় তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। স্বর্ণলতার চিত্তের সেই বিচলিত অবস্থা উপস্থিত। তাঁহার অদৃষ্টে কি অমঙ্গল ঘটিবে তিনি তাহা জানেন না, বুঝিতেও পারিলেন না, সুতরাং চিন্তা-প্রবাহ অন্যদিকে প্রধাবিত করিলেন,—'পতি-বিচ্ছেদ যাহারা সহ্য করিয়াছে তাহারাই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকিবে, পতির বিচ্ছেদে তাহারাই কাঁদিবে। আমি ত সে যাতনা সহ্য করি নাই, তথাপি কেন আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে? না জানি কি অমঙ্গল হইবে মনে হইতেছে। কত দিন দেখিতে পাইব না! তাই কি?'

স্বর্ণলতা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, এবং পতির আবশ্যকীয় দ্রব্য গুলি এ ঘর ও ঘর হইতে আনিয়া আপনার শয়ন-কক্ষে একত্রিত করিতেছেন।

কক্ষান্তরে বসিয়া গিরিশ একখানি জন্মপত্র পানে বিষণ্ণ ভাবে চাহিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপনি বলিলেন,—"মানি আর নাই মানি, জন্মপত্র আমার ভাগ্যে মিথ্যা হইল না! বুঝিতে পারিলাম জ্যোতিষ কেবল মিথ্যা কল্পনা নহে! বুঝিতে পারিলাম এই আশঙ্কায় পিতা আমাকে অল্প বয়সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। পরোলোক প্রাপ্তি কালে তিনি যে আমাকে সুসন্তান দেখিয়া গিয়াছেন তাহাই আমার পরম সৌভাগ্য! এখন আমার সেই কাল সপ্তবিংশতি বৎসর উপস্থিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি জন্ম পত্রোল্লিখিত দুর্ঘটনাও আরম্ভ হইয়াছে, হা অদৃষ্ট!" গিরিশ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার কহিতে লাগিলেন,—"দুর্ঘটনার কথা ত সত্য হইল, পাপ কলঙ্কে ত কলঙ্কিত হইলাম, পরিত্রাণের কথা কি সত্য হইবে না? হইবে বই কি,

নহিলে, দেশ ভ্রমনের বাসনা এত বলবতী হইবে কেন? ভার্য্যার সহিত বিচ্ছেদ সহ করিতে প্রস্তুত হইব কেন? যাহাকে কখন নয়নান্তর করি নাই, তাহাকে বিস্মৃত হইতে উদ্যত হইয়া আবার তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইতেছি কেন? এ সমুদয়ই পরিত্রানের লক্ষণ, যাহা যাহা লিখিত আছে, তাহাই ঘটিয়া আসিতেছে! ওঃ কারাবাস! অদৃষ্টে এখনও কারাবাস বাকি রহিয়াছে! ঘটে ঘটিবে! তাহার পরই ত পরিত্রান! ক্লেশ! ক্লেশ স্বীকার করিয়া ক্লেশের পরিণাম শান্তি ও সুখ! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই!" বলিয়া গিরিশ সাবধানে জন্ম-পত্রখানি যথাস্থানে তুলিয়া রাখিলেন। মুক্তের যাইবার জন্য পা বাড়াইলেন,—বলিলেন 'এই আমার তীর্থ যাত্রা! করুণাময় (উর্দ্ধে নেত্র তুলিয়া) অবোধ কুপথগামী সন্তানকে সৎ-পথে লইয়া আইস। প্রায়শ্চিত্ত হেতু ক্লেশ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ নহি, ক্লেশ দিয়া নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর; আর কি তোমায় বলিব? পিতঃ, তোমার যেমন ইচ্ছা হয় তাহাই কর—ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং—"

গিরিশ প্রস্তুত হইয়া স্বর্ণলতার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। ইহারই মধ্যে গিরিশের দুষ্প্রবৃত্তির এত হ্রাস হইয়া গিয়াছে যে, তিনি তখন স্বর্ণকে ভার্য্যা বলিয়া আবার গ্রহণ করিয়াছেন, অনুতাপ বশত কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু স্বর্ণকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিয়াছেন, স্বর্ণ তাঁহার বিচ্ছেদে কাতর হইবেন তাহাও বুঝিতে পারিয়াছেন। এই রূপ প্রণয়াভিষিক্ত হৃদয়ে গিরিশ আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। স্বর্ণলতা অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে সানুনয়ে আবার অনুরোধ করিলেন, "আমায় লইয়া চল, একলা থাকিতে আমার প্রাণ কেমন করিতেছে!" গিরিশ সানুরাগে স্বর্ণলতাকে হৃদয়ে আলিঙ্গন দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"স্বর্ণ—প্রিয়ে—কাঁদিও না, আমি শীঘ্রই আসিব, চাও আমার মুখ পানে চাও!" স্বর্ণলতা সেই অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে গিরিশের মুখ পানে চাহিলেন।

কি সুন্দর ছবি। গিরিশ স্বীয় বাহু-যুগলে স্বর্ণলতার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া অবনত মুখে সাশ্রুনয়নে সকাতরা ভার্য্যার অবসাদময় মলিন বদন পানে তাকাইয়া রহিলেন; স্বর্ণলতা কোমল বাহু দুখানি দিয়া গিরিশের গল দেশ জড়াইয়া ধরিলেন ও ঈষৎ বক্র ভঙ্গিমায় ঈষৎ উর্দ্ধমুখে আপনার অশ্রু পরিপ্লুত লোচন স্বামীর অনিমিষ অথচ সজল নয়ন যুগলে পাতিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই! নয়নে নয়নে কথা হইতে লাগিল। গিরিশের অশ্রুবিন্দু স্বর্ণ-লতার কপোলে, বিন্দু বিন্দু পতিত হইয়া স্বর্ণর অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গিরিশ সানুরাগে স্বর্ণলতার অধর চুম্বন করিলেন, পরক্ষণেই উভয়ের বাহুবল্লি খসিয়া পড়িল,—"আসি তবে স্বর্ণ!" বলিয়া গিরিশ পশ্চাৎ ফিরিলেন—কক্ষ ত্যাগ করিলেন। স্বর্ণলতা বিষাদ-বিহ্বলা হইয়া সেই-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন,—কাঁদিলেন। তাঁহার মনে হইল তখনও স্বামীকে দেখিতে পাইবেন—দ্রুত পদে বাহিরের দিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে লাগিলেন গিরিশ গাড়ীতে উঠিলেন, মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। গাড়ি চলিল, গিরিশ সেইরূপ মুখ বাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন, ক্রমে গাড়ী অদৃশ্য হইল, স্বর্ণ আপন কক্ষে

ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে বসিলেন। স্বর্গের সুখ শশি রাহুগ্রস্ত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

আজি অরন্ধন। অরন্ধনে পল্লিগ্রামে বড় ধুম। মনসা দেবীর পূজা উপলক্ষে গৃহে গৃহে কুলকামিনীগণ রন্ধন কার্য্যে নিষ্কৃতি পাইয়া কেহ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে, কেহ বা নিমন্ত্রিত কুলবধুদিগকে লইয়া আসিবার জন্য, পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। এ দিকে ও দিকে চারি দিকে মহিলার গতায়াত,—আজ তাহারা অবাধে মনের আনন্দে চলিতেছে। সহরের কামিনীর ন্যায় ইহাদের নয়নে চঞ্চল চটুলতা নাই, চলনে ভাব ভঙ্গি কিছুই নাই, কথোপকথনে রসিকতার আভাস মাত্রও নাই। কেবল সরলতা, কোমলতা দেখিতে চাও, তবে একবার চন্দন নগর ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী ব্যাজড়া গ্রামে চল।

ব্যাজড়ায় বহু সংখ্যক সমৃদ্ধিশালী ভদ্র লোকের বাস, ঘরে যদি অবিবাহিত বালক থাকে তাহার জন্য সেখানে পাত্রী পাইবে। যেমন সুন্দরী চাও তেমনি সুন্দরী মিলিবে। কেবল সুন্দরী নয়, আজ কাল বালিকারা বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত হইতেছে, সুচী কার্য্যে সুনিপুণা হইতেছে। আজ দেখিতে পাইবে—এইরূপ কত অস্ফুট কলিকা সুকুমারীগণ ইতস্ততঃ এ বাড়ী ও বাড়ী করিয়া বেড়াইতেছে। কথায় বলে, 'পাড়া গাঁয়ের মেয়ে আর সহরের ছেলে, বিবাহটা বড় ভাল'। পত্নী স্বামীর অনুগত থাকে, 'বানর' বলিয়া স্বামীকে ঘৃণা বা তাহার প্রতি কুব্যবহার করে না। পল্লিগ্রামে জামাতার আদর সহরে দেবতা পূজার মত। অল্প লেখা পড়া শিখিয়াও পণ্ডিত বলিয়া সমাদৃত হয়। জামাতাকে 'চালাক, 'চতুর, 'চোস্ত,' দেখিলে সকলেই সুখ্যাতি করে। শুধু তাই নহে, পাড়ার যুবতীবৃন্দ একত্রিত হইয়া জামাই দেখিতে আইসে; জামাইয়ের আহারে, বিহারে, শয়নে, প্রতি কথায় কৌতুক ও রহস্য, কত আমোদ, কত আহ্লাদ! যে দেশে সম্বন্ধ ব্যতীত সাধারণতঃ অপর রমণীর সহিত সদালাপ, হাস্য কৌতুক নিষিদ্ধ, সে দেশে এরূপ নিষ্পাপ আমোদে অন্তঃকরণ কতই প্রফুল্ল হইয়া থাকে,—যিনি পল্লিগ্রামে বিবাহ করিয়াছেন তিনিই তাহা অনুভব করিয়াছেন।

আবার, সহরে প্রতি দিন গোলমাল, মারামারি, হুড়া হুড়ি, হাঁকা হাঁকি, ডাকা ডাকি, পুলিষের তাড়না দেখিয়া শুনিয়া তিতবিরক্ত হইলে, জামাতা পল্লিগ্রামে শ্বশুরালয়ে আসিয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন। পল্লিগ্রামে স্বভাবের শোভা অতি চমৎকার,—নির্জ্জীব ও জীবন্তবৎ! সুন্দর নব মুকুলিত বৃক্ষবল্লির নিকুঞ্জ, নির্ম্মল-জল দীর্ঘিকা, সরসিপার্শ্বে সুবাস কুসুমময় বৃক্ষ লতাদি, কোথাও ঘন পত্রাবৃত বিস্তীর্ণ শাখা-বিশিষ্ট বিটপী নির্জ্জনে বিরাজ করিতেছে, তদুপরি নানাজাতি বিহগবিহগী বিবিধ স্বরে মধুর তানে গান করিতেছে। কোথাও বৃক্ষতলে দুইচারিটা গাভী শয়ন করিয়া আছে, অদূরে দুই চারিটা বৎস নব নব দূর্ব্বা ক্ষেত্রে চরিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও রাখাল বালকেরা মেঠ সুরে সপ্তমে তান ধরিয়াছে,—কোথাও বা বৃক্ষ-শাখায় রজ্জু বাঁধিয়া দুলিতেছে, কেহ কেহ বা দৌড়াদৌড়ি ও হাসি কৌতুক করিতেছে।

সম্মুখে সুদূর বিস্তৃত হরিৎবর্ণ ধান্য ক্ষেত্র, মন্দ মন্দ সমীরণ হিল্লোলে নামিয়া উঠিয়া, দুলিয়া দুলিয়া, ক্ষেত্রের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। আবার সেই ক্ষেত্র মধ্য দিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া ক্ষুদ্র সর্পিণী সদৃশ নদী কুল কুল রবে ধীরে ধীরে কেমন বহিয়া যাইতেছে। এ নদীতে তরঙ্গ নাই, তরণীও নাই, কৃষিগণ সামান্য সাঁকো করিয়া উহার উপর গতায়াত করিতেছে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে, এখানকার দৃশ্য সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ, সর্ব্বদাই নয়ন তৃপ্তিকর।

শোকার্ত্ত এই নির্জ্জন বনস্থলে আসিয়াই রোদন ভুলিয়া যায়; যিনি বিষয় কার্য্যে জ্বালাতন হইয়াছেন এই স্থানে ক্ষণেক বসিয়াই শান্তি লাভ করেন, সজীব ও সবল হইয়া উঠেন। কাহারও প্রণয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে, তিনি এই নির্জ্জনে বসিয়া প্রণয়িনীর সুন্দর মূর্ত্তি ধ্যান করুন, স্বভাব শোভা নিরীক্ষণ করুন, কেহ সে যোগ ভঙ্গ করিবে না; বিচ্ছেদ দ্বিগুণ হয়—হইবে, সে বিচ্ছেদ স্পৃহনীয়; তখন কাঁদিয়াও যে সুখ—সে সুখ দুর্লভ—সে সুখ এখানেই মিলিবে।

তাই বলিলাম সহরবাসীর পক্ষে পল্লিগ্রামে কুটুম্বিতা বাঞ্ছনীয়। কুটুম্বিতা করিও—সে পরের কথা, এখন ব্যাজড়ায় আসিয়াছ—ঐ দেখ, ঐ প্রাচীন অট্টালিকার দ্বারে একটী বালিকা দাঁড়াইয়া আছে। বালিকা—কুমারী; দিব্য দেখিতে, নাসিকা, নয়ন, ওষ্ঠ, ললাট, কপাল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সকলই পরিপাটি; বর্ণও উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। আহা উহার যেমন কৌমার্য্য, মুখ খানিও তেমনি কচি। পথের অপর পার্শ্ব হইতে আর একটী বয়স্কা রমণী উহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'হাঁ হেমা, বিদু আসিয়াছে নাকি?' 'হাঁ মাসী মা—দিদি এসেছেন' বলিয়া বালিকাটী বাটীর অভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

বালিকা হেমলতা, বিদ্যুল্লতার ভগ্নী। ইহারই বিবাহের জন্য বিদ্যুল্লতা ব্যাকুল হইয়াছেন। বিদ্যুল্লতার পিতার নাম কাশীনাথ মিত্র; এইটীই কাশীনাথের বাটী। কাশীনাথের পিতা ব্যবসা বাণিজ্যে যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ অকস্মাৎ ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অকালেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল। তখন কাশীনাথ কালেজে পড়িতেন; সেই অবধি কালেজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি পিতার কারবার চালাইতে প্রবৃত্ত হয়েন। কয়েক বৎসর বেশ উন্নতিও করিয়াছিলেন, সেই উন্নতির সময়েই বিদ্যুল্লতার বিবাহ দিয়াছিলেন, তাই বিদ্যুল্লতাকে শ্যামনগরের ধনবান সমৃদ্ধিশালী রাধাকান্তের পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর কঠিন পীড়া বশতঃ বহুদিন শয্যাগত থাকাতে কাশীনাথ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। এখন কলিকাতার হাউসে ৫০৲ টাকা বেতনে চাকরি করিতেছেন। সুতরাং অল্প আয় প্রযুক্ত প্রাচীন বাটীর ভগ্নাংশের সংস্কার হয় নাই। বাটীর আয়তন ও আড়ম্বর দেখিলে এখনও বোধ হয় যে মিত্রেরা একসময় গ্রামে একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্যামনগর নিবাসী মহেশচন্দ্র ঘোষ হাইকোর্টে ওকালতি করেন, মাসে ৮০০ হইতে ১২০০শত টাকা উপার্জ্জন করিয়া

থাকেন। তাঁহার নূতন অট্টালিকা, নূতন জমীদারী, নূতন বড়মানষী হইয়াছে। তাঁহার এক পুত্র শশিশেখর ভারনা কিউ-লার হইতে হনর পর্য্যন্ত পাঁচটী পাশ করিয়াছেন। এই পঞ্চ পাশের গৌরব গ্রামে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিকই শশিশেখর মহে-শচন্দ্রের যোগ্য পুত্র; শশিশেখরের সহিত হেমলতার বিবাহ দিবার জন্যই বিদ্যুল্লতার এত আগ্রহ। ঐ সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিদ্যু-ল্লতা পিতাকে পাত্র দেখিয়া আসিতে অনু-রোধ করিয়াছিলেন। যে দিন বিদ্যুল্লতা পিতার আগমন প্রতীক্ষায় অস্থির চিত্ত হইয়াছিলেন সেই দিন কাশীনাথ শ্যাম-নগরে মহেশচন্দ্রের বাটীতে গিয়াছিলেন; কিন্তু মহেশচন্দ্র কাশীনাথের আগমন বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং সাক্ষাৎ না দিয়া আপনার সরকার দ্বারা প্রথমেই লেন দেনের কথা উত্থাপন করেন। কাশীনাথ ঈদৃশ অভদ্রতা দর্শনে বিরক্ত হইয়া মনো-বেদনা বশতঃ দুহিতা বিদ্যুল্লতার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই ফিরিয়া আসিয়া ছিলেন। সে সম্বন্ধে আর তাঁহার মন নাই।

কিন্তু শশিশেখরের ন্যায় সর্ব্বগুণা-ন্বিত পাত্র পাওয়া সুকঠিন। যেখানে যেখানে উত্তম পাত্র দেখিয়াছিলেন, সেই সেই খানে অর্থ ব্যয় করিতে অক্ষম বলিয়া পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। কাশীনাথের যৎপরোনাস্তি মনঃ কষ্ট হইয়াছে। তাঁহার কেবল দুই কন্যা, প্রথমার বিবাহের সময় যেরূপ স্বচ্ছল রূপে ব্যয় করিয়াছিলেন এখন তদ্রূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না, আবার আজ কালের পদ্ধতি অনুসারে অল্প ব্যয়ে সৎ-পাত্রে কন্যাদান করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। তাঁহার একান্ত বাসনা, অসৎ পাত্রে কন্যাদান করিবেন না অথচ তিনি এখন দরিদ্র, অর্থ ব্যয় ব্যতীত সৎপাত্র কোথায় পাইবেন?

তিনি বিশেষরূপ অবগত আছেন যে, লক্ষ্মীরূপা বঙ্গমহিলা দুষ্টের হস্তে পতিত হইয়া ইহকালের সুখস্বচ্ছন্দে জলা-ঞ্জলি দিতেছে; তিনি জানেন যে, যে রমণী সৎকুলে, সৎপাত্রে, ন্যস্ত হইলে রত্ন স্বরূপা, লক্ষ্মী স্বরূপা, গৃহদেবী স্বরূপা হইয়া সংসারের শ্রী বৃদ্ধি করিতে পারিত, সংসারকে উজ্জ্বল করিতে পারিত, সেই রমণী পিতার দারিদ্র্য বশতঃ অসৎ পাত্রে পতিত হইয়া দুঃখে, ক্লেশে, মনঃপীড়ায় অহর্নিশি অশ্রুজলে ভাসিতেছে। জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া কাশীনাথ আপন কন্যাকে কুপাত্রে অর্পণ করিয়া চিরদুঃখে দুখিনী করিবেন!

দেশাচার! তুইই যত অধর্ম্মের মূল! তোরই জন্য দরিদ্র পিতা আপন আপন দুহিতাকে অপাত্রে অর্পণ করিয়া দুঃখার্ণবে ভাসাইয়া দিতেছে।

হা দুহিতাগণ! কেন তোমরা বঙ্গে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ! তোমাদের যে কি দুঃখ, তোমাদের জন্য আত্মীয় স্বজনের কি ঘোর বিপদ, নির্দ্দয় নির্ম্মম অর্থ পিশাচ পুত্র বিক্রেতা পুরুষগণ তাহা দেখিয়াও দেখে না! সমাজ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে, দয়া শূন্য হইয়াছে। বৈবাহিকের সর্ব্বনাশ করিতে পুত্রের পিতা কিঞ্চিৎমাত্র কুণ্ঠিত নয়! ধিক্ তাহার মনু-ষ্যত্বে, ধিক তাহার কীর্ত্তি কলাপে! রাজ দরবারে তাহার যশস্বী হওয়ায় ধিক্, রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যা উপা-

র্জ্জন করাতেও ধিক্! যাহারা আত্মীয় স্বজনের ক্ষতি করিতে পরাঙ্মুখ নহে, একজনের কন্যা গ্রহণ করিয়া এমন নিকট সম্বন্ধ সত্বেও তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে পরাঙ্মুখ নহে, তাহারা কি পরের, কি সমাজের, কি দেশের, কি জগতের শ্রীবৃদ্ধি করিতে কখন সক্ষম হইবে?

মধ্যে মধ্যে কাশীনাথ এইরূপ চিন্তা করেন, আক্ষেপ করেন, এবং অর্থ নাই—সুতরাং সমাজে সদৃষ্টান্ত দেখাইবার উপায় নাই বলিয়া নির্জ্জনে রোদন করেন। কন্যা দায়, এ ঘোর চিন্তায়, পরের চাকরীতে পরিশ্রম ও দারিদ্র্য হেতু, পুষ্টিজনক আহারের অভাব বশতঃ কাশীনাথ জীর্ণ শীর্ণ, মলিন ও বিশ্রী হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ইদানিং গ্রামে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না,—ছুটির দিবস বহির্বাটীতে একাকী বসিয়া থাকেন, হেমলতাকে দেখিলেই তাঁহার অন্তরানল দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে,—সেই হুতাশনে কাশীনাথ শুকাইয়া যাইতেছেন।

ঐ দেখ, কাশীনাথ আপিস হইতে বাটী আসিতেছেন,—দেখ তাঁহার মুখ বিশুষ্ক, ললাট কুঞ্চিত, চক্ষে জ্যোতিঃ নাই, তাঁহার সর্ব্বাবয়বে অবসাদ লক্ষণ। বসন ঘর্ম্মাক্ত—তাহাও মলিন। কে বলিবে তিনি কাশীনাথ মিত্র,—সৎকুলোদ্ভব কায়স্থ? কে বলিবে তিনি বিদ্যুল্লতার পিতা? বাস্তবিকই, যাঁহারা তাঁহাকে অনেক দিন দেখেন নাই, এখন দেখিলে চিনিতে পারেন না। দারিদ্র্য কি বিষম অবস্থা, চিন্তা কি বিষম বহ্নি! অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করিয়া মনুষ্যের রূপ, চিত্ত-প্রফুল্লতা, স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতাকে খাক করিয়া ফেলে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিদ্যুল্লতা পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার প্রত্যুত্তর পান নাই। কেবল তাঁহার জননী তাঁহাকে সেই পত্রের উত্তরে কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠান—সেকটি কথা এই,—

"মা, তুমি ও সম্বন্ধের আর অনুরোধ করিও না। হেমাকে গহনা দিবে ও কথাও আর মুখে আনিও না। তোমার পত্র পাঠ করিয়া তোমার পিতা অত্যন্ত রোদন করিয়াছেন;—আমার নিকট এমন কথা প্রকাশ করিয়াছেন, বাছা তুমি তাহা শুনিলে কি করিবে বলিতে পারিনা, বলিয়াছেন—অসৎ পাত্রে কন্যাদান না করিয়া বরং দেশত্যাগী হইবেন, জাতি ত্যাগী হইবেন, তাহাতেও হেমার সুপাত্র না পান তবে,—বাছা, সে কথা আমি মুখে আনিতে পারি না—

"তোমরা ভাল থাক, বাঁচিয়া থাক—আমি দেখিয়া মরি, ভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থনা।"

জননীর পত্র পাঠে বিদ্যুল্লতার হৃদয় কতদূর ব্যাকুল, কতদূর কাতর, কতদূর আহত হইয়া ছিল, পাঠক তাহা বুঝিয়া দেখুন। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শ্বাশুড়ীর নিকট বিদায় লইয়া পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হেমলতা সেই বয়স্কা রমণীকে এই জন্যই বলিয়াছিল—"দিদি এসেছেন"।

যখন বিদ্যুল্লতা ব্যাজড়ায় আসিয়া পহুঁছেন—তখন বেলা দ্বিপ্রহর, সুতরাং কাশীনাথ বাটীতে ছিলেন না—আপিসে ছিলেন। দ্বিপ্রহরের পর গৃহ-কার্য্য হইতে

কুলকামিনীদিগের অবসর হইয়া থাকে। বিদ্যুল্লতা আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া এই সময়ে প্রতিবাসিনী রমণীগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিল। মুকুর্য্যেদের সরোজিনী, বাঁড়ুর্য্যেদের বিনোদিনী, ঘোষেদের হেমলতা, বসেদের অপরাজিতা, দত্তদের লীলাবতী, মিত্রদের ইন্দুমতি, সরকারদের শৈলবালা সেনেদের চারুশীলা, আর গয়লা মাসী, তাঁতি পিসী, কামার খুড়ী, নাপতে বৌ, প্রভৃতি কত যুবতী, কত প্রৌঢ়া, কত বৃদ্ধা বিদ্যুল্লতাকে দেখিতে আসিল। সৎগুণান্বিতা বলিয়া, দয়া মায়া, মমতাশীলা বলিয়া বিদ্যুল্লতাকে সকলেই ভাল বাসে।

বিদ্যুল্লতা মৃদু হাস্যে মৃদুভাবে মধুরভাবে সকলকেই আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার সেই মধুর বাক্যে, মধুর আলাপে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। 'এমন সোনার প্রতিমা সীতার কপালে—হায় ভগবান।' 'তা—বাঁচিয়া থাক, তবু দেখিয়া মায়ের প্রাণ শীতল হইবে।' 'আহা বাছার যদি একটা ছেলে থাক্‌ত।' 'মেয়ে নয়ত বিদ্যুল্লতা মায়ের বেটা ছেলে'। 'সত্তি দিদি, আমরা মেয়ে পাইত যেন জন্মে জন্মে বিধুর মত মেয়ে পাই।' 'তা বইকি,—দেখ্‌ দেখি বোন, মার চিঠি পেয়েছে আর দৌড়ে এসেছে।' 'ভগবান ভালরই উপার ঝাল ঝাড়েন বইত নয়।' ইত্যাদি খেদ উক্তি করিতে করিতে প্রতিবাসিনীগণ বিদায় হইল।

'কি ভাই, আমাদের একেবারে ভুলে ছিলে নাকি?' 'দেওর বুঝি ছেড়ে দিতে চান না?' 'যেমন দেওর তেমনি ভাজ।' 'তুই ভাই বড় নিঠুর, তোর সঙ্গে আর কথা কব না,' 'হেঁ ভাই আমাদের স্বর্ণ ভাল আছে?' সমবয়স্কা যুবতীরা বিদ্যুল্লতাকে লইয়া এই রূপ হাস্য, পরিহাস, কথা বার্ত্তায় আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল।

বিদ্যুল্লতা কাহারও নবকুমার কাহারও নবকুমারীকে লইয়া মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন, আদর করিতে করিতে লাগিলেন, খাবার খাওয়াইতে লাগিলেন, আর তাহাদের সঙ্গে রহস্য করিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যে মধ্যে সমবয়স্কাদিগের পরিহাস, ও কথার প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। কে বিদ্যুল্লতাকে ছাড়িতে চায়? অপরাহ্ন হইয়া আসিল তাই অগত্যা—'এখন ভাই বেলা গেল,' 'কাল আবার আস্‌ব.' 'তুই ত ভাই এখন থাক্‌বি,' বলিয়া ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হইল। যাইবার সময় একটী বালক তাহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা ও কে ও মা, আমায় কোলে কর্‌লে, খাবার দিলে? আবার কখন আসবি?' বিদ্যুল্লতা সস্নেহে আবার তাহার মুখ চুম্বন করিলেন—আর বালক বালিকাদিগেরও আবার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—'ছেলেদের আবার নিয়ে এস ভাই।'

বিদ্যুল্লতা মহিলা মেলা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জননীর নিকট গিয়া বসিলেন। পত্রের মর্ম্ম, পিতার অভিপ্রায়, হেমলতার বিবাহের উদ্যোগ শ্রবণ করিলেন।

তাঁহার অন্তঃকরণে যার পর নাই দুঃখ ও অভিমান উপস্থিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমি এমনি হতভাগিনী যে বাবাকে পত্র লিখিলাম তিনি তাহার উত্তর লিখিলেন না, তুমি যা লিখিয়াছিলে মা, তা না লিখাই ভাল

ছিল। ঋণগ্রস্ত হয়ে, বাটী বন্ধক রেখে হেমার বিবাহ দেবেন—তবু আমি হেমাকে দুচারি খানা গহনা দেব লবেন না! আমি যেন এখন উঁহার আর কেহই নই, আমায় যেন উনি কন্যা বলেও মনে করেননা—' বিদ্যুল্লতার অশ্রু প্রবাহ এত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল, যে তিনি অশ্রু-মার্জ্জন করিয়া উঠিতে পারিলেন না—তাঁহার স্বর ভঙ্গ হইল। এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুণরায় সেই ভঙ্গস্বরে কহিতে লাগিলেন,—'মা আমার ত আর ভাই নাই, বোন নাই, হেমাকে সাজাব গোজাব, ভাল ঘরে বিবাহ দেব, হেমা যাতে সুখে থাকে, তা করতে কি আমার সাধ যায় না? হেমার ভাল দেখ্তে কি আমার মন চায়না? বাবা অন্যত্রে ওর সম্বন্ধ করছেন করুন, কিন্তু আমি যেমন তেমন ঘরে, যেমন তেমন বরে হেমার বিবাহ কখন দিতে দেবনা। দেখ মা—নয় আমাকেও আর দেখ্তে পাবে না'—

বিদ্যুল্লতার জননী দুহিতার রোদনে অন্তরে অন্তরে শিরায় শিরায় দগ্ধীভূতা হইতে ছিলেন, তিনি কাঁদিলে বিদ্যুল্লতার দুঃখ পাছে একবারে অসহনীয় হইয়া উঠে, পাছে সেই অধৈর্য্যে বিবেচনাহীন হতবুদ্ধি বালিকার ন্যায় বিদ্যুল্লতা কোন কঠিন শপথ করিয়া ফেলেন, সেই আশঙ্কায় এতক্ষণ অবধি অন্তরাগ্নি অন্তরে চাপিয়া ছিলেন। 'দেখ, মা, নয় আমাকেও আর দেখ্তে পাবে না' বিদ্যুল্লতার মুখে এই কঠোর প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনিও কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং বিদ্যুল্লতার চক্ষের জল মুছাইয়া বলিতে লাগিলেন—'ছি, মা ওকথা কি বলিতে আছে? তুমিত মা আমার তেমন মেয়ে নও, তোমার বুদ্ধি আছে, বিবেচনা শক্তি আছে, মায়ের কাছে কি ওকথা বলিতে আছে, ওকাজ কি করিতে আছে?'

'আমি যদি আজ বিধবা না হইতাম—!' বিদ্যুল্লতার আর কথা মুখেই রহিয়া গেল—তাঁহার জননী বিদ্যুল্লতার মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

মায়ের প্রাণ! তুমি এখনও বাহির হওনা কেন? দুহিতার ঈদৃশ শোকোচ্ছাস শুনিয়াও বাহির হওনা কেন? 'আমি যদি আজ বিধবা না হইতাম' দেখ, বুঝিয়া দেখ, ঐ কয়টি কথায় বিদ্যুল্লতা কি প্রকাশ করিলেন, কি প্রকাশ করিতে পারিলে না, কত বলিবার কত কথা তাঁহার হৃদয়ে রহিয়া গেল! মায়ের প্রাণ! তুমিত তাহা বুঝিতে পারিয়াছ তবে এখনও বাহির হওনা কেন? মায়ের প্রাণ, তুমি না অতি কোমল? সত্যই তুমি কোমল! মায়ের হৃদয়-কপাট লৌহ বা প্রস্তর নির্ম্মিত কপাট হইতেও কঠিন, তাই কোমল প্রাণ, যন্ত্রণায় অধীর হইলেও বাহির হইয়া, শান্তিলাভ করিতে পারে না। বিদ্যুল্লতার জননি! তুমি ধন্যা! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা! তোমার এত সহিষ্ণুতা না থাকিলে বিদ্যুল্লতার প্রকৃতি অমন স্বর্গীয় হইত না। বিদ্যুল্লতা এখন যে একবারে এত অধীর হইয়াছেন—সে কেবল অভিমান বশতঃ; বিধবার যন্ত্রণা, বা বৈধব্য বশতঃ তাঁহাকে কেহ কখনও অধীরা দেখে নাই। তাঁহার বিচিত্র সহিষ্ণুতা—অতুল—অনুপমেয়!

বিদ্যুল্লতার জননীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল, মনের কথা, প্রবোধ বাক্য—কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল না। নীরবে রোদন করিতে করিতে কেবল দুহিতার অশ্রু মুছাইতে লাগিলেন।

বিদ্যুল্লতা আবার কহিতে লাগিলেন,—'আমার বৃথা জন্ম—বৃথা জন্ম। শুধু নরক ভোগ, যন্ত্রণা ভোগ, মাতা পিতাকে ক্লেশ দিবার জন্য। কুমারী অবস্থায় যে মাতাপিতার হৃদয়ের ধন, নয়নরঞ্জন, বিবাহিতা হইলেই যে সেই জনক জননীর যেন আপনার কেহই নয়—যেন কোথাকার কে পর বলিয়া পরিগণিত হয়। হায়!'

বিদ্যুল্লতার জননী অতি কষ্টে,—'চুপ-কর—চুপকর মা' উচ্চারণ করিতে পারিলেন। বিদ্যুল্লতা বলিতে লাগিলেন,—'মা আমি ত কখনও কোন অনুরোধ উপরোধ করি নাই,—মনে বড় সাধ ছিল—হেমার বিবাহ আমিই দিব, সে আশা ঘুচিয়াছে—সাধ ত ঘুচে নাই। সত্য, আমার দশা মন্দ, কিন্তু আমি যে হেমাকে বড় ভাল বাসি মা,—বাবা কেন তবে আমায় সে সাধে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন!'

বিদ্যুল্লতার জননী অন্য কথায় কন্যাকে প্রবোধ দিতে না পারিয়া কহিলেন,—'আচ্ছা মা, তুমিই হেমার বিবাহ দিও;—এখন চুপ কর, তাঁর আসিবার সময় হতেছে, তোমায় কাঁদতে দেখিলে তিনি আবার কেঁদে সারা হবেন—চুপ কর।'

বিদ্যুল্লতা শোক, দুঃখ ও অশ্রু যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া পিতার অবশ্যকীয় জিনিষপত্র গুলি গুছাইয়া রাখিতে গেলেন।

ক্রমশঃ।

বিবাহ।

বিবাহ পদ্ধতি দ্বারা স্বাস্থ্যের কিরূপ বিঘ্ন জন্মিতে পারে, এবং কি উপায়ে তাহা দূর করা যাইতে পারে তাহাই এই প্রস্তাবের বর্ণনীয় বিষয়।

এ স্থলে বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে, এবং তাদৃশ প্রবন্ধ লেখাও আমার সাধ্যাতীত। বিশেষতঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয়, শ্রীযুক্ত [illegible]ণ তর্করত্ন মহাশয় প্রভৃতি ঐ বিষয়ে [illegible] লিখিয়াছেন তাহার পর বিবাহ বিষয়ে [illegible] না [illegible]কের হস্তক্ষেপণ করা সম্পূর্ণ নিষ্প্র[illegible] তাই [illegible] কেবল আধুনিক বিবাহ-পদ্ধতি [illegible] স্বাস্থ্যের কিরূপ ও কি পরিমাণ বিঘ্ন জন্মিতে পারে ও তাহা নিবারণের সদুপায় কি তাহাই লিখিয়া ক্ষান্ত হইব।

এতদ্বিষয়ক আলোচনা করিতে হইলে আধুনিক হিন্দু ও মুসলমান বিবাহ সম্বন্ধে লিখিতে হইবে। আধুনিক হিন্দু-বিবাহ প্রথা যে ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং জাতিগত নানা অনিষ্ট পাতের মূল তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন; এবং যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা উল্লিখিত মহোদয়গণ প্রণীত পুস্তক গুলি পাঠ করেন।

আধুনিক হিন্দু-বিবাহ দ্বারা সামাজিক অন্যান্য অনিষ্টের সহিত যে সাধারণ

স্বাস্থ্যেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, প্রথমতঃ আমি তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

(১) হিন্দুবিবাহ—

(ক) বাল্য বিবাহ,(খ) অসমান বিবাহ, (গ) বহু বিবাহ, (ঘ) অসবর্ণ বিবাহের অভাব (ঙ) এবং বিধবা বিবাহের অভাব, এ সকলই, সাধারণ স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এ সকল গুলিই সম অনিষ্টকারী নহে।

"বাল্য বিবাহ"—অর্থাৎ বালক ও বালিকার যৌবন কাল প্রাপ্ত ও পূর্ণ বয়স্ক হইবার পুর্ব্বে যে বিবাহ হয়। এইরূপ বিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। ৮.১০ বৎসর পুর্ব্বে পিতা মাতাগণ তাঁহাদিগের সন্তানের যে বয়সে বিবাহ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য মনে করিতেন, এক্ষণে সে বয়সে সন্তানের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন না; এবং উপযুক্ত পাত্র ও কন্যামনন করিতেও আজি কালি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক বিলম্ব ঘটিতেছে; সুতরাং অনেক সময় অনিচ্ছা পুর্ব্বকও বিলম্ব করিতে হয়। তাঁহারা এখনও দেখিতেছেন যে, দুই এক বৎসর বিলম্ব হইলে বাস্তবিক বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না। এই কয়েক প্রকার ঘটনা মিলিত হওয়াতে এক্ষণে সচরাচর গৌরী দানে বিবাহ হইতে দৃষ্ট হয় না—কন্যা প্রায় ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, এবং উচ্চ শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়া, ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সংগ্রহ করা সুকঠিন হওয়ায়, এবং "বর" দুই তিনটি "পাস" না করিলে মাননীয় হইতে পারেন না বলিয়া সচরাচর মধ্যম শ্রেণী গৃহস্থের বাটীতে পুত্রের বিবাহও প্রায় ২০।২১ বৎসরের পূর্ব্বে ঘটিতে পারে না। কিন্তু সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অতি অল্প বয়সে আপন আপন পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন; এবং ঐ বিবাহ আইন বিরুদ্ধ নহে সুতরাং উহার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। কিন্তু যদি পিতা মাতাগণ বাস্তবিক বিবাহের উদ্দেশ্য বুঝিতেন, এবং সন্তান সন্ততিগণের মঙ্গল কামনায় বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করা ধর্ম্ম মনে করিতেন, এবং তাহা না করিয়া তাঁহারা যত প্রকার অনিষ্টপাতের উপায় করিতেছেন ও আপন আপন কার্য্য দ্বারা সন্তান সন্ততির যত অমঙ্গলের সূত্রপাত করিতেছেন তাহা অনুভব করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, তাঁহারা কদাচ বাল্যবিবাহ অনুমোদন করিয়া ঐ রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

মহামতি স্পেনসার সাহেব তাঁহার 'ষ্টডি অব সোসিয়লজি' নামক গ্রন্থের ২৪পৃষ্ঠে বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—"সমুদায় উচ্চ শ্রেণীস্থ জীবের মধ্যে স্বীয়(শারীরিক ও মানসিক) উন্নতি ও বৃদ্ধি প্রায় সম্পূর্ণ হইলে পর নূতন জীব উৎপাদন করা সম্ভবে; এবং আত্ম সমর্থনের (রক্ষণের) আবশ্যক অপেক্ষা জীবনীশক্তি যে পরিমাণে অধিক থাকে সেই পরিমাণে নূতন জীবের উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। যখন আত্মোন্নতির অভাব সমুদায় হ্রাস হইয়া আইসে, এবং আত্মরক্ষা ও সন্তান প্রতিপালন উপযোগী শক্তি উদ্বৃত্ত হয় তখন সন্তানোৎপাদন বৃত্তি সমুদায়ও তদানুষঙ্গিক মানসিক ভাব (Emo-

tions) সমুদায় প্রবল হয়; এবং সাধারণতঃ যে পরিমাণে ঐ জীবনীশক্তি উদ্বর্ত্ত হয় সেই পরিমাণে ঐ বৃত্তি ও মানসিক ভাব সমুদায় প্রবল হয়।"

বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তানোৎপাদন ও বংশ বর্দ্ধন। সামাজিক শান্তিরক্ষা, সামাজিক বলবর্দ্ধন, গৃহ কার্য্য সম্পাদনের সুশৃঙ্খলা, এবং শারীরিক যন্ত্র সকলকে নিরূপিত কার্য্য করিতে দেওয়া ইত্যাদি বিবাহের অন্যান্য উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। অতএব যাহাতে ঐ প্রধান উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে তাহাই প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে।

যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত স্ত্রী ও স্বামীর সঙ্গমে সন্তান উৎপাদন হয়। এই স্থলে শারীর বিধান বিজ্ঞানের (Physiology) আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। পুরুষের শুক্র-গ্রন্থি হইতে সঙ্গম কালে যে রস নিঃসৃত হয় তাহার নাম শুক্র। উহা দেখিতে প্রায় অণ্ড লালের ন্যায় তরল, কতক কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ বিশিষ্ট। অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে উহাতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজীব পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদিগের আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেঙ্গাচির ন্যায়, উহারা মস্তক ও লেজ বিশিষ্ট। উহারা জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ৭।৮ দিবস পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু উহার বহির্ভাগে ১০।১২ ঘণ্টা মধ্যেই নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। উহাদিগের নাম স্পার্মেটোযোয়া; উহারাই বাস্তবিক অঙ্কুরোৎপাদক, এবং শুক্রের প্রধান অংশ; ইহা ব্যতীত অন্য কোন অংশ দ্বারা গর্ভাধান হইতে পারে না। ঐ "অঙ্কুরোৎপাদক জীব স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়ে উপস্থিত হইয়া "ওভরি" নামক দুই বীজকোষাভিমুখে গমন করে, পরে পথিমধ্যে (Fallopian tube) বীজকোষ হইতে বহির্গত অনাবৃত বীজে সংযুক্ত হয়। রজোদর্শনের সময় বা কিঞ্চিৎ পরে বা কি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ বীজ স্ত্রীর বীজকোষ হইতে বহির্গত হইয়া "ফেলোপিয়ান টিউব" নামক নলী দ্বারা জরায়ু-মধ্যে প্রবেশ করে।

প্রতি মাসে রক্তস্রাব কালে এক বা অধিক বীজ অঙ্কুরিত হইবার উপযুক্ত পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইয়া বীজকোষকে ভগ্ন করিয়া বহির্গত হয়, ঐরূপ কতকগুলি বীজ উভয় কোষেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু যাবৎ অঙ্কুরিত হইবার উপযুক্ত না হয় তাবৎ বীজকোষ পরিত্যাগ করে না। ঐ পূর্ণায়তন বিশিষ্ট অনাবৃত বীজের সহিত পুরুষের অঙ্কুরোৎপাদক বীজ সংযুক্ত হইলে ঐ বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয়। ঐ অবস্থায় বীজ জরায়ু মধ্যে উপস্থিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি ও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। ঐরূপে জরায়ু মধ্যে সন্তানের প্রথমে জন্ম হয়, পরে তথায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর বীজ (ওভম) এতদুভয়ের সঙ্গম ব্যতিরেকে কেবল শুক্রের দ্বারা, বা কেবল বীজ দ্বারা সন্তান উৎপাদন হইতে পারে না। আরও ঐ দুই প্রকার বীজ সুপক্ক না হইলে গর্ভাধান হয় না। শুক্রে যথোচিত পরিমাণ অঙ্কুরোৎপাদক বীজ, ও স্ত্রীর বীজ কোষে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত বীজ না থাকিলে গর্ভ হইতে পারে না। যেমন সুপক্ক বীজ অনুর্ব্বর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, কিম্বা সারবতী ভূমিতে অপক্ক বীজ বপন করিলে

অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে না, বা হইলেও তাহার তেজ থাকে না ও শীঘ্রই শুষ্ক হয়। তেমনই পরিপক্ক অঙ্কুরোৎপাদক বীজ অপক্ক স্ত্রী বীজের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহা হইতে কোন ফল ফলিতে পারে না, বা যদি ফলে তবে শীঘ্র শুষ্ক ও মৃত হইয়া যায়; এবং অপরিপক্ক পুরুষ বীজও সুপক্ক স্ত্রী-বীজের সহিত মিলিত হইলে কোন ফল ফলে না, বা অতি ক্ষীণ বল সন্তান জন্মে, তাহাও শীঘ্র মরিয়া যায়।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে কোন বয়সে স্ত্রী ও পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিপক্কতা লাভ করে। প্রাচীন হিন্দু বিচক্ষণ শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়া গিয়াছেন যে (পুরুষ) 'দ্বিজ গুরুর অনুজ্ঞা-লাভের পর যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্ত্তন করিয়া সজাতীয় সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিবেক।' এই বিধি অনুসারে বিদ্যাভ্যাস ও সদাচার শিক্ষার পর দার পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হয়।" (বিদ্যাসাগর প্রণীত বহু বিবাহ)

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে মনুষ্যের বিবাহ কাল ২৪ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্তই প্রশস্ত ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, 'পুরুষের যৌবন কালে এবং সাধারণত ২৪ বৎসরের বয়সের পর হইতেই দার গ্রহণ করা শাস্ত্রাভিপ্রেত বোধ হয়।' আর ঐ পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছেন যে, পুরুষ যৌবনে পদার্পণ করিবামাত্র যে বিবাহ করিতে সক্ষম হইবে এমত নহে। ২৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যে পুরুষেরা বিবাহ করিতে অনুমতি চাহিত এমত বোধ হয় না। কিন্তু আধুনিক শারীর-বিধান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রমেই বালকের যৌবন আরম্ভ হয় ও ঐ কালেই তাহার সন্তান উৎপাদিকা শক্তি জন্মে। তথাপি পুরাতন হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ২৫ বৎসর বয়সই বিবাহকাল বলিয়া কেন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বাবু যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহাই আমিও সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, 'অস্মদ্দেশে পুরুষদিগের ১৪।১৫ বৎসর বয়ঃক্রমে শুক্র জন্মিয়া থাকে। এই অভিনব শুক্র ভ্রূণোৎপাদনের উপযুক্ত নহে সুতরাং যতদিন উহা পরিপক্ক না হয় ততদিন তাহার ক্ষয় নিষ্প্রয়োজনীয়। অন্য পক্ষে এত অল্প বয়সে শুক্র ক্ষয় হইলে মনুষ্যের দৈহিক ও মানসিক অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর যদিও অপরিপক্ক শুক্র সংযোগে কোন কোন স্থলে সন্তান জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহা পরিপক্ক শুক্রোৎপন্ন ভ্রূণের ন্যায় কখন সুদৃঢ়, সবল, ও দীর্ঘজীবি হয় না। এই সমস্ত অনিষ্টরাশি নিরাকরণ মানসে এবং শুক্র ধারণের প্রকৃত কাল নির্ব্বাচনের নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা কেহ ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, কেহবা বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর বিবাহ করিতে অনুমোদন করিয়াছেন' যদি সকলেই ঐ শাস্ত্রোক্ত বয়সে বিবাহ করিত তাহা হইলে পুরুষের বিবাহ বয়স সম্বন্ধে আমাদের কোন আপত্তি থাকিত না, কিন্তু অধুনা শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ চলিতেছে। বেদাধ্যয়ন করিতে ও পাঠ সমাপন করিতে বিলম্ব হয় বলিয়া ২০।২১ বৎসরেই প্রায় অনেকের বিবাহ হইয়া থাকে।

এক্ষণে কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ভুবনেশ্বর

বাবু মুনিগণের আজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে 'এই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কন্যার অন্যূন অষ্টম বর্ষ হইতে রজোদর্শনের পূর্ব্বে যে সময় অথবা কাহার২ মতে দ্বাদশ ও ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত এবং পুরুষের যৌবন কালই বিবাহের উপযুক্ত কাল' (৬ পৃষ্ঠা), 'প্রায় সকল শাস্ত্রকারদিগের মতে অবিবাহিতা রজঃস্বলা কন্যা নিন্দার্হ হইতেছে' (পৃষ্ঠা ৭) পুনশ্চ 'উপরে নারীর যে বৈবাহিক বয়ঃক্রম দেখান হইল তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অভিপ্রায় মাত্র। বস্তুতঃ প্রাচীন সমাজে কন্যা বয়স্থা না হইলে তাহার পরিণয় সম্পাদিত হইত না, এ বিষয়ে ইতিহাস ভূরি ভূরি সাক্ষ্য দিতেছে; দময়ন্তী, ইন্দুমতী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, গান্ধারী, দেবযানী, প্রমদ্বরা, পৃথা, সাবিত্রী, জানকী প্রভৃতি উচ্চবংশ সম্ভূতা আর্য্য কামিনীগণ যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিলে তাঁহাদিগের বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদন হইয়াছিল। ইহাঁরাই আবার পতিব্রতাগ্রগণ্যা হইয়া আর্য্য কুলের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াগিয়াছেন। যখন প্রধান প্রধান বংশে নারীর বয়ঃস্থাবস্থায় পরিণয় হওয়ার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তখন সমাজ সাধারণে যে ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।' (৯ পৃষ্ঠা) শাস্ত্রকারদিগের উল্লিখিত বিবাহ বিষয়ক নিয়ম করিবার উদ্দেশ্য ভুবনেশ্বর বাবু বিশেষ চিন্তার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন তন্মধ্যে দ্বিতীয়টী (যথা—'গর্ভধারণের কাল উপস্থিত হইলে পুরুষ (স্বামী) সহবাস (বিবাহ) ঈশ্বরাভিপ্রেত জাতিবর্দ্ধন কার্য্যের বিঘ্ন না হয়'.) সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। কারণ বিবাহ বিষয়ক অন্যান্য যে সমুদায় বিধি আছে তাহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, পুরুষ ও স্ত্রী স্বজাতি বর্দ্ধন না করিলে মহাপাতকগ্রস্ত হয়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ নামক পুস্তক হয় হইতে ঐ রূপ কতকগুলি আদেশ উদ্ধৃত করিলাম।'

'স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টমবর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশমবর্ষে, কন্যামাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, ও অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে অধিবেদন করিবেক।' (৫ পৃ) 'যদি স্ত্রী চিররোগিনী হয়, তাহা হইলে অধিবেদন করিবেক।' (৬ পৃ) 'পরাশর বলিয়াছেন যে স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হই‌লে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত।' ('বিধবা বিবাহ' ২১ পৃ) 'বাগদান করিলে পর বিবাহের পূর্ব্বে যে কন্যার পতির মৃত্যু হয় তাহাকে তাহার দেবর এই বিধানে বেদন করিবেক। বিধবা লক্ষণ ধারিণী সেই কন্যাকে দেবর যথা বিধানে গ্রহণ করিয়া সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঋতুকালে এক একবার গমন করিবেক।' (৬৩ পৃ)

'যে নারী ঋতুস্নান করিয়া স্বামীর সেবা না করে সে মরিয়া নরকে যায় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।'

'পাণ্ডু কুন্তিকে কহিতেছেন হে পতিব্রতে রাজপুত্রি! ধর্ম্মজ্ঞেরা ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানেন যে প্রত্যেক ঋতুকালে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করিবেক না।' (৯১ পৃষ্ঠা) এইরূপ আরো অনেক নিয়ম ও তৎসাময়িক প্রথা জ্ঞাত হইলে স্বভাবতঃ মনে ধারণা

হয় যে, পূর্ব্বকালে শাস্ত্রকারেরা সন্তান উৎপাদন করাই এক প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন, ও যে কোন প্রকারে সন্তানোৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষ অবশ্য বিবাহ করিবেক, বিবাহ না করিলে নরকগামী হইবে; যাহারা বিবাহ না করিবে তাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইবে না।—'গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না' (১৭২ পৃ) 'দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ আশ্রম বিহীন হইয়া একদিনও থাকিবে না; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয়।' 'কেবল গৃহবাস দ্বারা গৃহস্থ হয় না, ভার্য্যার সহিত গৃহে বাস করিলে, গৃহস্থ হয়, যেখানে ভার্য্যা সেই খানে গৃহ, ভার্য্যাহীন গৃহ বন।' (১৭৩ পৃ) 'যাবৎ আটচল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হয়, পুত্রহীন ও ভার্য্যাহীন ব্যক্তির যজ্ঞে অধিকার নাই।' (১৭৪ পৃ) 'হে দেবর্ষি! সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও দার পরিগ্রহ করিবেক।' (১৭৫ পৃ)

এইরূপে দেখা যায় যে হিন্দুশাস্ত্র মতে বিবাহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীর সহিত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাস করা, ঋতুকালে পত্নিগমন করা, পত্নী বন্ধ্যা বা চিররোগিনী ইত্যাদি দোষাশ্রিতা হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ করা অবশ্য প্রতিপাদ্য বিধি সকল প্রচলিত থাকাতে সহজেই বোধ হইতেছে যে, সন্তানোৎপাদনের, বিশেষতঃ পুত্রোৎপাদনের কোন প্রকার ব্যাঘাত না থাকে, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় ছিল; এবং ৩। ৪ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এরূপ অভিপ্রায় হওয়ারও বিশেষ কারণ ছিল। এক্ষণে সে সমস্ত কারণ নাই তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা ২৪ হইতে ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে (যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত) পুরুষের পরিপক্ব শুক্র, অষ্টম, বা দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা, অযৌবন-প্রাপ্তা অপরিপক্ব-দেহ, বালিকার শোণিতের সহিত সম্মিলিত হওয়ার বিধি দিয়াছেন। ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে, তৎকালে শারীর বিদ্যা (Physiology) অত্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নর-বীজ নারী-বীজের সহিত সংযুক্ত হইলেই গর্ভ সঞ্চার হয় নচেৎ নহে, জরায়ু নিঃসৃত শোণিতের সহিত শুক্রের সংস্পর্শ না হওয়াই মঙ্গলকর। আর প্রতীয়মান হইতেছে যে, শাস্ত্রকারগণের মতে শুক্রেরই পরিপক্বতা আবশ্যক করে, (নারী বীজ) এবং নারীর আভ্যন্তরিক যন্ত্রের পরিপক্বতা না হইলেও তাঁহাদিগের মতে ক্ষতি ছিল না; তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে (নর) বীজ পরিপক্ব হইলে সামান্য উর্ব্বরা ক্ষেত্রে (অপরিপক্ব নারী-শরীরেও) তাহার অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে, এ কথা কতক পরিমাণে সত্য, কিন্তু তাঁহারা সেই অঙ্কুর হইতে সতেজ বৃক্ষ, জন্মিয়া প্রচুর ফলদান করিবে কি না না ভাবিয়া কেবল মাত্র অঙ্কুরের সংখ্যা গনিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। এক্ষণেও ঠিক তাহাই হয়; আধুনিক বিবাহের অনেকগুলি ফল ফলে বটে কিন্তু তাহার অনেকগুলিই অকালে শুকাইয়া ভূমে পতিত হয়; এবং যাহা থাকে তাহাও পরিপুষ্ট বা সুপক্ব হয় না। তাঁহাদিগের

হতে, প্রথম রজোদর্শনাবধি যাবত গর্ভা-ধান না হয় তাবত স্ত্রী ঋতুস্নানের পর স্বামী-সহবাস করিবে সুতরাং বিবাহ কার্য্য প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। পুরুষের শুক্র প্রথমে প্রায় ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আরও ৮ বৎসর উহা পরিপক্কতার জন্য রক্ষিত হইত, কিন্তু নারী শোণিত (বীজ) ১০। ১১ বৎসর বয়ঃক্রম নিঃসৃত হইলেও উহার পরিপকতা বা জননেন্দ্রিয়ের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

মা ও মেয়ে

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরল-হৃদয়া শরৎকুমারী কাষ্ঠ পুত্তলীর ন্যায় ভাবে সমস্ত কথা শুনিল। তাহার মালিন্য বিরহিত পবিত্র হৃদয়ে পাপ কি তাহার জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই। তাহার সম্বন্ধে যে যে অপরাধ ঘোষিত হইতেছে, সে তাহার কিছুই জানে না—সে তাহার কিছুই বুঝে না। যে কর্ম্ম সে কখন করে নাই, যে দোষে তাহার কোন সংস্রব নাই, এবং যে কার্য্য হেতু তাহার সরল হৃদয় একবারও সঙ্কুচিত বা কাতর হয় নাই সেরূপ কোন কার্য্যের জন্য যদি লোক মন্দ কথা কহে, তবে যাহারা সেরূপ নিন্দাবাদ করে তাহারাই প্রকৃত দোষী। সুতরাং সেরূপ কারণে শরৎকুমারীর মনে কোন প্রকার রাগের সঞ্চার হইল না; বিশেষ দুঃখও হইল না। ভাবিল 'লোকে যদি বলে অমুকের অনেক জিনিষ চুরি গিয়াছে, অথচ সে যদি দেখে তাহার কোন জিনিষই লোকসান হয় নাই, যাহা যেমন তাহা ঠিক তেমনিই আছে' তাহা হইল সে যেমন লোকের কথা শুনিয়া দুঃখিত হয় না, তেমনি আমি যখন দেখিতেছি লোকে যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা তখন আমার দুঃখিত, কাতর বা লজ্জিত হইবার কোনই কারণ নাই তো।' কিন্তু বালিকার মনে অন্য কারণে বিষম কষ্ট উপস্থিত হইল। সংসার-বোধ-বিহীনা বালিকা সে চিন্তায়, সে কষ্টে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার জন্য আজি তাহার এক-মাত্র আশ্রয়, পরম স্নেহ নিকেতন, পিতা মাতার শুভাভিষিক্ত এবং প্রতিপালক দীননাথ ও করুণাময়ী যার পর নাই কষ্ট পাইতেছেন এ চিন্তা তাহাকে নিতান্ত ব্যথিত করিতে লাগিল। বালিকা কাঁদিতে লাগিল। ভাবিল, এ অভাগিনীর জীবন কেবল অনন্ত ক্লেশ আচ্ছন্ন। কোথায় পিতা—আজি কোথায় মাতা! কোথায়

গৃহ, কোথায় অন্ন বস্ত্র! দুঃখিনীর ইহজগতে কিছুই নাই। পরের আশ্রয়ে, পরের অন্নে, পরের স্নেহে, পরের অনুগ্রহে বাঁচিয়া আছি। কিন্তু কি পরিতাপ, আজি সেই অকপট আত্মীয়ও এ দুঃখিনীর জন্য বিপদাপন্ন। আজি আমিই তাঁহাদের যাবতীয় ক্লেশের, যাবতীয় মনস্তাপের এবং যাবতীয় দুশ্চিন্তার কারণ। এ অভাগিনী যে দিক দিয়া যাইবে সেই দিকেই কি বিপদ, চিন্তা, হাহাকার, রোদন প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে যাইবে? এরূপ জীবন লইয়া এ সংসারে কেমন করিয়া থাকিব?

বালিকা এইরূপে পিতার কথা, মাতার কথা মাতার দেশব্যাপী কলঙ্কের, দীননাথ ভট্টাচার্য্যের কথা একে একে সকলই ভাবিল। ক্রমে তাহার মনে হইল,—'আমি কে? আমার জন্য ইঁহারা এত কষ্ট কেন সহ্য করিবেন? আমি যদি না থাকি, তাহা হইলে, এ সকল বিপদ কিছুই ঘটিবে না। যত দায়, যত বিপদ, যত চিন্তা সকলই আমার জন্য। আমি যদি না থাকি, তাহা হইলে সে সকলও থাকিবে না। তবে আমার অভাবে উহাঁদের বড় কষ্ট হইবে বটে। কিন্তু বর্ত্তমান কষ্টের চেয়ে সে কষ্ট ভাল, কারণ তাহাতে লজ্জা নাই, অপমান নাই, ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব আমার এখানে না থাকাই পরামর্শ। আমি এখানে আর থাকিব না।

থাকিব না,—যাইব কোথায়, করিব কি, খাব কি, ইত্যাদি কোন চিন্তাই বালিকার মনে আসিল না। বালিকা স্থির করিল,—এখানে থাকিয়া ইহাঁদের কষ্ট দিব না। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, আমি আজি রাত্রেই এখান হইতে চলিয়া যাইব—এখানে আর থাকিব না।'

তখন বালিকা কেমন করিয়া এই পিতৃমাতৃবৎ আত্মীয়জনকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব ভাবিয়া অধোবদনে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিকা হৃদয়কে অনেকটা দৃঢ়, অনেকটা সহিষ্ণু করিয়া লইল। গাত্রোত্থান করিয়া শরৎ হাত জোড় করিয়া, গলায় বস্ত্র দিয়া মনে মনে বলিল,—

"পিতামাতা, অভাগিনী অনেকদিন হারাইয়াছে। কিন্তু আপনাদিগের অনুকম্পায় পিতা মাতার অভাব আমি জানিতে পারি নাই। আজি আপনাদের কাছ ছাড়া হইতেছি, আজি আমি যথার্থই পিতৃমাতৃহীনা হইলাম। আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেও পারিলাম না। দেখা করিলে আমাকে আপনারা ছাড়িবেন না তো। কিন্তু আপনাদের এ বৃদ্ধ বয়সে, এ ধর্ম্মচিন্তার সময়ে, আমি আপনাদের সর্ব্বপ্রকারে ব্যাঘাত করিব না। অতএব বাবা, মা, আজি তোমাদের শরৎ বিদায় হইল। আমি তোমাদেরই দাসী। তোমরা দাসীকে আশীর্ব্বাদ করিও।'

চক্ষের জলে বালিকার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে ঘরের দ্বার খুলিল—বাহিরে আসিল। তখন আবার বলিল,—

"এই অসীম সংসারে অসংখ্য মানুষ কীট পতঙ্গ পশুপক্ষীর যে উপায়, আমারও সেই উপায়। যিনি সকলকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করিবেন।"

বালিকা আবার একবার গৃহের দিকে

চাহিয়া দেখিল। আবার অলকে ঘুমাইয়া বাহিরে আসিল।

তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। বসুন্ধরা নিস্তব্ধ। রজনী যেন ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। অন্ধকারের গাঢ়তা যেন কমিয়া গিয়াছে। শ্বেতবসনা ঊষা সতীর পিঙ্গলবর্ণা অগ্রদূতী যেন দেখা দেয় দেয় হইয়াছে। শরৎকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতে লাগিল। কোথায় যাইবে, অদৃষ্টে কি হইবে, মানবের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, পদে পদে কতই বিপদ বালিকা তাহার কিছুই জানে না। সুতরাং যেদিকে পথ দেখিল সেই দিকেই অগ্রসর হইল।

বালিকে শরৎকুমারি! চারিবৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, আজি আবার বলিতেছি, এ 'সুখের সংসারে' দুঃখের ভাগই অধিক। এই দুঃখরাশি ভেদ করিয়া দৈবাৎ সময়ে সময়ে কণিকামাত্র সুখ আসিয়া দেখা দেয়। সেই অত্যল্প সুখ তখন সকল বিগত ক্লেশ, বিগত যাতনা ভুলাইয়া দেয় এবং সংসারকে পরম সুখের স্থান বলিয়া প্রতীত করে। বৎসে! অধীরা হইও না— ব্যস্ত হইও না। যদি এ সুখের সংসার সম্ভোগে সাধ থাকে তবে সহিষ্ণুতা সহকারে সুস্থির হইয়া অপেক্ষা কর। অবশ্যই একদিন সুখ তোমার আয়ত্তগত হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় বারোটা। বড় রৌদ্র; সূর্য্যদেব যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন। ধরা যেন তাপে তাপিত হইয়া কাঁপিতেছে। একটী পাখীটী পর্য্যন্ত ডাকিতেছে না। যদি কোথাও একটা কাক থাকিয়া থাকিয়া চাপা গলায় অস্ফুটস্বরে এক একবার ডাকিতেছে। কোন জীবই আহারাদি স্বাভাবিক কার্য্যের চেষ্টাও করিতেছে না। সকলেই অলস, শিথিল ও নিশ্চেষ্টভাবে বাছিয়া বাছিয়া শীতল স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া আতপ-তাপ হইতে শরীর রক্ষা করিতেছে।

রূপনগরের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে একটী জনহীন প্রান্তর মধ্যে চারিদিকে বাঁশ, অশ্বত্থ, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষ সমাবৃতা ক্ষুদ্র একটী পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণী তীরে বৃক্ষছায়ায় শরৎকুমারী বসিয়া কাঁদিতেছে। কোমলাঙ্গী বালিকার পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে; বদনমণ্ডল শুষ্ক হইয়াছে; দেহ যৎপরোনাস্তি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; ক্ষুৎপিপাসাও নিতান্ত কাতর করিয়াছে। বালিকা শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত এই শীতল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখানে আসিয়াই তৃষ্ণা দূর করিবার নিমিত্ত অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া প্রথমতঃ পেট ভরিয়া জল খাইয়াছে। পথে লোকের সঙ্গে শরৎকুমারীর প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। যে দুই একজন লোকের সহিত দেখা হইয়াছিল তাহারা প্রায়ই হয়ত তাহার প্রতি অস্বাভাবিক ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, কেহ কেহ বা দুই একটা কদর্য্য পরীহাস করিয়াছে। বালিকা লোকের ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে এবং ভাবিয়াছে, এ জগতে যদি সকলেই দেবেন্দ্র নারায়ণ হইত তাহা হইলে কি সুখের বিষয় হইত।

বালিকা বৃক্ষ-ছায়ায় বসিয়া কাঁদিতেছে। কাঁদিতেছে কেন? বালিকা ভাবিতেছে,—'কি করিলাম, এ কোথায় আসি-

জাম, এখন কোথায় বা যাইব? কত পথই আসিয়াছি। ফিরিয়া যাইব? না না, আর ফিরিব না। না জানি বাবা মা কতই কাদিতেছেন, কতই খুঁজিতেছেন। আমি ফিরিয়া গেলে তাঁহাদের কতই আনন্দ হইবে। কিন্তু আমি থাকিলে তাঁহাদের কষ্টও অনেক বাড়িবে। তাঁহারা সমাজে স্থান পাইবেন না, আমার জন্য তাঁহাদিগকে পাপীর ন্যায় ঘৃণিত হইয়া থাকিতে হইবে, আমার জন্য তাঁহাদিগকে লোকের কত কথাই সহিতে হইবে, আর আমার জন্য তাঁহাদের কষ্টের—উদ্বেগের সীমা থাকিবে না। তবে ফিরিব কেন? ফিরিয়া কাজ নাই। কিন্তু এখন যাই কোথা—করি কি?"

আবার বালিকা অনেকক্ষণ অনেক কথা আলোচনা করিল। তাহার পর ভাবিল, 'এই পুষ্করিণীর জলে যদি ডুবি তাহাতে ক্ষতি কি? আমি মরিলে এ জগতের লাভ বই লোকসান্ নাই। আমি কাহারও কখন কোন কাজে লাগিব এমন বোধ হয় না। স্বয়ং কেবল দুঃখই ভোগ করিতেছি, আত্মীয় জনকেও কেবল দুঃখই দিতেছি। সম্মুখেও তো কোন সুখের চিহ্ন দেখিতেছি না। তবে এ জীবন নাই রাখিলাম। মৃত্যুর সুযোগও তো বেশ উপস্থিত।'

বালিকা যখন এইরূপ ভাবনা ভাবিতেছে তখন তাহার অজ্ঞাতসারে পশ্চাদ্দিক হইতে দুইটী লোক সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। লোক দুইটীর পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাদিগকে ইতর, অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়াই বোধ হয়। আগন্তুকদ্বয়ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আসিয়াছিল বলিয়া বোধ হইল। তাহারা এরূপ স্থলে একটী যুবতী বসিয়া আছে দেখিয়া প্রথমতঃ বিস্ময়াবিষ্ট, পরে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শরৎকুমারীর নিকটস্থ হইল। শরৎকুমারী তাহাদিগকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। আগন্তুকদ্বয়ের একজন বলিল,—

"ভয় নাই—ভয় নাই—চমকাও কেন? আমরা মানুষ—খায় না।"

শরৎকুমারী লজ্জায় বদন বিনত করিলেন। পুরুষও দেখিল যে তাহাদের সম্মুখস্থা কিশোরী সুন্দরীর শিরোমণি। তাহারা আরও বুঝিল যে, সুন্দরীর নেত্রদ্বয় এখনি অশ্রুত্যাগ করিতেছিল। একজন বলিল,—

"তুমি কাঁদিতেছিলে? তোমার এই বয়স, এত রূপ—তোমার কিসের দুঃখ? তুমি একটু হাসিয়া চাহিলে, দুটা কথা কহিলে কত লোক কৃতার্থ হইয়া যায়। তোমার চক্ষে জল?"

শরৎকুমারী কি বলিবেন? তিনি বুঝিলেন এখানে আর থাকা ভাল নয়। ভাবিলেন,—"হায় এ দারুণ রৌদ্রের সময় এই শীতল স্থানটায় বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম, ভগবান তাহাতেও বাদী! অভাগিনীর কপালে কি কোন প্রকারে সুখ নাই?

দীর্ঘ নিশ্বাস সহ শরৎকুমারী গাত্রোত্থান করিলেন এবং অবনত মস্তকে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। তখন আগন্তুকদ্বয়ের একজন গিয়া তাঁহার সম্মুখে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—

"সে কি? যাও কোথা? আলাপ পরিচয় হইল, দুদণ্ড এখানে থাক, চাঁদমুখে দুই একটা কথা কও—আমোদ আহ্লাদ

কর—তার পর যদি নিতান্তই যেতে হয় বলিও, যেখানে যাবে, আমরা মাথায় করে পৌঁছে দিয়ে আসিব।"

আগন্তুকদ্বয়ের একজনই প্রথম হইতে কথা কহিতেছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক্ষণে বক্তার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল এবং বলিল,—

"ছিঃ কর কি? কাজ কি? ও বদ্‌রসিক মেয়ে মানুষ, ওকে যেতে দাও।"

শরৎকুমারী পথ পাইয়া দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। লোকটা সঙ্গীকে বলিল,—

"এও কি কথা? হাতে পেয়ে ছাড়্‌তে আছে। তোমার মত আহাম্মক দুনিয়ায় আর নাই। ছেড়ে দেও ধরে আনি।"

শরৎকুমারী পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন লোকটা সঙ্গীর হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছে। শরৎকুমারী দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। লোকটা শরৎকুমারীকে দৌড়াইতে দেখিয়া সঙ্গীর হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত বড়ই জোর করিতে লাগিল তাহার সঙ্গীও তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত করিতে লাগিল এবং সাবধানতা সহকারে ধরিয়া রাখিল। অনেকক্ষণ গোলমালের পর লোকটা সঙ্গীর হাত ছাড়াইয়া বেগে ছুটিতে লাগিল। শরৎকুমারী তখন প্রাণপণ দৌড়িতেছেন। পার্শ্বে বা পশ্চাতে কোন দিকেই শরৎকুমারীর দৃষ্টি নাই। তিনি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছেন। ঘোর পরিশ্রম, এতাবৎকাল অনাহার, প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ প্রভৃতি কারণে শরৎকুমারী নিতান্ত কাতর ছিলেন। কিন্তু এখন বিপন্না বালিকার আর সে সকল লক্ষ্য নাই—বালিকা তীরের ন্যায় দৌড়িতেছে। কিন্তু সকল কষ্টই বুঝি বৃথা হয়; লোকটা নিকটস্থ হয় হয় হইয়া উঠিল। শরৎকুমারী পশ্চাতে তাহার পদ-ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। ভাবিবার সময় নাই, চিন্তিবার সময় নাই। দৌড়িয়া পলাইতে না পারিলে এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। বালিকা কেবলই দৌড়িতে লাগিলেন। সহসা বৃক্ষাদির ফাঁক দিয়া একটা অত্যুচ্চ শ্বেতাবয়ব ভবনের অংশ শরৎকুমারীর চক্ষে পড়িল। সেই স্থানে আশ্রয় পাওয়া যাইবে ভাবিয়া শরৎকুমারী সেই দিকে গতি ফিরাইলেন। শরৎকুমারী প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে একটা অতি মনোরম, প্রকাণ্ড ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং বেগে সেই দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তাহার পর 'মাগো, আমায় রক্ষা কর' বলিয়া তথায় পড়িয়া গেলেন। সেই ভবন দ্বারের উভয় পার্শ্বে আট দশ জন গালপাট্টা আঁটা দ্বারবান বসিয়া কেহ বা থালায় করিয়া বুটের দা'ল বাছিতেছিল, কেহ বা নলিচায় চিম্‌টা বাঁধা লম্বা পিত্তলের হুকার নল লাগাইয়া তামাকু খাইতেছিল, কেহবা ঘরে 'ভেজিবার' জন্য লম্বা লম্বা রেখা টানিয়া ঘটি বাটীর অনুরূপ অক্ষর যুক্ত 'খৎ' লিখিতেছিল, কেহ বা সেই লেখকের পার্শ্বে বসিয়া তাহার অসাধারণ ক্ষমতার প্রশংসা করিতেছিল, কেহ বা পাথরের বাটীতে নিমের সোটা দিয়া 'ভাঙ্গ' ঘুঁটিতেছিল, কেহ বা আলকাতরা মাখান, গায়ে কাপড়ের ছাপা লাগান আমকাঠের সিন্দুকের মধ্যে আপনার জিনিষ পত্র গুছাইয়া রাখিতেছিল, কেহ কেহ বা দেয়াল হেলান দিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিল। সকল দ্বারবানই একসঙ্গে 'ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া' শব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ লাঠি হস্তে বাহিরে ছুটিয়া আসিল কিন্তু কিছুই

দেখিতে পাইল না। অনুসরণকারী যখন দেখিল শরৎকুমারীর গতি এই দিকে ফিরিল, তখনই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং একটু কি ভাবিয়া চিন্তিয়া বিপরীত দিকে পলায়ন করিল। সুতরাং দ্বারবানেরা দেখিল পথে তো কিছুই নাই। দ্বারবানেরা বুঝিল শরৎকুমারী মূর্চ্ছিতা। তাহারা নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল; অথচ কি করা আবশ্যক অথবা কে কি করিবে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

"কি হইয়াছে? গোল কিসের? ব্যাপার কি?"

উপরের বারান্দা হইতে একজন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন দ্বারবান তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বৃত্তান্তটা জানাইল। তখনই সেই প্রশ্নকারী ব্যস্ততা সহ নামিয়া আসিলেন। দ্বারবানেরা বিশেষ সম্মান সহকারে সরিয়া দাঁড়াইল। তিনি শীঘ্র করিয়া একজন দ্বারবানকে শীতল জল আনিতে এবং আর একজনকে পাখার বাতাস করিতে আদেশ করিলেন। জল আসিলে ধীরে ধীরে তিনি শরৎকুমারীর মুখে, চক্ষে, কপালে, ঘাড়ে শীতল জল দিতে লাগিলেন এবং দ্বারবান অত্যধিক জোরে বাতাস করিতেছে দেখিয়া তাহার নিকট হইতে পাখা লইয়া স্বয়ং এক হস্তে বাতাস এবং অপর হস্তে জল প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বহুযত্নে, অনেকক্ষণ পরে শরৎকুমারীর চৈতন্য হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন কি? দেখিলেন, তিনি মনে মনে যাঁহাকে মানবের মধ্যে দেবতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন সেই দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় অতি যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত কুটীরের দ্বার বন্ধ করিয়া কামিনী শুইয়া আছে। কামিনীর সে অপূর্ব্ব রূপ শশধর যেন বিষাদ মেঘাচ্ছাদিত হইয়া মলিন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সে চমৎকার উজ্জ্বলতা যেন নষ্ট হইয়াছে, তাহার সে টলটলায়মান পূর্ণতা যেন শুষ্ক হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ কামিনীর দেহ প্রকাশ করিতেছে যে, তাহার মনে সুখ নাই—সে যেন বড় দাগা পাইয়াছে। কামিনী দাগা পাইয়াছে বটে। তাহার বড় সাধে ছাই পড়িয়াছে। রামচরণ তাহাকে যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা, ক্লেশের উপর ক্লেশ, হতাদরের উপর হতাদর করিয়া নিতান্ত জ্বালাতন করিয়াছেন। যে সুখের লোভে, যে প্রেমের আশায় সে জানিয়া শুনিয়া আপনার অধঃপতন আপনি ঘটাইয়াছে, আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে এবং ধর্ম্মের সুখ ছাড়িয়া অধর্ম্মের নরকে ডুবিয়াছে, সে সুখ, সে প্রেম কিছুই সে পায় নাই—তাহার সাধের স্বপ্ন এখন ভাঙ্গিয়াছে। সমাজে তাহার এখন স্থান নাই, ধর্ম্মে তাহার এখন অধিকার নাই, স্বর্গ-সুখ তাহার এখন কল্পনার অতীত, সংক্ষেপতঃ সে এখন পতিতা, ভ্রষ্টা, কালামুখী! মানুষের যাহা যাহা সুখ, যাহা আশা তাহার সে সকল এখন কিছুই নাই। এ সকলই সে জানিতেছে, এ সকলই সে বুঝিতেছে; সুতরাং তাহার ন্যায় দুঃখিনী আর কে আছে? এমন যাহার চিন্তা এবং এমন যাহার বোধ, তাহার দেহের শোভা, যৌবনের শ্রী কেমন

করিয়া থাকিবে? কামিনীর দেহ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন এ কামিনী সে কামিনী নহে।

রামচরণের সহিত কামিনীর আরও দুই একবার দেখা হইয়াছিল, কিন্তু কামিনীর যাহা অভিলাষ তাহা কি সফল হইয়াছিল? না—না। রামচরণ পাপ জানে, পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মই সে করিতে জানে। সে কেবল জানে না কোন প্রকার কোমলতা। সুতরাং তাহার নিকট হইতে যে কোন প্রকার কোমলতার ভিক্ষা করে, তাহার বিড়ম্বনা।

কামিনী গৃহ মধ্যস্থ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছে। কামিনীর পরিধান বস্ত্র মলিন, কেশরাশি অবিন্যস্ত, দেহ ভূষণ শূন্য। শুইয়া শুইয়া কামিনী বাম পদটী দুলাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। ঘরের এক কোণে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে।

বাহির হইতে শব্দ হইল,—

"দরজা খোল।"

কামিনী বুঝিল রামচরণ ডাক্তার আসিয়াছে। একবার ভাবিল, 'দরজা খুলিব না।' আবার ভাবিল, 'তাহাতে লাভ কি?' ধীরে ধীরে উঠিয়া কামিনী দরজা খুলিয়া দিল। রামচরণ ডাক্তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিলেন—স্থির পদে নহে। তাঁহার অবস্থা ভাল নহে—পা টলিতেছে। তিনি আসিয়া ধপাস্‌ করিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন,—

"কামিনি! তোমাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, তাই তাই তোমায় দেখ্‌তে এসেছি।"

কামিনীকে না দেখিলে রামচরণের কেমন করিয়া প্রাণ জ্বলে, তিনি তাহাকে কত ভাল বাসেন তাহা সকলই কামিনী জানে, সুতরাং তাহার এ আদর ভাল লাগিল না। সে কোন উত্তর দিল না।

রামচরণ আবার বলিলেন,—

"আমি মর্‌তে মর্‌তে তোমার কাছে ছুটে এলেম, তুমি একটী কথাও কহিলে না। ছিঃ কামিনি! আমি কি এতই ছোট লোক?"

কামিনী বলিল,—

"কথা আর কি বলিব? এলে ভালই—আমার সৌভাগ্য।"

কথাটা নিতান্ত ভাসা ভাসা, নিতান্ত না বলিলে নয় মত হইল। সুতরাং রামচরণের মনের মত হইল না। রামচরণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"তুমি চটেছ? বেশ করেছ! ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইও। আসিয়াছি তাহা ভাগ্য বলিয়া মান না, আবার রাগ! তোমার রাগ নিয়ে তুমি ধুয়ে খাও।"

কামিনী বলিল,—

"আমার আবার রাগ কি? রামচরণ! আমি অনাথিনী, দুঃখিনী, কষ্ট সহিতে আমার জন্ম। আমি কষ্ট যথেষ্ট সহিতে পারি। রাগ কি আমাদের মত লোকের শোভা পায়? তুমি দয়া করিয়া আসায় যে বিশেষ কোন লাভ হইয়াছে এ কথা যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার ভুল হইয়াছে। তোমার ইচ্ছা হয়, চলিয়া যাও, ইচ্ছা হয় বসিয়া থাক, কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমি দুঃখিনী। আমার

এত সহিয়াছে—তুমি আজি চলিয়া যাইবে সে কষ্ট টুকু আর সহিবে না?"

রামচরণ বিরক্ত ভাব আর এক মাত্রা বাড়িয়া গেল। বলিল,—"ভাবিয়াছ কি কামিনী, তুমি ছাড়া আর মেয়ে মানুষ নাই? তোমার বড় অহঙ্কার বাড়িয়াছে। তোমাকে দাসীপনা করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে, তাহা তুমি স্থির জানিও।"

কামিনী বলিল,—

"কাহার দাসীপনা?—সরকারদের দরুণ কেনা বাড়িতে তোমার যে নূতন রাণী আসিয়াছেন, তাঁহারই না কি?"

রামচরণ চমকিয়া উঠিল। থতমত খাইয়া বলিল,—

"সরকারদের দরুণ কেনা বাড়ী কি? কে আসিয়াছে? আমার নূতন রাণী কি? সে বাড়ীতে কেহ নাই তো। সেখানে কে আছে, তুমি কেমন করিয়া দেখিলে, তোমাকে বলিতে হইবে।"

উত্তরের জন্য রামচরণ অপেক্ষা করিল না। এখন রাগে তাহার শরীর কাঁপিতেছে। সে বলিল,—

"তোমার বড় আস্পর্দ্ধা হইয়াছে। আমার যাহা খুসি আমি তাহাই করিব। আমার কাজে কথা কহে, এমন ক্ষমতা কাহার? জানিও তোমার অনেক দুর্গতি আছে, আমার হাতে তোমার অনেক শাস্তি আছে।"

হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া কামিনী বলিল,—

"শাস্তি? আবার কি শাস্তি রামচরণ? আমি যে শাস্তি ভোগ করিয়াছি ইহার চেয়েও কি আর শাস্তি আছে? আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে রামচরণ? তোমার কাজে আমার কথা কহিতে ক্ষমতা নাই বটে, কিন্তু দেশ আছে, ধর্ম্ম আছে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি তোমার সর্ব্বনাশ অতি নিকট।"

এখন কামিনী জানিত সরকারদের দরুণ বাড়ীটা রামচরণ ডাকায় খরিদ করিয়াছে। রামচরণ তাহা খরিদ করিয়াছে বটে, কিন্তু কখন তাহা ব্যবহার করে না। সর্ব্বদা তাহাতে চাবি বন্ধ থাকে। এক-থাও কামিনী জানিত যে, প্রায়ই প্রতিদিন রামচরণ একবার করিয়া সেই বাটীতে যায়। এজন্য কামিনী মনে করিয়াছিল যে, ঐ বাটীতে একটা কি কাণ্ড কারখানা আছে। সে সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রামচরণের নিকট তাহার উল্লেখ করিল। রামচরণের প্রথমতঃ ভয়, তাহার পর ক্রোধ এবং তাহার কথাবার্ত্তার ভাব দেখিয়া কামিনী বুঝিল, বস্তুতঃই তবে ঐ বাটীতে একটা কি কাণ্ড কারখানা আছে বটে। এদিকে রামচরণ প্রথমতঃ ঐ বাটীর উল্লেখ, দ্বিতীয়তঃ রাণীর উল্লেখ, তৃতীয়তঃ সর্ব্বনাশের উল্লেখ শুনিয়া মনে করিল এ তিনেরই মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে এবং কামিনী তাহা জানে। অতএব কামিনীর নিকট হইতে সে কথা আদায় করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া বলিল,—

"কি আমার সর্ব্বনাশ? কাহার সাধ্য এ কথা বলে? কামিনি, যদি ভাল চাও, তবে বল কিসে আমার সর্ব্বনাশ হইবে—কে আমার সর্ব্বনাশ করিবে? যদি না বল তবে জানিও তোমার সর্ব্বনাশ আমার হাতে।"

কামিনী বলিল,—

"আমার সর্ব্বনাশ তুমি যতদূর করিবার তাহা তো করিয়াছ, বাকি তো কিছুই

নাই। কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশের এখনও অনেক বাকি। তার আর দেরি নাই। এই কামিনীর হাতেই তোমার সর্ব্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হইবে।”

তখন রামচরণ,

“কি এত বড় সাহস আমারই অন্ন খাইয়া আমার বিপক্ষে চক্রান্ত।”

এই বলিয়া কামিনীর বক্ষে প্রচণ্ড পদাঘাত করিল। কামিনী দূরে গিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে কামিনী ঘরের দেয়াল হেলান দিয়া বসিয়া আছে। সমস্ত রাত্রি কামিনী ঘুমায় নাই। কামিনীর চক্ষু রক্ত-বর্ণ কামিনীর মূর্ত্তি ভয়ানক। তাহার ঘন-কৃষ্ণ কেশরাশি চারিদিক দিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে ঝুলিতেছে, তাহার ললাটে সতেজ শিরা দেখা যাইতেছে, তাহার দৃষ্টিতে স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন প্রকটিত রহিয়াছে। কামিনী আজি অসাধ্য সাধন সংকল্প করিয়াছে, সে আজি বিষম চিন্তায় মনকে নিযুক্ত করিয়াছে। রামচরনের অসহ্য উৎ-পীড়নে কাতর হইয়া কামিনী প্রথমতঃ আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার শেষ করিব বলিয়া স্থির করে। কিন্তু তাহাতে হইল কি? রামচরণ—দুরাচার, ইন্দ্রিয় পরায়ণ, নরপ্রেত রামচরণের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? সে যে কামিনীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে—কামিনীর ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট করিয়াছে, কামিনীর সকল সুখের, সকল আশার পথে কাঁটা দিয়াছে, কামিনীকে মর্ম্মান্তিক জ্বালা দিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়াছে তাহার শাস্তি কৈ? কামিনী মরিলে তাহার শাস্তি কি হইল? কামিনী প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া মরিতে চাহে না—পারে না। প্রতি-হিংসা—সকল জ্বালার শেষ—সকল অপ-মান, সকল মনস্তাপের অবসান না করিয়া কামিনী আত্মহত্যা করিতে অসমর্থ। কা-মিনী এইরূপ আলোচনা করিয়া এক্ষণে আত্মহত্যার বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছে। এক্ষণে তাহার একমাত্র বাসনা—রামচরণের পাপের অনুরূপ দণ্ডবিধান, তাহার পর মৃত্যু।

এখন কামিনী ভাবিতেছে—‘বাসনা সিদ্ধির উপায় কি?’ কিন্তু উপায় কিছুই কামিনীর ভাল বলিয়া মনে লাগিল না। তাহার পর ভাবিল,—‘সরকারদের দরুণ কেনা বাড়ী—সেখানে নিশ্চয়ই রামচরণের কোন গুপ্ত লীলা আছে। তাহার অনু-সন্ধান করিলে হয়ত আমার বাসনা সিদ্ধির কোন উপায় হইতে পারে। দেখাই কেন যাউক না।’

কামিনী যখন এইরূপ আলোচনা করি-তেছে, সেই সময় কাশিতে কাশিতে, বাহির হইতে কণ্ঠধ্বনি করিতে করিতে, একজন লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইল। কামিনী তাহাকে দেখিয়া মুখের চুল সরাইল এবং বাহ্যভাব অপেক্ষাকৃত সহজ করিতে সচেষ্ট হইল। লোকটী আসিয়াই কাপড়ের কোণ হইতে কয়েকটী টাকা ও পয়সা বাহির করিয়া কামিনীর নিকট রাখিয়া দিল এবং বলিল,—

“টাকা দশটী এবং সুদ পাঁচ আনা দিতে আসিয়াছিলাম।”

তাহার পর লোকটী প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতে লাগিল।

তখন কামিনী বলিল,—

"রাধারমণ—যাইও না, দুটা কথা আছে।"

লোকটী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত রাধারমণ। কামিনীর কয়েকটী টাকা ছিল, সে তাহা সুদে খাটাইত। রাধারমণ মধ্যে ঘর মেরামত করিবার সময় অপ্রতুল হওয়ায় কামিনীর নিকট হইতে দশটী টাকা ধার লইয়াছিল। আজি রাধারমণ ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছে। কামিনী তাহাকে কি কথা বলিবে, কেন যাইতে বারণ করিল তাহা ভাবিয়া রাধারমন স্থির করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে রাধারমণ দাবার এক প্রান্তে বসিল। তখন কামিনী বলিল,—

"রামচরণ ডাক্তার তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল, তুমি যেই ভাল মানুষ তাই সহ্য করিয়াছিলে।"

রাধারমণ বলিল,—

"মানুষ মানুষের কি করিতে পারে মা? ভগবানই সকল কাজের বিচারক।"

কামিনী বলিল,—

"মানুষ কি না পারে রাধারমণ? মনে করিলে মানুষ সবই পারে। ভগবান দুর্ব্বলের বল। রামচরণ আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, পাপে মজাইয়া আমার মাথা খাইয়াছে, এখন আমি তাহার গলগ্রহ হইয়াছি। রামচরণ সোহাগীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কতই ঢলাঢলি না করিয়াছে—আর রামচরণ যে কত পাপ, কত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা তোমায় কি বলিব? তুমি কি মনে কর, রামচরণের এ সকল পাপের শাস্তি মানুষে দিতে পারে না— দিবে না। হরেন্দ্রনারায়ণ রায় রামচরণকে একটু সাজা দিয়াছেন—একটু মাত্র। অবশ্যই কোন না কোন দিন, কোন না কোন লোকের হাতে রামচরণ বিশেষ সাজা পাইবে। ওঁ'র দিন ঘুনাইয়া আসিতেছে।"

তখন রাধারমণ বলিল,—

"ডাক্তার বাবু যে মহাপাপী তাহার ভুল নাই। পাপের ফল আছেই আছে মা।"

তাহার পর রাধরমণ যে কারণে যেরূপে রূপনগরে গিয়াছিল, সোহাগের মুখে শরৎ কুমারীর যে বৃত্তান্ত সে জানিতে পারিয়াছে, উমাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যু, শরতের পীড়া, সুলোচনার নিরুদ্দেশ ইত্যাদি বৃত্তান্ত সমস্তই বর্ণনা করিয়া বলিল,—

"মা বলিব কি, কেহ কেহ বলে সুলোচনা যে নিরুদ্দেশ সেও হয়ত ডাক্তার বাবুর একটা লীলাখেলা।"

তখন কামিনী অনেকক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল,—

"এই গ্রামে সরকারদের কেনা বাড়ীতে ডাক্তারের নিশ্চয়ই বিশেষ গোপনীয় কোন কাণ্ড আছে। তুমি যে গল্প বলিলে হয়ত তাহার সহিত আর ঐ গোপনীয় ব্যাপারের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে। রাধারমণ আমি স্ত্রীলোক, আমি একলা কি করিতে পারি? তুমি যদি আমার সহায় হও, তুমি যদি আমাকে পরামর্শ দেও তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সরকারদের বাটীর লুকান কাণ্ডের খবর লইতে পারি আর হয়ত তাহা হইতে তোমার— গল্পের পর পর ঘটনাও প্রকাশ হইতে পারে। কে জানে রামচরণের পেটে কত কীর্ত্তি আছে। রাধারমণ, তুমি আমাকে সাহায্য করিতে স্বীকার কর।"

রাধারমণ অনেকক্ষণ নানা চিন্তা করিল। সে ভাবিল ‘দোষ কি? যাহাই হউক, ইহাতে কোন-না কোন, কাহার না কাহার উপকার হইতে পারে—ভালই তো? আর কামিনী যেমন বলিতেছে যদি এই সন্ধানে সুলোচনার দৈবাৎ কোনও সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে তো পরম লাভ। ১ম লাভ শরৎকুমারীর দুঃখ দূর হইবে; ২য় লাভ—রাজাবাবু (দেবেন্দ্র নারায়ণ) শরৎকুমারীর ভাবনা বিশেষ ভাবেন। যদি আমার দ্বারা এ সন্ধান হয়, তাহা হইলে তাঁহার আমার উপর বিশেষ অনুগ্রহ হইবে; ৩য় লাভ—ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে, ৪র্থ লাভ—রামচরণ জব্দ হইবে।’

কামিনী রাধারমণের সহানুভূতি উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রথম হইতে অনুরোধ করিতেছিল। এক্ষণে ক্রমশঃ রাধারমণের মনে সহানুভূতি ও উদ্দেশের একতা ঘটাইবার নিমিত্ত স্বার্থ, ধর্ম্ম, ইত্যাদি কারণও আসিয়া জুটিল। কার্য্যতঃ উভয়ের লক্ষ্য ক্রমশঃ এক হইয়া পড়িল।

তখন রাধারমণ বলিল,—

“আমি সামান্য লোক—ডাক্তার বাবু বড়লোক। কিন্তু আমি সে ভয় করি না। আমার বাবুরা সুখে থাকুন—উঁহারা আমার সর্ব্বদা সহায়। আমার দ্বারা যতদূর হইতে পারে, আমি ততদূর সাহায্য করিতে স্বীকার করিলাম। এখন কিরূপে সন্ধান লইবেন, বলুন।”

তখন কামিনী নানাপ্রকার পরামর্শ ব্যক্ত করিল, অনেক কাঁদিল এবং আপনার বর্ত্তমান অবস্থা অনেক বর্ণনা করিল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রাধারমণ চলিয়া গেল। রাধারমণ বাটী আসিতে অনেক অগ্রপশ্চাৎ ভাবিতে লাগিল। তাহার চিন্তা, ‘কামিনী যে এত কথা বলিল, তাহা মিথ্যা নয় তো? আমাকে ফাঁদাইবার মৎলব নাই তো?’ কিন্তু রাধারমণ সিদ্ধান্ত করিল, ‘না, কামিনীর কথার ভাবে মিথ্যার ভাব বুঝা যায় না; কামিনীর রাগ সত্য বটে।’ তাহার পর আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিল,—‘কামিনীর রাগ যথার্থ, কামিনীর রাগের কারণ আছে, কামিনীর কথাও সত্য কিন্তু আমি তাহাতে যোগ দিই কেন? রামচরণ আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু তাঁহাকে অনুরূপ সাজা দিয়াছেন। সে কথা এখনও আমার মনে থাকা ভাল নহে তো! তবে আমি কামিনীর প্রার্থনায় তাহার সহায়তা করিতে স্বীকার করি কেন?’ আবার আপনিই উত্তর করিল, ‘স্বীকার কেন করিব না? কামিনীর প্রতি রামচরণ অনেক অত্যাচার করিয়াছে। কামিনী যতই মন্দ হউক সে যে এখন নিতান্ত অনাথিনী, যার পর নাই দুঃখিনী তাহার ভুল নাই। এরূপ দুঃখিনীর সাহায্য করার দোষ কি? রামচরণ কতই পাপ করিয়াছে, কতই করিতেছে, আরও কতই করিবে। সুরেন্দ্রবাবু তাহার যে শাস্তি দিয়াছেন তাহাতেও সে জব্দ হয় নাই তো? যদি তাহাকে একটু ভাল করিয়া চৈতন্য দেওয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার পর সরকারদের বাটীতে অবশ্যই একটা বিশেষ কারখানা আছে। যদি তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে হয়ত না জানি কতলোকের কতই উপকার হইয়া যাইতে পারে। সেও তো মন্দ নহে।’ তাহার পর রাধারমণ স্থির করিল, ‘এ সরকারদের বাটীর কাণ্ডের সহিত শরতের মার

নিরুদ্দেশের কোন সম্বন্ধ আছে বোধ হয় না। থাকুক আর নাই থাকুক, এ বিষয়ে যাহা মনে করিয়াছি তাহাতে ক্ষতি নাই। তবে রামচরণের কোন অনিষ্ট চেষ্টা আমি সাধ্যমতে করিব না, ইহাই স্থির।

(ক্রমশঃ)

খদ্যোৎপুঞ্জ।

মত পরিবর্ত্তন।—১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রাইট্ অনরেবল ডবলিউ ই ব্যাক্সটর এম্ পি (Right-Honorable W. E Baxter M P) মহোদয় ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তিনি অত্যল্প কাল ভারতে ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া 'এ উইণ্টার ইন্ ইণ্ডিয়া (A Winter in India) নামে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের এক স্থানে প্রসঙ্গতঃ আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিভাজন শাসনকর্ত্তা লর্ড রীপন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিত হইয়াছে —

"I was very glad to have a long conversation with the Marquis of Ripon, with whom I had been associated in the House of Commons in early life, and whose praises as a man and as a ruler I had heard with no surprise from persons of all political opinions and religious creeds wherever we had been during our Indian tour I had expected, in consequence of the great change of policy since the Afghan war, to have found a good deal of difference of opinion with regard to Lord Ripon, but on the contrary there seemed to be none; every one I met extolled his government, except an agent of some tea plantations, who knew as litte about Indian politics as he did about the inhabitants of Jupiter"

এই উক্তির মর্ম্ম।—

"মার্কুইস্ অফ্ রীপণের সহিত সুদীর্ঘকাল কথোপকথন করিয়া আমি বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম। আমি বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার সহিত পার্লিয়ামেণ্ট সভার সাধারণ শাখায় একত্রিত হইয়াছি, অধুনা আমার ভারতভ্রমণ উপলক্ষে যে যে স্থানে আমি পর্য্যটন করিয়াছি সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক সম্প্রদায় ভুক্ত, বিভিন্ন ধর্ম্ম ক্রান্ত ও সর্ব্বপ্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী লোকের মুখে তাঁহার ব্যক্তিগত ও শাসনকর্ত্তা স্বরূপে প্রশংসা শুনিয়া সুখী হইলাম। আফগান যুদ্ধের পর হইতে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হেতু তাঁহার সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ দেখিতে পাইব বলিয়া আমার বোধ ছিল, কিন্তু কোনই বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাইলাম না। যত লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল প্রত্যেকেই তাঁহার শাসন কার্য্যের প্রশংসা করিল, কেবল একজন চা-করের এজেণ্ট এই প্রশংসায় যোগ দেয় নাই, অন্তরীক্ষস্থ গ্রহ নিবাসী বৃন্দের বিবরণ সে ব্যক্তি যেমন জানে ভারতবর্ষীয় রাজনীতি শাস্ত্রও তেমনি বুঝে।

কিন্তু স্বার্থপরতা মানুষকে কতদূরই বিচলিত করে—কতদূরই ভ্রমপরায়ণ করিয়া তুলে! যে এংগ্লো ইণ্ডিয়ানগণ দুই বর্ষ পূর্ব্বে একবাক্যে লর্ড রীপনের স্তুতিগান করিয়াছেন অদ্য তাঁহারাই আবার ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া, কাণ্ডজ্ঞানহীনের ন্যায় সেই মহামতি শাসন কর্ত্তার স্কন্ধে নানা প্রকার কল্পনার অতীত দোষের আরোপ করিতেছেন। বলা বাহুল্য এতাদৃশ চিত্ত চাঞ্চল্য হেতু তাঁহারা সভ্য ও বিজ্ঞ সমাজে নিশ্চই ধিক্কৃত হইতেছেন।

মহামান্য ব্যাক্সটর সাহেবের পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্য চা-করগণের জ্ঞানের যেরূপ পরিচয় রহিয়াছে তাহা বোধ করি 'বেঙ্গল টাইম্‌স্' (Bengal Times) সম্পাদক পাঠ করিয়া পরমানন্দিত হইবেন।

বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত সময়ে কিরূপে থাকা উচিত।—বজ্রপাত কালে গৃহ মধ্যস্থ থাকাই আবশ্যক; কারণ বজ্র পতিত হইলে প্রথমতঃ গৃহের উপরে পতিত হইবে এবং তথা হইতে তাহা পরিচালিত ও স্থানান্তরিত হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে। ডাক্তার ফ্রাঙ্কলীন (Dr. Franklin) বলেন যে, বজ্র-ভীত ব্যক্তিগণের পক্ষে গৃহের ঠিক মধ্যস্থলে একখানি চেয়ারে দেহ ও আর এক খানি চেয়ারে পা রাখিয়া বসিয়া থাকা ভাল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কতকগুলি মাদুর, বিছানা ইত্যাদি একত্রিত করিয়া সেইগুলি দুই ভাঁজ করিয়া তাহার উপর ঐরূপ চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকা আরও ভাল। রেশমের দড়ায় দোল্‌না ঝুলাইয়া তাহার উপর আশ্রয় লইতে পারিলে আরও ভাল হয়। যাহারা তাদৃশ সময়ে মাঠে বা খোলা স্থানে থাকে তাহাদের বরং জলে ভিজা শ্রেয়ঃ তথাপি বৃক্ষাদির নীচে আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য নহে।

বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত স্থানের দূরত্ব স্থির করা ও সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনক স্থান অনুমানকরা নিতান্ত কঠিন কার্য্য নহে। একসেকেণ্ড পরিমিত কালে আলোক প্রায় ১;৮৩৩০ ক্রোশ গমনকরে, সুতরাং বলিতে হইতেছে বহু দূর পর্য্যন্ত ইহার ফল আমরা হাতে হাতে জানিতে পারি। শব্দের গতি কিন্তু এত দ্রুত নহে। এক সেকেণ্ডে শব্দ ৩৮০ গজ মাত্র গমন করে। বিদ্যুতালোক দৃষ্ট হওয়া এবং বজ্রধ্বনি হওয়া এতদুভয় ঘটনার মধ্যে যে টুকু সময় অতিবাহিত হয় সেইটুকু ঠিক লক্ষ্য করিলে পূর্ব্বোক্ত গতিবিষয়ক নিয়মদ্বয়ের সাহায্যে স্থির করিতে পারা যায় যে, কতদূরে মেঘ হইয়াছে, বিদ্যুত দেখা দিতেছে এবং বজ্রপাত হইতেছে।

প্রতিধ্বনি-রহস্য।—দর্পণে যেরূপ পদার্থের আকৃতি বিভাসিত হয় তদ্রূপ শব্দ কোন দ্রব্য বিশেষ আহত হইয়া প্রতিধ্বনির উৎপত্তি হয়। কিন্তু বস্তুর কোন্ বিশেষ গুণ থাকায় প্রতিধ্বনির উদ্ভব হয় তৎসম্বন্ধে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে গিরিগুহা, উপত্যকা পর্ব্বত, প্রাচীন ভবন প্রভৃতি স্থানে প্রতিধ্বনির উদ্ভব হয়। ফ্লাণ্ডার্সের অন্তঃপাতী লোভেন সমীপস্থ দুর্গ মধ্যস্থ স্থান বিশেষে আশ্চর্য্যরূপ প্রতিধ্বনি জন্মিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি সে স্থানে গান করে, সে স্বীয় কণ্ঠধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পায় না কিন্তু যাহারা দূরে দাঁড়াইয়া থাকে তাহারা সেই সংগীতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পায় এবং যাহা শুনিতে পায় তাহাও

কখন বা মূল শব্দাপেক্ষা অনেক উচ্চ, কখন বা অনেক নরম, কখন বা অতি নিকটে, কখন বা অনেক দূরে বলিয়া বোধ হয়। ফরাশি একাডেমির বিবরণ পত্রাদির মধ্যে উল্লিখিতরূপ প্রতিধ্বনি জনক আর একটী স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে যে বিন্দুতে ধ্বনি প্রতিহত হয় সেই সকল কেন্দ্র-স্বরূপ স্থান হইতে নূতন নূতন ধ্বনির উৎপত্তি হয় এবং সেই সকল নবোদ্ভূত ধ্বনি সমদূর ও সম সময় লইয়া ব্যাপ্ত হয়। সুদূর বিস্তৃত ও পৌনঃপুনিক প্রতিধ্বনির ইহাই কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন।

কিল্‌কেনী কাউণ্টীর অন্তর্গত কাসলকম্বর গ্রামের ক্রোশদ্বয় দূরবর্ত্তী ডাইনান্ নামক ক্ষুদ্র নদীতটে আশ্চর্য্যরূপ প্রতিধ্বনির জন্মিয়া থাকে। তত্রত্য গুহায় উচ্চ শব্দ করিলে তাহার কোন প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলে অতি পরিষ্কার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

মিনে প্রণালীতে যে দুল্যমান সেতু আছে তাহা হইতে আশ্চর্য্য প্রকার প্রতিধ্বনির উদ্ভব হয়। যদি তাহার এক প্রান্তের কড়িতে একটা হাতুড়ির আঘাত করা যায় তাহা হইলে সেইরূপ যতগুলি কড়ি আছে প্রত্যেকটা হইতে ঐরূপ ধ্বনির উৎপত্তি হইতে থাকে, এবং তাহার বিপরীত দিকস্থ কড়ি হইতে সেই রূপ শব্দ সমুৎপন্ন হয় এবং যতবার ঐ উভয় শব্দ হয় ততবার জল ও সেতুর মধ্যে আর একটা করিয়া প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। এইরূপে প্রতি পাঁচ সেকেণ্ডে ২৮ আটাইশ বার শব্দ হয়।

কোমল প্রস্তর।—রোম নগরের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট কয় খণ্ড অত্যাশ্চর্য্য মার্ব্বল প্রস্তর আছে। এই মার্ব্বলের এক প্রান্ত তুলিয়া ধরিলে অপর দিক অবনত হইয়া পড়ে এবং তাহার দুই প্রান্ত দুই টেবিলের উপর রাখিলে মধ্যস্থল বিনত হয়। উহার একদিক ধরিয়া উভয় দিকে বক্র করা যায়। যদিও ঐ সকল মার্ব্বল এরূপ নমনশীল তথাপি অসাবধানতা সহকারে নাড়িলে চাড়িলে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ব্রিটিশ কৌতুকাগারে ঐরূপ এক খণ্ড প্রস্তর বহুদিবসাবধি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তিস্বীকার।

Speeches by Lal Mohan Ghosh. Edited by Ashutosh Banerji, Calcutta, Thacker Spink & Co.

আজি কালি শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের নাম জানেন না, শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে এমন কেহ নাই, বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যিনি সমস্ত ভারতবাসীর মর্ম্মান্তিক দুঃখকাহিনী বহন করিয়া ইংলণ্ডের সাধারণগণের সমক্ষে বিচারার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাঁহার জলদ-গম্ভীর যুক্তি-

পূর্ণ হৃদয়-নিঃসৃত বাক্যাবলী শ্রবণে ইংলণ্ডের মনীষীগণও বিমোহিত হইয়াছিলেন, যাঁহার তীব্র ও সতেজ বাক্য-বাণে ভারত বিদ্বেষী ইংরাজগণের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে এবং অধুনা যিনি পুনরায় স্বদেশীয়গণের ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া, ব্যবসায়, অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতির আশা বিসর্জ্জন দিয়া ইংলণ্ডে সুবিচার ও শান্তির প্রার্থনায় বাস করিতেছেন, তাঁহাকে জানেন না এমন অকৃতজ্ঞ বঙ্গবাসী অতি অল্পই আছেন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের ইংলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় বক্তৃতামালা একত্রিত করিয়া প্রচার করিয়া অবশ্যই অতি সৎকার্য্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মুদ্রাকার্য্য পরিপাটীরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। শুনিয়া সুখী হইলাম সাধারনের সুবিধার জন্য সম্প্রতি এই গ্রন্থের মূল্য ২৲ হইতে কমাইয়া ১।০ করা হইয়াছে।

বঙ্গবাসী মাত্রেরই এই পুস্তক যত্ন সহকারে পাঠ করা আবশ্যক। বৈদেশিক ভাষার উপর কীদৃশ অসাধারণ অধিকার জন্মিতে পারে, ভাষার দ্বারা হৃদয়ের জ্বলন্ত ভাব সমূহ কিরূপে অনর্গল ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, সাহসিকতা ও বিনয় সহকারে কিরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে এবং যাহার হৃদয়ে প্রকৃত জ্বালা আছে, স্বদেশের হিতসাধন যাহার ইষ্টমন্ত্র এবং আশায় যাহার প্রাণ উৎফুল্ল ভাষা কিরূপে তাহার সহিত ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করে এ সকল মহৎ শিক্ষা যদি লাভ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে বঙ্গীয় পাঠক, এই গ্রন্থ অধ্যয়ন কর।

নব্যভারত। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ২১০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲। প্রতি সংখ্যার মূল্য।৫

আমরা এই নূতন মাসিক পত্র খানি দেখিয়া সুখী হইলাম। অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক ইহাতে যোগ দিতেছেন এবং যত্ন সহকারে ইহার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। এরূপ মাসিক পত্রের আমরা অন্তরের সহিত কল্যাণ ও উন্নতি কামনা করি।

এই মাসিক পত্রমধ্যস্থ "নব্য ভারত" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধটীর কোনরূপ অর্থ নাই বলিয়া বোধ হইল। 'সাময়িক প্রসঙ্গের' মধ্যে অনেক কথাই প্রতিবাদার্হ। 'ক্ষেপা ভোলার চিন্তা তরঙ্গ' প্রবন্ধে কোনই নূতনত্ব নাই।

'নব্যভারতের' আর একটী প্রধান দোষ উপযুক্ত সম্পাদকের অভাব। এই দোষে ইহাকে সাময়িক পত্র বলিয়া বোধ হয় না, কেবল কতকগুলি সঙ্কলিত সন্দর্ভ পূর্ণ পুস্তিকা বলিয়া বোধ হয়। সম্পাদকীয় লেখনী সকল প্রবন্ধেই প্রবেশ করিয়া প্রবন্ধকে স্বীয় পত্রের অনুরূপ করা আবশ্যক। তাহা না হইলে প্রবন্ধ সকল নীরস, শুষ্ক, ও অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় এবং পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়না। নব্যভারতে এ দোষ বিলক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

একাকিনী। (ঐতিহাসিক উপন্যাস) শ্রীকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। Calcutta: H. M. Mookerjea & Co. মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা একখানি উপন্যাস গ্রন্থ। যে যে গুণ থাকিলে উৎকৃষ্ট উপন্যাস হয় ইহাতে তাহা নাই। তথাপি ইহার ভাষাটী অতি পরিষ্কার ও মার্জ্জিত বলিয়া বোধ হইল।

সমরশায়িনী। ঐতিহাসিক উপাখ্যান। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীমদনমোহন মিত্র প্রণীত। কলিকাতা ৮ নং হোগল কুঁড়িয়া গলি এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ১৸০। দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত মদনমোন মিত্র এক সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। সেই সময় এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ খানি ভাল হয় নাই। তথাপি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার অপেক্ষা পাঠকের রুচিরই নিন্দা করা আবশ্যক। ইহা এক খানি সুবৃহৎ পুস্তক।

ষ্টার থিয়েটার। (দক্ষযজ্ঞাভিনয়)

সম্প্রতি কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ নাটক-লেখক শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের যত্নে 'ষ্টার থিয়েটার' নামে এক অভিনব সুবিস্তৃত রঙ্গভূমি সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ রঙ্গালয়ে প্রথম দিন শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ বিরচিত দক্ষ যজ্ঞ নামক নূতন নাটক অবলম্বনে অভিনয় আরম্ভ হয়। গিরীশ বাবু লিপি-নৈপুণ্য হেতু সর্ব্বত্রই সুপরিচিত সুতরাং তাঁহার রচিত নাটক লোকের প্রীতি সম্পাদনে অবশ্যই সমর্থ হইয়াছিল। আমরা ঐ নূতন নাটকের অনেক স্থলে গিরীশ বাবুর প্রগাঢ় ভাবুকতা ও আবেগময়ী কল্পনার পরিচয় পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি।

পৌরাণিক বিষয়ের নাটক রচনা করিতে হইলে ও সেই নাটককে বর্ত্তমান কালের শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তি জনক করিতে হইলে অবশ্যই তাহার নানাস্থান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হয়। গিরীশ বাবু দক্ষতা সহকারে এই নূতন নাটকে অনেক বিষয় সমাবিষ্ট করিয়া নাটককে মনোরম করিয়াছেন। এতাদৃশ পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও এবং সুচারু রূপে এতৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে গ্রন্থকারের গুণপণা প্রচুররূপে পরিব্যক্ত হইলে মৌলিক উপাখ্যান অর্থাৎ পুরাণোক্ত ঘটনা ও বিষয়কে এককালে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলে মহদ্দোষ সংঘটিত হয় এবং সে দোষ আমরা অমার্জ্জনীয় বলিয়া মনে করি। গিরীশ বাবুর এই বর্ত্তমান নাটকে সে দোষ ঘটিয়াছে এবং আমরা তজ্জন্য আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। মূল হইতেই শিবের প্রতি দক্ষের বিদ্বেষ কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা পৌরাণিক বৃত্তান্ত কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত আছেন তাঁহারা জানেন সতীর সহিত শিবের বিবাহের বহুকাল পরে দক্ষ শিবের প্রতি বিরক্ত ও শিববিদ্বেষী হইয়া উঠেন। পৌরাণিক বিবরণে এতাদৃশ স্বাধীনতা অবলম্বন

আমরা কদাচ অনুমোদন করিতে পারি না। বিশেষতঃ হিন্দু পুরাণ গ্রীসীয়দিগের পুরাণের ন্যায় মৃত নহে। তাহা এখনও লোকের ধর্ম্ম ও মুক্তির উপায়—আরাধিত—অন্তরের সহিত সমাদৃত। গিরীশ বাবুর অন্য কোন কোন নাটকে অমরা এতদপেক্ষাও গুরুতর পৌরাণিক ভ্রান্তি দেখিয়াছি। এসম্বন্ধে গিরীশ বাবুর সাবধানতা নিতান্ত আবশ্যক।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রঙ্গভূমি হইতে লোকে শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ, ভাষায় ব্যবহার, বাক্য কথন প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা করে। আমাদের রঙ্গভূমিতে ততদূর যদি নাও হয়, অন্ততঃ লোকে যাহাতে ভুল না শিখিয়া বাটী ফিরে তাহার উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা দুঃখিত হইয়া ব্যক্ত করিতেছি যে গিরীশবাবু স্বয়ং অভিনয় কালে পুনঃ পুনঃ 'ঐক্যত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং অন্যান্য অভিনেতার মুখে 'সম্মান' ও 'সন্মুখের ছড়াছড়ি। এ সকল দোষ পরিহার করা এখনই আবশ্যক।

আমাদের রঙ্গভূমির এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে পাপিষ্ঠা বারবিলাসিনীগণকে ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু শিক্ষা ও উপদেশ দ্বারা তাহারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে তাহার মর্ম্মও কি বুঝাইয়া দেওয়া যায় না? আমরা নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে ব্যক্ত করিতেছি যে ঐ সকল কলঙ্কিনী তাহাদের কর্ত্তব্য কিছুই বুঝে না এবং আপনাদের ঘৃণিত স্বভাব একবারও ত্যাগ করিতে পারে না। গিরীশ বাবুর রঙ্গালয়ে যে পতিতা নারী সতীর অভিনয় করে তাহাকে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিতে দেওয়া নিতান্ত অবৈধ। আমরা দেখিয়াছি ঐ কুলটার চটুল চক্ষু নিরতই দর্শকবৃন্দের দিকে সঞ্চালিত থাকে এবং কোথায় কোন বিলাসী শ্রোতা বসিয়া আছে এবং তাহার নয়ন সেই দর্শকের হৃদয়ে কোন স্থান পায় কি না, সম্ভবতঃ এই চিন্তায় ও এই কার্য্যে তাহার নয়ন ও মন নিরন্তর বিনিযুক্ত থাকে। আমরা দেখিয়াছি যখন প্রসূতীর সহিত বাক্য কহিতে কহিতে করুণরসের যথেষ্ট উচ্ছাস উঠিয়াছে তখনও ঐ জঘন্য স্বভাবা কুলটার হাস্যপূর্ণও লালসাপূর্ণ নয়ন বিলাসী দর্শককে লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। গিরীশ বাবুর বিবেচনা করা উচিত যে, ঐ পাপীয়সীকে হিন্দু পুরাণের অত্যুচ্চ কল্পনা সম্ভূতা, জগতের আদর্শ স্বরূপা এবং দেবগণের শক্তি স্বরূপা সতীর অভিনয় করিতে দেওয়া হইয়াছে। তাহার শরীরের গতি, ভাব, হাব দৃষ্টি, এবং কথোপকথন সকলই বিজাতীয় অসতীত্ব মাখা। গিরীশ বাবুর নিকট আমরা রঙ্গভূমির উন্নতি আশা করি। তিনি যদিএরূপ জঘন্যতার প্রতিবিধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার রঙ্গভূমির সংস্রব পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। আর যদি তিনি একার্য্যে লিপ্ত থাকিতেও ক্রমশঃ এইরূপ নিকৃষ্ট রুচি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, এখনই ষ্টার থিয়েটারের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাউক, যে স্থানে তাহা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা সমভূমি হউক, এবং সেই পাপক্ষেত্র হলকর্ষণ দ্বারা পবিত্রীকৃত হউক।

বিবাহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক্ষণে রজোদর্শন ও গর্ভাধানের পরস্পর কি সম্পর্ক তাহা আলোচনা করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞানের আশ্রয় লওয়া যাউক। সচরাচর আদ্য ঋতুর সহিত প্রথমে নারীবীজ বীজকোষ ভাঙ্গিয়া বহির্গত হয়, এবং উহা নরবীজ দ্বারা আক্রান্ত হইলে গর্ভসঞ্চার হইতে পারে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরা আদ্য ঋতু হইতেই স্বামী সহবাসের বিধি দিয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে এক্ষণে দুইটী পৃথক মত হইয়াছে—যথা, কতকগুলি শারীর বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন যে, প্রত্যেক রজোদর্শনের সহিত এক বা অধিক বীজ, বীজকোষ ভগ্ন করিয়া জরায়ু অভিমুখে গমন করে, এবং বীজকোষ হইতে বীজ বহির্গত হয় বলিয়াই জরায়ু হইতে শোণিত বহির্গত হয়। অপর কতকগুলি পণ্ডিত বলেন যে, সচরাচর ঐরূপ হয় বলিয়া যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে এমত নহে, কারণ সময়ে সময়ে উহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে; যথা, ঋতু না হইয়াও গর্ভাধান হইতে পারে, এবং অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা বীজকোষ বিনষ্ট করিলে পরেও নিয়মিত রূপে ঋতু হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণের নিজবাক্যপাঠে শীঘ্র অর্থবোধ হইবে বিবেচনায় ডাক্তার প্লেফেয়ার, ডাক্তার বার্ণস্, ডাক্তার হেকার ও ডাক্তার এডিসের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"The main function of the ovary is to supply the female generative element and to expel it when ready for imprignation into the Fallopian tube along which it passes into the uterus."

"In the human female, the periodical discharge of the ovule in all probability takes place in connection with menstruation."—Plafayer Vol. I. p. 74.

"That there is an intimate connection between ovulation and menstruation is admitted by most physiologists, and it is held by many that the determining cause of the discharge is the periodic menstruation of the Groafian follicle."—Plafayer Vol. I. p. 72,

"All that can be fairly held to prove is that the escape of the ovules may occur independently of menstruation but the weight of evidence remain strongly in favour of the theory which is generally received."—P. 74.

"Thus we may conclude that at each menstruation a Groafian vesicle assumes a marked prepondrance over the rest, arrives spontaneously at maturity and generally bursts at an indeterminate moment of this period inorder to expel the ovum it contains. But nevertheless in certain cases this vesicle may also remain stationary or be totally absorbed."—Barnes—Diseases of Women, p. 184.

"The first dehiscence corresponds with the first appearance of the menses."—P. 185.

"Menstruation then is the natural epoch for escape of ova and consequently it is the most favourable to conception."

"Consequently the opening of ova and most frequently their d·hiscence are revealed outworldly by the appearance of the catomenea."—P. 188.

"That early menstruation depends upon early ovulation is further proved by the occasional occurrence of very early pregnancy."—P. 193.

"The exact relation between the discharge of ova and menstruation is not very clear. It was generally believed that the monthly flux was the result of a congestion of the u·erus arising from the enlargement and rupture of a Groafian follicle, but though a Granfian follicle is as a rule ruptured at each menstrual epoch yet several instances are recorded in which menstruation has occurred when no Granfian follicle has been ruptured and on the other hand cases are known when ova have been discharged in Amenorhœa women. It must therefore be admitted that menstruation is not dependent on the maturation and discharge of ova."—Kirk's Physiology—M. Baker, p. 728.

"It has generally been believed that menstruation was the result of an ovarian influx and that this influx emanated from the maturation and rupture of a Gracefian follicle ; in accordance with this view, it was long maintained that a Groafion vesule rup·ured with every menstrual epoch. It cannot be doubted that an ovum is discharged in the great majority of cases in connection with menstruation, at the same time it must be stated that a considerable number of cases have been recorded in which menstruation had taken place unaccompanied by maturation and rupture of an ovarian viscele and these cases are sufficient to show that menstruation is independent of the discharge of ova."

Facts have been observed proving ovulation may occur without menstruation and equally that menstruation may take place without any evidence of ovulation on the most careful examination. Post mertem-women who have never menstruated have conceived and even conception during lactation whilst menstruation is suspended is not uncommon."—D Edis, Diseases of Women, P. 110.

এদেশেও আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন স্ত্রীলোক ঋতুমতী না হইয়াও গর্ভবতী হইয়া থাকেন ; এবং অনেকে সন্তানকে স্তন্যপান করাইবার সময় ঋতুমতী না হইয়াও পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতেছে যে, প্রত্যেক নারীবীজ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই যে ঋতু হইবে এমত নহে। কিন্তু ইহা হইতে এমত সপ্রমাণ হয় যে, প্রত্যেক ঋতুকালে এক বা তদধিক বীজ পরিপক্ক হইয়া বহির্গত হয় না। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা বীজকোষ বিনষ্ট করিলে পর, এবং বীজ জন্মিবার অন্য কোন উপায় না থাকিলেও মাসিক ঋতু পূর্ব্বমত হইয়া থাকে। ইহা হইতে স্ত্রীলোকের ঋতুর ও বীজ বহির্গত হওয়ার পরস্পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে কি না নিশ্চয় বলা সুকঠিন।

এক্ষণে এমত অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া ঐরূপ কঠিন নিয়ম সংস্থাপন করা কতদূর অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে তাহা বিবেচনা করা উচিত। যদিই ঋতুর সহিত নারীবীজ বহির্গমনের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলেও শাস্ত্রের এমত কঠোর নিয়ম হওয়া অস্বাস্থ্যকর ব্যতীত আর কিছু হইতে পারেনা। নরবীজের পরিপক্কতার নিমিত্ত ৭। ৮ বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু নারীবীজ পরি-

পক্ক হইবার নিমিত্ত এক দিনও সময় দেওয়া হয় নাই। আদ্য ঋতুর সহিত যে প্রথম পরিপক্ক বীজ বহির্গত হয় তাহা হইতেই অঙ্কুরোৎপাদন করিতে হইবে। এমত অভিপ্রায় পূর্ব্বকালে আর্য্য জাতির সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত আবশ্যক হইয়া থাকিলেও এক্ষণেও ঐরূপ করা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ তৎকালীন প্রাপ্তবয়স্ক দ্বিজ মাত্রই বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেন; এক্ষণে কত শত প্রাপ্ত বয়স্ক দ্বিজ অর্থাভাবে বা অন্য কারণে অবিবাহিত থাকিয়া শাস্ত্রের বিপরীতাচরণ করেন। আবার মনে করুন, তখন বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রই সস্ত্রীক হইয়া সমস্ত গৃহকার্য্য করিতেন, এক্ষণে শত শত লোক বিবাহিত হইয়াও নানা কারণ বশতঃ স্ত্রীর নিকট হইতে পৃথক বাস করিতেছেন। আবার মনে করুন তৎকালে স্ত্রীমাত্রেই ঋতুস্নানের পর স্বামী সহবাস না করিলে পাতকগ্রস্ত হইতেন, সুতরাং কেহই ঐরূপ করিতে সাহস করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রবাসে হইয়া বা বহুবিবাহ করিয়া ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিতেছেন তাহা কে না জানেন? এবং এই সমস্ত কারণ বশতঃ সহস্র সহস্র ভ্রূণ হত্যাদি হইয়া যাইতেছে! তবুও লোকে শাস্ত্রমত আচার ব্যবহার করিতে, অর্থাৎ দাম্পত্য প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া বাস করিতে, অনিচ্ছুক বা অক্ষম।

এইরূপে লক্ষ লক্ষ নারীবীজ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে ও তাহা নিবারণের কোন উপায় অবলম্বিত হইতেছে না; কেবল আদ্য-ঋতুকালে যে নারীবীজ পরিপক্ক হওয়া অসম্ভব তাহার অঙ্কুরোৎপাদনে আধুনিক লোক কেন এমন যত্নবান তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সামাজিক অন্য কোন কারণ বশতঃই তাঁহারা ঐরূপ করিয়া থাকেন স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ কার্য্য করিয়াই বা কি ফল ফলিয়াছে? সচরাচর বঙ্গদেশে ১০।১১ বৎসরে কন্যার বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং কন্যার আদ্য ঋতুস্নানের পর, পুনর্ব্বিবাহ উপলক্ষে জামাতাকে আনয়ন করিয়া স্ত্রী সহবাস করিতে প্রকারান্তরে আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু তদুৎপন্ন কয়টী সন্তান ভূমিষ্ট হইতে দৃষ্ট হয়? প্রথম পুষ্পোদ্গম হইতে প্রায় সন্তান জন্মে না, এবং জন্মিলেও প্রায় শুষ্ক হইয়া অকালে ভূমে পতিত হয়। বিবাহের পর তিন চারি বৎসর গত না হইলে প্রায় কোন কন্যাই সন্তান প্রসব করেনা, ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সচরাচর কন্যার যে বয়সে বিবাহ দেওয়া হয় তাহা গর্ভধারণের কাল উপস্থিত হইবার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে।

পুনশ্চ দেখুন বালিকা মাত্রেরই প্রায় আদ্য ঋতুর পর ৬। ৭ মাস, কখন কখন একবৎসর পর্য্যন্তও, পুনর্ব্বার রজোদর্শন ঘটেনা, এবং উহাদিগের শরীর হইতে কোন নারীবীজ পরিপক্ক হইয়া বহির্গত হয় এরূপ বলা যায় না। সুতরাং ঐ বিবাহ কাল আধুনিক অবস্থার আধুনিক বালিকাগণের উপযুক্ত নহে। উহা কেবল ভ্রম ও কুসংস্কারের ফল অতএব বিবাহকাল নিরূপন বিষয়ে আদ্য ঋতুর উপর এতদূর নির্ভর করা অনাবশ্যক এবং বালিকার সন্তানোৎপাদিকা শক্তির অন্যান্য চিহ্নের উপর নির্ভর করা উচিত। যথা—অঙ্গের গঠনের পরিবর্ত্তন, স্থূলতা, নিতম্বের বৃদ্ধি, বক্ষের স্ফীততা, স্বর পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। ঐ সমুদয় চিহ্ন,

সকলের পক্ষে এককালে উপস্থিত হয় না; এবং উহারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুতে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। আরও ঐ সমুদায় চিহ্ন ক্রমশঃ প্রকাশ্য; অতএব ঐ সকল লক্ষণ কতকদূর প্রকাশ পাইলে কন্যার বিবাহের আয়োজন করা যাইতে পারে।

কিন্তু যদিই আদ্য ঋতুর সময় বুঝিয়া বিবাহকাল স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে কত বয়সে এদেশে আদ্য ঋতু হইয়া থাকে তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ড ইত্যাদি সমমণ্ডলস্থ দেশে প্রায় ১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যেই বালিকার আদ্য ঋতু হইয়া থাকে; অধিকাংশের প্রায় ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমেই হয়। ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব ও তাহাই হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ডাক্তর বার্ণব যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনুবাদিত হইল; "ডাক্তার ক্যাম্বেলের মতে সায়ামে কোন কোন বালিকা ১২ বৎসর বয়সে ঋতুমতী হয়। কিন্তু ১৪, ১৫, ১৬ বৎসরেই অনেকের প্রথম রজোদর্শন হইয়া থাকে।" "ডাক্তার গুডিভ গড়ে ১২ বৎসর বলিয়াছেন, ও বোম্বাইয়ের ডাক্তার লাইথ ১২½ বৎসর আদ্য ঋতুর সময় অবধারিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে তালিকাটী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে দৃষ্ট হয় যে ১৪ বৎসরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বালিকার আদ্য ঋতু হয়।"

নেটিভ ম্যারেজ য়্যাক্ট প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এই বিষয়ে অনেকানেক সুবিখ্যাত চিকিৎসকের মত লওয়া হইয়াছিল, তদুপলক্ষে ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল যে, অধিকাংশ বালিকা ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিলে পর আদ্য ঋতু হইয়া থাকে। আমরা যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে ত্রয়োদশ বর্ষই আদ্য ঋতুর সময় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নানা প্রকার কারণে ঐ সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। স্বামী সহবাস, সচ্ছন্দে আহার বিহার, আলস্যে কালক্ষেপণ এবং কামোদ্দীপক পুস্তক পাঠ করা ইত্যাদি ঘটনা দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে প্রথম রজোদর্শন হইতে পারে, এবং উহার বিপরীত ঘটিলে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে হইবার সম্ভাবনা। এ নিমিত্ত যদিও সচরাচর এদেশে ত্রয়োদশ বর্ষে আদ্য ঋতু হইতে দৃষ্ট হয়; তথাপি বোধ হয় বাল্য বিবাহ ও অসময়ে স্বামী সহবাস নিষিদ্ধ হইলে বালিকার প্রথম রজোদর্শন আরও কিছুকাল বিলম্বে হইবে। বোধ হয় বালিকাগণ বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্তা হইলে বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা হ্রাস হইবে; এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের নিমিত্ত শোণিত আবশ্যক হইলে জননেন্দ্রিয়ের উন্নতি ও বৃদ্ধি আরম্ভ হওয়া আরও বিলম্বিত হইবে। অতএব কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিবাহ দিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, প্রত্যেক বালিকার আকার প্রকার দর্শনে তাহার বিবাহকাল স্থির করিতে হইবে। নেটিভ ম্যারেজয়্যাক্ট প্রচলিত হইয়া পূর্ব্বে যে সমুদায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মত লওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদিগের অনেকেই ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে বলিয়াছেন। এখনকার উপযুক্ত বয়স ১৫ বৎসরে ন্যূন

নহে। যদিও অধিকাংশ বালিকার ১৪ বৎসর বয়সে গর্ভধানের শক্তি জন্মে, কিন্তু ঐ বয়সে উহাদিগের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকে; এবং উহারা মাতা পিতার আশ্রম ত্যাগ করিয়া পতির আশ্রমে যাইতে অনিচ্ছুক থাকে। ত্বরায় সন্তান জন্মিলে তাহার রক্ষণাবেক্ষণেও ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে; সন্তানের অকাল মৃত্যুও ঘটে। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া পঞ্চদশ বর্ষই বালিকার বিবাহের নিম্নতম-সীমা বলিয়া বোধ হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

বান্ধব-প্রকাশিত 'হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কার ও উন্নতিসাধন মনুষ্যমাত্রের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে দেশ যে পরিমাণে শিক্ষিত ও সভ্য, সেই দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ সেই পরিমাণে সংস্কৃত ও সমুন্নত। ফলত যে ধর্ম্ম বা যে সমাজ যতই সংস্কৃত ও উন্নত হউক না কেন, কোন অংশে যে তাহার কিছুমাত্র অঙ্গহীনতা না থাকিবে, এমন অনুমান হয় না। মানুষ নিজে এখনও অসম্পূর্ণ, সেই অসম্পূর্ণ মানুষ সমূহেই সমাজ গঠিত; সুতরাং অসম্পূর্ণ মানুষের সমাজ যে একবারে অসম্পূর্ণতাবর্জ্জিত, এরূপ ধারণা নিতান্ত অযৌক্তিক। তবে কোন সমাজে দোষের ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত অধিক। ধর্ম্মবিষয়েও ঐ রূপ। জগতের পুংতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, মানব একবারেই বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রণালী গুলি পায় নাই; কালচক্রের অবিরত আবর্ত্তনে মানবকে যখন যে ভাবে থাকিতে হইয়াছে, তখন সেই ভাবের উপযুক্ত ধর্ম্মই সে অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রোক্ত যুগধর্ম্ম কল্পনা অপ্রামাণিক নহে। মানবের বুদ্ধি বৃত্তি ক্রমে যতই মার্জ্জিত হইয়াছে, ততই সে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ধর্ম্মনীতি ও উপাসনা প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছে। আর্য্যেরা ভিন্ন ভিন্ন যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, সেই সঙ্গে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও মার্জ্জিত হইয়া ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থাপন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন যুগের সংহিতাশাস্ত্র এ কথার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বেদ, পুরাণ, দর্শন ও তন্ত্র প্রভৃতি এক সময়ের রচিত নহে এবং তৎসমুদায়ের প্রভেদও বড় অল্প নয়। ফলতঃ, ধর্ম্ম বা সমাজ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট সামগ্রী নহে, মানবের চিত্তবৃত্তি ও দশাবিপর্য্যয়ের সহিত নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।

হিন্দু ধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্ম বা হিন্দু সমাজ

আমাদের সমাজ বলিয়া যে তাহা এ নিয়মের বহির্ভূত, এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক। পরিবর্ত্তই যখন জগতের নিয়তি, তখন আমাদের ধর্ম্ম বা আমাদের সমাজ এক ভাবে আছে বা থাকিবে, এ কথা কে বলিতে পারে? অনুমান দূরে থাকুক, যখন দেখিতেছি যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এক হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ কত ভিন্ন ভাবে বিদ্যমান, তখন আর কষ্ট কল্পনায় প্রয়োজন কি?

ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়ই অতি প্রধান বিষয়। যাঁহারা এতদুভয় সংক্রান্ত বিচার ও মীমাংসা করিয়া, লোকের সন্দেহ ভঞ্জন ও জ্ঞান-বৃদ্ধি করেন, তাঁহারা অতি প্রধান ব্যক্তি। অপক্ষপাতে সত্যানুসন্ধান করাই তাঁহাদিগের পবিত্র জীবনের পরমপবিত্র মূলমন্ত্র। এরূপ মহাত্মাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু ধর্ম্ম বা সমাজ সংশোধন বা তত্তদ্বিষয়ের বিচার করিতে গিয়া সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষকে গালি দেওয়া অতিশয় নিন্দনীয়। বুদ্ধিশক্তি বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলের সমান থাকে না। তাই বলিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি বা অপেক্ষাকৃত অল্প ধর্ম্ম প্রবৃত্তিশীল লোককে কু কথা বলিতে হইবে এমত নহে। বরং এরূপ না করিয়া, মিষ্টকথায় সরলভাবে তাঁহাদের ভ্রমসংশোধন করাই ধর্ম্ম ও সমাজ তত্ত্ব বিচারক মহাশয়দিগের বিশেষ উচিত। তাহা না করিয়া, লোকের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি বা কটূক্তি করিলে, নিতান্ত অসারের ন্যায় পরমপবিত্র ব্রতভঙ্গ করা হয়।

ভারতবর্ষের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যক 'বান্ধবে' প্রকাশিত "হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ" প্রবন্ধ মধ্যে, লেখক মহাশয় অনেকের প্রতি অকারণ কটূক্তি করিয়াছেন। এটি বিশেষ দুঃখের বিষয়। বোধ হয়, ঐ সমস্ত ব্যক্তির-প্রতি অকারণ গালিবর্ষণ না করিয়াও, তিনি প্রস্তাবটি সুন্দররূপে সমাপ্ত করিতে পারিতেন। যাহা হউক, সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অবলম্বিত প্রস্তাবমধ্যে যে সমুদায় বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লেখক মহাশয় আমাদিগের সমাজ ও ধর্ম্মবিপর্য্যয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের যে দুই চারিটি বিরুদ্ধবাদ আছে, ক্রমান্বয়ে নিম্নে তাহা প্রকটিত করা যাইতেছে :——

১। এ দেশে ইউরোপীয়দিগের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার। লেখক মহাশয় বলিতেছেন,—"তুমি অসভ্য—স্বর্ণ রৌপ্যের খনি লইয়া কি করিবে? তুমি শস্য শালিনী ভূমি লইয়া কি করিবে? আইস আমরা তোমাকে খৃষ্টান করিয়া গোলকধামে পাঠাইয়া দিই"।—এইরূপ বুঝাইয়া ছলে বলে ইউরোপীয়েরা অসভ্যজাতির মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ও তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছেন। একথা অস্বীকার করিনা; কিন্তু এরূপ আচরণ ভারতবর্ষের কোথায় হইয়াছে? আরও জিজ্ঞাসা করি, এ প্রকার অভিনয়ে কি ইউরোপীয়েরাই পথপ্রদর্শক, না অন্য কোন জাতি পূর্ব্বে এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিয়াছে? জগতে যখন যে জাতির সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন সেই জাতিই ঐ পথে চলিয়াছে। আমরা যে মহাপুরুষদিগের সন্তান, ভারতবর্ষ কি তাঁহাদিগের আদিম বাসস্থান? লেখক মহাশয় হয়ত বলিবেন, "হাঁ"। কিন্তু পুরাবৃত্ত মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছে, তাঁহারা ছলে বলে ভারতের অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগকে

কতক নিহত, কতক বিদূরিত করিয়া, এই স্বর্ণভূমি অধিকার করিয়াছেন। জগতে এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। কেবল ইউরোপীয়গণ ইউরোপীয় বলিয়া—খৃষ্টান বলিয়া দোষী, আর অন্যেরা সাধু, এ কথা অতি অন্যায়। এরূপে দুর্ব্বলের স্বত্বনাশ করা যে ন্যায়ানুগত নহে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন। বোধহয়, এ স্থলে কেবল তাহাই প্রমাণ করিয়া লেখক মহাশয় ইউরোপীয়দিগের প্রতি কর্কশ ভাষা প্রয়োগ না করিলেই ভাল করিতেন।

২। লেখক মহাশয় বলিতেছেন,—"দশ বৎসরের মধ্যে পনের জন মাত্র হিন্দু খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, বিলাতে পাদ্রীরা ব্যথিত হইয়া, ধর্ম্ম প্রচারের এক উৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিলেন। সে উপায় এই,—"যে ইংরেজকে স্পর্শ করে, সেই বড়মানুষ হইয়া যায়। নবকৃষ্ণ (ক্লাইবের মুন্সি) মাসিক ৬০৲ মাত্র বেতন পাইতেন, কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধের সময় নবকৃষ্ণ নয়লক্ষ টাকা অকাতরে ব্যয় করিলেন।——হিন্দুরা দেখিলেন যে, ইংরেজ সংস্পর্শেই বুদ্ধি বিদ্যা না থাকিলেও বড়মানুষ হওয়া যায়। হিন্দুরা যে দিন এই কথা বুঝিলেন, সে দিন হইতেই ইংরাজসংস্পর্শ ও ইংরেজি শিক্ষার লালসা হিন্দুদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল।——যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু, তাঁহারাও ধনকুবের ইংরেজসংস্পর্শে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইংরেজি লিখিতে শিখিব, ইংরেজিতে কথা কহিতে শিখিব এবং ইংরেজসংস্পর্শে দুই পয়সা ঘরে আনিতে পারিব, এই আশা হিন্দুসমাজস্থ সকলকেই বিচলিত করিল। হিন্দুদিগের এই আশা পরিপূরণ করিবার জন্য নানাস্থানে নানাস্কুল সংস্থাপিত হইল। এদেশীয় ইংরেজেরা কতকগুলি স্কুল খুলিলেন। হেয়ার সাহেব, রামমোহন রায় প্রভৃতির যত্নে হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হইল।.........গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দান করিলেন।.........হিন্দুকলেজে ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি বিজ্ঞান প্রচলিত হইতে লাগিল।......যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষা করিলেন, তাঁহাদের মন হইতে ভয়, ভক্তি, বিনয়, শিষ্টাচার, সম্মান প্রভৃতি কতকগুলি সদ্‌গুণ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল।"

নবকৃষ্ণ ক্লাইবের চাকরী করিয়া ধনকুবের হইলেন,—এ দোষ কি ইউরোপীয় পাদ্রীর? রামমোহন রায় প্রভৃতির যত্নে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইল; গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিয়া, তথায় ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি বিজ্ঞানের আলোচনার ব্যবস্থা করিলেন; হিন্দু বালকগণ তথায় বিদেশীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, কৃতবিদ্য হইতে লাগিলেন।—এ দোষও কি ইউরোপীয় পাদ্রীর? পূর্ব্বকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের অপেক্ষা ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুসন্তানেরা অধিক অবিনয়ী, অধিক অশিষ্ট, একথা আমরা স্বীকার করি না; বিচারস্থলে স্বীকার করিলেও, ইংরেজি ভাষার কোন শিক্ষাগ্রন্থে যে, অশিষ্ট অবিনয়ী বা পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধাবান হইতে উপদেশ দেয়, একথা কে বলিবেন? সত্য বটে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ শালগ্রামের নিকট মস্তক অবনত করিতে চাহেন না। কিন্তু ইংরেজজাতির অভ্যুদয়ের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ধর্ম্মবিষয়ে এদেশে যে ঘোর নাস্তিকতা এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধবাদ প্রবল হইয়াছিল, তাহা কে না জানে? একরূপ ধর্ম্মভাব কি সর্ব্বত্র সমভাবে থাকে? যেখানে

সাধু, সেই খানেই অসাধু আছে। যেখানে স্বাধীন চিন্তায় লোকের অধিকার আছে, সেই খানেই ধর্ম্মবিষয়ে মত বিরোধ ঘটে। ইংরেজপাত্রী বা ইংরেজি শিক্ষাই উহার এক মাত্র কারণ নহে।

৩। লেখক মহাশয় বলিতেছেন,—"হিন্দু সমাজ এত কাল যাহা কিছু এত যত্নে সঞ্চয় করিয়াছিল, দুই দিনের ইংরেজি শিক্ষায় তাহা উড়াইয়া দিল। তবেত ইংরেজি শিক্ষাই সত্য! তবেত হিন্দু সমাজ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন! যেখানে হিন্দুসমাজে দুই দিনের ইংরেজি আলোক সহ্য করিতে পারিল না, সেখানে হিন্দুসমাজ ভ্রমান্ধ বই আর কি?" যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন হিন্দু-সমাজ বাস্তবিকই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। মুসলমান শাসনকাল হইতেই হিন্দুদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মুসলমানী প্রথা বহুল পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। তখন শাস্ত্রানুসারে কয়জন চলিত? ইংরেজি শিক্ষার তেজে মুসলমানী কুসংস্কার আমাদিগের দেশ হইতে অনেক তিরোহিত হইয়াছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু আচারের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই, এমত বলিনা। প্রত্যুতঃ উক্ত শিক্ষার প্রভাবে অনেক বিলাতী প্রথা আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে। তাই বলিয়াই যে ইংরেজি শিক্ষায় আমাদিগের কোন উপকার হয় নাই এমনও নহে। একটা প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে লাভ ক্ষতি উভয়ই হইয়া থাকে। এ কারণে ইউরোপীয়দিগের উপর সম্পূর্ণ দোষারোপ করা উচিত নয়।

৪। লেখক মহাশয় প্রবন্ধের স্থল-বিশেষে পণ্ডিতবর, মহাত্মা ডফ্‌সাহেবের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। আমাদিগের সমাজের গুরুর সম্বন্ধে উক্ত মহাত্মা যেমত কহিয়াছেন, তাহা কতদূর মিথ্যা, অনেকেই বিদিত আছেন। গুরুবংশ প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট থাকে; সেই বংশে মূর্খ বা পণ্ডিত, অসাধু বা সাধু যে কেহ জন্মিবেন, তিনিই "অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত ঈশ্বর পথ প্রদর্শক" বা "জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা অজ্ঞান তিমিরান্ধের চক্ষুরুন্মীলনকর্ত্তা" হইবেন! গুরুব্যবসায় বংশগত, গুরুবংশ ত্যাগ শিষ্যের পক্ষে ঘোর পাপের কথা! এক এক গুরুবংশের ধনী ও নির্ধন বহুসংখ্যক পরিবার নিরূপিত শিষ্য থাকে। তাঁহাদিগের উপরেই অধিকাংশ গুরুর দুর্বহ জীবনের ভার ন্যস্ত। গুরুবংশীয় বালকেরা জানেন, প্রবাস গমনেই অর্থ—অর্থই সকল সুখের মূল। অধ্যয়ন বা জ্ঞানার্জ্জনে প্রয়োজন কি? তাঁহারা প্রায়ই জীবনের প্রথমার্দ্ধ আপন আপন বিলাস-বাসনা পূরণে ব্যয়িত করিয়া, অবশিষ্টকাল "কুতঃপঙ্গুঃ পদহীনং শটৌলঙ্ঘয়তে গিরিং" এই মহাবাক্যের সত্যতাখ্যাপনে অতিবাহিত করেন। এই-রূপ গুরুর কথাতেই মহাত্মা ডফ্ এরূপ উপদেশ দিয়া ছিলেন। প্রকৃত গুরুর প্রতি কি বিজ্ঞ ব্যক্তি অনাদর করিতে পারেন? হায়! এই সকল গুরু প্রকৃত গুরু হইলে, দেশের কি মহৎ উপকারই হইত! ডফ্‌সাহেব যদি পূর্ব্বোক্ত গুরুর প্রতি অনাদর করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার সে কার্য্যের দোষ অপেক্ষা গুণই অধিক বলিতে হইবে। তিনি পরম যত্নে এদেশীয় বালকদিগের চিত্তোৎকর্ষ-সাধন করিয়াছেন, আর তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অযোগ্য গুরুর প্রতি অভক্তি করিতে

বলিয়াছেন। শিক্ষিত মন আপন কার্য্যাকার্য্য বিচারে অক্ষম নহে। সে স্বয়ং গুরুর গুণ জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি আস্থাশূন্য হইত, না হয় ডফ্‌সাহেব আগেই সে বিষয় তাহার গোচর করিয়াছেন। আর তাঁহার উপদেশের বলেই বা বঙ্গদেশের আট কোটি লোকের মধ্যে কয়জন গুরুত্যাগ বা খৃস্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে? আমাদিগের সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার যতদূর উন্নতি এখন দেখা যাইতেছে, ইহার অধিকাংশ উক্ত মহাত্মার অবিরত চেষ্টা ও যত্নের একমাত্র ফল। এরূপ মহাশয়ের নিকট সমগ্র বঙ্গদেশ চিরকৃতজ্ঞতায় বদ্ধ। এ প্রকার মহাত্মার উপরে অযথা কলঙ্কারোপ করা নিতান্ত গর্হিত।

৫। সিঙ্গাপুর দ্বীপ হইতে জনৈক ইংরেজ বিলাতের "টাইম্‌স্" নামক পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। লেখক মহাশয় সেই পত্রখানির স্থল বিশেষ অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা বা সভ্যতার বিস্তার করা খৃষ্টপাদ্রীদিগের অভীষ্ট নহে। তাঁহাদের অভিপ্রায় কেবল খৃষ্টান করা। বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া কেবল প্রলোভন দেখান মাত্র। আমি বোধ করি, একথা লিখিবার সময়, জন্‌ফ্রেডরিক্‌ ওবর্লিনের জগৎ পূজিত নাম ও কার্য্যকলাপ লেখক মহাশয়ের স্মরণ ছিলনা। চিরস্মরণীয় ডেবিড্‌ হেয়ারও পাদ্রী ছিলেন। লেখক মহাশয় এই প্রস্তাবেরই স্থানান্তরে, হিন্দুকলেজ স্থাপয়িতৃবর্গের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন, "শুদ্ধ জ্ঞানালোকে ও বিদ্যালোক বিতরণ করাই ডেবিড্‌ হেয়ার সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল"। একজন যে সে সাহেবের কথায় নির্ভর করিয়া সমস্ত পাদ্রী বা ইউরোপীয় সমাজের নিন্দা করা ভাল দেখায় না। খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে বিদ্যা ও সভ্যতার বিস্তার করাও এদেশেস্থ ইউরোপীয় পাদ্রীদিগের জীবনের মূল মন্ত্র ছিল—এখনও আছে। তাঁহারা যে উদ্দেশ্যেই যত্ন করুন না কেন, তাহা আমাদের উপকার ভিন্ন অপকারে অতি অল্পই আসিয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহের সুফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, কেবল তাঁহাদিগের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করা ভাল বোধ হয় না। পাদ্রীদিগের মধ্যে দুই চারি জন আমাদিগের ধর্ম্ম ও সমাজের একান্ত বিদ্বেষী বটেন, কিন্তু সেই দুই চারি জনের চেষ্টায় বিশাল হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ অধিক বিচলিত বা বিপর্য্যস্ত হইবে না। দুই এক জনের জন্য সমস্ত সম্প্রদায়কে দোষ দেওয়া নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ।

৬। যে সময়, ইউরোপীয় পাদ্রীদিগের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া দুই চারি জন হিন্দু সন্তান খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল, সেই বিপৎকালে—মহাত্মা রামমোহন রায় বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের সত্যতা প্রচারের জন্য ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। একে মুসলমান শাসন কাল হইতে হিন্দুসমাজ অজ্ঞানান্ধ, তাহাতে পাদ্রীদিগের সবল ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশমালার প্রবল তেজে হিন্দুসমাজ কতক বিচলিত হইল। তখন হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের অনুকূলে কে দাঁড়ায়? সেই সঙ্ঘাত সময়ে, অমিততেজা রামমোহন রায় বেদের সহায়তায় সমাজের ও দেশের অনুকূলে অটল অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। অনেকে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদমূলক; সুতরাং তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিল

না। এ স্থলে মহাত্মা রামমোহন রায়কে হিন্দুসমাজের মিত্র না বলিয়া শত্রু বলা লেখক মহাশয়ের পক্ষে অযোগ্য হইয়াছে।

৭। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, ধর্ম্ম যদি রবিবাসরীয় পরিচ্ছদের ন্যায় ব্যবহৃত না হইয়া, জীবনের সারবস্তু বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে, উহা নিত্য নিত্য নব নব ভাবে ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া প্রকাশ পায়। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু একথা স্বীকার করিলে, তৃতীয় ব্রাহ্মগুরু কেশব বাবুর ধর্ম্মান্দোলন কিরূপে নিন্দনীয় হইতে পারে? কেশব বাবু দেশের লোকদিগের রুচির অনুসরণ করিয়া এবং বৈদেশিকদিগকে আপন ধর্ম্মের নীতি বিদিত করিবার জন্য ইংরেজি ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন। কে বলিবে, কেশব বাবু দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারিতেন না? কেশব বাবু ধর্ম্ম প্রচারবিষয়ে কোন স্থলে যে বিশাল রত্নাকর হিন্দুধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, আমাদিগের এ বিশ্বাস নাই। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত। অতএব কেশব বাবু হিন্দু ধর্ম্মের শত্রু না হইয়া বরং মিত্রভাবে পরিচিত হওয়াই উচিত। স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিলাতী প্রথা সকল, কেশব বাবু এদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া, লেখক মহাশয়, তাঁহাকে অনেক দোষ দিয়াছেন। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" ভগবান মনুর এই উক্তিটি স্মরণ হইলে, স্ত্রীশিক্ষার প্রথাকে বিলাতী প্রথা বলিতে লজ্জা বোধ হয়। লেখক মহাশয়ই, স্থানান্তরে, হিন্দু যুবার প্রতি উপদেশ দিতে গিয়া কহিতেছেন,—"যাহা তোমার গৃহে আছে, তাহার কণামাত্র পাইবার জন্য খৃষ্টীয় পাত্রীর পদলেহন করিতেছ।" আবার "ঈশ্বরের সহিত স্থাপিত কান্তভাবকে লেখক মহাশয় "অতীব গভীর, অতীব মধুর" বলিয়া, পাঠকবর্গকে কেশব বাবুর জীবনেই এই পবিত্র ধর্ম্মভাবের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কেশব বাবু হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের বৈরী হইলে, হিন্দু যুবা কেমন করিয়া তাঁহার নিকট গভীর, মধুর, পবিত্র কান্তভাব শিখিবে? বাস্তবিক তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের শত্রু বলা অবৈধ হইয়াছে। বোধ হয়, ইংরেজ ধর্ম্ম প্রচারকদিগের চেষ্টায় আমাদিগের সমাজের ও ধর্ম্মের যে কিছু অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল, কেশব বাবু সেই আশঙ্কা হইতে হিন্দুসমাজকে অনেক রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম যে পথেই যাউক না কেন, সুবিশাল হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাহার কেন্দ্র দৃঢ় সংবদ্ধ আছে।

৮। মদ্যমাংসের ব্যবহার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, লেখক মহাশয় এ দেশের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারকে "ঢেঁকি রাম" প্রভৃতি অসম্ভ্রম সূচক নাম দিয়াছেন। বাস্তবিক মদ্যমাংসের ব্যবহার উক্ত ঢেঁকিরামদিগের প্রবর্ত্তিত নহে। তান্ত্রিক উপাসকেরা অতি প্রাচীন প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়া এখনও মদ্যমাংস প্রভৃতি "পঞ্চমকার" দ্বারা শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। যে চৈতন্য দেবকে হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু সমাজের একজন প্রবল বৈরী বলিয়া প্রস্তাবের সূত্রপাতেই উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই শচীনন্দন, অনাথবন্ধু চৈতন্য বরং এ সকল কুপ্রথা বঙ্গদেশ হইতে উন্মূলিত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, বোধ হয়, অনেকদূর কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। চৈতন্য হিন্দুধর্ম্মের বৈরী হইলে, লেখক

মহাশয়ের মতে, ব্যস পরাশর মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরাও এক এক জন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের অতি প্রবল শত্রু হইবেন সন্দেহ নাই। আবার স্থানান্তরে লেখক মহাশয় "চৈতন্য চরিতামৃত"কে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া এবং চৈতন্যের প্রচারিত "মুক্তি হইতে ভক্তির উৎকর্ষ জ্ঞানকে উদার উচ্চ এবং পবিত্র ধর্ম্মভাব" বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এরূপ স্থলে, চৈতন্যকে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের ঘোরতর শত্রু বলিয়া ঘৃণা করিব, না হিন্দুধর্ম্মের পরম হিতৈষী সংস্কারক বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করিব?

৯। লেখক মহাশয় বলিতেছেন,—"যখনই বিদেশীয়েরা বহুল অর্থব্যয় ও ক্লেশ-স্বীকার করিয়া এ দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছে, তখনই হিন্দুসন্তানেরা দলে দলে বিজাতীয় বিধর্ম্মীদিগের দলপুষ্টি করিয়াছেন। কয়েকজন বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য ভিন্ন অন্য কেহই হিন্দুত্বের জন্য কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি পর্য্যন্ত উত্তোলন করেন নাই।" এ কথা অনেকটা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালে, ইংরেজ পাদ্রী বা ইংরেজি শিক্ষা কিছুমাত্র এ দেশে ছিল না, তখন হিন্দু সমাজে অতি ঘোরতর বিপ্লব কেন ঘটিয়াছে? হিন্দু খৃষ্টান হইল, এটি প্রত্যক্ষ ব্যাপার; কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান, বা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রহণ করে নাই? তাহারও পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ কি নাস্তিকতার ঘোর আন্দোলনে আন্দোলিত হয় নাই? তবে ইংরেজ পাদ্রী বা ইংরেজি শিক্ষাই যে হিন্দুসমাজ নষ্ট করিয়াছে, এমত নহে। একটা নূতন মতের আন্দোলন হইলে, কিয়দংশ লোকে তাহার পক্ষপাতী হইবেই হইবে। যাহাদের সেই মতে আস্থা জন্মিবে সর্ব্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়াও তাহারা তাহা অবলম্বন করিবে। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা আপনাদের মতেই থাকিয়া যাইবে।

১০। হিন্দুধর্ম্ম যে বিশাল এবং উৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখক মহাশয় যে বলিলেন, লোকের প্রবৃত্তি বিবেচনায় যে মন্ত্র যাহার উপযোগী, গুরু সেই মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত করেন, একাথাটি আমরা স্বীকার করিনা। যে বংশ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, সে বংশের কেহ বিষ্ণু বা শিবমন্ত্র গ্রহণ করেন না; পরন্তু এরূপ কর্ম্মে বিশেষ পাপ সঞ্চয়ের আশঙ্কা করিয়া থাকেন।

১১। লেখক মহাশয় স্থানান্তরে কহিয়াছেন,—"রামের শরীরে প্রেম নাই।" রামের জীবন একটি প্রেমের নদী বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। গুহক চণ্ডাল, সুগ্রীব বানর, রাক্ষস বিভীষণ যাঁহার আলিঙ্গনে হৃদয় শীতল করিবার অধিকারী হইয়াছে, সেই প্রেমময় পুরুষের চরিত্রে প্রেম নাই? রামচন্দ্রের ন্যায় প্রকৃতি প্রেম কোন জীবনে দেখা যায়? তিনি প্রকৃতি পুঞ্জের পরিতোষের জন্য, প্রাণপ্রতিমা, পরমশুদ্ধচারিণী জানকীদেবীকে অকাতরে বর্জ্জন করিয়াছেন। আবার রামের মত দাম্পত্যপ্রেম প্রবণ হৃদয়ও আর কাহার নাই। সীতার বনবাসের পর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন; সস্ত্রীক যজ্ঞারম্ভ করিতে হইবে। তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত ও গুণবান ভূপতি ইচ্ছা করিলেই বিবাহ করিতে পারেন, আত্মীয়স্বজনেরা অনেক অনুরোধও করিলেন, কিন্তু সে প্রেমময় হৃদয় কি সীতাভিন্ন আর কাহারও মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে? জানকীর হৈমমূর্ত্তি গঠিত হইল, রামচন্দ্র সেই

হৈমসীতামূর্ত্তির সঙ্গে সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্গে দাম্পত্য প্রেমরূপ যজ্ঞের অপূর্ব্বরূপ সম্পাদন করিলেন! জগৎ শুভক্ষণে সেই মহাপুরুষের আচরণে পরম শুভকর পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিল! কৃষ্ণও প্রেমিক বটেন, কিন্তু তাঁহার প্রেম সমানের প্রতি। রামের প্রেমে সমস্ত জগৎ অধিকারী। রামচন্দ্রকে অপ্রেমিক বলা ভাল হয় নাই।

১২। খৃষ্টের আপন মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রতি উপেক্ষা ও অভক্তি প্রমাণ করিবার জন্য, লেখক মহাশয় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে যে বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা খৃষ্টের স্বজনের প্রতি অভক্তি বা উপেক্ষা প্রকাশ পায় না, বরং তাহাতে এই প্রকাশ পায় যে, তিনি ঈশ্বর ভক্তের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। লেখক মহাশয় স্থানান্তরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে একটি বচনের নিম্নলিখিত অর্থ প্রকাশিত করিয়া বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠের লক্ষণ করিতেছেন। "সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, বন্ধু, সাধু, অসাধু, এই সকলে যাঁহার সমান জ্ঞান, তিনিই বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।" তাহা হইলে, খৃষ্ট সকলের প্রতি সমান জ্ঞান করিয়া কোন মতে নিন্দার্হ হইবেন না, বরং তিনি শ্রেষ্ঠই হইবেন। অনর্থক খৃষ্টের চরিত্রে দোষারোপ করিতে গিয়া লেখক মহাশয় বিবেচনার কর্ম্ম করেন নাই।

১৩। আমাদিগের দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি বিজ্ঞানের আলোচনা না হইলে, সে অবস্থা শীঘ্র অপনীত হইত, বোধ হয় না। ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয়ে যে হিন্দুগণ এক্ষণে আপনাদের স্বাধীন মত প্রচার এবং অপরের প্রচারিত মতের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতেছেন, সে কেবল ইংরেজ পাদ্রী এবং ইংরেজি শিক্ষার গুণে। ইংরেজ পাদ্রীর গুণেই বঙ্গভাষার দেহসংস্থান হইয়াছে; ইংরেজ পাদ্রীর গুণেই হিন্দু আজ হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইতেছেন। পাদ্রী মহাশয়েরা কত যত্নে, কত অর্থব্যয়ে কত কত লুপ্তপ্রায় মহামূল্য সংস্কৃত গ্রন্থের পুনরায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যবনাধিকার কালে, অনেক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, পাদ্রী এতদ্দেশে না আসিলে, এতদিন সে কয়খানিও অদৃশ্য হইত। আমাদিগের এরূপ হিতকারী পাদ্রী মহাশয়দিগের প্রতি বরং বিশেষ কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত।

আমরা খৃষ্টীয় বা অপর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা সমাজকে ঘৃণা করিতে চাহিনা। যাহা আমাদের, আমরা তাহাতেই তৃপ্ত আছি, অনর্থক আমাদের তৃপ্তির বিঘ্ন করা অন্যেরও উচিত নয়। যদি অন্যেরা ন্যায় দৃষ্টি পরিহীন হইয়া, এই প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন সমাজকে অবজ্ঞা করেন, তাহার জন্য তাঁহারাই দোষী হইবেন। আমরা দোষ না দিতে পারি, সভ্য জগৎ তাঁহাদিগকে ছাড়িবেন না—সর্ব্বসাক্ষী ইতিহাস তাঁহাদিগের কলুষিত নামে কালিমালেপন করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না।

হিন্দুসমাজ যে বিশেষ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে অনেকের আস্থা কিয়ৎপরিমাণে কমিয়াছে, তাহা স্বী-

কার করি। কিন্তু চৈতন্য, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, খৃষ্টীয়পাদ্রী বা ইংরেজি শিক্ষা, এ গুলির কোন একটি তাহার একমাত্র কারণ নহে। নানা কারণ একত্র মিলিয়া হিন্দুসমাজে এই ঘোর পরিবর্ত্ত সঙ্ঘটিত করিয়াছে। যাহাতে আমাদিগের সমাজের এই দুর্দ্দশার অপনয়ন হয়, সে বিষয়ের আলোচনা ও চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এই ভয়ানক বিপ্লবের যথাসাধ্য বিবরণ বারান্তরে প্রকাশিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা রহিল।

শ্রীপ্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।*

চামেলিমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রমোদ বাগানে, সরসী কোলে,
মাতায়ে ভ্রমর-কুল, ফুটেছে চামেলি ফুল,
সুখের আবেশে লতিকা দোলে!
পুলকে বিভোর পাপীয়া কোলে!

গাইছে পাপীয়া মধুর গান
জাগায়ে বিহগদল, কাঁপায়ে সরসীজল
সৌরভে মাতায়ে কুসুম-প্রাণ,
উঠিছে আকাশে মধুর তান!

নীলিম-গগনে মেঘের ছটা!
শাদা মেঘ গুলি তায়, ভাসিয়ে ছুটিয়ে যায়,
নীলাম্বু হৃদয়ে তরঙ্গ ছটা!
বিভূতি-ভূষণ শিবের জটা!

প্রভাত কিরণ উজ্জল করি
সখী সহ সুরবালা, গাঁথিছে চামেলি মালা,
ফুল্ল ফুল দাম করেতে ধরি,
কুসুমের রাশি কুসুম-পরি!

ধীরে ধীরে তথা মলিন বেশে
আসি রণধীর বসিল পাশে!
বিষাদে চমকি আকুল প্রাণে,
চাহে সুরবালা বদন পানে!
সে ফুল্ল কমল মলিন দেখি,
হাসিতে হাসিতে কহিল সখী,—
'একি দেখি আজি, কহহে বীর,
বদন মলিন, নয়নে নীর?
এ সুখের দিন, এ উজ্জল উষা
অবনীর অঙ্গে কুসুমের-ভূষা!
দেখ চেয়ে অই তপন-কোলে,
ফুটন্ত কমল সোহাগে দোলে!
সমীর পরসে লতিকা হাসে,
ত্যজিয়ে শরম পুলকে ভাসে!
কুহরে পাপীয়া, ললিত গীতে
প্রেমের রহস্য শিখায়ে দিতে!
এ সুধা অবনী অধরে ধরে,
এ সকল শোভা তোমারি তরে!
এত দিন পরে ফলিবে আশা!
সলিল প্রচুর! মিটিবে তৃষা!

---

* লেখক মহাশয়ের মত ও উক্তি কোন কোন স্থলে প্রতিবাদার্হ।—প্রঃ সম্পাদক।

শির নমি লও চামেলি মালা,
পূর্ণ হোক আশা ঘুচাও জ্বালা!'
আঁখি হতে মুছি নয়ন-নীর,
বিষাদে নিশ্বাসি কহিল বীর,—
"হায় সুরবালা! সুখের স্বপন
এতদিনে বুঝি ফুরাল এখন!
কেমনে জানাব মরম-বেদনা,
সহিছি হৃদয়ে যে ঘোর যাতনা!
হেরিনু নিশিথে অদ্ভুত স্বপন,
সিহরিবে শুনি সে দৃশ্য ভীষণ!
রাহু-গ্রাসে শশী সহসা উঠিল,
তিমির সাগরে বসুধা ডুবিল!
সহস্র তারকা সবে জ্যোতিহীন!
সে ঘোর তিমিরে তারাও বিলীন!
শব্দময়ী ধরা স্তব্ধ—অচেতন,
জ্ঞান হারা যেন ভয়েতে ভুবন!
অম্বর-অধিষ্ঠাত্রী জগত-জননী,
কুলদেবী মম করাল-বদনী,
রণবেশে সাজি মুখে অট্টহাসি,
দাঁড়াইলা মম শিয়রেতে আসি!
নরমুণ্ড গলে, অসি দোলে করে,
রুধির-প্রবাহ অধরেতে ঝরে,
কালানল সম জ্বলে ত্রিনয়ন,
ভ্রকুটী-কুটীল করাল আনন!
বিস্ময়ে উঠিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
যুড়ি দুই কর জিজ্ঞাসিনু আমি!
'কহগো জননী! কোন্ পুণ্য ফলে,
পড়িতে পেলেম ও চরণ তলে?'
গম্ভীরে কালিকা কহিলা আমারে,
'শোন্ রণধীর! আদেশিছি তোরে,
হইবে ত্বরায় ভীষণ সমর,
আসিছে যবন লভিতে অম্বর!
বিড়ম্বনা হায়! বিধির লিখন,
অচিরে অম্বর হইবে পতন!
এ সময়ে যেই সেনাপতি হবে,
শমনের গ্রাসে নিশ্চয় পড়িবে!
কার সাধ্য আর অম্বরে রক্ষিবে,
থাকিলে হেতায় তুমিও মরিবে!
সাবধান ভাই! থাকে যেন মনে,
যাস্ যদি তুই এ যবন-রণে,
পরাজিত হবি নিশ্চয় সমরে,
নিশ্চয় মরিবি যবনের করে!
বাঁচাইতে চাই তোরে রণধীর!
ভাল বাসি তোরে প্রিয়তম বীর!'
বিষাদে বিস্ময়ে চাহি মুখ পানে,
কহিলাম আমি আকুল পরাণে!
'ও চরণ তলে হায় মরিব এখনি,
অবশেষে এই আজ্ঞা করিলে জননি?
মরিবার ভয়ে হায় ত্যজিব অম্বর,
পলাইব প্রাণ ভয়ে ছাড়িয়া সমর?
হেন পাপ জীবনেতে কোন্ প্রয়োজন?
পলাইতে হলো যদি পরিহরি রণ?
কহগো চামুণ্ডে, তুমি সমর রঙ্গিনী!
রণ-স্থলে বীরগণে অভয় দায়িনী!
হয়ে রাজপুত বীর তোমার তনয়,
রণ-রঙ্গে মরিবারে পাইব কি ভয়?
হইয়ে ক্ষত্রিয় মাতঃ! ডরিব যবনে?
যোড়হাতে প্রাণভয়ে পূজিব শমনে?
হাসিবেক বীরকুল, হাসিবে ভুবন,
হাসিবে অমর-বৃন্দ, হাসিবে যবন!
ধরিলাম অসি হায়! শিখিলাম রণ,
সেবিলাম ও চরণ, হাসাতে যবন?
বীরকুলে একলঙ্ক হবে চিরদিন,
রাজপুত যশোরাশি হইবে বিলীন!
এতই অধম আমি এ আদেশ তাই?
নিষ্ঠুর আজ্ঞা তো হেন কভু কর নাই!
পিতৃগণ অকাতরে স্মরি ও চরণে,
পশিতেন ঘোর রণে পুলকিত মনে!

তুমিতো আপনি আসি দিতেগো অভয়!
তোমার প্রসাদে মাতঃ চিরদিন জয়!
কোন্ পাপে আজি বল বিমুখ হইলে,
কোন্ পাপে চিরদাসে বল মা ত্যজিলে?
কি দোষ করেছে বল অম্বর-কুমারী
পবিত্র প্রসূন সম রাজপুত-নারী?
বল কোন অপরাধে যবনে সেবিবে?
রাজপুত বীর তাহা কেমনে দেখিবে?
কেনা জানে রাজপুত তোমার তনয়?
কি ছার যবন? তারে কেন করি ভয়?
ইচ্ছা যদি কর তুমি পারতো এখনি,
হুহুঙ্কারে ভস্মশেষ করিতে অবনী!
অতল জলধিতলে ডুবাতে যবন,
সময় রঙ্গেতে মাতি দেখাইতে রণ!
তবে কেন বল মাতঃ যবনে ডরিব?
আজ্ঞা দেহ, বীর দর্পে সমরে পশিব!'
কহিলা ভবানী 'শোন্ মূঢ় নর!
অদৃষ্টের দাস মানব অমর!
কি করিব আমি বৃথা গঞ্জ মোরে,
অদৃষ্ট লিখন কহিলাম তোরে!
ভারত-ললাট বিধির লিখন,
যবনের জয় ভারত-পতন!
যাইতে সমরে নিবারিছি তাই!
প্রাণ যদি চাও রণে কাজ নাই!
এরণে পশিলে হারাইবি প্রাণ!
শোন্ আদেশিছি পুনঃ! সাবধান!'
আদেশি কালিকা হলো অন্তর্ধান!
কি হইবে ভাবি আকুল পরাণ!
আসিছে যবন বল কি করিব,
অম্বিকার আজ্ঞা কেমনে লঙ্ঘিব?"
মুকুতা-দশনে দংশিয়ে অধরে,
মৃদু হাসি বালা উত্তরিল ধীরে,—
"পলাও হে বীর! বাঁচিবে তো প্রাণ!
প্রিয় কিবা আর জীবন সমান?
পবিত্র অম্বর, যবনে পূজিবে,
ক্ষতি তাহে নাই প্রাণতো বাঁচিবে,
হা ধিক্! হা ধিক্! ধিক্ রণধীর
বুঝেছি বুঝেছি তুমি যত বীর!"

অকস্মাৎ রণভেরী বাজিয়া উঠিল;
ভীষণ সমর ডঙ্কা,
ভারত বীরের শঙ্কা,
সহসা ভৈরব-রবে গগনে গর্জ্জিল!
শুনি সে ভীষণ-রবে,
পাখীগণ প্রাণ ভয়ে গগনে ছুটিল,
আতঙ্কে শ্বাপদকুল কাননে পশিল!
শত প্রতিধ্বনি তার পুরিল গগন!
গর্জ্জিল যবন দলে!
ঘোরতর কোলাহলে,
কাঁপিয়া উঠিল ধরা, পর্ব্বত কানন
চমকিয়ে রণধীর,
বিস্ময়ে কহিল বীর
"হায় সুরবালা! অই আসিল যবন!
অম্বিকা আদেশ নহে অলীক স্বপন!"

হারাল ধৈরজ বালা, দাঁড়ায়ে উঠিল!
কাঁচলি পড়িল খসি!
চঞ্চল চিকুর রাশি,
কম্পিত উরজ পরে আসি আবরিল!
নয়ন নীরজ দুটী,
সহসা উঠিল ফুটি!
সুন্দর মরাল-গ্রীবা ঈষৎ হেলিল!
বিষাদেতে বিধুমুখী উত্তর করিল,—

"এত যদি ভয় বীর! কর পলায়ন!
বীর-বেশ পরিহর, নারীর বসন পর,
প্রবেশ প্রাণের ভয়ে বিজন কানন!
দাও দাও, ছাড় অসি!
সমর প্রাঙ্গণে পশি,

দেখিব কেমনে হয় অম্বর-পতন !
রণ ভূমে মহে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন !

অভিমানে উঠি বীর ধরি তরবার,
উর্দ্ধে চাহি যোড করে,
কহিলা গম্ভীর স্বরে,
"লঙ্ঘিনু আদেশ আমি অম্বিকে তোমার
হয়ে থাকে অপরাধ,
পুরায়ে মনের সাধ,
আনন্দে করিও পান রুধির আমার !
যাই রণে, অই অরি গর্জ্জিল আবার !

"যাই তবে প্রাণ-সখি ! হৃদয়ের ধন !"
আদরে সোহাগ ভরে
ধরিয়ে কুসুম-করে
ছল ছল আঁখি দুটী করিয়ে চুম্বন !
"ললাট-লিখন যাহা,
অবশ্য হইবে তাহা,
এ সময়ে প্রিয়তমে ! করোনা রোদন !
এই বুঝি শেষ দেখা শেষ আলিঙ্গন !"

নিবারি নয়ন-কোণে নয়নের জল,
করে তুলি ফুল মালা,
উত্তরিল সুরবালা,—
"কি ভয়, ভাবিছ কেন হেন অমঙ্গল ?
বীর দর্পে কুতুহলে,
পরাজয়ি অরিদলে,
ত্বরায় ফিরিয়ে এস জুড়াইব জ্বালা !
গেঁথেছি যে বড় সাধে এ চামেলি-মালা।"

রণবেশে রণধীর সেনা মাঝে পশিল !
রাজপুত বীরগণ গরজিয়ে উঠিল !
মার মার ভীমরব গগনেতে ধ্বনিল !
অরিদল মাঝে তার প্রতিধ্বনি বাজিল !

শত অসি শূন্য দেশে চমকিয়া উঠিল !
গরজি ভীষণ রবে বীর দল গাহিল !

"কে যাবি সমর-ভূমে ত্বরা করি আয়রে !
রণরঙ্গে রাজপুত রণভূমে ধায়রে !
অই শোন্ অরিদল কোলাহল করিল !
অরির সমর-ভেরী অই শোন্ বাজিল !
অরির রুধির স্রোতে বসুমতী ভাসিবে !
যবনের রণতৃষা আজ রণে মিটিবে !
যুঝিব যবন সনে, আকুল হৃদয় রে !
কে যাবি ত্বরায় আয় বিলম্ব না সয়রে।"

ভীম মূর্ত্তি বীরগণ ভীম-রবে চলিল।
প্রলয়ের মেঘ যেন বজ্রনাদে ছুটিল।
যবন সেনার মাঝে রাজপুত পশিল,
আনন্দে যবন-বীর আস্ফালিয়ে উঠিল।
সদর্পে সাগর-বক্ষে ভীম নদী মিশিল,
তরঙ্গে তরঙ্গে যেন ঘোর রণ বাধিল।

যুঝে রাজপুত যবনের সনে—
কি হয় কি হয় কি জানি এ রণে !
নিনাদে গগনে সমর-বাজনা,
তুরঙ্গের হ্রেষা অসির ঝন্‌ঝনা।
কুলবালা কুল হুলুধ্বনি করে,
শঙ্খের নিনাদ উঠিছে অম্বরে।
বিংশ শত হিন্দু অসংখ্য যবন।
অতুল বিক্রমে যুঝে সেনাগণ।
রুধির-প্লাবনে বসুধা ভাসিল,
শত শত বীর জীবন ত্যজিল।
রণধীর আজি রণেতে ভীষণ।
হেরি বীর্য্য তার বিস্মিত যবন।
অকস্মাৎ একি ! একি হায় হায় !
রণধীর বীর ভূমিতে লুটায় !
এ কিরে আবার ! পাপিষ্ঠ যবন
অসি লয়ে করে বক্ষঃ বিদারণ !

নিদয় অরিকে! এই কি করিলে?
যবনের হাতে তনয়ে সঁপিলে,
উল্লাসে যবন গরজি উঠিল!
রাজপুত সেনা সমর ত্যজিল!
শোকাকুল সবে নাহি বল আর,
বিষাদে ভূমিতে পড়ে তরবার,
অম্বর সেনানী অশ্বের ভুবনে,
পলাইল আজি পরিহরি রণে!
পশ্চাতে উল্লাসে ছুটিছে যবন,
হ'লো হ'লো হায় অম্বর-পতন!
সহসা চমকি দাঁড়াইল সবে,
অবাক্ অরাতি হেরিছে নীরবে!
চমকিত সবে বিস্ময়ে মগন,
নিস্পন্দ নির্বাক্, চলে না চরণ,
একিরে একিরে কে এল সমরে?
কে জিজ্ঞাসে কারে বচন না সরে।
উজলি দিগন্ত, মাতায়ে পরাণ,
অমেঘ অম্বরে চপলা সমান,
মরি মরি হায় কি রূপ-মাধুরী,
মন্ত্রমুগ্ধ সবে সে মুখ নেহারি,
নবীন যৌবনে তনু ঢল ঢল,
বসন্তের লতা, নিদাঘ-কমল,
কুঞ্চিত অলক সোহাগে আদরে,
ছুটিছে ঢাকিতে ললাটে অধরে।
আধা প্রকাশিত মুখ মনোহর!
আধা লাজ তায়, মরি কি সুন্দর;
ভাঙা মেঘে যেন আধা ঢাকা শশী,
ভাঙা জোছনায় আধা ফোটা নিশি,
বিকচ গোলাপ, আধা কিশলয়,
সলিলের স্রোতে আধা কুবলয়,
রণবেশে ঢাকা তনু মনোহর,
কবচে আবৃত পীন পয়োধর,
উন্নত উরস ঈষৎ কাঁপিছে,
সে কুসুম প্রাণে কতই বাজিছে।

কোমল করেতে ভীম তরবার,
ঝরিছে শোণিত, সহে কি সে ভার?
অধীর হতেছে সমর তুরঙ্গ,
নিবারিছে বালা পরশিয়ে অঙ্গ।
হেরিয়ে মুহূর্ত্ত নীরজ-নয়নে,
সম্বোধিয়ে বালা কহে বীরগণে—
সে মধুর স্বর রজত-নিক্কণ,
মতাইয়ে প্রাণ পরশে গগন।
"ছি ছি বীরগণ! কহ কি কারণ
সমর রঙ্গেতে বিমুখ আজ?
জগত পূজিত, অমর-বিদিত
অম্বর বীরের এই কি কাজ?
রাজপুত হয়ে, যবনের ভয়ে
পলাইলে ছি ছি ছাড়িয়ে রণ,
যবনের করে, সঁপিলে কি করে
প্রিয় তরবার, সাধের ধন?
যবন হাসিবে, অম্বর পড়িবে
অরি পদতলে প্রাণের দায়!
কেমনে সহিবে? কি লয়ে থাকিবে?
লুটাইবে ছি ছি অরির পায়?
জিনিয়ে সমর, লভিয়ে অম্বর,
লইতে যবন আমারে চায়,
তাও কি হেরিবে? তাও কি সহিবে
বীরের হৃদয় এই কি হায়?
নাহি রণধীর, সহ অসি তীর
আছ তো তোমরা সহস্র বীর
এনয় এনয় শোকের সময়,
ধর অসি, মুছ নয়ন নীর।"

সে মধুর বাণী হৃদয়ে পশিল,
বীরের হৃদয় চমকি উঠিল।
সিহরিয়ে সবে ধরে তরবার,
জয় জয় রব উঠিল আবার।
আবার গগনে অসি চমকিল,

হ্রেষারবে পুনঃ তুরঙ্গ ছুটিল,
অরির হৃদয় কাঁপিল এবার,
এরণে বুঝিরে নাহিক নিস্তার।
মন্ত্রমুগ্ধ আজি বিস্মিত যবন।
একি সেনাপতি? এ কেমন রণ।
বীর ইংলণ্ড, কভু কি শুনেছ?
সেনাপতি হেন কভু কি দেখেছ?
দেখ নাই যদি দেখ আঁখি মেলে,
প্রলয় জলদ সৌদামিনী খেলে,
সুকুমার দেহে দেখ শত তীর,
হৃদয় সরোজে দেখরে রুধির,
শারদ শশীর সম প্রফুল্ল আনন,
কুসুম করেতে অসি সঞ্চালন,
যুঝে প্রাণপণে যবনের দল,
সে ঘোর তরঙ্গে অক্ষুব্ধ কমল,
অই দেখ অই অসংখ্য যবন,
সভয়ে বিস্ময়ে করে পলায়ন।
জিনিয়ে সমর, ফিরে সুরবালা,
শোণিতাক্ত বুকে চামেলির মালা।

৪

আঁধার অম্বর করি অস্ত দিনকর,
তিমিরে বিলীন হায় কিরণ প্রখর।
তুমিতো হে দিননাথ! আবার আসিবে;
প্রভাতে বসুধা সুখে আবার হাসিবে,—
যে রবি ভারতে হায় আজি অস্তমিত
জানকি আবার কবে হইবে উদিত?
পলাইল অরিদল, কিন্তু বীরগণ,
হারাইয়া রণজিতে বিষাদে মগন।
নাহিক সমর গীতি, নাহি জয় রব,
বিজয়-নিশান নাই, সকলি নীরব।
নিঃশব্দে শ্মশান ভূমে সমবেত সবে,
নির্বাক্ সেনানী চিতা সাজায় নীরবে।
ধরা-শায়ী সেথা হায়, মুরতি সুন্দর,
দেব রাজ দেহ যেন ধূলায় ধূসর।

সহসা চমকে সবে! উন্মাদিনী প্রায়
সঙ্গে সখী সুরবালা আসিল তথায়।
এখনো সে রণ বেশ, করে দোলে অসি,
শোণিত রঞ্জিত দেহ, ফুল্ল মুখশশী।
চামেলির মালা শোভে উন্নত উরসে,
চাঁচর চিকুর-দাম ধরণী পরশে।
কনকের পারিজাত, হেরি সে মুরতি,
প্রাণ চায় পড়ে পায় করেরে আরতি।
প্রফুল্ল আননে বালা মৃদু মৃদু ভাষে,
বিষাদিত বীরগণে সম্ভাষে উল্লাসে,—
"জিনিয়ে সমর, রক্ষিলে অম্বর,
ত্রিদিবে হাসিছে অমরগণ।
কেন বল তবে, ম্লান আজি সবে
নাহি জয়োল্লাস জিনিয়ে রণ?
কর তালি দাও, জয় গীত গাও
সাজাও চিতায় আনন্দ ভরে,
সাজাও চিতায়! বসন্তের বায়,
মৃদুল মধুর বহিছে ধীরে।
অই তরু কোলে, মৃদু মধু বোলে
কুহরে পাপীয়া মধুর গান।
হাসায়ে অম্বর, পূর্ণ শশধর
হাসিছে, করিছে আকুল প্রাণ।
এ সুখের দিন, কি দুঃখে মলিন,
এ হেন বিষাদ কিসের তরে?
কর তালি দাও, জয় গীত গাও,
সাজাও চিতায় আনন্দ ভরে।
হায় একি দেখি, কেন বল সখি,
কাঁদ কি কারণ সুখের দিনে?
সুখের সময়, আজি পরিণয়,
প্রিয় রণধীর বীরের সনে।
যতনে গেঁথেছি, আদরে রেখেছি
হৃদয়ে ধরিয়ে চামেলি মালা।
আজি কুতূহলে, রণধীর-গলে
দোলাইয়ে মালা জুড়াব জ্বালা।

ঘুচিবে বিষাদ, জননীর সাধ,
পিতার আদেশ পুরাব সখি,
কি বিষাদে বল? আঁখি ছল ছল
গাও প্রেম গীত, মুছলো আঁখি।
প্রেম পুরস্কার, হেম-অলঙ্কার
লও লও সখি প্রণয় সনে।
এ সব হেরিলে, নিকটে রাখিলে
সখী বলি কভু পড়িবে মনে।
হাসিতে হাসিতে, পুলকিত চিতে
দাও দাও সখি, বিদায় তবে।
মম পরিণয়, এ সুখ সময়
ছিছি সখি, তুমি বিষণ্ণ হবে?
শুনলো গগনে, পুলকিত মনে
দেবগণ সবে করিছে গান।
অই সুরলোকে প্রেমের পুলকে,
গাইছে অপ্সরী মাতায়ে প্রাণ।
আকুল হৃদয়, বিলম্ব না সয়,
কর জয়োল্লাস আজি এ দিনে।
কর তালি দাও, জয় গীত গাও
প্রবেশি চিতায় আনন্দ মনে।"

যেহারে সে চন্দ্রানন কাতর নয়নে।
শোকাকুল বীরগণ নিবারে কেমনে?
হাসিতে হাসিতে বালা প্রবেশে চিতায়
কে ধরিবে, কে রাখিবে, কে নিবারে হায়.
বিস্ময়ে, পুলকে, শোকে হায়, বীরদল,
কম্পিত-হৃদয়ে দিল চিতায় অনল।
হুতাশন কোলে সুখে বসি সুরবালা,
অর্পিল প্রিয়ের গলে চামেলির মালা।
চমকি হেরিল সবি বিস্মিত নয়নে,
গম্ভীর নির্ঘোষে চলে বিমান গগনে।
বেষ্টিত সে দিব্যরথ দিগঙ্গনা দলে,
সুধামাখা গীতি সবে গায় কুতূহলে।
প্রণয়-পুলকে হাসে যুগল দম্পতী,
বীর রণধীর-পাশে সুরবালা সতী।
রণধীর কণ্ঠে সখী হেরে সুরবালা,
'চাঁদের গলাতে হায় যেনরে চপলা'
হাসি হাসি সুখে ভাসি, সখী সুরবালা,
দোলায় প্রিয়ের গলে চামেলির মালা।

সমাপ্ত।

কমলিনী।

"And love is loveliest when embalmed in tears."—Scott, "*The Lady of the Lake.*"

"একি সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা"—হেমচন্দ্র।—ইন্দ্রের সুধাপান।"

আমি সতৃষ্ণ নয়নে একটী রমণীর মস্তকের পশ্চাদ্দেশ নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। রঙ্গস্থলে সে রজনীতে অনেক দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এমন কি স্থানাভাবে অনেকের প্রত্যাগমন করিতেও হইয়াছিল। আমার রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। রমণী একদৃষ্টে অভিনয় দেখিতেছিলেন। তিনি একটী বক্সে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি সে বক্স হইতে তৃতীয় বক্সে রহিয়াছি। মুখ ভাল দেখিতে পাইলাম না। একটী স্তম্ভের অন্তরাল হইতে তাঁহার মুখের পশ্চাদ্ভাগ মাত্র দেখিতে

পাইলাম। তিনি রঙ্গভূমির দিকে মুখ করিয়াছিলেন।

যবনিকা পতিত হইল। রমণী যে বক্সে ছিলেন আমি তাহার পার্শ্বস্থ বক্সে বসিলাম। রমণী আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন কিন্তু আমাকে দেখিতে পাইলেন না বোধ হয়।

এতক্ষণে বুঝিলাম আমার সন্দেহ মিথ্যা নহে। যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। উঃ এতক্ষণ আমি চিনিতে পারি নাই কেন?

এ রমণী যে কমলিনী।

আমি নিশ্চল ভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

কমলিনী আমার পরিচিতা। বহুকাল হইতে তাঁহার সহিত আমার আলাপ ছিল। আমি কি তাঁহাকে ভাল বাসিতাম? কমলিনী অত্যন্ত রূপবতী, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ হইবে না। কিন্তু আমার বোধ হয় রমণীগণের গুণের বিষয় আমরা যাহা জানি তাহার জন্য তাঁহাদের অতি অল্প ভালবাসিয়া থাকি। কিন্তু তাঁহাদের অনেক অজ্ঞাত গুণের জন্যই আমরা তাঁহাদের অধিক ভালবাসি। কমলিনী-প্রণয় পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আমি পাঠ করিয়াছি। পাঠক যেমন সহজেই পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া উঠে, আমিও তেমনি সহজেই কমলিনীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। উভয়ের মধ্যে একটু সামান্য মতভেদ হইতে এই বিচ্ছেদ সমুৎপন্ন এবং এই বিচ্ছেদের পর জানিত ইচ্ছা করিয়াই আর কমলিনীর সহিত দেখা করি নাই। তাঁহার বর্ত্তমান মনের ভাব আমি জানি না।

হঠাৎ মনে পড়িল কমলিনীর কপোলপ্রদেশে একটী ক্ষুদ্র তিল ছিল। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই ক্ষুদ্র চিহ্নটী দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তাঁহার মুখমণ্ডল বিষণ্ণ দেখিলাম। তিনি একটী স্তম্ভের উপর নিজ মস্তক রক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। তাহার নয়নদ্বয় জলে পরিপূর্ণ দেখিলাম। সেই বিষণ্ণমূর্ত্তি বড় সুন্দর বোধ হইল। কমলিনীর কি দুঃখ হইয়াছে যে তিনি সে দুঃখ অন্তরে গোপন করিতে অক্ষম হইয়াছেন—বাহ্য লক্ষণেও ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে?

পূর্ব্বস্মৃতির পুনরুদ্রেকে—জানি না কেন, এত দিন পরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস অজ্ঞাতে পরিত্যাগ করিলাম। কমলিনী, কখনও ত তোমার এরূপ মলিনমূর্ত্তি দেখি নাই। আশ্চর্য্য! আমি ভাবিতাম তুমি কখনও বিষণ্ণ হইতে পার না। কমলিনী বিষণ্ণা! কেন? কখনও ত তাঁহার মুখে হাসি ভিন্ন দেখি নাই। কে তোমাকে বিরক্ত করিয়াছে কমলিনী? কি দারুণ দুঃখাগ্নিতে তোমার মন দগ্ধ হইতেছে? তোমার দুঃখ কাহিনী শুনিতে—জানি না কেন, বড় বাসনা হইয়াছে। আমি কি তোমার কোনও উপকার করিতে পারি না? আমি যে তোমার নিকট অনেক বিষয়ের জন্য ঋণী। আমি আবার কমলিনীর মুখপানে চহিলাম। শতদল যেরূপ সূর্য্য কিরণ অনন্যমনে পান করে—ধরণী নিশীথে যেমন নিস্পন্দ ভাবে পাপিয়ার স্বরসুধা পান করে—আমিও সেইরূপ একচিত্তে কমলিনীর বিষণ্ণবদনের অনুপম সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিলাম।

কি আশ্চর্য্য। আমি এই মুখ শশীর প্রতি কতবার চাহিয়াছি, অথচ ইহার শীতল—প্রীতিকর, প্রাণমোহিনী—কৌমুদী-

রাশিকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে পাই নাই। কিন্তু তখন কমলিনীর মুখ প্রফুল্ল ছিল। তাই কি সেরূপ হইয়াছিল? উঃ, অন্তঃকরণের উপর বিষণ্ণ মূর্ত্তির কি প্রফুল্ল মূর্ত্তির অপেক্ষা অধিকতর আধিপত্য? প্রফুল্লতা অপেক্ষা কি বিষাদ অধিকতর মনোহর? আমি এই মূর্ত্তি দেখিবার জন্য চিরজীবন লালায়িত ছিলাম—দেখিতে পাই নাই। এই মূর্ত্তি দেখিবার জন্য সকল কষ্টই বোধ হয় সহ্য করিতে পারিতাম—এখনও পারি—কিন্তু আমি হতভাগ্য তাই আমার অদৃষ্টে সে সুখভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। যখন কমলিনীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হই, যে বিচ্ছেদের পর আর আমি ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখি নাই—তখনও এই মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না বলিয়া একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

কমলিনীর নয়নকমলদ্বয় যেন বিষাদ সলিলে ভাসিতেছে। আমার তাহা দেখিয়া চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল কেন? কমলিনী যে স্তম্ভে নিজ মস্তক রক্ষা করিয়াছিলেন আমিও সেই স্তম্ভে ভর দিয়া বসিয়াছিলাম। কমলিনীর দক্ষিণ হস্তখানি আমি দেখিতে পাইতেছিলাম। কেন তাহা দেখিয়া আমার অন্তর অধীর হইল? আজি কমলিনীকে দেখিয়া, কে বলিবে কেন, আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল? কমলিনীর ঐ হস্ত নিজ হস্তে ধরিয়া কতবার তাঁহাকে বক্ষের দিকে আকর্ষণ করিয়াছি—ঐ হস্ত ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নারজনীতে দুইজনে পুষ্পোদ্যানে কত বিচরণ করিয়াছি—ঐ হস্ত কতবার চুম্বন করিয়াছি—আবার ঐ হস্তে কমলিনী কতবার আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন—আর আজি ঐ হস্ত আমার এত নিকটে রহিয়াও আমার উপস্থিতি জানিতে পারিতেছে না? কমলিনী কেমন করিয়া এই স্তম্ভের এক পার্শ্বে রহিয়াছেন, আমি অপর পার্শ্বে রহিয়াছি, অথচ আমাকে দেখিতেছেন না? কমলিনীর মুখ দেখিলেই বোধ হইত যেন তিনি, সে সময়ে কি দারুণ দুঃখ চিন্তায় মগ্না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কি আমাকে ভুলিয়াছেন? কমলিনীর পার্শ্বস্থ বায়ু আমার আগমনে বিচলিত হইয়া এক সময়ে কমলিনীকে আমার আগমন বার্ত্তা জানাইয়া দিত—আজি আমি কমলিনীর এত নিকটে রহিয়াছি, কমলিনী কিছু মাত্রও জানিতে পারিতেছেন না!!

কমলিনীর গোলাপরক্ত করতলের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। মনে মনে তাহাকে শত চুম্বন করিলাম। অথচ তাহার স্মরণশক্তির অভাবের জন্য যেন তাহাকে কত তিরস্কার করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম যদি পূর্ব্বঘটনা সমস্ত তোমার স্মরণপথে উপস্থিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, করতল, দেখিতাম তুমি আমাকে চিনিতে পারিতে কি না?

কমলিনীর স্থির নিস্পন্দ হস্ত—ম্লান মুখশ্রী, আমি অতিশয় দুঃখের সহিত অবলোকন করিতেছিলাম। তিনি এক সময়ে আমাকে ভাল বাসিতেন, আজি তাঁহার অন্তরের দুঃখ কি আমি তাহা জানিনা! যদি কমলিনী জানিতে পারেন আমি তাঁহার দুঃখের ইতিহাস শুনিতে এত উৎসুক, তাহা হইলেও তিনি কি আমার নিকট তাহা গোপন করিবেন? আমাকে দেখিলে পূর্ব্বে তাঁহার যে চক্ষু অপূর্ব্ব শান্ত জ্যোতিঃতে উজ্জ্বলতর হইত, সেই চক্ষু আজি চিন্তার আসন! কিন্তু আমাকে দেখিয়াও কি আর

তাহা সুখে উচ্ছলিত হইবে না? কমলিনী কি আমাকে একেবারে ভুলিয়াছেন? তাহাও কি সম্ভব হয়? তরণীগমন চিহ্ন নদী যেরূপ মুহূর্ত্তমধ্যে ঢাকিয়া ফেলে—বিহঙ্গমপক্ষ ক্ষুণ্ণ পথ আকাশ যেরূপ নিমেষ মধ্যে বিলুপ্ত করে—রমণী হৃদয়ও কি এক সময়ে প্রিয় এবং গভীরাঙ্কিত নাম সেইরূপ শীঘ্র ভুলিতে পারে?

কতবার মনে করিলাম কমলিনীর সহিত কথা কহি—অন্ততঃ জিজ্ঞাসা করি তিনি কেমন আছেন,—কিন্তু সাহস হইল না। তাঁহার সঙ্গে আরও অন্যান্য লোক ছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার আত্মীয়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই আমার পরিচিত ছিলেন না, তাই আমার তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস হইল না। কি জানি, কাহার মনে কি ভাব কেমন করিয়া জানিব?

এইরূপে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল পরে কমলিনী তাঁহার সঙ্গীগণের সহিত চলিয়া গেলেন। তখনও অভিনয় শেষ হয় নাই। কমলিনীর সঙ্গীগণ বোধ হয় বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। কমলিনী সেইরূপ ম্লানমুখী।

আমি আর অভিনয় দেখিতে পারিলাম না। সে স্থানে থাকা আমার নরক-যন্ত্রণাভোগ বোধ হইতে লাগিল। উঠিলাম। বাটী গিয়া সমস্তরাত্রি ভাবিতে লাগিলাম। নিদ্রা হইল না। রজনীর চিন্তার কিয়দংশ পত্রাকারে লিখিয়া কমলিনীকে প্রেরণ করিলাম:—

"কমল,

আমি তোমাকে পত্র লিখিতেছি দেখিয়াই হয় ত তুমি মনে করিবে যে, আমি আমাদের সেই পুরাতন কাহিনীর কথাই বলিব। যদি তাহা মনে কর তবে তুমি ভ্রান্ত। যদি মনে কর কখনও আমি তোমাকে ভাল বাসিতাম, তাহাও মিথ্যা। আমি তোমার নিকট প্রণয় প্রকাশ করিয়াছি সত্য—আমি তোমার সহিত যতক্ষণ থাকিতাম ততক্ষণ সুখী হইতাম—তুমি নিকটে না থাকিলে আমার কষ্ট হইত—তোমার বিষয় অহোরাত্র চিন্তা করিতাম—নিদ্রাঘোরে তোমার মোহিনীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতাম—তোমার নিমিত্ত শারীরিক, মানসিক সকল প্রকার ক্ষতি সহ্য করিয়াছি তাহাও সত্য, কিন্তু আমি পূর্ব্বে তোমাকে ভাল বাসিতাম না। গত রজনী মাত্র হইতেই আমি তোমাকে ভালবাসি, এই তোমাকে আমি প্রথম ভাল বাসিতেছি। আমার অন্তরে এ ভাবের উদয় কি কারণে হইল তাহাই বলিবার জন্য তোমাকে লিখিতেছি।

"কমল, আমার হৃদয় মন্দির অনেক কক্ষে বিভক্ত, আমার আত্মা, দৃশ্যতঃ, বহিস্থ অথবা চিরমুক্ত আমোদের কক্ষে রহিয়াছে কিন্তু প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে উহা গোপনে বিষাদের কক্ষেই সর্ব্বদা দীনভাবে পড়িয়া থাকে। আমি যে সকল কার্য্য বা দৃশ্য করিয়া বা দেখিয়া সচরাচর তাহাদের প্রশংসা করি—সুখী হই সে সকলের বিষাদ অধিকৃত হৃদয়ের সেই পবিত্র কক্ষের তোরণ পার হইবার ক্ষমতা নাই। যাহারা চির প্রফুল্ল তাহাদের দেখিয়া আমি সুখী হই বটে—তাহাদের সেইরূপ আমোদ প্রিয়তা আমার স্বাভাবিক হউক ইহাও সময়ে সময়ে প্রার্থনা করি বটে—কিন্তু তাহারা আমার হৃদয়ের বিষাদকক্ষে উপনীত হইতে পারে না, সুতরাং আমার আত্মার সহিতও তাহাদের সাক্ষাৎ হয় না। সে কক্ষ নির্জ্জন থাকে, এই জন্যই

আত্মা অত দুঃখী। আমোদের হাসির প্রতিধ্বনি সেই নিস্তব্ধতা সময়ে সময়ে ভেদ করে। আমার আত্মা নির্জ্জন প্রদেশে একাকী থাকিয়া থাকিয়া ক্লান্ত হয়, তখন উহা প্রেমের ভিখারী হয়—আপরাত্মার কাঙ্গালী হয়। কিন্তু সে কিরূপ আত্মা? সামান্য আত্মার ভালবাসা তাহা চাহেনা। তাহার নিজ স্বভাববিশিস্ট আত্মার প্রেম—যে প্রেমের গুণে সেই আত্মা,আমার আত্মার নিবাস ভূমি বিষাদের পবিত্র কক্ষে, যে কক্ষে প্রফুল্লতা কখন উপস্থিত হইতে পারে না, সেই কক্ষের মধ্যে,-প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে পারে—যে প্রেম সেই কক্ষে একবার প্রবিষ্ট হইলে যাবজ্জীবন সেই স্থানেই থাকে—এইরূপ প্রেম প্রাপ্তিই আমার আত্মার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু হৃদয়ের সেই পবিত্র গুপ্ততম কক্ষে আত্মা অনেক দিন পর্য্যন্ত একাকী থাকিতে পারে। পরে আমোদ প্রমোদে একেবারেই বীতরাগ হইয়া, হৃদয়ের বহিস্থ কক্ষের সমুদয় শোভা বিনাশ করিয়া অভ্যন্তরস্থ সেই নির্জ্জন কক্ষে, নীরবতার সহিত—শান্তির সহিত—দীনভাবে অথচ সুখে সময় অতিবাহিত করে।

"কমল, আমার এ সকল কথা বলিবার অভিপ্রায় কি তুমি বুঝিয়াছ? আমাদের পরস্পরের প্রথম সন্দর্শন সুখ কি তোমার মনে পড়ে? প্রথম যে দিন তোমার করপদ্ম আমি চুম্বন করিয়াছিলাম, সে দিন তুমি কত সুখী হইয়াছিলে এখন স্মরণ করিতে পার কি? যখন আমি তোমাকে প্রথম বলিয়াছিলাম যে, আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, সে সময়ে তোমার সেই কৃত্রিম অবিশ্বাস—সন্তোষ অথচ ঔদাস্য প্রকাশ—কি আজি তোমার স্মরণপথে পতিত হয়? উভয়ের দর্শনে উভয়ের হৃদয়ে কিরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত তাহা কি এখন স্মরণ করিয়া তুমি সুখী হও কমল? আমার সহিত একত্র অবস্থান জন্য কত লোকে তোমাকে তিরস্কার করিত, তোমার সঙ্গিনীগণ কত কথা বলিয়া তোমাকে বিদ্রূপ করিত, তুমি আবার সেই সকল কথা ঈষৎ হাস্যের সহিত আমাকে বলিতে তাহা শুনিয়া আমি হাসিতে হাসিতে তোমার কপোলে কত চুম্বন করিতাম, তুমি অহ্লাদে গলিয়া যাইতে,—সে সকল দিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে? তুমি যে যথার্থই আমাকে ভাল বাসিতে সে বিষয়ে আমি অণুমাত্রও সন্দেহ করি না। কারণ তাহা না হইলে তুমি আমার নিমিত্ত এত ক্ষতি কেন স্বীকার করিবে? কিন্তু কমল, আমি যখন তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিতাম তখনই আমার মনে হইত যে আমি যতক্ষণ তোমার নিকটে ছিলাম ততক্ষণ আমার আত্মা তোমার আত্মার সহবাস সুখ সম্ভোগ করে নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতাম যে আমার হৃদয় মন্দিরে কি প্রণয়ের অগম্য কোনও কথা লুকায়িত আছে! আমি তোমার প্রণয়ের অধিকারী হইয়াছিলাম সত্য বটে কিন্তু সেই প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ের প্রিয়তম অনুচর অশ্রু ও নীরবতাকে ত দেখিতে পাই নাই? কমল, আমি তোমাকে পূর্ব্বে ভালবাসিতাম না। তোমার প্রফুল্লতা দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া তোমার বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়াছিলাম। পরে তোমার বিষয় আর ভাবি নাই।

"কিন্তু এক্ষণে (তুমি হয় ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইবে যে, গত রজনীতে তোমা

কর্ত্তৃক অলক্ষিত হইয়াও তোমার নিকট হইতে অদূরে আমি বসিয়াছিলাম)—তোমার নয়নের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই আমি উন্মত্ত হইয়াছি। আমার হৃদয়মন্দিরের সমস্ত কক্ষেই তোমার প্রবেশ অব্যাহত। আমার শরীরের প্রত্যেক শিরা—আমার মনের প্রত্যেক ভাব—তোমারই শাসন অবনতমস্তকে বহন করিবে। গতরজনীতে আমি একঘণ্টা তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছি। তোমার মুখের ভাব সুন্দর রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তোমার মূর্ত্তি বিমন্ন দেখিয়াছি। দূর হইতে তোমার মুখে অদৃষ্টপূর্ব্ব দুঃখ মাধুর্য্য দেখিয়া তোমার নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়াছিলাম। তোমার আমোদপ্রিয়তায় যখন আমি ক্লান্ত হই, তখন তোমার মুখে এইরূপ ভাব দেখিতে অভিলাষ হইয়াছিল—তোমার নয়নে এইরূপ দৃষ্টি দেখিতে অধীর হইয়াছিলাম। তোমার ন্যায় সৌন্দর্য্যের সহিত এইরূপ দৃষ্টির মিশ্রণ পৃথিবীময় খুঁজিয়াছি কিন্তু পাই নাই। এ দৃষ্টি কোমল, স্নেহ ব্যঞ্জক, অনুরাগ উদ্রেকক, অথচ দুঃখ ভাব পূর্ণ। তোমার এই দৃষ্টি দেখিয়াই আমি তোমার হৃদয়ের একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব কক্ষ দেখিতে পাইয়াছি। হৃদয়ের এই ভাব দেখিবার জন্য আমি ব্যগ্র ছিলাম। এ কক্ষ অশ্রু পরিপূর্ণ।

"আহা কেন তুমি পূর্ব্বে এরূপ বিষণ্ণ হও নাই? তোমার হৃদয়ে এই অমূল্য রত্ন গুপ্ত ছিল, সেই হৃদয়ের সহিত তুমি আমাকে ভাল বাসিতে কিন্তু আমি তাহা জানিতে পারি নাই। উঃ জানিতে পারিলে আমি কত সুখী হইতাম! সেই সকল অমূল্য সুখ সময় আমি বৃথা হারাইয়াছি! হায়! দেবতারা পৃথিবীতে অজ্ঞাত বাস করেন, যখন লোকে জানিতে পারে, তখন তাঁহারা অদৃশ্য হন। কি দুঃখের বিষয়, যে রূপ হৃদয় প্রাপ্তি আমার স্বভাবের প্রিয়তম, সুতরাং চির আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য, যেরূপ হৃদয়ের সম্মুখে আমার উন্নত মস্তক অবনত করিয়া তাহার পূজা করা আমার চির অভিপ্রেত, এতদিনে জানিয়াছি যে তোমার সেইরূপ হৃদয়ই আছে কিন্তু তোমার এইরূপ বিষণ্ণ মূর্ত্তি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বলিয়া তোমার আলাপে সুখী হইতে পারি নাই। কমলিনি! তোমার অতুল সৌন্দর্য্য আজি আমার নিকট শত গুণে সুন্দরতর বোধ হইতেছে। জগদীশ্বর এত দিন আমি কমলিনীর হৃদয় জানিতে পারি নাই কেন? মানসিক সৌন্দর্য্যের বিকাশে শারীরিক সৌন্দর্য্য কেমন বিকসিত হইয়াছে! রমণীর দুঃখ মূর্ত্তির কি মোহিনী শক্তি। আমোদ প্রমোদ এবং বিলাস যেখানে বিরাজিত সেখানে ভাল বাসা থাকিতে পারে না, সেখানে পবিত্রতার উপস্থিতি অসম্ভব।

"কিন্তু কমল তোমার দুঃখের কারণ কি তাহা কি আমাকে বলিবে না? আমার দ্বারা কি তোমার কোন উপকার হইবে না? না হইলেও তোমার নয়ন জলের সহিত আমার নয়নের জল মিশ্রিত হইবে, তোমার দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত আমারও দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইবে—সস্নেহে চুম্বন করিয়া তোমার অশ্রু নিরাকৃত করিব। তোমার বিষণ্ণ মূর্ত্তির জন্যই তোমাকে ভাল বাসিয়াছি অথচ তোমার এ বিষাদ অপসৃত করিতে হইতেছে, একি!

"তোমাকে আর কি বলিব? একটী প্রার্থনা করি। যদি অনুমতি কর আমার জীবন তোমাতেই উৎসৃষ্ট করিব। তুমি যে

পূজা পাইবার যোগ্য তোমার সেই পূজার আরম্ভ করিব। হিন্দু যুবক যে রূপ শৈশবের ক্রীড়া পুত্তলিকে পরে দেব দেবী ভাবে পূজা করে, আমিও সেইরূপ আমার শৈশব সহচরীকে এই যৌবনের দেবী ভাবে পূজা করিব। জগদীশ্বর! আমি কি এত দিন জানিতাম যে, কমলিনী এই পূজা পাইবার উপযুক্ত?

"কমলিনি! উন্মত্ত হৃদয়ে কি লিখিলাম জানি না—অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্য ক্ষমা করিও, অথবা পূর্ব্বে যে রূপ হৃদয়ে তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতে আমার নিষেধ করিতে, যদি এখনও তোমার সেই রূপ হৃদয় থাকে তাহা হইলে আর আমার ক্ষমা চাহিতে হইবে না। এই পত্রের উত্তর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আমি অশান্ত মনে রহিলাম। হায়, কেমন করিয়া বলিব কত অশান্ত? তুমি কি বুঝিতেছ না? আমি এত দিন তোমার গুণ দেখিতে পাই নাই। আমার মূর্খতার নিমিত্ত সুখরত্ন পাইযাও পাই নাই! উঃ, কতক্ষণে চক্ষের জলে তোমার বক্ষঃস্থল আর্দ্র করিব? কতক্ষণে আমার এই তাপদগ্ধ হৃদয় তোমার শীতল হৃদয়ে রাখিয়া শান্ত হইব? সে সুখ কি হতভাগার অদৃষ্টে আছে?"

আমি এই পত্র প্রেরণ করিলাম। উত্তর পাইতে যে কয়দিন বিলম্ব হইয়াছিল, সে কয়দিন যে কি কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছি তাহা ভাষায় অবক্তব্য। সর্ব্বদাই মনে হইত যে, যে রত্নকে একবার নিজেই বিদূরিত করিয়াছি হয়ত আর তাহা পাইব না। চারি দিবস পরে একখানি পত্র পাইলাম। যে হস্তাক্ষরে শিরোনামা লিখিত, সে হস্তাক্ষর আমার অপরিচিত। পত্র খানি এই রূপ :—

"মহাশয়, আমার স্ত্রী কমলিনীর ইচ্ছামতে আমি এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি। সে রজনীতে অভিনয়স্থলে আপনি কমলিনীর মুখের ভাবে তাহাকে অসুখী মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বাস্তবিক কোনও গভীর মনের অসুখ নহে। আহারের দোষে কমলিনী কিছু শারীরিক অসুস্থা ছিলেন। সেই কারণে আমরা সমস্ত অভিনয় না দেখিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। কমলিনী আজি অত্যন্ত অসুস্থ। কিন্তু বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিবেন। আপনি এখানে আসিলে আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে পারে। নিবেদন মিতি।

আমি তাঁহার স্ত্রীর সহিত কেন দেখা করিব?

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব।

"———তোমার পরশে
সুচন্দন বৃক্ষ-শোভা বিষ-বৃক্ষ ধরে।"—মাইকেল।

যথা যাবে হাসি', উষা কুসুম কুন্তলা
খুলি' সুকোমল করে দীপ্তির দুয়ার,
দূর করে তমস্বিনী নিশায়,—ভূলোক
জাগিয়া উঠে, আলোক দেখি' পুলকিত :
তেমতি শচীর তুমি হৃদয়ের ধন,
মহাপ্রভো! আইলা ভূতলে, বিনাশিতে
অজ্ঞান তমসা, অন্ধ বঙ্গভূমি হ'তে
শুভক্ষণে! আগমনে তব, দ্বিজশ্রেষ্ঠ!
হাসিলেন বঙ্গমাতা পরম হরষে ;
হইলেন শচীদেবী, মরি! সুভাগিনী
যথা পুত্রবতী রাণী কৌশল্যা সুন্দরী
লভি'রামে অভিরাম! পুলকে পূরিতা।
'ধন্য নবদ্বীপ ধাম!' ধ্বনিল আকাশে!

বহুদিন হ'ল গত, তথাপি তাপস!
স্মরিলে সে পুণ্যদিন, নাচে হে অন্তর!
নাহিক শকতি, কিন্তু দেখা'তে তাহারে
সুচিত্রে মানসে আঁকি' তব ভক্তগণে।
তাই, দ্বিজকুলধন! মাগি হে কাতরে,
তব কাছে এই ভিক্ষা,—'কহ ভারতীরে—
কবিতাকুসুমেশ্বরী, কবিকুল মাতা,
বিশ্বরমা, কহ দেব! তাঁ'রে বিতরিতে
অভাজনে সে অভয় চরণের ছায়া,
যা'র বলে নরঘাতী, মূর্খ রত্নাকর
হইলা কবিতারত্নাকর, কবিগুরু
বাল্মীকি ;—বিমূঢ়, নর দ্বিজ কালিদাস,
ত্যজিয়া অজ্ঞানবাস, কবিতানন্দনে
গাইলা মধুর তানে, বিদ্যাধরবেশে,
মাতা'য়ে জগতজনে মধুরসঙ্গীতে,
রঘুকুল চিত্র লিখি অমর হইলা।
গাইব আমি এ বঙ্গ আসরে, চৈতন্য,
তব কীর্ত্তিগাথা :'- কহ তুমি জননীরে।
তব অনুরোধ পূর্ণ হইবে অচিরে,
উপেন্দ্রের ভক্ত তুমি, উপেন্দ্রাণী স্নেহে
রাখিবেন তব কথা, জানিহে নিশ্চয়।

কৃষ্ণপক্ষ গতে যথা বাড়ে শশিকলা
ক্রমেতে, তেমতি তুমি বাড়িলা, নিমাই!
লভিলা পরম জ্ঞান গুরুউপদেশে।
ছলিতে কি যে'তে নিত্য বিদ্যার নগরে,
সে তব গুরুরে, তুমি জগতের গুরু?
এছল শিখিলে কোথা? বলহে আমারে।
জগন্নাথ মিশ্র—পিতা তব, (দ্বিজকুলে,
তুমি ধন্য মহাভাগ! এবঙ্গ মণ্ডলে)
শিখালেন কিহে তোমা' ছলিতে ব্রাহ্মণে?
তা নহে নিমাই! এ যে পরম পিতার
ছল তব, যাঁ'র ছলে মোহিত এভব!—
সেই বাজকীর তোমা'কহিলা ছলিতে।
কিন্তু, হে নিমাই! তুমি ধাতার আদেশে,
বিতরিলে যেই জ্ঞান, এবিশ্ব মাঝারে,
তা'র সহ তুলনায়, সে শিক্ষা, লভিলে
যাহা তব গুরু হ'তে, অকিঞ্চিৎকর।

রবির কিরণ সহ কে করে তুলনা
ক্ষুদ্র দীপের ?—হিমাদ্রি'সহ কে তুলনে
কহ বল্মীকে ? অনন্তের সহ কীটাণু ?

যৌবনে বৈরাগ্য তব উদিল অন্তরে ।
রাখি' একাকিনী গৃহে পতিব্রতা ধনী
বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয় ! মাতৃ আজ্ঞা ল'য়ে,
গেলে তুমি ত্যজি' প্রিয় নবদ্বীপধাম
সুক্ষণে । যদিও মাতা কান্দিলা শোকেতে
পাগলিনীপ্রায়, দেব ! তোমার বিয়োগে;
যথা কোশলের রাণী শ্রীরাম জননী
কান্দিলা অধীরা, যবে সত্যের পালনে,
সত্যসন্ধ পুত্র তাঁ'র রঘু-চূড়ামণি
গেলেন অরণ্যবাসে, চৌদ্দ বর্ষ তরে !
যদিও নদীয়াবাসী বিজ্ঞ বন্ধুগণ
তব কান্দিলা অধীরে ঘোর বিরহ বিষাদে;
যদিও রমণী তব (ক্ষুন্নকমলিনী
যথা অস্ত গেলে রবি) কাঁদিলা নীরবে,
দীনা, মলিন বদনা, বিয়োগ বেদনা
মরি ! সহিতে না পারি,'—তথাপি সুক্ষণে
দেব ! বাহিরিলা তুমি সংসার হইতে ।
গিরি দেহ ভেদ করি' বাহিরায় যবে
স্রোতস্বতী, শুকায় ভূধর তা'র শোকে ;
কিন্তু সেই নদী, পুনঃ বারি সুধাদানে
জুড়ায় তাপিত জীবে, বাঁচায় উদ্ভিদে ;
সেই নদী বাহি' যত বণিক পশিয়া
দেশ মাঝে, করে বহু বাণিজ্য বিস্তার ;
তট ভাগে শস্যক্ষেত্র হাসে ফল ফুলে ;
হরষে অমরকুল তরুরূপ ধরি'
প্রশংসে কুসুম ফল বরিষণে তা'রে !
তথা তুমি, বাহিরিয়া সংসার হইতে
গিরিরূপ, জুড়াইলে তাপিত জীবনে,
উপদেশবারি দানে তুষিলে জগতে ;
তাই, এবে একবাক্যে যত বুধগণ
তোমার মহিমাগীতি গান অবিরত !

বিজ্ঞবর ! মানসেতে এখনো নেহারি'
সে তব বিরাগী মূর্ত্তি, মাতি ভক্তিরসে ।
কে না চাহে ছাড়িবারে এছার সংসার,
হেরিলে তোমার সেই মধুময় ভাব ?
যবে তোমা' হেরি গুরো ! মনের নয়নে,
কৌপিন কটিতে পরা, বহির্বাসে ঢাকা
সেই বর অঙ্গ, গলে তুলসীর মালা,
স্কন্ধে শ্বেত উত্তরীয়, শ্বেত উপবীত,
(রজতের ধারা মরি ! হেমগিরিদেহে !)
শ্রীকরে করঙ্গ, নেত্রে বহে প্রেমধারা
অবিরত,—বাসনা কি থাকে ছার বাসে ?

সংসার ছাড়িলে তুমি রাখিতে সংসার ।
যেমতি খনির গর্ভে—তিমিরে আবৃত,
জনমি' উজ্জ্বল মণি, উজ্জ্বলে আবার
আকরের গর্ভ, তমঃ নাশি' নিজতেজে ;—
তেমতি হে দীনবন্ধো ! অজ্ঞানজড়িত
বঙ্গমাঝে জন্ম ল'য়ে, তমোহর তুমি,
নাশিলা অজ্ঞান তমঃ নিজ জ্ঞানতেজে ;—
নাশিলা বঙ্গের পুনঃ তামসী যামিনী !
তব দেহপরশনে পাপী কত শত
পাইয়া পাতকে ত্রাণ, হ'য়েছে অমর !

হেন অনুপম প্রেম আছে কি জগতে ?
ভুবনের পাপভারে, তোমার অন্তর
কে'দেছে সতত ;—তব পদ্ম আঁখি হ'তে
বহিয়াছে শান্তিধারা অবিরত ধারে,
যেন সেই গুরুভারে দূরে ফেলিবারে,
আর তার ক্লিষ্ট জনে শান্তি-সুখ দিতে ।
কতজন কত মতে নিন্দিয়াছে তোমা,
পাগল বলিয়া কেহ করেছে হেলন ;
প্রহার করেছে কেহ অজ্ঞানের বশে

শ্রীঅঙ্গে (স্মরিলে এবে কান্দেছে পরাণ !);
কিন্তু অবহেলি তুমি সকল বাধায়,
(বেগবান নদ, যথা লজ্যে অবহেলে
ভূধর শিখর যদি রোধে তা'র গতি,)
সুধাময় উপদেশ দিয়াছ তা'সবে।
সে বিমল কলেবরে যে জন করেছে
প্রহার, তাহারে তুমি ধরে'ছ কোলেতে
যেন দেহ পরশনে রসিতে নীরস
দেহ তার, সুধাময় ভক্তিরস দানে !

যা'করে'ছ, প্রভো ! তুমি মানবের তরে,
আর কিছে পারে কেহ করিতে সেমত?-
পদ্মকরে করঙ্গ যে ধরেছ, সুমতি !
একি মুক্তিভিক্ষা তরে ?—কভু না সম্ভবে।
দাসের মানসে এই হ'য়েছে ধারণা ;
বিশ্বপাতাপাশে বহু উপাসনা করি,
লভিয়াছ তুমি, ওহে নরকুলমণি !
শান্তিসুধা, না'শিবারে ভবব্যাধি যত,
ধন্বন্তরী রূপে ,—রেখেছ করঙ্গে তাহা,
পদ্মযোনি যথা পূর্ব্বে কমণ্ডলুমাঝে
রাখিলা পাবনী দেবী জাহ্নবীর নীরে,
তারিতে সগরবংশ। ভক্ত ভগীরথ,
সূর্য্য কুলমণি, বহুক্লেশে, তপে তুষি,
পিতামহে, লভিলা গঙ্গারে , কিন্তু নর
সকল পাপব্যাধিগ্রস্ত, না যাচিতে সুধা
তব পাশে, কৃপা করি' আপনি যাচিয়া
দিলে সুধা- সে রোগের চরম ঔষধি,—
বিনিময়ে ল'যে শুধু আন্তরিক প্রেম ;—
ধন্য হ'লে নিজগুণে, ভুবন ভিতরে !

মাগে দাস এই ভিক্ষা, অবনত শিরে,
তব পদে,—'দেহ পদাশ্রয় তুমি তা'রে।
তোমার প্রসাদে, গুরো। ভবরোগ হ'তে
একবারে হ'ব মুক্ত, শান্তি সুধাপানে,
এবাসনা মনে মম, দ্বিজকুল নিধি।
তুমি বিনা আর কেবা অধমের তরে
কান্দে, তাই মাগে দাস ও পদ আশ্রয়।

মা ও মেয়ে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরকাদের বাটীর ভূতপূর্ব্ব অধিকারী জনার্দ্দন সরকার রামচরণ ডাক্তারের কিছু টাকা ধারিত। দেনার জন্য ঐ বাটী বিক্রয় হইয়া যায় ; এক্ষণে উহা রামচরণের সম্পত্তি হইয়াছে। একবার ওলাউঠা রোগের বড় প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সময়ে জনার্দ্দন সরকার সেই রোগের হস্তে সপরিবারে কালগ্রাসে পতিত হয়। শেষে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহারা ঘরেই পচিয়া পড়িয়া থাকে। তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার লোকটীও ছিল না। এই ব্যাপারের পর হইতে সরকারদের বাটীতে বড় ভূতের ভয় বলিয়া জনরব উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, রামচরণ ডাক্তার বলিয়াছেন যে, তিনি এক-

দিন হঠাৎ ঐ সরকারদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান যে বৃদ্ধ জনার্দ্দন সরকার ঘরের দাবায় বসিয়া পাটের দড়ি কাটিতেছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র জনার্দ্দন সরকারের ঐ প্রেত মূর্ত্তি অন্তর্ধান হইল। রামচরণ ডাক্তার এ কথা সকলের নিকট বিশেষ মাত্রা চড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ স্থলে সরকার বাটীর ভূতের ব্যাপারে অবিশ্বাস করে কাহার সাধ্য? ফলতঃ সরকারদের বাটীর ভূতের ব্যাপারে বিশ্বাস করে না এমন লোক ত কল্যাণপুরে নাইই, নিকটস্থ দুই পাঁচ খানি গ্রামেও নাই। সরকার বাটীর ভূত যে কেবল রামচরণ ডাক্তারকেই দেখা দিয়া চুপ করিয়া ছিল এমন নহে। হলা খুড়ো নামক একজন বয়ঃজ্যেষ্ঠ কৃষক একদিন দুরদৃষ্ট ক্রমে মাঠ হইতে ফিরিতে রাত্রি করিয়া ফেলিয়াছিল। আহা! গরিব বেচারা পথটা সোজা হইবে মনে করিয়া সাহস ভরে সরকারদের বাটীর পার্শ্ব দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। এখন বলিলে না প্রত্যয় যাইবে, হলা খুড়ো দিব্য চক্ষে দেখিল সরকারদের ঘরের মট্‌কায় একটা ভূত বসিয়া রহিয়াছে! হলাখুড়ো যেই দেখিল ভূত, অমনি ত্রাহি মধুসূদন শব্দে ছুটিতে আরম্ভ করিল। ভূতও অমনি মট্‌কা হইতে এক লম্ফে মাটীতে পড়িল এবং হলাখুড়োর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিল। হলাখুড়োও ছুটে, ভূতও ছুটে—ধরে আর কি? তখন হলাখুড়ো বুদ্ধির কাজ করিয়া অতি দূর হইতে 'রামা দা, রামা দা' বলিয়া পথ পার্শ্বস্থ এক কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণকে ডাকিতে ডাকিতে দৌড়িতে লাগিল। এই ডাকাডাকিতেই ভূতের দৌড় কিছু কমিয়া আসিল। এদিকে রামা দা 'কেরে? হলা নাকি?' বলিয়া যেমন বাহিরে আসিল, অমনি হলাখুড়ো দৌড়িতে দৌড়িতে, হাঁফাইতে হাঁফাইতে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। এখন রামা দা উপবীতধারী ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার তাহার নাম রাম, সুতরাং সেখানে ভূতের দন্তস্ফুট করিবার উপায় নাই। কাজেই ভূতকে ক্ষুণ্ণমনে ফিরিতে হইল। সরকারদের বাটীতে যে কেবল ভূতই থাকে তাহা নহে,—প্রেতিনীও আছে। নবার মা নামে এক জাঁহাবাজ জেলেনী স্বচক্ষে প্রেতিনী দেখিয়াছে—কেবল দেখিয়াছে নয়—তাহার সহিত ঝগড়াও করিয়াছে। নবার মা একদিন শেষরাত্রে রাজার হাটে মাছ লইয়া যাইতেছিল। কেমন তাহার কুগ্রহ সে সেদিন অন্যমনস্ক ভাবে সরকারদের বাটীর পার্শ্বস্থ পথ দিয়াই যাইতেছিল। এখন যেমন সে সরকারদের বাটীর কাছে গিয়াছে, অমনি এক ভয়ানক প্রেতিনী নেকড়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল এবং বিকট নাকিসুরে বলিতে লাগিল, 'মাছ দে, মাছ দে, ঘাড় মট্‌কে দেব—মাছ দে।' নবার মার বড় সাহস। তাহার কোমরে আবার লোহার চাবি ছিল, সে সেই চাবিতে হাত দিয়া বলিল, 'আমার কাছে লোহা আছে। আমার ভয় কি? পথ ছাড়।' প্রেতিনী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবলই বলিতে লাগিল 'মাছ দে।' তখন নবার মা জোর করিয়া বলিল,—'আরে মলো পথ ছাড় বলছি—না হইলে আঁইস বটি দিয়া নাক কাটিয়া দিব।' তবু কি প্রেতিনী পথ ছাড়ে? সে কেবলই বলে,—'ঘাড় মট্‌কে দেব—মাছ দে।' তখন নিরুপায় হইয়া

নবার মা বলিল,—

"ভূত আমার পুত্ত
শাখ্নি আমার ঝি।
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে
করবি আমার কি?"

রাম লক্ষ্মণের নাম যেমন করা অমনি প্রেতিনী কোথায় যে গেল তাহা আর বুঝা গেল না। কিন্তু পাঁচ পা যাইতে না যাইতে আবার প্রেতিনী আসিয়া পথ আগুলিয়া মাছ চাহিতে লাগিল এবং নবার মা আবার ঐ মন্ত্র বলিয়া প্রেতিনী তাড়াইল। এইরূপে দুই ক্রোশ পথ একবার করিয়া প্রেতিনী আইসে, আবার নবার মার মন্ত্রের জোরে পলাইয়া যায়—এইরূপে চলিতে লাগিল। প্রেতিনী ও নবার মা ঝগড়া করিতে করিতে রূপনগরে গিয়া পৌঁছিল, এদিকে ফরসাও হইয়া আসিল। কাজেই প্রেতিনীকে হতাশ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া আসিতে হইল। নবার মার সাহসের জন্য গ্রামস্থ লোক ধন্য ধন্য করে। নবার মা যাহা করিয়াছে তাহার গল্প করিতে হইলেই লোকের গা ডোল হইয়া উঠে। নবার মা বলিয়াছে যে, সে ভাল করিয়া দেখিয়াছে, প্রেতিনীর পা দুখানা একেবারে উল্টা। যাহা হউক এত বলবান প্রমাণ স্বত্বে সরকারদের বাটীর ভূতে লোক কোন্ সাহসে অবিশ্বাস করিবে? ভূতে অবিশ্বাস করা দূরে থাকুক যদি দৈবাৎ কোথাও সরকারদের বাটীর নাম উঠে, অমনি নিকটস্থ লোক বলে,—'রাম রাম বল ভাই—ও কথায় কাজ কি?' রাত্রে দূরে থাকুক দিনমানেও কেহ সরকারদের বাটীর নিকটস্থ হইতে সাহস করে না। ইদানীং যে কেহ কখন নিতান্ত কার্য্যানুরোধে সরকাদের বাটীর কাছ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে সেই বলিয়াছে যে সরকারদের ঘরের মধ্যে মানুষের কোঁতানি শব্দ, অথবা নাকি সুরে ক্রন্দনের শব্দ স্পষ্ট শুনা গিয়াছে। এ নিশ্চয়ই প্রেতিনীর কার্য্য।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। আকাশে মেঘাচ্ছন্ন, চারি দিকে নিতান্ত অন্ধকার, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। দুইটা লোক এইরূপ সময়ে এই নিদারুণ সরকার বাটীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কথা কথা বার্ত্তা কহিতেছে। লোক দুইটীর এক জন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক। তাহারা অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিল। সেই সময় সরকারদের ঘরের ভিতর হইতে নিতান্ত কাতর ভাবে ও ক্ষীণস্বরে শব্দ হইল,—'মাগো।'

শব্দ শুনিয়া পুরুষটী বলিল,—

"এ নিশ্চয়ই মানুষের আওয়াজ।"

স্ত্রীলোকটী বলিল,—

"মানুষই হউক আর ভূতই হউক, আমি ইহার তত্ত্ব না লইয়া ছাড়িব না।"

"বড় শক্ত কথা। তত্ত্ব লইবার উপায় কি?"

স্ত্রীলোকটী উত্তর দিল,—

"শক্ত কেন? ঘরের এদিকে জানালা আছে জান? সেই জানালা দিয়া খোঁজ লইব।"

"জানালা তো আছে, উঠিবে কেমন করিয়া? যে অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না; জানালা কোথায় তাহা তো বুঝা যাইতেছে না।"

"উঠিব? পার্শ্বের বেড়া হইতে দুইখান বাঁশ তুলিয়া আনি দাঁড়াও। তাহা দিয়া উঠা যাইবে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ হইতেছে, সেই আলোকে জায়গা ঠিক করিয়া লইব।"

পুরুষ আর কথা কহিল না। সে বুঝিল তাহার অপেক্ষা এ নারীর উৎসাহ অনেক অধিক। স্ত্রীলোক যাহা বলিয়াছিল সে তাহা করিল। সে অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে দুই খানি বাঁশ সংগ্রহ করিয়া আনিল। তখন পুরুষ আবার বলিল,—

"ইহাতেই বা উঠিবে কি রূপে? চাঁচা বাঁশ—পা দিবে কোথায়?"

স্ত্রীলোক বলিল,—

"তা বটে। তাহারও একটা উপায় করিতেছি।"

এই বলিয়া স্ত্রীলোক আবার প্রস্থান করিল। অনতিবিলম্বে চারি পাঁচখানি কাঠের কচা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বলিল,—

"এই লও, ইহাতে উঠিবার উপায় হইবে।"

এখন ঘরের মধ্য হইতে আবার শব্দ হইল,—

"ভগবান্ আর কত দিন এমন করিয়া যন্ত্রণা সহিব?"

গৃহ মধ্যস্থ বক্তা মানবই হউক, প্রেতাত্মাই হউক তাহার স্বর কাতরতা ও ক্ষীণতায় পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোক গৃহ মধ্যস্থ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"ভয় নাই—তোমার দুঃখের শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা আত্মীয়।"

গৃহমধ্যস্থ লোক অতি কষ্টে বলিল,—

"কি শুনিলাম? তোমরা মানুষ! মানুষে এমনি করিয়া কথা কহে বটে!"

স্ত্রীলোক বলিল,—

"আমরা মানুষই বটে, তোমার অত কষ্ট করিয়া চেঁচাইয়া কথা কহিতে হইবেনা। তোমার কাছে যাইবার চেষ্টা করিতেছি।" তাহার পর পুরুষের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"দেখিতেছ কি? বাঁধ—কাঠ গুলা শীঘ্র বাঁশের সঙ্গে বাঁধ। কথার স্বর শুনিয়া বুঝিতেছ ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোক। রামচরণ, নরাধম তোমার সর্ব্বনাশের আর দেরি নাই। বাঁধ, বাঁধ, শীঘ্র বাঁধ।"

পুরুষ বলিল,—

"বাঁধিব কেমন করিয়া? কি দিয়া বাঁধি?"

স্ত্রীলোক বলিল,—

"তাইত।"

এই বলিয়া পুরুষের স্কন্ধ হইতে তাহার চাদর খানি তুলিয়া লইল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার মাঝ খানে লম্বালম্বি ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই ছিন্ন অংশদ্বয় পুরুষের হস্তে দিয়া বলিল,—

"বাঁধ, বাঁধ—এই দিয়া বাঁধ। আরও দিতেছি।"

তাহার পর স্ত্রীলোক আপনার বস্ত্রের উভয় দিকের পাইড় ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং তাহা পুরুষের হস্তে দিয়া বলিল,—

"কেমন ইহাতে হইবে তো?"

পুরুষ বলিল,—

"যথেষ্ট।"

বাঁশের সহিত কাঠ একত্র করিয়া বাঁধা হইল। তাহার পর উভয়ে মিলিয়া তাহা ধরাধরি করিয়া যথাস্থানে লাগাইল। তাহার পর স্ত্রীলোকটী তাহার উপর দিয়া উঠিয়া জানালার সমীপস্থ হইল। জানালা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক কৌশল করিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল স্ত্রীলোক সেই বাঁশের উপর দাঁড়াইয়া গৃহ মধ্যস্থা স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিল। সে সময়ে সময়ে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জন করিতে লাগিল এবং তা-

তার কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম সহানুভূতি পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্ত্রীলোক বৃদ্ধ অবাঙ্গা কামিনীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। আসিবার সময় সে বলিয়া আসিল,—

"মা, আজি হইতে তিন দিবসের মধ্যে তোমার মুক্তি নিশ্চয় জানিবে।"

তাহার পর স্ত্রীলোক নীচে আসিয়া পুরুষের সাহায্যে বাঁশ কাঠ ইত্যাদি সরাইয়া ফেলিল। সে সমস্ত বিদূরিত হইলে পুরুষ ও স্ত্রীলোকে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য যে এই পুরুষ রাধারমণ এবং এই স্ত্রীলোক কামিনী।

——০:০——

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে বৃহৎ ভবন দ্বারে শরৎকুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল এবং যেখানে দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের শুশ্রূষায় তাহার চৈতন্যের পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সুদূর বিস্তৃত সৌধের অন্তঃপুর মধ্যে একতম প্রকোষ্ঠে শরৎকুমারী বসিয়া আছেন। যে প্রকোষ্ঠে শরৎকুমারী উপবিষ্টা তাহার আয়তন বৃহৎ এবং তাহা সুন্দররূপে সজ্জিত। তাহার জানালা ও দরজার সার্সীর গায়ে নানাবর্ণের নানাপ্রকার সুন্দর ফুল অঙ্কিত। তাহার বারান্দায় নানাপ্রকার দেশী ও বিলাতী ফুল ও পাতার গাছ। ঘরের ভিতর বৃহৎ বৃহৎ তৈলবর্ণে দেশীয় চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত নানাপ্রকার হিন্দু দেব দেবীর চিত্র লম্বিত। গৃহ মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যা। সমাচ্ছাদিত অতি সুন্দর খাট। একটী আলমারিতে কতকগুলি পুস্তক, একখানি টেবিলের উপর নানাবিধ কাগজ কলম ইত্যাদি, এবং কয়েক খানি গদি আঁটা চেয়ার ঘরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। ভিত্তি গাত্রে একটী সুন্দর ঘড়ি অবিশ্রান্তভাবে স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই ঘরের মধ্যে শরৎ বসিয়া আছে।

শরৎ কুমারী সেই মূর্চ্ছার পর হইতেই এই বাটীতেই আছে। কেন, এখানে কেন? এখানে না থাকিয়া শরৎ আর কোথায় যাইবে? রূপনগরের দীননাথের বাটী তাহার একমাত্র আশ্রয় স্থান। কিন্তু সেখানে শরৎ আর যাইবে না, শরতের জন্য তাঁহারা যে জন সমাজে ঘৃণিত হইয়া থাকিবেন, ইহা শরৎ প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিবে না। এই তো প্রধান কথা। তাহার পর গৃহস্বামী দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় জমিদার মহাশয়ের যত্ন, তাঁহার পত্নীর স্নেহ এবং সর্ব্বোপরি দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের অনুরোধ শরৎ ছাড়াই কেমন করিয়া? শরৎ এখানেই থাকিল— তাহাকে থাকিতেই হইল। আগ্রহে ও অনুপায়ে তাহাকে এই স্থানেই থাকিতে হইল। আর শরৎ থাকিল—যে দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়কে তাহার আত্মা স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে শিখিয়াছে, সেই দেবেন্দ্র নারায়ণকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে বলিয়া। এ লোভ—এ আশা, বালিকা কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? বালিকা এখানেই থাকিয়া গেল। এক মাস, দুই মাস, তিন মাস করিতে করিতে ক্রমে আট মাস কাটিয়া গেল।

বালিকা শরতের মূর্চ্ছার পর যখন প্রথমে

জ্ঞানোদয় হইল এবং যখন দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রভৃতি সকলে তাহার এবম্বিধ অবস্থা ও হঠাৎ এ স্থানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বালিকা কোন কথাই প্রচ্ছন্ন করিল না। প্রচ্ছন্ন করিতে সে জানে না সে তাহা করিল না। সমস্ত কথা বলিয়া পিতৃ মাতৃ স্থানীয় দীননাথ ও করুণাময়ীর জন্য কাঁদিতে লাগিল। হেমেন্দ্র নারায়ণ তখনই লোক পাঠাইয়া দীননাথকে শরতের বর্ত্তমান অবস্থা জানাইয়া পাঠাইলেন। সেই দিনই রাত্রে দীননাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি শরতকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত অনুরাগ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু হেমেন্দ্র নারায়ণ কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, অতি সৎপাত্রে বালিকার বিবাহ দিয়া তাহার পর তাহাকে রূপনগরে পাঠাইবেন।

বালিকা বর্ত্তমান অবস্থায় বড় সুখে আছে। দীননাথের সহিত প্রতিদিনই সাক্ষাৎ হয় এবং করুণাময়ীর সহিতও প্রায়ই সাক্ষাৎ ঘটে সুতরাং সে সম্বন্ধে তাহার আর উদ্বেগ নাই। তাহার পর সকল সুখের উপর সুখ—দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়। সেই স্বর্গের দেবতা তাহাকে বড় আদর করেন, বড় স্নেহ করেন, বড় দয়া করেন, বড় অনুগ্রহ করেন। বালিকার হৃদয়ে এ সুখ, এ আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সেই দেবতা তাহার জন্য এত ব্যস্ত! তাহার মনের অপার আনন্দ হেতু দেহও স্ফূর্ত্তিযুক্ত, তাহার লোচন যুগল উৎফুল্ল, তাহার বদন মণ্ডল প্রদীপ্ত, তাহার সর্ব্ব শরীরে লাবণ্য চল চলিত। পিতার মৃত্যুর পর বালিকা এত সুখ কখন জানিতে পারে নাই।

শরৎকুমারী সেই গৃহ মধ্যস্থ একখানি চেয়ারে স্বর্গ কন্যার ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে। তাঁহার পরিধানে সুচিক্কণ শুভ্র বস্ত্র, তাঁহার হস্তে স্বর্ণচূড়, কণ্ঠে সৌবর্ণ চিক, কর্ণে হৈম দুল। যৌবনোন্মুখী বিকসিতাঙ্গী শরৎকুমারীকে সাক্ষাৎ স্বর্গকন্যা বলিয়াই মনে হইতেছে।

শরৎকুমারী নিষ্কর্ম্মা ভাবে বসিয়া নহে। তাঁহার হস্ত, ও মন একটী মকমলের টুপির উপর নানাবর্ণের রেসমি সূতার ফুল তৈয়ার করিতে নিযুক্ত। আজি চারিদিন হইল দেবেন্দ্র নারায়ণ কলিকাতা হইতে একটী মকমলের টুপি আনাইয়াছেন। ঐ টুপিতে রেশমি সূতার নানা প্রকার ফুলকাটা ছিল। টুপিটী দেখিয়া দেবেন্দ্র নারায়ণ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এবং পুনঃ পুনঃ শিল্পীর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। শরৎকুমারী তাহা শুনিয়াছিল। সে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিল্প কার্য্য যুক্ত টুপি তৈয়ার করিবার অভিপ্রায়ে দেবেন্দ্র নারায়ণের অজ্ঞাতসারে তাঁহারই একটী সাদা টুপি লইয়া নানা বর্ণের রেশমী সূতা সংগ্রহ করিয়া দেবেন্দ্র নারায়ণের নাম যুক্ত ফুল আরম্ভ করিয়াছে। কাজ প্রায় অর্দ্ধাধিক সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। শরৎ একান্ত চিত্তে এই কর্ম্মে নিযুক্তা রহিয়াছে।

ধীরে ধীরে দেবেন্দ্র নারায়ণ রায় সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র শরতের চিত্ত টুপি, ফুল, সূতা ইত্যাদির কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। টুপিটীর কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহা তাঁহাকে শিল্পীর পরিচয় না দিয়া দেখাইতে হইবে বলিয়া যে সংকল্প ছিল, তাহাও সে ভুলিয়া গেল। তাহার অসম্পূর্ণ টুপি হাতেই রহিল। সে

আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেবেন্দ্র নারায়ণ তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"দেখি তোমার হাতে কি? বাঃ এ বেশ যে! দেখি দেখি।"

তখন শরৎ বুঝিল যে টুপিটা লুকান' হয় নাই। বলিল,—

"ও কিছু নয়। দিন্; ও দেখিতে হইবে না।"

দেবেন্দ্র নারায়ন বলিলেন,—

"একি তোমার হাতের ফুল? কি চমৎকার! তুমি সূচীকর্ম্মে এত নিপুণা! কলিকাতা হইতে যে টুপি আনাইয়াছি ইহার সঙ্গেতো তাহার তুলনাই হয় না।"

শরৎকুমারী বদন বিনত করিয়া বলিল,—

"আপনাকে দেখাইবার জন্য আমি উহা করি নাই। আপনার উহা দেখিতে হইবে না। আপনি এখানে এখন কেন আসিলেন? হাসিতে হাসিতে দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"আমি আসিয়াছি বলিয়া তুমি রাগ করিয়াছ, আচ্ছা আমি চলিয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু দুই পদ পশ্চাদিকে সরিয়া আসিলেন।

বালিকার চক্ষু জল ভারাকুল হইল। বলিল,—

"আচ্ছা যান।"

তখন দেবেন্দ্র নারায়ন ব্যস্ততা সহকারে শরতের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"তুমি যাইতে বলিলে বটে কিন্তু আমি যাইব না; আমি জোর করিয়া এখানে বসিয়া থাকিব; যদি বড় রাগ করিয়া থাক তবে আমাকে তাড়াইয়া দিতে পার তো তাড়াইয়া দেও।"

এই বলিয়া তিনি একখানি চেয়ার টানিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। শরতও হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন। ভাষা অপূর্ণ ক্ষীণ ও সীমাবদ্ধ। ভাষার সাহায্যে তাঁহাদের সেই পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ, অসীম, ও জ্বলন্ত ভাব সমূহ কখনই ব্যক্ত হইতে পারে না। তাঁহারা উপবেশন করিলেন কিন্তু কথা কহিতে সাহস হইল না! কি জানি কি বলিতে কি বলিব, কি জানি, বলিতে গিয়া যদি মনের প্রকৃত বক্তব্য বলিয়া উঠিতে না পারি, এই বিষম আশঙ্কা। উভয়েই নীরব। বহুক্ষণ পরে দেবেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন,—

"শরৎ, বিশেষ প্রয়োজন হেতু আমাকে কল্য কলিকাতা যাইতে হইবে। আমার চারি দিন কাল বিলম্ব হইবে। এ চারিদিন তুমি আমাকে মনে করিবে কি?"

শরৎ বলিল,—

"মনে করিব কি না জানি না। আপনি কলিকাতায় যাইতে পাইবেন না।"

দেবেন্দ্র নারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তুমি যদি আমাকে মনেই না কর, তবে আমি যাইতে পাইব না কেন?"

শরৎ গম্ভীর ভাবে বলিল,—

"প্রায় একবৎসর আমি এখানে আছি। আপনি ইহার মধ্যে একদিনও আমাকে ফেলিয়া কোথাও যান নাই তো। তবে আজি আমাকে কেন ফেলিয়া যাইবেন। আমি দুঃখিনী, আমি অনাথিনী। আপনি আমাকে সে সকল ভুলাইয়া দিয়াছেন। আমি এখন আপনার কৃপায় পরম সুখী। আপনি আমার সাহস বাড়াইয়াছেন। সেই সাহসবলে আমি বলিতেছি, আপনি যাইতে পাইবেন না।'

শরৎকুমারীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তখন দেবেন্দ্র নারায়ন বলিলেন,—

"না শরৎ, আমি যাইব না। আমার যে প্রয়োজন তাহা পত্রে লিখিয়া দিলেও চলে। জমিদার ও প্রজা ঘটিত যে আইন হইতেছে, তাহারই জন্য এক বৃহৎ সভা হইতেছে। সেই সভায় আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আমি যদি উপস্থিত না হইয়া আমার মতামত পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠাই, তাহা হইলেও বিশেষ হানি হইবে না। আমি তাহাই করিব।"

শরতের বদন মণ্ডল প্রফুল্ল হইল। দেবেন্দ্র নারায়ন বলিলেন,—

"শরৎ, আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

শরৎ বলিল,—

"এত শীঘ্রই যদি যাইবেন, তবে আসিলেন কেন?"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"জানত তুমি পিতাঠাকুর বিষয় কর্ম্মে ইদানীং নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়াছেন। সে সকলই আমাকে করিতে হইতেছে। তুমি সারাদিনই এই ঘরটীতে বসিয়া থাকিবে—শরীর খারাপ হইবে যে, চল মার কাছে যাই।"

শরৎ বলিল,—

"আমি টুপিটা না সারিয়া যাইব না।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

"টুপি অন্য সময়ে করিও। নিরন্তর এক কর্ম্ম করা ভাল নয়। চল মার কাছে যাই।"

শরৎ ও দেবেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

পতিসোহাগিনী।

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি
প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি॥
কুমারসম্ভব, চতুর্থ সর্গ
৩৩ শ্লোক॥

মরি কি সুখের নিশা, নীরব পৃথিবী;
গিরি, নদী, তরু, লতা নীরবে ঘুমায়,
কিবা কোমলতাময় প্রকৃতির ছবি
শান্তির সাগরে ভাসে মন প্রাণ তায়।
অসীম উজ্জ্বল-নীল আকাশ মণ্ডল
শান্তির আবাস-ভূমি, মাথার উপর,
উর্ক্কলিয়া মণি জিনি বিভায় উজ্জ্বল
জ্বলিতেছে ঝক্ ঝক্ তারকা নিকর।
গাত সুষমা হরি　　নিজ কলেবরে ভরি
হাসি হাসি প্রাণ মন তোষে সুধাকর।

চন্দ্রিকা চাঁদের কোলে খেলিছে বিমল,
পরিয়াছে শ্বেতবাস প্রকৃতি সুন্দরী।
হাসিছে অবনীতলে তরুলতা-দল
পাতায় পাতায় শোভে রজত মাধুরী।
পড়িছে বিমল বিভা তটিনীর জলে,

ঝিকি ঝিকি ভাসে যেন হীরকের হার।
বিমল বিভায় মিশি প্রতি দূর্ব্বাদলে
মুকুতার পাঁতি প্রায় শোভিছে নীহার।
স্বামীর সোহাগে ভোর সুখের নাহিক ওর,
মৃদু হাসি গাল-ভরা হেরি চন্দ্রিকার।

হায়রে সহসা কেন উড়িল গগনে,
এ সুখ সময়ে কাল জলধর-জাল।
হায় কেন দেখা দিল ঘোর দরশনে
প্রলয়-মূরতি ভীম কালের করাল।
কোথা গেল তটিনীর হীরকের হার,
স্বভাবের সুখ-হাসি ডুবিল কোথায়?।
ধরিয়াছে ধরাতল ঘন ঘনাকার
নাহিক আগের শোভা লতায় পাতায়।
চাঁদে ঢাকিয়াছে মেঘে, পতির বিরহে বেগে
পলায় চন্দ্রিকা-সতী খোলে না ধরায়।

আবরিত নিশাকর, নীরদ উদয়,
কৌমুদীর অপগমে আঁধার অবনী।
ঘোরতর কালিমায় ঢাকে সমুদয়,
ক্ষণে ক্ষণে শুনি শুধু জীমুতের ধ্বনি।
কোথা ছিল সৌদামিনী—দেখা দিল আসি
খেলেছি মেঘের কোণে আঁখি ঝলসিয়া,
দেখা দিয়ে ক্ষণে পুন মেঘে যায় মিশি,
নাহিক ক্ষমতা হেরি নয়ন ভরিয়া।

নানা খেলা খেলে রঙ্গে, সোহাগে পতির সঙ্গে
প্রকাশিয়া রূপ-ছটা হাসিয়া হাসিয়া।

এ হেন ভঙ্গিমা তব হেরিয়া চপলে
নিরমল সুখোদয় কাহার অন্তরে?
শুধু সুখী সেই জন পথে যেই চলে,
হিয়া তার গুরু গুরু করে তবু ডরে।
নিত্য নহে নব নব নীরদ-উদয়,
কেবল তোমার সুখ বরষা আগমে।
পেয়েছ পতির দেখা কত ভাগ্যোদয়
দূর কর ব্যথা যত আছয়ে মরমে।
প্রিয়পতি-সহবাসে, সুখের সাগরে ভাসে,
ভুলিয়া দুঃখের জ্বালা নারী ধরাধামে।

পতি সুখে থাকে সুখী সতত রমণী,
পতিদুঃখে দুখের সাগরে ভাসে নারী।
পতির আদরে প্রাণে বাঁচে যে কামিনী।
অনাদরে মরু-ভূমি জীবন তাহারি।
পতি সে অতুল নিধি জগতে সতীর
পতি গতি পতি মতি পতি সে ভাবনা,
নিশীথে নীরবে ভাব হেরি প্রকৃতির
ধীরে ধীরে হৃদয়েতে হইল ধারণা,
পতি প্রেম ভিখারিণী, পতি বিনা কাঙ্গালিনী
পতি সহ প্রমোদিনী ভূতলে ললনা।

শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।

খদ্যোৎপুঞ্জ।

স্বপ্নের অদ্ভুত সফলতা যখন পোলাণ্ড-পতি খৃষ্টীয় ১৭২৮ অব্দের জুন মাসে বর্লিনে আসিয়াছিলেন, সেই সময় সুবিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টা লেনকাণ্ট স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তিনি রাজসভায় ধর্ম্মোপদেশ দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। তিনি তৎকার্য্যে যাদৃশ প্রস্তুত থাকা আবশ্যক, তাদৃশ প্রস্তুত ছিলেন না, বলিয়া স্বপ্নকালে আপত্তি করেন। স্বপ্নেই পুনরাদেশ হয় যে, ধর্ম্ম পুস্তকের নিম্নলিখিত অংশ অবলম্বনে তাহাকে উপদেশ দিতে

হইবেঃ—"Let thine house in order, for thou shall die, and not live." ইহার মর্ম্মার্থ,—'তোমার গৃহ ব্যবস্থা ঠিক করিয়া লও, কারণ তোমার মৃত্যু হইবে।' লেনকাণ্ট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত কয়েক জন বন্ধু বান্ধবের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ছিলেন না বটে, তথাপি ইহা তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কপাত করিল এবং তিনি তৎকালে যে এক বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের রচনায় নিযুক্ত ছিলেন, তৎসমাপনে বিশেষ যত্নবান হইলেন। তাহার পর ২৫ সে জুন রবিবারে তিনি রাজ সভায় বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন এবং পর মাসের ৭ই দিবসে হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গত হইলেন। ১।

যুদ্ধ বিশেষের পূর্ব্বে তৈমুর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে এক শ্বেত শ্মশ্রু পরিশোভিত বৃদ্ধ সেখ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তিনি স্বপ্নে তাঁহাকে তৎকালে তাঁহার সমরখণ্ডের ভবনস্থ পীড়িত পুত্র ইখান গীরের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে স্বপ্নদৃষ্ট বৃদ্ধ পুরুষ বলিলেন,—"ঈশ্বরের নিকট যাউক।" তৈমুর যুদ্ধাবসানে গৃহাগত হইয়া দেখিলেন, বস্তুতঃই তাঁহাদের মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রিয়পুত্র ঈশ্বরের সমীপগত হইয়াছে। ২।

ওয়াল্টার টেলর নামক এক ব্যক্তি মার্কুইস্ অব হংটিংগটনের নিকট হইতে একটা প্রাচীন ধর্ম্ম মন্দিরের মাল মসলা ক্রয় করিয়াছিলেন এবং নিয়মত সময় মধ্যে তৎসমস্ত ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবার কথা স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, আমরা হইলে কখনই এরূপ ধর্ম্ম নিকেতন ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। দুই এক দিবসের মধ্যেই টেলর স্বপ্ন দেখিলেন যে পূর্ব্ব দিকের জানালা হইতে ইট পড়িয়া তাহার প্রাণ-বিযুক্ত হইল। টেলর এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত অনেককেই জানাইলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন, তুমি স্বহস্তে বাটী ভাঙ্গিবার কোন সহায়তা করিও না, তাহা হইলেই স্বপ্ন দৃষ্ট বিপদ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না। টেলর এককালে কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন না এমন নহে। দুর্ভাগ্য ক্রমে নাড়াচাড়া ও ঠেলাঠেলির সময়ে পূর্ব্ব দিকের জানালা হইতে এক খণ্ড ইট পড়িয়া তাঁহার মাথা ফাটিয়া গেল ও তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।(৩)

—— o:o ——

রমণীর ভূষণ।—এই পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে রমণীগণের রুচি সম্বন্ধে নানা প্রকার বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। জাপান দেশীয় রমণীগণ আপনাদের দন্ত স্বর্ণ দ্বারা গিল্টি করিয়া থাকেন, মিসীর দ্বারা দন্তকে কৃষ্ণবর্ণ করা বঙ্গদেশে নিতান্ত অপ্রচলিত নহে। মসীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দন্ত গুজরাট সুন্দরীগণ পরম শোভাকর বলিয়া জ্ঞান করেন। উল্কির প্রথা এদেশের রমণীমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। আমেরিকার কোন কোন স্থানের মনোমোহিনিগণ উল্কির নিতান্ত পক্ষপাতিনী। মস্কোভাইট সুন্দরীর বর্ণ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তিনি তাহা নানাবর্ণের চিত্র দ্বারা না ঢাকিলে আপনাকে নিতান্ত কুৎসিতা মনে করিয়া লজ্জিতা হইয়া থাকেন। চীনের মনোরমাগণ অতি ক্ষুদ্র পদই সকল শোভার মূল বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তৎসাধনোদ্দেশ্যে আজন্মকাল কাষ্ঠ ও লৌহ পাদুকা ব্যবহার করিয়া যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে কাতর হন না।

কোন কোন দেশে মস্তক চতুষ্কোণ হওয়া পরম শোভাকর বলিয়া গণ্য; সেই দেশে জননী দুহিতার মস্তক পিঁড়ি দ্বারা পেষণ করিয়া তাহা চতুষ্কোণ করিয়া দেন। বঙ্গ সুন্দরীগণ, ও পারস্য সিমন্তিনীগণ রক্তবর্ণ কেশ নিতান্ত ঘৃণাজনক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তুরস্ক সুন্দরীগণ রক্তবর্ণ কেশ না হওয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করেন। চীন সুন্দরীগণ ক্ষুদ্র চক্ষু বড়ই সুদৃশ্য বলিয়া জানেন, এ দিকে আমাদের দেশের ললনাকুল 'আয়ত,' 'ইন্দীবর সদৃশ,' 'সফরী সদৃশ,' ও 'পটোল চেরা' চক্ষের নিতান্ত অনুরাগিনী। তুরস্ক কামিনীকুল চক্ষু অধিক উজ্জ্বল দেখাইবে বলিয়া তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ ঔষধ বিশেষ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও মুসলমান মহিলামণ্ডলী কজ্জল দ্বারা লোচনরাগ না বাড়াইয়া থাকিতে পারেন না। বঙ্গদেশীয় হিন্দু *সিমন্তিনীগণ* অলক্তে চরণ ও নখররঞ্জিত করিতে বড়ই ভাল বাসেন এবং মুসলমান বিবিগণ হস্ত ও চরণ রঞ্জিত করিবার অভিপ্রায়ে মেদীপত্রের সর্ব্বনাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আজি কালি বঙ্গদেশে নোলক ত্বরিত গতিতে নথকে বিদূরিত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে বটে, কিন্তু ভারতের অন্যান্য অনেক স্থানেই যোষিদ্বর্গ চক্রাকার নথভারে নাসিকাকে নিপীড়িত না করিয়া কোন ক্রমেই পরিতৃপ্ত হন না। পেক ও অন্যান্য অনেক রাজ্যে নথ ধারণ প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে স্বর্ণ বা রজতময় প্রজাপতি, চিল, চিরুণ, বিবিধ প্রকার ফুল মস্তকের ভূষণ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, চীন সুন্দরীগণ মস্তকোপরে একটী পক্ষী মূর্ত্তি বহন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। সুন্দরীর সম্পত্তি অনুসারে ঐ পক্ষী তাম্র বা স্বর্ণ দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। তাহার পক্ষদ্বয় উন্মুক্ত থাকিয়া ললাটের প্রান্তদ্বয় ঢাকিয়া রাখে এবং তাহার পুচ্ছ পশ্চাদ্ভাগে বিস্তৃত হইয়া থাকে; আর তাহার চঞ্চুপুট সুন্দরীর নাসিকার উপরে আচ্ছাদন স্বরূপে অবস্থিতি করে। এই পক্ষী এরূপ সুকৌশলে মস্তকোপরে সমাবিষ্ট থাকে যে সুন্দরী কিঞ্চিন্মাত্রও মস্তকান্দোলন করিলে ঐ পক্ষী আন্দোলিত হইতে থাকে। আফরিকা সন্নিহিত বিশ্বাও নামক দ্বীপ নিবাসিনীগণ আপনাদের দেহে নানাপ্রকার সর্পাকৃতি চিত্র করেন। তাঁহাদের ঘনকৃষ্ণ বর্ণ ঐ সকল চিত্র সমন্বিত হইয়া অবিকল ফুলকাটা কাল সাটিনের ন্যায় দেখাইতে থাকে। নাসিকার ন্যায় কর্ণকে নিপীড়িত করিবার প্রথা পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। কোন কোন জাতির মধ্যে কর্ণে সুন্দর বিস্তৃত শৃঙ্খল ব্যবহার করাও রীতি আছে। আমেরিকার কোন কোন স্থানে কর্ণ ভূষার উৎপাতে কর্ণের নিম্নভাগ ক্রমশঃ লম্বিত হইয়া স্কন্ধে আসিয়া সংলগ্ন হয় এবং তাহা যেন পক্ষীর পাখার ন্যায় দেখায়।

—:—

নদী নিম্নবাহী সেতু।—বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডের টেম্‌স্ নদীর নিম্নদেশ দিয়া যেরূপ সুড়ঙ্গ করা হইয়াছে, পুরাকালেও এরূপ ছিল—ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। রাজ্ঞী সেমিরামিস্ ইউফ্রেটিস্ নদীর উভয় তীরে দুইটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ডাইওডোরস্ (Diodorus) বলেন ঐ

প্রাসাদ দ্বয়ের একটী হইতে অপরটীতে আসিবার নিমিত্ত নদীর নিম্নদেশ দিয়া অতি সুন্দর পথ ছিল। ঐ পথ ৩০০ ষ্টাডিয়া (Stadia প্রায় ৯০০ হাত) দীর্ঘ এবং ১৯ ষ্টাডিয়া বিস্তৃত।

—:—

বনবালা ম্যাডামইসিল্ লেব্লাঙ্ক (Madamoiselle Leblanc)।—এক দিন অপরাহ্ন কালে সঁবর্গি নামক ফ্রান্স দেশের উত্তর পূর্ব্বস্থিত গ্রামের অধিবাসী সমূহ তাহাদের গ্রাম্য উৎসব বিশেষে মত্ত ছিল, এমন সময় কে জানে কোথা হইতে একটা মূর্ত্তি নরাকারধারী জীবমূর্ত্তির আবির্ভাব হেতু তাহাদের সকল আমোদের বিঘ্ন ঘটিয়া গেল। এই জীবের মস্তকের কেশ সুদীর্ঘ এবং স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার দেহ কৃষ্ণ বর্ণ। সে উলঙ্গ এবং তাহার হস্তে এক প্রকাণ্ড কাষ্ঠ খণ্ড ছিল। গ্রামবাসী জনগণ তাহাকে প্রেত মনে করিয়া তাহার নিকটস্থ হইতে সাহসী হইল না। তাহাদের নিকটে একটা বৃহৎকুকুর ছিল, ঐ কুকুরটা বেগে ঐ বিস্ময় জনক মূর্ত্তিকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। কিন্তু সমাগত জীব অনুমাত্র ভীত হইল না। কুকুর তাহার কণ্ঠদেশ গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে যেমন চেষ্টা করিল সে অমনি হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা এমনি এক প্রচণ্ড আঘাত করিল যে সেই আঘাতে কুকুর ধরাশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পর এই অদ্ভুত আগন্তুক সম্মুখস্থ প্রান্তর পার হইয়া সন্নিহিত অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং কাষ্ঠমার্জ্জারের ন্যায় অবলীলা ক্রমে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে প্রস্থান করিল। ভয়চকিত কৃষকগণ অতঃপর তাহার অনুসরণ করিতে সাহস করিল না। কয়েক দিন এই অত্যাশ্চর্য্য জীবের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ইত্যবসরে সেই প্রদেশের জমিদার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই অরণ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনই ফল হইল না। সপ্তাহ পরে একদিন রাত্রিকালে জমিদারের এক ভৃত্য ভবন সংলগ্ন উদ্যান মধ্যে বৃক্ষ বিশেষের উপর এক আশ্চর্য্য জীব দর্শন করিল। সাহসী ভৃত্য উক্ত জীবের অলক্ষিত ভাবে ধীরে ধীরে ঐ বৃক্ষ সন্নিধানে আগমন করিল, কিন্তু সে বৃক্ষারূঢ় হইবার পূর্ব্বেই ঐ জীব বৃক্ষান্তরে লাফাইয়া গেল এবং সে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য এক বৃক্ষে, এইরূপে লাফাইতে লাফাইতে উদ্যান অতিক্রম করিয়া নিকটস্থ এক অত্যুচ্চ বৃক্ষে গিয়া আরোহণ করিল। ভৃত্য স্বীয় প্রভুকে জাগরিত করিল এবং তিনি উঠিয়া অধীনস্থ সমস্ত লোক জনকে উঠাইলেন ও নিকটস্থ গ্রাম হইতে কয়েক জন কৃষককে ডাকিতে আদেশ করিলেন। সকলে সমবেত হইয়া সেই বৃক্ষ ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং কোন মতেই ঐ জীবকে পলাইতে দিবে না সংকল্প করিল। বৃক্ষস্থিত জীব যত্ন সহকারে আপনার দেহ পত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

গ্রামবাসী কৃষকেরা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে এ সেই কুকুরহন্তা দৈত্য। জমিদার বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিয়া স্থির করিলেন যে, ইহা নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি। তিনি লোকদিগকে অভয় দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তোমরা ভীত হইও না। এ কোন উন্মাদিনী কামিনী—কোন

কৌশলে অবরোধ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি এবং পরদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লোক সকল গাছের চারিদিকে পাহারা দিয়া থাকিল। অবশেষে জমিদার পত্নী পরামর্শ করিলেন যে, ঐ বৃক্ষের নিকটে এক গামলা জল রাখিয়া লোকজন সরিয়া যাউক। যদি ঐ উন্মাদিনী তৃষ্ণা হেতু লোকালয়ে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে জল দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিতে পারে। তাহাই করা হইল। অনেকক্ষণ পরে বৃক্ষস্থিতা বিকট স্ত্রীলোক নিতান্ত সন্দিগ্ধভাবে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল, এবং অশ্বাদি পশু মুখনত করিয়া যেরূপ জল পান করে সেইরূপে সেই পাত্রস্থিত জলপান করিল। তাহার পর লোকজন সমবেত হইয়া তাহাকে অনেক কষ্টে ধরিয়া ফেলিল। তাহার হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সমূহে বড় বড় নখ। সেই সকল নখ দ্বারা সে তাহার স্বাধীনতা বিলোপকারীগণের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। অবশেষে সে অগত্যা ধৃত হইয়া জমিদার ভবনে আনীত হইল।

তাহাকে ধরিয়া ভবনস্থ রন্ধন শালায় আনিবামাত্র সে সজোরে রক্ষকদিগের হস্ত স্খলন করিয়া পাচিকা যে পক্ষী বিশেষ রন্ধন করিবার আয়োজন করিতেছিল তাহাই গ্রহণ করিল এবং মহানন্দে সেই আমমাংস প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিল। তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল সে অনেকক্ষণ অনাহারে ছিল। এই রাক্ষসী আহার সমাপ্ত হইলে সে অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইল। দেখিয়া বোধ হইল এই বনবালার বয়স ত্রয়োদশ বর্ষের অধিক নহে। তাহার কৃষ্ণকায় কেবল মলিনতা, স্নানাভাব এবং সূর্য্যোত্তাপ প্রভৃতির ফল। সে কোন কথাই জানে না; কেবল থাকিয়া থাকিয়া এক একটা বিকট ও কর্কশ শব্দ উচ্চারণ করে মাত্র।

সমস্ত দিন সে পলায়ন করিবার নিমিত্ত বারম্বার চেষ্টা করিল। রাত্রি আসিলে তাহাকে পুনরায় আহার্য্য দেওয়া হইল, সে তাহা স্পর্শও করিল না; সম্ভবতঃ পাক করা খাদ্য তাহার রুচি সঙ্গত হইল না। তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইবার চেষ্টা করা হইল; সে কোন ক্রমেই তাহা করিল না। কোন প্রকার বস্ত্র পরাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করা হইল, সে তাহাতেও স্বীকৃত হইল না।

জমিদার ও তাঁহার পত্নীর নিরন্তর যত্নে বস্ত্রাদি ব্যবহার করা ও মানুষের ন্যায় রাঁধা খাদ্য ভক্ষণ করা এই বনবালার অভ্যাস হইয়া আসিল এবং সে বর্ত্তমান অবস্থায় প্রথমে যেরূপ বিরক্ত ছিল, ক্রমে সে বিরক্তি অনেক কমিয়া গেল। তাহাকে একাকিনী ভবন সন্নিহিত উদ্যানে বেড়াইতে দিলেও সে আর পলাইতে চেষ্টা করিত না। কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে বলিয়া বোধ হইল, এবং স্থির হইল খোলা মাঠে সময়ে সময়ে না বেড়াইলে তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িবে। একদিন অনেক লোক সঙ্গে লইয়া জমিদার এই বনবালাকে লইয়া মাঠে বাহির হইলেন। মাঠে আসিবামাত্র বালিকা মহানন্দে লাফাইতে লাফাইতে এরূপ ছুটিতে লাগিল যে, কেহই তাহার সঙ্গে ছুটিতে পারিল না। জমিদার ঘোড়ায় চড়িয়া ছিলেন; তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া তাহাকে একবারও নয়নান্তরাল হইতে দিলেন না। অবশেষে সম্মুখে এক প্রকাণ্ড জলাশয় দেখিয়া বনবালা তা-

জলে ঝাঁপ দিল। জমিদার মহাশয় মনে করিলেন হয়ত আত্মহত্যা দ্বারা আমাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য বনবালা জলে ঝাঁপ দিল। তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন কিন্তু নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন বালিকা জলের উপর অতি সুন্দররূপে সন্তরণ দিতেছে। হঠাৎ সে সন্তরণ দিতে দিতে জলে ডুবিয়া গেল, বহুক্ষণ হইয়া গেল, তথাপি উঠিল না, তাঁহার ভয় বড়ই বর্দ্ধিত হইল। আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং জলে নামিয়া তাহার সন্ধান করা আবশ্যক মনে করিয়া তিনি তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময় জলোপরি আবার তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল। সে তটাভিমুখে যখন আসিতে লাগিল, তখন তাহার মুখে একটা শ্বেত পদার্থ বিশেষ লক্ষিত হইল। নিকটস্থ হইলে দেখা গেল, বনবালার মুখে একটা মৎস্য। সে সেই মৎস্য তীরে উঠিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। তাহার পর নির্ব্বিবাদে সঙ্গীগণ সহ গৃহে চলিয়া আসিল।

সে সমস্ত বন্য জন্তুর স্বর অবিকল অনুকরণ করিতে পারিত কিন্তু তাহার মনুষ্যের ভাষা শিক্ষা করিতে বহুসময় অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমশঃ বুঝিতে পারা গেল যে, তাহাকে পাগলিনী বলিয়া প্রথমে যে সন্দেহ করা হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অমূলক। নিশ্চয়ই সে কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া অতি শৈশবাবস্থা হইতে জনহীন অরণ্য মধ্যেই বাস করিতেছে।

অনেক কষ্টে ও অনেক যত্নে সে কথা কহিতে শিখিল। যতই সে ভাল করিয়া ভাষার মর্ম্ম বুঝিতে লাগিল ততই তাহার আরণ্য স্বভাব ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে লাগিল এবং নব নব চিন্তা ও কল্পনার প্রাবল্যে সে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনেক ভুলিয়া গেল। তাহার অসম্বন্ধ বাক্যাবলীর মধ্য হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে

বন ভিন্ন আর কোন বৃত্তান্ত তাহার মনে নাই। তাঁহার পিতা মাতার কথা সে জানে না। বনে তাহারই সমবয়স্ক এক সঙ্গিনী ছিল, সম্ভবতঃ ঐ সঙ্গিনী তাহার ভগিনী। তাহারা সমুদ্র নিকটবর্ত্তী বনে বাস করিত। তথায় জীব জন্তু মারিয়া আহার করিত। সে রক্ত, বিশেষতঃ খরার রক্তপান করিতে বড় ভাল বাসিত। দৈবাৎ খরা ধরিতে পারিলে সে স্বীয় সুদীর্ঘ নখর দ্বারা তাহার একটা শিরা ভেদ করিয়া সেই শিরায় মুখ দিয়া সমস্ত রক্ত চুষিয়া খাইত এবং অবশেষে দেহটা ফেলিয়া দিত। এই স্বভাব তাহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল।

তাহার সঙ্গিনীর মৃত্যু বিবরণ ভিন্ন আর কোন কথা তাহার বড় মনে ছিল না। একদিন তাহারা উভয়ে একটা জলাশয়ে সাঁতার দিতেছিল এমন সময়ে বন্দুকের আওয়াজ হইল এবং তাহাদের নিকট দিয়া গুলি চলিয়া গেল। তাহারা ভয়ে জলে ডুব দিল এবং অনেক ক্ষণ জলের ভিতর সাঁতার দিয়া একটা বন পার্শ্বে আসিয়া প্রবেশ করিল। সেই বনের ভিতর একটা খাদ্য সামগ্রী লইয়া উভয়ে বিবাদ বাধিল বনবালা এক কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা তাহাকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। সেই আঘাতে সে রক্তাবর্ণ হইয়া ধরাশায়ী হইল। বনবালা বোধ হয় কিছু কিছু ঔষধ জানিত। সে ঔষধ আনিতে গমন করিল, কিন্তু আসিয়া তাহাকে আর দেখিতে

পাইল না। সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রাদিতে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া থাকিবে। তাহার কয়েকদিন পরে তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া সে জল খাইতে বাহির হইয়াছিল, সেই সময়ে সে গ্রাম্য কৃষক মণ্ডলীর চক্ষে পড়িয়াছিল। তাহার পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

অনতিকাল মধ্যে এই বনবালার বৃত্তান্ত সমস্ত ফ্রান্সে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নানা দিগ্দেশ হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত সমাগত হইতে লাগিলেন। তাহাকে আপন আবাসে লইয়া গিয়া রাজপদস্থ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব কৌতূহল চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। এই সময় ম্যাডামইসিল-লেব্লাঙ্ক বলিয়া তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করা হইল।

তাহার বন্য স্বভাবের কোন কোন ভাব চিরকালই ছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপে নিম্নে দুইটী বিবরণ সংগৃহীত হইল। একদা এক পরমাসুন্দরী কামিনী তাহাকে দেখিবার জন্য স্বীয় আবাসে লইয়া আইসেন। যখন লেব্লাঙ্ক তাঁহার গৃহাগত হইল তখন তিনি আহার করিতেছিলেন। তাহাকে সেই স্থানেই লইয়া যাওয়া হইল। সে সেই সুন্দরীর দেহের পূর্ণতা ও শরীরের উজ্জ্বলতা দেখিয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সুন্দরী মনে করিলেন, সে বুঝি তাঁহার খাদ্যের অংশ প্রার্থনা করিতেছে। তিনি তাহাই দিতে অগ্রসর হইলে লেব্লাঙ্ক বলিল,—'না না—উহা চাহি না, তোমাকে চাহি।' কথা সমাপ্তির সঙ্গে সে যেরূপ ভাব করিল তাহাতে তাহার রক্ষক তাহাকে সজোরে স্থানান্তরিত না করিলে সে নিশ্চয়ই সুন্দরীর শোণিত পান না করিয়া ক্ষান্ত হইত না।' আর একদিন পোলাণ্ডের রাজ্ঞী তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে একপুরুষ লেব্লাঙ্কের সহিত কুৎসিৎ পরিহাস করে। লেব্লাঙ্ক এইরূপ ভাবে সেই ব্যক্তির কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, সমবেত দর্শকবৃন্দ সাহায্য না করিলে নিশ্চয়ই সে দিন তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি বাধিত।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই বনবালা পুরুষ মানুষকে বড় ঘৃণা করিত। তাহার এরূপ প্রবৃত্তির কারণ কি, তাহা স্থির হয় নাই।

প্যারীস নগরে লেব্লাঙ্কের জন্য চাঁদা হয়। সেই সংগৃহীত অর্থে উপযুক্ত রক্ষকাদি রাখিয়া দিয়া লেব্লাঙ্ককে তাহার মরণ কাল পর্য্যন্ত প্যারীসে রাখা হইয়াছিল। তাহার জীবনের শেষ ভাগে তাহার শরীরের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া উঠে। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করার পর ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্যারীস্ নগরে লেব্লাঙ্কের মৃত্যু হয়। তখন তাহার বয়স অনুমান ৬৩ বৎসর হইবে।

বিদ্যুল্লতা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যথা সময়ে বিদ্যুল্লতার পিতা কাশিনাথ বাটী আসিয়াছেন। বিদ্যুল্লতা পিতার প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি সুশৃঙ্খল রূপে যথাস্থানে রাখিয়াছিলেন, কাশিনাথ দেখিয়াই সন্দেহ করিলেন বিদ্যুল্লতা আসিয়াছেন। হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিদু আসিয়াছে বুঝি?" কাশিনাথের স্ত্রী নিকটে ছিলেন, বলিলেন, "হাঁ আসিয়াছে।" কাশিনাথ ভাবিলেন, "আমি বিদুর পত্রের উত্তর দিই নাই বলিয়াই বা আসিয়া থাকিবেন," তাহার পর কহিলেন। "কই, বিদু? কোথা?" বিদ্যুল্লতা আহার্য্য আনিয়া পিতার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

স্নেহস্পদা দুহিতা আসিয়া সম্মুখে প্রণত হইলেও হয়ত সময়ে সময়ে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিয়া যাইতে হয়। তা নাহইলে কাশীনাথ বিদ্যুল্লতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন না কেন?

পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া, বিদ্যুল্লতা যে অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; হেমলতার বিবাহ সম্বন্ধে কোন না কোন কথা কহিতে আসিয়াছেন, কাশিনাথ বাটী আসা পর্য্যন্ত ইহাই ভাবিতে ছিলেন; বিদ্যুল্লতাকে দেখিবা মাত্র, আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিয়া গিয়া, বলিয়া উঠিলেন, "মা তুমি বৃথা চেষ্টা পাইয়াছিলে, মহেশের পুত্রের সহিত হেমার বিবাহ ঘটিবে কেন? বিশেষতঃ মহেশ আমার সহিত অত্যন্ত অসৎ ব্যবহার করিয়াছে" বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বিবৃত করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আমি ত্রিবেণীতে পাত্র স্থির করিয়াছি।"

বিদ্যুল্লতা বলিলেন "কেন বাবা, সে সম্বন্ধ ঘটিবে না? মহেশ কাকার প্রবৃত্তি খুব ভাল নয় বটে, কিন্তু শশিঠাকুরপো অত্যন্ত সৎ ছেলে, তারই সঙ্গে হেমার বিবাহ দিতে হইবে।"

কাশি। "তুমি যেমন মা। অত টাকা দেওয়া কি আমাদের সাধ্য?"

বিদ্যুল্লতা। "টাকাত দিতে হইবে না; আমি খুড়ীমাকে বলে কয়ে ঠিক্ করেছি, সুধু খানকত গহনা দিতে হবে, তা-তা—আমি দেব—"

কাশি। "তুমি দেবে সে কি মা, তুমি কোথায় পাবে? তোমার কি মা সে অবস্থা?"

বিদ্যুল্লতা। "কেন বাবা, আমার কি অবস্থা এতই মন্দ যে হেমাকে দুখানা গহনা দিতে পারব না, আমি দিতে পারব।"

কাশি। "আমি সে অবস্থার কথা বলিতেছিনা,—বলি আজ যদি আমার নরেন্দ্র বেঁচে থাকিত। কাশিনাথের স্বর ভঙ্গ হইয়া আসিল।"

বিদ্যু। "আমি দেব বাবা—"

কাশি। "তুমি কাহার ধন দেবে মা?"

বিদ্যু। "কেনবাবা, আমার ত অনেক গহনা আছে, সে গুলাতে আমার কি কাজ?"

কাশি। "লোকে বলিবে কি মা?"

বিদ্যু। "লোকে জানিবে কেন? আর জানিলেই বা তাহারা কি বলিবে? যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারা ভাই ভগ্নির শুভকার্য্যে দু একখানা অলঙ্কার দিয়া থাকে?"

কাশি। "মা, তোমার কিছু দিয়া কাজ নাই, তাহাতে আমায় ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে?"

বিদ্যুল্লতা এই কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যাহাতে শীঘ্র শুনিতে পান তাহার জন্য আগ্রহান্বিতা ছিলেন, কেন না তাহা হইলেই আপনার কথা বলিয়া পিতার হৃদয় দ্রবীভূত করিতে পারিবেন। অতি কাতর ভাবে বলিলেন, "বাবা, আমি কি তবে পতিত হইয়াছি?"

কাশি। "বালাই, মা, তুমি ধর্ম্মে পতিত হইবে কেন? তুমি বুঝিতে পারনা, তোমার সহিত, তোমাকে যে অঙ্গাভরণ দিয়াছিলাম তাহা সমুদয় দান করিয়াছি, দত্ত দ্রব্য পুনঃগ্রহণে মহা পাতক।"

বিদ্যু। "আমি ত আপনাকে কিছুই দিতে চাই না, আমি হেমাকে দিব, আপনার আপত্তি কেন? না বাবা আপনি আর কোন কথা কহিবেন না, আমি হেমার বিবাহ দিব, আপনি হেমাকে দান করিবেন, ঠাকুর পো আসিয়া আর যাহা করিতে হয় করিবেন; এ কার্য্যে তাঁহার দাঁড়ানতেও যদি আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হন, তিনিও আসিবেন না, আমিই সমুদয় করিব।"

কাশিনাথ স্তম্ভিত হইলেন, নিরুত্তর থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন—আর কি বলিয়া বিদ্যুল্লতাকে সাহায্য দানে ক্ষান্ত করিতে পারেন। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই পাইলেন না, তখন নিরাশ হইয়া বলিলেন, "তা মা তুমিই হেমার বিবাহ দাও।"

বিদ্যুল্লতার প্রফুল্লতা দেখে কে? এতক্ষণ বিষাদে, ভাবনায়, অভিমানে যে মুখখানি মলিন, বিশুষ্ক, লাবণ্যহীন ছিল, পিতার আদেশ প্রাপ্তে আশা সঞ্চয়ে সেই বদনমণ্ডলে প্রফুল্লতার জ্যোতি একবারে বিকাশ পাইল, যে নয়নদ্বয় কেবল অশ্রু বর্ষণে জ্যোতিশূন্য হইয়াছিল এখন তাহা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মুখে, মুখের প্রকৃত লাবণ্য আসিয়া খেলিতে লাগিল; তাঁহার মুখের ঈদৃশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বোধ হইল, যেন রজনীতে বিষাদগ্রস্থ নলিনী বাত্যাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া, প্রভাতে দিনমণি দর্শনে পুনরায় সজীব, সতেজ ও প্রফুল্ল হইয়া বিকশিত হইয়াছে। বিদ্যুল্লতা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিকূল বাত্যাঘাতে বেগময়ী স্রোতস্বতী যেরূপ চঞ্চল হইয়া উঠে, ঘৃতাহুতি পাইলে হুতাশন যেমন অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, ঘোরা অমানিশি মেঘাচ্ছন্ন হইলে যেমন আরও ভীষণ মুর্ত্তি ধারণ করে, যাহাদিগের পবিত্র সহবাসে গিরিশচন্দ্র আপনার চিত্ত বিকারের উপশমের জন্য মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগের বাহ্যিক অমায়িকতা ও ধর্ম্ম নিষ্ঠা, ও আন্তরিক কুৎসিত ভাব দেখিয়া তাহার বিচলিত চিত্তও তদ্রূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল, বিদ্যুল্লতার বিরহ হুতাশন একবারে জ্বলিয়া উঠিল, এবং মোহতিমির আরও গাঢ়তর অন্ধকারময় হইল।

স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাতে অনুকূল বায়ু সহায় হইলে ভাসমান বস্তু আরও বেগে ছুটিতে থাকে; গিরিশের চিত্ত কুপ্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, সুহৃদগণের পাপাচার দর্শনে স্বীয় দুষ্টাভিলাষ পরিপূরণে এক প্রকার প্রশ্রয় লাভে, আরও বেগে ধাবমান হইল। তিনি ভাবিলেন, যখনই তাঁহার মনোমধ্যে বিদ্যুল্লতার চিন্তা উদয় হইয়াছিল, তখনই অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়াও সেই চিন্তা, সেই আনন্দপ্রদ, সেই চিত্ত বিমোহিনী চিন্তাকে স্মৃতির অগাধ গভীরতায় ডুবাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বর্ণলতার সহিত বিদায় লইবার সময় বিদ্যুল্লতার প্রতি তাঁহার আর সেরূপ শক্তিও ছিল না। মুঙ্গের আসিতে আসিতে বিদ্যুল্লতাকে মনে পড়িলে, অন্য চিন্তা তুলিয়া যাইতেন। মুঙ্গেরে পঁহুছিয়া তিনি বিদ্যুল্লতাকে ভাবিবার সময় পান নাই, ইচ্ছা করিয়া অবসর এড়াইতেন। কিন্তু দুই চারি দিন মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিয়াই সুহৃদগণের যে ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে বিদ্যুল্লতার প্রতি তাঁহার অনুরাগ অপবিত্র নহে। জ্ঞান হইয়াছে বাসনা দমন করাই পাপ, বাসনা দমন করিলেই যন্ত্রণার উদয় হয়। ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহার অপূর্ণ পরিত্যক্ত অভিলাষ এখন পূর্ণ হউক।

পাপের অদ্ভুত ক্ষমতা, একবার আপন আয়ত্ত মধ্যে পাইলেই নিজে বাহু প্রসারণ করিয়া সমাদরে পথিককে কোলে তুলিয়া লয়। গিরিশ পাপের অঙ্কে পতিত হইয়াছেন, অনেক কষ্টে পাপ তাঁহাকে হস্তগত করিয়াছে, এখন কতপ্রকার প্রলোভন দেখাইতেছে,—ইহা দিবে, উহা দিবে, গিরিশ যাহা চাহিবেন তাহাই দিবে, মর্ত্তলোকে তাঁহাকে স্বর্গসুখ দিবে। বিদ্যুল্লতাকে আনিয়া দিবে, হৃদয়ের যে স্থানে স্বর্ণলতার সরল প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই স্থানে বিদ্যুল্লতার প্রতিমা আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে। গিরিশ উদ্‌গদ চিত্ত হইয়া সানুরাগে তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হৃদয়কাননে স্বর্ণলতার প্রতি প্রেম পরিপুষ্ট লতিকায় উচ্ছেদ করত, বিদ্যুল্লতার প্রতি নবানুরাগ সিঞ্চিত নূতন লতিকায় নূতন কুসুম প্রস্ফুটিত করিয়া সেই কুসুমের অঞ্জলি দিতে বসিয়াছেন। গিরিশের এখন বোধ হইতেছে বিদ্যুল্লতা হাসিয়া তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছেনও বলিতেছেন—'অনেক কষ্ট দিয়াছি, শ্রম সফল কর।' আর কি গিরিশ মুঙ্গেরে থাকিতে পারেন! তাঁহার সুহৃদ সহবাস সাধ ফুরাইল, দেশে আসিবার জন্য প্রাণ কাঁদিল মুঙ্গের হইতে মন উঠিল, তিনি সেথা হইতে বিদায় হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দিবা অবসান প্রায়, অস্তোন্মুখ রবির লোহিত কিরণজাল তরুশির রঞ্জিত করিয়া আছে, মেদিনী বক্ষে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল দিবালোক অপসৃত হইয়াছে, স্থানে স্থানে অপসৃত হইতেছে, প্রকাণ্ড বিটপীর ঘন পত্রাচ্ছাদনে মূল প্রদেশ ঈষৎ ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে, দূরাগত বিহগগণ বৃক্ষ শাখায় আশ্রয় লইয়া কলরব করিতেছে, গোপাল গাভিদল লইয়া, কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া, গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে। পথে পথিকের সংখ্যা কমিয়া আসি-

য়াছে—এমন সময় ব্যাজড়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্তরস্থিত পথপার্শ্বে বিটপী-তলায় বিমর্ষ ভাবে গিরিশচন্দ্র দণ্ডায়মান। তাঁহার সে কান্তি নাই, তাঁহার বদনে সে স্ফূর্ত্তি নাই, তাঁহার রূপ যেন কুৎসিত হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে অশনি পাত হইলে, তত্রত্য বৃক্ষগণ যেরূপ ঝলসিয়া যায়, ঠিক সেইরূপ না হউক—নিকটস্থ তরুগণ যেন অর্দ্ধ বিদগ্ধ হইয়া থাকে, গিরিশের দশা, গিরিশের চেহারা ঠিক সেইরূপ। এমনি মলিন, এমনই বিশ্রী, দেখিলেই বোধ হয় তিনি কোন ঘোর মর্ম্ম বেদনায় জর্জ্জরীভূত হইয়া থাকিবেন, নয় কোন উৎকট পীড়ায় অল্প দিন হইল উপসম লাভ করিয়া থাকিবেন।

ক্রমে পথে যে দুই একজন লোক চলিতেছিল তাহারাও দূর হইল। অতঃপর গিরিশ দেখিলেন গ্রামের দিক হইতে কলস কক্ষে শুভ্রবসনা একটী কামিনী তাঁহারই দিকে আসিতেছে। সে যত নিকট হইতে লাগিল, সে কে জানিবার জন্য গিরিশের ঔৎসুক্য ততই বাড়িতে লাগিল। নিকটে আসিলে বেস করিয়া দেখিতে পাইলেন,—বুঝিতে পারিলেন—সে তাঁহাকে সময়োচিত সহায় প্রদান করিলে করিতে পারে। তাঁহার ইচ্ছা হইল. গিয়া সে কামিনীকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করেন—কিন্তু প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া প্রবৃত্তির আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। সুধু তাহার দিকে ছল ছল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

কামিনী দূর হইতে গিরিশের দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়া স আশ চিত্তে নানা রঙ্গ ভঙ্গ করিতে করিতে আসিতেছিল, নিকট হইয়াই বসনের পাশে দশন চাপিয়া ধরিয়াছিল—অকাল পতিত যৌবন উন্নতিশীল দেখাইবার জন্য বারাঙ্গনা সাধ্য চাতুরি অবলম্বন করত, মুচকি হাসিতে হাসিতে গিরিশের পানে অপাঙ্গে কটাক্ষ করিতে করিতে চলিয়া গেল—যাইতে যাইতে দুই একবার পাছু ফিরিয়া দেখিল—অঞ্চল সঞ্চালনে ইঙ্গিত করিল "আইস"। গিরিশ তখনই পা বাড়াইতে পারিলেন না—কামিনী-পথের অপর পাশে অনতিদূরে বাঁকা নদীর উপর বাঁধা ঘাটে নামিয়া গেল। গিরিশ ধীরে ধীরে সেই দিকে যাইতে লাগিলেন—ভাবিতে লাগিলেন, সন্ধ্যা হইয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়া আর কেহ চিনিতে পারিবে না, অনায়াসে তিনি কামিনীর অনুসরণ করিতে পারেন, এবং তাহার ভাব বুঝিয়া বক্তব্য বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারেন।

গিরিশ বাঁধাঘাটের এক ধারে গিয়া উপবেশন করিলেন। কামিনী পূর্ণ কলস লইয়া উঠিল, গিরিশকে দেখিল, ছল করিয়া একটু দাঁড়াইল, তাহার পর অপরিস্ফুট স্বরে একটী কুৎসিত রহস্য করিয়া পূর্ব্বমত রঙ্গ ভঙ্গিতে চলিয়া গেল।

বাঁধাঘাটে বসিয়া বহুকালের কথা গিরিশের মনে পড়িয়াছে—সেই ঘাটে স্বর্ণ ও তৎসমভিব্যাহারে আরও তাহার পাঁচ সাতটী সমবয়স্কাকে লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলেন—তন্মধ্যে বিদ্যুল্লতাও ছিলেন, বিদ্যুল্লতা তখন সধবা ছিলেন, বিদ্যুল্লতা তাঁহাকে তামাসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "স্বর্ণকে যেখানে সেখানে লয়ে যাবে—তারই বুঝি গোড়া বাঁধুনি করিতেছ!—ওকে খুব ভাল বাস, না?"

সেই স্বর্ণের প্রতি বিরাগ, সেই বিদ্যুল্লতার প্রতি কু অভিসন্ধি! গিরিশের চিত্ত টলমল করিয়া উঠিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া

পাপব্রতে নিবৃত্ত হইতে তিনি তখনও এক বার ইচ্ছা করিলেন।

পরক্ষণেই তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন—"ভোগ লালসা অতৃপ্ত থাকিতে কে কোথায় সুখী হইয়া থাকে? আজ নিবৃত্তি—কাল হয়ত তদপেক্ষাও অধিকতর পাপে নির্লিপ্ত হইতে হইবে,—বিশেষতঃ ভোগ্য সামগ্রী সুধু কালের প্রভাবে অব্যবহারে বিনষ্ট হইলে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না! বিদ্যুল্লতার যৌবন ভোগের সামগ্রী! কামিনীকে তখনই জিজ্ঞাসা করিলেই হইত"—

তজ্জন্য গিরিশকে অধিক আক্ষেপ করিতে হইল না। কামিনী আবার আসিয়া উপস্থিত। আপনার মনে হ্রস্ব স্বরে গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত—যেন সে সান্ধ্য সমীর সেবন করিতে আসিয়াছে, এই ভাবে পদচারণ করিতে লাগিল। তাহার অন্তরে যে আশা গানে তাহার আভাস মাত্র বিকাশ পাইতেছিল।

গিরিশ গীতের কিয়দংশ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কামিনীর সে আশা পরিপূরণে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই—সুতরাং আর শুনিতে তাঁহার ভাল লাগিল না। ক্রমে বরং বিরক্তি বোধে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কামিনীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতে ইচ্ছা নাই, বলিতে আর ইচ্ছা নাই, অথচ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া কামিনী তাঁহার নিকটে আসিল ও জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা—কাকে খোঁজ?'

চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার, চারিদিক নিস্তব্ধ, স্থানটী নির্জ্জন, কেহ কথা বার্ত্তা শুনিবার জন্য আড়ি পাতিয়া নাই—কথা কহিবার গিরিশের একান্ত বাসনা সত্বেও তাঁহার মুখে কথা জড়াইয়া গেল—তিনি বলিলেন—

"এঁ——এঁ, আমি!"

"কে তুমি?

"আমি একটী লোকের কথা জানিতে আসিয়াছি—তুমি কি এই গ্রামে থাক?"

"হ্যাঁ থাকি—কার কথা বল না?'

"এঁ—একটী স্ত্রীলোকের কথা—এঁ মিত্রদের—"

"মিত্তির দের কার?

"তুমি কি বিদুকে চেন?

"তা আর চিনিনে—সে যে হেথায় রয়েছে—

"তা একটা কাজ করিতে পার?"

"পারবনা কেন, তোমার সঙ্গে তার কতদিনের আলাপ?"

একজন পুরুষ, নীচকুলোদ্ভব, সেই সময় ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। গিরিশ ত্রস্তে উঠিয়া গেলেন, কামিনীও তাঁহার অনুসরণ করিল। কিয়দ্দূর আসিয়া কামিনী গিরিশের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইল' কহিল—'বাড়ীতে চল—কি কথা কহিবে, কেহ শুনিতে পাইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

গিরিশ অর্দ্ধেক কথা কহিয়াছেন, কামিনীও যে ভাবে উত্তর দিয়াছে, কথা কহিয়াছে, তাহাতে গিরিশের মনে হইয়াছে তাহার দ্বারাই কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে। তিনি কামিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাটীতে গমন করিলেন। জীবনে এতাবৎকাল যে স্থানকে কুস্থান বলিয়া ঘৃণা করিতেন এখন পাপ পথে পথিক হইয়া শান্তি লাভাশয়ে সেই কু স্থানে, সেই ঘৃণিত নিরয় সম পাপ মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই পাপ কুটিরে বসিয়া পাপমতি দুই জনে যে সকল পাপ পরামর্শ করিতে লাগিল তাহা পাঠকের অশ্রোতব্য।

গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তিস্বীকার।

পাশকরা ছেলে!! নাটক। শ্রীদুর্গাচরণ রয় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা। জি, সি, বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ৩০৯ সংখ্যক ভবনে, বসু প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ।।০ আনা।

আমরা এই নাটক খানির বিশেষ প্রশংসার কোন কথাই বলিতে পারিতেছি না। কেবল গ্রন্থোক্ত পাত্র পাত্রীর দ্বারা গল্প ব্যক্ত করিতে পারিলেই নাটক হয় না, ইহা গ্রন্থকার মহাশয়ের বোধ হয় অবিদিত নাই। তাঁহার বর্ত্তমান নাটকে নাটকোচিত কোন গুণ দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। গ্রন্থকারের লিপি নৈপুণ্য অপ্রশংসনীয় নহে। তাঁহার রহস্যোৎপাদনের শক্তিও মন্দ নহে। এই সকল শক্তি আর একটু বিবেচনার সহিত পরিচালিত করিলে বোধ হয়, তিনি অধিকতর কৃতকার্য্য হইতেন। সমালোচ্য নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথমাংশ গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ অপেক্ষা উত্তম।

——০:০——

চিনির বলদ। (সামাজিক রহস্য) পাশকরা ছেলে নাটক প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ৯৮ নং কলেজ ষ্ট্রিট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি হইতে প্রচারিত। চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ৵ আনা মাত্র।

পূর্ব্বোল্লিখিত পাশকরা ছেলে যে লেখনীর ফল ইহাও সেই লেখনী সমুদ্ভূত। এ পুস্তিকাখানি নাটকাকারে লিখিত; কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গ্রন্থকার নাটক লিখিতে অক্ষম। সে হিসাবে বর্ত্তমান গ্রন্থও নিন্দনীয়। কিন্তু আমরা বলিয়াছিলাম যে, তিনি রহস্যোৎপাদনে নিপুণ, এ গ্রন্থে তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। কৃপণতা অতি-রঞ্জিত করিয়া উপহাসাস্পদ করাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। আমাদের বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রায় অনেকটা সফল হইয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে অতি ঘৃণাই উক্তি আছে। তাহা পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত।

——০:০——

চিন্তা প্রবাহ। প্রথম ভাগ। খণ্ড কাব্য। শ্রীকুঞ্জ বিহারী বাগচী কর্ত্তৃক প্রণীত। সৈদাবাদ—প্রমাদ ভঞ্জন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।।০

এই নানাবিষয়িনী কবিতা পুস্তিকার অনেকগুলি কবিতা প্রশংসার যোগ্য। ভাব সমূহ প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত না হইলেও কোন ক্রমেই অবজ্ঞা বা নিন্দার যোগ্য নহে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, তিনি সাহিত্য সংসারে এই নূতন প্রবেশ করিলেন। সমুচিত উৎসাহ পাইলে তিনি আবার সাহিত্যরাজ্যে দেখা দিবেন সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ তাঁহার চিন্তা ও ভাব সমূহ আরও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

"বিধবার বিলাপ,' আর্য্যজাতি' প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা এ গ্রন্থে না থাকিলেই ভাল হইত; কারণ সে গুলিতে কোন নূতনত্ব নাই।

ভারতীয় রাজকুল-দর্পণ।

চতুর্থ অধ্যায়—বুঁদি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হার বংশীয় রাজপুতদিগের আবাস ভূমি বলিয়া এই বৃহৎ রাজ্যের নাম হারাবতী হইয়াছে। ইহার এক খণ্ডের নাম বুঁদী ও অপর খণ্ডের নাম কোটা। এই সুবিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড যে কারণে দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

বুঁদী রাজ্যের উত্তরে জয়পুর, পশ্চিমে মিবার, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্বে কোটা রাজ্য অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ২৩০০ মাইল ও লোক সংখ্যা প্রায় ২২৪,০০০ হইবে। ইহার রাজস্ব আটলক্ষ ও রাজকর একলক্ষ বিংশতি সহস্র মুদ্রা। এই রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা ১৩৭৫ পদাতিক, ৭০০ অশ্বারোহী এবং ৮৮ সংখ্যক কামান। বুঁদী রাজ্যের অধিকাংশ অনুর্ব্বর ও। কঙ্করময়; পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় না। রাজধানী বুঁদী নগর পর্ব্বতময় প্রদেশে সংস্থিত; গিরি-গাত্রে সুন্দর সৌধমালার শোভা দেখিলে নয়ন মন যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে।

হারাবতী রাজ্য সংস্থাপয়িতা রাওদেব সিংহ প্রথম চোহান অগ্নিপালের বংশ সম্ভূত, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া মিবারের মহারাণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে তথায় তাঁহারা ক্ষমতাপন্ন সামন্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। দেব সিংহ স্বয়ং মিবারের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহ জয় করিয়া এই রাজ্যের সংস্থাপন করেন। ১২৪২ খৃ অব্দে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। তদবধি প্রায় ২০০ দুই শত বৎসর বুঁদী রাজেরা মহারাণার মহত্ত্ব স্বীকার করত তাঁহার সহিত অতি পবিত্র মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ থাকেন। মিবারের যুদ্ধ সময়ে তাঁহারা সৈন্য দ্বারা রাণার সাহায্য করিতেন। এতদুভয়ের মধ্যে বৈবাহিক ব্যাপারও সচরাচর সংঘটিত হইত। রাও দেবসিংহের পর ক্রমান্বয়ে সমরসিংহ, নাপজি, হামত, বীরসিংহ, বৈরীশাল, ভাণ্ডো, নারায়ণ দাস, সূর্য্যমল, ও সুর্ত্তান বুঁদীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই কয় জনের রাজত্ব সময়ের বিবরণ মধ্যে এমন কোন ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই, যাহা ইতিবৃত্ত অঙ্কে স্থান পাইতে পারে।

১৫৫৫ খৃঃ অব্দে রাও সর্জ্জন সিংহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মোগল কুলতিলক আকবরের হস্তে সুবিখ্যাত দুর্গ রিন্থম্বোর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিলেন। সম্রাটও ইহার প্রতিদান স্বরূপে তাঁহাকে বুঁদীর নিকটস্থ ৫২টী প্রদেশ দান করিয়া তাঁহাকে রাও-

রাজা উপাধি প্রদান করিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার বিবিধ কার্য্য কুশলতা নিবন্ধন সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারাণসী ও চুণালগড় এই দুই বিখ্যাত নগর পুরস্কার স্বরূপে দান করেন। রাও রাজা সর্জ্জন সিংহ ৩১ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া পুণ্য ভূমি বারাণসী নগরীতে জীবলীলা সম্বরণ করেন। তদীয় পুত্র রাও ভোজসিংহ পিতৃ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে আকবর সমীপে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি গুজরাট সমরে সম্রাটের সহযাত্রী হইয়া কার্য্য দ্বারা তাঁহার যার পর নাই সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে ভোজ সিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাও রতন সিংহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। সদগুণ সমূহের সমাবেশ নিবন্ধন রতনসিংহ সর্ব্বসাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্র হইয়া সাজিহানের বিদ্রোহ সময়ে অনেক কার্য্য করেন। বিদ্রোহী পক্ষীয়েরা সমবেত হইয়া বুর্হানপুরে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করে, রতন সিংহ সেই সময়ে সাহসিকতা ও রণপাণ্ডিত্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। এই যুদ্ধে বিদ্রোহী সম্প্রদায় এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপে রতন সিংহ বুর্হান পুরের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া রতনের দ্বিতীয় পুত্র মধুসিংহকে হারাবতীর দক্ষিণাংশ প্রদান করত পুরুষ পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতে আদেশ করিলেন। ইহাতেই হারাবতী দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বুঁদী ও কোটা এই উভয় নামে প্রসিদ্ধ হইল। নূতন রাজ্যের রাজধানী কোটা নগরে সংস্থাপিত হইল।

১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে রতন সিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় পৌত্র ছত্রশাল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি আপন রাজত্ব সময়ের অধিকাংশ সম্রাটকার্য্যে ব্যয়িত করিলেন। সম্রাট সাজিহান কর্ত্তৃক দিল্লির শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠা সহকারে বহুকাল সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন। যখন কুমার অরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে সমরযাত্রা করেন, তখন ছত্রশাল তাঁহার সহযাত্রী হইয়া রণপাণ্ডিত্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সাতিশয় যশোরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি যোধপুরেশ্বর যশোবন্ত সিংহের সমসাময়িক ছিলেন; উভয়ে একযোগে জ্যেষ্ঠ কুমার দারা শেঁকোর পক্ষাবলম্বন করেন; সেই সময়েই ছত্রশাল ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গতাসু হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাও ভাও সিংহ আরঙ্গজীবের দ্বারা অনেক উৎপীড়ন সহ্য করেন; এমন কি, সম্রাটের আদেশে বুঁদী সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া যায়। পরিশেষে ভাওসিংহ সম্রাটের ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া পৈতৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি এখন অবধি বিশ্বাসী সামন্ত রূপে পরিগণিত হইয়া অরঙ্গাবাদের শাসন কর্ত্তৃত্ব কার্য্যে আপন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সম্রাটের সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন।

১৬৬২ খ্রী অব্দে ভাওসিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর ভীমসিংহের পৌত্র রাও অনিরুদ্ধ সিংহ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। সাহসিকতা ও সমর নিপুণতা নিবন্ধন তিনি অরঙ্গজীবের অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের সহিত দক্ষিণাত্যে যাত্রা করিয়া বিজয়পুর আক্রমণ সময়ে কার্য্য কুশলতার একশেষ প্রদর্শন

করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের গোলযোগ মীমাংসা করিতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৬৯৬খ্রীঃ অব্দে তদীয় পুত্র বুদ্ধসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহার একাদশ বৎসর পরে আরঙ্গজীবের মৃত্যু হয়। সম্রাটের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি বাহাদুর সাহের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহারই শিরে মুকুট অর্পণ করেন। সম্রাট বাহাদুর সাহ ও তদীয় উত্তরাধিকারীবর্গ জেহন্দর সাহ, ফিরোকসের ও মহম্মদ সাহের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বুদ্ধসিংহ সম্রাট কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন। মহম্মদ সাহের পরলোকের পর তিনি স্বদেশে গমন করিলেন, কিন্তু তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সিংহাসন অপহৃত হইয়াছে। তাঁহার এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতিরূপ সুযোগে অম্বরেশ্বর দ্বিতীয় জয়সিংহ বলদর্পে বুঁদী অধিকার করিয়া দলিলসিংহ নামক জনৈক প্রিয় পাত্রকে রাওরাজা উপাধি প্রদান পূর্ব্বক তথাকার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বুদ্ধসিংহ বারম্বার রাজ্যলাভের চেষ্টায় বিফল যত্ন হইয়া বেগু নামক স্থানে গমন করিলেন; তথায় তিনি হতাশ জনিত ভগ্ন হৃদয়ে গতাসু হইলেন। তদীয় পুত্র উমেদ সিংহ চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল নানা স্থানে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এত দিন তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। পৈতৃক সিংহাসন অপহৃত হওয়ায় তিনি হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছিলেন। তিনি এই কালের মধ্যে অনেক অনুচর সংগ্রহ করেন, পরিশেষে কোটার অধীশ্বর দুর্জ্জন শালের সাহায্যে জয়পুরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন। বহুকাল ব্যাপী সমরে উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়ায় একটী সন্ধি সংস্থাপিত হইল। উমেদ সিংহ বুঁদী প্রাপ্ত হইলেন বটে কিন্তু কর-স্বরূপে অনেক অর্থ প্রদান করিতে হইল। ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দে উমেদ সিংহ পৈত্রিক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সুখ সৌভাগ্যে অতিপাত হয় নাই। দীর্ঘকাল ব্যাপী সমরে দেশ এক প্রকার নির্দ্ধন হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর আবার মহারাষ্ট্রীবদিগের দৌরাত্ম্য উপস্থিত হইল। ইহাদের উৎপীড়নে দেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম দেখিয়া ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে পুত্রের প্রতি রাজ্য ভার সমর্পণ করত উমেদ সিংহ তীর্থযাত্রা করিলেন কিন্তু ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে পুত্রের মৃত্যু সমাচার পাইয়া স্বরাজ্যে আগমন করত পুনরায় রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল শেষ হইবার সময়ে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা সংঘটিত হয়। হোলকারের নিকট পরাজিত হইয়া কর্ণেল মনসন সসৈন্যে পলায়ন করত বুঁদী রাজ্যে প্রবেশ করিলে উমেদ সিংহ তাঁহার যথোচিত সৎকার করেন। এই সূত্রে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে উমেদ সিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় পৌত্র রাও বিষণ সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিণ্ডারীদিগকে দমন সময়ে ইংরেজগণের যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইহাতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক সন্ধিসূত্রে তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন। ১৮১৮খ্রীঃ অব্দে এই সন্ধি সংস্থাপিত হয়। হোলকার ও সিন্ধিয়া দ্বারা বুঁদীর অধিকারস্থ যে সকল প্রদেশ অপহৃত হইয়াছিল, এই সন্ধি সূত্রে বিষণ সিংহ সে সমুদায় পুনঃ

প্রাপ্ত হইলেন। রাও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন এবং প্রয়োজন মত সেনা সাহায্যের নিয়মে আবদ্ধ হইলেন। এত দিন সিন্ধিয়াকে যে কর দিতে হইত, এখন অবধি তাহা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট লইবেন; যে কর হোলকারকে দেয়, তাহা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট দিবেন, এই নিয়ম হইল।

সপ্তদশ বৎসর রাজত্বের পর ১৮২১ অব্দে বিষণসিংহ কলেবর পরিত্যাগ করিলে তদীয় পুত্র রামসিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ মাত্র ছিল, তাঁহার প্রাপ্ত ব্যবহার পর্য্যন্ত সুযোগ্য মন্ত্রী কিষণরাম সমস্ত রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। মন্ত্রীর গুণে রাজকার্য্য অতি সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। সমস্ত ঋণ পরিশোধিত হইয়া বার্ষিক রাজস্ব অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। সমস্ত বিষয়েই রাজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময়ে কতিপয় যোধপুর সামন্ত দূত স্বরূপে বুঁদীর রাজসভায় উপনীত হয়; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের দ্বারা মন্ত্রী প্রাণ বিযুক্ত হইলেন। মহারাও যুবক রামসিংহ যার পর নাই বিরক্ত হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। যাহারা এই দুরপনেয় দুষ্কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই জন মাত্র ধৃত হইয়া জীবনচ্যুত হইল। মহারাও ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া যোধপুরের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। উভয় রাজ্যে ঘোরতর বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইলে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন। ইহার পরেই রামসিংহ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৫৭ অব্দে যে ঘোরতর সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার সাহায্য না করায় মিত্রতা সূচক সন্ধি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ত্রয়োদশ বৎসর পরে আবার সেই সন্ধি সংস্থাপিত হইয়া অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

১৮৭৭ অব্দে দিল্লিতে যে বিক্টোরিয়া রাজসূয় হয়, তাহাতে মহারাও রাজা রাম সিংহ উপস্থিত থাকিয়া "কৌন্সিলর অবদি এম্প্রেস" ও প্রথম শ্রেণীর নাইট হইয়া "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি লাভ করেন। পরিশেষে তিনি "অর্ডার অব দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাও রামসিংহের প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা আছে; তাঁহার সম্মানসূচক সপ্তদশ সংখ্যক তোপধ্বনি হইয়া থাকে। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর।

পঞ্চম অধ্যায়।

কোটা।

এই রাজ্য বুঁদীর দক্ষিণে অবস্থিত; ইহার পরিমাণ ফল ১২৫০ বর্গক্রোশ ও লোক সংখ্যা প্রায় চারিলক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইবে। রাজস্ব ২০ বিংশতি লক্ষ ও রাজকর ১ এক লক্ষ চুরাশি সহস্র সাতশত কুড়ি টাকা। সৈন্য সংখ্যা ৪৬০০ পদাতিক, ৭০০ অশ্বারোহী ও ১১৯টী কামান।

কোটা প্রদেশ অতিশয় উর্ব্বর। কূপ ও পুষ্করিণীর জলেই অধিকাংশ কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, রাজধানী কোটা নগরী যেন চর্ম্মণ্বতী বক্ষে লক্ষ্য করিয়া একদৃষ্টে বসিয়া আছে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বুঁদীরাজ

রতনসিংহের দ্বিতীয় পুত্র মধুসিংহকে সম্রাট বুঁদীর অর্দ্ধাংশ প্রায় দান করেন। কি কারণে সম্রাট এবম্বিধ কার্য্য করেন, তাহা ইতিবৃত্তে প্রকাশ নাই, সম্ভবতঃ ইহাই বোধ হয় যে, বুঁদীরাজেরা বাদসাহের অনুগ্রহে দিন দিন যেরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষমতার খর্ব্ব করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সে যাহা হউক, মধুসিংহ ১৬২০ অব্দে কোটা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া দশ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দশ বৎসরে তিনি রাজ্যের সীমা অনেক বৃদ্ধি করিয়া যান। তাঁহার পরে ক্রমান্বয়ে চারিজন ৭৩ বৎসর কাল রাজত্ব করেন; তাঁহাদের নাম যথাক্রমে মুকুন্দসিংহ, জগৎসিংহ, প্রথম কিশোরসিংহ এবং প্রথম রামসিংহ। তাঁহারা সকলেই সম্রাটের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

১৭০৭ অব্দে প্রথম ভীমসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন; তিনিই প্রথমে সম্রাট প্রদত্ত "পঞ্চহাজারীর নায়ক" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উদয়পুরের মহারাণাও তাঁহাকে মহারাও উপাধি প্রদান করেন। ভীমসিংহ অতি সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, তিনি ভীলদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের অধিকৃত প্রদেশ আপনার রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার অনেক গুণ ছিল, কিন্তু এক দোষে তিনি লোক সমাজে অতিশয় নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ শাখার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। জয়পুরেশ্বর দ্বিতীয় জয়সিংহ বুঁদীরাজ বুদ্ধসিংহকে যে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে ভীমসিংহ আপনার বল সংযোগ করত ঐ অবসরে চর্ম্মন্বতীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী অনেকগুলি প্রদেশ আপনার অধিকারে ভুক্ত করেন। ১৭১৯ অব্দে ভীমসিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্জ্জুন সিংহ পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃযুগল সিংহাসন লইয়া বিবাদ আরম্ভ করেন,—সেই বিবাদে শ্যামসিংহ কলেবর পরিত্যাগ করিলে দুর্জ্জন শাল রাজা হইলেন। দুর্জ্জন বিবিধ গুণান্বিত বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সিংহাসন লাভের অনতিবিলম্বে জয়পুরেশ্বর সদলে আগমন পূর্ব্বক কোটা আক্রমণ করেন, কিন্তু দুর্জ্জন শালের বলবিক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলেন। এই দুর্জ্জন শালের সাহায্য বলেই উমেদ সিংহ বুঁদীর হৃত সিংহাসন পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুর্জ্জন শাল এত দূর ক্ষমতাশালী হইয়াও মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হীনবল হইলেন; তাঁহার রাজত্ব কালের শেষভাগে তিনি বার্ষিক করদানে সম্মত হইয়া হোলকারের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ অব্দে দুর্জ্জন শালের মৃত্যু হইলে অজিত সিংহ নামক জনৈক দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি তিন বৎসর মাত্র রাজ্য করেন; তৎপরে তাঁহার পুত্র ছত্রশাল রাজা হইলে ১৭৬১ অব্দে জয়পুরেশ্বর আবার কোটা আক্রমণ করিলেন। ছত্রশালের সৈন্য সংখ্যা পাঁচ সহস্র মাত্র, কিন্তু আক্রমণকারীর সংখ্যা অনেক। এই বিসদৃশ সময়ে কোটার সর্ব্বনাশ হইবারই সম্ভাবনা কিন্তু মন্ত্রীপ্রবর জালিম সিংহের কৌশল বলে সমরের পরিণাম অন্যবিধ হইল। যখন উভয় সৈন্য বটারো নামক স্থানে সমবেত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, তখন মন্ত্রীবর বহু-

লুণ্ঠনের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া অর্থপিশাচ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমন্ত্রণ করিলেন; তাহাদের সমাগত দল বল দর্শনেই ভীত হইয়া জয়পুরীয় সেনাগণ শিবিরাদি যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। ১৭৬৫ অব্দে ছত্রশালের মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা গোমান সিংহ রাজা হইলেন। তিনি জালিম সিংহের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন, কিন্তু কিছু দিন পরে মন্ত্রীবর পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়রা বার বার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে গোমান সিংহ নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া পরিশেষে ছয় লক্ষ টাকা উৎকোচ দানে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। ১৭৭০ অব্দে গোমানের মৃত্যু হইলে তদীয় শিশু পুত্র উমেদ সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সমস্ত রাজকার্য্যের ভার জালিমের উপর প্রদত্ত হইল। মন্ত্রীবরের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোটারাজ্য রাজপুতানার মধ্যে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। ১৭১৭ অব্দে প্রসিদ্ধ দস্যু পিণ্ডারীদিগকে বশীভূত করিবার জন্য ইংরাজেরা যে সৈন্য প্রেরণ করেন, জালিম সিংহ সেই সঙ্গে যোগ দান করত আপনার কার্য্য কুশলতার সুন্দর পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজদিগের সহিত মহারাও উমেদ সিংহের এক সন্ধি হইল, তাহার নিয়ম নিচয় মধ্যে প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে—কোটা রাজ্য ইংরাজদিগের আশ্রিত হইল; মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাপ্য কর এখন অবধি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পাইবেন; এবং প্রয়োজন হইলে মহারাও ইংরাজদিগকে সৈন্য সাহায্য করিবেন। আরও একটী নিয়ম হইল যে মন্ত্রীত্ব পদ জালিম সিংহ পুরুষানুক্রমে ভোগ করিবেন। যে চারিটী প্রদেশ হোলকার হরণ করিয়াছিলেন তাহাও এই সময়ে কোটার অধিকার ভুক্ত হইল। এই সন্ধির তিন বৎসর পরেই মহারাও উমেদ সিংহ কলেবর পরিত্যাগ করিলে তদীয় পুত্র দ্বিতীয় কিশোর সিংহ রাজা হইলেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতাই জালিম সিংহের উপর থাকায় তিনি অতিশয় বিরক্ত হইলেন; শূন্য রাজোপাধি তাঁহার তৃপ্তিকর না হওয়ায় স্বহস্তে রাজশক্তি লইবার জন্য তিনি বল প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া পরিশেষে উদয়পুরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া ইহাই মীমাংসা করিলেন যে, কিশোর সিংহ নিজব্যয়ের জন্য এক লক্ষ চৌষট্টি সহস্র টাকা বার্ষিক পাইবেন, এবং তিনিও স্বীকার করিলেন যে, রাজশক্তি জালিম ও তদীয় বংশধরগণের হস্তেই থাকিবে। ১৮২৪ অব্দে জালিমের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র মধু সিংহ মন্ত্রীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যদিও তিনি রাজকার্য্যে পিতার ন্যায় উপযুক্ত ছিলেন না, তথাপি সন্ধির নিয়মানুসারে, প্রতিদ্বন্দ্বী বিরহিত হইয়া উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

১৮২৮ অব্দে মহারাও কিশোর সিংহ আপন ভ্রাতুষ্পুত্র রামসিংহকে শূন্য উপাধি বিশিষ্ট রাজপদ প্রদান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে মধুসিংহের মৃত্যু হওয়ায় তদীয় পুত্র মদন সিংহ মন্ত্রীত্বভার গ্রহণ করিলেন। রাজশক্তি লইয়া রাজা ও মন্ত্রীতে বিবাদ আরম্ভ হইল, পরিশেষে ১৮৩৪ অব্দে বিবাদবেগ এত দূর বৃদ্ধি পাইল, যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আর নিরপেক্ষ না থাকিয়া মধ্যস্থ হইলেন। তাঁহারা মহা-

রাও রামসিংহের হস্তে সর্ব্বতোমুখী রাজ-শক্তি প্রদান করিলেন। পিণ্ডারী যুদ্ধে জালিমসিংহ যে প্রাণপণে তাঁহাদের সহায্য করিয়াছিলেন, তাহার নিষ্ক্রয় স্বরূপে জালিমের বংশধরগণের জন্য অন্য একটী উপায় স্থিরীকৃত হইল; কোটা হইতে ১৭টী প্রদেশ বাহির করিয়া তাহার ঝালবর নাম দিয়া জালিম বংশীয়দিগকে সমর্পিত হইল। ১৮৩৮ অব্দে এই ব্যাপার সংঘটিত হইল। কোটার রাজকর হইতে ৮০ হাজার টাকা কমিয়া গেল, এখন হইতে ঐ টাকা ঝালবর রাজ্য হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পাইতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের কতকগুলি সৈন্য পোষণের জন্য কোটারাজ বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন; কিছু দিন পরে উহার এক লক্ষ টাকা কমিয়া যায়, ঐ পোষিত সৈন্য পোলিটিকেল এজেণ্টের অধীনে থাকিল; সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে ঐ সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া এজেণ্ট ও তাহার পুত্রদ্বয়ের বিনাশ সাধন করে। মহারাও এই বিদ্রোহ দমনে কিছুমাত্র চেষ্টা না করায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মানসূচক তোপ সংখ্যা ১৭ হইতে ১৩ করিয়া দিলেন। ১৮৬৬ অব্দে রামসিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র ভীমসিংহ ছত্রসিংহ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক রাজপদ গ্রহণ করিলেন, তিনি তখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হন হন নাই, অতএব তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীবর্গ দ্বারা রাজ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সুশৃঙ্খলরূপে রাজকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইলেন না—দিন দিন অর্থের অনাটন হইয়া রাজঋণ বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া রাজ্যের সুব্যবস্থা সংস্থাপনের জন্য অগ্রসর হইলেন। জয়পুরের ভূত পূর্ব্ব মন্ত্রী নবাব সর্ মহম্মদ ফৈজ আলি খাঁ বাহাদুর কে, সি, এস, আই মহোদয়কে সুশৃঙ্খল সম্পন্ন রাজকার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই উপযুক্ত পাত্রের হস্তে পড়িয়া অনধিক কালমধ্যে রাজ্যের আশাতীত উন্নতি হইল। রাজস্ব বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধিত হওয়ায় অসচ্ছলতা দূর হইয়া গেল। কি দেওয়ানী, কি নেজামত, সকল বিষয়েই সুব্যবস্থা হইল; কোন বিষয়েই প্রজার আর কষ্ট রহিল না। মহারাও ছত্রসিংহ বাহাদুর এখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই, ইনি নিজ ব্যয়ের জন্য এখন বার্ষিক এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন। ইহাঁর সম্মানের জন্য পূর্ব্বমত ১৭ তোপই গ্রাহ্য হইয়াছে, ইহাঁর প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বোতোমুখী ক্ষমতা আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঝালবর।

কোটার যে ১৭টী প্রদেশ লইয়া ঝালবর রাজ্য সংস্থাপিত হয়, তাহার পরিমাণ ফল প্রায় ৬২৫ বর্গ ক্রোশ ও লোক সংখ্যা ২২৬০০০ হইবে। রাজস্ব ১৬ লক্ষ ও রাজকর ৮০ হাজার। সৈন্যসংখ্যা—৪৪০০ পদাতিক, ৪২৫ অশ্বরোহী, ১৫০ গোলান্দাজ ও ৯৫টী কামান।

যেরূপে ঝালবর রাজ্যের সংস্থাপন হয় তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। মদন সিংহ এই নূতন রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ৮০ হাজার টাকা কর ও সাধ্যমত সৈন্য সাহায্য করিবার নিয়মে সন্ধি

করিলেন। এই সময়েই তিনি মহারাজ রাণা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৪৫ অব্দে মদন সিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র পৃথ্বিসিংহ পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি চির-জীবন ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা রাখিয়া গিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে তিনি অনেক বিপন্ন ইংরাজ-জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৭১ অব্দে মহারাজ রাণা পৃথ্বিসিংহ কলেবর পরিত্যাগ করিলে তদীয় দত্তকপুত্র বক্তসিংহ সিংহাসন লাভ করিলেন। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত নহেন বলিয়া জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারীর দ্বারা রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। ১৮৭৭ অব্দে ১লা জানুয়ারি দিল্লিতে যে বিক্টোরিয়া রাজসূয় হয়, মহারাজ রাণা বক্তসিংহ তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সম্মান সূচক তোপ সংখ্যা পঞ্চদশ। প্রজার জীবন মরণে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা আছে।

ক্রমশঃ।

নীল।

উদ্ভিদ দ্বারা জীবজন্তুর যত উপকার হয় তেমন আর কিছুতেই নয়। বাসগৃহ, আহার্য্য ও পরিধেয় প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য জাত অধিকাংশই উদ্ভিদ হইতে সংগ্রহ হয়। যদি বল মাংস ভোজন ও পশুচর্ম্ম পরিধান করিলেও ত চলিতে পারে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিতই হইতে পারেনা। কেননা যাহাদিগের মাংস ও চর্ম্ম প্রয়োজন সাধনার্থ গ্রহণ করিতে হয়, তাহারা কি উদ্ভিদ ভোজন ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে? যাহা হউক, উদ্ভিদ যে জীবদিগের অতিশয় প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহাভাব।

উদ্ভিদ উৎপাদনের চেষ্টাই কৃষিকার্য্য। কৃষিকর্ম্মে বিস্তর লাভ। তাহাতে যে পরিমাণে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, তাহার কিয়দংশ নিজের ব্যবহারোপযোগী রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ বিক্রয় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করা যায়। কৃষিকার্য্য করিতে হইলে বাণিজ্য ও শিল্প তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

চাস করিতে ও কৃষি সম্ভূত দ্রব্যাদি সাধারণের ব্যবহারোপযোগী করিতে নানা বিধ যন্ত্রাদির প্রয়োজন। শিল্পকার্য্য ভিন্ন কোন যন্ত্রই প্রস্তুত হইতে পারে না। এই জন্যই বলিতেছি, যে কৃষি কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্প ও বাণিজ্য যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইবার কথা। ভারতবর্ষীয় ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এইজন্যই এ দেশকে সমস্ত জনপদ বাসী লোকেরা রত্ন প্রসূ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। এদেশে কৃষিকার্য্য দ্বারা যে সকল উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হয়, ক্রমে ক্রমে তাহা সাধারণকে অবগত-করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। সংপ্রতি

সমধিক লাভজনক নীল চাসের বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে নীল জন্মে। সম্রাট আলেক্জাণ্ডারের সহাগত পণ্ডিত এরিয়ান্ ও নিয়ার খস্ স্বীয়স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, যে হিন্দু সাংযাত্রিকেরা সিন্ধু নদীতীরস্থ বারবোরিক নগর হইতে নীল লইয়া বাণিজ্যার্থ ইজিপ্ত প্রভৃতি পাশ্চাত্য জনপদ সমূহে যাতায়াত করিতেন। খৃষ্ট জন্মিবার ৩০০শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ পণ্ডিত মাসিডেনিয়ার অধিপতির সঙ্গে দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে এ দেশে আসিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যান। নীল তাহার অনেক পূর্ব্বকাল হইতেই এদেশে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে সন্দেহ নাই। অতি প্রাচীন সময়ের লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে নীলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ ইংরেজদিগের অধিকৃত হইবার পর ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে কোর্ট অব ডাইরেক্টর হইতে এদেশে প্রচুর রূপে নীল কৃষি হইবার প্রস্তাব হয়। তদনুসারে বাঁশবেড়িয়া ও সুখসাগর এই দুই স্থানে দুইটী কুঠী প্রস্তুত করিয়া নীলের চাস আরম্ভ করিয়া পরীক্ষা করা হয়। তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে কতকগুলি ইউরোপীয় বণিক্ আসিয়া এদেশের প্রায় সর্ব্বত্র কুঠি স্থাপন পূর্ব্বক নীলের চাস আরম্ভ করেন। বহুবর্ষ ব্যাপিয়া সেই কার্য্য চলিতে ছিল। বঙ্গদেশের মধ্যে জেলা নদীয়া ও যশোহর নীল প্রধান প্রদেশ। এই দুইটী জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই নীল কুঠি ছিল ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীলের আবাদ হইত, বঙ্গদেশ হইতে যত নীল বিদেশে রপ্তানি হইতে দেখা যাইত তাহার প্রায় তিন ভাগ ঐ দুই জেলাতেই জন্মিত।

ইউরোপীয় নীল ব্যবসায়ীদিগকে নীলকর বলিত। তাঁহারা আপন কুঠির উন্নতি জন্য মহাজনী করিতেন, টাকা ও ধান কর্জ দিয়া প্রজাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিতেন। আর ছলে বলে কৌশলে এতদ্দেশীয় ভূস্বামীদিগের জমিদারী হয় পত্তনী, নয় মৌরসী সর্ত্তে লিখিয়া পড়িয়া লইতেন। জমিদারী লইবার যে সকল কৌশল অবলম্বিত হইত, তাহার দুই একটা প্রদর্শন করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। মনে কর একজন জমিদারের শরিক আছে, নীলকর সেই শরিকের সহিত যোগ সাজস করিয়া তাহার অংশ পত্তনী বা মৌরসী লইলেন। তাহার পর প্রজার উপর জুলুম্ করিয়া অন্য শরিকের প্রাপ্য খাজনা আদায় করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সহজেই অন্য অংশীদার নীলকরের শরণাপন্ন হইয়া আপন অংশ লিখিয়া দিতে বাধ্য হইল। অন্য উপায় এই, কোন জমিদারের নিকট নীলকর তাহার বিষয় মৌরসী বা পত্তনী লইবার প্রস্তাব করিলেন, জমিদার তাহা দিতে অস্বীকৃত হইল, তখন নীলকর ফেরেপ করিয়া সেই জমিদারের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত করিয়া দিলেন, সেই নালিশ গুলি এক স্থানে একত্রে করিল না। নানাস্থানের নানা লোক নানারূপ মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিল; কাজেই জমিদার জব্দ হইয়া সাহেবের অভীষ্ট সাধন করিয়া নিরুপদ্রব হইলেন। এইরূপ বহুবিধ বিলাতী কৌশলে নীলকরেরা জমিদারের সর্ব্বনাশ করিতেন।

নীলকরদিগের টাকার অপ্রতুল ছিল না, এক একজন নীলকর এক এক কোসের

অধীনে থাকিয়া আপন আপন কারবার চালাইতেন; সংবৎসর যত টাকার আবশ্যক হইত হৌসওয়ালা সমস্ত টাকা কর্জ্জ দিতেন, কার্ত্তিকমাসে আপন অধিকারের নীল বড়ী বিক্রয় করিয়া হৌসের সুদ শুদ্ধ সমস্ত দেনা পরিশোধ পূর্ব্বক যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহাও সেই হৌসে জমা করিয়া রাখিতেন। নীলকরের প্রায়ই কোন বিঘ্ন ছিল না, সুতরাং হৌসের দেনা প্রতি বৎসরই যথাসময়ে পরিশোধ হইত। নীলকর এইরূপে টাকা লইয়া জমিদারদিগকে প্রথমে অতিরিক্ত টাকা দিয়া লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে ফাঁদে ফেলাইতেন, তারপর সেই জমিদারদিগের দুঃখে শৃগাল কুক্কুরেরাও রোদন করিত। কুঠিয়াল্ সাহেবেরা বাঙ্গালি কর্ম্মচারী দ্বারা লোকের অবস্থা অবগত হইয়া যেখানে যেমন সেখানে সেই রূপ ব্যবস্থা করিতেন। অর্থ বা জুলুম যেখানে যাহার প্রয়োজন সেখানে তাহাই প্রযুক্ত হইত। ইঁহারা অধিকাংশ স্থানেই জুলুম করিয়া কৃতকার্য্য হইতেন।

রাইয়তদিগকে স্ববশে রাখিবার জন্য যে আশ্চর্য্য উপায়টী অনুষ্ঠিত হইত, অদ্যাপিও কেহ কেহ তাহার ফলভোগ করিতেছে। প্রজাদিগকে নীল আবাদ জন্য আগোরা স্বরূপ কিছু টাকা দিয়া একখানি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হইত। সেই চুক্তি পত্রের সর্ত্ত প্রকারান্তরে ক্রীত দাসের সর্ত্তের অনুরূপ। এই আগামী টাকা দেওয়ার নাম নীলদাদন। যে একবার এই দাদন লইত, সেব্যক্তি পুরুষানুক্রমে নীলচাস করিয়া দিয়াও সে টাকা পরিশোধ করিতে পারিত না। অথবা কোন কালেই আর তাহা পরিশোধ হইত না। যত আবাদ করনা কেন, সেই দাদনের টাকা খাতায় বাঁকি বকেয়া চলিত। রাজকীয় বিচারালয়ে নালিশ করিয়াও নীলকরের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় ছিল না। কারণ তখন সবডিবিশন স্থাপিত হয় নাই; কেবল দূরতর স্থানে জেলা ছিল। ইংরাজ হাকিমেরা বাঙ্গালাভাষা বা এদেশীয় লোকের আচার ব্যবহার ও ভাব চরিত্র ভাল রূপ বুঝিতেন না। উকীল মোক্তারেরাও ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন আপন আপন মওক্কেলের বিষয় হাকিমদিগকে বুঝাইতে অসমর্থ হইতেন। পক্ষান্তরে নীলকরেরা স্বজাতি ভাষায় স্বজাতীয় বিচার-পতিদিগকে যাহা বুঝাইয়া দিতেন, হাকিমেরা তাহাই যথার্থ বলিয়া বোধ করিতেন, সুতরাং তদনুসারেই বিচার নিষ্পত্তি হইত। দেশীয় বিচারকেরাও আইন সঙ্গত কাজ করিতে সাহস করিতেন না। তাঁহাদিগের এজলাসে এরূপ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেও নীলকরেরা তাহা ইংরাজ হাকিমের নিকট উঠাইয়া লইতেন। বিশেষতঃ নিপীড়িত লোকেরাও আদালতের ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ। তাহারা নির্ধন, সহায়হীন, অন্যায় গ্রস্ত হইলে প্রমাণ করিতে পারিত না। নীলকরের এমনই প্রতাপ, যে কেহই তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়া সাক্ষ্য দিতে সাহস করিত না, যদি কেহ নীলকরের অনভিমত কার্য্য করিত, তবে তাহার আর নিস্তার থাকিত না। দুরন্ত নীলকর তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া ভিটা মাটি ছাড়াইত। পক্ষান্তরে নিপীড়ক

দিগের অর্থবল ও লোকবলের ক্রটি ছিলনা। সুতরাং তাহাদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ বা মোকদ্দমা করিয়া প্রতিপক্ষকেই সর্ব্বস্বান্ত ও হয়রাণ হইতে হইত। তৎকালে নীলকরদিগের এরূপ প্রাদুর্ভাব ও প্রভুত্ব হইয়াছিল, যে তাঁহারা দুই চারিটা নরহত্যা করিলেও বিনা দণ্ডে পার পাইয়া যাইতেন। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করা বা সাক্ষী দেওয়া কাহারও সাধ্য ছিল না। যদি কোন স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা করিতে বা সাক্ষী দিতে উদ্যত হইত, তবে নীলকরের লাটিয়ালেরা সেই হতভাগ্যকে ধরিয়া এক কুঠি হইতে অন্য কুঠি, অন্য কুঠি হইতে অপর কুঠি লইয়া বেড়াইত, এইরূপে যাহাকে গুম করিত, তাহার আর দুঃখের ইয়ত্তা থাকিত না, সে বহুকাল নীলকুঠির গুদামে দায়মাল হাফেজের আসামীর মত আবদ্ধ থাকিয়া নানা রূপ যন্ত্রণা উপভোগ করিত। ফলতঃ সেই সময়ে নীল কুঠিয়ালেরা বারণ প্রতাপে নিঃসপত্ন্য ভাবে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন।

কুঠি বিশেষে নীলকরদিগের নিজ আবাদ ও রাইয়তান্ প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার বিঘা জমিতে নীল বুনানি হইত। সেই সমস্ত আবাদের তত্ত্বাবধানার্থ চারি পাঁচ জন মাঠ আমিন ও বিশ ত্রিশ জন তাগাদগির নিযুক্ত থাকিত। তাগাদগির আর কিছুই নয়, তাহারা লাঠিয়াল্। আমিন ও তাগাদগিরগণই নিম্ন লোকদিগের উপর বিশেষ উৎপাত করিত। তাহারা ভদ্রলোক ও কুলকন্যাদিগকেও নীল কাটিবার জন্য ধরিয়া পথিমধ্যে টানা টানি করিত। পথিক লোকদিগের প্রতিই এই রূপ অত্যাচার অধিক হইত। নিরীহ পথিকগণ তাহাদিগকে উৎকোচ দিয়া এই অপমান হইতে অব্যাহতি পাইত। রাইয়তেরা ধান্যাদি বপনার্থ বিশেষ যত্ন সহকারে যে জমি আবাদ ও কারকিত করিত দুষ্ট আমিন ও তাগাদগিরগণ সেই জমিতে নীল বুনিবার জন্য মার্কা দিয়া যাইত। যে হতভাগ্য উৎকোচ দিয়া সেই জমি আবাদ করিতে পারিত, সেই ধান্যাদি বুনিতে সক্ষম হইত। তদ্ভিন্ন তাহাতে নীল বীজই উপ্ত হইত। দুষ্ট কর্ম্মচারীরা এইরূপ সামান্য দৌরাত্ম্য করিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিত এরূপ নয়। তাহারা দুঃখী লোকদিগের উপর জবরদস্তী করিয়া তাহাদিগের স্ত্রী পরিবারের সতীত্ব নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। বালকের পানীয় দুগ্ধ এবং গৃহস্থের সঞ্চিত আহার্য্য পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। সেই সময় প্রজাদিগের ধনপ্রাণ, মান সম্ভ্রম সমস্তই নীলকরের অনুগ্রহ নিগ্রহের অধীন ছিল। জেলার হাকিম ও মফঃসলের পুলীস নীলকরদিগের পক্ষে থাকায় তাঁহারা এইরূপ নানা অত্যাচার করিয়া এড়াইয়া যাইতেন। সবডিবিশন স্থাপিত হইলেও চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে চুয়াডাঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী লোকনাথপুর নীল কুঠির মেনেজার গ্লাসকট সাহেবের অভিনয় বোধ হয় পাঠকবর্গ বিস্মৃত হন নাই। তারপর রত্নপুরের মেনেজার আনন্দবাগ গ্রামে যে কাণ্ড করেন তাহাও বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। এই দুইটী গ্রামই নদীয়া জেলার মধ্যে; শেষোক্ত গ্রামটী মেহেরপুর সবডিবিজানের সামিল।

ক্রমে ক্রমে এই সকল ঘোরতর অত্যাচার গবর্ণমেন্টের কর্ণে উঠিল। পোষ্টাল

ডিপার্টমেন্টের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, এই সকল অত্যাচার সাধারণের গোচর করিবার জন্য 'নীলদর্পণ' নামে একখানি নাটক লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। কপোসডাঙ্গার পাদরি এক্ সোর নীলকরের দৌরাত্ম্য ঘটিত কতকগুলি বিবরণ লিখিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। পাদরি লংসাহেব দীনবন্ধু বাবুর লিখিত নীলদর্পণ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া তদানীন্তন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি সিটনকার সাহেবকে দেন। তিনি তাহা সরকারী ডাকে সর্ব্বত্র পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন। এই সমস্ত ঘটনায় তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যায়। নীলকরেরা অকারণ গ্লানি করার দোষ দিয়া লংসাহেবের নামে সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ করেন। তদানীন্তন চিফ্জষ্টিস্ পিকক ও পিইনী জজ সার মর্ডাণ্ট ওয়েল্স বিচার করিয়া লংসাহেবকে দোষী করেন। তাহাতে তাঁহার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়। ৺ কালী প্রসন্ন সিংহ অর্থ দণ্ডের টাকা দেন। সিটনকার সাহেবও সরকারী ডাকে নীলদর্পণের অনুবাদ প্রচার করার অপরাধে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৫৯ সালে মহামতি সারজান পিটার গ্রাণ্ট সাহেব বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হন। সার আস্লি ইডেন্ সাহেব তৎকালে বারাসতের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। নীল করের দৌরাত্ম্যে সহস্র সহস্র প্রজা উত্তেজিত হইয়া দলবদ্ধ রূপে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বাস স্থানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপন আপন দুর্ভাগ্যের কান্না কাঁদিতে লাগিল। হিন্দুপেট্রিয়ট পত্র ও মিশনরিগণ রাইয়তদিগের সহায় হইলেন। কোন কোন মিসনরি ও হিন্দু পেটরিয়ট্ সম্পাদক ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দুঃখী লোকদিগের আনুকূল্য করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

এই সকল কারণে সার আসলি ইডেন্ বারাসত জেলায় পুলিস দ্বারা এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দেন, যে রাইয়তদিগের অভিপ্রায় না থাকিলে কেহই বল পূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারা নীল বপনাদি করাইতে পারিবে না। এই পরওয়ানা প্রচার হইলে ক্রমে ক্রমে নীল প্রধান প্রদেশ গুলির সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হইয়া নীল বপন করা পরিত্যাগ করিল। গোসাঁই দুর্গাপুর নিবাসী ৺মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতকগুলি জমিদার এই সময়ে প্রজাদিগের বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময় নীলকরেরা মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া যে অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য।

৺মহেশ বাবুও মিথ্যা মোকদ্দমার হাত হইতে এড়াইতে পারেন নাই। মেয়ার প্রভৃতি তিন চারিজন নীলকর অশ্বারোহণে উক্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সাহেবদিগের শিক্ষিত এক দল লাঠিয়াল হঠাৎ উপস্থিত হইয়া মেয়ার সাহেবের অশ্বের পদে সড়কির আঘাত করে। সাহেবেরা মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। তদানীন্তন কুষ্টিয়ার সবডিবিশ্যনল অফিসার কোবরণ সাহেব নীলকরদিগের প্রতি পক্ষপাত করিয়া মহেশ প্রভৃতি— আসামীবর্গের অর্থ দণ্ড ও কারাদণ্ডের আজ্ঞা দেন। তৎকালে বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট

গবর্ণর রিভার্স টম্সন্ মহোদয় নদিয়ার সেশন জজ ছিলেন। তাঁহার নিকট আপীল হইল। জজসাহেব কোবরণের হুকুমই বহাল রাখিলেন। হাইকোর্টে মোশন হইল, জষ্টিস্ এফ, বি, কেম্প সাহেব বিচার করিয়া মহেশচন্দ্রকে নির্দ্দোষী দেখিয়া খালাস দেন।

রাইয়তেরা বিদ্রোহী হইলে স্থানে স্থানে সৈন্য সংরক্ষিত হইয়াছিল, লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরও এক রেজিমেণ্ট সৈন্য সঙ্গে লইয়া ইষ্টিমার যোগে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই এই বিবাদের যথার্থ অবগতি জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এক কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশন স্থানে স্থানে বৈঠক করিয়া অনেক ভদ্রলোকের সাক্ষী লইয়া তত্ত্ব নিরূপণ করিলেন। নীলকরের দৌরাত্ম্য প্রমাণীকৃত হইল, তদবধি নীলকরেরা অধিকাংশই এদেশের কুঠী ও জমিদারী বিক্রয় করিয়া চলিয়া গেলেন। যাঁহারা এখন বর্ত্তমান আছেন তাঁহারাও যে এক কালে দৌরাত্ম্য করেন না এরূপ নয়, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম।

পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন্, নীল কৃষির বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া নীলকরের অতীত দৌরাত্ম্য বর্ণনার আবশ্যক কি? একথার উত্তর এই, যাহার যে কার্য্য করিতে হয়, সে যদি সেই বিষয়েরই ইতিবৃত্ত জানিতে পারে, তাহা হইলে স্বীয় অবলম্বিত কার্য্যের দোষগুণ বুঝিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হয়। যাহা হউক এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

"এস তবে প্রিয়তমে।"

(১)

এস তবে প্রিয়তমে, রহ মোর সনে,
হৃদয়ের অধীশ্বরী হইয়া আমার।
দেখিবে কি সুখ তুমি পাইবে জীবনে,
কি সুখে বা উছলিবে চিত্ত অভাগার!

(২)

ভ্রমিব কখন দোঁহে পর্ব্বত উপরে,
কাননের তরুতলে বিশ্রাম লভিব;
নির্ঝরের জলপাত ঝর ঝর স্বরে
শুনিতে শুনিতে কভু ঘুমায়ে পড়িব।

(৩)

আনন্দে কভু বা দোঁহে ভ্রমি উপবনে,
রবির রক্তিম ছবি উষায় দেখিব;—
সুহাস কুসুম কত তুলিব যতনে,
পাখীর মধুর রব প্রদোষে শুনিব।

(৪)

কত সুখে ফুলদল দেখিও তখন
তোমার চরণ সহ খেলিবে হাসিয়া—
মনোরম মালা গাঁথি ও গলে অর্পণ
করিলে, কি সুখে মন উঠিবে মাতিয়া!

(৫)

অস্তাচলে রবি যবে করিবে গমন—
নিশানাথ নীলাম্বরে হইবে উদিত—
ধীরে ধীরে গৃহমুখে দুজনে তখন,
দেখিতে দেখিতে চন্দ্রে ফিরিব ত্বরিত।

(৬)

দীনের কুটীর, সখি, তোমারি হইবে—
যাহা কিছু আছে তাতে দরিদ্রের মত,
সামান্য ভোজনে পানে সুখী কি রহিবে?
বহু ধন কোথা হতেপাব অবিরত?

(৭)

মানসিক সুখ যত চাহ এ জীবনে
সকলি ত, প্রিয়তমে, পাইবে হেথায়;
রজনীতে সুপ্ত মম প্রেম আলিঙ্গনে
তোমারে জাগাবে পাখী ডাকিয়া উষায়।

(৮)

পাপিয়া তোমারি তরে সমস্ত যামিনী
সুমধুর স্বরসুধা করিবে বর্ষণ—
কুটীরে গবাক্ষপথে পড়িবে চাঁদিনী
তব মুখে—শশী হতে শশীতে পতন!

(৯)

সেই শোভা কখন বা দেখিয়া তখনি
আদরে অধর তব যতনে চুমিব—
হয়ত চমকি তুমি উঠিয়া অমনি
চুমিবে আমারে, সুখে জগৎ ভুলিব।

(১০)

যত সুখ চাহ তুমি পাইবে ললনে,
হৃদয়ের ভালবাসা সব তোমা দিব;
পাবে না সে সুখ লোকে পায় যাহা ধনে,
দীন হীন আমি, ধন কোথায় পাইব?

(১১)

রাখিয়াছি ভালবাসা এ হৃদয় ভরি,
চিরদিন সমভাবে তোমার কারণে;—
এ সকল সুখ যদি চাহলো সুন্দরি,
এস তবে প্রিয়তমে, রহ মোর সনে।

(১২)

(উত্তর)

এ সুখ তোমার সহ কুটীরে থাকিলে
পাই যদি, প্রিয়তম, কি করিবে ধনে?
শান্তির সহিত তব হৃদয় পাইলে
স্বর্গসুখ ভোগ হবে আমার জীবনে।

(১৩)

সাগর গামিনী নদী উজান বহিবে
তোমার এ ভালবাসা যে দিন ভুলিব;—
ভালবাসা না থাকিলে ধনে কি করিবে?
তোমার সহিত আমি কুটীরে রহিব।

বাল্মীকির 'নভেল'-শিক্ষা।

(প্রাপ্ত)

একদিন দিবাবসান সময়ে আর্য্য-কবি-গুরু বাল্মীকি জাহ্নবী-তীরে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে উপবিষ্ট হইয়া একান্তচিত্তে পরব্রহ্মের উপাসনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এক তাড়া কাগজ হস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে কবি-গুরুর ধ্যানভঙ্গ হইলে, দেখিলেন সম্মুখে বেদব্যাস। তখন মহা সমাদরে

আলিঙ্গন করিয়া স্বগত কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সহসা তাঁহার চক্ষু ব্যাসের হস্তস্থিত কাগজের উপর পতিত হইলে, বলিলেন, 'বেদব্যাস ও আবার কোন শাস্ত্রের সংগ্রহ ও বিভাগ করিতেছ?'

বেদব্যাস স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা গুণে মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন এখানি "নভেল।"

বাল্মীকি 'নভেল!' বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন "ও আবার কিরূপ শাস্ত্র? ইতি পূর্ব্বে ইহার নাম কখন তো শ্রুতিগোচর হয় নাই।"

"আজ্ঞে না, এ শাস্ত্রের এই প্রথম সৃষ্টি"

বাল্মীকি। আচ্ছা নভেল শব্দের অর্থ কি?

বেদব্যাস। ন ভেল যাহাতে; অর্থাৎ চারি প্রকার ভেল যাহাতে থাকে, তাহাকেই নভেল বলে।

বাল্মীকি। চারি শব্দ কোথা হইতে পাইলে?

ব্যাস—'ন' শব্দের অর্থ চার।

'ন' চারি ইহা কোন শাস্ত্রের অর্থ? আমরাত কোথাও পাই নাই। ন—না কিম্বা নয় ৯) এই দুই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এ অর্থ তুমি কোথায় পাইলে?

ব্যাস। আজ্ঞা, গৃহস্থাশ্রম-সংহিতার ভ্রাতৃবধূতত্ত্বে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। যেমন নবৌ।

বাল্মিকী। হাঁ বুঝিলাম, চারি প্রকার ভেল কি কি?

ব্যাস। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভুগোল। ইহা পড়িলে এই চারি বিষয়ে জ্ঞান জন্মে।

বাল্মীকি। বলিয়া যাও।

ব্যাস। ইহা পড়িলে স'হিত্যে টন্‌টনে জ্ঞান জন্মে। কাব্য বলুন, আর অলঙ্কার বলুন ইহার হাত ছাড়াইবার যো নাই। ব্যাকরণ ত পদ তলস্থ। মাঝে মাঝে টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে লইয়াও টানাটানি করিতে হয়।

বাল্মীকি। ইতিহাস ও ভূগোল কি আছে?

ব্যাস। শুনুন—ইহাতে রাজা আছেন, রাজপুত্র ও কন্যা। আছেন, রাজমন্ত্রী, সেনাপতি, দাস দাসী, চাটুকার, বড়লোক কাহারও বাদ যাইবার যো নাই; ইহাতে রাজধানী আছে, নানা দেশের কথা আছে. দেশের জল, বায়ু ও অবস্থা প্রভৃতি তন্ন তন্ন ক'রে লেখা আছে। কোন কোন স্থানে বড় লোকেই কাজ সম্পন্ন হয়, রাজা রাজড়ার দরকার হয় না। যে সময়ে যে কাজ সম্পন্ন হয় তাহার তারিখ পর্য্যন্তও সময়ে সময়ে পাওয়া যায়। ইহাতে ঝগড়া বিবাদেরও অভাব নাই। সুতরাং এগুলি ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক রহস্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

বাল্মীকি। বুঝিলাম বটে, কিন্তু ইহার গুণ কি?

ব্যাস। মহাশয় ইহার গুণ যে কত তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায়না—মহাদেব পঞ্চ মুখে ইহার গুণ গান করে কৃতকার্য্য হইতে পারেন কি না সন্দেহ। তবে মোটামুটী শুনুন—ইহাতে মানসিক শক্তি উত্তেজিত হয়, জাতীয় একতার শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ যে প্রণয় তাহার অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সভ্যতা হয়, বক্তৃতাশক্তি প্রখর হয়, এক কথা শত গুণে বাড়াইয়া বলিতে পারে, মনের সরলতা জন্মে, রাজনীতি, সমাজনীতি সমুদয় শিখিতে শিখায়, স্ত্রীস্বাধীনতার ঔৎসুক্য বাড়ায়, ধর্ম্মে মতি হয়, বীরহৃদয় প্রণয়ে মোহিত হয়,

হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে হয়, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতে হয়। মিলন ও বিচ্ছেদ হাতে হাতে, স্বর্গের সুখ, নরকের দুঃখ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেয়! এমন গুণ বিশিষ্ট শাস্ত্র আর কি আছে?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ব্যাস বিরত হইলেন।

বাল্মীকি এতক্ষণ এক মনে এই সমুদায় শুনিতেছিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণ নূতন রসে আর্দ্র হইতেছিল, তিনি যেন কোন নূতন সৃষ্টি দেখিতেছিলেন। ক্ষণেক পরে বলিলেন, "বেদব্যাস, পৃথিবীতে এমন শাস্ত্র আছে, তাহা আমি জানিতাম না, একাধারে এতগুণ থাকিতে পারে তাহা আমি এত দিন ভাবি নাই। আজি আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি যেন কোন নূতন জগতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আচ্ছা, নভেল লেখে কেমন করে?"

বেদব্যাস আরম্ভ করিলেন,——

"পাঠক! নিদাঘ কাল, ঘোর গ্রীষ্ম, বাতাসের নাম গন্ধ নাই, প্রাণ আই ঢাই করিতেছে! পৃথিবীর মুমূর্ষু দশা উপস্থিত! বেলা অবসান প্রায়, সূর্য্য অস্তাগত হইবেন এই জন্য রাগে রক্তবর্ণ, ঘোর রক্তবর্ণ, ভয়ানক রক্তিমাভা প্রকাশ করিতেছেন। রাগে গরগরে! কিন্তু কেহ তাহাকে ভয় করিল না, ফিরিয়াও দেখিল না, অবশেষে নিরুপায় হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত, অন্ধকার আসিল, কমল ফুল কাঁদিয়া উঠিল, পৃথিবী সে শোক সহ্য করিতে পারিল না, তাই মুখ খানি আঁধার হইল; শোকের তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচিয়া উঠিতেছে, হৃদয় কাঁপাইতেছে তবুও কমিতেছে না—বাড়িতেছে। এমন সময়ে পূর্ব্বাকাশে রজতবর্ণ বিভূষিত সুগোল নিটোল, প্রফুল্ল সহাস্য আনন চন্দ্র উঠিলেন—হাসিলেন। পৃথিবীর সে খেলা ভাঙ্গিল—কান্না গেল, দুঃখ ঘুচিল, হাসি উঠিল, ছুটিল। দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল, হাসির ঘটা দেখে কে? পাঠক! এমন সময়ে জয়নগরের রাজপুত্র ছাতের উপরে বসিয়া সুদীর্ঘ নলশালিনী কিরিটমালিনী সুগম্ভীর শব্দকারিণী আলবোলার উপাসনা করিতেছেন; পাঠক! আর তাঁহার পার্শ্বদেশে একটী ষোড়শবর্ষীয়া যু"——

বাল্মীকি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন,—"বেদব্যাস একটু অপেক্ষা কর, দেখি আমি নভেল রচনা করিতে পারি কিনা; তুমি এত বলিয়া গেলে আমি সব মনে রাখিতে পারিব না। এমন সুন্দর প্রণালী কখন শ্রুতি গোচর হয় নাই, ইহার লালিত্যে ও মধুরতায় কর্ণ জুড়াইল।'

বেদব্যাস মৌনাবলম্বন করিলে বাল্মীকি আরম্ভ করিলেন—

"পূর্ব্বকালে কলিঙ্গদেশে প্রতাপ নারায়ণ নামে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—"

বেদব্যাস বলিলেন, না প্রভু হইতেছে না। আপনি বুঝিতে পারেন নাই, ওরূপ করিয়া নভেল লেখে না, ঐ বিষয়টী নভেলের ভাষায় লিখিতে হইলে এইরূপ হইবে।

"পাঠক! ১২০৩ শালে প্রতাপ নারায়ণ কলিঙ্গদেশের রাজা। তাঁহার পরাক্রম অসীম, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, প্রতাপের সীমা নাই ভয়ে সকলে কম্পান্বিত, থরহরি কম্প।"

"নভেল লিখিতে হইলে মাঝে মাঝে

এক কথা দুইবার বলা চাই; যেমন উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে, থাকিয়া থাকিয়া নামিতেছে। আর মাঝে মাঝে পাঠককে ধরিয়া টানিয়া রাজবাটীর অন্দর মহলে, ভীষণ দুর্গম গহনবনে, উত্তাল তরঙ্গমালা সমাকুলিত বিক্ষোভিত সাগরবক্ষে লইয়া যাইতে হয়। যিনি ইহা না পারিবেন তাঁহার পক্ষে নভেল লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা—ঘোর বিড়ম্বনা—মূর্খতা প্রকাশ মাত্র।

বাল্মীকি বলিলেন—"এখন বুঝিলাম, বেশ বুঝিলাম, আমার হৃদগত হইয়াছে। আচ্ছা তার পর শুন। পাঠক 'রাজসভার মহা সমারোহ, মহাড়ম্বর। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট; আশ পাশ কাহারও দিকে চাহিতেছেন না, পার্শ্বদৃষ্টি নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, সম্মুখে দৃষ্টি রহিয়াছে, সরল রেখায় দৃষ্টি রহিয়াছে, সম্মুখের লোকের প্রতি তীব্রনজর রহিয়াছে।"

বেদব্যাস বলিলেন,—"হাঁ এইবার হইতেছে।"

বাল্মীকি বলিলেন,—"বাপু তোমার গুণে আজ আমি এক অপূর্ব্ব রত্ন লাভ করিলাম, দিব্যজ্ঞান জন্মিল, নভেল লিখিতে শিখিলাম। এখন হইতে আর রামায়ণে হাত দিব না, কেবল নভেল লিখিব। আর তুমি মাঝে মাঝে আসিয়া আমাকে নভেলতত্ত্ব শিখাইয়া যাইও। কি জানি বুড়ো মানুষ সকল কৌশল যদি মনে রাখিতে না পারি। এমন মহার্ঘ অমূল্যরত্ন কখন অবহেলা করিয়া ফেলিয়া রাখা উচিত নয়, আমি তোমার নভেলের পরম ভক্ত হইলাম। ভরসা করি ভবিষ্যতে লোকসমাজে ইহা সমাদর পাইবেন। বেদব্যাস প্রস্থান করিলে। বাল্মীকি নভেল লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।*

বিবাহ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এক্ষণে বাল্যবিবাহ দ্বারা স্বাস্থ্যের কিরূপ ব্যতিক্রম ঘটে তাহার আলোচনা করা যাউক। ভুবনেশ্বর বাবু বাল্য বিবাহের যে সমুদায় কাল ব্যখ্যা করিয়াছেন তন্মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ও ষষ্ঠটীর স্বাস্থ্য বিরোধী। যথা—

(২য়) "বাল্য বিবাহ হইলে দম্পতীর শারীরিক সমুচিত উন্নতি সাধন হইতে পারে না।"

(৩) "বাল্য পরিণীত দম্পতীর সন্তান সন্ততি অসম্পুষ্ট, খর্ব্ব দেহ দুর্ব্বল এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে"।

---

* নভেল উপলক্ষ করিয়া বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করা আজি কালি অনেকেরই প্রিয় কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত অভ্যস্ত নভেল লেখকগণের লেখনী হইতে যখন বিদ্রূপ যোগ্য সামগ্রী বাহির হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তবে সম্প্রতি বাঙ্গালায় নূতন রূপে কতকগুলি ঘৃণার্হ পুস্তক প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থ নিশ্চয়ই বিদ্রূপের যোগ্য। আমরা জানিনা প্রবন্ধ লেখক কোন্ শ্রেণীর নভেল লেখককে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাহা জানি না বলিয়াই এ প্রবন্ধ প্রবাহে প্রকাশিত হইল।—প্রবাহ সম্পাদক।

করিয়াছে। নির্ব্বোধ, তাহা কি আর হয়? সে সাবধানতার সময় অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। শরৎ এখন বুঝিয়াছে যে সে এখন এই প্রেমের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছে এবং তাহার জীবন ও মরণ এই প্রেমের পরিণামের উপর নির্ভর করিতেছে। তাই বালিকা কাঁদিতেছে।

দেবেন্দ্র নারায়ণ প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বালিকার মন বড়ই চিন্তা-মগ্ন, সে তাঁহার আগমন জানিতে বা বুঝিতে পারিল না। দেবেন্দ্র নারায়ণ ক্রমে আসিয়া খট্টার সমীপে দাড়াইলেন; তখনও বালিকা কিছুই জানিতে পারিল না। দেবেন্দ্র নারায়ণ বুঝিলেন, শরৎ ক্রন্দন করিতেছে। সভয়ে বলিলেন,—

'শরৎ, একি?'

শরৎ ব্যস্ততাসহ উঠিয়া বসিল। সে যে ক্রন্দন করিতেছিল তাহা লুকাইবার আর সময় বা সম্ভাবনা নাই। সে তাহা না পারিয়া দেবেন্দ্র নারায়ণের মুখের প্রতি চাহিল এবং সেই দেবকান্তির নয়নে পড়িবামাত্র আরও অধিক কাঁদিয়া ফেলিল। বালিকা দুই হস্তে বদন ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার সেই নবনীত বিনির্ম্মিত অঙ্গুলি গুলির মধ্যদিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু প্রবাহ বহিতে লাগিল। দেবেন্দ্র নিতান্ত কাতর ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—

'বল—বল শরৎ কি হইয়াছে—কেন কাঁদিতেছ?'

তখন শরতের হৃদয়ের উদ্বেজিত ভাব সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া উঠিল এবং সে কাঁদিতে কাঁদিতে বেগে আসিয়া দেবেন্দ্র নারায়ণের পাদমূলে নিপতিতা হইল এবং বলিল,—

'আমাকে ক্ষমা করুন। আমি দুঃখিনী আমি নিরাশ্রয়া আমাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। আমি তাহার মত ব্যবহার করিতে পারি নাই, আমাকে ক্ষমা করুন—আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না।'

দেবেন্দ্র নারায়ণ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন; অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে শরৎকুমারীকে উঠাইয়া বলিলেন,—

'শরৎ তোমার দোষ? তোমার কোন কার্য্যেই তো আমি দোষ দেখিতে পাই না। তোমার ব্যবহার অপূর্ব্ব মধুরতায় মাখা স্বর্গীয় পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। কেন শরৎ, —কেন তুমি কাঁদিতেছ? তোমার মনে আজি কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। বল আমাকে, আমি প্রতিকারের চেষ্টা করি। দোষের কথা বলিওনা—তোমার চরিত্রে কোন দোষ সম্ভাবনার অতীত কথা।'

শরৎ বলিল,—

"এবার আমার দোষ ঘটিয়াছে; হে হৃদয়-দেবতা, আজি তোমার নিকট আমি অপরাধিনী হইয়াছি। দেবেন্দ্র বাবু, হৃদয় সর্ব্বস্ব, আমি আপনাকে প্রাণের প্রাণ হইতে ভাল বাসিয়াছি! এ পিতৃ মাতৃ-হীনা, নিরাশ্রয়া অভাগিনীর এ দুরাশা অমার্জ্জনীয়। করুণাময় দেবেন্দ্র বাবু, আপনি আমাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন, আজি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি যথাসাধ্য যত্নে হৃদয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সে তাহা বুঝে নাই; আমি প্রাণকে বারম্বার এ দুরাশার পথ হইতে ফিরিতে বলিয়াছি কিন্তু কেহই আমার কথা শুনে নাই। আমি ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই—আর ফিরিতে সাধ্য নাই। আমার

বিষম অপরাধ হইয়াছে বটে কিন্তু লুকান অপরাধ বড় ভয়ানক জানিয়া, হে করুণা-ময়, আজি মুক্তকণ্ঠে আমার অপরাধের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলাম। দুঃখিনীর আশ্রয়, বিপন্নবান্ধব দেবেন্দ্র বাবু, আমি আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি; ভাবিবেন না যে আমি আপনার নিকট হইতে সমান পরিমাণ ভাল বাসার আশা করি। না না দেবেন্দ্র বাবু, আমার উন্মত্ত দুরাশা তত কাণ্ডজ্ঞানহীন নহে। আমার আশা নিতান্ত সীমাবদ্ধ—নিতান্ত অল্পে সন্তুষ্ট। আপনাকে দেখিতে পাইলে আমার আশার পূর্ণ তৃপ্তি। দেবেন্দ্র বাবু, আপনি বিবাহ করিয়া সুখের সংসার পরমসুখে কাটাইতে থাকিবেন। আমি দুঃখিনী কেবল নিকটে থাকিয়া আপনাকে দেখিব, আপনার সুখময় জীবন দেখিব। তাহাতেই আমার আশার চরম তৃপ্তি হইবে। তাহার অপেক্ষা অধিকতর সুখ, আমি আর জানি না—চাহি না। দেবেন্দ্র বাবু, দয়াময়, আমার যাহা অপরাধ তাহা আপনাকে জানাইলাম। আপনার চরণে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেছি—আমাকে গৃহবহিষ্কৃতা করিয়া দিবেন না, আমাকে ক্ষমা করুন।”

দেবেন্দ্র নাথ নীরবে সমস্ত কথা শুনিতে ছিলেন। তাঁহাতে তখন তিনি নাই। তিনি কল্পনায় শরৎকুমারীর প্রণয় লাভ করিয়া যে যে সুখময় বিষয়ের ধ্যান ও চিন্তন করিয়াছিলেন, যে শরৎকুমারীকে স্বীয় হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিয়া তিনি প্রতিনিয়ত প্রেমার্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন, এবং আপনাকে অত্যন্ত হীন ও শরৎকুমারীকে নিতান্ত উচ্চ জ্ঞানে যিনি শরতের সম্মুখে কদাচ প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সাহসী হন নাই, আজি সেই শরৎকুমারী, সংসারের সার সম্পত্তি শরৎকুমারী, তাঁহারই পদ নিম্নে—তাঁহার প্রেমার্থিনী। কি সৌভাগ্য! দেবেন্দ্র তাহাই ভাবিতেছেন। শরতের বদনবিনির্গত এক একটী কথা তাঁহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সুখময় রাজ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি সে সুখের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বাহ্যজ্ঞান বিরোহিত হইয়া দেবেন্দ্র নারায়ণ সেই আশার অগোচর অজ্ঞাত পূর্ব্ব সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারীর কথা সমাপ্ত হইল, তখন দেবেন্দ্রর চৈতন্য হইল। তখন তিনি সযত্নে শরৎকুমারীকে তুলিয়া হৃদয়ে লইলেন। বলিলেন,—

“শরৎকুমারী, হৃদয়েশ্বরি! তুমি আমার পদনিম্নে! আমি শয়নে স্বপ্নে, ভ্রমণে ও বিরামে নিয়ত তোমাকে বই আর জানি না। দিবারাত্রি কেবল তোমার চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা আমার চিত্ত কখন অধিকার করিতে পারে না। কেমন করিয়া তোমাকে পাইব, কিসে তুমি সন্তুষ্ট হইবে, কি উপায়ে তুমি আমাকে অধিক ভাল বাসিবে, এই আলোচনায় আমি নিরন্তর নিযুক্ত। সেই আমার হৃদয়ের দেবী, চিন্তার আশ্রয়, কল্পনার বিষয় শরৎকুমারী অদ্য অতুল প্রেম পূর্ণ হৃদয় লইয়া, আমার নিকট—আমার পদনিম্নে। প্রিয়তমে, আমার হৃদয় সুখে ও আনন্দে সংসার ছাড়িয়া দিয়াছে—কথায় আমি হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষম’—

এই বলিয়া দেবেন্দ্র নারায়ণ স্বীয় বক্ষমধ্যস্থ শরৎকুমারীর বদনের প্রতি চাহিলেন দেখিলেন সেই মুদিত নয়না সুন্দরীর নয়ন প্রান্ত হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বহিয়া

তাঁহার বক্ষস্থল ভাসাইতেছে। শরত কাঁদিতেছে—আনন্দে! এত সুখ, এত আনন্দ সে তো আশা করে নাই। আশার অনেক অতীত আকাঙ্ক্ষার অনেক অধিক সুখ তাহার আয়ত্তগত। আজি সেই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়া সর্ব্বগুণাধার দেবেন্দ্র নারায়ণ তাহাকে, সেই দুঃখিনী, অভাগিনীকে হৃদয় ভরিয়া ভাল বাসিয়াছেন। সে সে হৃদয়ের কণিকামাত্র স্থানও প্রার্থনা করিতে সাহস করে নাই, সেই হৃদয়ের আজি সে রাজ্ঞী হইতেছে, আজি সেই দেবহৃদয়ে তাহারই পূর্ণ অধিকার। দেবেন্দ্র নারায়ণ আবার বলিলেন,—

'হৃদয়েশ্বরি শরৎ! দেবী! আমি মানব—অতি ক্ষুদ্র, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর মানব; তোমার সহিত আমার তুলনা কদাচ সম্ভব নহে। তবে কেমন করিয়া শরৎ তোমার দয়ার—তোমার অনুগ্রহের পরিশোধ দিব? আমার হৃদয় আমি তোমারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছি—কিন্তু তাহা তো কদাচ তোমার গুণের অনুরূপ পুরস্কার নহে। হৃদয় দান করাই তো যথেষ্ট নহে—আমি তোমাকে শরৎ, অর্চ্চনা করিয়া সুখী হই। এ ক্ষুদ্র দেবেন্দ্র নারায়ণের ক্ষুদ্র দেহ, মন, প্রাণ শরৎকুমারী তোমারই হস্তে নির্ভর করিলাম,—তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।'

শরতের চিত্ত তখন অপার্থিব সুখ চিন্তায় নিমগ্ন। তাহার হৃদয়ে তখন কুসুমের সৌরভ, বসন্তের বায়ু, স্বর্গের জ্যোতি, সাগরের গাম্ভীর্য্য, শূন্যের অসীমতা, ভাবের নীরবতা, কল্পনার সূক্ষ্মতা, তাড়িতের ক্ষিপ্রতা, এবং হিমাদ্রির উচ্চতা সকলই সমভাবে বিরাজ করিতেছে। এই সর্ব্ববিধ ব্যাপারের সংমিশ্রনে সে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় শান্তির আবির্ভাব হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে সমশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইলে পদার্থ যেমন একস্থানে স্থির হইয়া থাকে, শরৎকুমারীর হৃদয় অধুনা সেইরূপ স্থির ও নিশ্চল। দেবেন্দ্র নারায়ণ আবার বলিলেন।

'বল দেবী আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া সন্তুষ্ট হইবে। এই নগণ্য ক্ষুদ্র হৃদয়কে তুমি ঘৃণা করিবে না? শরৎকুমারী, স্বর্গবালা, তোমার হৃদয়ে স্থান পাইতে আমার সাহস নাই! তুমি দয়া করিয়া এই অনুপযুক্ত পাত্রে হৃদয় দিবে কি?'

মুদিতনয়না শরৎকুমারী একবার নয়ন মেলিয়া চাহিল। সেই চক্ষুতে কত কথা, কত হাস্য, কত আনন্দই ব্যক্ত করিল! ভাষার সাহায্যে কথার দ্বার দিয়া তাহার অপেক্ষা অধিক ভাব বাহির হইতে পারিত কি?

সেই দিন সেই স্থানে এই যুবক যুবতী হৃদয়ের বিনিময় করিলেন এবং পরস্পরের নিকট আত্মোৎসর্গের বিধান করিলেন। সংক্ষেপতঃ সেই দিন তাঁহাদের হৃদয়ের বিবাহ হইয়া গেল। সমাজে যাহাকে বিবাহ বলে তাহা দেহের বিবাহ। হৃদয়ের বিবাহ এ পতিত সমাজে নিতান্ত দুর্লভ সামগ্রী। এ স্থলে সেই আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল।

বালিকে, শরৎকুমারি! আজি বহুকাল পরে তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, বল দেখি, এ সংসারে সুখের কি দুঃখের রাজ্য? আজি আর তোমার মরিতে সাধ যায় কি? এ সংসারকে বিষাদের পুরী বলিয়া এখন তোমার মনে হয় কি? তোমাকে তখনও বলিয়া ছিলাম, এখনও আবার বলিতেছি, এ বিপদ-ব্যাধি-বিদলিত জীবনে ধৈর্য্যই একমাত্র ঔষধ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা ৮ টা। সুবৃহৎ রায় ভবনের একতম নিভৃত প্রকোষ্ঠে হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় ও একজন সন্ন্যাসী বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। হেমেন্দ্র নারায়ণের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁহার প্রশস্ত ললাট বিশাল উরস্ ও সুতীক্ষ্ণ নয়ন দ্বয় দেখিলেই তাঁহাকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তির আধার বলিয়া বোধ হয়। হেমেন্দ্রের বয়স যতই ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ সীমার নিকটস্থ হইতেছে ততই স্বভাবতঃ স্পৃহা শূন্য হেমেন্দ্র নারায়ণ ধর্ম্মালোচনায় অধিকতর নিবিষ্টমনা হইয়া উঠিতেছেন। বিশেষত; তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বিষয় ব্যাপার এরূপ সুনির্ব্বাহিত করিতে সক্ষম হইয়া উঠিয়াছেন যে তাঁহার এক্ষণে তৎসংক্রান্ত চিন্তার কোনই প্রয়োজন নাই।

যে সন্ন্যাসী গৃহ মধ্যে বসিয়া আছেন হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। হেমেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে বড় ভাল বাসেন বলিয়া সন্ন্যাসী সময়ে সময়ে এ অঞ্চলে আসিলেই হেমেন্দ্র-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। আজি চারিদিন হইল তিনি ঐরূপ উপলক্ষে এস্থলে সমাগত হইয়াছেন। হেমেন্দ্র এ কয় দিন সন্ন্যাসীর সহিত নিরন্তর নানাবিধ সামাজিক, পারত্রিক, ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় পরমানন্দে কাল কাটাইতেছেন।

তাঁহারা উক্তরূপ প্রসঙ্গ বিশেষের আলোচনায় রত রহিয়াছেন, এমন সময় ধীরে ধীরে দেবেন্দ্র নারায়ণ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হেমেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন,—

“আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহ?’

দেবেন্দ্র নারায়ণ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন,—

‘আজ্ঞে না।’

তাহার পর দেবেন্দ্র নারায়ণ ভক্তি ভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া সন্নিহিত আসন বিশেষে উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে স্নেহময় ভাবে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন,—

‘আমাদের এই নীরস আলাপ শুনিতে তোমার অনুরাগ হয়?’

দেবেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন,—

‘আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আপনাদের কথাবার্ত্তা অত্যন্ত সরস বলিয়াই বোধ হয়।’

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,—

‘পিতার উপযুক্ত সন্তান।’

হেমেন্দ্র নারায়ণ জিজ্ঞাসিলেন,—

‘হঁা—তাহার পর আপনি যে বলিতেছিলেন, সমাজ যাহা পাপ বলিয়া মনে করে তাহা পাপ বলিয়া ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বেশ কথা। কিন্তু সকল ঘটনায় এ কথা কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? যে স্থানে যুক্তি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সমাজ না জানিয়া কোন ব্যক্তিকে পাপী বলিয়া স্থির করিতেছে, সে স্থলে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সেই নিষ্পাপী ব্যক্তিকে পুনরায় গ্রহণ করা উচিত নহে কি?’

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

“সমাজ যদি ভ্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি সমাজের সেই ভ্রান্তি দূর

করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে পারেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে সমাজ কিছুতেই বুঝিবেনা, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই সেই সমাজের মতে চলিতে বাধ্য।'

হেমেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন,—

'আপনাকে একটী দৃষ্টান্ত দেখাই। আমার এই বাটীতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা গুণবতী ও রূপবতী একটি বালিকা আছে। ঐ বালিকার বিধবা মাতা বহুদিন হইতে নিরুদ্দেশ। লোকে অনুমান করে সে ব্যভিচারিণী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। এ কথার কোনই প্রমাণ নাই। আপনি কি বলেন এই অমূলক কথার জন্য ঐ কন্যা চিরদিন সমাজে পতিতা থাকিবে?'

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

'অবশ্যই থাকিবে। সামাজিক নিয়ম নিতান্ত কঠোর হইলেও তাহার অন্যথাচরণ করা পাপ।'

হেমেন্দ্র নারায়ণ আবার বলিলেন,—

'ঐ কন্যা যেরূপ বিদ্যাবতী, গুণবতী তাহাতে তাঁহাকে পুত্রবধূ করিতে পাইলে আমি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করি। আমি যদি তাহাই করি তাহাতে দোষ কি?'

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

'তাহাতে মহাদোষ। আপনার সামাজিক শাসনের অন্যথাচরণ করা হইতেছে।'

হেমেন্দ্র। আমি যদি চেষ্টা করিয়া সমাজকে বুঝাইয়া দিই যে, এ বিষয়ের সমাজ যাহা স্থির করিয়াছে, তাহা ভুল।

সন্ন্যাসী। তাহা করিতে পারিলে, এ কার্য্যে আর পাপ নাই।

হেমেন্দ্র। আর যদি আমার সমাজের মধ্যে এমন ক্ষমতা থাকে যে, আমি যাহা করিব, তাহাই সমাজে নিয়ম বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা হইলে?

সন্ন্যাসী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

'তাহা হইলেও পাপ নাই। আমার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে সমাজে বাস করিতে হইবে তাহার নিয়মাদি, সঙ্গত বা অসঙ্গত হইলেও অবশ্য প্রতিপাল্য। সমাজ মধ্যে যদি এমন ব্যক্তি থাকে যে ইচ্ছা মতে সে সমাজের নিয়মকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, সে ব্যক্তি সে সমাজের নেতা। সে ব্যক্তি সৎবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য করে তাহা নিন্দনীয় বা পাপ নহে।'

হেমেন্দ্র নারায়ণ চুপ করিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী আবার বলিতে লাগিলেন,—

'কিন্তু ঐরূপ সামাজিক নেতা অসাধারণ গুণবান হওয়া আবশ্যক। সে ব্যক্তি যদি কেবল সম্পত্তিশালী বা প্রতাপান্বিত হওয়ায় লোকে তাহাকে ভয় প্রযুক্ত মান্য করে তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তির নেতৃত্বে সমাজের ঘোরানিষ্টের সম্ভাবনা। যথেষ্ট জ্ঞান, বিদ্যা ও ভূয়োদর্শন—সে ব্যক্তির এ সকলই থাকা আবশ্যক। নচেৎ সে জোর করিয়া নানাবিধ স্বেচ্ছানুগত জঘন্য ক্রিয়া সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে এবং সে জন্য সমাজের অধঃপতন অপরিহার্য্য। সমাজের নেতা হওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। আপনার ন্যায় ব্যক্তি সামাজের নেতা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু এরূপ লোক তো সচরাচর মিলিবার কথা নহে।'

তাঁহারা যখন এবম্বিধ বিচারে নিমগ্ন সেই সময় দ্বার সমীপে একজন ভৃত্য আ-

সিয়া উঁকি দিল। তাহাকে দেখিয়া হেমেন্দ্র নারায়ণ জিজ্ঞাসিলেন,—

'কাহাকে ডাক।'

ভৃত্য বলিল,—

'আজ্ঞে—রাজা বাবু কে।'

তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত। তিনি সন্ন্যাসীর সহিত পিতার কথাবার্ত্তা শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিলেন যে, শরতের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, ইহা তাঁহার পিতার নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। সেই দেবী—যাঁহাকে তিনি হৃদয় বেদীতে বসাইয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই দেবী তাঁহার পিতার ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবেন এ অচিন্তিত পূর্ব্ব সৌভাগ্য এত সহজে—এত শীঘ্র উপস্থিত হইবে, তাহা তিনি একবারও মনে করেন নাই। তিনি শরৎকুমারীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া এই মহানন্দের সংবাদ তাঁহার গোচর করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন।

সেই ভৃত্য দ্বার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল,—

'কলিকাতা হইতে বড় জরুরি পত্র আসিয়াছে, দেওয়ানজি আপনাকে জানাইতে বলিলেন।'

দেবেন্দ্র উত্তর দিলেন,—

'আমি শীঘ্রই যাইতেছি।'

আবার ব্যাঘাত—সম্মুখে রাধারমণ প্রণাম করিয়া উপস্থিত।

দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—

'রাধারমণ কি সংবাদ? ভাল আছতো।'

রাধারমণ বলিল,—

'সংবাদ অনেক। দয়া করিয়া শুনুন্।'

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

'একটু পরে। আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি। এখনই আসিতেছি।'

রাধারমণ বলিল,—

'আজ্ঞে আমার কথা—সর্ব্বনাশের কথা,—জীবন মরণের কথা। এখনই শুনিলে ভাল হয়।'

দেবেন্দ্র বলিলেন,—

'বটে? সর্ব্বনাশের কথা! তবে তো তোমার কথা অগ্রেই শুনিতে হইতেছে।'

এই বলিয়া পার্শ্বস্থ একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাধারমণ তাঁহার অনুগমন করিল।

ক্রমশঃ

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান শ্রীবৃদ্ধি কর্ত্তা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথমভাগ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কোন কোন সমালোচক ঐ প্রথমভাগ উইল্‌সন্‌স্‌ 'হিন্দু সেক্ট্‌স্‌' নামক ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ মাত্র বলিয়া আপনাদের অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। উইলসন্‌স্‌ 'হিন্দু সেক্ট্‌স্‌' নামক পুস্তকের

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত। কলিকাতা, ১১নং সিমলাষ্ট্রীট গৃহে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮৯। মূল্য ৩।০ সাড়ে তিন টাকা।

এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের ভারত-বর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের অবলম্বনীয়বিষয়। এক বিষয়ের একতা হেতু উভয় পুস্তকের প্রসঙ্গ সমূহের কিয়ৎপরিমাণে সমতা অপরিহার্য্য। তাহার পরে আরও বিবেচনা করা আবশ্যক যে, উক্ত প্রথমভাগে শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু যে সুবিস্তীর্ণ উপক্রমণিকা সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন তাহা উইলসন্ সাহেবের গ্রন্থে নাই। যাঁহারা বঙ্গভাষা ও ইংরাজি ভাষা উভয়েরই সংবাদ রাখিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ উপক্রমণিকাংশ অমূল্য বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রত্যুত ঐ উপক্রমণিকা ঐ গ্রন্থকে অত্যুপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ প্রথম ভাগ অপেক্ষাও সুবৃহৎ গ্রন্থ। ইহার পত্র সংখ্যা ছয় শত চৌদ্দ। এই ছয় শত চৌদ্দ পৃষ্ঠার মধ্যে দুই শত বিরাশী পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা। অবশিষ্ট ভাগ মূল গ্রন্থ ও পরিশিষ্টাদির দ্বারা অধিকৃত। এই বহ্বায়ত গ্রন্থ অক্ষয় বাবু যেরূপ শারীরিক অবস্থায় সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয় এবং তাঁহার ন্যায় মনস্বী ব্যক্তির এবম্বিধ অবস্থা স্মরণ করিয়া হৃদয় ব্যথিত ও কাতর হইয়া উঠে। সমালোচ্য গ্রন্থের আলোচনায় অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে অক্ষয় বাবু কিরূপ শরীর লইয়া কিরূপে এই সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং তাহার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সুদীর্ঘ হইলেও আমরা এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

'এবার এই পর্য্যন্ত। আর চলিয়া উঠিতেছে না। এখন হিন্দু নামে বিখ্যাত ও তদ্ভিন্ন দূর-দূরান্ত-বাসী ম্লেচ্ছ বলিয়া পরিগণিত বিভিন্ন জাতীয় লোকের যে অপরিজ্ঞেয়কল্প আর্য্য-বংশীয় আদিম পুরুষের, পরস্পর একত্র সংসৃষ্ট থাকিয়া, দ্যৌ, বরুণ, উষা প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তু ও কাল-বিভাগ, বিশেষকে সচেতন দেবতা জ্ঞান পূর্ব্বক, তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন; যাঁহারা পূর্ব্ব নিবাস পরিত্যাগ ও ভারতবর্ষ প্রবেশ পূর্ব্বক অত্রত্য জল, বায়ু, সূর্য্য, নক্ষত্র পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলাদির অসামান্য প্রভাব-শালিত্ব ও ঝঞ্ঝাবাত, শিলাবৃষ্টি, বজ্রধ্বনি, পর্ব্বতাকার সমুদ্র-তরঙ্গ, প্রখর-রশ্মি প্রদীপ্ত নিদাঘ-মধ্যাহ্ন ইত্যাদি অত্যুৎকট নৈসর্গিক ব্যাপার সমুদায়-দর্শনে ভীত, চমৎকৃত ও অভিভূত হইয়া ঐ সমস্ত প্রভাবশালী অচেতন প্রাকৃতিক পদার্থকে সচেতন জ্ঞান করিয়া তাঁহাদেরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং তদীয় স্বরূপে স্বকীয় অর্থাৎ মানব-জাতীয় শারীরিক ও মানসিক গুণ আরোপণ করিয়া তাঁহাদিগকেই আপনাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ও দণ্ড পুরস্কারের বিধান-কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন; যাঁহারা পূর্ব্বকালীন আর্য্য-বংশীয় ভারতবর্ষীয়দিগকে জটিল কর্ম্ম-জালে জড়িত ও দুশ্ছেদ্য কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ করিয়া তদীয় জ্ঞান-পদবীতে দুর্ল্লঙ্ঘ্য কণ্টকাবলি রোপণ পূর্ব্বক উত্তরকালীন পণ্ডিতগণের তিরস্কার-ভাজন এবং বিশেষতঃ গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধাদি প্রচলিত করিয়া স্ব সম্প্রদায়ীদিগকে চার্ব্বাকগণের বিষাক্ত বাণ ও কঠিন কষাঘাত সহ্য করিবার ভার অর্পণ করিয়া যান; যাঁহারা সমাজ-বিরুদ্ধ নাস্তিকতাদি প্রবর্ত্তন বা প্রচার করিয়া সেই সমাজের পূজাস্পদ ও শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন, ঈশ্বরের অধীনত্ব

অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়াও কুহকময় বেদনিচয়ের চরণ-পাদুকার দাসানুদাস বলিয়া আপনাদের পরিচয় দান করিয়াছেন এবং মানবকুলের চিরাকাঙ্ক্ষিত অথচ মানব-বুদ্ধির নিতান্ত অগম্য বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান অর্থাৎ সুখ-স্বর্গের প্রকৃত পথ অন্বেষণ করিতে গিয়া নানাপ্রকার কুটিল ও জটিল মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদের কল্পনা-শক্তি প্রসারণ করিয়া স্বভাব-লব্ধ বুদ্ধি-প্রভাবকে অনেকাংশ স্বপ্ন-কল্পিত বা মরীচিকা-দৃষ্ট পদার্থ গ্রহণ-চেষ্টার ন্যায় বিফল করিয়া গিয়াছেন ও বিচার-বলে পরস্পর পরস্পরের মত অনেকাংশে অসিদ্ধ বা মিথ্যাভূত করিয়া তুলিয়াছেন; যাঁহারা অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সদসৎ ও বাস্তবাবাস্তব অশেষবিধ উপাখ্যান সঙ্কলন এবং কাব্য, ইতিহাস ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র একত্র সম্মিলন করিয়া বহুবিধ বিজাতীয় বিষয়ের এক একটী সুচারু সুবৃহৎ বাক্য-স্তূপ প্রস্তুত করিয়া যান; যে সমস্ত কপট ব্যাস পুরাতন পুরাণ শব্দ অবলম্বন দ্বারা নূতন বিষয় কল্পনা বা পুরাতন বিষয়ের নূতন বেশ-বিন্যাস পূর্ব্বক উল্লিখিত কবিগণের ন্যায় একটী অবেদ-পরিচিত লোক-রঞ্জন ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচারণ-উদ্দেশে পূর্ব্ব-পুরুষদের পূজিত প্রাচীন দেবগণকে তদীয় উচ্চ পদ হইতে অবনত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আপনাদের অভিমত অভিনব দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করেন ও যাঁহাদের সম্প্রদায়-ভুক্ত শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা ব্যাসাসনে উপবেশন ও বাক্‌পটুতা, স্বর-মাধুর্য্য ও সঙ্গীত-গুণ-প্রভাবে শ্রোতৃগণের অন্তঃকরণ হরণ করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রণয়াস্পদ এবং কেহ কখনও বা ব্যবহারদোষে অতিমাত্র অশ্রদ্ধারও আস্পদ হইয়া থাকেন; যে সমস্ত চির-দূষিত অপবিত্র আমোদ-ব্যাপার জন-সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইয়া আসিয়াছে, যাঁহারা ধর্ম্মচ্ছলে সেই সমস্ত অধর্ম্মময় আমোদ-তরঙ্গে শরীর ও মন সুখে সন্তরিত বা একেবারে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছেন ও বিশেষতঃ এদেশে বিলাতীয় পান-দোষ প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে, যাঁহারা বাঙ্গালা কবিগণের উপমা-সামগ্রী ফাল্গুদীর মত অন্তঃশিল সুরসরিৎ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন; যে সমস্ত লোক-পূজ্য ভূদেব শিক্ষাগুরু বিচার-স্থলে শিষ্টাচার লঙ্ঘন বিষয়ে অশিক্ষিত দুর্নীত সম্প্রদায়কে পরাভব করেন, এমন কি, শিথিল বা স্খলিতা-কচ্ছ হইয়া নিতম্ব-দেশ পরিঘর্ষণ বা কখন কখন হঠাৎ উল্লম্ফন, কটু কাটব্য উচ্চারণ ও হট্ট কোলাহল অতিক্রম পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া মহাব্যাপকতা সহকারে মল্লযুদ্ধের ভাব প্রদর্শন করিতে থাকেন, সেই সমুদায়েরই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও মত-প্রণালী এবং তৎ-কর্ত্তৃক রচিত, সঙ্কলিত বা অবলম্বিত শাস্ত্রের সংক্ষেপে কিছু কিছু প্রসঙ্গ করা হইয়াছে।

* * * * *

'শরীরের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় এত দূর চলিল তাহা কি বলিব? না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থ-শ্রবণ কোনরূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্যেই আমি সমর্থ নই। ইহার কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত মাত্রেই মানসিক কষ্ট হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় এভাগের কি রচনা, কি শোধন, কি মুদ্রাঙ্কন যে কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটি বারও নেত্রপাত করিতে পারি নাই। অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ় ভাব-সম্বলিত

চিন্তা-প্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ক্ষয় করিতেছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া, অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে চিন্তা-স্রোত মন্দীভূত হয় না।" যতক্ষণ সে সমুদায় এবং যাহা কিছু অন্যরূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপি-বদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ মস্তক মধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে, যান-বাহন দ্বারা দূরস্থিত বন্ধু-বিশেষের সমীপে গমন পূর্ব্বক লিখিতে অনুরোধ করি। যাহার বত্ব ণত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, অপার্য্যমানে কখন কখন এরূপ অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। অর্দ্ধ রাত্রেও নিদ্রা-কাতর কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া কতবার কত বিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া সে রজনীতে নিদ্রার সম্ভাবনা থাকিত না। মনোমধ্যে এরূপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, তাহার চিন্তন ও আন্দোলনেও কষ্ট, নিজে দূরে থাকুক, অন্য দ্বারা তাহা লিপি-বদ্ধ করাইতেও কষ্ট, এবং যে পর্য্যন্ত লিপি-বদ্ধ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা-নিবারণ-উদ্দেশেই লিপি-বদ্ধ করাইতে হইয়াছে এবং ইহাতেই অতীব অল্পে অল্পে পুস্তকখানি একরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। কোন বিষয়ের প্রমাণ-প্রয়োগ-উদ্দেশে কোন গ্রন্থার্থ অবগত হইবার প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতে হয়। তাহাই কি যে সে দিনে ও যে সে সময়ে শুনিতে পারি? না সমুচিত মনঃসংযোগ করিতেই সমর্থ হই? শরীরের অবস্থানুসারে দিন বিশেষে ও সময়-বিশেষে ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে হইয়াছে। এইরূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পংক্তি, কখন দুই চারি পংক্তি, কখন দুই চারিটি বা দুই একটি শব্দমাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়। সেই সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সমুদায় বাক্য যে প্রথমে যথাস্থানে পর পর লিখিত হয়, পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না। কোন্ বাক্যটি কোন্ স্থানে বা কোন্ বাক্যের পর বিনিবেশিত হইবে, উক্তরূপে লিপি-বদ্ধ করাইবার সময় তাহা কিছুই স্থির থাকে না। সে সমুদায় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা হয়, সেই দিনই বিভ্রাট্। পূর্ব্বোক্ত রূপে, শরীরের অবস্থানুসারে দিন-বিশেষে ও সময়-বিশেষে তদর্থ ঔষধ-বিশেষ সেবন ও অন্য অন্য নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া বহু কষ্টে সেটি কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি।

* * * *

"এ অবস্থায় গ্রন্থ-প্রণয়নের অভিলাষ করা অনুচিত ও অসঙ্গত কার্য্য। ওদিকে চির জীবন নিশ্চেষ্ট মনে কাল হরণ করাও অসহ্য। তাহা স্থির ভাবে মনে করাও দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয়। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া এই গ্রন্থপ্রকাশের অভিলাষ করি এবং পূর্ব্ব-লিখিত কিয়দংশ বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।

যে শুভকর বিষয়ে একবার কৃত সঙ্কল্প হইয়াছি, পার্য্যমানে দূরে থাকুক, অপার্য্যমানেও তাহা পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অতীব কষ্টের বিষয়। এই নিমিত্তই এরূপ করিয়া কার্য্যসাধন করিতে হইয়াছে। যখন গুরুতর কার্য্যে মনঃ সংযোগ করিবার পথ একবারেই রুদ্ধ হইল, মনোহর পূর্ব্ব-বাসনা সমুদায় স্বপ্ন কল্পিত ব্যাপার হইয়া গেল, এবং অনেক বৎসর একাদিক্রমে নানাপ্রকার চেষ্টা পাইয়াও যখন রোগের শান্তি না হইল, তখন কেবল ঔষধ-সেবন ও পথ্য গ্রহণ দ্বারা রোগের সেবায় জীবনক্ষেপ করা অপেক্ষায় এরূপ কষ্ট স্বীকারও তৃপ্তির বিষয়। আমার পূর্ব্ব অধ্যবসায়-বৃত্তির নষ্টাবশেষ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা যদি এইরূপে কিছু কার্য্যকর হইয়া থাকে, তবে গুরুতর কল্যাণকর কার্য্যসাধনের নিতান্ত অনুপযুক্ত এই বিষম শারীরিক দুরবস্থায় তাহাও আমাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

* * * * *

"এই সমস্ত অঙ্গীকার করিয়াও, যদি জনসমাজ-বিশেষের কোন অন্তর্ভূত মানসিক রোগের বিষয় কিছু নূতন জানিতে পারিয়া থাকি, তবে সেটি আমার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় কি কতদূর হইল কি বলিব? আমার আর বলিবার কথা নাই। সকলই শোচনার বিষয়। অন্তঃকরণ বার্দ্ধক্য-দশায়ও নানাপ্রকার শুভকর বিষয়ে যৌবনোচিত প্রবল অনুরাগ-প্রভাবে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, কিন্তু শরীর যৌবনাবধিই বার্দ্ধক্যকাল অপেক্ষা নিস্তেজ হইয়া চিরদিন মৃতকল্প হইয়া রহিল! আমার জরা-জীর্ণ কম্পমান লেখনীকে নিজ হস্তে আর একটিবারও ধারণ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিলাম না! আমার একটি পরম বন্ধু একবার আক্ষেপ করিয়া বলেন, যাহার হস্ত পুস্তকালঙ্কারে অলঙ্কৃত না হইয়া এক দণ্ড কাল অতীত হইত না, এখন বৎসর বৎসর ও যুগ যুগান্তর তদ্ব্যতিরেকে অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে! ষোড়শ বা সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে রীতিমত শিক্ষারম্ভ করিয়া, পঁইত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইতেই, দুর্জ্জয় রোগ-প্রভাবে চির দিনের মত অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম। যে সময়ে মনোমত কার্য্য-সাধনের কেবল উদ্যোগ পাইতেছিলাম, সেই সময়ে চিরজীবনের মত গুরু লঘু সকল কর্ম্মেই অক্ষম হইলাম। তদবধি আমারবাসনারূপ বৃক্ষ-বাটিকায় আর না পুষ্প না ফল কিছুই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিল না; শাখা পল্লবাদি সমস্ত শুষ্ক হইয়া গেল। কোথায় বা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান বিশেষের বিশেষরূপ অনুশীলন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অভিনব তত্ত্বানুসন্ধান-চেষ্টা, কোথায় বা ভূমণ্ডল অথবা তদীয় ভূরি ভাগ সন্দর্শন-বাসনায় এক এক বারে বহুবিধ বর্ব্বর-নিবাস, সুপ্রাচীন মানব-কীর্ত্তি এবং অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সামগ্রী ও অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারাদি বিশিষ্ট বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিভ্রমণ, কোথায় বা আপনাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকৃতির যুগপৎ সমোন্নতি-সাধন-ব্রতে ব্রতী স্বদেশীয় সম্প্রদায়-বিশেষ-প্রবর্ত্তনের অভিলাষ এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন ও ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন ও স্বদেশ–সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার হিতানুষ্ঠান-কামনা রহিল! সকলই বাষ্পীভূত

হইয়া গেল! সকল বাসনাই নির্ম্মূল হইল! অঙ্কুরেই আঘাত ঘটিল! আমার হৃদয়স্থ পুষ্পোদ্যানটি একবারেই শুষ্ক হইয়া গেল!”

এরূপ কাতর, রুগ্ন ও ভগ্ন শরীর লইয়া কোন প্রকার কার্য্য করাই অসম্ভব। কিন্তু অক্ষয় বাবু এই অবস্থায়ও গভীর চিন্তাপূর্ণ, অতি সুশৃঙ্খল বিন্যস্ত যুক্তি ও তর্কপূর্ণ এবং অশেষ গবেষণা পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মৃতকল্প অবস্থায় তিনি যাদৃশ মানসিক ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন অনেক স্বাস্থ্য-সৌভাগ্যশালী মানবের পক্ষে তাহা প্রণিধান করিয়া পাঠ করাও এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ অকর্ম্মণ্য অবস্থায়, নিয়ত পরকীয় সাহায্য প্রত্যাশী হইয়া অক্ষয় বাবু যখন এই অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থ রচনায় সক্ষম হইয়াছেন, তখন তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে এই গ্রন্থ কতই মনোরম হইতে পারিত তাঁহা ভাবিয়া স্থির করা ভার।

এই গ্রন্থ মধ্যে শৈব, শাক্ত. সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায় সমূহের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এতন্মধ্যে শৈব সম্প্রদায়েরই নানাবিধ প্রকারভেদ সংগৃহীত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু প্রমান করিয়াছেন যে অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে শিবোপাসনার প্রথা প্রচলিত আছে এবং এই প্রথা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া ‘উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পশ্চিমে হিঙ্গলাজ ও পূর্ব্বদিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ বিভূষিত বিশাল শৈবধর্ম্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। যে ধর্ম্ম বহুকাল ধরিয়া ও বহুস্থান ব্যাপিয়া চলিয়া আসিতেছে স্বভাবতঃ তন্মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ ও উপাসনা পদ্ধতির বিভিন্নতা অবশ্যই সংঘটিত হয়। সুতরাং শৈবউপাসক-সম্প্রদায় ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণিত শৈব সম্প্রদায় সমূহ মধ্যে দশনামী ও দণ্ডী প্রকরণ অতীব হৃদয়গ্রাহী ও আমূল জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকারের হৃদয় স্বদেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া ও ভাবী দুর্দ্দশা চিন্তা করিয়া কিরূপে ক্রন্দন করিয়া থাকে দশনামী প্রকরণ মধ্যে প্রসঙ্গতঃ তাহার সুন্দর পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পুরাণপুরি নামক একজন অসাধারণ অধ্যবসায় শালী ঊর্দ্ধ বাহু নানা দেশদেশান্তর পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার দেশীয় নব্য সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া লিখিতেছেন,—

‘এদেশীয় সভ্যতর নব্য সম্প্রদায়! তোমরা কমলা-দেবীর প্রসাদ-লাভ উদ্দেশে ধূম-ধ্বজ সুচারু সমুদ্র-যানে সুখে শয়ান ও স্বচ্ছন্দে দোলায়মান হইয়া, চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ ভোগ উপভোগ পূর্ব্বক, অক্লেশে কমলা-তীর্থ বিলাৎ-ক্ষেত্র দর্শন করিতে পার, ও তথাকার অসহ্য চাকৃচক্য দর্শনে চমৎকৃত ও বিমোহিত হইয়া, বিলাতীয় বেশ-ভূষাদি ভৌতিক বিষয় মাত্রের অনুকরণ পুরঃসর, আপনাদের অসারবত্তাও প্রকাশ করিতে সমর্থ হও; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, এ অংশে অশিক্ষিত পুরাণপুরির উৎসাহ, অধ্যবসায়, কৌতূহল ও প্রতিবিধিৎসা অদ্যাপি তোমাদের আদর্শভূমি হইয়া রহিয়াছে। তোমাদের শরীর গুলিই কেবল বামনরূপ ধারণ করিয়াছে এরূপ নহে, মনও তাহার অনুপযুক্ত হয় নাই। “আকারসদৃশী প্রজ্ঞা” কেবল দিলীপেরই হইতে হয় এমন নয়; তাদৃশ কবি

উপস্থিত থাকিলে, ভাবান্তরে তোমাদেরও সেই রূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন। শরীর খর্ব্ব, মন খর্ব্ব, আয়ু অল্প, ইহাতে আর শুভ প্রত্যাশার সম্ভাবনা কি? ভারত-ভূমির প্রকৃতি-সিদ্ধ বল-বীর্য্য দিন দিন ক্ষীণ ও বিলীন হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। শিক্ষায় স্বভাবের ক্ষয় কত পূরণ করিতে পারে? ধর্ম্মনীতির অনুশীলন ও অনুষ্ঠান-শিক্ষা এদেশীয় শিক্ষা-প্রণালীতে সন্নিবেশিত করা রাজপুরুষদের শ্রেয়ঃ বোধ হয় নাই। অতএব সে বিষয়ের ত কথাই নাই। এক-বারেই মরু ভূমি! অতর্পণীয় ধন-লোভ ও শূন্য-গর্ভ অভিমান 'বিদ্যারণ্য' অধিকার করিয়াছে। অশেষ দোষাকর পানীয়-দোষে ঐ পুণ্য-ধামের সকল গুণ সংহার ও সকল অকল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছে। অশিক্ষিত লোকের কথাই বা কি কহিব? "—— ততোঽধিকঃ।" উভয় দলের মধ্যেই বাক্য-নিষ্ঠার অসদ্ভাবে পরস্পরের মন পেষণ করিতেছে। মিথ্যা, শঠতা, ও তন্নিবন্ধন মোকদ্দমায় দেশমধ্যে যে কিরূপ অনল জ্বালিয়া দিয়াছে, তা বলিবার নয়। পূর্ব্ব-কালে যে হিন্দু-জাতির ন্যায়পরতা, সত্য-বাদিতা, শান্তশীলতা, পান-দোষ-বিহীনতা, ব্যবহার-বিমুখতা ও সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ-চরিত্রতা দেখিয়া বিদেশীয় লোকে বিস্ময়াপন্ন হইত, যাঁহাদের মধ্যে ঋণ-দান ও তাদৃশ অন্য অন্য অনেক বৈষয়িক ব্যবহার বিষয়ে খত পত্রাদি লিখন এক সময়ে অপ্রচলিত ছিল, যাহারা ধনাদি-রক্ষার্থে কুলুপ দিয়া দ্বার রুদ্ধ করা অনাবশ্যক জানিত ও শত বৎসর অপেক্ষায় অল্পকাল পূর্ব্বে যাহারা সূর্য্য-সাক্ষী ও ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া অকুণ্ঠিত হৃদয়ে ঋণ প্রদান করিত, এই সেই হিন্দুদের এখন এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল! হায়! কি ভারতভূমিই এ অংশে কি হইয়া গেল! অশিক্ষিত লোকের যতই দুর্গতি হউক না কেন, প্রীতি-নিকেতন শিক্ষিত-সম্প্রদায়! লোকে তোমাদেরই বিস্তর আশা ভরসা করিতে পারে এজন্য তোমাদিগকেই দু কথা বলিতে মন যায়। কিন্তু তোমাদেরই ভাই অপরাধ কি? অকারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কারণসঙ্কর উপস্থিত হইয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।— ভাই হে! আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে ও স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে পারি, এদেশ সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের বর্ত্তমান অবস্থা বিদ্যমান থাকিতে, বাঙ্গালায় পুনরায় আশানন্দের অসম্ভাবিত উদ্ভব হওয়াও যদি কথঞ্চিৎ সম্ভব হয়, তথাচ একটী রামমোহন রায় আর এখানে জন্ম-গ্রহণ করিবেন না!! বিশুদ্ধ বুদ্ধি রাজপুরুষেরা আমাদের প্রকৃত রূপ ব্যথার ব্যথী হইলে যদিই কিছু প্রতি-কার করিতে পারেন, তথাচ অনিবার্য্য নৈসর্গিক দোষ কে নিবারণ করিবে? ভার-তবর্ষের ইঙ্গরাজ-রাজত্বে নিত্য-সহচর-স্বরূপ স্বাস্থ্য-ক্ষয় পাপ-বৃদ্ধি ও দুর্মূল্যতা দোষই বা কি প্রকারে দূরীকৃত হইবে? আবার সর্ব্বাংশে অতি প্রবলের সহিত অতি দুর্ব্ব-লের শাস্তৃ-শাসিত সম্বন্ধের বিষময় চরম ফল মনে হইলে হৃৎকম্প হয়। যে সমস্ত কারণ-প্রভাবে আমাদের উল্লিখিত অক-ল্যাণ-রাশির সঙ্ঘটন হইয়াছে, সেই সমু-দায়ের কার্য্য-প্রবাহ নিরন্তর চলিলে, আমাদের বিপৎ-প্রবাহ কোথায় গিয়া শেষ হইবে, কে বলিতে পারে? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! ভালি এক অপ্রাসঙ্গিক শোচনীয় ব্যাপার

উত্থাপিত করিয়া অন্তঃকরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলাম। উপায় যে কিছুই দেখিনে। ভেবেও কূল পাইনে। এদেশের-উত্তর কালীন অবস্থা পর পর কেবল ধূমা-কীর্ণ দেখিতেছি। বিষাদ ও অবসাদ আসিয়া জীবন জড়ীভূত করিল। যেন কুজ্ঝটিকায় হৃদয়-ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।—ঘোর দুর্দ্দিন!—অমাবস্যার নিশীথসময়—বিদ্যুৎ-শূন্য মেঘাচ্ছন্ন তামসী বিভাবরী!!'

শৈব সম্প্রদায়ের সমস্ত বিবরণ পাঠ করিলে অধিকাংশ সম্প্রদায়ই ভক্তির আস্পদ বলিয়া মনে হইবে। বস্তুতঃ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, বা অবিশ্বাস পরতন্ত্র হইয়াই হউক যেরূপ চক্ষেই কেন দেখ না শৈব ধর্ম্মাবলম্বী অনেকগুলি সম্প্রদায় আপনাদের ব্যবহারের প্রকৃষ্টতায়, মতের উচ্চতায়, ভক্তির অপরিমেয়তায় এবং সাধুতার গভীরতায় নিশ্চয়ই তোমাকে বিমোহিত করিয়া তুলিবে। শৈব সম্প্রদায়ান্তর্গত যোগ ও যোগীদিগের প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত হইলেও বিবিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান কালে কর্ণেল অল্‌কট্ ও মাদাম ব্লাভট্স্কি লুপ্ত যোগ শাস্ত্র পুনরুদ্ধারার্থ যত্ন করিতেছেন এবং তাঁহাদের যত্ন ও অনুরাগ দেখিয়া এত কাল পরে দেশীয় যুবকেরা যোগশাস্ত্রের মহিমা সম্যক প্রকারে পরিজ্ঞাত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে উৎসুক হইয়াছেন। এতৎসম্বন্ধীয় অনেক সমালোচ্য সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে সংগৃহীত হইয়াছে, অতএব এতদ্বিষয়ানুসন্ধিৎসু জনগণ ইহা পাঠ করিলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। শৈব সম্প্রদায়ের অন্যান্য বিবরণ ও সমালোচ্য গ্রন্থের অপরাপর প্রসঙ্গের উল্লেখ বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শকুন্তল শ্লোকাবলী।

দূরারোহণ করিলেই পড়িতে হয়।

ক্ষিতিধর-গুরু বিদিত সুমেরু
পাদ আরোপিয়া শিরেতে তার,
তমোরাশি নাশি করিয়াছে শশী
গগন-মাঝারে সুখ-বিহার।
এবে সেই শশী পড়িতেছে খসি
গগন হইতে সুদীন বেশে।
দূরে আরোহণ করয়ে যে জন
হলেও মহান্ পতন শেষে।

—শাকুন্তল।

উষার উপদেশ।

হেথায় চরমাচলে নিশাকর ধীরে চলে
সুবিমল করজাল হইতেছে ম্লান।
আর দিকে দিবাকর ধরিয়া অপন-কর
উদিত হতেছে অই সহাস বয়ান।

হেন তেজোময় যারা সদা সুখী নহে তারা
কভু দুখী সুখী কভু উষাতে প্রকাশ।
যেই জন সদা সুখী পরদুখে হয় দুখী
ধীর তুমি নিজদুখে হ'য়ো না হতাশ।
—শাকুন্তল।

প্রিয়-বিরহ যুবতীজনের দুঃসহ।

লুকায়েছে সুধাকর অচল-শিখর-পর
কুমুদিনী নীর-পরে ম্লানমুখী হইল।
শোভা নাহি আগেকার, আঁখি নাহি তোষে আর
সহসা, মরিরে, তার একি দশা ঘটিল,
যতেক যুবতীজন না হেরিয়া প্রিয়জন
ভোগে দুখ অসহন অনুমান হইল।
প্রিয়সমাগম-নাশে দুখের সাগরে ভাসে
কুমুদিনী নিশাশেষে যেই শশী ডুবিল।
—শাকুন্তল।

বিশ্বাসহন্তা প্রণয়ীর প্রতি।

নব-পরিমল-লোভে অলি
চূতকলিকারে চুমিলে।
কতই প্রণয় কত অনুরাগ
প্রকাশি তাহারে তুষিলে।
ফুটিল নলিনী হৃদয়ে তাহার
উড়িয়া যেমনি বসিলে।
সে চূত-কলিকা সেই সে প্রণয়
অমনি কি অলি ভুলিলে?
—শাকুন্তল।

বিদ্যুল্লতা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আজি একাদশী—বিধবার কাল একাদশী! পক্ষান্তরে একবার করিয়া আসিয়া কেবল চিরজ্বলন্ত দুঃখানলে আহুতি প্রদান করিয়া যায়। ভূত গর্ভস্থায়ী সেই পতি বিয়োগ ঘটনা—শ্রীহীনা হইবার দিনের কথা বিগত বিস্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া, প্রোজ্জ্বল অক্ষরে দেখাইয়া যায়! কালরূপী একাদশীর আগমনে বিধবার দুঃখ স্মৃতি একবারে উথলিয়া উঠে, ক্ষুদ্র হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া ফেলে, সংসার বন্ধন গ্রন্থিগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া বিধবার হৃদয়ে আত্মনাশের বাসনা উদিত করিয়া দেয়!

সংসার মরুমধ্যে রমণীই একমাত্র শীতল সরোবর, রমণীই এ দগ্ধারণ্যে একমাত্র জীবন্ত লতিকা, প্রকৃতিরূপিণী রমণীই জগৎপটে বিচিত্র প্রতিমা। তাঁহারা দয়া, মায়া, স্নেহ, ভক্তি ও প্রণয়ের খনি স্বরূপা! আহা, এই স্নেহময়ী রমণী বিধবা হইয়া দেশাচারের কঠোর অত্যাচারে কতই অসহ্য যন্ত্রণাই সহ্য করিতেছেন! আর, সেই দেশাচারের নিয়ন্তা স্বরূপ পুরুষজাতি অকাতরে তাহার সেই যন্ত্রণা দর্শন করিতেছেন। পতিশোক-বিহ্বলা তরুন বয়স্কা ভগিনী, অপূর্ণ-

কায়া অবোধ বালিকা একাদশীর নিরম্বু উপবাসে চক্ষের উপর ছট ফট করিতেছে, কোন্ পুরুষ তাহা না দেখিতেছেন, তাহা দেখিয়া শুনিয়াও কোন্ পুরুষ না আপনার উদর পরিতৃপ্ত করিতেছেন?

ভারতে বিধবার দুঃসহ যন্ত্রণা দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়! তরঙ্গময় সংসার-সাগর পারের দিক্‌নিদর্শনার্থ ধ্রুবতারা স্বরূপ স্বামীকে হারাইলে রমণী কি এককালে দিশেহারা হন না! বিষাদের ঘোর অন্ধকারে, নিরাশ ঝটিকার প্রবল আঘাতে তাঁহার চিত্ত-তরণী কি খান খান হইয়া যায় না? অতীতের সুখচিন্তায় যে স্বামীর সহর্ষ মুখমণ্ডল সর্ব্বাগ্রে মনে আইসে, বর্ত্তমানের যিনি একমাত্র মনোমোহন, ও ভবিষ্যতের অসীম অনন্ত কল্পনা রাজ্যের যিনি কেন্দ্র স্বরূপ, সেই সর্ব্বকালরঞ্জন স্বামীকে হারাইলে, রমণী যে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? স্ত্রীবিয়োগে পুরুষের গৃহশূন্য হয়, পতিবিয়োগে স্ত্রীর গৃহ শূন্য নহে, সংসার শূন্য, জগৎ শূন্য হয়। পৃথিবীতে পতিপরায়ণা সাধ্বীর স্বামীই সুখ সম্পত্তি, স্বামীই সহায়, স্বামীই পরম সর্ব্বস্ব! সেই পরম ধনে বঞ্চিত হইলে তাঁহার আর রহিল কি?

সৌন্দর্য্য হইতে রমণীয়তা, সমীরণ হইতে স্নিগ্ধতা, কুসুম হইতে কৌমার্য্য, চিত্ত হইতে স্ফূর্ত্তি, উদ্যম হইতে আশা, বাসনা হইতে তৃপ্তি, কাড়িয়া লইলে তৎ তৎ বস্তুর যেরূপ দুরবস্থা হয়, হিন্দু মহিলার পতি বিয়োগ হইলে সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। দগ্ধ-হৃদয়া হিন্দুবিধবার দুঃখের কি আর পার আছে? অহোরাত্র হৃদয় মধ্যে হুহু করিয়া যে অগ্নি জ্বলিতেছে, ইহজন্মে সে অগ্নির আর নির্ব্বান নাই! হিন্দুবিধবা সেই রাবনের চিতা বুকে করিয়া বহিতেছে, মরমে মরমে পুড়িতেছে, তথাপি বিধবা সকলই নীরবে সহ্য করিতেছে! আশ্চর্য্য তাহাদিগের সহিষ্ণুতা! ধন্য তাহাদের পতিপরায়ণতা!

বঙ্গে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নহে। বিদ্যুল্লতার সহিষ্ণুতা ও বৈধব্যে অকাতরতা দর্শন করিয়া, কে বলিবে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করাই আবশ্যক? বিধবা বিবাহ প্রচলিত না করিলেই নয়? যিনি প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আপনার পবিত্রতা ও গৌরব রক্ষা করত জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহার নিকট বৃথা চীৎকার পূর্ব্বক প্ররোচনা বাক্যে সেই পবিত্রতা—সেই পাতিব্রত্য ভঙ্গ করিতে উপদেশ উচ্চারণ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। যিনি বৈধব্যের ঘোর যন্ত্রণায় চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে সক্ষম, যাঁহার হৃদয়ে পরলোকান্ত পতির প্রতি এখনও ভক্তি ও প্রণয় প্রবাহ সমান বহিয়া আসিতেছে, যাঁহার পবিত্র পাতিব্রত্য ও নিরন্তর নিষ্ঠার সহিত ধার্ম্মানুষ্ঠান জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়াছে, তিনি প্রকৃত বীরচারিনী, তাঁহাকে দেখিলে বাস্তবিকই ভক্তির উদয় হয়। কোন্ বুদ্ধিমান এইরূপ দেবী স্বরূপা রমণীর নিকট পুনরায় বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে চাহিবেন? আহা! এইরূপ শত শত বিধবা আজিও ভারতের জীর্ণ বক্ষে উজ্জ্বল রত্ন ভূষণ স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। অন্য কোন দেশে কি এরূপ দৃষ্টান্ত মিলিতে পারে? সুশিক্ষিত, সুসভ্য ইউরোপেও প্রকৃত বঙ্গ বিধবার তুলনা আছে কি না সন্দেহ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আজি একাদশী! পিপাসায় বিদ্যুল্লতার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছে, অনশন প্রযুক্ত তাঁহার গাত্রদাহ হইতেছে। তিনি হর্ম্যতলে অঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিয়া আছেন। আবল্য বশতঃ সেই অপরাহ্নে, অসময়েও তাহার তন্দ্রা আসিতেছে।

অনশন কি কঠোর ব্রত! উপবাসে লাবণ্য দগ্ধ হইয়া যায়! সরল, সতেজ লতার মূলে উত্তপ্ত বারি ঢালিয়া দিলে সেই লতার যেমন সর্ব্বাঙ্গ শুকাইয়া যায়, আজ অনশনে বিদ্যুল্লতার প্রফুল্ল মুখ কমল তেমনি বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছে, শরীরের লাবণ্য জ্যোতিহীন হইয়া পড়িতেছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। তাই তিনি তন্দ্রাভিভূতা হইয়াছেন।

সহসা তাঁহার ভগিনী হেমলতা সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে ডাকিল,—"দিদি, দিদি—তোমায় আবার নিতে এসেছে!" বিদ্যুল্লতার তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। 'কি হেমা' বলিয়া বিদ্যুল্লতা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিতেছিলে?" 'পালকী নিয়ে এয়েছে তোমায় নিয়ে যাবে' বলিয়া হেমলতা আপনার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া তুলিল। বিদ্যুল্লতা সসব্যস্তে গাত্রোত্থান করত অতি বিস্মিত চিত্তে,—"সত্য নাকি, কেন কি হইয়াছে?" 'বলিতে বলিতে বহির্ব্বাটীর দিকে আসিতেছিলেন; তাঁহার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যার হস্তে এক খানি পত্র দিলেন। বিদ্যুল্লতা তখনই পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে করিতে আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অতি কাতর স্বরে বলিলেন,—'মা আমাকে এখনই যাইতে হইবে।' তিনি অঞ্চলে নয়নাশ্রু মুছিতে লাগিলেন। 'কেন বিদু, কেন বিদু, কি হইয়াছে, সব ভাল ত?' বলিয়া তাঁহার জননী তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন।

'সেখানে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মার বড় ব্যারাম' বলিয়া বিদ্যুল্লতা আরও কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—'আমি মা এখনই যাইব।'

'সেকি! আজ ত কোন মতেই,'—বিদ্যুল্লতার জননীর কথা শেষ হইতে পাইল না। বিদ্যুল্লতা যারপর নাই কাতরস্বরে কহিয়া উঠিলেন,—'না গেলে হয়ত আর দেখিতে পাইব না, মা!'

'একে একাদশীর উপবাস, তায় বৃহস্পতিবারের বারবেলা, তাইত মা তিনিও এখন ঘরে আইসেন নাই,' বলিতে বলিতে বিদ্যুল্লতার জননী অত্যন্ত কাতর ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

বহির্ব্বাটী হইতে একজন দ্বারবান ডাকিল, 'মা ঠাকুরাণ শীঘ্র আসুন, বড় মেঘ উঠ্‌ছে।' দ্বারবানের ঐ আহ্বান বাক্য বিদ্যুল্লতার জননীর কর্ণে বজ্রনিনাদবৎ ধ্বনিত হইল! তিনি, 'এমনই কপাল আমার' বলিয়া আরও উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

মায়ের প্রাণ অতি কোমল। কর্কশ দুঃখ কণ্টক সমাকীর্ণ পৃথিবীতেও মায়ের প্রাণ যার পর নাই কোমল। স্নেহ মমতার খনি, সন্তানবৎসল জননীর হৃদয়কে কোমল পাইয়াই, শোক দুঃখ, এবং পুত্র কন্যার কাল্পনিক ভাবী অমঙ্গল চিত্র উদিত করিয়া দিয়া অনবরত যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া রাখে। সংসারে স্নেহের পুরস্কার দুঃখ, অথবা মর্ম্মান্তিক বেদনা, অথবা আত্মবিসর্জ্জন। স্নেহ করিয়া কয়জন সুখী

হইয়াছে? হায়, কত কুসন্তান মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্নেহময়ী জননীর প্রতি ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ, যারপর নাই অকৃতজ্ঞতার কার্য্য করিয়া ফেলিতেছে, তবুও মায়ের প্রাণ কোমলই থাকে; উহা যে স্বভাবতই কোমল, উহাতে পাপ স্পর্শ হয় না, উহা কঠিন হইবার নহে! কিন্তু কঠিন নয় বলিয়াই কঠিনতাকে জয় করিতে পারে না।

বিদ্যুল্লতার জননীর প্রাণ তখন কেমন করিয়া উঠিল কে বলিবে! দুহিতা বিদায়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে কেবল ক্রন্দন। ক্রন্দন করিতে করিতে যথাসাধ্য সময়োচিত উদ্যোগ করিয়া বিদ্যুল্লতার জননী দুহিতাকে শিবিকায় তুলিয়া দিতে গেলেন। প্রাণ চাহিল না; অসময়ে, একাকী, কেবল মাত্র একজন অপরিচিত দ্বারবান ও বাহকগণের ভরসায় প্রাণ-প্রতিমা কন্যাকে পাঠাইয়া দিতে হইল। কি করিবেন? বিদ্যুল্লতার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। বিদ্যুল্লতা কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, হেমলতাকে সাদরে চুম্বন করিলেন ও আস্তে আস্তে গিয়া শিবিকারোহণ করিলেন। শিবিকায় প্রবেশ কালে তাঁহার কপালে আঘাৎ লাগিল, তাঁহার জননী সে সময় অঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা করিতেছিলেন, যাত্রাকালীন সেই অমঙ্গল বাধা দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে পাইলে কখনই কন্যাকে যাইতে দিতেন না।

বাহকগণ শিবিকা স্কন্ধে করিয়া বাটীর বাহির হইল। বিদ্যুল্লতার জননী পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্দ্বার অবধি আসিয়া যতক্ষণ শিবিকা দৃষ্টির অগোচর না হইল ততক্ষণ অনিমেষ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হেমলতাও কাঁদিল। পালকী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে ক্ষুণ্ণ মনে, কত কি ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুল্লতার জননী ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সরস্বতী নদী পার হইয়া বাহকগণ শিবিকা লইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। শরতের জ্যোৎস্নাময়ী রজনী যেমন সুন্দর, কৃষ্ণপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি আবার তেমনই ভয়ানক! সন্ধ্যাকালেই আকাশ প্রান্তে মেঘ দেখা দিয়াছিল, এক্ষণে সেই মেঘ আরও গাঢ়তর হইয়া সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল। মধ্যে মধ্যে বিজলীর চকিৎ আলোক নির্ব্বাণ হইলে অন্ধকার আরও ঘোরতর দেখাইতে লাগিল, বায়ুর বেগ প্রবল হইয়া উঠিল, ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল! সহজেই পথ দুর্গম—অল্পক্ষণেই কর্দ্দমপূর্ণ হইল। বাহকেরা আর চলিতে পারে না। তাহারা ভার নামাইতে পারিলেই বাঁচে, কিন্তু কোথায় নামাইবে? দুইপার্শ্বে গহন বন, নিকটে মনুষ্যের বাস মাত্র নাই! অগত্যা তাহারা আরও ছুটিতে লাগিল।

বিদ্যুল্লতা শিবিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন—কতদূর আসিয়াছেন পথ দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন ভাবিয়া ঈষৎমাত্র দ্বার মুক্ত করিয়া চাহিলেন—তখনই বিজলী খেলিয়া উঠিল সত্য, কিন্তু তাহাতে কতদূর আসিয়াছেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না, একটী দৃশ্য তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। যেন একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী পথ-

পার্শ্বে একটী বিটপীমূলে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন—তাঁহার শিবিকা সেই সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র পুরুষ কাতরস্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"কে গো তোমরা, এমন সময়ে এ পথ দিয়া যাইতেছ? ভয় নাই কি?" বাহকগণ সে কথা কানে তুলিল না, কিন্তু তচ্ছ্রবনে বিদ্যুল্লতা শিহরিয়া উঠিলেন। ভয়ে তাঁহার হৃদয় দুর দুর করিয়া উঠিল। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, 'সেই রাত্রে তাঁহাকে যাইতেই হইবে—সহস্র বিপদ পাতের সম্ভাবনা থাকিলেও অগ্রসর হইতে হইবে। আর তাঁহার সে ভয় রহিল না, শ্বাশুড়ির অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

অদৃষ্ট! অদৃষ্ট বলিয়াই তুমি এত প্রভাবশালী! তুমি যদি চক্ষুর গোচর হইতে, অথবা মনুষ্য জ্ঞানের আরত্ত হইতে, তাহা হইলে সকলেই সর্ব্বাবস্থায় বুঝিয়া সুজিয়া কার্য্য করিত। শোকে দুঃখে বিপদে কেহই তোমার দোহাই দিতে পারিত না, তোমার প্রবল প্রতাপের অধীন হইয়া থাকিতে চাহিত না। অবস্থাচক্র অবিরত তোমারই শাসনে ঘুরিতেছে, কখন কাহার কি ঘটাইবে কে বলিতে পারে? কেহ স্বীকার করুক আর নাই করুক, সকলেই তোমার বিচিত্র শক্তিতে পরাভূত। ভাল, বল দেখি বিদ্যুল্লতার ভাগ্যে বিধাতা কি লিখিয়াছেন? দুঃখের পর সুখ, বিপদের পর শান্তি, অথবা দুঃখের উপর দুঃখ, বিপদের উপর বিপদ? অদৃষ্ট! একে ঘোর দুর্য্যোগের রাত্রি, তাহাতে আবার দস্যু সমাকুল পথ, অশুভ ব্যতীত সুভফলের সম্ভাবনা কোথায়? তবে তুমি হাসিলে কেন? হায়! তুমি হাসিবেই ত! সংসারে বিপদপাতে তোমারই জয় হইয়া থাকে।

বিদ্যুল্লতা ঘোর চিন্তায় নিমগ্না! 'মা কি এখনও বাঁচিয়া আছেন। হয় ত আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না! আমাকে দেখিবার জন্যই তাঁহার মন কেমন করিয়া থাকিবে, তাই ঠাকুরপো আমাকে অদিনে কুক্ষণে লইয়া যাইতে লোক পাঠাইয়াছেন। আপনি মায়ের শুশ্রূষার ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই। হায়! আমি কি মন্দ কপাল করিয়াছিলাম, মায়ের এ সময়ে সেবা করিতে পারিলাম না। মরিলেওত আমার এ দুঃখ যাইবার নয়! আগে জানিলে হেমার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে কখনই এখানে আসিতাম না। তাঁহার শোক উথলিয়া উঠিল, আর যেন শিবিকায় বসিয়া থাকিতে তাঁহার যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে, যেন কতই বিলম্ব হইতেছে, দেবতা বাদ সাধিতেছেন, তাঁহার যত শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা হইতেছে ততই যেন পথ বাড়িয়া যাইতেছে, এইরূপ ভ্রান্তিমূলক চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে আসিয়া উদিত হইল। তাহার পর, যদি শ্বাশুড়ী ভাল আছেন দেখিতে পান—আহা বেহারারা কত ক্লেশ সহ্য করিতেছে—ভাল করিয়া উহাদিগকে খাওয়াইবেন, পুরস্কার দিবেন, যাহাতে উহারা খুসী হয় তাহাই করিবেন, ইত্যাদি কত প্রকার আশাজনিত কত সাধ এক একটী করিয়া তাঁহার মনে আসিতে লাগিল।

চিন্তার কি বিচিত্র গতি, চিত্তের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আরও কিয়দ্দূর আসিয়া বাহকেরা পালকী নামাইল, ও বিদ্যুল্লতাকে নামিতে

বলিল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে, বায়ুর প্রচণ্ডতা হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু মেঘ বিচ্ছিন্ন হয় নাই, সুতরাং অন্ধকার পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। বিজলীর উজ্জ্বল প্রভা তখন আর তত শীঘ্র শীঘ্র বিকাশ পাইতেছে না।

বিদ্যুল্লতা নামিয়াই, চতুর্দ্দিক তিমিরাচ্ছন্নতা প্রযুক্ত, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ দাণ্ডায়মান থাকিলে পর অন্ধকারেও যথাসম্ভব দৃষ্টি চলিয়া থাকে। একটু দাঁড়াইয়া বিদ্যুল্লতা সম্মুখ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যার পর নাই বিস্মিতা ও ভীতা হইলেন।

বিদ্যুল্লতা দেখিলেন চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে সেই স্থানটীকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, একটী অপরিচিত জীর্ণ অথচ উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বাটী মধ্যে তিনি উপনীতা হইয়াছেন, সে বাটী যেন অন্ধকারের কারাগার—জন শূন্য,—প্রাণী শূন্য—নিস্তব্ধ—ভয়ানক। সে বাটীতে তিনি কখনও আইসেন নাই, তাঁহার শোনিত শুষ্ক হইল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইল, তিনি সভয়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা আমায় এ কোথায় আনিলে?' কেহ উত্তর দিল না, তখন অদূরে দ্বার রুদ্ধ শব্দ হইল, তিনি দেখিলেন সে শিবিকা নাই, বাহকেরাও নাই!

পাঠক! এই নির্জ্জন স্থানে এই জনশূন্য প্রাচীন বাটী কাহার বলিয়া রাখি। কাহারও মুখে হরা শাঁড়ির নাম শুনিয়াছিলেন কি? হরা ডাকাইতদিগের দলপতি। এক সময়ে তাহার নাম করিয়া অথবা তাহার কৃপাপ্রদত্ত সাঙ্কেতিক আম্রশাখা লইয়া পথিক আজকার মত ভয়ানক রাত্রিতেও দস্যুদিগের হাত এড়াইত। এই বাটী সেই দস্যুপতি হরা শাঁড়ির নির্জ্জন দুর্গস্বরূপ। হরা এই খানে নিরাশ্রয় পথিকদিগকে লইয়া আসিয়া অবাধে হত্যা করিত। একদা এই দুষ্ট ভ্রমক্রমে আপন জামাতাকে হত্যা করিয়াছিল। এই বাটীর পশ্চাতে একটী গভীর কূপ আছে, তাহাতেই সমস্ত মৃত দেহ নিক্ষিপ্ত হইত। হরা এখন নির্ব্বংশ, তাহার দুর্গ এখন জন শূন্য পতিত রহিয়াছে।

কোমল প্রাণা বঙ্গমহিলা, তুমি কি কখন বিদ্যুল্লতার মত বিপদে পড়িয়াছিলে? ঈশ্বর না করুণ, যদি কখন শ্বশুরালয়ে, অথবা পিতৃগৃহে যাইবার সময় এরূপ বিপদে পতিত হও, বল দেখি তখন কি করিবে? সাহসে ভর করিয়া একাকিনী আত্ম রক্ষা করিতে পারে কি? যখন সাহসী বলিষ্ঠ পুরুষও এরূপ অবস্থায় বিহ্বল হইয়া পড়ে সামর্থ্য সত্বেও আপনাকে দুর্ব্বল মনে করিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, তখন তোমারা ত অবলা ভীরু জাতি—বিপদের সূত্রপাত দেখিলেই মূর্চ্ছিতা হইয়া থাক, তখন কি প্রকারে আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। উচ্চ ক্রন্দন রোলে বনভূমি কাঁপাইয়া তুলিবে—না?

বিদ্যুল্লতার যার পর নাই ভয় সঞ্চার হইয়াছে, তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বাটী হইতে বাহির হইবার জন্য ছুটিলেন। কিন্তু হয়! তাঁহার সে উদ্যম—সে আশা বিফল হইল। দেখিলেন সে দ্বার কে বন্ধ করিয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি সেখান হইতে অন্যদিকে ধাবমানা হইলেন, তখনই প্রাঙ্গন পার্শ্বস্থিত একটী কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল, সেই কক্ষে প্রদীপ জ্বলিতে ছিল. মুক্তদ্বার

দিয়া সেই দীপালোক আসিয়া পলায়ন পরায়ণা বিদ্যুল্লতার উপর পতিত হইল। তখনই একটী স্ত্রীলোকে আসিয়া 'আর কোথা যাইবে?' বলিয়া তাঁহার হাত ধরিল। বিদ্যুল্লতা চমকিয়া উঠিলেন ও কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি, কি কারণে আমায় ধরিতেছ?' রমণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং কহিল 'আমি কে চিনিতে পার নাই, ভাল, একটু পরে চিনিতে পারিবে, এখন ঘরে আইস'। সে তাঁহাকে সেই দিকে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিল। বিদ্যুল্লতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেন তুমি আমায় লইয়া যাইবে? এ কাহার বাটী?' রমণী সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, 'বিলম্ব করিও না, বিপদ ঘটিবে, আইস আমার সঙ্গে আইস, ভয় কি?'

বিদ্যুল্লতা তাহার কথার মর্ম্মে তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না. হতাশে অধীর হইয়াছিলেন, রমণীর বাক্যে কথঞ্চিৎ আশা লাভ করিলেন, ও আর কোন প্রশ্ন না করিয়া তাহার সঙ্গে কক্ষ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কক্ষ মধ্যে একজন পুরুষ দণ্ডায়মান ছিল, সে তাঁহাকে দেখিবা মাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া অপর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। বিদ্যুল্লতা পুরুষের মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না, যতটুকু দেখিতে পাইলেন তাহাতেই তাঁহার সন্দেহ হইল, সে ব্যক্তি তাঁহার পরিচিত—সুধু পরিচিত নহে, আত্মীয় ও আদরের পাত্র। সন্দেহ হইবামাত্রই তাঁহার মনে ক্রোধের উদয় হইল। তিনি তখনই একবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলেন, হৃদয় ভরিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং সেই খানে বসিয়া পড়িলেন।

তখন রমণী একবার বাহিরে গিয়া সেই পুরুষের সঙ্গে দুই একটা কথা কহিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—'চিনিতে পারিলে কি?' বিদ্যুল্লতার সংশয় দূর হইল—রমণীর কথায় বুঝিতে পারিলেন, সেই পুরুষ সত্য সত্যই তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি—বিদ্যুল্লতা ক্রোধে আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, ও খর নেত্রে রমণীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সক্রোধে কহিলেন, 'সর্ব্বনাশী! তুইই আমার এ বিপদের মূল! চল, এখনও আমার বাটী চল, নচেত দেখবি আমি তোর কি সর্ব্বনাশ করিব!' ক্রোধে বিদ্যুল্লতার মুখে আর কথা বাহির হইল না।

রমণীও সক্রোধে কহিয়া উঠিল,—'আমায় সর্ব্বনাশী বলিবার তুমি কে? আমি তোমার কি করিয়াছি? ভালই করিয়াছি, যাহাকে চাহিতে তাহার কাছে আনিয়া দিয়াছি।'

বিদ্যুল্লতা ক্রোধে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন,—'পাপীয়সী, এতবড় স্পর্দ্ধা তোর; ও কথা তুই মুখে আনিস? তখনই আপনাকে সেই অপরিচিত স্থানে অনুপায় ভাবিয়া নিরাশে, 'হা বিধাতঃ, পরিণামে আমার এই দশা ঘটাইলে?' বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া রমণীর হৃদয়ে দুঃখ হইল না। সেই পাষাণী, পাপিনী, কালরূপিনী ভুজঙ্গিনী অনায়াসে, তাঁহাকে উপহাস ছলে আপনা আপনি বলিতে লাগিল, — 'প্রথম দিন আমরাও ঐরূপ করিয়া, হে ভগবান বলিয়া কাঁদিয়া

ছিলাম। আর কেন? ঢের হইয়াছে, অন্যে দেখুক আর নাই দেখুক আমিত দেখিয়াছি একবার দুই চক্ষে জল ফেলিয়াছ, এখন পুরাণ কাহিনী ভুলিয়া যাও, নূতন সুখের সাগরে ভাস।'

বিদ্যুল্লতার অসহ্য বোধ হইল, ইচ্ছা হইল তখনই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া সেই ঘোর মর্ম্মান্তিক বেদনা হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিউক। আত্মঘাতিনী হইতে সাধ হইয়াই সে সাধ অনুতাপে পরিণত হইল। আত্মীয় স্বজনগণকে মনে পড়িতে লাগিল, তাঁহার উপস্থিত বিপদের বার্ত্তা হয়ত কেহই পান নাই, ভাবিয়া নিরাশে, বিষাদে, যার পর নাই মুহ্যমানা হইয়া পড়িলেন। তখন মুখে অঞ্চল চাপিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কামিনীকে পাঠকের স্মরণ থাকিবে। সে সেই ব্যাজড়া নিবাসিনী কুলটা, যাহার সহিত সে দিন গিরিশচন্দ্র পাপ পরামর্শ করিতেছিলেন। হরিপালে কামিনীর পিত্রালয়, সে জাতিতে গোয়ালা; সে দুশ্চরিত্রতা বশত কয়েক বৎসর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া নানা স্থান দেখিয়াছে, নানা প্রকার লোকের সঙ্গে সহবাস করিয়াছে। সুতরাং কুলকামিনীর ন্যায় কামিনীর হৃদয় আর সরল নাই, উদার নাই। জাতি কুল, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া যে রমণী নীচ বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহার সরলতা ও অমায়িকতা চাতুর্য্যে পরিণত হইবে না কেন? এখন তাহার যৌবন লহরী চলিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং যে পথে ভবিষ্যতে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জনের উপায় আছে কেন না সে সে পথের পথিক হইবে? কেন না সে, সংসারের নানাবিধ আবশ্যকীয় বন্ধনব্যূহ ভেদ করিয়া বিদ্যুল্লতার ন্যায় রূপবতী কুল মহিলাকে কুলত্যাগিনী করিতে চেষ্টা পাইবে?

এখন সে ভাবিতেছে বিদ্যুল্লতাকে চিরহস্তগত করিতে পারিলে তাহার দীন দশা ঘুচিয়া যাইবে। সে ভাবিতেছে, যে পুরুষের আদেশানুসারে বিদ্যুল্লতার নিষ্পাপ চিত্তকে সে কুপথ গামিনী করিতে প্রয়াস করিতেছে তাহাকে আয়ত্তগত করিবে, এবং ক্রমে পূর্ণ যৌবনা বিধবা বিদ্যুল্লতাকে অপর কোন ধনাঢ্যের হস্তে সমর্পণ করিবে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিদ্যুল্লতা সেই বিজন বন মধ্যে আজ রাত্রিবাস করিলেই কাল প্রাতে কেহই তাঁহাকে গৃহে পুনঃগ্রহণ করিবে না। সুতরাং তাঁহাকে তাহারই অনুকম্পার উপর নির্ভর করিতে হইবে,—অজীবন না হউক, অন্যূন দিন কয়েকের জন্য ত করিতেই হইবে। এখন কি প্রকারে সে স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবে ভাবিয়া দেখিল ও মনে মনে নানা কৌশল আঁটিল। তখন সে আস্তে আস্তে এস্থান হইতে সরিয়া গেল এবং বাটীর পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বাহির হইল। বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। বিদ্যুল্লতা সেই অরণ্য মধ্যে, সেই পরিত্যক্ত নির্জ্জন পুরীতে বন্দিনী হইলেন।

বোগদাদ-পতন।

যিনি অতীত ঘটনা স্মৃতি-দর্পণে প্রতি-বিম্বিত করিয়া না রাখিয়া বিস্মৃতি-সলিলে নিমজ্জিত করেন, তাঁহার পরিণাম কখনই শুভাবহ হয় না—তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। খলিফা মোতাসিম বিশ্বাস-হন্তা মোগলদিগকে একবার বিশ্বাস করিয়া যে প্রতিফল ভোগ করেন; দ্বিতীয় বার তাহা-দিগকে বিশ্বাস করিয়া কিরূপ পরিতাপয়িনী দশায় সমানীত হন, এবং সমস্তাৎ বিপজ্জাল সমাকীর্ণ হইয়া বোগদাদের বিনাশদ্বার কিরূপে উন্মুক্ত করিয়া দেন তদ্বিবরণ পাঠে আমাদিগের প্রাগুক্ত কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

বোগদাদ এক সময়ে গৌরবের অভ্রংলিহ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, এক সময়ে সোলেমান পর্ব্বত হইতে পিরানিস ও অক্সাস হইতে টোগাস নদী পর্য্যন্ত তাবৎ দেশ বোগদাদের খলিফার শাসন-দণ্ডে সমুস্তাসিত হইয়াছিল, এক সময়ে বোগদাদের খলিফার মস্তক কম্পনে তাবৎ পৃথিবী কম্পান্বিত-কলেবরা হইত; এবং এক সময়ে বোগদাদের খলিফার অসন্তুষ্টিতে অনেক মহীপালের কিরীট মৌলিদেশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িত। কালের কঠোর আক্রমণে খলিফাগণের সে প্রতাপ খর্ব্ব হইয়া পড়িল। যে খলিফীয় সাম্রাজ্য আয়তনে জগৎ-সাম্রাজ্যেশ্বরী রোমকেও অধঃকৃত করিয়াছিল, কালের কঠোর আক্রমণে সেই মহাসাম্রাজ্য কিঞ্চিদূন দুইশত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব গৌরব ভ্রষ্ট হইয়া সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়া উঠিল। মুসলমান রাজপুরুষেরা স্বভাবতঃ বিশ্বাসঘাতক ও স্বার্থপরায়ণ। রাজ-হিতৈষণা কখনই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। পক্ষান্তরে, মুসলমান নৃপতিগণ দুই চারি পুরুষ রাজত্ব করিয়া এরূপ বিলাসী হইয়া উঠেন যে, রাজোপাধিমাত্র তাঁহাদিগের সার সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে। তাঁহারা বিলাস-সাগরে দেহ ভাসাইয়া দিয়া, রাজ-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অবরোধবাসিনী উপপত্নী মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া কালক্ষেপ করেন। অবরোধই তাঁহাদিগের বিবেচনায় পরিদৃশ্যমান জগতের শেষ সীমা বলিয়া উপলব্ধ হয়। তাঁহারা ক্রমেও রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। প্রজা-পালন করা, রাজ্যের শান্তি সংবিধান করা, এবং উপায়হীনকে রক্ষা করা যে, রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এ কথা ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাদিগের মানসক্ষেত্রে সমুদিত হয় না। "অদণ্ড্যান দণ্ডয়ান রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্য দণ্ডয়ন্, অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি' অর্থাৎ 'রাজা যদি অদণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড করেন, দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ইহলোকে মহৎ অযশভাগী ও পরলোকে নরকগামী হইতে হয়।' প্রাচীন আর্য্যগণের এই মহাবাক্য তাঁহাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে সুরাজকতার পরিচয় দিতে উৎসাহান্বিত করে না। যথার্থতঃ বলিতে গেলে, এই সময়ে প্রকৃত রাজ-

ক্ষমতা মন্ত্রী ও সেনাপতিগণ আপনাদিগের করায়ত্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টা পান। এই সময়ে পরিণাম বোধী ভূয়োদর্শী রাজপ্রতিনিধিগণ দুর্ব্বল ও অক্ষম ভূপালের অধীনতা উচ্ছেদ পূর্ব্বক স্বাধীন হইয়া উঠেন। বোগ্দাদের খলিফার সাম্রাজ্য অনধিক দুইশত বৎসরের মধ্যে তদ্রূপ দশায় সমানীত হয়। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাগণ স্ব স্ব প্রদেশে স্বাধীনতা বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। যখন বোগদাদ সাম্রাজ্য ঈদৃশী পরিম্লায়িনী দশার শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখন খলিফা মোস্তাসিমের নির্ব্বুদ্ধিতায় রাজধানী বোগদাদ মোগলদিগের আক্রমণে বিধ্বস্ত ও তৎসঙ্গেই তাহার পূর্ব্ব গৌরবের শেষ চিহ্ন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয়।

খলিফা মোস্তাসিম মোগলদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথমবার যে প্রতিফল প্রাপ্ত হন, তাহাতে পরিণামদর্শী না হইয়া ইস্মাঈলীয় হামাসীন দস্যুদলপতির বিধ্বংস মানসে মোগল-রাজ মঙ্গু খাঁ এই আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া, বহুসংখ্যক সাংযুগীন মোগল সেনা একত্রে সমবেত করিলেন; এবং স্বকীয় ভ্রাতা হোলগু খাঁকে সেই সৈন্যদলের অধিনেতা করিয়া, কতকগুলি উপদেশ দিয়া, তাঁহাকে পারস্য দেশে পাঠাইয়া দিলেন। মঙ্গু খাঁর উপদেশের সারাংশ এই:—

"ভ্রাতঃ! আমি তোমাকে প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ মোগল সৈন্যগণের অধিনায়কতা পদে নিয়োজিত করিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। সাবধান, তোমা হইতে যেন জেঙ্গিস খাঁর নাম লোপ না হয়; সাবধান, তোমা হইতে যেন মোগল নাম পৃথিবীতে ঘৃণার আস্পদ না হয়। জেঙ্গিস খাঁ যে কীর্ত্তি প্রভাবে জগৎ আলোকিত করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে তাহা পৃথিবীতে অধিকতর উদ্ভাসিত হয় তাহা করিতে, তুমি নিরন্তর যত্ন-সহকারে চেষ্টা করিও। উৎসাহ, একাগ্রতা ও অক্লান্ত অধ্যবসায় গুণে যাহাতে অক্সাস হইতে নাইল নদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ মোগল বিজয় বৈজয়ন্তীতে সুশোভিত ও সমলঙ্কৃত হয়, তাহা করিতে কখন যত্নের ত্রুটী করিও না। তুমি সদা সর্ব্বদা একান্ত বিশ্বাসী ও নিতান্ত বশবর্ত্তী সৈনিক পুরুষগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিও। যে সকল সৈনিক পুরুষ বিশ্বাস-হন্তা ও বিদ্রোহোন্মুখ; সপ্রজ, সপত্নীক তাহাদিগের প্রতি নিরন্তর ঘৃণা ও অপমান প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে পাদদলিত করিতে কদাচ অবহেলা করিও না। দস্যুদলের বিনাশ সাধন করিয়া তুমি খলিফার নিকট দূত প্রেরণ করিও। খলিফা যদি মহামূল্য উপঢৌকন দানে তোমার পদাশ্রিত ও তোমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে রক্ষা করিবে। অন্যথা তাঁহাকে দস্যু দলপতির অদৃষ্ট ভাগী করিও। বোগদাদের খলিফীয় সাম্রাজ্য বিনাশ করা এই মোগল অভিযানের মূলোদ্দেশ্য, সাবধান, যেন একথা কদাচ বিস্মৃত হইও না।"

হোলগু খাঁর আগমনের পূর্ব্বেই, ১২৫২ খৃঃ অব্দে কুতবাগনয়ান নামক একজন মোগল সেনাপতি মঙ্গু খাঁর সভা পরিত্যাগ করিয়া হামাসিনগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পর বৎসর তিনি অক্সাস নদী উত্তরণ করিয়া কোহিস্থানে প্রবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রদেশান্তবর্ত্তী কতিপয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহি ও পঞ্চ সহস্র পদাতি সৈন্য লইয়া কিবদেকো নামক দুর্গ

অবরোধ করেন। হাসাসিনদিগের অধিকারে যে সকল দুর্গ নির্ম্মিত ছিল, তন্মধ্যে এই দুর্গই বল-বহুলতা ও দুরাক্রম্যতা জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কুতবাগনয়ান এই স্থানের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করাইয়া আপন সহকারীর হস্তে দুর্গ জয়ের ভার সমর্পণ করিলেন। তিনি স্বয়ং এই অবসরে অসি ও বহ্নিদ্বারা নিকটবর্ত্তী প্রদেশ উৎসন্ন করিতে যাইবেন, মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু কিরদেকো দুর্গবাসিদের আকস্মিক আক্রমণে তদীয় সহকারী মৃত্যু কবলে নিপতিত হওয়াতে, অগত্যা তাঁহাকে পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। অবরুদ্ধ দুর্গবাসিগণ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত দুর্গ সংরক্ষা করিতে লাগিল। হাসাসিন দস্যুদলের অধিপতি আলাদ্দিন দুর্গের উদ্ধার সংসাধনার্থ একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা অতুল সাহসে দুর্গে প্রবেশ করিল। পথিমধ্যে কোন বিপদ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের গতি বিঘ্ন সঙ্কুল করে নাই; এবং বিপক্ষগণ এক জন ব্যতীত তাহাদিগের কাহাকেও নিহত করিতে সমর্থ হয় নাই। দুর্গবাসিগণের সাহস ও উৎসাহ এই সাহায্যে শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তাহাদিগের অমিত পরাক্রমে মোগলদিগকে দুর্গ জয়ের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক অবশেষে, মোগলদিগের সৌভাগ্যবশতঃ হাসাসিনগণ আপনাদিগের ধ্বংস আপনারাই সম্পন্ন করিয়া তুলিল। আলাদ্দিন স্বীয় পুত্র রুকনেদ্দিন খস্'র প্ররোচনায় একজন কর্ম্মচারী দ্বারা নিহত হইলেন। রুকনেদ্দিন পিতার মৃত্যুর পর স্বয়ং দস্যুদল-পতির পদে সমাসীন হইয়া স্বভিবাচ- সেই পিতৃবধকারির প্রাণদণ্ড করিলেন। তিনি দুর্ব্বল, অপরিণামদর্শী ও সাহস বিহীন অধিনায়ক ছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করণোপযোগি সাহস তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত না। এই সময়ে দুর্ভাগ্য বশতঃ হোলগ খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে সকল প্রদেশ তাঁহার পদে অঙ্কিত হইয়াছিল, সেই সকল প্রদেশের দুর্ভাগ্যের পরিসীমা ছিল না। যে সকল প্রদেশ এ পর্য্যন্ত সৌভাগ্যের লীলাভূমি ছিল, হোলগ খাঁর পদার্পণে সেই সকল প্রদেশ মৃতদেহ ও বিদগ্ধ গৃহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

হোলগ খাঁর আগমনে রুকনেদ্দিনের হৃদয় হইতে সাহস অন্তর্হিত হয়, এবং ভয়ে তদীয় হৃদয় ম্লান হইয়া উঠে। এই সময়ে হাসাসিনদিগের অধীন প্রায় একশত দুর্গ ছিল। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধ ব্যতীত তৎসমুদয় অধিকার করা মোগলগণের সাধ্য ছিল না। তথাপি ভয়-বিহ্বল দস্যুদলপতি আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি কয়েক মাস মোগলদিগের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত বিফল প্রয়াস পাইলেন। অবশেষে তিনি সংগ্রাম না করিয়া মোগলদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। যে সকল দুর্গ অমিত পরাক্রমে তাঁহাদিগের সহিত আহবে নিয়োজিত ছিল, তৎসমুদয় মোগলদিগকে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। যে বংশগণ দুইশত বৎসরের অধিক কাল দস্যুদলের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতে ছিলেন, তাঁহারা কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। হোলগ খাঁ আদেশ পাঠাইলেন 'দুগ্ধপোষ্য

ও কোমলতাময়ী রমণী হইতে বীর্য্যবান পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই মৃত্যুমুখে পাতিত হইবে। হাসাসিনদিগের মধ্যে একব্যক্তিও অবশিষ্ট থাকিবে না।' তাঁহার এইবাক্য অচিরে অন্বর্থ হইয়া উঠিল। মোগলগণ ককনেদ্দিন-পুত্র, ভগিনী ও ক্রীতদাসগণ ক্যাসভিল প্রদেশে মৃত্যুর অনন্ত শয্যায় শায়িত হইলেন। কথিত আছে, খোরাসানের শাসনকর্ত্তা একস্থানেই দ্বাদশ সহস্র হাসাসিনের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন। যে কায়াবাজার গোমিদ বংশ দস্যু দলপতির পদ পুরুষানুক্রমিক ছিল, সে বংশ সম্ভূত সকলকেই অসি-মুখে নিপতিত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইল; সে বংশের একজনও অবশিষ্ট রহিলেন না।

হোগল খাঁ হাসাসিনদিগের বিনাশ সংসাধন করিয়া মূর্ত্তিমান মৃত্যুর ন্যায় বোগদাদ নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এ সময়ে বোগদাদের অবস্থা কিরূপ ছিল, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইতেছে। তৎপরে, কিরূপে বোগদাদের বিনাশ সম্পন্ন হইল, তাহা যথাযথ বর্ণিত হইবে।

মোগলগণ যে সময়ে হাসাসিনগণের বিনাশে নিয়োজিত ছিল, তৎকালে বোগদাদবাসিগণ আত্ম কলহে নিমগ্ন ছিল। প্রধান উজির সয়িদ ইচন আলকেমী সিয়াদলের শুভানুধ্যায়ী মন্ত্রী হওয়াতে তাহারা তৎকালে নগর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। মাজাহিদ আদ্দিন আইবেক নামধেয় অন্য একজন প্রথম শ্রেণীস্থ রাজ কর্ম্মচারী অন্য দলের অধিনেতা ছিলেন। এই দুইদলের বিবাদ সমুপস্থিত হওয়ায়, রাজ্যের শান্তি বিঘ্ন পূর্ণ হইয়া উঠে, রাজপথ অনবরত নরশোণিতে প্লাবিত হইতে থাকে, এবং সাধারণের জীবন ও সম্পত্তি আপদ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। উজির এই পক্ষ বিরোধ নিবারণ জন্য কোনরূপ উপায় অবলম্বন করেন না। ক্রমশঃ এই গোলযোগ ও আত্মকলহ প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। উজির ও মজাহীদ উভয়েই ভয় প্রদর্শন করিয়া খলিফাকে আত্ম পক্ষাবলম্বী করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। মাজহীদ খলিফাকে বিজ্ঞাপন করিলেন, 'আপনি যখন মুসলমানগণের সংরক্ষণকারী ও ভূলোকে মহম্মদের প্রতিনিধি তখন যাহাতে সত্যধর্ম্মবিদ্বেষী সিয়াগণ ক্ষমতা ও আধিপত্য লাভ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হওয়া আপনার একান্ত কর্ত্তব্য।' উজির খলিফাকে নিবেদন করিলেন, 'মাজহীদ রাজ-বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার গুপ্ত ষড় যন্ত্র করিতেছেন। খলিফার প্রাণবধ সাধন করাই তাঁহার একান্ত বাসনা।'

এই সময়ে খলিফা মোতাসিম রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপ্তশত মহিষী পরিবৃত হইয়া, মহাসুখে অবরোধে কালযাপন করিতেছিলেন। অবরোধ যে কেবল তাঁহার চিন্তা-জগৎ পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, এমন নহে। প্রত্যুত তিনি যে জগতের বিষয় অবগত ছিলেন, তাহা এই অবরোধ প্রাচীরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি অসীম ক্ষমতায় গৌরবান্বিত হইয়া রমণীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তোষামোদকারী দাস ব্যতীত আর কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইতেন না। তিনি এই সকল ব্যক্তির জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে, এতাদৃক্

ব্যক্তি কখনই তাঁহার নয়নপথে পতিত হইত না। সুতরাং তাঁহার ধারণা ছিল, জগদীশ্বর ও তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই। বহুকালের পর, তাঁহার আদেশ লিপি বহির্গত হইল। তাহাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'মাজহীদ রাজহিতৈষী ও রাজ ভক্ত প্রজা। যাহারা তাঁহাকে অন্যরূপ বিবেচনা করিবে, তাহারা পরদ্বেষী ও পর নিন্দুক, সন্দেহ নাই। অদ্যাবধি উপাসনা সময়ে আমার নামের সহিত মাজহীদের নাম ব্যবহৃত হইবে।' ইহার পর, খলিফা তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্র পুরস্কার প্রদান করিয়া তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিলেন। খলিফার ঈদৃক্ ব্যবহারে উজির সংক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বোগ্দাদ মোগল হস্তে পতিত হউক, বোগ্দাদ বাসীগণ মোগলদিগের শাণিত অসি প্রভাবে মৃত্যুর অঙ্কশায়ী হউক, স্বদেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হউক, স্বদেশের গৌরব-ভাস্কর মোগল পরাক্রমে সান্দ্র-তামসে আচ্ছাদিত হউক, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? খলিফা ও মাজহীদকে প্রতিফল প্রদান করিতেই হইবে। তিনি আত্ম অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার জন্য হোগল খাঁর সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক দিকে হোগল খাঁকে পত্র লিখিলেন, 'আপনি যদি বোগ্দাদ নগর আক্রমণ করেন, তাহা হইলে আমি, যতদূর সাধ্য, নগর অধিকারে আপনার সাহায্য করিব।' অন্য দিকে তিনি খলিফাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, 'রাজস্বের বর্ত্তমান অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; সুতরাং যদি সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা যায়, তাহা হইলে রাজস্বের অবস্থার সমূহ উন্নতি হইতে পারে। আপনি যখন ভূমণ্ডলে ঈশ্বরের প্রতিনিধি তখন বিপদে মানবীয় সাহায্যে নির্ভর করা কোন মতেই সমীচীন নহে। মাহমুদ ও টোগল বেগের ন্যায় হোলগ খাঁও আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মান্য করিবেন।'

এই সময়ে হোলগ খাঁ দস্যুদল বিনাশ করিয়া দূত দ্বারা খলিফাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "মোগলগণ এদেশবাসীদিগকে যে শাস্তি প্রদান করিয়াছেন, আপনি বোধ হয় তাহা অবগত আছেন। মোগলগণ একমাত্র ঈশ্বরের সাহায্যেই তাহাদিগকে প্রণত ও বিনষ্ট করিতে পারিয়াছে; সুতরাং তজ্জন্য ঈশ্বরকে শত সহস্র বার ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। এদেশে যে সকল ব্যক্তি রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, বোগ্দাদের তোরণ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে বদ্ধ রহে নাই। যে আমি সর্ব্বজন প্রশংসনীয় ঈদৃক মহৎ কার্য্য সমাধান করিলাম, সেই আমি কি বোগ্দাদে প্রবেশ লাভে বঞ্চিত হইব। না, তাহা করা আপনার কর্ত্তব্য। সময় থাকিতে জ্ঞান শিক্ষা করা উচিত। কেন না, সময় অতীত হইলে জ্ঞান লাভে কোন ফল দর্শে না। যদি আপনি মোগলদিগের নিকট আত্ম সমর্পন করেন, তাহা হইলেই আপনার মঙ্গল সংসাধিত হইল। অন্যথা আমার প্রজ্জ্বলিত ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে এবং আমি বোগ্দাদের বিরুদ্ধে প্রধাবিত হইব, এবং তন্নগরকে জীবিত মনুষ্য পরিশূন্য করিব। আপনার রাজ্য, আপনার নগর, —সমস্তই দাবানলে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।' খলিফা দূত প্রমুখাৎ এই কথা আকর্ণন করিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তুমি একবার জয়লাভ করিয়া এতাদৃক্ গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছ যে, মহম্মদের প্রতিনিধির অপমান জনক বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহস

করিয়াছ। জয় চিরস্থায়ী নহে ; অদ্য তুমি যে জয় লাভে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বিবেচনা করিতেছ, হয়ত কল্যই তোমাকে পরাজয় রূপ দারুণ মনস্তাপে জর্জ্জরিত কলেবর হইতে হইবে। আমি মহম্মদের প্রতিনিধি ; পৃথিবীস্থ তাবৎ ভূপালই আমার আজ্ঞা প্রতিপালনে বাধ্য। তুমি কি জাননা, শত শত পার্থিব মহীপালের অদৃষ্টনেমী আমা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। এই সকল রাজগণ আমার আজ্ঞানুসারে একত্রিত হইয়া পারস্য দেশ হইতে আক্রমণকারিদিগকে দূরীভূত করিবে. এবং তুরাণ দেশে গমন করিয়া ধর্ম্মবিরোধী মোগলগণকে প্রদমন করিবে। শোণিত-স্রোতে পৃথিবী প্রক্ষালিত করিতে আমার কোনরূপ বাসনা নাই। যদি এক্ষণেও তুমি সৎবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া খোরাসান হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন কর তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিব।' হোগল খাঁ এতচ্ছ্রবনে কোপানলে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি অসংখ্য রণকুশল সৈন্যে সুশোভমান হইয়া বোগদাদে আগমন করিতেছি। আপনি এক্ষণে ভীষণ যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই পাইবার আশা করিতে পারেন না।"

এই অভিমানের সংবাদ বোগদাদের চতুর্দ্দিকে সম্প্রসারিত হইলে, সকলেই ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। খলিফা দুষ্ট উজিরের পরামর্শে, ঐশ্বরিক অনুগ্রহে এই বিপদ নিরাকরণ করিবেন ভাবিয়া, নগর সংরক্ষণার্থ অন্য কোন রূপ উপায় অবলম্বন করিলেন না। তিনি হোলগ খাঁকে অভিসম্পাতের ভয় দেখাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু হোলগ খাঁ ভয়-শীল ছিলেন না। তিনি অভিসম্পাতের ভয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বোগদাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি দিনেয়ার নামক স্থানে উপনীত হইলে, খলিফা প্রেরিত এক দূত আসিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিলেন, 'আপনি নির্ব্বিবাদে যদি এদেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন, তাহা হইলে খলিফা মোগল রাজকে বার্ষিক কর প্রদান করিবেন।' হোলগ খাঁ এ সকল প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া বোগদাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মোগলগণের অগ্রবর্ত্তী সৈন্য সমূহ বোগদাদীয় সৈন্যদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইলে মোগলদিগের সহিত এই সৈন্য দলের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মোগলেরা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। পর দিন মোগলদিগের মূল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাদিগের সহিত বোগদাদীয় সৈন্যদিগের যে আর একটী ভীষণ যুদ্ধ সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে শেষোক্তেরা পরাজিত হইয়া নগরে পলায়ন করে। অতঃপর মোগলেরা বোগ্দাদ অবরোধ করিল। সুপ্রসিদ্ধ আলীবংশ্যগণ এই সময়ে প্রধ্বংস বেবিলনের অনতি দূরবর্ত্তী হেলীনগরে বাস করিতে ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে খলিফাগণ তাঁহাদিগের প্রতি অনেক অত্যাচার প্রকাশ করিয়াছিলেন, হোলগ খাঁ বোগদাদ অবরোধ করিয়াছেন, এই সংবাদ আকর্ণন করিয়া তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ; এবং মোগল রাজ কুমারকে কহিয়া পাঠাইলেন, 'আমাদিগের বংশে সুবিখ্যাত আলী কর্ত্তৃক অতি যত্নে সংরক্ষিত যে কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে তাহাতে বোগ্দাদের পতন যে অদূরবর্ত্তী তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। বোধ হয়,

আপনা হইতেই বোগ্দাদ বিনষ্ট হইবে।' হোগল খাঁ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং উৎসাহে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

ক্রমশঃ।

গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তিস্বীকার।

কমলা। (উপন্যাস) শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা। আদরিণী কার্য্যালয় হইতে শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৹ আনা।

প্রকৃত প্রস্তাবে সমালোচ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানিকে 'নভেল' বলা যায় না। ইংরাজিতে যাহাকে নভেল বলে, বাঙ্গালায় তাহা বুঝাইবার জন্য ঠিক্ কোন শব্দ এখনও চলিত হয় নাই। সাধারণতঃ উপন্যাস শব্দ নভেল শব্দের প্রতিপাদক রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। যদি উপন্যাস শব্দ ঠিক নভেল বুঝাইবার জন্যই প্রয়োগ করা হয় এবং তাহা লেখকের ইচ্ছানুসারে গোলমাল করিয়া ব্যবহার করা না হয়, তাহা হইলে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। নভেল আমাদের দেশে পূর্ব্বে ছিল না। ইংরাজির অনুকরণে বাঙ্গালায় নভেলের আবির্ভাব হইয়াছে। ইংরাজিতে যাহাকে 'ষ্টোরি' বলে এদেশে তাহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই আছে। নভেল ও ষ্টোরি এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। সেই প্রভেদ বজায় রাখিয়া দুইটী স্বতন্ত্র শব্দে এই দ্বিবিধ বিষয়ের নির্দ্দেশ করা সঙ্গত। যাহাকে ষ্টোরি বলা যায় বাঙ্গালায় তাহাকে গল্প বা আখ্যায়িকা বলিলে কোন দোষ ঘটে না।

আমরা বলিতেছিলাম সমালোচ্য পুস্তিকা খানি নভেল অর্থাৎ উপন্যাস নামে অভিহিত হইতে পারে না; ইহাকে ষ্টোরি অর্থাৎ আখ্যায়িকা বা গল্প বলাই আবশ্যক। উপন্যাস ও আখ্যায়িকার প্রভেদ কি তাহা বুঝাইবার এ স্থল নহে।

এই উপাখ্যানে গল্পরহস্য (plot) কিছুই নাই। ইহা সরল কথায়, সরলভাবে সরল পথে একটী উদ্দেশ্যের চরম ফল (consummation) দেখাইবার অভিপ্রায়ে ধাবিত। প্রথমে বাল্যবিবাহের দোষ, পরে বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা এই আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থকার সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ একটী নিত্য পরিচিত ও সর্ব্বজন জ্ঞাত ঘটনা অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান গ্রন্থে কোন নূতনত্ব নাই।

গ্রন্থের কোন কোন অংশ অসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করিয়াছি। কমলার জনক জননী লোকাপবাদ হেতু একমাত্র নিরাশ্রয়া রুগ্না মরণাপন্না কন্যাকে নিরপরাধিনী জানিয়াও গৃহবহিষ্কৃতা করিয়া দিল, এ দৃশ্য নিতান্ত অসঙ্গত। এরূপ ঘটনা সম্ভব হইলেও তাহার চিত্র সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত না করাই শ্রেয়ঃ। গ্রন্থকার যদি কমলার পিতা মাতাকেও সমাজে পতিত করাইতেন এবং তাহার পরিণাম স্বরূপে সেই পরিবারের অশেষ কষ্ট ও বিপদের চিত্র দেখাইয়া অবশেষে কমলার মৃত্যু দ্বারা

গ্রন্থের অবসান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইত এবং পাঠকের হৃদয়ে সেই ঘটনার দৃঢ়তর রূপে অঙ্কপাত করিত।

গ্রন্থকারের লিপি নিপুণতা মন্দ নহে। বর্ত্তমান গ্রন্থ সুপাঠ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

গোপালন অর্থাৎ গো প্রতিপালন ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। রাজা শ্রীকমলকৃষ্ণ সিংহ প্রণীত। শ্রীগোলোকচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই গ্রন্থে গোজাতির ইতিহাস, গো দুগ্ধের উপকারিতা ও তাহার পরিমাণ বাড়াইবার প্রক্রিয়া, গাভী সমূহের নানাবিধ পীড়া ও তাহার চিকিৎসার্থ বহুবিধ ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ বিন্যস্ত হইয়াছে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে গোজাতি ক্রমশঃ যেরূপ হীনদশাপন্ন হইয়া যাইতেছে তাহাতে সকলের চিত্ত যদি এই সময়েই এই বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ আকৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে উত্তরকালে সমূহ অনিষ্ট ঘটিবে সন্দেহ নাই। গোদুগ্ধ ও তদুৎপন্ন সামগ্রীই বঙ্গের প্রধান আহার্য্য। গোজাতি এদেশের কৃষি কার্য্যের একমাত্র অবলম্বন। এই সকল উপকারিতা আলোচনা করিয়াই বোধ হয় আর্য্যগণ গোজাতিকে দেবস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছেন। সেই গোজাতির রোগাদির চিকিৎসা প্রক্রিয়া ও তাহাদের ক্রমোৎকর্ষের ব্যবস্থা শিক্ষা করা সকলেরই আবশ্যক। বর্ত্তমান গ্রন্থ তৎপক্ষে সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই। আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিলাম; বিশেষতঃ গ্রন্থকার ধনিসন্তান ও ধনবান। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি যে বিলাসসুখে প্রমত্ত না হইয়া এবম্বিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় সময় পাত করিয়া থাকেন ইহা নিতান্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

অশ্বতত্ত্ব। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শ্রীরুক্মিণীকান্ত ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ময়মনসিংহ ভারত মিহির যন্ত্রে শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

গোজাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন যেমন পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তেমনি অশ্বজাতির উন্নতি ও রক্ষা সাধন বর্ত্তমান গ্রন্থের লক্ষিত। সুতরাং এ গ্রন্থও সবিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে তাহার সন্দেহ নাই। তবে গোপালন অপেক্ষা অশ্ব তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অনেক অল্প; কারণ—গবাপেক্ষা অশ্বের প্রয়োজনীয়তা এ দেশে বহুলাংশে কম। এ দেশে সাধারণতঃ অশ্ব বিলাসের সামগ্রী, গো জীবন যাত্রার অপরিহার্য্য সঙ্গী।

এই গ্রন্থে, সংস্কৃত, উর্দ্দু ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে নানা বিষয়ক প্রমাণ সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত বিষয় সমূহ বিশদ ও সরল ভাষায় লিখিত।

বোগদাদ-পতন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মোগলেরা দৃঢ়তা অটলতা ও অধ্যবসায়ের সহিত বোগদাদ অবরোধ করিয়া রাখিলেন। খলিফা ভীতি পূর্ণ হৃদয় হইয়া দূতের পর দূত হোলগা খাঁ সমীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণের দুর্ভাগ্য বশতঃ হোলগ খাঁ নগরবাসীদিগের নিকট হইতে একটী সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যেরূপে পারি, নগরবাসিগণকে ইহার প্রতিফল প্রদান করিতেই হইবে।" তিনি নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যে সকল মুসলমান অবিলম্বে তাঁহার নিকট আত্ম সমর্পণ করিবে, তাহারাই কেবল ভবিষ্যতে ক্ষমা ও দয়ার ভাজন হইবে, তদ্ব্যতীত এক জনও ক্ষমা ও দয়ার অধিকারী হইবে না।" তাঁহার এই ঘোষণা শ্রবণে সহস্র সহস্র বোগদাদবাসী দলে দলে আসিয়া মোগলদিগের নিকট আত্ম সমর্পণ করিল।

মোগলেরা এক্ষণে বিশ্বাস ঘাতকতা করিবার সম্পূর্ণ অবসর প্রাপ্ত হইল। আত্ম সমর্পিত ব্যক্তিগণ দশ ভাগে বিভক্ত হইল; এবং মোগলদিগের শাণিত অসি মুখে নিপতিত হইয়া আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। মাজ্‌হীদ ও দশসহস্র আত্মীয়ের সহিত সেনাপতি সলিমান ইহলোক হইতে অপসারিত হইলেন। খলিফা মোতাসিম নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইয়া পরামর্শ জন্য বিশ্বাসঘ্ন উজিরের দিকে নেত্র নিপাতিত করিলেন। পাপিষ্ঠ উজির কেবল এই মাত্র উত্তর দিলেন, "এক্ষণে ইহার কোন উপায় নাই।" অবশেষে খলিফা দুই পুত্র, সায়দ কাজী প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারী ও তিন সহস্র নগরবাসী সমভিব্যাহারে হোগল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মোগল রাজ কুমার প্রকাশ্য শিষ্টাচারের সহিত প্রণত ভূপালের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি খলিফাকে আদেশ করিলেন, "আপনি নগরবাসীদিগকে অস্ত্র শস্ত্র বিজেতার নিকট সমর্পণ করিয়া নগর তোরণে উপস্থিত হইতে আদেশ প্রদান করুন।" খলিফা অবনত মস্তকে তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালন করিলেন। নগরবাসিগণ নগর তোরণে উপনীত হইবা মাত্র বিশ্বাস ঘাতক মোগলদিগের কর্ত্তৃক নিষ্ঠুর রূপে বিনষ্ট হইল। নগর এক্ষণে রক্ষক-বিহীন হইয়া উঠিল, অমনি মোগলেরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিল। নগর বিলুণ্ঠিত ও অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইল, রাজপথে শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইল, এবং সুমনীষা-সম্পন্ন বিদ্যা-বিসারদ মহাত্মাগণের জ্ঞানের অক্ষয়-ভাণ্ডার-স্বরূপ বিবিধ সদ্গ্রন্থ দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া গেল। যে সকল গ্রন্থ অনুকূল দৈব বশে অগ্নির হস্তে পরিত্রাণ পাইল, তাহাও মোগলদিগের কর্ত্তৃক টাইগ্রীস নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। বোগদাদ বিলুণ্ঠনে একজন সামান্য যোদ্ধা এত লুণ্ঠিত দ্রব্য পাইয়াছিল যে, তাহাদিগের অধিনায়কগণও ইহার পূর্ব্বে তাহা কখন দৃষ্টিগোচর করেন নাই। ক্রমাগত দুই দিন এইরূপ লুণ্ঠন

ও হত্যা চলিতে লাগিল; তথাপি তাহা শেষ সীমায় উপনীত হইল না।

অতঃপর হোলগা খাঁ খলিফা বিনির্ম্মিত প্রাসাদে উপনীত হইয়া মোগল সম্রাট্‌দিগকে একটী আনন্দ-ভোজ প্রদান করিলেন। খলিফা তাঁহার সম্মুখে সমানীত হইলে, তিনি বিদ্রূপ-চ্ছলে কহিলেন, "আমাদিগকে অভ্যর্থনা করা আপনার উচিত ছিল। কেন না, আমরা আপনার অতিথি। আপনি আমার জন্য কি বহুমূল্য দ্রব্য রাখিয়াছেন, তাহা আমাকে দেখাইয়া দিউন।" খলিফা এক সিন্দুক উদ্ঘাটন করিয়া দুই সহস্র থান কাপড়, দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা এবং অসংখ্য হীরক ও রত্নরাজি তাঁহাকে দেখাইলেন। হোলগা রোষ-লোহিত লোচনে তৎসমুদায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি এক্ষণেও বাগ্‌দেশ অবলম্বন করিতেছ; যে সকল দ্রব্য দেখাইলে, তাহা সকলেই দেখিতে পায় এবং অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে। তোমার গুপ্তধন কোথায়? তাহা অবিলম্বে আমাকে দেখাও।" খলিফার আজ্ঞানুসারে মন্ত্রভবন ক্ষত খনন হইলে, তন্মধ্য হইতে স্বর্ণ, হীরক ও রত্নাদি পরিপূর্ণ অসংখ্য পাত্র বাহির হইল। পারসিক ইতিহাসবেত্তাগণ কহেন, "এই সকল মহার্ঘ দ্রব্য যখন হোলগা খাঁর সমীপে আনীত হইয়া রাশীকৃত হয়, তখন তাহা পর্ব্বত প্রায় উচ্চ হইয়া উঠে।" হোলগা এক পাত্র রত্ন-সমূহে পূর্ণ করিয়া, খলিফাকে ভোজন করিবার নিমিত্ত প্রদান করিলেন। খলিফা যখন পাত্র সম্মুখে স্থাপন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন, তখন হোলগা কহিলেন; "রত্নরাজি খাদ্য নহে; ইহা দ্বারা জীবন ধারণ করা যায় না। তবে তুমি ইহা দ্বারা আত্ম রক্ষার্থ সেনা রাখিলেনা কেন? অথবা আমাকে দিয়া সন্তুষ্ট করিলে না কেন?"

এই ঘটনার পর দিন হোলগা শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে, বোগ্‌দাদের ধ্বংস পুনর্ব্বার আরম্ভ হইল। খলিফার বিলাসভবন ও গোরস্থান, মস্‌জীদ ও উৎকৃষ্ট গৃহ সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গেল। যত লোক মোগলদিগের হস্তে মৃত্যুর কুক্ষিশায়ী হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পারসিক ইতিহাসবেত্তাগণ কহেন, "কয়েক দিন টাইগ্রিস নদী শোণিত প্রবাহিনী রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।" নগরে মৃত ব্যক্তি পচিয়া এরূপ দুর্গন্ধ সঞ্জাত হয় যে, হোলগা খাঁ স্বয়ং নগর পরিত্যাগ করিয়া ও ক্রেমেলোনা নামক গ্রামদ্বয়ে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১২৫৯ খৃঃঅব্দে খলিফা মোস্তাসিম, দুই পুত্র ও পঞ্চজন বিশ্বাসী খোজার সহিত, মৃত্যু মুখে নিপাতিত হইলেন। মোস্তাসিমই বোগ্‌দাদের শেষ নরপতি। যে বোগ্‌দাদ এক দিন সিন্ধুনদ হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত আপন গৌরব জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা দৈবের অচিন্ত্যপূর্ব্ব আবর্ত্তনে সেই বোগ্‌দাদ এক্ষণে বিনষ্ট হইল। এই অবধি বোগ্‌দাদের পূর্ব্ব সৌভাগ্যের শেষ চিহ্ন, কালের অনন্ত বীচি মালায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বিভিন্ন শ্লোকাবলী।

গগনেতে সুধাকর লুকাইলে কলেবর
অমনি চন্দ্রিকাসতী তখনি পলায় রে।
যবে জলধর দলে পবন উড়ায় বলে
চপলা গগন তলে দেখা নাহি যায় রে।
অবলা জনের গতি যেই পথে যান পতি
প্রমদারা শীঘ্রগতি সেই পথে ধায় রে।
বিচেতন আছে যত তাহারাও অবিরত
প্রমাণ করিছে বুঝি সযতনে তায় রে।

কুমারসম্ভব।

নায়ক সমীপে নায়িকার পত্র
ও তাহার প্রত্যুত্তর।

থাক প্রিয়তম তথা কিছুদিন
এ দেশে এখন এসোনা আর।
হিমকর-কর জ্বালায় শরীর
বাসোচিত নহে এ দেশ আর।

হিমকর কর জ্বালায় শরীর
মনেও প্রেয়সি আনিতে নাই।
বিয়োগ তাপিত হৃদয় আমার
বাস তাহে তব তাপিত তাই।

উদ্ভট।

নায়িকার পত্র ও সহসোপনীত
নায়কের প্রত্যুত্তর।

তব প্রতি অভিলাষ তোমার মিলনে আশ
কি আর বলিব নিরদয়।
জানিনা হৃদয় তব আমারে ত মনোভব
তাপিত করেছে অতিশয়।

প্রেয়সি তাপিত তুমি জ্বলিতেছি সদা আমি
অনঙ্গের বিষম জ্বলনে।
শ্রীহীন শশাঙ্ক যত কুমুদী কি হয় তত
দিবসেতে বল সুলোচনে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল।

হৃদয়-কুসুমের আশাবৃন্ত।

প্রণয়ে পূরিত ললনা-হৃদয়
কোমল কুসুম-তুল।
বিরহ-জ্বলন পারে কি সহিতে
সেই সুকোমল ফুল।
বিয়োগের তাপে শুকায়ে শুকায়ে
সে ফুল ঝরিয়া যায়।
অতি দৃঢ়তর আশা বৃন্ত তার
নহিলে কে রাখে তায়।

মেঘদূত।

পরিধেয়।

কয়েকটী অসভ্যজাতি ব্যতীত সমস্ত মানবমণ্ডলী পরিধেয় ব্যবহার করে। বস্ত্রাদি পরিধান না করিলে মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে না, এমত নহে; কারণ আণ্ডামান দ্বীপের আদিমবাসীরা এককালে সমস্ত শরীর উলঙ্গ রাখিয়াও জীবন ধারণ করে, (কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতেছে)। ছোট নাগপুরস্থ অসভ্যজাতিরা

প্রায় বস্ত্রশূন্যাবস্থায় দিনাতিপাত করে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ঋতুগণ ইহাদিগের কোন বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু অসভ্যজাতির মধ্যে ঐরূপ প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া সভ্যজাতির পক্ষে ঐ নিয়ম কোন প্রকারে প্রচলিত হইতে পারে না। তাহাদের আচার, ব্যবহার, পরিশ্রম, জীবন-ধারণোপায় ইত্যাদির নিমিত্ত পরিধেয় অত্যন্ত আবশ্যক। পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইটী, যথা—(১) শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর ক্লেশদায়কতা দূর করা, ও (২) লজ্জা নিবারণ করা।

শীত বা গ্রীষ্ম ঋতুর আতিশয্যজনিত ক্লেশ দূর করিবার নিমিত্ত পরিধেয় আবশ্যক। এদেশে বৎসরের মধ্যে প্রায় ৬ মাস কাল গ্রীষ্মের আতিশয্য হইয়া থাকে, ও ৩ মাস শীতের আধিক্য হয়। অবশিষ্ট তিন মাস শীত বা গ্রীষ্মের আধিক্য থাকে না। সুতরাং এদেশে এমত পরিধেয় ব্যবহার করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা ঐ নয় মাস কাল কোন ক্লেশ বোধ না হয়। অর্থাৎ গ্রীষ্মের উত্তাপ ও শীতের শৈত্য দূর করিতে পারে, এরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা কি?

কার্পাস নির্ম্মিত ধৌত বস্ত্রই এদেশের প্রধান পরিচ্ছদ। এক্ষণে দেখিতে হইবে তুলার কি কি গুণ থাকাপ্রযুক্ত তাহা এদেশে এত আদরণীয় হইয়াছে। তুলার "তন্তু কঠিন, বহুকাল স্থায়ী," উষ্ণ হইলে উহার আয়তন হ্রাস হয় না, জল শোষণ করে না, এবং উত্তাপ পরিচালক নহে", (পার্কস)। উহা এদেশে সুলভ।

এই সমুদয় গুণ আছে বলিয়া এদেশে কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের এত আদর। উহা গ্রীষ্মের উত্তাপ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না, ও শীতকালে শরীরের উত্তাপ বহির্গত হইতে দেয় না, আরও উহার শুভ্রবর্ণ উত্তাপ শোষণ না করিয়া বিক্ষেপ করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত কার্পাস বস্ত্রের প্রধান গুণ এই যে, উহা প্রত্যহ ধৌত ও পরিষ্কৃত হইতে পারে, রেশম বা পশমের বস্ত্রাদি প্রত্যহ ধৌত করিলে শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব বৎসরের মধ্যে ৯ মাস কাল কার্পাসনির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করিলে স্বাস্থ্যের উপকার বই অপকার নাই। কেবল শীতকালে ৩ মাসের নিমিত্ত অন্য পরিচ্ছদ আবশ্যক।

রেশম ও পশম এতদুভয়ই এদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশমের প্রধান গুণ এই যে, "উহা অত্যন্ত মন্দ উত্তাপ পরিচালক; এবং উত্তম জল শোষক।" স্পেনদেশীয় মেরিনো-নামক মেষের লোম হইতে মেরিনো প্রস্তুত হয়, কিন্তু সচরাচর উহাতে অধিক পরিমাণ কার্পাস মিশ্রিত থাকে। ফ্লানেল, বনাত, কম্বল ইত্যাদি সামগ্রী পশম নির্ম্মিত। অধুনা এদেশে পট্টবস্ত্র অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; এনিমিত্ত কার্পাস, পশম ও পাট এই তিন সামগ্রীর প্রভেদ নির্ণয় করিতে পারা অতি আবশ্যক।

অনেক সময় পশম বিবেচনায় অনেকে রঞ্জিত কার্পাস পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া থাকেন। উহাতে দুইটী অপকার; প্রথমতঃ স্বল্প মূল্যের সামগ্রী অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয়, দ্বিতীয়ঃ শীত বা বর্ষাকালে পশম বিবেচনায় কার্পাস পরিচ্ছদ পরিধান করিলে পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। পশম স্পর্শ করিলেই অধিক বা অল্প 'কুট্ কুট্' করে, পাট বা কার্পাস তাহা করে না; পশমের তন্তু সমুদয় ঢ়া [illegible] কোঁকড়া; পাট ও কার্পাস সরল নহে। অল্প উষ্ণ জলে পশমের তন্তু

সঙ্কুচিত হয়, তুলার সেরূপ হয় না; গন্ধক-দ্রাবক পশমকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, কিন্তু কার্পাসকে বিগলিত করে এবং উহাতে আইওডাইন প্রয়োগ করিলে নীলবর্ণ ধারণ করে। পট্টবস্ত্র উত্তম শুভ্রবর্ণ ধারণ করিতে পারে না এবং উহা অল্প চিক্কণ।

অতি পূর্ব্ব কালাবধি এদেশে ধুতি, উড়ুনি ও শাটীর ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে হিন্দু রাজত্বকালে অন্যান্য পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইত। বঙ্গভূমে আসিয়া আর্য্যজাতি কি কারণে ঐ সমুদয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না।

ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র তাঁহার "ইণ্ডো-এরিয়ান্" নামক গ্রন্থের ১৭৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, যে হিন্দুদিগের পরিচ্ছদের আকার ও গঠনের বিষয় বেদ হইতে কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। বোধ হয়, আধুনিক লোকের ন্যায় তৎকালেও অধিকাংশ লোকেই ধুতি পরিধান করিত। সেকেন্দর সার অনুচরগণ ২২শ শতাব্দি পূর্ব্বে হিন্দুদিগকে ধুতি পরিধান করিতে দেখিয়াছিল। পরে ডাক্তার মিত্র রামায়ণ ও মহাভারত হইতে অনেক উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে উচ্চপদস্থ ও ভদ্রলোক অন্যান্য প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। যথা;—জামা, চাপকান্, ঘাগরা, পায়জামা, কাঞ্চুলিকা, জাঙ্গিয়া, অঙ্গরক্ষা, চোল ও চাদর। ১৯৯ পৃষ্ঠায় স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদের বিষয় লিখিয়াছেন যে, "আমার বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকেই শাটী পরিধান করিত; সাধারণত হইলে কাঞ্চুলিকাও ব্যবহার করিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহার উপর জাঙ্গিয়া পরিয়া সর্ব্বোপরি চাদর ব্যবহার করিত। কেহ কেহ ঘাগরা বা পায়জামা ব্যবহার করিত।"

মস্তকাবরণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যে যে দেশে শরীর উত্তমরূপে আবৃত নহে, তথায় মস্তকে কেশ ব্যতীত অন্য কোন আবরণ থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু নানাপ্রকার টুপি, পাগড়ি ইত্যাদি মস্তকাবরণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

চর্ম্মপাদুকার ব্যবহার বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, "বিষ্ণু পুরাণে আদেশ করেন যে, যাঁহারা তাহাদের শরীর রক্ষা করিতে চাহে, তাহারা যেন চর্ম্মপাদুকা শূন্য থাকে না" (২২৩ পৃষ্ঠা)। পুরাণে বাটীর বাহিরে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতে আদেশ করে। হিন্দু কুলকামিনীরা চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন কি না, তাহা ডাক্তার মিত্র স্থির করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি এমন কোন পুস্তক দেখেন নাই, যাহাতে কুলনারীগণের চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শরীরকে ঋতুবিশেষের উপদ্রব হইতে রক্ষা করাই যদি পরিচ্ছদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে কেবল একখান ধুতি পরিধান করিয়া কিরূপে ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? এদেশে লোকে সচরাচর যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, দেহের কতক অংশ নয়নের অদৃশ্য রাখাই পরিচ্ছদের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি বস্ত্রাদি পরিধানের উদ্দেশ্য উহাই হইত, তবে আমাদের আর এ বিষয়ের বলিবার কিছুই থাকিত না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় পরিচ্ছদের প্রধান উদ্দেশ্য শরীর রক্ষা করা। এ নিমিত্ত যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

স্বেদ নিঃসরণ করাই ত্বকের প্রধান ধর্ম্ম,

ঐ স্বেদে শরীরের অকার্য্যকর পদার্থ সমূহ অতিরিক্ত জলের সহিত মিশ্রিত থাকে। ত্বকের কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। শীতল বা জলসিক্ত বায়ু ত্বকে আঘাত করিলে হঠাৎ ঐ কার্য্য স্তব্ধ হইয়া যায়, ও স্বেদ নিঃসৃত হইতে পারে না। স্বেদ নিঃসৃত হইয়া শুষ্ক বা বাষ্পীভূত হয়, তৎকালে ত্বকের উত্তাপ বিলুপ্ত হয়। অতি শীতল বায়ু গাত্রে না লাগিলে অনিষ্ট হয় না এমত নহে। শীতল ও উষ্ণ এই দুই শব্দ আপেক্ষিক ভাব প্রকাশ করে, সুতরাং যৎকালে ত্বকের উত্তাপ ৯০০ অংশ, তখন ৮৫ অংশের উত্তাপ গাত্রে লাগিলেই শীতবোধ হইবে, এবং যখন ত্বকের উত্তাপ ৯০ অংশ তখন ৯৫ অংশের উত্তাপ লাগিলেই অত্যন্ত গরম বোধ হইবে। সুতরাং যাহাতে ত্বকের উত্তাপ সর্ব্বদাই সমান রাখিতে পারা যায় তাহাই করা উচিত। এনিমিত্ত সর্ব্বদাই সমস্ত শরীর কোন না কোন আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা অতি আবশ্যক। প্রয়োজন মত উহার তারতম্য করা উচিত। যে সময় বায়ু শীতল বা সিক্ত থাকে তখন রেসম বা পশমের কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে; গ্রীষ্মকালে বা মধ্যাহ্নে পাতলা ও কার্পাস নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত।

শরীরের অধোভাগ আবৃত রাখিয়া ঊর্দ্ধাংশ অনাবৃত রাখা অত্যন্ত অহিতকর প্রথা। মস্তক শীতল রাখাই উচিত; তাহার কারণ এই যে শরীরের সমস্ত যন্ত্রাপেক্ষা মস্তিষ্কে অধিক শোণিত প্রবাহিত হয়, তথায় অধিক জীবাণুধ্বংস ও উত্তাপ উৎপন্ন হয়। সেই অতিরিক্ত উত্তাপ বিলুপ্ত করাই বোধ হয় কেশের প্রধান উদ্দেশ্য। যখন কেবল কেশদ্বারা ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন না হয় তখন স্নিগ্ধকারী তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করা আবশ্যক হইয়া উঠে, নচেৎ পীড়া জন্মে। আবার যথায় প্রখর সূর্য্যের উত্তাপ মস্তিষ্কের উত্তাপ বৃদ্ধি করে, তথায় ঐ সূর্য্যোত্তাপ হইতে মস্তককে রক্ষা করা আবশ্যক, অর্থাৎ মস্তকাবরণ ব্যবহার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। বোধ হয় এই সমুদয় কারণেই পশ্চিমাঞ্চলে তিলের তৈল ও টুপী বা পাগড়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর্য্যজাতি বঙ্গদেশে আসিয়া ভূমির আর্দ্রতাহেতু, বা অন্য কোন্ কারণে উভয় প্রথাই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা স্থির করা যায় না। গ্রীষ্মকালে প্রখর রবির উত্তাপে বাটীর বহির্ভাগে অনাবৃত মস্তকে গমন করা কতদূর অস্বাস্থ্যকর তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। হেমন্ত ও শীতকালের রাত্রিতেও অধিকক্ষণ অনাবৃত মস্তকে বাটীর বহির্ভাগে থাকিলে যে পীড়া হইয়া থাকে তাহা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। এই সমুদয় হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্যদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় বঙ্গদেশেও মস্তকাবরণ আবশ্যক করে, এবং উহার অভাবে নানা প্রকার পীড়া জন্মে ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। টুপী এরূপ শুভ্র ও মসৃণ হওয়া আবশ্যক যে তাহা সূর্য্যের উত্তাপ বিক্ষেপ করিয়া দিতে পারে।

কেহ কেহ বলিবেন যে কেন ছত্র ব্যবহার করিলে কি ঐ উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে না? আমাদের উত্তর এই যে, ঘন শুভ্রবর্ণের ছত্র ব্যবহার করিলে কতক পরিমাণে সাধিত হইতে পারে বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপ নয়। ছত্র ব্যবহার করিলেই একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গকে ছত্রধারণে নিযুক্ত করিতে হয়, টুপী পরিধান করিলে ঐরূপ

করিতে হয় না। যাহাকে হস্তদ্বারা কর্ম্ম করিতে হইবে, সে কিরূপে ছত্রধারণ করিয়া মস্তককে সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে; যদি মনুষ্য ইচ্ছানুসারে মধ্যাহ্ন কালে গৃহের মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারিত, তাহা হইলে টুপীর আবশ্যক হইত না। কোন অনাবৃত স্থানে মধ্যাহ্নকালে বহু-লোকের সমাগম হইলে তথায় প্রত্যেকে একটী ছাতা লইয়া গেলে ১০০০ লোকের স্থানে ৩০০ লোকের অধিক দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না। অবস্থানুসারে লোককে গ্রীষ্ম কালের মধ্যাহ্ন রবিকিরণেও বিস্তর পরিশ্রম করিতে হয়, সে সমুদায় ব্যক্তির কোন প্রকার মস্তকাবরণ আবশ্যক নাই বলা কেবল কুসংস্কার মাত্র। স্বাস্থ্যরক্ষার ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে "আমাদের দেশের অনেকে ইংরাজ জাতির অনুকরণ প্রিয় হইয়া টুপী ও কমফর্টার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন।" ভাল যদি অনুকরণই করিয়া থাকে তাহাতে দোষ কি, অনুকরণ ব্যতীত আমরা কি শিক্ষালাভ করিতে পারি? সন্তান ভূমিষ্ট হইয়া অবধি অনুকরণ করিতে অভ্যাস করে, ও মরণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অনুকরণ প্রিয়তা দূর হয় না। আমরা ইংরাজী পদ্য, নাটক, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি অভ্যাস করি, ও ইংরাজদিগের ন্যায় লিখিতে পড়িতে, পুস্তক প্রস্তুত করিতে, বক্তৃতা করিতে শিক্ষা করি; এ সমুদয়ই অনুকরণ দ্বারা হইয়া থাকে। তবে ইংরাজদিগের ন্যায় সমস্ত শরীর আবৃত রাখিতে, কিম্বা টুপী পরিধান করিতে অনুকরণ করিলেই কি মহাপাপ হয়, তাহাত বুঝিতে পারা যায় না। অনেকেই অনুকরণের নিন্দা করেন, কিন্তু অনুকরণ ব্যতীত কোন শিক্ষাই হয় না। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অন্যের অনুকরণ করে, সে ঐরূপ করিলে তাহার মঙ্গল হইবে বলিয়াই করে। আপনার অনিষ্টের নিমিত্ত প্রায় কেহ অন্যের অনুকরণ করে না; কখন কখন সঙ্গদোষে মন্দ বিষয় অনুকরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে বটে কিন্তু এক্ষণে দেখিতে হইবে যে মদ্যপান অনুকরণ করা ও টুপী ও মোজা পরিধান অনুকরণ করা সমান কি না? মদ্যপান করা যেরূপ অনাদৃত ও ঘৃণিত মস্তকাবরণ ব্যবহার করা সেরূপ নহে। তবে ইংরেজী টুপী ব্যবহার করিলে জাতীয়ত্ব লোপ পায়, বলিয়া অন্য কোন প্রকার উপযুক্ত মস্তকাবরণ ব্যবহার করা আবশ্যক। অতএব সে বিষয়ে উপদেশ না দিয়া অনুকরণের দোষ ব্যাখ্যা করিলে কি ফলোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা? এদেশে বহুকালাবধি "পিরাণ" ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, উহা কি বঙ্গবাসীর আদিম অবস্থা হইতে চলিত, কি বিজাতীয়দিগের হইতে গৃহীত? ডাক্তার ফাউলারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে কিন্তু ডাক্তার ফাউলার কি টুপী ব্যবহার করিতেন না? বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগের লোকে টুপী পরিধান করিতে কোন আপত্তি করে না, তবে আমরা বঙ্গবাসী হইয়া কেন উহাতে আপত্তি উত্থাপন করি? যদি টুপী পরিধান করিতে হয়, তবে কোন্ প্রকার টুপী ব্যবহার করা উচিত? মস্তকাবরণের বিষয় ডাক্তার পার্কস বলিয়াছেন, যে শৈত্য, উত্তাপ ও বৃষ্টি হইতে মস্তককে রক্ষা করাই মস্তকাবরণের উদ্দেশ্য। উহা আরামজনক ও লঘু হওয়া উচিত, এবং কেশের উপর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকা উচিত। কেশ ও টুপীর মধ্যস্থ বায়ু পরিচালনের উপযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখা আবশ্যক। অধুনা বঙ্গদেশে যে সমুদায় মস্তকাবরণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে

তাহার প্রায় অধিকাংশই রেশম বা পশম নির্ম্মিত, সুতরাং ঐরূপ আবরণ দ্বারা যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন হয় না, বরং অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। চীনদেশে এক প্রকার তৃণের মস্তকাবরণ ব্যবহৃত হয়, তাহা অত্যন্ত লঘু, উত্তাপ নিবারক ও সছিদ্র। এদেশে যে সোলার টুপী নির্ম্মিত হয় তাহাও মন্দ নহে, কিন্তু সোলার টুপীর পার্শ্বে ছিদ্র না থাকিলে শীঘ্রই গরম হইয়া উঠে। কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রের পাগড়ীও অতি উত্তম, উহা লঘু ও শুভ্র হইলে উপকার বই অপকার নাই। কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রেরই হউক, সোলারই হউক, বা চীনদেশীয় তৃণেরই হউক মস্তকাবরণের উল্লিখিত কয়েকটী গুণ থাকা আবশ্যক। বোম্বাই প্রদেশে প্রচলিত কার্পাস নির্ম্মিত বৃহৎ পাগড়ী (যাহার ব্যাস ১৷৷০ কিম্বা ২ হস্ত পরিমিত) কখনই আরামজনক বলিয়া বোধ হইতে পারে না। শীত ও হিম নিবারণের নিমিত্ত রেশম বা পশমের টুপীই ভাল। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে গাত্রের এক অংশ আচ্ছাদিত রাখিয়া অপরাংশ অনাচ্ছাদিত রাখা স্বাস্থ্যবিরুদ্ধ, এনিমিত্ত যদ্বারা সমস্ত শরীর সমভাবে আচ্ছাদিত ও রক্ষিত হইতে পারে, এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

সর্ব্বদা একখান মাত্র ধুতি পরিধান করিয়া সমস্ত শরীর রক্ষা করা যায় না। ধুতির সহিত উড়ুনি ব্যবহার করিলেও হইবার সম্ভাবনা নাই। উড়ুনি ব্যবহারে বিলক্ষণ ব্যাঘাত আছে, কারণ উড়ুনি ব্যবহার করিলে কোন বিশেষ পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারা যায় না, করিলেই শীঘ্র উড়ুনি গাত্র হইতে স্খলিত হয়। ধুতি ও উড়ুনি পরিধান করিয়া কিঞ্চিৎকাল পদব্রজে গমন করিলেই উড়ুনি খসিয়া পড়ে ও হস্ত দ্বারা পুনঃ স্থাপন আবশ্যক করে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তিকে হস্ত দ্বারা কোন কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলে সে উড়ুনি ব্যবহার করিতে পারে না। ধুতি ও অঙ্গরক্ষা ব্যবহার করিলে কতক পরিমাণে উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে; কিন্তু ধুতির অসুবিধা না জানেন এমত লোক অল্প আছেন; অনেক সময় ধুতি কটিদেশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। কিম্বা কোঁচা বা কাছা খুলিয়া যায় একারণ সময়ে সময়ে লজ্জিত হইতে হয়। এই সমুদয় ও অন্যান্য নানা কারণে আধুনিক ধুতি পরিধানের প্রথা অসুবিধা জনক বলিয়া বোধ হয়।

মুসলমানের রাজ্যাধিকারের সহিত বঙ্গদেশে পাজামা, চাপকান, ও পাগড়ি ব্যবহার প্রচলিত হইল। ইংরাজদিগের আগমনের সহিত পাজামার পরিবর্ত্তে ট্রাউজার ব্যবহৃত হইল, এবং পুরাতন চাপকান্ পরিত্যক্ত হইয়া নূতন রূপ চাপকান ব্যবহৃত হইল। ক্রমে চাপকানের পরিবর্ত্তে চীনে কোট ও ইংরাজী কোট পর্য্যন্ত চলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বিদেশীয় রাজার আজ্ঞানুসারেই হউক, বা তাঁহাদের অনুকরণাভিলাষেই হউক, ঐ সমুদয় পরিচ্ছদ পুরাতন দেশীয় ধুতি ও উড়ুনি একবারে পরাভূত ও পদচ্যুত করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহার কারণ কি? ঐ সমুদয় বিজাতীয় পরিচ্ছদ কেবল রাজকীয় কর্ম্মচারীগণের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্য সাধন না করিয়া বরং অনিষ্টপাত করিতেছে, কারণ যে ব্যক্তি গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে ধুতি, অঙ্গরক্ষা, চাপকান ও মোজা ব্যবহার করে, তাহাদের ত্বক প্রাতঃকালীন বা রাত্রিকালীন অতি অল্প শীতল বায়ু সেবন

করিলেই পীড়িত হইবার সম্ভাবনা। ঐরূপ আচরণ দ্বারা ত্বকের দৈহিক উত্তাপ রক্ষা করিবার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, তাহা লোপ পায়। এ নিমিত্তই ঐ সমুদয় পরিচ্ছদ বাস্তবিক দেশীয় পরিচ্ছদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব আমাদের অভাব মোচন করিতে পারে এরূপ পরিচ্ছদ এপর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই; এক্ষণে যে সমুদয় পরিধেয় ব্যবহৃত হয়, বোধ হয় ক্রমে সে সমুদয়ই লোপ প্রাপ্ত হইবে, ও নূতন প্রকার পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইবে।

আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাজামা ও পিরাণ, এই দুই পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে প্রায় সমস্ত শরীর রক্ষা করা যাইতে পারে, পাজামার পরিবর্ত্তে পশ্চিম-বিভাগ নিবাসীগণের ন্যায় ধুতি পরিধান করিলেও বোধ হয় উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। অতএব গাত্র বস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া আবশ্যক, এক অংশ গলা হইতে উরুদেশের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরকে রক্ষা করিবে, অপরংশ কটি হইতে জানুর অধোভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরকে রক্ষা করিবে। এই অভিপ্রায়ে ধুতি ও পিরাণ, ট্রাউজার ও কোট, পাজামা ও চাপকান, এই তিনের মধ্যে যাহা সর্ব্বোত্তোভাবে সুবিধাজনক ও অল্প ব্যয়সাধ্য, তাহাই ব্যবহার করা উচিত।

পরিধেয় দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ পরিচ্ছদ ব্যবহার করা অত্যন্ত ভ্রম। বিশেষতঃ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত অর্থব্যয় করা সকলের পক্ষে সম্ভবে না, অতএব অধিকাংশ লোক যাহা সচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারিবে, এরূপ পরিচ্ছদ প্রচলিত হওয়া উচিত।

কোট, চাপকান, পিরাণ, এ সকলই বিজাতীয়, অতএব বিজাতীয়ের অনুকরণ করিতে হইলে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই অবলম্বন করা উচিত। বোধ হয় খাট পাজামা ও চীনেকোটের ন্যায় একটী কোট বা পিরাণ ব্যবহার করিলেই স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, উহাতে পরিশ্রমের ব্যাঘাত হয় না। এরূপ কোন পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত নহে যদ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস বা অন্য কোন শারীরিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত না জন্মে। পরিচ্ছদ গাত্রের সহিত লিপ্ত হইয়া থাকিবে অথচ ত্বকের কোন অংশকে পেষণ করিবে না।

এই সমুদায় পরিচ্ছদ ব্যতীত পাদত্রাণও আবশ্যক। ঐ অতি প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদের অভাবে এদেশীয় লোকে নানা যন্ত্রণা সহ্য করে। এদেশে যদি সকলেই পাদত্রাণ ব্যবহার করিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই সর্প ও অন্যান্য বিষধর জন্তুর অঘাতে এত অধিক লোক অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইত না। কত লোকে পাদুকাভাবে ধনুষ্টঙ্কার রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া গিয়াছে; এবং অনাচ্ছাদিত পদে জল বা কর্দ্দমোপরি পরিভ্রমণ করিয়া অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে?

কেহ কেহ পাদুকা ব্যবহারেও আপত্তি করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা পদদ্বয় শীতল হইলেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে বলিয়াই এরূপ বলেন। ব্যায়াম ও প্রক্ষালন দ্বারা উত্তম রূপে শোণিত সঞ্চালিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই, এবং বালকবৃন্দ অনাবৃত পদে চলিয়া বেড়াইলে ক্রমে চর্ম্ম কঠিন হইতে পারে, ইহাও সত্য; কিন্তু মনুষ্য যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সমস্ত দিবস কেবল

ব্যায়াম ও পদ প্রক্ষালন করিতে পারিত তাহা হইলেই ঐরূপ সম্ভব হইত। যাহাকে দিবারাত্র ঘাটে, মাঠে, পথে যাইতে হয়, সে কিরূপে অনাবৃত পদে স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে? ব্যায়াম ও প্রক্ষালন দ্বারা পদদ্বয়ে কণ্টক বিদ্ধ হওয়া, কাচ বা শানিত অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তিত হওয়া, সর্প বা অন্যান্য হিংস্র জন্তু দ্বারা দংশিত বা আহত হওয়া রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং উল্লিখিত বিপদ হইতে পদদ্বয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পাদত্রাণ আবশ্যক।

কৃষকদিগের নিমিত্ত স্থূল চর্ম্ম বা রবরের পাদুকা হইলে আর কোন ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু ঐ পাদুকা অত্যন্ত সুলভ না হইলে দুঃখী ব্যক্তিরা কখনই ব্যবহার করিবে না। অপর সাধারণের নিমিত্ত চর্ম্ম, বা কাষ্ঠ ও চর্ম্ম, বা কাপড়ের পাদুকা ব্যবহৃত হইতে পারে। গাত্র বস্ত্রের ন্যায় পাদুকাও আরাম জনক লঘু ও কিঞ্চিৎ আল্গা হওয়া উচিত, নচেৎ অনেক প্রকার অসুবিধা ঘটিয়া উঠে।

এক্ষণে বঙ্গমহিলাগণের উপযুক্ত পরিচ্ছদের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। একখান ১০ দশ হস্ত দীর্ঘ শাটী দ্বারা সমস্ত শরীর রক্ষিত হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গৃহমধ্যে থাকিয়াও তাঁহাদিগকে যেরূপ কার্য্য করিতে হয় তাহাতে অনেক সময় ঐ শাটী সমস্ত গাত্রকে আচ্ছাদন করিতে পারে না এবং তাহা পারিলেও কেবল শাটী পরিধান করার বিশেষ আপত্তি আছে। অনেক সময়ে দৃষ্ট হইয়াছে যে অতি সামান্য কারণে ঐ বস্ত্র অঙ্গ হইতে স্খলিত প্রায় হইয়াছে। শাটী বা ধুতি পরিয়া স্থানান্তরে গমন করা যে কি বিপদ জনক ও লজ্জাদায়ক তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। এনিমিত্ত শাটীর পরিবর্ত্তে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভদ্রকন্যারা যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, তাহা ব্যবহৃত হইলে বাস্তবিক দেশের উপকার হইতে পারে। যতকাল শাটীর পরিবর্ত্তে ঘাঘরা ব্যবহৃত না হইবে ততকাল শাটীর নিম্নে একটী সুদীর্ঘ পিরাণ ব্যবহার করা উচিত। গলা হইতে জানুর অধোভাগ পর্য্যন্ত আবৃত থাকে এরূপ দীর্ঘ পিরাণ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার আছে। উহার উপর শাটী এরূপে পরিধান করা উচিত, যে হস্তদ্বয় সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত থাকে। ঐ পিরাণের মধ্যে কাটা, ও বোতাম দ্বারা বদ্ধ থাকিলে প্রয়োজনমত সন্তানকে স্তন্য পান করাইবারও কোন ব্যাঘাত জন্মিবে না।

এক্ষণে বঙ্গ মহিলাগণ রৌদ্রের উত্তাপে সচরাচর কোন কর্ম্ম করেন না, সুতরাং মস্তকাবরণেরও বিশেষ আবশ্যক নাই। যদি কাহাকেও রৌদ্রের উত্তাপে ভ্রমণ করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহারও মস্তকাবরণ পরিধান করা উচিত। সচরাচর পাদুকা ব্যবহৃত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

বহুমূল্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলেই স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। পরিধেয় বস্ত্রাদির মূল্য অধিক বা অল্পই হউক না কেন, তাহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ উপযোগিতা বা বিরুদ্ধতা জন্মিতে পায় না। পরিধেয় যত পরিষ্কৃত রাখা যায় ততই মঙ্গল; অল্প মূল্যের পরিচ্ছদ প্রত্যহ ধৌত ও পরিষ্কৃত হইলে অপরিষ্কৃত বহুমূল্য পরিচ্ছদের অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ হইতে পারে। পরিচ্ছদ পরিষ্কৃত রাখা কেন আবশ্যক, তাহা প্রায় এক প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে। ত্বক নিঃসৃত মলিন পদার্থ সমুদায় পরিধেয় বস্ত্রকে দূষিত ও দুর্গন্ধময় করে। মলিন বস্ত্রের বর্ণাপেক্ষা গন্ধই উহার মলিনত্বের উত্তম প্রমাণ। বস্ত্র দেখিতে মলিন

হওয়া অপেক্ষা দুর্গন্ধময় হওয়া আরও অধিক অপকারী। শীতকালে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয় না বলিয়া গাত্র বস্ত্র মলিন হয় না এরূপ নহে। কারণ অধিক স্বেদ নিঃসৃত হউক বা না হউক ত্বক হইতে মৃতচর্ম্ম ও জৈবনিক পদার্থ, লোম, সর্ব্বদাই পরিত্যপ্ত হইতেছে। সেই সমুদয় পরিত্যক্ত পদার্থ পরিধেয় বস্ত্রে লাগিয়া থাকে, এবং তাহা দূর করা স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিশেষ আবশ্যক। কেহ কেহ বস্ত্রাদি ধূলি রেণু দ্বারা অপরিষ্কৃত হইবে বলিয়া বিশেষ সতর্ক থাকেন কিন্তু স্বীয় গাত্রের সমস্ত মলিন পদার্থ বস্ত্রকে দূষিত করিলে তাহা গ্রাহ্য করেন না ও সেই বস্ত্র পরিষ্কার না করিয়া রাখিয়া দেন, পরদিবস বা পরক্ষণে তাহাই পরিধান করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। ঐ বিষয়ে শরীর পালনের ৪৯ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য। ঐ ঘৃণিত আচার যত শীঘ্র পরিত্যক্ত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল। এক পরিচ্ছদ এককালে ১০।১৫ দিন ব্যবহার করা কত দূর স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ তাহা ত্বক হইতে প্রতিদিবস যে পরিমাণ মলিন পদার্থ নির্গত হয়, তাহাকে ১০।১৫ গুণ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। যদি কেবল একটী পিরাণ ও একখানা ধুতি বা একটা পাজামা পরিধান করিতে হয়, তাহা হইলে এই দুই পরিচ্ছদকে প্রতিদিবস পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধৌত করা আবশ্যক। যদি পিরাণ ও পাজামার কি ট্রাউজারের নিম্নে আর কিছু বস্ত্র ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উপরিস্থ পরিচ্ছদকে প্রতি দিন ধৌত না করিলেও অনিষ্ট হইবে না; যদি প্রতিদিবস ধৌত করার ব্যাঘাত জন্মে, তাহা হইলে রৌদ্রের উত্তাপে বিস্তার করিয়া দিলেও অনেক উপকার হয়। রৌদ্রের উত্তাপে জলীয়াংশ বাষ্পীভূত হইয়া যায়, ও বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজান দ্বারা জৈবনিকমলা সমুদয় কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে বস্ত্র অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইতে পারে। অনেকেরই প্রায় দুই প্রস্ত কাপড় থাকে, তন্মধ্যে সচরাচর এক প্রস্ত বাটীর মধ্যে ব্যবহৃত হয় (আট প্রহরী), অপর প্রস্ত স্থানান্তরে গমনাগমনের নিমিত্ত রক্ষিত হয়। এই প্রস্তটী অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত থাকে, ও তদ্দ্বারা মান সম্ভ্রম রক্ষিত হয়। কিন্তু যাহা সর্ব্বদা বাটীর মধ্যে ব্যবহৃত হয় তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা হয় না, সুতরাং স্বীয় দেহপরিত্যক্ত মলিন সামগ্রী পুনর্ব্বার দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকারে স্বাস্থ্যভঙ্গ করে। এই সমস্ত কারণে গাত্রবস্ত্রাদি শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তন ও পরিষ্কার করা আবশ্যক। সকলে এবিষয়ে সমান মনোযোগ করিতে পারে না; সকলেই বস্ত্রাদি সপ্তাহে একবার বা দুইবার রজকালয়ে প্রেরণ করিতে পারে না। দরিদ্রতাবশতঃ যাহাদিগকে স্ব স্ব বস্ত্র ধৌত করিতে হয়, তাঁহারা প্রায় সাবান ব্যবহার না করিয়া ক্ষার ব্যবহার করে। ক্ষার ব্যবহার করিলে কাপড় পরিষ্কৃত হয় বটে, কিন্তু অধিক জীর্ণ হয়, এনিমিত্ত দেশী সাবান ব্যবহার করা উচিত। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে তেঁতুল ও অশ্বত্থ কাষ্ঠের ক্ষার উত্তম।

ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত পরিধেয় বস্ত্রের পরিবর্ত্তন আবশ্যক, কিন্তু ঐ সময় বিশেষ সতর্ক হইতে হয়, নচেৎ হঠাৎ পীড়া হইবার সম্ভাবনা। শীতের প্রারম্ভে গরম কাপড় পরিধান করিতে আরম্ভ করিবে ও শীতের কিঞ্চিৎ পরে পরিত্যাগ করিবে। অনেক সময় গ্রীষ্মকালে সর্দ্দি, গালবেদনা ইত্যাদি পীড়া উপস্থিত হয়, তাহার কারণ

প্রধানতঃ এই যে, ঐ সময় পাতলা কার্পাস নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হয়। এমত সময় হঠাৎ ঝটিকা ও বৃষ্টি দ্বারা অপেক্ষাকৃত শীতল ও জলসিক্ত বায়ু গাত্রে লাগিলেই ঐ সমুদয় ঘটনা ঘটে।

(১) অপ্রচুর পরিধেয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা সমস্ত শরীরকে শীতল বা জলসিক্ত বায়ু হইতে উত্তমরূপে রক্ষা করা যায় না, ব্যবহার করিলে সর্দ্দি, কাশি, শ্বাস-নালীর প্রদাহ, নিউরাল্জিয়া (স্নায়ুবেদনা), অবসাদ (Paralysis), ধনুষ্টঙ্কার, বাত ও জ্বর রোগের উৎপত্তি হয়। আবশ্যক হইলে উহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রদাহের প্রধান কারণ, তীক্ষ্ণ শীতল বায়ু সেবন। শীতকালে ও বর্ষাকালে ঐ সমুদয় রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক, তাহার কারণ এই যে, ঐ সময় পরিধেয় পরিবর্ত্তনের বিশেষ আবশ্যক। অল্পদিন হইল নদীয়ায় যে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রায় এক লক্ষ লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে (১৮৮১) তাহাদিগের অধিকাংশই অত্যন্ত দুঃখী; তাহাদিগের উপযুক্ত পরিধেয় বা শয্যা কিছুই ছিল না, এতদ্ব্যতীত স্থানাভাবে অনেককে গৃহের বারান্দায় রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল।

(২) অপ্রচুর পরিধেয় ব্যবহার করিলে ক্ষতরোগ ও তদনুবর্ত্তী ধনুষ্টঙ্কার, সর্পাঘাত, ক্ষিপ্ত কুকুরাদির দন্তাঘাত ইত্যাদি ভয়ানক ও সাংঘাতিক ঘটনার দ্বারা হঠাৎ প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা। যাহাদিগের পদদ্বয় পাদুকাদ্বারা সর্ব্বদা আবৃত ও রক্ষিত থাকে, তাহাদিগের মধ্যে সর্পাঘাত প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।

(৩) যে সময়ে যেরূপ পরিধেয় ব্যবহার করা উচিত, তাহা না করিয়া কত লোক পীড়িত ও অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে কলিকাতার চিকিৎসালয়ে কতকগুলি লোক Sunstroke (সর্দ্দিগর্ম্মি) রোগাক্রান্ত হইয়া অচিরে প্রাণত্যাগ করে। গ্রীষ্মকালের প্রখর রবিকিরণে উত্তাপ পরিচালক সামগ্রীর টুপি ব্যবহার কিম্বা অনাবৃত মস্তকে ভ্রমণ করাই তাহার প্রধান কারণ; এবং ফ্লানেল, বা অন্যান্য গরম ও ঘন পরিচ্ছদে দেহকে আবৃত রাখা অপর একটী কারণ; শরীর ঐরূপে আবৃত থাকিলে ঘর্ম্ম সহজেই শোষিত হইয়া যায়, ও উহা বাষ্পীভূত হওয়ায় শরীরের উত্তাপ হ্রাস হইতে না পাইয়া আভ্যন্তরিক উত্তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, ও কিয়ৎক্ষণে ঐ ভয়ানক রোগ উপস্থিত হয়। এ'ন মত গ্রীষ্মকালে লঘু, পাতলা, অপেক্ষাকৃত উত্তম উত্তাপ পরিচালক শুভ্রবর্ণ কার্পাসের পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত, সোলা কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন লঘু শুভ্রবর্ণের মস্তকাবরণ (টুপি বা পাগ্ড়ী) ব্যবহার করা অতিশয় আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। সত্য বটে, ঐ ভয়ানক রোগ দেশীয় লোককে অধিক পরিমাণে আক্রমণ করে না, কিন্তু আমাদিগের ঐ রোগ হইতে পারে না এরূপ নহে।

বর্ষাকালে কোন সময় গ্রীষ্ম, কোন সময় অপেক্ষাকৃত শীতল বোধ হয়। এনিমিত্ত হঠাৎ পীড়া হইবার সম্ভাবনা। গ্রীষ্ম দূর করিবার নিমিত্ত অনবধান পূর্ব্বক পাতলা কাপড় ব্যবহার করিলে, কিম্বা অনাবৃত শরীরে থাকিলে হঠাৎ বৃষ্টি বা ঝটিকা উত্থিত হইয়া বায়ুকে শীতল করিলে সহসা কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রদাহ, নিউরাল্জিয়া

ও বাত রোগ উপস্থিত হইতে পারে। এনিমিত্ত মেরিনো, পাতলা ফ্লানেল কিম্বা অন্য কোন লঘু পশম বা রেশম নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ধারণ করা আবশ্যক। পরিচ্ছদ ঘর্ম্ম বা বৃষ্টিজলে সিক্ত হইলে আর এক মুহূর্ত্তও অঙ্গে ধারণ করা উচিত নহে; তৎক্ষণাৎ ঐ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শুষ্ক বসন ব্যবহার করিতে হইবে। রৌদ্র ও বৃষ্টি এতদুভয় সময়ে সুবিধা হইলে ছত্র ব্যবহার করা উচিত। মস্তকাবরণ থাকিলে অল্প সময়ের নিমিত্ত ছত্র না থাকিলেও অনিষ্ট না হইতে পারে।

বিদ্যুল্লতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরা সাড়ীর বাটী হইতে কিয়দ্দূরে তারকেশ্বরের পথের পাশে একটী উদ্যান মধ্যে একখানি চৌচালা বৈঠকখানায় একজন পুরুষ ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ভাবে ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার পাশে একটী স্ত্রীলোক নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নপানে চাহিয়া আছে। উভয়ের মুখে দীপালোক পড়িয়াছে--দেখিলেই চিনিতে পারা যায়, পুরুষ সেই গিরিশচন্দ্র এবং স্ত্রীলোক সেই পাপীয়সী কামিনী।

গিরিশ অতি বিমর্ষ, যার পর নাই ভাবনায় অধীর, তাঁহার মনে সুখ নাই, তাই তাঁহার বদন মলিন ও বিষণ্ণ ভাবাপন্ন। কামিনী আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছে, বিদ্যুল্লতা পলায়ন করিয়াছেন। তাই গিরিশের চিন্তার শেষ নাই। উভয়েই নীরব ও নিস্পন্দ।

কিয়ৎক্ষণ পরে, গিরিশ অতি কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এতক্ষণ কতদূর গিয়া থাকিবে?"

"তা কেমন ক'রে জান্‌ব?"

"কোন দিকে গেল?"

"তারকেশ্বরের দিকে।"

গিরিশ একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন—"ওঃ কামিনী কি কল্লে বলদেখি? সবদিক নষ্ট হইল।"

'আমি কি জানি, তোমার সঙ্গে তার আগেকার আলাপ ছিল না।"

"আমার নাম করিলে কেন?"

"তা গেছে গেছেই, আমি তোমার তার চেয়ে ভাল—"

"তোমায় এ কাজের ভার দিয়া ঝকমারি করিয়াছিলাম।"

"তা আমি কি করব—তোমায় সে চায় না—তার ভালবাসার অন্য লোক রয়েছে—তোমার কাছে থাকবে কেন?"

"গেল যখন—তুমি আমায় ডাকিলে না কেন?"

"কেন্দেশ—। আমি থেকে তাকে সামলাতে পারলেন না, তা আবার ডাকতে আসব।"

গিরিশ ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন,—"যা হবার তা হয়েছে, এখন স্থির হয়ে বস।"

কামিনীও ক্রুদ্ধভাবে উত্তর করিল,—"আমার উপর এত মুখ ভার কর্‌ছ যে—গোটাকত টাকা দিয়েছ, কিনেত রাখনি—চল এখনি চল তোমার টাকা ফিরেদেব।"

"আমি টাকা ফিরে চাই না।"

"না—আমি তোমার কথা সহ্য কর্‌ব কেন? আমায় পাঠিয়ে দেও, আমি তোমার টাকা ফেরৎ দেব।"

"আঃ—একটু স্থির হও, বস।"

"তোমার কাছে বসব কেন,—তুমি আমার কে? আমায় পাঠিয়ে দেও।"

"স্থির হবেনা?"

"না—এখানে আর একদণ্ডও থাক্‌বনা—আমায় পাঠিয়ে দেও।"

"এখানে কে আছে—কাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

"তুমি কেন সঙ্গেকরে নিয়ে চলনা।"

গিরিশের হৃদয় তখন বিদ্যুল্লতা বিরহে বিদগ্ধ হইতেছিল। ভবিষ্যতে আর যে কখন দেখা সাক্ষাৎ হইবে না এই নিরাশায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল—সেই দুঃখময় চিন্তার অবস্থায় কামিনীর স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলেন এবং ঠেলিয়া উঠিলেন। তখন নিরুত্তরে কামিনীর দিকে একবার তীব্রদৃষ্টি করিলেন। তখনই আবার কি ভাবিয়া অত্যন্ত নম্রভাবে কহিলেন,—"কামিনী—কেন আর আমায় জ্বালাতন করিতেছ, তোমার পায়ে পড়ি—একটু স্থির হও।"

"না আমি এখনই যাব।"

সক্রোধে "যাও" বলিয়া গিরিশ চীৎকার করিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে কামিনী বিদ্যুল্লতাকে বন্দী করিয়া চলিয়া গেলে অল্পক্ষণ পরেই আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরিশিক্ত হইয়া সেই বাটীর সম্মুখে তিন জন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন সন্ন্যাসী-বেশী। অপর দুই জন সামান্য ব্যক্তি, তাহাদের পরিচ্ছদও সামান্য। ইহারা দুই জনে দ্বারে আসিয়াই গৃহাধিকারীর উদ্দেশ্যে চীৎকার করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ ডাকিয়া উত্তর না পাওয়াতে, দ্বারের শিকল ধরিয়া নাড়িবে মনে করিয়া শিকলে হাত দিয়া দেখিল, দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ রহিয়াছে; শিকল খুলিবা মাত্রেই দ্বার খুলিয়া গেল। তাহারা শুনিল বায়ু প্রবাহের শোঁ শোঁ শব্দে মিশিয়া যেন রোদন-ধ্বনি সেই বাটীর মধ্য হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তখন তাহাদের মধ্যে একজন কহিয়া উঠিল,—"সর্ব্বনাশ করেছি!" অপর ব্যক্তি কহিল—"কোথায় এসেছি রে ছিরু!" ছিরু কহিল,—"পালাই চ—এযে সেই হরার বাড়ী। এ বাড়ীতে ভুত আছে।" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি তারকেশ্বরের পথ নয়?" "না ঠাকুর না।" বলিয়া ছিরু প্রস্থান করিল, তাহার সমভিব্যাহারী,—"ঠাকুর পালিয়ে এস, নইলে মারা পড়বে" বলিয়া ছিরুর অনুধাবন করিল। তখনও বৃষ্টি হইতেছে।

সন্ন্যাসী একজন ঘোর তান্ত্রিক, সুতরাং ভুত প্রেতকে ভয় করেন না। তাঁহার সমভিব্যাহারীদ্বয় ডাকাইতের ভয় দেখাইলে তিনি সে স্থলে আর তিষ্ঠিতেন কি না বলিতে পারি না। ভুতের নাম শুনিয়া একটু মাত্রও ভীত না হইয়া আস্তে আস্তে সেই বাটীর অভ্যন্তরে

প্রবেশ করিলেন। যে ঘরে বিদ্যুল্লতা রোদন করিতেছিলেন, সেই ঘরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। ঘরের নিকটে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, ও সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে মা তুমি, একাকিনী?"

বিদ্যুল্লতা চমকিয়া উঠিলেন, ভয়ের উদ্রেকে শোকানুভূতি স্থগিত হইল, প্রাণ উড়িয়া গেল। তখন কাঁপিতে কাঁপিতে দণ্ডায়মান হইয়া সশঙ্কিত অথচ ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আবার কে? তাঁহারই দূত?" পরে সভয়ে এদিকে ওদিকে চাহিয়া পশ্চাৎ দিকে দুই এক পা সরিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ন্যাসী। আমি কাহারও দূত নহি মা, তোমার রোদন শুনিয়া আসিয়াছি, ভয় পাইও না। তিনি সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং অতি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমিই কি মা সেই বৃষ্টির সময় পালকী করিয়া আসিতেছিলে?"

অন্ধকারে উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ভগ্নপোত আরোহীর চিত্ত অকস্মাৎ সম্মুখে দাঁড়াইবার স্থান পাইলে যেরূপ পুলকিত হয়, বিদ্যুল্লতার নিরাশ চিত্ত সন্ন্যাসীর মুখে কথঞ্চিৎ পরিচিতের ন্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রূপ পুলকিত হইল। তখনই তাঁহার মনে অভাবনীয় পরিত্রাণের আশা একবার বিজলিবৎ বিকাশ পাইল, সাতিশয় বিস্ময় বশতঃই হউক অথবা আশার উদ্রেকে আহ্লাদ বশতঃই হউক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষের জল চক্ষেই স্থির রহিল, কপোল বহিয়া যে অশ্রুধারা বহিতেছিল তখনই তাহা শুকাইয়া গেল। তিনি যে অঞ্চলাংশে অশ্রু মার্জ্জনা করিতেছিলেন তাহা তাঁহার হস্তেই রহিয়া গেল, তিনি কম্পিত হস্তে সেই বসনাংশ রক্ষা করত বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে অবাক হইয়া স্থির নেত্রে সেই সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী বিদ্যুল্লতার চিত্তের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সাদরে, সস্নেহে কহিলেন,—"আশ্চর্য্য হইও না মা! আমার এক জন পরম স্নেহাস্পদ শিষ্যের কুললক্ষ্মীর ঘোর বিপৎপাতের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া আমি যার পর নাই চিন্তিত ছিলাম। তখনই সেই অন্ধকারে দুর্য্যোগের সময় তোমার শিবিকা দেখিয়া মনে হইয়াছিল তুমিই সেই লক্ষ্মীস্বরূপা—তখনই আমার ইচ্ছা হইয়াছিল তোমাকে আর অগ্রসর হইতে না দিই, কিন্তু—" বলিয়া সন্ন্যাসী মুহূর্ত্তেক নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিতে লাগিলেন,—"সে যাহা হউক, অদৃষ্ট লিখন অখণ্ডনীয়—অগোচর ভবিষ্যতের নিগূঢ়তত্ত্ব সংগ্রহ করা অতি সুকঠিন। এখন বলিবে কি, কে তোমার পিতা, কোথায় তোমার অবস্থিতি—আর কেই বা উপস্থিত দুর্দ্দশার কারণ!" সন্ন্যাসী বিদ্যুল্লতার মুখের দিকে উত্তর অপেক্ষা চাহিয়া রহিলেন।

কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নিস্পর্শে যেমন বহুল পরিমাণে ধূম একত্রিত হইয়া অল্পক্ষণ পরেই ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সন্ন্যাসীর প্রশ্নে বিদ্যুল্লতার চিত্তে সেইরূপ ঘটিল। 'কে তাঁহার উপস্থিত দুর্দ্দশার কারণ' এই কয়টী কথায় তাঁহার হৃদয় একবারে জ্বলিয়া উঠিল, যে তাঁহার দুর্দ্দশার কারণ সে ব্যক্তি অপরিচিত নহে, নীচ কুলোদ্ভব নহে, বিরাগ ভাজন নহে—সে ব্যক্তি তাঁহার সোদরাসম স্নেহাস্পদ স্বর্ণলতার স্বামী, তাঁহার আদরের পাত্র—উচ্চবংশীয়—সম্ভ্রান্ত—গিরিশচন্দ্র। হায়! বিদ্যুল্লতা কেমন করিয়া তাঁহার নাম করিবেন! আপনার পরিচয় কিছুতেই দিবেন না। একে ভদ্রমহিলা—তাহে বিধবা—তাহে

তেমন নির্জ্জন স্থানে তেমন অবস্থায়—কোন্ ভদ্রমহিলা পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত না হইতেন? তিনি কি উত্তর করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না; তাঁহার নয়নদ্বয়ের যে অশ্রু প্রস্রবণ ছিল তখন উথলিয়া উঠিল, চক্ষু হইতে টস টস করিয়া বারিবিন্দু পতিত হইল, তিনি অলক্ষিত ভাবে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে গিয়া হু হু শব্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন,—অঞ্চলে মুখ আবরণ করিলেন। তাঁহার কাতরতা দর্শন করিয়া সন্ন্যাসীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

অকস্মাৎ বহির্দ্বারে যেন কথা কহিয়া উঠিল "বলেছি ত—এই দোর খোলা রয়েছে দেখ।" কথা কয়টী সশঙ্কিত চিত্ত বিদ্যুল্লতার শ্রবণে প্রবেশ করিল। কে যেন তাঁহার কানে কানে কহিয়া দিল,—"সাবধান ওই আসিতেছে!" তিনি রোরুদ্যমান বদন হইতে আবরণ সরাইয়া ফেলিলেন; সচকিতে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া প্রাঙ্গনের দিকে চাহিলেন।

তখন অগ্রে অগ্রে গিরিশ ও তৎপশ্চাতে কামিনী প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্যুল্লতা দেখিলেন তাহারা সত্যই আসিতেছে, তাঁহার চরণ কাঁপিল, মস্তক ঘুরিল, রসনা শুকাইল, হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি নয়নে অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার মনে হইল প্রলয় উপস্থিত! চিত্তের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! তখনই তাঁহার সে ভয় ঘুচিয়া গেল, বাহুদ্বয়ে যেন অসাধারণ সামর্থ্য পাইলেন। তাঁহার মনে হইয়াছে, "আসিবে আসুক, ও পাপমতি আমার কি করিবে?" তাঁহার অশ্রুপ্লুত আরক্ত নয়ন আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সাহসে চিত্ত ভরিয়া উঠিল, শোক দুঃখ ভয় যেন সরিয়া দাঁড়াইল, উপস্থিত কোন অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্তি-বশতঃ রোদন, খেদ, নিরাশ উক্তি, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া বিদ্যুল্লতা যেন দেবীশক্তিসম্পন্না বীর্য্যবতীর ন্যায় এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন! তখন তাঁহাকে দেখিয়া কে বলিবে তিনি সেই কোমলহৃদয়া সেই স্নেহপ্রাণা বিদ্যুল্লতা যিনি স্বর্ণলতার মনোবেদনায় কাতর হইয়া, বহির্ব্বাটী হইতে গিরিশচন্দ্রকে ডাকিয়া মিষ্টবাক্যে ভার্য্যার অপরাধ ক্ষমা করিতে সাধিয়াছিলেন।

কামিনী প্রাঙ্গনে—গিরিশ কক্ষ মধ্যে—বিদ্যুল্লতা চঞ্চল স্বভাবা উন্মাদিনীর মত ত্রস্তে কোথায় সরিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী নবাগত পুরুষকে দেখিয়া অবাক, গিরিশ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ। গিরিশের তখন অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, একে নিরাশ বিদগ্ধ, তাহাতে বিদ্যুল্লতার নিকট অপর একজন পুরুষকে দেখিয়া দ্বেষে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহার চক্ষু দিয়া ঈর্ষানল স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ কটাক্ষ নিঃসৃত হইল। তিনি সেই সন্ন্যাসীর দিকে চাহিলেন, অতি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি—কাহার হুকুমে বাড়ীর ভিতরে আসিয়াছ?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন না, গিরিশ আর উত্তর অপেক্ষায় রহিলেন না, সন্ন্যাসীকে তখন কোন শাস্তি না দিয়াই যে দিকে বিদ্যুল্লতা সরিয়া গিয়াছেন দ্রুতপদে সেই দিকে ধাবমান হইলেন। সন্ন্যাসীর চক্ষুদ্বয় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ক্রোধে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি জানিতে পারিয়াছেন সেই দুরাত্মাই এই বিপদগ্রস্ত কুলকামিনীর অনর্থের মূল। তিনিও সেই অপরিচিত বাটীর অপরিচিত দ্বার দিয়া গিরিশের অনুধাবন করিলেন। তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না।

"বিদ্যুল্লতা, দ্বার খুলিয়া দাও—দ্বার খুলিয়া দাও—এ কি করিলে—ঘরের ভিতরে আমায় বন্ধ করিলে কেন, দ্বার খুলিয়া দাও, আমায় ক্ষমা কর" এইরূপ চীৎকার তখনই শ্রুত হইল। প্রাঙ্গন হইতে কামিনী সরিয়া পড়িল, সন্ন্যাসী সেই আলোকিত কক্ষে প্রতিগমন করিয়া কোন্ দিক দিয়া কোথায় যাইবেন না জানিতে পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখেই দেখিলেন, সেই রমণী বিদ্যুল্লতা, আলুলায়িত কেশে, উন্মাদিনী বেশে সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত। বিদ্যুল্লতার নয়ন দ্বয় হইতে বিগলিত অশ্রুবিন্দু অগ্নিকণার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাঁহার অধর কম্পিত, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত, মুখে উজ্জ্বল তেজরাশির জ্বলন্ত বিকাশ। তিনি একপ্রকার অবসাদ ভাবাপন্ন ভগ্নস্বরে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেব, আমি এখনি আসিতেছি, দেখিবেন যেন উনি আমার অবর্ত্তমানে কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ না করেন।" বলিয়াই বিদায় হইতে উদ্যত হইলেন। সন্ন্যাসী তখন তাঁহার বদনে, কথায় ও ভাবে রমণী গরিমা দৃষ্টি করিতেছিলেন, তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া সম্মুখে গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন ও অতি নম্রভাবে বুঝাইয়া বলিলেন,—"এই অন্ধকার ত্রিযাম রজনীতে আবার কোথায় যাইবে মা, এক বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কি আবার কোন বিপদে পতিত হইবে? আমার কথা শ্রবণ কর, আজ যাইও না।" নিরুত্তরে বিদ্যুল্লতা চলিতে প্রয়াস পাইলেন, সন্ন্যাসী প্রতিবন্ধক দিতে প্রয়াস পাইলেন। বিদ্যুল্লতা কহিলেন,—"দেব, আমি এখনি আসিব, যাইতে দিন।" ভিতর হইতে গিরিশ চীৎকার করিয়া উঠিল, "রে পাষাণি—পাষাণি—পাষাণি বিদ্যুল্লতা, দ্বার খুলিয়া দে!" বিদ্যুল্লতা দুঃখ ও শোকাবেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে করপুটে সন্ন্যাসীকে কহিলেন,—"আমায় এখনই যাইতে দিন।" তাঁহার কাতরতায় সন্ন্যাসী পথ ছাড়িয়া দিলেন; হায়! আত্মীয় হইতে আত্মীয় হইয়া, সুহৃদ হইতে সুহৃদ হইয়া, বিপন্ন কুলমহিলাকে অন্ধকারময় রজনীতে অন্ধকারময় ভবিষ্য নিয়তির উপর, ঘূর্ণায়মান বিষম কালচক্রের উপর, জানিয়া শুনিয়াও নিক্ষেপ করিলেন!

বিদ্যুল্লতার যাইবার সময় সন্ন্যাসী আবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদ্যুল্লতা কাঁদিতে কাঁদিতে—"অভাগিনীর নাম বিদ্যুল্লতা" বলিতে বলিতে বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী তখন তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। বিদ্যুল্লতা অন্ধকারে মিশিয়া অগোচর হইলেন।

"হায় হায় আমি কি করিলাম, কুললক্ষ্মীকে জানিয়া শুনিয়া আবার বিপদের মুখে অগ্রসর হইতে দিলাম কেন? ভগবন্! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তোমার মহিমা উজ্জ্বল হউক, তোমার কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হউক। বিদ্যুল্লতাকে আদর্শ বঙ্গমহিলা করিয়া তুমি কি বিচিত্র লীলা দেখাইতেছ।" বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী পথ হইতে সেই বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি একপ্রহর অতীত হইয়াছে। ঘনাবৃত আকাশে একটীও তারকা দৃষ্ট হয় না। চতুর্দ্দিক অন্ধকারময়, কেহ যেন নভস্তল হইতে মেদিনী পর্য্যন্ত মসী ঢালিয়া রাখি-

যাছে। প্রকৃতি পটের রমণীয় চিত্রের রেখা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে, বৃক্ষ লতাদির গাঢ় শ্যাম অন্ধকার আরও গাঢ়তম বলিয়া বোধ হইতেছে না। নিবিড় বনভূমির অন্ধকারে ও শূন্য স্থানের অন্ধকারে এখন কোন বিশেষ নাই। কি ঘোর অন্ধকার, যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে! কোনদিকে জীব জন্তুর সাড়া শব্দ নাই, সজীব জগৎ যেন প্রাণী শূন্য হইয়াছে! মধ্যে মধ্যে আকাশের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত চকিৎপ্রভা বিজলী বিকাশে প্রকৃতির সেই ভীষণ নিস্তব্ধ প্রলয়ঙ্করী ভাব দেখাইয়া যাইতেছে। মস্তকোপরি আকাশময় অতি ভীষণ নাদে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, প্রাণীমাত্রেরই তাহাতে হৃৎকম্প হইতেছে। কোন্ পথিক এমন সময় পা বাড়াইতে সশঙ্কিত না হয়। প্রস্তর খণ্ডে পদস্খলন, বৃক্ষশাখায় আহত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

এই আসন্ন বিষম দুর্য্যোগের সময় ব্যাণ্ডড়া হইতে চন্দননগর আসিবার পথে দুই ব্যক্তি ইংরাজীতে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই যুবাপুরুষ, একজন ইংরেজ বেশী, অপর ব্যক্তি আমাদিগের বঙ্গবাসী। একবার করিয়া বিদ্যুতের বিকাশ হইলে তাঁহারা একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, আবার পুনর্ব্বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেছেন, সুতরাং স্বল্প পরিমাণে পথ চলিতে ছিলেন। দূরে বৃষ্টি পতনের শব্দ শুনিয়া পথিকদ্বয় একটী বটবৃক্ষের তলে আশ্রয় লইলেন। দূরাগত শোঁ শোঁ শব্দ ক্রমে নিকট হইল, ফোঁটা ফোঁটা ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, গম্ভীর গর্জ্জনে ঘন ঘন বজ্রপাত হইতে লাগিল, দূরে একখানি শস্যক্ষেত্র জ্বলিয়া উঠিল। বটপত্রাচ্ছেদে এত প্রচুর পরিমাণে জলধারা পড়িতে লাগিল যে, পথিকদ্বয় তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সিক্ত হইয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্টি কমিয়া আসিলে, তাঁহারা নিকটস্থ কোনস্থানে বসনাদি পরিত্যাগ করিবেন ভাবিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। চলিতে চলিতে সাহেব বেশী পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সহিসেরা এতক্ষণে কত দূর আসিয়া থাকিবে?" বঙ্গবাসী উত্তর করিলেন,—"অধিকদূর আসিতে পারে নাই, হয়ত ব্যাণ্ডড়ায় পঁহুছিয়া থাকিবে।' বিদেশী বেশী বলিলেন,—"ঘোড়া না ছাড়িয়া দিলেই বেশ হইত।"

বঙ্গবাসী বলিলেন,—'আজ না আসিলেই বেশ হইত; মেঘ দেখিয়া যাত্রা করা অবিধেয় হইয়াছে।"

সাহেববেশী কহিলেন,—"সন্ধ্যার সময় হরিপাল হইতে যাত্রা করা অন্যায় হইয়াছে, এখন বোধ হইতেছে। কিন্তু কলিকাতায় আজ রাত্রে ফিরিয়া যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।'

বঙ্গবাসী। গাড়ি ত পাইবে না, অকারণে এই ক্লেশ স্বীকার করিলে।

সাহেববেশী। চন্দননগর (ফরাস ডাঙ্গা) আর কত দূর?

বঙ্গবাসী। প্রায় এক ক্রোশ। মুটের মার পুষ্করিণী পার হই নাই এখনও।

সাহেববেশী। না।

সম্মুখে আর পথ নাই, পথ গিয়া একটী পুষ্করিণীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

বঙ্গবাসী কহিলেন,—"এই সেই পুষ্করিণী, স্মরণ আছে?'

সাহেব কহিলেন,—"হুঁ।' বিদ্যুৎ বিকাশের প্রতীক্ষায় উভয়েই দণ্ডায়মান রহিলেন।

যে পুষ্করিণীর পঙ্কিল সলিলে সহস্র সহস্র মানব অস্থি নিমজ্জিত আছে, গ্রীষ্মকালে যাহার জল শুকাইলে শত সহস্র নর মুণ্ড চারিদিকে বিকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, দস্যুরা যে স্থলকে সাক্ষাৎ যমালয় স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছে, যে স্থল অসংখ্য অপমৃত্যু হেতু বহু অপদেবতার ক্রীড়াভূমি বলিয়া প্রবাদ আছে, দিবসেও এখনও পথিকগণ কম্পিত কলেবরে ইষ্ট দেবতার নাম করিতে করিতে যে স্থান অতিক্রম করিয়া থাকে, ভয়ানক উচ্চ পাহাড়ে পরিবেষ্টিত সেই বিখ্যাত মুটের মার পুষ্করিণীর তীরে, সেই দুর্যোগের রাত্রে নিঃসহায় পথিকদ্বয় কি সাহসে দণ্ডায়মান হইয়া আছেন।

বিদ্যুৎ বিকাশ পাইল না।—পুষ্করিণীর অপর পাহাড়ে জঙ্গল মধ্যে কে যেন তখনই ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"গেলাম গো, মলাম গো," পথিকদ্বয় 'ভয় নাই, ভয় নাই' বলিয়া সেই দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন—লতা গুল্ম লম্ফে অতিক্রম করিয়া ছুটিলেন—পড়িলেন—উঠিলেন, আবার ছুটিলেন। কিন্তু হায় যে আর্ত্তনাদ করিতেছিল, তাহার নিকটে না যাইতে যাইতে সে নীরব হইল! আলো নাই, পথ নাই, যে দিকে যান সেই দিকেই তরু—নয় লতার প্রতিবন্ধক—হাত দিয়া যথাসাধ্য ঠেলিয়া তুলিয়া সেই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অনিরূপিত লক্ষ্য উদ্দেশে একবারে একটা মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে বিদ্যুতের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন,—এখন সেই বিজলী হইল, সেই বিদ্যুতের আলোকে দেখিলেন, মাঠে কেহই নাই; তাঁহাদিগের পশ্চাতে বিজন বন। সেই বনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অকস্মাৎ বনের একদিকে সড় সড় শব্দ হইল, তাঁহারা সেই দিকে দৌড়িলেন, তখনি একটা মোটা লোষ্ট্রখণ্ড সজোরে আসিয়া সাহেবের দক্ষিণ বাহুতে আহত হইল; সে আঘাতে অস্থির হওয়াতে রুথ কুক, সাহেব সেই হস্তে, পকেট হইতে রিভল্ভার (Revolver) বাহির করিয়া সেই দিকে লক্ষ্য করত ছুটিলেন। তখনই সেই দিকের বন ভাঙ্গিয়া দ্রুতপদে একটা লোক ছুটিয়া গেল, বলিয়া গেল,—"বাঁচিয়া গেলি"। সাহেব তাহার অনুধাবন করিতে পা বাড়াইয়াছেন, তখনি একবার বিদ্যুৎ হইল; তিনি দেখিলেন, সেই দিকে অনতিদূরে শুভ্রবসনা স্ত্রীলোকের ন্যায় কে পড়িয়া রহিয়াছে। তখনই উভয়ে সেই ব্যক্তির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনই আবার বিদ্যুৎ হইল, হাত ধরিয়া সাহেব দেখিলেন তখনও তাহার অতি মৃদু নাড়ী আছে। আর বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে সেই মৃতপ্রায় রমণীকে তুলিয়া লইলেন। বাহুতে আশ্রয় দিয়া সেই অন্ধকারে, সেই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যুবকদ্বয়কে ধন্য!

রমণীকে পুনর্জীবিত করিবেন, এই সাধ, এই সাধে আশা, সেই আশায় আনন্দ, সেই আনন্দে সাহস উভয়ের চিত্তকে আশঙ্কাবিহীন করিল, শ্রমকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া তুলিল, তাঁহাদের মনে হইল কে যেন অগ্রে অগ্রে তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে।

—•০—

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশা তুমি অসীম প্রভাবশালিনী! জগতে এমন কোন ব্যক্তি আছে যাহার উপর তোমার আধিপত্য নাই! কৃতী, অকৃতী, ধনী, দরিদ্র, সুখী, অসুখী, সুস্থ, পীড়িত

কি মুমূর্ষু ব্যক্তিও তোমার মুখ চাহিয়া থাকে। তোমার সংস্পর্শ ব্যতীত কেহ কখন জীবিত থাকিতে পারে না। তুমি মানব হৃদয়কে সজীব, সতেজ ও উদ্যম পূর্ণ করিয়া রাখ। তুমি বিপদে অভয় দাও, কার্য্যে উৎসাহ প্রদান কর, বিফলতায় নূতন উদ্যমের সঞ্চার কর। শিশুসন্তান জননী কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই জননীর মুখ পানে চাহিয়া থাকে, আশা—জননী তাহাকে ক্রোড়ে লইবেন। দীন ব্যক্তি ধনী প্রতিবেশী কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইলেও সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে, আশা—চির দিন সমান যাইবে না! অনাথিনী বিধবা বঙ্গ মহিলা সংসার সুখে জলাঞ্জলী দিয়া বিষাদে দিন যাপন করে, আশা—পর জন্মে অবিচ্ছিন্ন পতি সহবাস লাভ হইবে। কঠোর ব্রতনিষ্ঠগণ ঐহিকের যাবতীয় সুখ সম্পদে প্রবৃত্তি শূন্য হইয়া যার পর নাই কায়িক ক্লেশ ও তদ্ধেতু মানসিক বেদনা সহ্য করিয়া থাকে, আশা—অনন্ত পারত্রিকের আনন্দ ভাণ্ডার সাধ্যায়ত্ব হইবে। পীড়িত ব্যক্তি কটু কষায় ঔষধ সেবন করিতে বিমুখ হয় না, বরং আবশ্যক হইলে অপেক্ষাকৃত বিস্বাদ গরল পান করিতে অভিলাষ করে, আশা—প্রাণ লাভ হইবে! ভগ্ন পোত আরোহি অকূল সমুদ্রে পতিত হইয়াও সন্তরণ করিতে ত্রুটী করে না, আশা—অকূলে আবার কূল পাইবে! আজীবন নির্ব্বাসিত দ্বীপান্তরিত হতভাগ্য প্রত্যহ দিন গণনা করিয়া দুঃখের লাঘব করিয়া থাকে, জীবনের যে ততদিন কমিয়া আসিতেছে একবারও তাহা ভাবিয়া দেখে না, আশা—কখন কোন সূত্রে মুক্তলাভ করিবে! দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রাণী অনাহারে কঙ্কালসার হইয়াও ভিক্ষা করিতে ও শ্রম করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, আশা—কোন স্থানে একমুষ্টি অন্ন লাভ করিবে! কালরূপী সমরক্ষেত্রে যোদ্ধাগণ সসৈন্যে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়, মরণকে সম্মুখে রাখিয়া সংগ্রাম করিয়া থাকে, আশা—প্রাণপণে জয়লাভ করিবে! আশা তুমি ধন্য! জীবন্ত জগতে তুমিই প্রাণ, প্রাণের অস্তিত্ব তোমাতেই নির্ভর করিয়াছে। মুকুল পুষ্পিত হইলে যেমন শাখা হইতে ঝরিয়া পড়ে, আশা ত্যাগে মনুষ্যের জীবন কুসুম সেইরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে! আশাহীনের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড অস্তিত্ব বিহীন,—আশা হীন স্বয়ং অস্তিত্ব বিহীন! যে মনুষ্যের হৃদয়ে আশা অসীম, সে অকুতোভয়, জরাজীর্ণ হইয়াও সে নিস্তেজ নহে, সম্পদচ্যুত, পদচ্যুত, জীবিকাচ্যুত হইয়াও নিরানন্দ বা বিমর্ষ নহে, শোকে সে বিদগ্ধ হইয়াও রস শূন্য নহে, তাহার হৃদয় সতত বিকসিত, সরস, ও পীযূষ পরিপূর্ণ! তাই বলিলাম, আশা তুমি জীবন্ত জগতের প্রাণ, প্রাণের অস্তিত্ব তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে! পথিকদ্বয়ের তুমিই সহায় হইয়াছ, সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেই বিপদগ্রস্ত মুমূর্ষু রমণীকে বহন করিতে আনন্দ প্রদান করিয়াছ।

আশা করি, পথিকদ্বয়ের আশা পরিপূর্ণ হউক!

—০•—

উধাও প্রাণ।

বহে সশঙ্কিত দূরে সমীরণ।
শীতল প্রবাহ তলে—বিকট মূরতি
(বিভীষিকা বিস্ফারিত বিচঞ্চল প্রাণ)
কা'ল নিশিথিনী কোলে—ঘুমায় প্রকৃতি।

দেখি সে স্বভাব ভাব মাতিল পরাণ!
নীরব বীণার তার বাজিল আবার!
ভাব উচ্ছসিত চিতে ত্যজিয়া ভবন,
বাহিরিনু সেই কাল-নিশিথ মাঝার।

সম্মুখ সৈকত পার প্রক্ষালিয়া ধায়
কলস্বনা কল্লোলিনী তটিনী সুন্দরী,
নির্জ্জনে নগেন্দ্র সুতা—নিরূপম কায়,
ঘুমের আভাবে তোবে বসুধারে মরি!

শূন্যে—ছায়াপথে দোলে তারকার মালা,
বিমল, শীতল দীপ গগনে গগনে;
নৈশ নির্জ্জনতা পুরি নিয়মিত ডালা
শান্তিকুলে, স্বভাবের ঢালিছে জীবনে।

সেই নিশি—সে নির্জ্জনে—নির্ব্বাসিত প্রাণ
নির্গম কান্তারে,—কান্তা-বিরহ বিধুর!
ভুলি ভূত, ভবিষ্যৎ, পূর্ব্ব, আত্মজ্ঞান,
উধাও-পরাণ ধায় বৈজয়ন্তপুর।

উড়িল রে শূন্যপথে তৃষিত চাতক—
সতৃষ নয়নে চায় জল ধারা পানে;
সেই প্রেম—সেই ধারা—ও ধারা বাঞ্ছক,
সিঞ্চিবে কি তৃষ্ণাতুর, পিপাসিত প্রাণে?

পলা'লরে পোষাপাখী পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া—
প্রেমের নিগড়ে বাঁধা বনবিহঙ্গিনী
হৃদয়-পিঞ্জর ভেঙ্গে গিয়াছে উড়িয়া!
পুনঃ কি ফিরিবে সেই মন-বিমোহিনী!

ভাঙ্গিল রে ভববন্দী ভব-কারাগার—
নবদ্বার কারাগার এদেহ অন্তরে,
ভাঙ্গি কারাগার—প্রেম-বন্দিনী আমার
কোথায় গিয়াছে চলে দূর দেশান্তরে!

* * * * *
* * * *

উড়িল—বিহ্বল-যান—বিমান প্রদেশে।
কল্পনা মাথায় ধরি বিজয়-নিশান,
আগে আগে চলে যায় সম্ভাষিয়া হেসে—
স্বর্গীয় আনন্দে ভাসে—উন্মাদ পরাণ!

আহা! সেই আনন্দের তুলনা কোথায়?
অতুলিত—উথলিত সোহাগের রাশি,
স্বর্গীয় সৌরভ ময়;—সমাদরে তায়
নিভৃতে পূজেছে মোর হৃদয় পিপাসী।

উড়িয়া উড়িয়া ধায়—তারকা সদনে,
হাসিয়া নাচিয়া ধায় নিশিথিনী গলে,
হেলিয়া দুলিয়া প্রাণ, ল'য়ে দ্বিগঙ্গনে
নাচায়ে ঘুমায়ে পড়ে সমীরের কোলে।

সে ঘুম—জীবন চেয়ে আদরের অতি!
অমরতা, নশ্বরতা সঙ্গমের স্থল—
সে স্বপন—সাধনের সাধের মূরতি,
সাধক সদনে তার মোক্ষময় ফল।

সদা গরজিত চিন্তা-কাল-ভুজঙ্গিনি,
মানব হৃদয় যার অনন্য আশ্রয়—
সম্মুখ শিকার ফেলি, বাসকী নাগিনী
এই মুহূর্ত্তের তরে পাতালে পলায়।

তমোময় ভবিষ্যৎ—ভীষণ মূরতি,
স্মৃতির সুদূর ভেদী উলঙ্গ কৃপাণ,
এ মুহূর্ত্তে তারা যেন সুখ-মূর্ত্তিমতী—
সংসার সাহারা মরু—হৃদয় শ্মশান।

এ মুহূর্ত্ত—হায়! বিদ্যা বিভবের নয়,
এ মুহূর্ত্ত নহে জাতি, কুল-অভিমানে,
এ মুহূর্ত্ত একমাত্র জানিবে নিশ্চয়
সংসার বিরাগী সেই সন্ন্যাসীর ধ্যানে!

পাষাণ বাঁধিয়া বুকে ঘোর যন্ত্রণায়,
ঝাঁপ দিয়াছিল যেই হতাশ সাগরে।
আজি সেই হতভাগা যুবকের দ্বার
পরিণাম পথে মুক্ত শান্তির মন্দিরে।

কালের পীড়নে হ'য়ে কণ্ঠাগত প্রাণ,
সাধিতে আপন ব্রত ব'সেছিল ধ্যানে—
এ মুহূর্ত্ত—এই সুখ—সেই ভাগ্যবান
বিরাগীর—উদাসীর—সন্ন্যাসীর প্রাণে!

বিরাগের গলা ধরি, বিষাদ সুন্দরী!
কাঁদসে—বসিয়া সখি, নির্জ্জন কাননে,
নির্জ্জন প্রসূত চিন্তা! চিরন্তন অরি!
আর না—আসিও কভু আমার সদনে।

প্রতারিত পূর্ব্ব স্মৃতি! পাপের আবাস—
আঁধার গিরি কন্দরে ত্বরায় পলাও;
পূর্ণ প্রাণে, পরিণাম! পূরিয়া হুতাশ,
গভীর সাগর নীরে শীঘ্র ডুবে যাও।

যাও, সংসারের সুখ! অসুখ দায়িনী,
(অনিত্য সুখের ভাগ নহেক আমার);
যাও, আশা! কুহকিনী—মায়াবিনী তুমি,
তোমার কুহকে প্রাণ নাচিবে না আর!

এ'স অমরতা সুখ! পবিত্রতাময়;
হাসাইয়া প্রকৃতিরে—ভাসাইয়া প্রাণ,
শান্তিময়ী সুরবালা! ডুবাও আমার
তরল তুফানে তব,—মন্দাকিনী ভান।

তুমি. আশা! সুরপুরে সুরসোহাগিনী,
বাজাইয়া সপ্ত সুরে জীবন বিষাণ—
কাঁপাইয়া ধরাতল—উন্মত্ত সে ধ্বনি,—
পূর্ণ প্রতিধ্বনি তার ধ্বনুক বিমান!

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত তোমাকে বলা হয় নাই। এতদিন অবকাশাভাবে লিখিয়া তোমাকে জানাইতে পারি নাই। এক্ষণে লিখিতেছি। আমার লেখা আর কাহারও ভাল লাগিবে না। তুমি আমাকে যেরূপ স্নেহ চক্ষে দেখ, তাহাতে নূতনত্ব না থাকিলেও ইহা তোমার বিরাগ উৎপাদন করিবে না। আর একটা কিছু লিখিলে কাহাকেও দেখান কর্ত্তব্য, এই হেতু এই বিবরণ তোমাকেই দেখাইতেছি।

পূজার অবকাশের পর বাটী হইতে আসি-

বার সময় রাস্তায় আমার জ্বর হয়। কোনরূপে এখানে আসিয়া, অতি কষ্টে জ্বর নিবারণ হইল বটে, কিন্তু শরীরের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম না। ৭৮ দিবস পরে পুনরায় জ্বর বোধ হইল। এই সময়ে এলাহাবাদ হইতে এখানকার প্রবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইলাম। ইহার পূর্ব্ব হইতে মনের নানাপ্রকার বিকৃত অবস্থা জন্মিয়াছিল। পীড়ার যন্ত্রণায় এরূপ বিকৃত অবস্থা জন্মিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। কাজেই আমার মন পশ্চিম যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যাইবার সুযোগও হইয়া গেল। এখানকার একজন বন্ধুও এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থে ও বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য বহির্গত হইলাম। ১২৮৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ বৈকালে চিরবাঞ্ছিত পশ্চিম প্রদেশ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। সে দিবস আমার জ্বরের পরাক্রম কিছু অধিক হইয়াছিল; সঙ্গে কুইনাইনের বড়ি লইতেও ভুলি নাই। রাত্রি এগারটার সময় শ্রীরামপুর ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে উঠিলাম।

গাড়ীতে উঠিয়া শরীরের গ্লানি বশতঃ আর বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেদিন আমার জ্বর কিছু বেশী হইয়াছিল: সেই কারণে ও পথশ্রান্তিতে সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। আর বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত এক প্রকার দেখা আছে; এই কারণে শুইয়া পড়িলাম। ইচ্ছা ছিল রাণীগঞ্জে যখন যাইব, তখন উঠিয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লইব। দুর্ভাগ্য বশতঃ কখন্ রাণীগঞ্জ ছাড়িয়া গিয়াছি জানিতে পারি নাই। সুতরাং এ যাত্রা রাণীগঞ্জ দেখা হইল না। রেলগাড়ীর গতি সময়ের গতির সহিত তুলনা করা অসম্ভব নহে। একবার ছাড়িলে ইহা সময়ের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে চলিতে থাকে। আমাদিগের অজ্ঞানিতরূপে গাড়ী, কত গ্রাম, নদী ও পাহাড় প্রভৃতি ছাড়িয়া চলিল। যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন দেখিলাম রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে ঊষাদেবী হাসিতে হাসিতে উদয় হইতেছেন তাঁহার সম্ভাষণার্থ, যেন পূর্ব্বাকাশে, কে সিন্দুর ছড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে। পশ্চিম দিকে তখনও অল্প অল্প অন্ধকার রহিয়াছে। যেন সেই অন্ধকার পূর্ব্বদিকে লালবর্ণ ভয়ানক বস্তু দেখিয়া ভয়ে নিভৃত স্থান অনুসন্ধানে ব্যস্ত! এস্থলে ঊষাদেবীর সহিত ফুলের সহাস্য বদন ও সুগন্ধ বা পক্ষীর কূজন প্রভৃতির সম্বন্ধ নাই। কারণ তখন আমরা দ্রুতগতি বাষ্পীয় রথে। ঊষাদেবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। পূর্ব্ব দিবস যে জ্বর হইয়াছিল, তজ্জনিত গ্লানি বা শরীরের বেদনা কিছুই নাই। যেন ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গদেশ ছাড়িয়া যাইতেছি দেখিয়া, মমতাহীন বাঙ্গালীর ন্যায় সমুদায় ব্যাধি একেকালে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক ইহার পর অবধি একদিনের জন্যেও আমার কোন অসুখ উপস্থিত হয় নাই।

সূর্য্যোদয়কালে রেলগাড়ী হইতে পূর্ব্বাকাশের শোভা বড় চমৎকার দেখায়! বিশেষ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে অর্দ্ধ লুক্কায়িত ভাবে সূর্য্যদেবকে উঁকি দিতে দেখিলে এবং অর্দ্ধালোকিত প্রকাণ্ড পর্ব্বতের সানুদেশ নিরীক্ষণ করিলে, মনে যে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় তাহা বর্ণনাতীত। আমরা এক্ষণে রেলওয়ের দুই পার্শ্বে কিঞ্চিৎদূরে বড় বড় পাহাড় দেখিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গী পূর্ব্বে কখন পাহাড় দেখেন নাই। তিনি অন্ধকার

থাকিতে থাকিতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন ও দুইধারে ঐ সকল প্রকাণ্ড পাহাড়ের অবয়ব দৃষ্টে মনে করিয়াছিলেন যে ঐ সকল পাথরিয়া কয়লার স্তুপ হইবে। তিনি জানিতেন এই সকল অঞ্চলে পাথ'রিয়া কয়লা উৎখাত হয়। অতএব এ সিং. ও তাঁহার অন্যায় হয় নাই। দূর হইতে পাহাড় সমুদায়কে পাথরিয়া কয়লার স্তুপ রাশির ন্যায়ই বোধ হয়। আমি উঠিবামাত্র তিনি বলিলেন, "দেখুন, কত পাথরিয়া কয়লার গাদা দেখা যাইতেছে, এত কয়লা কি হয়?" আমি পুর্ব্বে একবার রাজমহল গিয়াছিলাম সুতরাং আমি পাহাড়ের বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা অনেক অভিজ্ঞ। তাঁহার কথা শুনিবামাত্র হাসিয়া উত্তর করিলাম "ও সকল পাথরিয়া কয়লার গাদা নহে। ঐ সকল কেই পাহাড় বলে। ইহার পর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত দেখিতে পাইবেন।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার ভ্রম দূর হইল। ক্রমে আমরা একটী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এই ষ্টেশনের নাম সীতারামপুর। তখন সূর্য্যদেব সমস্তই প্রকাশ হইয়াছিলেন।

সীতারামপুরে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পুনরায় বাষ্পীয় রথযোগে চলিতে লাগিলাম। শরীরের সহিত মনের এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে শরীরের গ্লানি উপস্থিত হইলে, মনেরও স্বভাবতঃ অসুখ উপস্থিত হয় এবং একের স্বাচ্ছন্দ্যে অন্যের সজীবতা সম্পাদিত হয়। এক্ষণে আমার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হওয়াতে মনেরও স্বাভাবিক স্ফূর্তি লাভ হইল। তখন রেলওয়ে শকটে উপবেশন করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকের মনোরম শোভা দেখিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দ হইল। নবোদিত প্রাতঃসূর্য্যের কোমল কিরণ সম্পাতে সমস্ত জগত অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। দূরে ধূম্রবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী গম্ভীরভাব ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে; ইতিপুর্ব্বে সমুদায় শৃঙ্গ, অল্প অল্প অন্ধকার থাকাতে অস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল এক্ষণে সূর্য্যালোকে সমুদায় অংশ পরিষ্কাররূপে নয়নগোচর হইতে লাগিল। গাড়ীর দুই পার্শ্বেই শালবন। আমি পুর্ব্বে কখন শালবন দেখি নাই। ছোট বড় অসংখ্য শালবৃক্ষের শ্রেণী দেখিয়া বোধ হইল যেন কেহ যত্নপুর্ব্বক ইহাদিগকে এইরূপে বিন্যস্ত করিয়া গিয়াছে। নিকটে গ্রাম নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে তত দূরই কেবল পর্ব্বত ও বনে আকীর্ণ। মধ্যে মধ্যে দুই একটী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদী বন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। প্রায় কোন নদীতেই তাদৃশ জল নাই। যতটুকু আছে তাহা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। বোধ হয় এই জলের গুণেই এতদ্দেশের লোক সকল সুস্থ ও সবলকায়। কোন কোন নদীর উপর দিয়া আমাদিগের গাড়ী চলিতে লাগিল। এই সকল নদীর উপরে সেতু নির্ম্মাণ করিতে রেলওয়ে কোম্পানীর বিস্তর টাকা ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, এই সকল বন্যদৃশ্য অতীব মনোরম ও সন্তোষপ্রদ। বোধ হয় অন্য কোনও প্রকার সুখ, এই দৃশ্যজনিত সুখের সহিত তুলনীয় নহে। এই কারণেই কবি ও ভাবুকগণ চিরকাল বনে বনে ও পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিয়া অনুপম সুখভোগের একাধিকারী হইয়া আসিতেছেন। রেলওয়ে শকট কোনপ্রকার বিঘ্নবাধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্রুতবেগে আপন মনে চলিতে থাকে ও পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু বিপরীত দিকে তদ্রূপবেগে ছুটিতে

থাকে, ইহাও জগতের একটী অনুপম দৃশ্য। এইরূপে নানাপ্রকার চিত্ত বিমোহিতকর দর্শনীয় দেখিতে দেখিতে কয়েকটী ষ্টেশন ছাড়িয়া আমরা মধুপুর নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

মধুপুর একটী বড় ষ্টেশন। এখান হইতে গিরিডি যাইবার শাখারেলওয়ে বাহির হইয়াছে। এখানে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা রেলওয়ে শকট অবস্থান করে। তজ্জন্য নানাদেশীয় যাত্রীগণ এখানে অবতরণ করত আপন আপন অভিলষিত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া লয়েন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে রেলওয়ে শকটও বহুদূর গমনজনিত শ্রান্তি দূর করিয়া আপন খাদ্য সংগ্রহ করনানন্তর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। এখন বেলা ৮টা। শীতকালের সূর্য্য মৃদুমন্দ কিরণ বর্ষণ করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবকে সজীব ভাব প্রদান করিতে লাগিল। আমরা শকট মধ্যে উপবেশন করিয়া নানাবিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গী আমাকে সুস্থ দেখিয়া মনে মনে সুখী হইলেন। ক্রমে বৈদ্যনাথ ছাড়িয়া চলিলাম। এক্ষণে চতুর্দ্দিকে অধিক পরিমাণে পর্ব্বত দেখিতে লাগিলাম। রেলওয়ে ট্রেন কখন কখন দুই পার্শ্বে পর্ব্বত ভেদ করিয়া যাইতে লাগিল। কোন কোন ষ্টেশন ঠিক পর্ব্বত তলে অবস্থিত। আমরা নিম্ন বঙ্গ-ভূমির লোক; এত পর্ব্বত একত্রে কখন দেখি নাই। সুতরাং এই দৃশ্যে আমরা যে বিস্মিত হইব তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পর্ব্বতের আকার, তদুপরি লোকের অবস্থান ও শস্য উৎপাদন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর ও সরিতের ধীরে ধীরে গমন ও পতন প্রভৃতি মনে করিয়া অন্তঃকরণে বিস্ময় সম্বলিত আনন্দরসের উদ্রেক হইতে লাগিল। এই দুঃখপূর্ণ জীবনের একে একে সমুদায় ঘটনা স্মরণ করিয়া দেখিলাম; বোধ হইল এরূপ সুখ একদিনও ভোগ করি নাই। এইরূপে বিস্ময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া আমরা কতদূর ছাড়িয়া চলিলাম। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে কর্ড ও লুপ লাইন একত্র মিলিত হইয়াছে। এখানে একটী নদীর উপর রেলওয়ের প্রকাণ্ড সেতু রহিয়াছে। নদীটীর নাম স্মরণ নাই।

লক্ষ্মীসরাইএর একটী ষ্টেশন পরেই মোকামাষ্টেশন। এখান হইতে লুপলাইনের ট্রেন যাতায়াত করে। ষ্টেশনটী বেশ সুরম্য। এখানে ট্রেন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। আমরা মোকামা ছাড়িয়া চলিলাম। এক্ষণে আমরা বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধদিগের বিহারক্ষেত্র বিহার প্রদেশে আগমন করিয়াছি। বিহারের বিষয় মনে পড়িয়া এককালে কত অতীত ঘটনাই স্মৃতিপথে উদিত হইল। এই বিহার প্রদেশে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানগণ ক্রমান্বয়ে কত প্রসিদ্ধ ঘটনার অভিনয় করিয়াছিলেন। এক সময়ে ইহার শোভা ও সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। যখন মহারাজ অশোক বৌদ্ধপতাকা উত্তোলন পূর্ব্বক দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ চর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন ইঁহার প্রভাবে পৃথিবী কম্পান্বিত হইত। আবার যখন মস্তকে দীর্ঘ শিখাধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চাণক্য পণ্ডিত, রাজা চন্দ্রগুপ্তকে উপলক্ষ্য মাত্র করত স্বীয় বুদ্ধি বলে ও চাতুর্য্য কৌশলে নন্দবংশীয় রাজাদিগের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বকীয় অপমানের প্রতিশোধ দিয়াছিলেন তখন ইহার এক সময় ছিল। শেষ যখন মুসলমানদিগের সুরবংশীয় সেরসাহ এই প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বয়োবৃদ্ধি সহকারে, প্রবল

প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অমিত তেজোবলে সম্রাট হুমায়ুনকে কণোজের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন তখন ইহার গৌরবের ইয়ত্তা ছিল না। কালের এই সকল পরিবর্ত্তনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্ষুন্ন মনে বাড ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। বাড় হইতে বাডঘাট পর্য্যন্ত একটী শাখাপথ আছে। পরে গঙ্গা পার হইলেই ত্রিহুত ষ্টেট্ রেলওয়ে। এই লাইন দিয়া দ্বার ভাঙ্গা যাইতে হয়। বাড ষ্টেশনের আর দুইটী ষ্টেশন পরেই পাটনা (City) ষ্টেশন। এই পাটনা নগর পূর্ব্বকালে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। ইহারই পূর্ব্বনাম পাটলীপুত্র। এখানে নন্দবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। বাঙ্গালার নবাবদিগের রাজত্বকালেও পাটনা একটী প্রধান স্থান ছিল। এখনও এই নগরী সমস্ত বিহার প্রদেশের রাজধানী ও বিশেষ সমৃদ্ধ। এখানে বিবিধ বাণিজ্যকার্য্য সম্পন্ন হয়। পাটনা রবি শস্যের জন্য বিখ্যাত। বাস্তবিক রেলগাড়ী হইতে চতুর্দ্দিকে যত দূর দৃষ্টি চলে ততদূরই কেবল নয়ন-রঞ্জন শ্যামল শস্যক্ষেত্রে আবৃত দেখিলাম। এক্ষণে আর পর্ব্বত শ্রেণী দেখা যাইতেছিল না। পাটনার পরেই বাঁকীপুর ষ্টেশন। এখান হইতে গয়া ষ্টেট্ রেলওয়ে ব্রাঞ্চ্ বাহির হইয়াছে। বাঁকিপুর মন্দ স্থান নহে। পূর্ব্বে রেলওয়ে শকট হইতে প্রায়ই পল্লীগ্রাম দেখা যাইতেছিল না। এক্ষণে দূরে দুই এক খানি গ্রাম দৃষ্টি পথে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের অবস্থা ভাল নহে। ইহার পরেও যে সকল পল্লীগ্রাম দেখিয়াছি, তাহাতে আমার সংস্কার জন্মিয়াছে যে, পশ্চিম প্রদেশের পল্লীসমূহ অতি শোচনীয় অবস্থাপন্ন। সাধারণতঃ বাঙ্গালার গ্রাম সমূহের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন নহে।

বাঁকীপুর বা মিঠিপুর ষ্টেশনের পরেই দানাপুর ষ্টেশন। এইটী গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদিগের জন্য, এই কারণে ইহাকে মিলিটারী ষ্টেশন কহে। দানাপুর একটী প্রসিদ্ধ নগর। আমরা দানাপুর ও বিটা ষ্টেশনদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। বিটা ও কোয়েলায় ষ্টেশনের মধ্যে প্রসিদ্ধ শোননদীর ব্রীজ বা সেতু। তেমন দ্রুতগতি শকটেরও এই সেতু পার হইতে ৫ মিনিট লাগিয়া থাকে। সেতুটী ঠিক এক মাইল প্রশস্ত। ইহার নির্ম্মাণে ইংরাজের অসাধারণ বুদ্ধি, কৌশল ও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। যে বুদ্ধির প্রভাবে বায়ুর ন্যায় বেগ বিশিষ্ট রেলওয়ে শকট ও ক্ষণকাল মধ্যে শত যোজনের সংবাদবাহী তাড়িত বার্ত্তাবহের আবিষ্কার হইয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ নদীর উপর আশ্চর্য্য সেতু নির্ম্মাণ করাও সেই বুদ্ধির উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। আমরা প্রাচীন কালের রাজাদিগের অনেক অসাধারণ কীর্ত্তির বিষয় শ্রুত আছি এবং কতক স্বচক্ষেও দেখিয়াছি, কিন্তু ইংরাজের অমানুষিক কার্য্যের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। বোধ হয় অবিশ্রান্ত উদ্যম ও অধ্যবসায়, অসামান্য বুদ্ধি এবং ততোধিক কার্য্য সফলতা জনিত উৎসাহ প্রভাবে ইংরাজ জাতি পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ হইয়াছেন। আর প্রাচীন সভ্যতাভিমানী প্রাচীন জাতি আমরা আপনাদিগকে দৈববিহীন মনে করিয়া পদ-দলিত হইতেছি। হায় কালের কি মাহাত্ম্য!

কোয়েলার ষ্টেশনটী দেখিলে বোধ হয় যেন ব্রীজের সঙ্গে একত্রে গাঁথা রহিয়াছে। যখন এই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, তখন সূর্য্যদেব রক্তিমবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক পাটে বসি-

বার উদ্যোগ করিতেছেন। "এই মনোহর শোভা সমৃদ্ধি সম্পন্ন, জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য জাতির আবাস ভূমি পৃথিবীমণ্ডল আর দেখিতে পাইব না" ভাবিয়াই যেন সূর্য্যদেব মনে মনে দুঃখিত হইতে লাগিলেন, এবং ক্রমশঃ অপ্রসন্নভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন আমাদিগের মন অপেক্ষাকৃত স্ফূর্ত্তি বিহীন হইল। বাস্তবিক এক সূর্য্যের অভাবে রাত্রিকালে সমস্ত পৃথিবী নিরানন্দ ভাব ধারণ করিয়া থাকে।

সন্ধ্যার পরেই আমরা আরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আরা ষ্টেশনটী মন্দ নহে। আরা বা সাহাবাদ বিহার প্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ জেলা। এই জেলায় অনেক নীলকর সাহেব বাস করিয়া থাকেন। ক্রমে আমরা দুই তিনটী ষ্টেশন ছাড়িয়া বক্সারে উপনীত হইলাম। বক্সার ষ্টেশনটী সুদৃশ্য। এই বক্সারে কয়েকটী যুদ্ধ ঘটনা হয় বলিয়া ইতিহাসে ইহার নাম অতি প্রসিদ্ধ। বক্সার হইতে ট্রেন ছাড়িলে, অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পাইবনা বলিয়া আমরা গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এক্ষণে অত্যন্ত শীত বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত দিবস অনাহারে থাকাতে শরীরও ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল; সুতরাং আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে মোগল সরাই নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখন রাত্রি ১১টা। মোগল সরাই ষ্টেশন বেশ জাঁকাল। এখানে ট্রেন অনেক ক্ষণ বিশ্রাম করে এবং এখান হইতে স্বতন্ত্র রেলওয়ে দিয়া বেনারস বা কাশী যাইতে হয়। গঙ্গার পরপারে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এখানে যাত্রীগণ শকট আরোহণে ও অবরোহণে ব্যস্ত। আমি শরীরের ক্লান্তি বশতঃ ও অন্যকারণে এখানে অবরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ পদ চারণা করিতে লাগিলাম। ক্রমে ট্রেন ছাড়িবার সময় হইয়া আসিল। আমি ট্রেনে উঠিতে যাই এমন সময়ে একজন এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান সাহেব আমাকে উঠিতে নিষেধ করিল। আমি তাহার উঠিতে না দিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া আমি ট্রেনে উঠিতে গেলাম। বোধ হয় এই কারণে তাহার রাগ বৃদ্ধি হইল। (ফিরিঙ্গী বাচ্ছা কি না!) সে ব্যক্তি অসদ্ব্যবহার করিতেও ক্ষান্ত হইল না। কিন্তু কিছুতেই আমাকে নিবারণ করিতে পারিল না। আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, সেও রাগে গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেল। এই সকল দুর্দ্দান্ত কর্ত্তব্য বুদ্ধি পরিশূন্য এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান, আপনাদিগকে ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দিয়া মহৎ ইংরাজ নামে কলঙ্কারোপ করিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহারা যে ইলবার্ট বিলের ঘোরতর প্রতিবাদ করিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই সকল ফিরিঙ্গী সন্তান দেশের মহা অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। ইহাদের কুপরামর্শে অনেক খাঁটী ইংরাজ, দেশীয়দিগের প্রতি অযথা ব্যবহার ও অত্যাচার করিয়া থাকেন।

বলিতে পার, প্রবল স্বভাবতঃ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয় কেন? এই সংসারে যেখানেই দেখি, প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে। রাজা প্রজার উপর, জমিদার কৃষকের উপর, ধনী নির্ধনের উপর, প্রভু ভৃত্যের উপর অত্যাচার করিতেছে। এইরূপ অত্যাচার করা জগদীশ্বরের নিয়ম অথবা জীব প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্ম, অনেক সময়ে তাহা বুঝিতে পারি না। অত্যাচার পরায়ণতা জীব প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্ম

হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে সক্ষম ঈশ্বর-সৃষ্ট-জীব রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম মনুষ্যগণকে অত্যাচার পরায়ণ দেখিলে, জগতের বর্ত্তমানাবস্থাকে সভ্য বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না; প্রত্যুত স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ হয়। কে বলে, জ্ঞানবুদ্ধিসহকারে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়?

ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি মিসর রাজ সিসষ্ট্রীস্ অত্যন্ত দাম্ভিক ও অত্যাচারী ছিলেন। তিনি পরাজয়াবনত রাজাদিগের দ্বারা আপনার শকট বাহনের কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতেন। এক দিবস এইরূপ শকটে মিসর রাজ গমন করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন পরাজিত রাজগণের মধ্যে একজন, শকটচক্রের দিকে এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি মিসর রাজ কর্ত্তৃক ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, উত্তর করিলেন যে, "চক্রনেমীর যে স্থান একবার উর্দ্ধে উঠিতেছে, সেই স্থানই আবার অধঃপতিত হইতেছে, ইহাই দেখিতেছিলাম।" সিসষ্ট্রীস্ ইহার তাৎপর্য্য বুঝিলেন—অর্থাৎ তিনি মনে করিলেন যে এই চক্রনেমীর ন্যায় মনুষ্যের অদৃষ্টও পরিবর্ত্তনশীল। যে ব্যক্তি ভাগ্যবলে এক সময়ে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, কালচক্র তাঁহাকে আবার দুঃখের অশেষ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হইবে। ইহার পরই তিনি বন্দীরাজগণকে বিমুক্ত করিয়া দেন। হিন্দুদিগের এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাঁহাদিগের উপদেশাবলীর প্রথম সূত্রই "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।" তবে এ দৃষ্টান্ত সকল জাতির দৃষ্টি পথে পতিত না হইতে পারে। কিন্তু উপরি লিখিত দৃষ্টান্তটী ইংরাজী ভাষায় লিখিত; উহা কি ইংরাজগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না? যদি এ দৃষ্টান্তেও প্রধানেরা অত্যাচার হইতে বিরত না হন, তবে জানি না জগতের শেষ অভিপ্রায় কি? কি বলিতে বলিতে কি বলিলাম!

মঙ্গল সরাই হইতে গাড়ী ছাড়িলে দুরন্ত শীতের জন্য বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আর অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইব না বলিয়াও বটে, আমরা শুইয়া পড়িলাম। পরে রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় এলাহাবাদ ষ্টেশনে উত্তীর্ণ হইলাম এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদিগের আহ্বানকারীর বাটীতে উপনীত হইলাম। তাঁহারা আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মঙ্গল সরাই হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত রাস্তার মধ্যে বর্ণনীয় বিষয় অনেক আছে। ক্রমে তাহা বলিব। এক্ষণে এলাহাবাদের বিবরণ লিখিতেছি।

(ক্রমশঃ)

নরসিংহ।*

—০•—

পদ্যময় নাটক।

ব্যক্তিগণ।

নরসিংহ।	ভাগ্যদেব।
দিননাথ ঠাকুর।	নিয়তিগণ।
ব্যাধ।	প্রতিহিংসা।
নিধিরাম।	ব্রহ্মাণ্ড আত্মা।
সৃষ্টিধর।	ব্রহ্মময়ীর আত্মা।
	নরসিংহের প্রতিভা।

পর্ব্বতদেশের অধিষ্ঠাত্রী।

অন্যান্য আত্মা ও প্রেতগণ।

—০ঃ()ঃ০—

"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."
Hamlet.

—••—

প্রথম অঙ্ক।—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয় পর্ব্বত।

নরসিংহ উপবিষ্ট।

ন। নির্ব্বাপিত দীপে আজি প্রোজ্জ্বলিত করি
সম্মুখে, অনন্ত কাল এমনি করিয়া
তার প্রতি স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিবে।
কিন্তু পুনরুদ্দীপিত সে আলো কি কভু
জ্বলিবে অনন্ত কাল অভাগার তরে?
সুনিদ্রা ত অভাগারে গিয়াছে ছাড়িয়া;
দারুণ হৃদয়ভেদী ভাবনার স্রোতঃ
তন্দ্রা সহ অহরহ হইয়া মিলিত,
বিষাদের সুভীষণ তরঙ্গ কম্পিত
এ মনঃসাগরে পশে, পাপ কর্ম্ম নাশা
ভাগীরথী সহ যেন বঙ্গোপসাগরে।
সে ভাবনা স্রোতঃ হায় এত যত্ন করি
নিবারিতে না পারিনু একি ঘোর দায়!
উঃ
যখনি নয়ন মুদি তখনি অন্তরে
কি ভীষণ দৃশ্য, অহো পাইগো দেখিতে!
এ যাতনা সহিয়াও রয়েছি জীবিত?
জীবন্ত মানব মুখ দেখিতেছি পুনঃ?
(কিঞ্চিৎ পরে)
দুঃখই কেবল কিন্তু মানবের মনে
জ্ঞানের সঞ্চারে শক্ত—বিষাদই বিজ্ঞান।
মহাজ্ঞানী, মহাদুঃখী—সেই শুধু জানে
সুখ সুধা কভু নাহি জ্ঞান বৃক্ষে ফলে।
দর্শন বিজ্ঞান, কিবা, বিস্ময় নির্ঝর,
মানবের জ্ঞানস্রোতঃ কোথা সমুচিত,
কোথা প্রবাহিত, কোথা পতিত, সকলি
বিদিত আমার কাছে—এমনো মাঝারে
এখনও এমন শক্তি নিবসে সতত
যাহার প্রভাবে আমি পারি সে সকলে
করিবারে বশীভূত—অঙ্গুলি চালনে
সসম্ভ্রমে মানি মোরে সে স্রোত নিচয়
লঙ্ঘিবে স্বভাবগতি—বহিবে উজান।

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ পূর্ব্বে 'আর্য্যদর্শন' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে প্রবন্ধ লেখক তৎকালে ইহার অবশিষ্টাংশ উক্ত প্রবন্ধে প্রদান করেন নাই। এক্ষণে ইহা আমূল প্রবাহ প্রকাশিত হইতেছে।—প্রবাহ সম্পাদক।

অসীম ক্ষমতা মম সকলি বিফল !
পর উপকার তরে নিজ স্বার্থ আমি
ত্যজিয়া ভুগেছি কত দুঃসহ যাতনা
সংসার পৃথিবী পরে, নরচিত্তাকাশে
কতই সুন্দর গ্রহে উদিত হইতে
দেখেছি নয়নে, কিন্তু সকলি বিফল।
কত শক্র ছিল মোর—কিন্তু পরাজিত
কখন(ও) কাহার(ও) কাছে হয়নি জনমে।
এ গর্ব্ব উন্নত শিরঃ বিজিত হইয়া
অবনত কার(ও) কাছে হয়নি কখন(ও)।
এই বাহুবলে আমি কৈনু পরাজিত
কত শক্র বল—কিন্তু সকলি বিফল।
উত্তম অধম কিবা—জীবন, মরণ—
ক্ষমতা বা রিপুচয়—যা কিছু জগতে
নরভোগ্য, সকলি ত বৃথা মোর কাছে।
উত্তপ্ত বালুকা মাঝে জলবিন্দু সম।
সেই কুঘটনা এই যাতনা প্রভৃতি।
বুঝি নাই ভীতি কিবা—স্বভাব এ মনে
সে ভাব ভুলেছে দিতে। হৃদয়ে আমার
বাসনা কি আশা আর কয়না উদিত।
হেন দ্রব্য পৃথিবীতে নাগিরে আমার—
অহো, দুরদৃষ্ট মম—যার তরে মন
ক্ষণেকের (ও) তরে এবে হয় লালায়িত।
উঃ।

(কিঞ্চিৎ পরে)

কিন্তু,
দেখ আজি পারি কিনা এ কার্য্য সাধিতে।
অসীম জগৎ আত্মা, আইস সকলে ;—
কি আলোকে কি তমসে—দিবসে নিশিতে
ডাকিয়াছি কত বার, পুনঃ আজি ডাকি।
অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ—সমুদ্রের ভীম
উন্নত তরঙ্গ রাজি—নিবিড় কানন।
দুর্ব্বল, সাধিতে বিঘ্ন তব গতি পথে।
কেন বিলম্বিছ ? এস তোমরা সকলে
স্বৈরগতি, ডাকি আমি আইস সত্বরে।
অধীন আমার যবে সেই মন্ত্রবলে
তোমরা, সে মন্ত্র আমি উচ্চারণ করি
ডাকিতেছি, অবিলম্বে হও আবির্ভূত।

(কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে।)

একি !
এখনও অনাগত—এত গৌণগতি !
বুঝিতে নারিনু কেন ? কিসের কারণে,
কি সাহসে মম আজ্ঞা বিলম্ব পালিতে ?
এই চিহ্ন যার নামে আতঙ্কে শিহর—
দেখ এই চিহ্ন সবে ; মৃত্যুঞ্জয় দেব,
প্রভু যিনি তোমাদের, মন্ত্রদাতা মম,
তাঁহার পবিত্র নামে ডাকিতেছি আমি,
এসগো জগৎ আত্মা এস গো সকলে।

(কিঞ্চিৎ পরে)

তবুও কি আসিবেনা ? জানিনা কেমনে
কোন্ বলে এত স্পর্দ্ধা মন্ত্রাধীন জীবে ?
প্রচণ্ড প্রভাব পুনঃ করিব প্রয়োগ—
আর(ও) মহত্তর বল হবে প্রকাশিত—
দেখিব তাহাতে তারা না আসে কেমনে।
উঠহে ব্রহ্মাণ্ড আত্মা, আইস সকলে—
যে চিন্তা অন্তরে মোর চির সে চেতন,
প্রবল শাপাগ্নি যাহা জ্বলিছে অন্তরে
অহরহ, তার নামে ডাকি পুনঃ আমি
তোমাদের, উঠ সবে, এস ত্বরা করি।

নেপথ্যে প্রথম আত্মা।

মানব আইনু তোমার আদেশে
ত্যজিয়া আমার আকাশ ভবন,
গোধূলি তপন কিরণে উজল
লোহিতাভা কিবা নয়ন রঞ্জন !
নিদাঘ প্রদোষ রবিকর যার
ললাট রঞ্জনে যতনে নিরত,
নীল মেঘ আভা কেশ বিধানিতে
সিন্দুরের রেখা আঁকয়ে সতত।

যদিও তোমার আদেশ লঙ্ঘিতে
ক্ষমতা হে নর আছিল আমার,
তারকা-কিরণ-রথে আরোহিয়া
এসেছি তথাপি সকাশে তোমার।

নেপথ্যে দ্বিতীয় আত্মা।

পর্ব্বত প্রধান হিমালয় গিরি—
অদ্রিরাজ বলি জগতে বিদিত—
শিলা সিংহাসনে, আকাশ বসনে,
তুষার মুকুটে চিরবিরাজিত—
কটি দেশ সদা কাননে বেষ্টিত—
দীর্ঘ শিলাখণ্ড রাজদণ্ড করে,
সেই হিমাচল পর্ব্বতের রাজা
আমার আতঙ্কে সদাই সিহরে।
নিয়তই শিলা পড়িছে খসিয়া,
গলিয়া যেতেছে অবনীর পানে—
পর্ব্বত সামগ্রী পৃথিবীর মাঝে,
সবাই আমার আদেশে সম্মানে।
মহীধর আত্মা আমি হে সকল,
পারি তাহাদের বিনত করিতে—
কেন হে মানব ডাকিলে আমারে
কি কার্য্য আমার হইবে সাধিতে?

নেপথ্যে তৃতীয় আত্মা।

সুনীল গভীর জলধি গরভে,
তরঙ্গ ভঙ্গিমা নাহিক যথায়—
পবনের সহ করিয়া বিবাদ,
আঘাতে না যথা তরঙ্গ বেলায়—
যাদোগণ যথা করে সুখে বাস
সাগর কামিনী সুহাসে যেখানে,
কুঞ্চন-কেশ মুকুতা জড়িত
করিতেছিলেন - বসিয়া সেখানে,
দেখিতেছিলাম সে লাবণ্য রাশি
সুনীল আকাশে তারকা যেমনি—
সহসা পশিল শ্রবণ বিবরে
তব মন্ত্র, ত্বরা আইনু অমনি।
জলধি নিচয় অধিষ্ঠাতৃ দেব,
আসিয়াছে, নর, তোমার নিকটে।
কি বাসনা তব উদিয়াছে মনে
বল মোরে ত্বরা বল অকপটে।

নেপথ্যে চতুর্থ আত্মা।

ভূমিকম্প যথা নিবসে নিয়ত,
অগ্নিস্তুপ যথা বিরাজে সতত,
তপ্তধাতু যথা, সাগর যেমন
ধরিছে বক্ষেতে, তরঙ্গ ভীষণ।
মহীধর মূল বিস্তৃত যেখানে,
মহীধর চূড়া যেমন বিমানে,
সেই নিজ দেশে সদা করি বাস,
মন্ত্রবলে, নর, আমি তব দাস—
আসিয়াছি তাই তোমার নিকটে,
পড়িয়াছ তুমি বল কি শঙ্কটে।

নেপথ্যে পঞ্চম আত্মা।

আসিয়াছি আমি পবন বাহন,
ঝঞ্ঝ প্রবর্ত্তক, তোমার সকাশে
ঝটিকা প্রবাহ উন্মত্ত হয়ে
বিদ্যুতের সহ খেলিছে আকাশে
ত্যজি তাহাদের, তব মন্ত্রবলে
আইনু মানব ধরণী উপর,
বল ত্বরা করি কি প্রার্থনা তব,
কোন্ দ্রব্য লাভে ব্যাকুল অন্তর?

নেপথ্যে ষষ্ঠ আত্মা।

প্রশান্ত রজনী ছায়া কান্ত মম কাছে,
দুর্গম কান্তার কিম্বা ঘোর অন্ধকার—
কেন তব মন্ত্র আলো, হে ভুবন বাসী,
প্রবেশিল বল আজি আবাসে আমার?

নেপথ্যে সপ্তম আত্মা।

যে নক্ষত্র বশে অদৃষ্ট তোমার
সে নক্ষত্র, নর, অধীনে আমার।

ছিল সে তারকা নবীন সুন্দর,
ছড়াইত আভা নেত্র তৃপ্তি কর—
একটী তারাও উজ্জ্বল তেমন,
আকাশ কখন করেনি দর্শন,
একটী তারকা তেমন সুন্দর,
আলিঙ্গন বদ্ধ করেনি অম্বর;
স্বাধীন সরল ছিল তার গতি,
সহসা তাহার ফিরিল নিয়তি;
সে সুন্দর তারা হল পরিণত
অগ্নি শিখরূপে; ঘুরিছে নিয়ত—
বক্রভাবে সদা; ব্রহ্মাণ্ডের লোক
বিস্মিত চকিত হেরে সে আলোক।
নির্দ্ধারিত গতি নাহিক তাহার
জগতের মনে ভয়ের সঞ্চার
করিয়া রয়েছে উপর গগনে;
তাহারি ক্ষমতা তোমার জীবনে,
তুচ্ছ কীট তুমি, তব মন্ত্রবলে
মানি তোমা, কিন্তু ক্রোধে দেহ জ্বলে;
যে ক্ষমতা বশে অধীন তোমার
হয়েছি আমরা, নহে তা তোমার;
মহীতল বাসী বল কি কারণ
সহসা মোদের করেছ স্মরণ?

নেপথ্যে সকলে

মেদিনী, সাগর, বায়ু, রজনী, ভূধর,
ঝটিকা, অদৃষ্ট তারা অথবা তোমার—
সকলি অধীন তব, এ ঘোর নিশিতে
কি বাসনা বল ত্বরা করিয়া বিস্তার।

নর। বিস্মৃতি——

১ আত্মা কিসের তরে? কেন, কিকারণ?

নর। অন্তর হইতে মোর দুরন্ত চিন্তারে
দূর কর এরি তরে চাহি গো বিস্মৃতি;
দেখহ হৃদয়ে মোর নিরখি তোমরা
সর্ব্ববিদ্, বাক্যে আমি নারি প্রকাশিতে।

১ম। প্রদান করিতে তোমা পারি সে সকল
প্রভুত্ব মোদের আছে যাদের উপরে;
অবনীর আধিপত্য ইচ্ছা কর যদি,
কিম্বা পঞ্চভূতে চাহ করিতে অধীন,
দিতে পারি, এ সকল আমাদের বশে।

নর। বিস্মৃতি—আত্মবিস্মৃতি যাচি তব কাছে;
ক্ষমতা, প্রভুত্ব, মোর ইথে অভিলাষ
নাহি কিছু, নাহি চাহি এ সকলে আর।
তোমাদের অধিকৃত প্রদেশ হইতে—
প্রদানিতে পার যার প্রভুত্ব আমারে,
পার না কি দিতে মোরে আত্মবিস্মরণ?

১ম। আমাদের সাধ্যাতীত সামগ্রী কেমনে
দিব তোমা? কিন্তু তুমি পারত মরিতে।

নর। মরিলে কি পাব মম প্রার্থিত সে ধন?

১ম। অমর আমরা সবে, বিস্মৃতিবিহীন,
এ আত্মা জ্ঞান ত নর অনন্তে ধাবিত,
ভূত ভাবী বর্ত্তমান আমাদের কাছে
সকলি সমান, নর, বুঝিলে কি তুমি?

নর। পরিহাস করিবার এই কি সময়?
কিন্তু সেই মন্ত্র তোমা আনিয়াছে হেথা,
সে মন্ত্র প্রভাবে সবে অধীন তোমরা
আমার—সাহসে কিবা আমার বাসনা
বিফল করিতে চাহ, উপহাস কর?
আমার হৃদয়, আত্মা, চির গর্ব্বশালী
এ প্রাণ-বিদ্যুৎ ছটা চির সমুজ্জ্বল,
দূর প্রসারিত সদা মহাশূন্য দেশে—
যদিও এ ক্ষুদ্র-দেহ আকাশ-সম্ভবা।
জিজ্ঞাসিনু যা তোমারে কহ শীঘ্র করি।
আমার ক্ষমতা নহে অবিদিত কভু
তব কাছে—কহ শীঘ্র, নতুবা এখনি
সে প্রভাব ফল তব হইবে ভুগিতে।

১ম।
কি আর কহিব তোমা হে দুর্গা নর?
সংসারে আমরা সদা সৌভাগ্য সহায়—

না চাহ সে সব তুমি—তব মনোনীত
সামগ্রী প্রদানে মোরা অক্ষম, কহিনু।
তবে কেন বৃথা দোষী ভাবিছ মোদের?
কি ফল তোমার সহ পরিহাস করি
সুকৃতি?—

নর। কেন বা তবে বলিছ এমন?

১ম। ভাবি দেখ মনে মনে আরম্ভ অতীত
কোন (ও) দ্রব্য, কি উপায়ে দিব বল তোমা,
পুণ্যভাক্? মৃত্যু নহে আমাদের দাস,
তব উপকারে আর কি করিব বল
গুণনিধি, মন্ত্রবলে অধীন আমরা।

নর। বৃথা তবে তোমা সবে ডাকিনু হেথায়!
মম উপকার হায় তোমাদের দিয়া
দেখিতেছি, কখন (ও) না হবে সম্পাদিত।
তবে আর বৃথা কেন?—

১ম। আমরা যা কিছু—
প্রদানিতে পারি, নর, সকলি তোমার।
স্থির মনে ভাবি তুমি দেখ দেখি পুনঃ,
রাজত্ব, শাসন, বল, দীর্ঘায়ুঃ—

নর। কি হবে
দীর্ঘায়ুঃ পাইলে মোর? জীবন ধারণে
কি যাতনা, কে বুঝে তা? যাও সবে যাও

১ম। পুনঃ ভাবি দেখ মনে, কিছুই কি আর
জগতে প্রার্থিত ধন নাহিক তোমার?

নর। কিছুই নাহিক;—কিন্তু তিষ্ঠ ক্ষণকাল—
দেখিতে বাসনা করি তোমা সবাকারে।
তোমাদের কণ্ঠস্বর, বিষাদ কম্পিত
অথচ মধুর কিবা! এখনও যেন
শুনিতেছি, সঙ্গীতের রব শ্রোতা যথা
নীরবিলে গীতগায়ী, এ স্বর লহরী
তরঙ্গিনী উর্ম্মিমালা সহ যেন মিশি
সুদূর হইতে মৃদু আসিছে কেমন!
একটী তারকা অই দেখিতেছি আমি
বিমল, সুন্দর, স্থির, উজ্জ্বল আকৃতি।
আইস তোমরা সবে আমার সমীপে
পরিগ্রহি নিজ মূর্ত্তি—

১ম। আকৃতি মোদের
আত্মা মোরা, নাহি কিছু। করিব ধারণ
যে মূর্ত্তি বলিবে তুমি। কি বাসনা তব?

নর। কিছুই বাসনা নাই, যাহা ইচ্ছা কর।
এরূপ মূরতি এবে নাহি পৃথিবীতে
বিরক্তি বা প্রফুল্লতা প্রদানিতে পারে
এ মৃত অন্তরে মোর। তোমাদের মাঝে
মহাশক্তিশালী যেই, আমার সম্মুখে
আইস, বিহিত মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।

(একটী রমণীবেশে সপ্তম আত্মার প্রবেশ।)

৭ম। দেখ এবে নিরখিয়া—

নর। হা ঈশ্বর একি!
এ মূরতি সত্য যদি হইত তা হলে,
সেই সুখ পুনঃ আসি পশিত হৃদয়ে।
হায় রে এরূপে কেন অভাগার সনে
পরিহাস? আমারে কি উন্মত্ত করিতে?
কিন্তু, না—আইস তোমা তেমনি করিয়া
ভুজপাশে বাঁধি, বুকে রাখিব যতনে।
প্রিয়তমে পুনঃ দোঁহে তেমনি রহিব।

(আলিঙ্গন করিতে অগ্রসরণ ও মূর্ত্তির
তিরোভাব।)

একি! একি! কোথা গেল সে সুখ মূরতি?
সুখের স্বপন মম গেল যে মিলায়ে!
পরাণে দারুণ ব্যথা লাগিল সহসা—
হৃদয়-পঞ্জর মম গেল যে ভাঙ্গিয়া—
অন্তর শোণিত সব শুকাইল হায়—
একি? উঃ সহে না যে এ বিষম জ্বালা!

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

আকাশসম্ভবা দৈববাণী।

যখন রজনীকান্ত তটিনী উরসে
শতমূর্ত্তি ধরি যেন খেলেন হাসিয়া—

বিটপী শরীরে যবে খদ্যোত ঝলসে,
নীরবে কানন পতি বেশে উজলিয়া—
যখন প্রকৃতি সতী ঘুমে অচেতন,
চন্দ্রমা তারকা করে সুধা বরষণ—

নিঃস্বার্থ জীমূতবৃন্দে যতন করিয়া
মস্তকে ধরিয়া সুখী হিমাদ্রি যখন;
সুপ্ত দিগঙ্গনাগণ—থাকিয়া থাকিয়া
পাপিয়া মধুর রবে জুড়ায় শ্রবণ—
সমগ্র মানব যবে সুসুপ্ত রহিবে,
তখন(ও) তোমার মন বিষাদে কাঁদিবে।

শান্তি কি নিদ্রারে আর জনমে কখন
পাবে না দেখিতে তুমি হতভাগ্য নর;
শাপাগ্নিতে ভস্ম হবে তোমার জীবন,
বিবাদ প্রকৃতি সনে হবে নিরন্তর।
মহাপাপী, কি করিবে? মুছ নেত্রজল,
শান্তি ভাগ্যে নাহি তব, বিষাদ (ই) কেবল।

মরণ, জীবন্ত দুঃখ করে সংহরণ,
তাই মৃত্যু তব ভালে নাহিক ত্বরায়—
ভীষণ পাপের, নর, শাস্তিও ভীষণ,
ভুঞ্জ দুঃখ অবিরত থাকিয়া ধরায়;
শাপের উপরে শাপ করিনু প্রদান;
জনমে না হবে তব দুঃখ অবসান।

দেখিতে আমারে তুমি পাবে না নয়নে,
আমার ক্ষমতা কিন্তু সতত ভুঞ্জিবে;
শুনিতে আমার কথা পেলে না শ্রবণে,
কিন্তু কার সাধ্য মম আদেশ লঙ্ঘিবে?
জীবন্তে নিরয় বাস হয়েছে তোমার,
শান্তিতে পাপীর কভু নাহি অধিকার।

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক,—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমালয় পর্ব্বত।

ব্যাধের প্রবেশ।

ব্যা। সুন্দর সে মৃগশিশু পলাল কোথায়?
ক্ষিপ্রতায় হারাইল মম দ্রুতপদে?
দিনমান অর্দ্ধভাগ হয়েছে অতীত,
একি দুরদৃষ্ট মম, কিসের কারণে
একটী শিকার(ও) নাহি হল হস্তগত?
পণ্ডশ্রম, বৃথা যত্ন হল মোর আজি।

(অন্য দিকে নরসিংহের চিন্তিতভাবে প্রবেশ।)

(তাঁহাকে দেখিয়া)
একি!
নরান্তর সমাগম সম্ভবে এ দেশে
কিরূপে? মৃগয়ু ভিন্ন আসিতে এখানে
—দুর্গম—পারে না কেহ। উন্নত এ গিরি
লঙ্ঘিল কিরূপে আমি নারিনু বুঝিতে!
সমুজ্জ্বলবেশধারী, মুখশ্রী সুন্দর,
পৌরুষব্যঞ্জক কিবা, গর্ব্বিত আকৃতি—
আর(ও) সন্নিকটে গিয়া দেখিব উঁহাকে।
(অগ্রসর)

নর। ডাকিনু যে আত্মাগণে, ছাড়িয়া আমাকে
গিয়াছে চলিয়া সবে; বহুকাল ধরি,
বহু দুঃখ সহিয়াছি যে সব শিখিতে
সে সকল মন্ত্র মম হইল নিষ্ফল।
যে ঔষধে ভেবেছিনু অন্তর্দাহ মম
নিভিবে, প্রচণ্ডতর হইল যে তাহে।
দৈবশক্তি পরে আর নির্ভর কখন(ও)
করিব না—কেন পুনঃ নিরাশ-সাগরে
ডুবিব? অতীত নহে অধীন কাহার(ও)
ভবিষ্য ভাবিলে যেন হই জ্ঞানহারা
কি হবে জানিয়া তাহা অতীত না ভুলি?

অতীত পাপের ফল ভবিষ্য যন্ত্রণা।
হে ধরণি, হে ভূধর, তরুণ তপন,
কেন গো তোমরা সবে এতই সুন্দর?
অভাগা কখন(ও) ভাল বাসিবে না আর
তোমা সবে দেখিবে না প্রীতির নয়নে।
প্রকৃতি, তোমার নেত্র সদা উন্মীলিত,
আনন্দদায়িনী তুমি—কিন্তু এ হৃদয়ে
জান কি তোমার এই উজ্জ্বল আকৃতি
বিম্বিত হবে কি কভু, বল না আমারে?
এই যে পর্ব্বত শৃঙ্গ, যাহার উপরে
দাঁড়াইয়া আছি এবে—দূর নিম্নদেশে
উন্নত পাদপগণে দেখিতেছি যেন
গুল্ম সম; এই শৃঙ্গ, এই স্থান হতে
একটী লম্ফন মাত্রে মুহূর্ত্তের মাঝে
শিলাবক্ষ শয্যাপরে, ভূধর রাজের,
নিদ্রিত হইতে পারি, চিরদিন তরে।
ভুগিতে না হয় আর এ মহাযন্ত্রণা।
জানিতেছি সব, তবু কেন সঙ্কুচিত?
মনের বাসনা কেন বিরত সাধিতে?
যে কাজে যাতনা মম হয় অবসান
মুহূর্ত্তে, সাধিতে তাহা কেন এ ভাবনা?
সম্মুখে বিপদ ঘোর দেখিয়াও তাহা
পলায়নে এ বিলম্ব সাজে কি কখন(ও)?
কাঁপিছে হৃদয় তবু চরণ অটল।
কি ক্ষমতা আধিপত্য হৃদয়ে আমার
জানি না, যাহার বলে অভাগার ভালে
মরণ নাহিক ত্বরা—এ হৃদয় লয়ে
এ যাতনা আর আমি পারি না সহিতে!
(একটী পক্ষী আকাশপথে উড্ডীয়মান দেখিয়া)
হে বিহঙ্গ, শূন্য পথ বক্ষে বিদারিয়া
সুদূর আকাশে তুমি উঠেছ কেমন!
অদৃশ্য হইলে ক্রমে—উপরে কি নীচে
কিছুই অদৃশ্য কিন্তু নাহিক তোমার।
যথা ইচ্ছা তথা তুমি কর বিচরণ;
কি সুন্দর! ধরণীরে দেখ কি নয়নে!
স্বভাব উজ্জ্বল সদা তোমার সকাশে;—
প্রকৃতি তোমার দাসী, সুখবিধায়িনী।
জীবের প্রধান কিন্তু মানব আমরা,
নামে মাত্র; কার্য্যে মোরা বড়ই দুর্ব্বল।
আমাদের আশা উচ্চ, সামান্য অভাব
কত কষ্ট দেয় সবে, গর্ব্বিত আমরা
অথচ অধমতম—অবিশ্বাসী নর
মনের মালিন্য হেতু অশেষ যাতনা
ভুঞ্জে কত, তথাপিও অজ্ঞান, পাগল।
(দূরে ব্যাধের শৃঙ্গ বাদন।)
আহা কি সুন্দর স্বর পশিল শ্রবণে!
এ রবের প্রতিধ্বনি এমনি করিয়া
আমরণ কাল আমি পারি যে শুনিতে।
এমন মধুর ইহা; আহা, ইচ্ছা করে
অই শৃঙ্গরব সহ মিশায়ে পরাণে
আকাশে ভ্রমিতে সদা—বৃথা সে বাসনা।
অই রব কর্ণে যথা পশিয়া তখনি
বাতাসে মিশিয়া গেল, এ পাপ পরাণ
তেমনি করিয়া কেন মিশে না বাতাসে?
(চিন্তা।)
ব্যা। ঘোর কুজ্ঝটিকা ক্রমে আবরিল এবে
চতুর্দ্দিক—সাবধানে নামিতে উঁহারে
এ উন্নত শৃঙ্গ হতে বলিব এখনি।
নতুবা মুহূর্ত্ত মাঝে হারাবেন আজি
নিজ প্রাণে—উহুঃ একি দুর্গম প্রদেশ?
চলিতে চরণ মম কত বিচলিত।
(ধীরে ধীরে অগ্রসর)
নর। চিন্তায় আমার কেশ হইল পলিত,
ললাটে ভাবনা চিহ্ন কত সমুজ্জ্বল!
ভগ্নশাখা দারুরাজি সম্মুখে আমার
রয়েছে দাঁড়ায়ে অই, ঝটিকা প্রভাবে
এই দশা—পত্রহীন, শোভাহীন এবে।

আমারও এই দশা, প্রাণ বৃক্ষে মম
একটী একটী করি পড়েছে ঝরিয়া
আশা পত্র ছিল যত, এ ভীষণ ঝড়ে।
এই ভাবে চিরকাল রব কি জগতে?
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে হায় প্রত্যেক নিমেষে,
দুঃখ হেতু, যুগ সম বোধ হয় মম।
এ যাতনা পারি নাযে সহিতে গো আর,
পড়িতেছ নিম্নদেশে তোমরা সকলে,
সানুবাহী শিলাখণ্ড, দেখিতে দেখিতে
অভাগারে চূর্ণ কর, এ মম মিনতি।
এই দেখিতেছি তোমা, পলক পালটে
পড়িয়া সুদূর নিম্নে বিনাশিছ হায়
সুন্দর সামগ্রী কত! দরিদ্র কুটীরে,
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে কত করেছ বিনাশ,
দয়া করি অভাগার এ যন্ত্রণা হর।

(চিন্তা)

ব্যা। সাবধানে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ চরণে
যাই আমি, অকস্মাৎ পদশব্দে মম
চমকি উঠেন যদি, বিপদ সম্ভব।

(অগ্রসর)

নর। একি!
কিছুই দেখিতে আর পাই না যে এবে,
ঘোর কুজ্ঝটিকা রাশি ঘেরিল চৌদিকে।
শোভিছে দলে দলে পদতলে মোর
পয়োদ সমূহ কিবা! নির্ব্বৃত্তি এ দেশে।
হায় রে, অসীম এই অবনী মাঝারে
এ মত প্রদেশ যদি থাকিত, যেথানে
এমনো যাতনা মম নারিত পশিতে,
এ প্রদেশে পদস্থিত পয়োদ যেমন,
তা হলে এখনি গিয়া পশিতাম তথা—
এ যাতনা তা হলে ত হতনা ভুগিতে।
একি!
কম্পিত চরণ কেন হইল সহসা?
অস্থির মস্তক কেন? কি বিষম দায়!

ব্যা। কি দুর্গম পথ উহুঃ, যাইতে ওখানে
কত যে বিলম্ব হবে কে পারে বলিতে?
যাই শীঘ্র প্রাণপণে যতন করিতে
করিব না ত্রুটী, দেখি কতদূর হয়।

নর। কত শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়াছে শূন্য শূন্য করি.
নির্দ্দোষী মানব কত তাহার আঘাতে
চূর্ণ হয়ে ধূলি সহ গিয়াছে মিশিয়া।
জলাশয় কত তাহে বাষ্পরাশি রূপে
হইয়াছে পরিণত—(অগ্রসর)

ব্যা।——কে তুমি ওখানে?
সাবধান, পদমাত্র অগ্রসর হলে
অগাধ গহ্বর মাঝে পতন সম্ভব।
ধীরভাবে অই স্থানে রহ দাঁড়াইয়া,
হইও না অগ্রসর, দেখ, সাবধান।

নর। নিশ্চয় যন্ত্রণা আজি করিব নিঃশেষ।
ভূধর গহ্বরে এই লভিব বিরাম
অনন্ত কালের তরে। প্রকৃতি বিদায়—
আকাশ এ অভাগারে দেখ না চাহিয়া—
জগতে আমার তরে সৃষ্ট নহে কিছু
চির ভাগ্যহীন আমি। জননি পৃথিবি,
দেহ-পরমাণু মম লহ কোলে করি।

(লম্ফপ্রদানোদ্যত ও ব্যাধ কর্ত্তৃক ধৃত)

ব্যা। উন্মত্ত মানব একি? কিসের কারণে
এমন অধীর তুমি—জীবনে তোমার
এ বিরাগ কেন বল? এ পূত গহ্বর
কেন কলঙ্কিবে আজি মানব শোণিতে?

নর। এ মনোবেদনা হায় কে বুঝিবে বল?
ছাড় মোরে; একি একি ঘুরিতেছে কেন
ভূধর, পাদপ, সব; একি নেত্র মম
অন্ধ কেন অকস্মাৎ—হৃদয় দুর্ব্বল?
কে তুমি এসেছ হেথা, ছাড় আমারে।

ব্যা। আইস আমার সহ—বলিব তোমারে
কে আমি, কিসের লাগি ভ্রমিতেছি হেথা।
নিজ দেহ ভর তুমি রাখ স্কন্ধে মম;

হও অগ্রসর, পদ রাখহ ওখানে—
এই দিকে—এই যষ্ঠি ধর শীঘ্র ধর ;
এই বৃক্ষ অবলম্বি এস এইরূপে—
এই লহ কর মম করহ ধারণ,
ধর মম স্কন্ধ দেশ—এস ধীরে ধীরে।
বিপদ সঙ্কুল হেন পর্ব্বত উপরে
কি কারণে গতি তব? আইস এ দিকে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয় পর্ব্বত।—কুটীর।

ব্যাধ ও নরসিংহ উপস্থিত।

ব্যা। না না হেথা কিছুকাল করহ বিশ্রাম ;
যাইও পশ্চাতে—কেন এতই অধীর?
হৃদয় অশান্ত তব, শরীর দুর্ব্বল,
চলিতে অশক্ত এবে ; থাক আজি তুমি
এ আশ্রয়ে ; রাখি কালি আসিব তোমারে
বলিবে যেখানে ; যুবা, কোথা ধাম তব?
ন। কি হবে জানিয়া তাহা? পথ প্রদর্শিতে
প্রয়োজন কিছুমাত্র নাহিক তোমার।
আমার অজ্ঞাত পথ নাহি এ প্রদেশে।
ব্যা। পরিচ্ছদে আকৃতিতে ভাগ্যবান্ বলি
হয় বোধ ; বল তব নিবাস কোথায়?
অই তুঙ্গ শৃঙ্গ পরে শোভে সারি সারি
অট্টালিকা, বল মোরে উহাদের মাঝে
কোন্‌টী সম্মানে তোমা স্বপ্রভু বলিয়া?
শিশুকাল হতে আমি জানি ভালমতে
সমুদায় পথ ; কহ, এখনি তোমারে
প্রাসাদ তোরণে তব আসিব রাখিয়া।
ন। কিছুমাত্র প্রয়োজন নাহিক তোমার।
আমার আলয় কোথা কি হবে জানিয়া?

উঃ
দারুণ পিপাসা উহুঃ যাই প্রাণে মরি।
ব্যা। প্রস্রবণ বারি এই সুশীতল অতি
কর পান—
ন।——ওকি, ওকি ফেলহ সত্বরে
পাত্রসহ বারি তব ; দেখ উন্মীলিয়া
চক্ষুদ্বয়, রক্তবিন্দু দেখনা উহাতে।
ব্যা। কই রক্তবিন্দু কই উন্মত্ত যুবক?
ন। অই যে অই যে ; পাত্র নিক্ষেপহ ভূমে।
রক্তস্রোতঃ,—সেই উষ্ণ নির্ম্মল প্রবাহ,
পূর্ব্বপিতৃ পুরুষের শিরায় শিরায়
বহিত য'; আমাদের(ও) হৃদয় মাঝারে
ছিল যাহা, যবে মোরা উন্মত্ত যৌবনে
এক প্রাণে উভয়েরে বাসিতাম ভাল—
এত ভালবাসা নরে বাসেনি কখন,
এত ভালবাসাবাসি দেখেনি পৃথিবী
এত ভাল বাসা মর্ত্তে দুঃখের কারণ,—
এই রক্ত সে সময়ে হয়েছে পতিত।
কত দিন গত এবে তথাপি দেখনা,
উঃ
সেই রক্ত স্রোতঃ দেখ নির্ঝরের মত
উঠিছে বিমান পথে শূন্য আঁধারিয়া।
চাহিতে পারিনা আর কোমল নয়নে।
ব্যা। একি কথা? কি আশ্চর্য্য! হতভাগা নর
কোন্ দোষে, কোন পাপে এই দশা তব?
হৃদয়-উন্মাদকারী কি পাপে অন্তর
বল কলুষিত তব? নির্জ্জন প্রদেশে
বিহরিতে ভালবাস এই, সে কারণে?
যাই হক, যত্ত কেন ভীষণ যাতনা
সে পাপের হক্ তব ; তথাপি তাহার
শান্তি আছে ; ধীর ভাবে ভুঞ্জি সে যাতনা
স্বীকারিয়া পাপ নিজ সাধু সনে সদা
কর বাস—অনুতাপ কর তার তরে।
ন। শান্ত হও। কেন বৃথা? কহিও না মোরে

ও কথা—তোমার মত ধূলি বিনির্ম্মিত
দুর্ব্বল মানব যারা তাহাদের কাছে
ঘোষ' গিয়া এই কথা, জাননা কি তুমি
বহু উচ্চতর আমি সে শ্রেণী হইতে?

ব্যা। অশান্ত হওনা কভু; নিজ কর্ম্মফল
ফলিবে; তাহার তরে দোষী তুমি নিজে।

ন। শান্ত কিগো নহি আমি? ধীর ভাবে সব(ই)
সহিতেছি;—দেখ আমি রয়েছি জীবিত।

ব্যা। অসুস্থ জীবন তব—অশান্ত হৃদয়।

ন। শুন বলি, বহুদিন রয়েছি জীবিত,
বহুবর্ষে দেখিয়াছি আসিতে যাইতে।
কিন্তু তাহে ফল কিবা? এ কয় বৎসর
কেন রহিয়াছি বাঁচি? এই অল্পকাল
অনন্ত সময় সম, অভাগার কাছে।
ফুরাবেনা? জীবনের অন্তিম সময়
আসিবেনা? যাতনার হবে না কি শেষ?

ব্যা। এ বয়সে মৃত্যু চাহ? যৌবন তোমার
এখনও গত নহে——

ন। —— সময়ে কি করে?
সময়ে কি বয়ঃক্রম করে গো নির্ভর?
বয়ঃক্রম কার্য্য বুঝে—আমার জীবনে
করিয়াছি হেন কার্য্য যাহার কারণে
দিবারাত্রি সকলই অনন্ত আমার।
সকলি সমান, যেন সমুদ্রের তটে
বালিরাশি অগণন—

ব্যা। (স্বগত) জ্ঞান হারা যেন
হয়েছে যুবক, আহা, এ অল্প বয়সে।
কে বুঝে তোমার লীলা হে পরমপিতঃ?

ন। আহা সুখে থাক তুমি হে ব্যাধ দরিদ্র
সদা ধর্ম্মে রত মন থাকে যেন তব;
নির্দ্দোষ চিন্তায় সদা পূর্ণ হক মন;
স্বাধীন, পবিত্র, ধীর, ধর্ম্মভীত যেন
আত্মা তব হয় সদা। দিবস রজনী
শান্তির কোমল ক্রোড়ে লভহ বিশ্রাম।
আমার হৃদয় মাঝে উহঃ কি দেখিনু?
যই চক্ষু—প্রাণ মম জ্বলিছে হুতাশে।

ব্যা। আমার হৃদয় সনে তোমার হৃদয়
বিনিময় করিতে কি ইচ্ছা তুমি তবে?

ন। না, না, কেন হেন ইচ্ছা হইবে আমার?
অন্যায় যাতনা কেন অপরের প্রতি
নিক্ষেপিতে অভিলাষ উদিবে অন্তরে?
জীবিত মানব সনে হৃদয় আমার
বিনিময় করিবারে কভু নাহি চাহি।
হৃদয়ে যে বল মোর আছে গো এখন(ও)
তাহার প্রভাবে আমি সক্ষম ভুগিতে
এ যাতনা,—যত কেন দহুক আমারে।
কোন্ নর সাধ্য বল এ যাতনা ভোগে
আমি ভিন্ন? যার নামে মূর্চ্ছা যায় লোক
সে যাতনা ভুগিতেও নহিগো অক্ষম।
সহিষ্ণু হৃদয় হেন নাহি পৃথিবীতে।

ব্যা। অপরের দুঃখে যদি এতই ব্যথিত—
কোন্ দোষে বল তবে হৃদয় তোমার
কলুষিত হতে পারে? বল(ও) না ও কথা।
হেন সহৃদয় যার অন্তর সে কভু
প্রতিহিংসা বৃত্তি কি গো রাখে নিজ হৃদে?

ন। না না না, বুঝিতে তুমি পারনি আমায়।
কার রক্ত? শত্রু রক্ত বলি নাই আমি।
যে মোরে বাসিত ভাল—যারে পৃথিবীতে
ভাবিতাম প্রিয়তমা, অনিষ্ট তাহারি
ঘটিয়াছে। শত্রু সনে অন্যায়ে কখন(ও)
প্রতিহিংসা সাধিবারে করিনি যতন।
প্রণয়ের আলিঙ্গন কে জানিত মম
বিষময়?—

ব্যা। বিশ্বনাথ শান্তি যেন তোমা
দেন, উন্মত্ত নর, লভ জ্ঞান পুনঃ।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছা করিব নিয়ত,
তব তরে সদা আমি করিব প্রার্থনা।

ন। প্রার্থনার প্রয়োজন নাহি মম তরে।

যাই আমি—আর নহে, হয়েছে সময়।
বিলম্বে কি প্রয়োজন? এই স্বর্ণ মুদ্রা
লহ তুমি; লহ, ধর—প্রাপ্য ইহা তব।
আসিওনা মম সহ—সমুদায় পথ
জানি আমি; আসিওনা পুনর্ব্বার বলি।

নরসিংহের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন।)

—০:০—

দ্বিতীয় অঙ্ক,—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমালয় পর্ব্বত—উপত্যকা।

নরসিংহের প্রবেশ।

নর। দ্বিতীয় প্রহর দিবা—নির্ঝরিণী জল
রবিকরে বুকে করি হাসিছে কেমন!
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ অসহ্য এখন,
ছায়া অন্বেষিয়া সবে ফিরিছে কেবল।
বসিয়া এ তরুতলে, ছায়ায় শীতল
জুড়াই তাপিত দেহ, করি দরশন
প্রকৃতির এই শোভা জুড়াই নয়ন;
সবারি সুস্থির মন, আমারি চঞ্চল।
আমর নয়ন শুধু এ শোভা-অমৃত
করি পান একাকী এ নিরজন স্থানে
মন সুখে, হইতেছে কত বিমোহিত!
এ শোভা দেখাতে কারে ডাকিব এখানে?
এ প্রদেশ অধিষ্ঠাত্রী দেবীরে ত্বরিতে
ডাকি হেথা; মম আজ্ঞা কেবা অসম্মানে?
এস দেবি, দেখিবারে ও কম মুরতি
ডাকিতেছি তোমা হেথা মুহূর্ত্তের তরে,
জ্বলন্ত নয়ন তব, মধুর ভারতী,
সমুজ্জ্বল কেশরাশি, ললাট উপরে
মূর্ত্তিমতী শান্তি যেন করিছে বিরাজ,
লোহিত অধর প্রান্তে সুঈষৎ হাসি,
কপোলে রক্তিম আভা, এ মোহন সাজ,
কার না দেখিতে সাধ এ লাবণ্য রাশি?

(দেবীর প্রবেশ।)

দে। জানি আমি তোমা নর—যে ক্ষমতা বলে
মহা শক্তিশালী তুমি তাহাও আমার
নহে গো অজ্ঞাত; জানি, এ অবনীতলে
ভাল, মন্দ, দুইই কার্য্য আছয়ে তোমার;
উভয়ের(ই) শেষ সীমা; অনন্ত ব্যথায়
জানি আমি মন তব দহিছে সতত।
কি বাসনা উদিয়াছে এবে তব মনে?
কেন বা স্মরেছ আমা অসময় মত?
নর। সুরূপ ভাসিত তব বদন কমল
নিরখিতে ডাকিয়াছি আমার সকাশে—
পৃথিবী আমারে, দেখি, করেছে পাগল
ডাকিয়াছি তোমা, স্নেহ বারি লাভ আশে।
প্রতপ্ত হৃদয় মম করিতে শীতল
ডাকিয়া ব্রহ্মাণ্ড আত্মা সাহায্য প্রার্থনা
করিনু তাদের, কিন্তু সকলি বিফল
না হল আমার দেখি যাতনা খণ্ডন।
ডাকিনু তাদের আমি যাহার কারণে
অক্ষম তাহারা তাহা প্রদানিতে মোরে;
হে দেবি, এ অভাগার এ শোক দাহনে
নিবারণ করি, চির কৃতজ্ঞতা ডোরে
বাঁধে তারে, কেহ হেন জনম গ্রহণ
করেনি অবনীতলে, করিবে কখন(ও)?
দে। কি প্রার্থনা বল নর ব্রহ্মাণ্ড জীবন
কি ভিক্ষা প্রদানে তোমা, অক্ষম হইল?
অসীম ব্রহ্মাণ্ড পালে যাঁদের শাসন
তুচ্ছ নর বল শুনি কি দান চাহিল
প্রদানে তাঁদের যাহা ক্ষমতা অতীত।
বল নর, শুনি আমি হৈনু চমকিত।
ন। একটী প্রার্থনা, কিন্তু কি কাজ বলিয়া?
আবার কি হবে বৃথা করি উদ্দীপিত
সে বাসনা, যারে হায় অভাগার হিয়া
করিয়াছে গূঢ় দেশে সমাধি নিহিত?

দে। বল, নর, কি প্রার্থনা বল না আমারে।

নর। শুন তবে, শুন দেবি, বলিতে বলিতে
শত নরকের বহ্নি হৃদয়ে আমার
প্রজ্বলিত হবে, তবু কহিব তোমায়,
বর্ণিব তোমার কাছে শোকের কাহিনী।
আযৌবন আত্মা মম মানবের সহ
মিশিতে অনিচ্ছু ছিল; মানবের মনে
যেই উচ্চ আশা আমি দেখিতাম সদা
সে আশা ছিল না মম; মানব নয়ন
যে ভাবে এ ধরণীরে দেখিত সে ভাবে
নারিতাম দেখিবারে; মানব হৃদয়ে
জীবনের লক্ষ্য কোন(ও) থাকিত নিশ্চিত,
সে ভাব ছিল না মম। বিষাদ, যাতনা,
ক্ষমতা বা রিপুচয়, সকলি আমার
অমানুষী ছিল দেবি; মানব আকৃতি
যদিও দেখিছ মম, তথাপি কখন(ও)
নরসনে সহানুভূতি নাহিক আমার।
ধূলি বিনির্ম্মিত-দেহ মানব মাঝারে
মম ভালবাসা যোগ্য দেখিনি কখন(ও)।
কিন্তু দেবি একজন, কি হবে স্মরিয়া
তার কথা? বলিয়াছি মানবের সহ—
মানব মনের সহ মনের মিলন
আছিল সামান্য মম;—বিজন কাননে,
তুষার বেষ্টিত কিম্বা মহীধরচূড়—
সুউচ্চ, বিহঙ্গ যথা সাহসে না কভু
নির্ম্মাইতে নীড়, ঝঞ্ঝা ঝটিকার ভয়ে—
একটী পতঙ্গ যথা না হয় লক্ষিত—
ভ্রমিতে তথায় সদা বাসিতাম ভাল।
পর্ব্বত নিঃসৃত অই তরঙ্গিণী বুকে
খেলিতাম কখন বা লহরীর সনে।
এ মনে ভীতির লেশ নাহি গো কখন(ও)।
সমস্ত রজনী বসি কভু একমনে
দেখিতাম শশধরে, তারকা নিচয়ে,
উদ্ভ্রান্ত তাহাদের; কখন(ও) হৃদয়ে—
ঘোর ঘনাবৃতাকাশে বিজলীর ছটা
তরল উৎসাহ যেন দিত-গো ঢালিয়া।
প্রফুল্ল হতাম কত সে শোভা নিরখি।
বহিত প্রচণ্ডতম পবন যখন,
দেখিতাম অভ্রভেদী মহীধর চূড়,
ব্যোমস্পর্শী তরুবরে ভাঙ্গিয়া পড়িতে।
বিজনে থাকিতে সদা বাসিতাম ভাল।
মানব বলিয়া নিজে ঘৃণিতাম কত
আপনারে; যদি কভু মানবের মুখ
দেখিতাম, তখনই ঘৃণা রোষে যেন
নীচ সহবাসে, নিজে দোষিতাম কত।
বিজন বিপিনে বসি বিজ্ঞানালোচনে
কাটায়েছি কত কাল—সে বিজ্ঞান নর
আমরণ যত্ন করি পারে না শিখিতে;
শিখিয়াছি আমি তাহা, তাহারি প্রভাবে
অসীম ব্রহ্মাণ্ড আত্মা মম আজ্ঞা পালে;—
তারি বলে আজি দেবি আনিয়াছি তোমা
এই স্থানে—কত কালে; কত যত্ন সহ,
কত পরীক্ষায়, অহ, বিজড়িত না হয়ে
এই মন্ত্র লাভ আমি করেছি এখন,
জ্ঞানেই বাড়িল ক্রমে জ্ঞানের লালসা—
কতই হইনু সুখী নিজ শক্তি দেখি,
কার না উপজে সুখ সাধনা সিদ্ধিতে?

দে। বল না সহসা কেন হইল নীরব?

ন। ওঃ
কেন বৃথা গর্ব্ব করি এ কথা বলিয়া?
বিষাদ কাহিনী মম কহি শুন দেবি।
জনক জননী পত্নী কিম্বা অন্য কেহ
চিরবদ্ধ যার সনে প্রণয় শৃঙ্খলে,
বলিনি তোমারে, মম আছে কি না আছে।
থাকে যদি আনি কভু পার্থিব নয়নে
চাহিতে তাদের প্রতি পারিব না এবে।
কিন্তু দেবি, একজন—

দে। বল নর, বল।

ন। আকৃতিতে মম সম—নয়ন তাহার,
ললাট, কপোল, হস্ত, কিম্বা কণ্ঠস্বর,
সকলি আমার মত, কিন্তু সে দেহের
প্রতি অঙ্গে সুষমায় আছিল জড়িত।
বিজনে ভাবিতে আর বিজনে ভ্রমিতে,
গূঢ় জ্ঞান লাভে সদা করিতে যতন
কত যে বাসিত ভাল অন্তর তাহার;
তাহার(ও) হৃদয় সদা ব্রহ্মাণ্ড কৌশল
সাবধানে নিরখিতে ব্যগ্র ছিল অতি।
শুদ্ধ ইহা নহে দেবি, মহত্তর গুণে
ছিল বিভূষিত তার হৃদয় সর্ব্বদা।
করুণা, আহ্লাদ, অশ্রু, যে সব আমার
নাহি কোন কালে,—তার ছিল গো সকলি,
কোমলতা সরলতা নম্রতা আধার
সে স্বর্ণ পুত্তলী মোর; তার দোষ যত
আমার তা;—গুণ তার ছিল গো তাহারি।
কত ভাল বেসেছিনু তাহারে জীবনে
কে বুঝে? অথচ তারে করেছি বিনাশ।
দে। করেছ বিনাশ? সে কি? নিজ হস্তে তব?
নর। না, না, হস্ত নহে দেবি, হৃদয় আমার
ভেঙ্গেছে সে হৃদয়েরে চিরকাল তরে—
কোমল কুসুম সম যেই তার হিয়া
নিদাঘ মধ্যাহ্নরবি সম এ পরাণে
দেখিল, অমনি তাহা গেল গো শুকায়ে।
রক্তপাত ভূমণ্ডলে অনেক করেছি,
কিন্তু তার রক্ত নহে, অথচ তাহার
রক্তপাত হইয়াছে জানি গো নিশ্চিত।
হৃদয় শোণিত তার দেখিনু নয়নে
পড়িতে—অথচ তাহা নারিনু বারিতে।
দে। এইজন্য শুন নর কর বিস্মরণ
লভিয়াছ যেই বিদ্যা এত যত্ন করি;
পার্থিব সামগ্রী সনে মিশহ আবার
ঘৃণিতে যাদের সদা—যাও নর যাও।
নর। শুন বলি, শুন দেবি, আকাশ সম্ভবে
সেই দিন হতে হায় এ দশা আমার।
নিদ্রাঘোরে দেখ মোরে, অথবা যখন
গভীর নিশিতে বসি নিরজন স্থানে
ভাবি কত; সাবধানে, দেখ (৩) নিরখিয়া
একাকী থাকিতে মোরে না হয় এখন।
দারুণ ভাবনা রাশি, উগ্র বৃত্তিচয়ে
সতত পূরিত এবে অন্তর আমার।
উন্মাদ হইতে কত করেছি প্রার্থনা
হবে না তা এজনমে, মরণ (ও) কপালে
নাহি কি এ অভাগার? প্রাণনাশী যাহা
অপরের, নহে তাহা ক্ষতিকর মম।
জগতের যাবতীয় সামগ্রী মাঝারে
খুঁজেছি বিস্মৃতি কোথা—পাইনি দেখিতে।
হতাশ হয়েছি এবে—কি হইবে বৃথা
আশা করি? চিরকাল যাপিব এ ভাবে।
যে অনল বুকে করি বহিতেছি সদা
জ্বলুক তা দিবানিশি—পোড়াক্ হৃদয়।
অনন্তকালের তরে, অভাগার ভালে
অনন্ত যাতনা আছে—হৃদয় বিনাশী।
দে। সাহায্য করিতে তোমা নহিত অক্ষম
মানব, কি কাজে বল তুষিব তোমায়?
নর। তুষিবে আমারে দেবি? পারিবে কি তবে
জাগাইতে তারে চির নিদ্রিত যে জন?
অথবা তাহার সনে আমারে কি তুমি
কৃতান্তের কোলে, দেবি, পারিবে শোয়াতে
পার যদি কর তবে—পার যে প্রকারে,
যবে ইচ্ছা, যত তীব্র যাতনার সহ;
সহিব সে দুঃখ আমি—তা হলেও আর
এ দুঃখের তাপে দগ্ধ হবে না হৃদয়।
দে। অসাধ্য আমার তাহা; তবে যদি তুমি
প্রতিশ্রুত হও মম আদেশ পালিতে
মম আজ্ঞাধীনে যদি থাকহ নিরত
তা হলে বাসনা তব হইবে সফল।
নর। আদেশ পালিব? কার? ইচ্ছামত আমি

স্বকর্ম্ম সাধন তরে পারি নিয়োজিতে
যাহাদের—যারা মম আজ্ঞাধীন দাস,
তাহাদের ইচ্ছামত হইবে চলিতে
আমার? কিসের তরে? নহে এ জনমে।

দে। এই কি উত্তর তব? ভাবি দেখ নর
ভাল করি—

ন। ভাবিব কি?

দে। যাই তবে আমি।

(দেবীর প্রস্থান।)

ন। সময়ের দাস নর সতত জীবনে;
দেখিতেছি নিশিদিনে আসিতে যাইতে,
রয়েছি বাঁচিয়া তবু; জীবনে বিরাগ
অথচ মরণে ভীতি! একি ঘোর দায়!
(কিঞ্চিৎ পরে)
উঃ
হায়রে অভাগা যদি জনম গ্রহণ
না করিত, তা হলে সে এখন(ও) বাঁচিয়া
রহিত; অথবা তারে যদি গো কখন
নাহি বাসিতাম ভাল, তা হলে সে হিয়া
তেমনি মধুর ভাবে—নয়ন রঞ্জন—
থাকিত এ পৃথিবীতে; দেখিয়া দেখিয়া
সে মাধুরী কার(ও) তৃপ্ত হত না নয়ন।
কিন্তু—
কে পারে দেখিতে তারে ভাল না বাসিয়া?
(কিঞ্চিৎ পরে দীর্ঘনিশ্বাস)
আমার পাপের ফল লাগিল তাহারে,
একি অবিচার হায়। সে মূর্ত্তি ভাবিতে
অক্ষম অন্তর মম, হৃদয় মাঝারে
নাহি বল, কাঁপি সদা সে কথা স্মরিতে।
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কিসের কারণে?
ভাল, মন্দ, আত্মা প্রতি চাহিয়া দেখিতে
কখন(ও) ত ভয় নাহি উদিয়াছে মনে,
অপূর্ব্ব দৌর্ব্বল্য আজি কেন এ হৃদিতে?
(কিঞ্চিৎ পরে)
যাই এবে, সন্ধ্যা দেখি হয়েছে আগত।
(প্রস্থান)

—০০—

দ্বিতীয় অঙ্ক,—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমালয় পর্ব্বতের শিখর প্রদেশ।

প্রথম নিয়তির প্রবেশ।

১নি। উদিল রজনীকান্ত বিমল গগনে
গোলমূর্ত্তি আভাময়, কেমন সুন্দর,
মধুর হাসিল কিবা কৌমুদী মিলনে;
অন্যনারী সহবাসে প্রফুল্ল অন্তর
দেখি শশধরে, নিশি মানিনী যেমন,
নীরবে গম্ভীর মূর্ত্তি করিল ধারণ।

পর্ব্বতের এই শৃঙ্গে তুষার উপরে
সামান্য মানব পদ স্পর্শে কলঙ্কিত
নহে যাহা, প্রতিনিশি আনন্দে বিহরে
নিয়তিরা এই স্থানে; অধীর এ চিত
না দেখিয়া তাহাদের; বুঝিতে না পারি
এ বিলম্ব কেন করে গগনবিহারী।

ভাগ্যদেব সন্নিধানে যাইতে হইবে,
আজিরাত্রে মহোৎসব তাঁহার ভবনে,
নিয়তি ভগিনীগণ সকলে যাইবে,
তবে এ বিলম্ব করে কিসের কারণে?
এতক্ষণ রহিলাম তাহাদের আশে,
কি আশ্চর্য্য, এখনও কেন নাহি আসে?

২ নি (নেপথ্যে)।
রাজারে সে দিন অত্যাচারী বলে,
সিংহাসন চ্যুত করিয়া সকলে
হস্ত পদ বাঁধি সুদৃঢ় শৃঙ্খলে
কারাগারে বদ্ধ করি রাখিল।
করিয়া তাহার শৃঙ্খল-মোচন,

দলবল সহ করায়ে মিলন,
সিংহাসনে পুনঃ করিনু স্থাপন,
পুনঃ অত্যাচারী হয়ে উঠিল।
তার তরে এত করিনু যতন,
নিজেও সে দুঃখ ভুগিয়াছে কত!
তার প্রতিশোধ—বৈর নির্যাতন
শত নর রক্তে লউক সতত।

৩ নি (নেপথ্যে)।
জলধি তরঙ্গ বেগে ভিন্ন করি
দেখিনু আসিতে অই জলযানে,
গুণবৃক্ষ সহ দিনু ডুবাইয়া;
কোন হতভাগা বাঁচিলনা প্রাণে।

তাহাদের মাঝে একজন শুধু
জলদস্যু বলি বিখ্যাত আছিল;
পৃথিবীতে আর(ও) নর অপকার
করিবে সদাই—তাই সে বাঁচিল।

১ নি। কত শত গ্রামে বিজনকাননে
পরিণত আমি করেছি।
কতই নগরে করুণ রোদনে
প্লাবিত হইতে দেখেছি।
কোটী কোটী লোকে এরূপে বধিব
দহিব দারিদ্র্য অনলে।
মহামারী আদি ব্যাধি পাঠাইব
ভুগিয়া মরিবে সকলে।
একই নিশিতে অপকার শত
একাকী নরের করেছি।
চিরকাল ধরি দেখ ভাবি কত
দুঃখ মানবেরে দিয়েছি।

২ নিয়তি ও ৩ নিয়তির প্রবেশ।

সকলে।
আমাদের হস্তগত মানব-হৃদয়—
আমাদের ক্রোধে অগ্নি পোড়ায় মানবে—
আমাদের চিরদাস মানব নিচয়—
নরে আজ্ঞা দেই মোরা, লই ইচ্ছা যবে।

১ নি। আইস ভগিনীগণ—প্রতিহিংসা কোথা?
২ নি। আছেন ব্যাপৃত কোন বৃহৎ ব্যাপারে—
জানিনা কি কার্য্য তাহা—
৩ নি। আসিছেন অই।

প্রতিহিংসার প্রবেশ।

১ নি। কোথা ছিলে, প্রতিহিংসে, এতক্ষণ ধরি?
নিয়তি ভগিনীগণ(ও) বিলম্বে আগত—
এ অযথা ব্যাজ বল কিসের কারণে?

প্রতি।
সিংহাসনে বসাইনু কত নরাধিপে—
কত নরে শিখাইনু বৈর নির্যাতন—
অন্যায় হিংসার তরে কতই মানবে
চির অনুতাপানলে করিনু দাহন।

বিজ্ঞানী মানবে কত করিনু পাগল,
কত রাজকার্য্য ধীরে করি নিরীক্ষণ
দূরিনু কারে বা, কারে করিনু অটল,
দিনু প্রজাগণে পুনঃ স্বাধীনতাধন।

কিন্তু কি হইবে আর সে সব কথায়?
আকাশবাহনে চল যাই গো আমরা—
বিরাজেন ভাগ্যদেব সতত যথায়,
চলহ ভগিনীগণ চল যাই ত্বরা।

সকলের প্রস্থান॥

—•:•—

সম্পাদকীয় উক্তি।

বিগত ১৩ই কার্ত্তিক সোমবার পণ্ডিতবর লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। "তিনি যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। তাঁহার নিকট বঙ্গবাসীমাত্রেই অচ্ছেদ্য ঋণজালে বদ্ধ আছে।" অতএব বঙ্গভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্র-কলেবরে এই সংবাদ অঙ্কিত করা বিধেয় বিবেচনায় এই বিষাদ-বার্ত্তা এইস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

অচিন্তিতপূর্ব্ব কারণে সহসা আমার মাতুল পূজ্যপাদ লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় ইহলোক হইতে প্রস্থান করায় বিজাতীয় মনস্তাপ ও সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সাংসারিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তজ্জন্যই বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাহ প্রকাশিত হইতে ছয় দিন বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছে। প্রার্থনা করি সাধারণে এই অপরিজ্ঞাতপূর্ব্ব-কারণ-সংঘটিত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

কৃষ্ণনগরের নূতন বাজারে মহাত্মা লোহারাম শিরোরত্নের নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে এক সভা হয়। ঐ সভায় ধনী ও দরিদ্র, বিদ্বান্ ও মূর্খ সকল শ্রেণীর লোকই উপস্থিত ছিলেন। সভায় নানা প্রকার প্রস্তাব হয়। তন্মধ্যে এক জন প্রস্তাবকারী আমাকে স্বর্গীয় মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করেন। তথায় এবম্বিধ প্রস্তাব হইবার পূর্ব্বেই আমি পরলোকগত মাতুল মহাশয়ের জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে সংকল্প করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদপত্র সম্পাদক আমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন আমি তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রয়াসবান রহিলাম। এক্ষণে আমি জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিতেছি। ঐ জীবনী প্রথমে প্রবাহে পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিব স্থির করিয়াছি।

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

ইউরোপাগত হিন্দু-যুবক।

পণ্ডিতবর লোহারাম শিরোরত্নের শ্রদ্ধসভায় বর্ত্তমান কালের এক মহা কল্যাণকর প্রসঙ্গ সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক সমলোচিত হয়। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

এই সভায় পণ্ডিত চূড়ামণি ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, (নবদ্বীপ) ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, (নবদ্বীপ) প্রসন্ন কুমার ন্যায়রত্ন, (বিল্বপুষ্করিণী) কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন, যদুনাথ সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণনগরের রাজগুরু লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়রত্ন, প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ শাস্ত্রী, সতীশ চন্দ্র চূড়ামণি, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী প্রভৃতি অনেকগুলি মহাসম্ভ্রান্ত হিন্দু শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। যে সকল পণ্ডিত বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় বিচারে আমূল যোগদান করেন নাই, তাঁহাদের নাম এস্থলে লিখিত হইল না। এতদ্ব্যতীত উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর (রাজ কুটুম্ব এবং জমিদার), দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় (নদীয়া রাজার দেওয়ান), ডাক্তার মহানন্দ মুখোপাধ্যায় (পেন্সন প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন) অভয়ানন্দ রায় (রাজকুটুম্ব ও জমিদার); কুমারানন্দ রায় (রাজকুটুম্ব ও জমিদার) কুমার নাথ রায় (রাজ জামাতা ও জমিদার) প্রসন্ন কুমার বসু

(উকিল এবং মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ার ম্যান) মৃত্যুঞ্জয় রায় (উকিল) পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ইন্স্‌পেক্টর অব্ পুলিস্) প্রসন্ন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (গভর্ণমেণ্ট পেন্সনার) হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (গভর্ণমেণ্ট পেন্সনার). দীননাথ সেন (কালেজের শিক্ষক), শশিভূষণ সেন (ওভরসিয়র) গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কালেজের পণ্ডিত) ইত্যাদি বিস্তর ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলের নাম এস্থলে প্রকাশিত করা সম্ভবপর নহে।

এই সভায় আমার পরমাত্মীয় পণ্ডিতপ্রবর ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইউরোপ প্রত্যাগত হিন্দু-যুবকগণকে সমাজে গ্রহণ করার যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া পরে ক্রমশঃ কেন তাঁহাদিগকে গ্রহন করা হয় না, তদ্বিষয়ক বিচার আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় সম্ভবপর প্রায়শ্চিত্তান্তে উক্ত যুবকগণকে সমাজে গ্রহণ করার পক্ষপাতী এবং অন্যান্য পণ্ডিত মহাশয়েরা এককালে তাঁহাদিকে বিধর্ম্মী বলিয়া ত্যাগ করিতে অভিলাষুক। ঘোর বিচার ও বহুতর্ক বহুক্ষণ ব্যাপিয়া চলিল। উভয় পক্ষ হইতে যে যে শাস্ত্রীয় যুক্তি উত্থাপিত হয়, তাহা কোন কারণে এ স্থলে প্রকাশিত হইল না। বহুক্ষণ বাক্‌যুদ্ধের পর পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী জয়লাভ করিলেন। বিপক্ষ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিলেন যে, ইংলণ্ডাগত যুবকগণ যদি শাস্ত্রানুমোদিত প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং উত্তরকালে কোন কার্য্যাদির দ্বারায় হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের ব্যভিচার না করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহন করা যাইতে পারে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে উক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় গোময় ভক্ষণাদি কঠোর প্রায়শ্চিত্তের প্রতিবাদ করেন; সমবেত পণ্ডিতগণও তাহা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করেন।

এই অতি কল্যাণকর বিষয় আরও বিস্তৃত রূপে আলোচনা করিবার নিমিত্ত এবং ইহার কার্য্যক্ষেত্রে সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপিত করিবার নিমিত্ত কলিকাতার টাউনহলে এক মহাসভা করার প্রয়োজন। ঐ সভায় পণ্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন অথবা তাদৃশ উন্নত পদস্থ পণ্ডিতদ্বয়কে মধ্যস্থ রাখিয়া বিচার হওয়া আবশ্যক। তথায় যে বিচার হইবে তাহা রীতিমত কাগজে কলমে লিখিত হওয়া বিধেয়। পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় এরূপ সভা অনুষ্ঠিত হইলে তথায় বিচার করিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছেন। এজন্য বঙ্গদেশস্থ সমস্ত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক।

এরূপ মহদ্ব্যাপার বহুব্যয় সাপেক্ষ। বঙ্গীয় ধনীসন্তানগণ যদি এই নিতান্ত হিতকর বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন তবেই এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। আমরা প্রার্থনা করি তাঁহারা এই কল্যাণকর বিষয়ের সহায়তা করিতে ঔদাসীন্য করিবেন না।

বঙ্গীয় সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা অনেকেই এই হিতকর অনুষ্ঠানের নিতান্ত পক্ষপাতী। সুতরাং তাঁহারা যে এই কার্য্যের সফলতা কল্পে যথাবিহিত সহায়তা করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদের আন্দোলন ও তাঁহাদের প্রদত্ত-উৎসাহ যে এতৎসাধন পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক এ কথা বলাই বাহুল্য।

দেশীয় শিক্ষিত ও উন্নত সম্প্রদায় যত্ন ও চেষ্টা করিলে এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা

করিতে পারেন। তাঁহারা যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এতৎকার্য্যের আনুকূল্য করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডাগত ধন-সম্পন্ন ও পদস্থ দেশীয় ভ্রাতৃগণও অর্থ দ্বারা এ অনুষ্ঠানের আনুকূল্য করিতে পারেন। বোধ হয় এ সময়ে তাঁহারা স্ব স্ব ব্যবহার দ্বারা ও জাতীয় রীতি নীতির প্রতি বিহিত অনুরাগ দেখাইয়া বাসনা সিদ্ধির পথ সহজ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহাদের উপর এ বিষয় অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির চেষ্টায় এ বিষয় সিদ্ধ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। অতএব আমি বিনীত ভাবে সাধারণ সমীপে নিবেদন করিতেছি যে, যে কেহ এতৎসম্বন্ধে আমাকে কোন হিত পরামর্শ প্রদান করিবেন, আমি তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি এবং যদি কেহ এতদ্বিষয়ে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন আমি তাঁহাকে হৃষ্ট চিত্তে তাহা দিতে স্বীকৃত আছি। ভরসা করি সমসাময়িক-সহযোগিগণ স্ব স্ব পত্রে এতদ্বিষয়ের বিহিতরূপ আন্দোলন করিবেন।

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

সমাজ-ব্যাধি।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,—

আজ কাল যেরূপ নানাপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, দেখিতেছি তদুপযোগী ঔষধেরও অপ্রতুল নাই। প্রায় সকল সংবাদ পত্রেরই বিজ্ঞাপনী অংশ নানাবিধ অত্যুৎকৃষ্ট অব্যর্থ ঔষধের তালিকায় পূর্ণ থাকে। এই সকল ঔষধ আবিষ্কারকদিগের যেরূপ দম্ভ আমাদের পৌরাণিক ধন্বন্তরিও এরূপ দম্ভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। প্রশংসাপত্রেরও অভাব নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের যে শোচনীয় অবস্থা তাহাই আছে। আমি দুই এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করাতে শুনিয়াছি, যে এ সকল ঔষধ যাঁহারা একবার ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আর দ্বিতীয়বার লইতে হয় না। যাহা হউক এই সকল দেখিয়া, বহুদিবসাবধি, আমিও নানাবিধ উৎকট রোগের ঔষধ অন্বেষণ করিতেছিলাম, এবং আপনাদের অনুগ্রহে, এখন সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আমার আয়াস সফল হইয়াছে। আমি যে সকল ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি, তাহার মহোপকারিতা বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহার আর এক গুণ এই যে, ইহা একবার ব্যতীত দুইবার ব্যবহার করিতে হয় না। তবে আমার সমপন্থীদিগের ন্যায় আমি এত দিন কোন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে সাহস করি নাই; যে হেতু সকল পত্রেই দেখি, বিজ্ঞাপনের নিয়ম-পঁক্তি ।০ চারি আনা। আমার যেরূপ রোগনির্ঘণ্ট ও চিকিৎসাবিবরণ উক্ত হারে ব্যয় করিতে হইলে আমার যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে সমস্তই বিক্রয় করিতে হয়। যদিও আপনার প্রবাহে বিজ্ঞাপনের দর অনেকাংশে কম, কিন্তু তাহাতেও আমার সাহস হয় না। এই জন্য আমি আপনাকে প্রেরিত পত্রের হিসাবে এই চিকিৎসাবিবরণ পাঠাইতেছি; যে বারে আপনার সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিষয়াভাব বুঝিবেন সেই বার আমার এই জনসাধারণের মহোপকারী ব্যবস্থা-

প্রণালীকে স্থান দিবেন। আর যদি ইহাতে কুণ্ঠিত হন, আমি আপনার নিকট এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারি যে, আমার ঔষধ বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু লাভ হইবে, আপনাকে তাহার সমান অংশ দিব। এরূপ উদার প্রস্তাবেও যদি সম্মত না হন, আমার পাণ্ডু-লিপি ফিরাইয়া দিবেন আমি অন্যত্র চেষ্টা করিব।

রোগ নির্ঘণ্ট।

বাক্‌প্রাবল্য।—মত্তকুকুর-দষ্ট রোগীর পক্ষে জল যেরূপ ভীতিকর, নির্জ্জনতা এই রোগীদের পক্ষে সেইরূপ কষ্টকর; তবে এই রোগের নানাপ্রকার ভেদ আছে। যাহাতে রোগনির্ণয়ে ও যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে কোন ভ্রান্তি না হয় তজ্জন্য রোগের অবস্থা বিবেচনায় দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া দেওয়া গেল।

১ম শ্রেণী। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন ও নানা শাস্ত্রদর্শী কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ততা বশতঃ পরিপাক শক্তি হ্রাস হওয়ার অতিশয় রমণশীল হইয়া উঠেন। নিজের পরিবার প্রতিপালন ব্যতীত ইহাঁদিগের দ্বারা ইহ জগতের কোন উপকার নাই এবং স্থানে স্থানে ইহাঁদের উদ্গীরণে পার্শ্বস্থিত লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। যদিও সময় সময় ইহাঁদের নিকট অনেক সারবান কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাঁদের বন্ধুগণ, যাঁহারা কষ্টলব্ধ অবকাশ কাল কোন নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে অথবা মিষ্টালাপে অতিবাহিত করিতে চাহেন, ইহাঁদিগকে দেখিলে দূরে পলায়ন করেন। ইহাঁদের মধ্যে যিনি উচ্চ পদ প্রাপ্ত, তাঁহার অধীনস্থদিগের ত মৃত্যু; যেহেতু প্রভুর শ্রোতা আবশ্যক, বন্ধুগণ সহজে কেহ সাক্ষাৎ করিতে যান না, সুতরাং অনুপায় অধীনস্থদিগকে, তাঁহার অবকাশ কালে, স্ব স্ব প্রয়োজনীয় কার্য্য ফেলিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হয় এবং কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া প্রভুর অনর্গল বক্তৃতাস্রোতের বেগধারণ করিতে হয়। অনুপস্থিতি ত অমার্জ্জনীয়: যদি কোন দিন কোন বিশেষ কারণে কিছু পূর্ব্বে যাইতে চাহে, অমনি "আ! কোথা যাও হে?" "আজ্ঞে এই—" "বস, বস! সে হবে এখন; এই আমি বলে পাঠাচ্চি!' আর কি করেন, একটু দুঃখ্যহাসি হাসিয়া পুনরায় বসিতে হয়। আমার বিবেচনায় ভদ্রলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা কঠিনদণ্ড ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে আছে কিনা সন্দেহ। এই সকল লোকের সহিত প্রথম আলাপে বড় প্রতারিত হইতে হয়; যেহেতু, তাঁহাদের বাক্‌পটুতা ও পদবিবেচনায় অমায়িকতা দেখিয়া মনে হয়, এমন সরলব্যক্তি আর হইবে না; কিন্তু ক্রমে জানা যায় যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাঁদের মন কুটিলতা ও পরশ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ, কেবল রোগের জ্বালায় লোকের সহবাস ভালবাসেন। কোন প্রতিষ্ঠালব্ধ গ্রন্থকার এ রোগাক্রান্ত হইলে আর নিস্তার নাই; নিজের গ্রন্থের, প্রত্যেক পরিচ্ছেদ, প্রত্যেক পংক্তি, প্রত্যেক বিরাম চিহ্নের ইতিহাস ও গূঢ়তম ভাব ব্যাখ্যা করিতে থাকিবেন। যে কোন স্থানে, যে কোনরূপ সমাজে উপস্থিত থাকুন না, ক্রমে নিজের গ্রন্থের বিষয় উত্থাপন করিতেই হইবে। ইহাতে একটী আনুসঙ্গিক রোগ প্রকাশ পায়, যথা—অযথা প্রতিষ্ঠাপ্রিয়তা। ইহাঁদের সহিত দুইদিবস সহবাস করিলেই ইহাঁদের পুস্তক পাঠে যে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে তাহা উড়িয়া যায়। (ক্রমশঃ)

পণ্ডিতবর লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়ের পরলোকগমনোপলক্ষে।

"——কাল দুরাচার
হরেছে যে রত্ন, হায়! কত দিনে পুনরায়
ফলিবে এমন রত্ন, ফলিবে কি আর?"
নবীনচন্দ্র সেন।

১

অকস্মাৎ কেন বজ্রপাত!
বঙ্গের আকাশ'পরে
সুশীতল, সঞ্জীবনী দীপ্তি বিকাসিয়া,
এই যে হাসিতেছিল সুখের তারকা,
এই মাত্র দেখিছিনু, লুকাইলে কোথা?

২

কালমেঘ হইয়া উদিত,
বুঝি চিরকাল তরে
রাখিল ঢাকিয়া সেই শান্ত ছবি খানি,
আর তা'রে কভু নাহি হেরিব নয়নে,
আর না তুষিবে সেই সুধা বরিষণে।

৩

আঁধার নিশীথে তুমি দেব!
জনমিয়া ভাগ্যবলে,
পতিত বঙ্গে অঙ্ক করিলে শোভিত;
নিজ প্রতিভার বলে জ্ঞান উপার্জ্জিয়া,
গেলে চলি', ধরাধামে যশঃ বিস্তারিয়া।

৪

ধনে, মানে, জ্ঞানের গৌরবে,
ছিল বঙ্গে দেবসম;
অলঙ্ঘ্য নিয়তি কিন্তু অশনি প্রহারি',
জননীর কোল হ'তে লইল কাড়িয়া,—
কান্দিছেন বঙ্গমাতা তোমায় স্মরিয়া।

৫

প্রাচীন পাণিনি আদি যত
ব্যাকরণ শাস্ত্রবিৎ।
তা'সবার সম দেব বঙ্গে তব মান;
তাই আজি শোক-তপ্ত সপ্তকোটি প্রাণ,
তব তরে শোক-অশ্রু করে প্রতিদান।

৬

জ্ঞানহীন বাঙ্গালির তরে,
বহু দুঃখ কষ্ট স'য়ে,
করেছ যে মহামুল্য পুস্তক রচনা,
কৃতজ্ঞতা-পাশে বঙ্গ বদ্ধ তাই এবে
তব কাছে, তাই সবে কান্দিছে নীরবে।

৭

নিজ দেহ তুচ্ছ জ্ঞান করি,
বঙ্গের সুশিক্ষা তরে,
আজীবন পরিশ্রম করেছ অপার,
তাই তব গুণগাথা সপ্ত কোটিনর
গায় আজি, মিলাইয়া সপ্তকোটি স্বর।

৮

নির্ব্বিকার, অহঙ্কারহীন,
নির্ব্বিলাস, পরহিতরত
তোমা সম আর বল আছে কয় জন?
আপনার ধনে মানে গর্ব্বী সবে হয়,
পরদুঃখে দুখী যেই সেই মহাশয়।

৯

নিয়তি অলঙ্ঘ্য সত্য বটে,
কিন্তু তাই বলি' ভবে
আছে বল কয় জন, প্রিয়জন তরে
নাহি করে এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন—
বিশাল ধরণী মাঝে আছে কি এমন?

১০

যদি দেব! থাকিত শকতি'
বিশ্ববিধি উলটিয়া
করিতাম বহু যত্ন রাখিতে তোমায়,
যে পূজার পাত্র তুমি, রাখি সিংহাসনে,
প্রাণ ভরি' ভক্তিপুষ্প দিতাম চরণে।

১১

না হইতে বাসনা পূরণ,
মর্ত্ত্য সিংহাসন ছাড়ি'
অকালে অনন্ত দেহে গেলে মিশাইয়া,
আর সেই শান্তমূর্ত্তি বঙ্গবাসিগণ,
না পা'বে হেরিতে, এই রহিল বেদন!

১২

চিরানন্দ শান্তির ভবনে,
যাও তবে শিরোরত্ন!
বহু ক্লেশে কার্য্যক্ষেত্রে করি' বিচরণ
পরিশ্রান্ত আত্মা তব, লভহ বিরাম,
শোকনীরে ডবাইয়া প্রিয় বঙ্গধাম!

১৩

পাণিনি প্রভৃতি ঋষি যত,
মনীষিপ্রধান দেব!
তা' সবার পার্শ্বদেশে তোমার আসন;
ভুলি ভবশোকজ্বালা, শান্তি-নিকেতনে
বিহার অনন্ত কাল সুধীগণ সনে।

১৪

কালের কুটিল চক্রে পড়ি'
দীন বঙ্গবাসিগণ,
যদিও বঞ্চিত হ'ল তব দরশনে,
রহিল যে চিত্র তব, হৃদয়ে অঙ্কিত
অক্ষয়, ভকতি সনে পূজিবে নিয়ত।

১৫

যত দিন র'বে বঙ্গভাষা,
যাবৎ বাঙ্গালি র'বে,
তব যশোগুণ-গান হইবে ভুবনে।
মুরতির ভাতি তব হ'য়েছে নির্ব্বাণ,
যশোভাতি কিন্তু দেব! রহিবে সমান।

ভারতীয় রাজকুল-দর্পণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

কিষণগড় বিবরণ।

আজমীর ও জয়পুরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম কিষণগড়; উহার পরিমাণ ফল ১৮০ বর্গ ক্রোশ ও লোকসংখ্যা প্রায় ১০৫,০০০ হইবে। রাজস্ব ত্রয়োদশ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ টাকা প্রতিবর্ষে রাজ্যের হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হয়। সৈন্য সংখ্যা—৫৫০ অশ্বারোহী, ৩৫০০ পদাতিক, ৩৬ কামান এবং ১০০ গোলন্দাজ।

মাড়োয়ার-রাজ উদয়সিংহের নবম পুত্র কিষণসিংহ সিংহাসন লাভ লালসায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শূরসিংহের সহিত ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে কৃতার্থতা লাভে অসমর্থ হইলেন; তখন অনন্যোপায় হইয়া কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃরাজ্য হইতে বহির্গত হইলেন। আজমীরের পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিয়া ১৬১৩ খৃঃ অব্দে সেই কিষণসিংহ এই স্বাধীন রাজ্যের সংস্থাপন করেন।

কিষণগড়ের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বিশদ রূপে

অবগত হইবার কোন উপায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন রাজা বাহাদুর সিংহ কিষণগড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার পূর্ব্বে এমন কোন ঘটনাই সংঘটিত হয় নাই যাহা ইতিহাসপটে অঙ্কিত হইবার উপযুক্ত। দুরাচার বাহাদুর সিংহেরই বিশ্বাসঘাতকতা সূত্রে দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা মৈর্ত্তার মারাত্মক সমরে যোধপুর ও জয়পুরের মিলিত সেনার উপরে জয়লাভ করে। এই অবসরে প্রায় সমগ্র রাজস্থান তাহাদিগের কর-কবলিত হয়। বাহাদুরের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র কল্যাণসিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন। এই সন্ধি-সূত্রে তিনি ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এই নিয়মে তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন যে, উক্ত গবর্ণমেণ্টের বিনানুমোদনে কোন কার্য্য করিবেন না। এই সন্ধি সংস্থাপনের কিছু দিন পরেই তিনি আপন অধীনস্থ সামন্তবর্গের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে হৃতসিংহাসন হইয়াছিলেন। সামন্তগণের হস্তে যে যে রাজকার্য্যের ভার সমর্পিত থাকিবার নিয়ম ছিল, কল্যাণসিংহ তাঁহাদিগকে সেই কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কর আদায়ের উপক্রম করেন। তাহাতে সামন্তেরা যার পর নাই বিরক্ত হইয়া অর্থ দানে অস্বীকার করেন; ইত্যবসরে ফতেগড়ের সামন্ত আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। ফতেগড়ের ঠাকুরকে দমন করিবার জন্য রাজা সজ্জিত হইয়া কোন অপরিজ্ঞাত কারণ বশতঃ কিষণগড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লিতে গমন করিয়া সম্রাটের নিকট নানাবিধ রাজপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন। এদিকে কিষণগড়ে নিতান্ত অরাজকতা উপস্থিত হওয়ায় রাজা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সেনা-সমাবেশ পূর্ব্বক বিদ্রোহী সামন্তবর্গের বিপক্ষে যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু সেনাগণ একে একে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে তিনি নিরুপায় হইয়া আজমীরে পলায়ন করত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা বিফল হইল; বিদ্রোহী সামন্তবর্গ নিরুদ্যমে কালক্ষেপ না করিয়া এই অবসরে কল্যাণের শিশু পুত্র পৃথ্বিসিংহকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করত কিষণগড় রাজধানী আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলে রাজা কল্যাণসিংহ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গতপূর্ব্ব ব্যবহারে প্রজালোক অত্যন্ত বিরক্তচিত্ত হইয়াছে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র মোখমসিংহকে সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক যদৃচ্ছা প্রস্থান করিলেন। ১৮৩৯ অব্দে মোখমের মৃত্যু হইলে ১৮৪০ অব্দে তদীয় দত্তক-পুত্র পৃথ্বিসিংহ উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিলেন। একাল পর্য্যন্ত পৃথ্বিসিংহের রাজত্বে শান্তি বিরাজিত রহিয়াছে; বিটীশগবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার সন্ধি অপ্রতিহত রহিয়াছে। অধীনস্থ সামন্তগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ভাব অবিচলিত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। বিদ্যার প্রতি বিশিষ্ট রূপ উৎসাহ থাকায় রাজ্যমধ্যে বিদ্যার আশানুরূপ বিস্তার হইতেছে। রাজধানীতে হিন্দী ও উর্দ্দু স্কুল এবং মফস্বলে দেশপ্রচলিত ভাষার তিনটী স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে; ইংরাজী স্কুল অদ্যাপি সংস্থাপিত হয় নাই। তথায় রীতিমত ঔষধালয় নাই, হাকিম ও বৈদ্যেরা সচরাচর চিকি-

ৎসা করিয়া রাজসরকার হইতে বেতন লাভ করেন। তথাকার শাসনপ্রণালী অতিশয় প্রশংসার উপযোগী; সরওয়ার ও রূপনগর পরগণার প্রত্যেক প্রধান নগরে এক একটী দেওয়ানী আদালত, দুইটী নিম্ন আদালত, রাজধানীতে একটী আপীল আদালত এবং ফৌজদারী মকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য চারিটী ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে।

আগ্রায় ইংলণ্ডীয় রাজকুমার যে দরবার করিয়াছিলেন, মহারাজ ধীরাজ পৃথ্বি সিংহ সাহেব বাহাদুর তথায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ কিছু উপঢৌকন প্রদান করিলে রাজকুমার তদ্বিনিময়ে তাঁহাকে একটী ১৬ চোঙ্গের বন্দুক, এক খানি তরবারী, এক স্বুবর্ণ পদক, এক অঙ্গুরি এবং স্বুবর্ণ চেন সহ একটী ঘড়ি প্রদান করেন। দিল্লির বিক্টোরিয়া রাজসূয় উপলক্ষে মহারাজ উপস্থিত হইয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনরল ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন বাহাদুরের সন্তোষ সাধন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সম্মানসূচক তোপ-সংখ্যা ১৫ হইতে ১৭ হয়। মহারাজার বয়ঃক্রম ৪৮ বৎসর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাবি উত্তরাধিকারী কুমার সাদল সিংহ সাহেব বাহাদুরের বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর মাত্র। প্রজার জীবন মরণে রাজার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা আছে। মহতা শোভাগ সিংহ একণে প্রধান মন্ত্রীত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঢোলপুর বিবরণ।

করৌলীর পূর্ব্বদিকে ঢোলপুর রাজ্য সংস্থাপিত; ইহার পরিমাণ ফল ৪০০ বর্গ ক্রোশ, লোক সংখ্যা ৫ লক্ষ এবং রাজস্ব প্রায় ১১ লক্ষ মুদ্রা। সৈন্যবল—২৭০০ পুলিস, ৬০০ অশ্বসেনা, ৩৬৫০ পদাতিক, ৩২টী কামান এবং ১০০ গোলন্দাজ।

ঢোলপুরের রাজা জাঠ-বংশীয়; ইহার পূর্ব্বপুরুষেরা গোয়ালিয়রের নিকট গোহদ নামক অতি সামান্য গ্রামের ভূস্বামী ছিলেন। প্রায় দ্বাদশ পুরুষে ২৭৮ বৎসর কাল তথায় বাস করেন। শ্রমক্ষমতা ও যুদ্ধপ্রিয়তা এই গুণদ্বয়ের সমাবেশ বশতঃ তাঁহারা পেশোয়া বাজি রাওয়ের অধীনে যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে গোহাদের সামন্ত বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রচার করেন। পাণিপথ সমরে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়েরা হতবল হইলে তাঁহারা গোয়ালিয়র আক্রমণ পূর্ব্বক স্বাধীনতার ধ্বজা তুলিয়া আপনাদিগকে রাণা নামে প্রচার করেন। ১৭৯৯ অব্দে গোহদের রাণা লোকেন্দ্র সিংহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত এক সন্ধি সংস্থাপন করেন; তাহাতে গবর্ণমেণ্ট এই নিয়মে স্বীকৃত হয়েন যে, রাজ্য রক্ষা অথবা তাহার সীমাবৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহারা মহারাণাকে সৈন্যবলের সাহায্য করিবেন, মিলিত সেনা কর্ত্তৃক বিজিত প্রদেশের স্বত্ব ভোগ করিবেন এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মহারাণার যে কোন সন্ধি হইবে তাহার অনুমোদন করিবেন। ১৮৭১ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সিন্ধিয়ার যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহাতে এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, যত দিন মহারাণা ইংরেজদিগের বিশ্বাসভাজন থাকিবেন, তত দিন সিন্ধিয়া তাঁহার রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপণ করিতে পারিবেন না। মহারাণা অতি ত্বরায় বিশ্বাস ভঙ্গ করায় ১৭৯৯ অব্দে ঐ সন্ধি ভাঙ্গিয়া গেল; সুতরাং সিন্ধিয়া উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া গোয়ালিয়র এবং গোহদ

আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া মহারাণাকে বন্দী করিলেন। গোহদ অধিক দিন বিজেতার অধিকারে থাকে নাই। গোহদের শাসন-কর্ত্তৃত্বপদে সিন্ধিয়া অম্বাজি ইংলিয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সেই বিশ্বাসঘাতক দুরাচার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করে। সে সন্ধি করিয়া গোয়ালিয়র, গোহদ ও অন্যান্য কতিপয় স্থানের স্বত্ব পরিত্যাগ করত অবশিষ্ট অংশ নিষ্কর ভাবে অধিকারে রাখিতে প্রার্থনা করে। তদনুসারে ইংরাজেরা গোয়ালিয়র দুর্গ স্বাধিকারে রাখিয়া গোহদ ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য স্থান মহারাণা লোকেন্দ্র সিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী কীরৎ সিংহকে সমর্পণ করেন। পরে সিন্ধিয়ার সহিত স্বতন্ত্র এক সন্ধি করিয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে গোয়ালিয়র ও গোহদ প্রদান করায় কীরৎ সিংহের যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ করিবার জন্য তাঁহাকে ঢোলপুর, বরা ও রাজকীরা পরগণা প্রদত্ত হইল। এই সময় হইতে ইঁহারা ঢোলপুরের মহারাণা হইলেন। ১৮৩৪ অব্দে মহারাণা কীরৎ সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ভগবন্ত সিংহ সিংহাসন লাভ করিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে মহারাণা ভগবন্ত সিংহ গোয়ালিয়রের বিপদ্‌গ্রস্ত ইংরাজদিগের রক্ষা-সাধন করিয়া গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী দেবসিংহ আগ্রা প্রদেশের কতিপয় গ্রাম লুণ্ঠন দ্বারা ইংরাজদের অপ্রীতিভাজন হইলেন। অধিকন্তু তিনি আবার মহারাণাকেও সিংহাসন চ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উভয়বিধ অপরাধে তিনি ধৃত হইয়া বারাণসী ধামে কারারুদ্ধ হয়েন। ১৮৭৩ অব্দে মহারাণা ভগবন্ত সিংহ প্রথম শ্রেণীর 'ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া' উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নেহাল সিংহ মহারাণা-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১৮৭৩ অব্দে আগ্রা নগরে ব্রিটীশ রাজ-কুমারের সম্মান জন্য যে সভা হয়, মহারাজ ধীরাজ শ্রী সওয়াই মহারাণা নেহাল সিংহ লোকেন্দ্র বাহাদুর তথায় উপস্থিত ছিলেন। দিল্লির রাজসূয়-সভাতেও তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসর, দেখিতে সুপুরুষ, ইংরাজী বলিতে ও শীকার করিতে সুপটু। প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা—তোপসংখ্যা পঞ্চদশ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

করৌলী বিবরণ।

উত্তরে ভরতপুর, দক্ষিণে চম্বা নদী, পূর্ব্বদিকে ঢোলপুর এবং পশ্চিমে জয়পুর এই চতুঃসীমার মধ্যে করৌলী প্রদেশ অবস্থিত। পরিমাণ ফল ৪৬৫ ও লোকসংখ্যা ১২৪০০০। রাজস্ব ৫০০০০০, সৈন্যবল ৪০০ অশ্বারোহী, ৩২০০ পদাতিক, ৪০ কামান ও ৪০ জন গোলন্দাজ।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংস্রব ঘটিবার পূর্ব্বে এখানে কোন প্রকার প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। অন্যান্য রাজপুত রাজ্যের ন্যায় ইহাও মোগলদিগের গ্রাসের মধ্যে নিপতিত ছিল, পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাধান্য হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা হরবক্স পাল পেশোয়াকে ২৫,০০০ টাকা বার্ষিক কর দিতেন। পুনার সন্ধিসূত্রে পেশোয়া নর্ম্মদার উত্তর দিকস্থ সমস্ত ভূমি ইংরাজদিগকে দান করায় করৌলী তাহারই মধ্যে পতিত হয়। রাজা হরবক্স পাল এই সন্ধিনিবদ্ধ করিয়া ইংরাজদিগের প্রাধান্য

স্বীকার করেন এবং প্রয়োজন হইলে সাধ্যমত সেনা সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। এই রূপে তিনি স্বাধিকারে দৃঢ়বদ্ধ হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাঁহার যে কর দিতে হইত তাহাও রহিত হইল; কিন্তু রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক যে সকল অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তিনি তাহারই কিয়দংশ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রার্থনা গ্রাহ্য না হওয়ায় তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। ইংরাজ বন্ধু ভরতপুরেশ্বরের বিপক্ষে যে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, হরবক্‌স তাহার সহিত যোগদান করায় ইংরাজদিগের অপ্রীতিভাজন হইলেন। পরিশেষে নম্রতার সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রক্ষা পাইলেন।

১৮৩৮ অব্দে হরবক্‌স অপুত্রকাবস্থায় লীলা সম্বরণ করিলে প্রতাপ পাল নামক জনৈক নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে করৌলী রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সেই বিশৃঙ্খলানিবন্ধন রাজকোষ শূন্য হইলে গুরুভার কর দ্বারা প্রজা পীড়নের উদ্যোগ হইতে লাগিল। ইহাতে প্রজালোকে শত্রু হইয়া তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট চারিবার লোক পাঠাইলেন কিন্তু রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইলেন না। এই সকল গোলযোগের মধ্যেই রাজা প্রতাপ পালের মৃত্যু হইল; তিনি নিঃসন্তান ছিলেন; নরসিংহ পাল নামক জনৈক অপ্রাপ্তব্যবহার নিকটকুটুম্ব তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে ইহার প্রতিবাদ করিলেন; প্রতিবাদ করিবার যথেষ্ট কারণও উপস্থিত হইয়াছিল;—করৌলীরাজ সে সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট ১,৫৪,৩১২ টাকার ঋণী ছিলেন; কোন নিয়মিত সময়ের মধ্যে সেই ঋণ শোধ করিবার কথা ছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন উপায় করা হয় নাই;—এই কারণেই প্রতিবাদ হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেই কারণে উত্তরাধিকারী স্বীকারের পূর্ব্বে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। অনেক কষ্টে অর্থ সংগ্রহ হওয়ায় রাজ্যের প্রজালোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইল দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট দয়া পরবশতা বশতঃ নরসিংহ পালকে উত্তরাধিকারী স্বীকার করিয়া কহিয়া দিলেন, যত শীঘ্র হয় গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। এই সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রাজ্যের তত্ত্বাবধারকের জন্য এক জন এজেণ্ট প্রেরিত হইলেন।

১৮৫২ অব্দে নরসিংহ পাল জীবলীলা সম্বরণ করিলেন। জীবদ্দশায় তিনি ভরতপাল নামক জনৈক দূর কুটুম্বকে দত্তক গ্রহণ করেন; ইংরাজ রাজ তাহাকে নরসিংহের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া জানিতে পারিলেন যে, অপ্রাপ্ত ব্যবহার সময়ে গোপনে দত্তক গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বিশেষ অনুসন্ধানে অবগতি হইল যে, রাজরমণীগণ মদনপাল নামক জনৈক নিকট-কুটুম্বকে দত্তকরূপে স্বীকার করিয়াছেন, ক্ষমতাপন্ন ঠাকুরগণও তাহাতে অনুমোদন করিয়াছেন, সামন্তবর্গ তাহার পক্ষপাতী হইয়াছেন, তখন গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বমত অগ্রাহ্য করিয়া মদনপালকেই প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন (১৮৫৪)। এজেণ্টের আর কোন কার্য্যের প্রয়োজন নাই বলিয়া তিনি প্রত্যাহৃত হইলেন। সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে মদন পাল যার পর নাই যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য হইলে তাঁহার গবর্ণমেণ্টের নিকট যে ঋণ ছিল তাহার ক্ষমা হইল, তিনি সম্মানসূচক

রাজপরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইলেন ও তাঁহার সম্মানের তোপ-সংখ্যা ১৫ হইতে ১৭ হইল। যদিও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধিত হইল, কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ঋণে রাজা জ্বালাতন হইতে লাগিলেন। ১৮৫৯ অব্দে এই সকল ঋণের সুব্যবস্থা করিবার জন্য জনৈক এজেণ্ট প্রেরিত হইলেন,—গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এইরূপ পরামর্শ দিলেন যে, "রাজশক্তি প্রয়োগের পরিবর্ত্তে বন্ধুভাবে সমস্ত কার্য্য করিবেন।" একষট্টি অব্দে তিনি প্রত্যাহূত হইলেন। মহারাজা মদন পাল প্রথম শ্রেণীর 'ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া' হইলেন। ১৮৬৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভাগিনেয় হাদোতীর লছ্মন পাল উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হইয়া সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় জয়সিংহ * সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১৮৭৪ অব্দে ইনি আগ্রার দরবার উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া বর্ষান্তরে দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারলের সহিত সাক্ষাৎ করত বিবিধ মনোহর দৃশ্যে মোহিত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ১৮৭৫ অব্দে জীবলীলা সম্বরণ করিলেন। হাদোতীর অর্জ্জুন পাল তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। বিক্টোরিয়া-রাজসূয়ে ইনি উপস্থিত ছিলেন। প্রজার জীবন মরণে তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভুতা আছে।

* এই বংশের প্রধান পুরুষ মহারাজা ধরম পালের দ্বিতীয় তনয় কয়থ সিংহের বংশ সম্ভূত।

শৈশব-মৃত্যু ও পীড়া।

যে যে অবস্থা বা আচার দ্বারা সন্তানের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে, ও যদ্দ্বারা সেই কারণ সমূহ দূরীকৃত হইতে পারে, সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

সদ্য-প্রসূত শিশুগণ শীত সহ্য করিতে নিতান্ত অক্ষম, এ নিমিত্ত উহাদিগের জন্য উত্তাপ অপরিচালক অর্থাৎ ফ্লানেল কাপড়ের জামা ও চাদর প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত শিশুর শয্যাও প্রস্তুত রাখিতে হয়। ঐ অনুসারে চারিটী পাতলা ও ঘন ফ্লানেলের জামা, ও চারি খানা চাদর এবং চারি যোড়া মোজা ও দুইটা টুপি থাকিলেই সমস্ত শরীর উত্তমরূপে রক্ষিত হইতে পারে। শয্যার নিমিত্ত কতকগুলিন কাঁথা ও দুই বা তিনটী বালিস, দুইখান তেলকাপড় (অইস ক্লথ) বা রবরের চাদর আবশ্যক। নবপ্রসূত সন্তানের উপযুক্ত শয্যা ও বস্ত্রাদি অত্যন্ত আবশ্যক। এমন কি, ইংলণ্ডে ঐ বস্ত্রাদি প্রস্তুত না থাকিলে ও সন্তান মরিয়া গেলে অনেক সময় তাচ্ছল্য হেতু মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মাতাকে বিচারালয়ে দণ্ডিত হইতে হয়। এদেশের শীতের প্রাদুর্ভাব অল্প এ নিমিত্ত শীত-প্রধান দেশের ন্যায় এদেশের শিশুগণকে সেরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া কতকক্ষণ মৃত্তিকায়

উপর শয়ন করিয়া থাকে, পরে উহাকে ক্রোড়ে লওয়া হয়; এইরূপে কোন কোন সন্তান হঠাৎ মরিয়া যায়। ক্ষুদ্র, নিস্তেজ ও নিরুপায় শিশু শরীর কাঁচা মৃত্তিকার উপর পড়িয়া থাকিলে যে অনিষ্ট হইবে তাহার আর কারণ দর্শাইতে হইবে না। নয়মাস কাল জননী জঠরে ৯৮° অংশ উত্তাপে উত্তপ্ত থাকিয়া হঠাৎ তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ৬০°। ৭০°।৮০° অংশ উত্তপ্ত বায়ু সেবন বা আর্দ্র ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিলে মৃত্যু না হইলেও সর্দ্দি, কাশী ইত্যাদি রোগের সূত্রপাত হয়। এই নিমিত্ত যাহাতে শরীর উত্তপ্ত থাকিতে পায় তাহার উপায় করা আবশ্যক। অগ্নির উত্তাপ দিয়া শিশুর দৈহিক উত্তাপ সকল সময় সমান উত্তপ্ত রাখা যায় না; সুতরাং একবার উত্তপ্ত, একবার শীতল হওয়াপেক্ষা সমান উত্তপ্ত থাকা উত্তম। অতএব উত্তাপ রক্ষক কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত রাখাই সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। "এই সময় উত্তাপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ স্বভাবতঃ শরীরের যে উত্তাপ থাকে, বা জীবন ধারণ নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, নবপ্রসূত সন্তানের দৈহিক উত্তাপ তাহাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়া যায়।"

অগ্নির উত্তাপ দ্বারা কোন কোন সন্তানের গাত্র জ্বলিয়া যায়, (ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ধাত্রীশিক্ষা ১০২পৃষ্ঠা)। শিশুর শয্যা রক্ষা করিবার নিমিত্ত একখান ছোট তেলকাপড় (১৲ এক টাকা গজ) বা রবরের চাদর (২।।০ টাকা গজ) কাঁথার উপর পাতিয়া তাহার উপর একখান ছোট পুরাতন কাপড় পাতিয়া দিলে সন্তানের শীত বোধ হইবে না ও তেল কাপড়ের নিম্নস্থ কাঁথা শিশুর মূত্র দ্বারা দূষিত হইতে পারিবে না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ক্রন্দন করিয়া উঠিলে শীঘ্র নাড়ী বন্ধন ও কর্ত্তন করা আবশ্যক, পরে উহার সমস্ত শরীর উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হয়। ইহা দুই প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রথম, দেশীয় প্রথানুসারে শিশুর গাত্রে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শীতল জল সেচন করিয়া সমস্ত শরীর একখান শুষ্কবস্ত্র দ্বারা পরিমার্জ্জিত হয়। দ্বিতীয়, সমস্ত শরীরে কিঞ্চিৎ সাবানের প্রলেপ দিয়া সামান্য উত্তপ্ত জলে ধৌত এবং শীঘ্র শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা সমস্ত চর্ম্ম উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিয়া উত্তাপরক্ষক জামা ইত্যাদি দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত রাখা হয়। এই দুই উপায়ের মধ্যে শেষোক্তটী উত্তম। যদি শিশু অতি ক্ষুদ্র, শীর্ণ বা রুগ্ন হয়, তবে প্রথম উপায় অবলম্বন করা উচিত।

সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইলে শিশুর সমস্ত শরীরে সর্ষপতৈল মর্দ্দন করত অনাবৃত শরীর একখান কাষ্ঠাসনের উপর রৌদ্রের উত্তাপে সংস্থাপন করা হয়। ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? বোধ হয় বস্ত্রাদিদ্বারা শীত নিবারণ করিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক হইয়া সূর্য্যোত্তাপ দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ইচ্ছায় ঐরূপ করা হয়। উহার ফল কি? প্রথমতঃ তৈলমর্দ্দন দ্বারা লোমকূপ সমুদায় বন্ধ হইয়া যায়, উত্তমরূপে স্বেদ নিঃসৃত হইতে পারে না, দেহমধ্যস্থ মলা সমুদায় দেহমধ্যে থাকিয়া যায় এবং শোণিত উত্তমরূপে পরিশোধিত হইতে পারে না। সুতরাং শিশুর ক্ষুদ্র মন প্রফুল্ল না হইয়া উগ্র ও কোপনস্বভাব হয়। দ্বিতীয়তঃ রৌদ্রের উত্তাপ দ্বারা যকৃতে রক্তাধিক্য হয় ও অধিক পিত্ত নিঃসৃত হয় এবং তাহা হইলে সন্তানের উদরাময় রোগ জন্মে। তৃতীয়তঃ শিশুর ত্বক

প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে অভ্যাস করে, কিন্তু শৈত্যের লেশ মাত্র লাগিলে সর্দ্দি, কাশী ইত্যাদি রোগ উপস্থিত হয়।

শৈশবাবস্থায় কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা যাউক যে ঐ সময়ে শিশুগণ কি কি পীড়াগ্রস্ত হয় এবং তদ্দ্বারা কত শিশুর প্রাণ-বিয়োগ হয়। ঐ সমুদয় পীড়া জাতীয় আচার ব্যবহারের দ্বারা কি পরিমাণে পরি-বর্দ্ধিত হয় এবং ঐ সমুদয় পীড়া নিবারণ বা উহাদিগের প্রাবল্য ও যন্ত্রণার হ্রাস করা যাইতে পারে কি না পরে বিচার করিতে হইবে।

শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, প্রতি বৎসর যত বালক বালিকা জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ট হয় তাহার প্রায় ১/৫ অংশ পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হয়। আর ঐ পাঁচ বৎসর মধ্যে মোট যত শিশুর মৃত্যু হয়, প্রথম বৎসরেই তাহার অর্দ্ধেক মরে।

এই ভয়ানক শৈশব-মৃত্যুর সংখ্যা যে সমু-দয় করণ হইতে উৎপন্ন, তন্মধ্যে অধিকাংশই নিবার্য্য। ঐ সমুদয় নিয়ম-ভঙ্গ করিলে শিশুর মৃত্যু না হইলেও উহার শরীর রুগ্ন, দুর্ব্বল, নিরুৎসাহ ও শ্রমকাতর হইয়া যায় এবং সে কিছুকাল জীবিত থাকিয়া পিতা-মাতার ক্ষণিক সুখোৎপাদন করতঃ বাল্যাবস্থায় বা যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই লীলাসম্বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে গভীর শোক সাগরে নিপতিত করে। এই বিষয়ে ডাক্তার ট্যানার এইরূপ বলিয়াছেন,— "শৈশব মৃত্যুর অধিকাংশই যে শ্রমজীবী লোকদিগের বাসভবনের অস্বাস্থ্যকারিতা, মাদক দ্রব্য, ঔষধ ও অহিফেন মিশ্রিত সামগ্রীর অন্যায় ব্যবহার, ধাত্রী ও পিতা-মাতার কুসংস্কার, তাচ্ছিল্য ও মূর্খতা এবং অন্যান্য নিবার্য্য কারণের ফল, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

ডাক্তার বুল বলেন, "যৎকালে সন্তান পিতামাতার যত্ন ও কষ্টের পুরস্কার দিতে আরম্ভ করে, সেই সময় ঐ শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটিলে পিতামাতার যে যন্ত্রণা হয় তাহা অনেক সময় নিবারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সন্তানের অকাল মৃত্যুই পিতামাতার কেবল একমাত্র দণ্ড নহে। কারণ উহা অপেক্ষা আরও অধিক যন্ত্রণা-দায়ক বিষয় এই যে, কতকগুলিন শিশু দুর্ব্বল দেহপ্রকৃতির আনুসঙ্গিক ঘটনা সহিত প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত এবং বন্ধুগণের আশা সফল করিবার সময় অকালে প্রাণ-ত্যাগ করিবার নিমিত্তই বাঁচিয়া থাকে। কিম্বা যদি এইরূপও না ঘটে, তবে তাহারা যাব-জ্জীবন এত অসুস্থ থাকে যে, তাহাদিগের মনের স্থিতিস্থাপকতা, প্রকৃতির ধৈর্য্য এবং কর্ত্তব্যপালনজনিত আনন্দ এককালে তিরো-হিত হয়।"

শৈশব ও বাল্যমৃত্যুর সময়, সংখ্যা ও কারণ ইত্যাদির বিষয়ে ডাক্তার ইঃ এঃ বার্চ সাহেবের ফাইবারের অনুবাদ হইতে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলিন সংগৃহীত হইল।

"ইহা বিদিত আছে যে, ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই শিশুর মৃত্যু-সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যৌবনাবস্থার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ঐ সম্ভাবনা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে, এবং যৌবনের আগমনে পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই নিয়ম সকল জাতীয় লোকের মধ্যে ও সর্ব্বপ্রকার জলবায়ুতে সমভাবে চলে।"

এষ্টারলেনের মতে সমস্ত ইউরোপে

প্রত্যেক সহস্র নিবাসীর মধ্যে প্রতিবৎসর গড়ে ২৫.৩ জন মরে। এবং ওয়াপাঁয়ুসের মতে গড়ে প্রত্যক ৩৪.৫ ব্যক্তির মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইয়া থাকে।

বেল্‌জিয়ম দেশে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যত জীবিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তন্মধ্যে প্রত্যেক ১০০০ মধ্যে ১৪৯টী; প্রথম দ্বাদশমাস-মধ্যে ১৩টী, একাদশ মাস হইতে চতুর্বিংশ মাস অবধি ৫৬টী, এবং প্রথম পাঁচ বৎসর মধ্যে মোট ২৮০টী শিশুর প্রাণবিয়োগ হয়। অর্থাৎ ঐ বৎসর বেল্‌জিয়মে যত জীবিত শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তাহার প্রায় ⅙ অংশ এক-বৎসর বয়ঃক্রম না হইতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং প্রায় ২⁄৭ অংশের পাঁচ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম হয় নাই। পাঁচ বৎসর বয়ঃ-ক্রমের পূর্ব্বে মোট যত শিশুর মৃত্যু হয় তাহার অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক সংখ্যক শিশু কেবল প্রথম বৎসরেই প্রাণত্যাগ করে। আরও হেলফট সাহেবের মতে প্রত্যেক ১৮০ শৈশব-মৃত্যুর মধ্যে ২৫টী প্রথম মাসে, ১০টী দ্বিতীয় মাসে, ৯.৫টী তৃতীয় মাসে, ৯.৮টী চতুর্থ মাসে, ৭.৭টী পঞ্চম মাসে; এইরূপ ক্রমশঃ বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সহিত মৃত্যু-সংখ্যার হ্রাস হইয়া দ্বাদশ মাসে ৪.৪টীর মৃত্যু হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যাইবে, ইউরোপের নানাদেশে প্রত্যেক ১০০ শত জীবিত ভূমিষ্ঠ সন্তানের মধ্যে গড়ে কতগুলি একবৎসর মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

দেশ।	কাল।	প্রত্যেক ১০০ জীবিত ভূমিষ্ঠ শিশুর মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা।
নরওয়ে	১৮৫৬—৬৫	১০.৪
স্কটল্যাণ্ড	১৮৫৫—৬৪	১১.৯
সুইডেন্	১৮৬১—৬৭	১৩.৫
ডেন্‌মার্ক	১৮৫০—৬০	১৪.০
ইংল্যাণ্ড	১৮৫১—৬০	১৫.৪
ফ্রান্স	১৮৪০—৫৯	১৬.৬
প্রসিয়া	১৮৫৯—৬৪	২০.৪
ইটালী	১৮৬৩—৬৮	২২.৮
অষ্ট্রিয়া	১৮৫৬—৬৫	২৫.১
হঙ্গেরী	১৮৬৪—৬৫	২৪.৭

শৈশবমৃত্যু পিতামাতার সামাজিক অবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ফ্রয়ফুট নগরে খৃঃ ১৮৪৮ অব্দ হইতে ১৮৬১ সালের মধ্যে যত জীবিত শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তন্মধ্যে শতকরা ৩০.৫টী শ্রমজীবীর, ১৭.৩টী মধ্যমাবস্থার, এবং ৮.৯টী ধনীর সন্তান এক বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যে ১১.৫টী শ্রমজীবীর সন্তান, ৫.৫টী মধ্যমাবস্থার সন্তান, এবং ১.৯টী ধনীর সন্তান প্রাণত্যাগ করে।

জারজ সন্তান গণের মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত আরও অধিক।

জন্মের হার ও মৃত্যুর হার এতদুভয় মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ফ্রয়ফুট নগরের ডাক্তার উল্‌ফের (Woolfe) মতে যে যে অবস্থা বা ঘটনা দ্বারা শৈশব-মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহা ১৮৮১ সালের ইংলিসম্যান্ নামক গেজেটের ২৪৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল।

"যৎকালে খাদ্যদ্রব্য সুলভ থাকে, তৎকালে যে সমুদায় শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তাহাদিগের মৃত্যুর হার মাহার্ঘের সময় যাহারা জন্মগ্রহণ করে তাহাদিগের মৃত্যুর হার অপেক্ষা অল্প। অতএব দেশের সাধারণ শ্রীবৃদ্ধি কেবল সংখ্যার উপর উহার শক্তির বিস্তার করে, এমত নহে, শিশুগণের জীবনী শক্তির উপরও প্রভুত্ব করে। পিতার মদ্যপান, ব্যভিচার, উপদংশ, ক্লোরসিস (Chlorosis) স্ক্রফুলা

(Scrofula) টিউবার কিউলোসিস ও দুর্ব্বলতা, মাতার বসন্ত, ওলাউঠা, নিউমোনিয়া, আক্ষেপ ইত্যাদি পীড়া সন্তানের জীবনী-শক্তির উপর ক্ষমতা প্রকাশ করে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

"বালিকা অপেক্ষা বালকের মৃত্যু-সংখ্যা অধিক।

"দরিদ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহাদিগকে ভূমির অধিক কর দিতে হয় তাহাদিগের শিশুসন্তানের মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। যে বৎসর কোন কারণ বশতঃ কর-প্রদ ভূমির কর বৃদ্ধি করা হয় সে বৎসর তৎপ্রদেশে অধিক সংখ্যক শিশুর মৃত্যু হয়। তাহার কারণ এই যে, পিতামাতারা জীবনের আবশ্যক পদার্থ অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাটী, শিক্ষা ও আমোদের নিমিত্ত যথোচিত অর্থ রাখিতে পারে না।

"শিশুগণের খাদ্য ও পোষণের উপর উহাদিগের মৃত্যু-সংখ্যা নির্ভর করে। মাতার ও বেতনভোগী ধাত্রীর স্তন্যপায়ী শিশুগণের মৃত্যুর সংখ্যা তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ৫টী বেতনভোগী ধাত্রীর স্তন্যপায়ী শিশুর মৃত্যু হইলে ৩টী মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুর মৃত্যু হয়। ডাক্তার রাউথ, ব্রাইটন নগরে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছিলেন যে, নয় মাস বয়ঃক্রমের শিশুগণের মধ্যে শতকরা ৯২.৬ টী মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুর স্বাস্থ্য উত্তম ছিল; ২৩.৩ মধ্যবিধ, ১০৫ টী মন্দ। যাহারা মাতার স্তন্য ও অন্যান্য খাদ্য ভক্ষণ করিত, তন্মধ্যে শতকরা ২৬.৮ টীর স্বাস্থ্য উত্তম, ২৬.৩ টীর মধ্যবিধ, ও ৪৫.৯ টীর মন্দ। যাহারা মাতার স্তন্যপান করিত না ও অন্য প্রকার খাদ্য দ্বারা পুষ্ট হইত, তন্মধ্যে ১০ টীর স্বাস্থ্য উত্তম, ২৬ টীর মধ্যবিধ ও ৬৪ টীর মন্দ ছিল।"

এই সমুদয় সাধারণ কারণ ব্যতীত স্থানিক সাময়িক ও জাতীয় কারণে শৈশব-মৃত্যুর হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে ক্রমে লিখিত হইবে।

সামান্য যত্নে ও চেষ্টায় যে শৈশব-মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করিতে পারা যায়, ডবলিনের সূতি-চিকিৎসালয় তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। ১৭৫৭ হইতে ১৭৮৩ সাল মধ্যে ঐ চিকিৎসালয়ে ১৭৬৫০ টী জীবিত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৯৪৪ টী শিশু দড়কা বা আক্ষেপের পীড়ায় অল্পদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। প্রায় ২৫ বৎসর পরে ডাক্তার ক্লার্ক ঐস্থানের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়া ঐ ভয়ানক শৈশব-মৃত্যুর কারণ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করেন; পরে অনুমান করেন যে বাটীর গঠনই ঐ ভয়ানক শৈশব-মৃত্যুর কারণ। ঐ মতের যাথার্থ্য শীঘ্র প্রমাণিত হইয়াছিল। চিকিৎসালয়ের গৃহগুলির বায়ু সঞ্চালন ও পরিষ্কার করিবার উপায় অবলম্বিত হইলে, ৮০৩৩টী শিশুর মধ্যে ৪১৯টীর মাত্র ঐ সময়ের মধ্যে মৃত্যু হয়।

ইহা হইতে আমরা কেবল মাত্র এই শিক্ষা প্রাপ্ত হই, যে, অবশ্যম্ভাবী দৈব কিম্বা আকস্মিক ঘটনা হইতে পীড়া ও অকাল মৃত্যু হয় এমত নহে; বরঞ্চ যে সমুদয় নিয়ম ও আদেশ প্রতিপালন করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার আজ্ঞানুসারে আমাদিগের দৈহিক যন্ত্র সকলের স্বাস্থ্য ও উন্নতিলাভ হইবে, সেই সমুদয় নিয়ম ও আদেশের অবহেলা করাই পীড়া ও অকালমৃত্যুর বাস্তবিক কারণ।

শৈশবাবস্থায় ও বাল্যকালে ত্বক, শ্লৈষ্মিক, অন্তস্ত্বকের ফুসফুস এবং মস্তিষ্ক এই চারি স্থানের পীড়া ও জ্বরের সংখ্যাই অধিক।

ইংলণ্ডের মৃত্যুর প্রধান প্রধান কারণ নিম্নের তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

মোট ১৫৪৬৩৯ টী মৃত্যুর মধ্যে —

মৃত্যুর কারণ	দ্বাদশ মাস মধ্যে	দ্বিতীয় বৎসর	তৃতীয় বৎসর	চতুর্থ বৎসর	পঞ্চম বৎসর	মোট।
জাইমটিক	২৬৩৩৫	১৭৩৮৫	১০৫৬৭	৭১০৩	৫৯৩৭	৬৬৩২৭
দেহপ্রাকৃতিক	৭৭৭৭	৪৮১৯	২১৯৮	১১৮৮	৮২৮	১৬৮১০
স্নায়ুসম্বন্ধীয়	২৩২৪২	৪১০৭	১৬০৭	৯৪৮	৫৯৯	৩০৫৩৩
শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয়	২০৭২৮	৯৬১৪	৩৬৯৯	১৫৮৯	৯২২	৩৬৫৫২
পাক যন্ত্র সম্বন্ধীয়	২৩৩৯	৪১৪	২১৭	১৩২	১২০	৩২২২

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, বসন্ত, হাম, স্কার্লেট-ফিবার, ডিপ্থেরিয়া ইন্‌ফ্লুয়েনজা, টাইফস, টাইফায়া ইত্যাদি পীড়াই অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক শিশুর মৃত্যুর কারণ। তন্নিম্নে শ্বাসপ্রশ্বাস-যন্ত্রের পীড়া, যথা—সর্দ্দি, কাশী, গলবেদনা, শ্বাসনালীর প্রদাহ ফুসফুসের প্রদাহ, ব্রঙ্কাইয়ের প্রদাহ ইত্যাদি। মস্তিষ্কের ও স্নায়ুর পীড়া, যথা—কন্‌ভলশন্ (আক্ষেপ), মস্তিষ্কাবরণের প্রদাহ, ধনুষ্টংকার, মৃগী ইত্যাদি রোগই মৃত্যুর তৃতীয় শ্রেণীস্থ কারণ। তন্নিম্নে উদরাময়, আমাশয়, কৃমি ইত্যাদি শৈশব ও বাল্যমৃত্যুর প্রধান কারণ।

(ক্রমশঃ)

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

এলাহাবাদ।

আমরা যাঁহার বাটীতে উপনীত হইলাম, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকিল। আমি তাঁহার ন্যায় অমায়িক লোক অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমরা তাঁহারই কন্যার বিবাহ উপলক্ষে এলাহাবাদে আসিয়াছি। সুতরাং বিবাহের গোলমালে দুই তিন দিন গত হইল। বাঙ্গালীর বিবাহের বিষয়, বাঙ্গালীর অবিদিত নাই। অতএব বিবাহের বিষয় লিখিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না। তবে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালীর বিবাহ বলিয়া ইহাতে কিছু নূতনত্ব ছিল। কেবল তাহাই লিখিলাম। হিন্দুস্থানী যে সকল লোক এই বিবাহের 'আইবুড়ভাতের' লোকতাদি পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রেরিত কয়েকজন করিয়া স্ত্রীলোক বাদ্যের সহিত গীত গাহিতে গাহিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। দিনের

মধ্যে অনেকবার এইরূপ গীতবাদ্য শুনিতে লাগিলাম। এই প্রকারে বিবাহের কয়দিন কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে কেবল এক দিন সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছিলাম।

এলাহাবাদ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী। এখানে উক্ত প্রদেশের লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বাস করিয়া থাকেন। এখানে একটী হাইকোর্ট আছে। অন্যান্য বিচারালয় এবং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত আপিসাদি অনেক আছে। এখানকার রেলওয়ে-ষ্টেশন অতি সুবিস্তৃত। বোধ হয় ইহার কার্য্যাদি প্রায় হাবড়া-ষ্টেশনের ন্যায় বহুব্যাপী। কেবল রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণের অবস্থানের নিমিত্ত বড় বড় ১১০টী বারিক আছে। ট্রেণের গতিবিধিও অত্যন্ত অধিক। ফলতঃ অন্য কিছুই না থাকিলেও এক রেলওয়ে-কারখানার জন্য ইহা বিখ্যাত হইত। এখানে একটী কলেজ আছে। শুনিলাম ১২। ১৩ বৎসর ধরিয়া কলেজগৃহ প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। এই কলেজগৃহ পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইলে ভারতবর্ষের মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট গৃহ বলিয়া পরিগণিত হইবে। স্কুল এবং ডিস্‌পেন্সারিরও অভাব নাই।

সমস্ত এলাহাবাদসহর অনেক পল্লীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে কতকগুলির নাম এই;—কীটগঞ্জ, কর্ণেলগঞ্জ, জনষ্টনগঞ্জ, দারাগঞ্জ, ও বাদসাহী মণ্ডী প্রভৃতি। সংস্থাপকের নামানুসারে এই পল্লীগুলির নামকরন হইয়াছে। এক পল্লী হইতে অপর কোন কোন পল্লী ২ বা ৩ ক্রোশ অন্তর হইবে। অতএব সমুদায় সহর পূর্ণ হইলে, ইহা এক অতি বিস্তৃত সহর হইয়া উঠিবে।

এলাহাবাদ সহরের রাস্তা অতি বিখ্যাত। দুই ধারে ঘন বৃক্ষশ্রেণী-শোভিত এত অধিক সংখ্যক সুপ্রশস্ত রাস্তা আর কুত্রাপি নাই বলিয়া বোধ হয়*। কলিকাতার ইডেন-গার্ডেন বা আনন্দ-উদ্যানের ন্যায় এখানেও গবর্ণমেণ্টের একটী উদ্যান আছে। লোকে তাহাকে কোম্পানীর বাগান বলিয়া থাকে। ইহার সৌন্দর্য্য ইডেন গার্ডেনের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ন্যূন নহে। বিশেষতঃ যেখানে ইংরাজগণ আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন, সে স্থানের সৌন্দর্য্য কলিকাতার বাগানের সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

এখানে অনেক ইউরোপীয় লোক বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বাস বাটীর নাম 'বাঙ্গালো',। অনেক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানীও বাঙ্গালোতে বাস করিয়া থাকেন। বাঙ্গালোগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। সমুদায় বাঙ্গালোই প্রসুশস্ত এবং সুসজ্জীভূত উদ্যানে পরিবৃত। প্রায় অধিকাংশ বাঙ্গালোই একতল। কোন কোনটী দ্বিতলও দৃষ্ট হয়। যেখানে ইংরাজগণ বাস করেন সেইখানেই তাঁহাদের মহাসমৃদ্ধিশালী উপাসনা মন্দির থাকে। এলাহাবাদেও অনেক গির্জা আছে। তন্মধ্যে একটী গির্জার নির্ম্মাণ-কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। এই গির্জাটীও কলেজের ন্যায় ১২। ১৩ বৎসর ধরিয়া নির্ম্মিত হইতেছে। ইংরাজদিগের সুবিধার্থ এখানে একটী গ্রেট্‌ ইষ্টারণ হোটেলের ব্রাঞ্চ্‌ আছে। সুতরাং যে সকল বাঙ্গালী বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে বাস করিতেছেন তাঁহাদিগকে কলিকাতাত্যাগজনিত অসুবিধা অনুভব করিতে হয় না।

সহরের নানাভাগে 'নেটিভ্‌' দিগের

* কিন্তু অল্প বৃষ্টি হইলে রাস্তায় কাদা হয়।

বসতি। সচরাচর দেশীয়দিগের বাসস্থান যেরূপ হইয়া থাকে, এখানেও তদ্রূপ। কাজেই দেশীয়দিগের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট।

সহরের দক্ষিণ ভাগে 'চক'। এখানে নানাবিধ জিনিষ পত্রের ক্রয় বিক্রয় কার্য্য সমাহিত হয়। ইংরাজ সওদাগরগণ তাঁহাদের বাসস্থানের সঙ্গেই দোকানাদি খুলিয়া থাকেন। চকের সহিত তাহাদিগের প্রায় কোন সম্বন্ধ নাই। এলাহাবাদে ইংরাজের কয়েকটী বড় বড় দোকান আছে। কলের কাও কারখানাও অনেক দৃষ্ট হয়। এলাহাবাদ সহরে যে সকল পল্লী আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই ভাল ভাল বাজার আছে। এখানে বাণিজ্যকার্য্য রীতিমতই সম্পন্ন হয়। তবে দ্রব্যাদি কানপুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। এ প্রদেশে কানপুরই উন্নতিশীল বাণিজ্য স্থান।

এলাহাবাদ সহরে প্রায় ৫।৬ হাজার বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন। এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীগণ বাঙ্গালার অনেক ভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। সকলেই পরস্পরের সাহায্য করিবার নিমিত্ত একতা-সূত্রে বদ্ধ। কাহারও কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সকলে প্রাণপণে তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক বাঙ্গালীর এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিলে, বাঙ্গালীর মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। এখানকার বাঙ্গালীসমাজে প্রায় কুসংস্কার স্থান পায় না। তবে দুই এক জন অকালকুষ্মাণ্ডের দোষে দলাদলির ব্যাপার সামান্যরূপ দৃষ্ট হয়। এ দোষ এখনও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই।

এস্থানের বাঙ্গালী অধিবাসিগণের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, তাঁহারা চিরাভ্যস্ত অলসভাব পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহ সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সকলেই স্ব স্ব স্বাস্থ্যরক্ষণে যত্নবান্। উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দলে দলে বৃদ্ধ, যুবক ও বালক সকল প্রাতঃকালে পরিভ্রমণে নিযুক্ত। সকলেরই মুখে হর্ষচিহ্ন ও সজীবভাব অভিব্যক্ত। এই দৃশ্য অতীব আশাজনক তাহার সন্দেহ নাই। এখানকার বাঙ্গালী বালকদিগের মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য একটী বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয়ও আছে। এই বিদ্যালয়গুলি কতিপয় মহাত্মার আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমের ফল। কিন্তু সকলেই যে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন এরূপ নহে। একটী উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। কতিপয় বন্ধুকে উপহার দিবার জন্য মৎপ্রণীত কয়েকখণ্ড বাঙ্গালা পুস্তক লইয়া গিয়াছিলাম। পুস্তক কয়েক খণ্ড উপযুক্ত মাহাত্মাদিগের হস্তেই পতিত হইয়াছিল। কেবল এক খণ্ড, একজন বন্ধুর অনুরোধে একটী অপরিচিত লোককে দেওয়া হইয়াছিল, আমার তাঁহাকে দিবার ইচ্ছা ছিল না। দুই তিন দিন পরে তিনি আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, "আপনার পুস্তক উত্তম হইয়াছে। আমি স্বয়ং পড়ি নাই। আমার একজন বন্ধু পড়িয়া সন্তোষজনক মত প্রকাশ করিয়াছেন।" মাতৃভাষার পক্ষে কেমন অনুরাগ! আমার পুস্তক বলিয়া একথা বলিতেছি না। অনেকেই এইরূপে বাঙ্গালা পুস্তক না দেখিয়া তাহার দোষ গুণ নির্ণয়ে সমর্থ হন! মাতৃভাষার প্রতি

আন্তরিক অনুরাগ কেবল যে তাঁহারই নাই, আমি এমন কথা বলি না। এতদ্দেশে তাঁহার ন্যায় অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। হায়! কবে আমরা মাতৃভাষার আদর করিতে শিখিব। "যদি জাতীয় উন্নতি দেখিতে চাও তবে অগ্রে মাতৃভাষার উন্নতি সাধন কর" এ কথার অর্থ আর কত দিনে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

এলাহাবাদের কয়েক জন কৃতবিদ্য লোকের যত্নে ও উদ্যোগে এখানে 'সাহস' নামে এক-খণ্ড বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র (অধুনা ইংরাজী) প্রকাশিত হয়। 'সাহস' সাহসের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ইহা এখানকার বাঙ্গালীদিগের অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

চাকরী উপলক্ষেই অধিকাংশ বাঙ্গালী এখানে বাস করিয়া থাকেন। অনেকে নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও বাস করি-তেছেন। গুডম্যান কোম্পানী দ্বারা একটী দাওয়াই-খানা চলিতেছে। কলিকাতার স্মিথের বাড়ীর ন্যায় এই ডাক্তারখানায় ঔষধাদি পাওয়া যায়। ইহাঁদের কারখানা অত্যন্ত বিস্তৃত। বিলাত হইতে সমুদায় ঔষধাদি ইহাঁরা আনাইয়া থাকেন। গুড্ম্যান কোম্পা-নির ম্যানেজার বাবু নিতাইচরণ মিত্র অতি সদাশয় লোক।

এলাহাবাদে এক দিন মিসরদেশ-প্রত্যা-গত একটী বাঙ্গালী যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি মিসরযুদ্ধ উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টর অফিসার নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার নিকট মিসর দেশের ও যুদ্ধের বিবরণ অনেক অবগত হইলাম। তিনি ব্যতীত আরও সাতজন বাঙ্গালী মিসর-যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। বিখ্যাত তেলেল কবিরের যুদ্ধে আরাবি পাশা যেরূপে বন্দীভূত হন, তাহাও তাঁহার নিকট অবগত হইলাম। ইহাও বাঙ্গালীর একটী উন্নতির চিহ্ন। এখানে পঞ্জাব হইতে প্রত্যাগত দুইজন লোকের সহিতও মিলন হইল। তাঁহাদিগের প্রমু খাৎ পঞ্জাবের অনেক বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি। কিন্তু স্বচক্ষে না দেখিয়া কোন বিষয় বলিতে ইচ্ছুক নহি।

এলাহাবাদের অধিবাসী হিন্দুস্থানীগণ অপেক্ষাকৃত উগ্র প্রকৃতির লোক। ইহাঁ-দিগের মধ্যে অবশ্য শান্ত ও সুবুদ্ধি-সম্পন্ন ভদ্রলোক অনেক আছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই প্রকৃতি কিছু উগ্র। এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়জাতীয় লোকই বাস করে। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে সম্প্রীতি ভাব অতি বিরল। প্রায়ই উভয় জাতির মধ্যে দাঙ্গা হইয়া থাকে ও দুই চারিটী খুনের কথাও শুনা যায়। এই সকল কারণে এখানে ফাঁসির সংখ্যা অধিক। গত জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানে একটী ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

এলাহাবাদের সকল রাস্তা অপেক্ষা সিটী-রোড অধিক জনাকীর্ণ। এই রাস্তায় প্রাতঃ-কাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সমান পরিমাণে গাড়ী, ঘোড়া, এক্কা ও মনুষ্যাদি চলিয়া থাকে এলাহাবাদ হইতে অনেক সংবাদপত্র প্রকা-শিত হয়। তন্মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজী; দেশীয় ভাষায়ও অনেক আছে। দৈনিক বিজ্ঞাপনীও যথেষ্ট প্রচারিত হয়। প্রসিদ্ধ 'পাইওনিয়ার' এখান হইতে প্রকাশিত। এলা-হাবদে সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যই পাওয়া যায়।

এলাহাবাদের প্রধান দৃশ্য—এলাহাবাদ-

দুর্গ, খসরুবাগ ও যমুনাব্রীজ। ক্রমে এই তিনটীর বিবরণ লিখিতেছি।

দুর্গ—যিনি কলিকাতার দুর্গ দেখিয়াছেন, এলাহাবাদ দুর্গ তাঁহার নিকট নূতন বোধ হইবে না। কারণ অনেকে বলেন, কলিকাতার দুর্গ, এলাহাবাদ দুর্গের অনুকরণে ক্লাইব-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। বাস্তবিক দুইটী দুর্গই একপ্রকার। প্রভেদ এই যে এলাহাবাদ দুর্গ কিঞ্চিৎ ছোট। কাহার সময়ে হয়, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না। অনেকে বলেন আকবরসাহ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এবং তাহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কারণ এই দুর্গের মধ্যে হিন্দুদিগের মহাতীর্থ অক্ষয়বট পাতালপুরীতে অবস্থিত। আকবরসাহ যেরূপ অপক্ষপাতী সম্রাট ছিলেন, তাহাতে তিনি দুর্গেরমধ্যে হিন্দুতীর্থ থাকিবার কোন আপত্তি করেন নাই। অন্য সম্রাটের সময় এই দুর্গের পত্তন হইলে, তিনি অগ্রে হিন্দুতীর্থের মস্তকে পদাঘাত করিতেন ও তাহার চিহ্নিও রাখিতে দিতেন না। যাহা হউক যদি আকবরসাহের সময়ে এই দুর্গের পত্তন হইয়া থাকে তবে এক্ষণে ইহার বয়ঃক্রম ৩০০ বৎসর অতীত হইল। দুর্গের নির্ম্মাণ-কৌশল অতি চমৎকার। অদ্য পর্য্যন্ত ইহার একখণ্ড প্রস্তরও স্থানচ্যুত হয় নাই। সমুদায় দুর্গটী প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। দুর্গ-প্রবেশের তিনটী দ্বার আছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই দুর্গের সমধিক সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছেন। এখানে অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি কলিকাতার অপেক্ষা অনেক অধিক। শুনিয়াছি দুর্গের মধ্যে যে পাতালপুরী আছে, তাহার ভিতর দিয়া আগ্রা ও দিল্লী যাইবার দুইটী রাস্তা আছে। একবার দুইজন সৈনিক সেই রাস্তার ভিতর গমন করিয়া কোন দিক্ দিয়াই উত্থিত হয় নাই। এই ঘটনা সত্য কি মিথ্যা তাহা বলিতে পারিনা। বেণীতীর্থে মস্তক মুণ্ডন করিয়া হিন্দুমাত্রেরই এই পাতালপুরীতে অবস্থিত অক্ষয় বটের পূজা করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। আমরা পাতালপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম এবং একজন পাণ্ডা আলো লইয়া সমুদায় দেখাইয়াছিলেন। পাতালপুরীতে অনেক বিগ্রহ-মূর্ত্তি স্থাপিত। আমরা প্রায় প্রত্যেকেরই পূজা করিয়াছিলাম। কিন্তু পাণ্ডাদিগের বড় অত্যাচার।

খসরুবাগ—ইহার নাম করিতে মনে বড় দুঃখ হয়। জাহাঙ্গীরের পুত্র ও রাজা মানসিংহের ভাগিনেয় খসরু এই বাগান প্রস্তুত করেন বলিয়া ইহার নাম খসরুবাগ। পিতার কোপে পড়িয়া খসরুর কি দশা ঘটে, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রের তাহা অবিদিত নাই। কারাগারের ভীষণ যন্ত্রণায় এই হতভাগ্যের জীবলীলার পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। খসরুবাগ অত্যন্ত বিস্তৃত ও অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের গাঁথনী দুর্গের দুর্গের গাঁথনীর ন্যায়। বাগানে প্রবেশের দুইটী দ্বার আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ দিকের দ্বার সদর। এই দরজার সম্মুখে বাজার বসিয়া থাকে। দ্বারের উপরিতলে নহবতখানা। ইহা এত উচ্চ যে এক্ষণকার ত্রিতল গৃহও ইহার সমান উচ্চ হয় না। জীর্ণসংস্কার অভাবে এই সিংহদ্বারটী ফাটিয়া গিয়াছে। ইহার সংস্কার হওয়া উচিত। বাগানের মধ্যে দর্শনীয় বৃক্ষাদি অধিক নাই। কেবল তিনটী অত্যুচ্চ মসজিদ আছে। তাহার

ভিতর দিকে পারসী ভাষায় কি লিখিত আছে। শুনিলাম ইহার মধ্যে কোন কোন মহাত্মা সমাহিত আছেন। এই বাগানের মধ্যে জানুয়ারি মাসে একটী প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। বাগানের প্রবেশ-দ্বারের একটু অন্তরে একটী প্রকাণ্ড কূপ আছে। সিঁড়ি দিয়া এই কূপে নামিতে হয়। জলের নিকট মৃত্তিকার গর্ভে বিশ্রামাগার আছে। বোধ হয় বাদসাহ-তনয়েরা স্নানাদির পর এই সকল গৃহে বিশ্রাম করিতেন। কূপের জলই এদেশে সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহৃত হয় ও সেই জলই উৎকৃষ্ট পানীয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজারাও এই উদ্দেশে এইরূপ কূপ খনন করাইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে কাহারা সেই সমুদায় উপভোগ করিতেছে! পৃথিবীতে কাহার দ্রব্য কে ভোগ করে! ৮০।৯০ হাত নিম্ন হইতে জল তুলিয়া লইতে এতদ্দেশীয় লোকদিগের একপ্রকার ব্যায়াম-চর্চ্চা হইয়া থাকে।

যমুনা ব্রীজ—এই ব্রীজের কার্য্য-প্রণালী অতীব আশ্চর্য্য। ইহা ইংরাজের কীর্ত্তি। ইহার উচ্চতা অত্যন্ত অধিক। এই উচ্চতার সামঞ্জস্য রাখিবার নিমিত্ত প্রায় ১২ মাইল অন্তর হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণে রেলওয়ে কোম্পানীর অপরিমিত অর্থ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম একটী থামকে দুই তিন বার ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। ইংরাজও ছাড়িবার পাত্র নহেন। দুই তিন বার বিফল-মনোরথ হইয়াও একেবারে ভগ্নোদ্যম হন নাই। অবশেষে যমুনাকে ইহাঁদিগের নিকট অধীনতা-স্বীকার করিতে হইয়াছে। ব্রীজটী ½ মাইল পরিসরবিশিষ্ট ও দুই থাকে বিভক্ত। ইহার সর্ব্ব উপরিতল দিয়া রেলওয়ে শকট গমনাগমন করিয়া থাকে। প্যাসেঞ্জার ট্রেণগুলির এই ব্রীজ পার হইতে ৫।৬ মিনিট কাল অতীত হয়। মধ্য ভাগ দিয়া, গাড়ী, ঘোড়া ও মনুষ্যাদি যাতায়াত করে এবং নিম্নতল দিয়া অনায়াসে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। ফলতঃ যমুনা-ব্রীজ ইংরাজের অসীম ক্ষমতা ও অসাধারণ কৌশলের পরিচায়ক।

এলাহাবাদের পূর্ব্বাপর বিখ্যাতির কারণ—প্রয়াগ তীর্থ। কিন্তু এতক্ষণ প্রয়াগতীর্থের উল্লেখ না করিয়া আমরা অন্যায় করিয়াছি। এই স্থান হিন্দুদিগের মতে অতি পবিত্র ও পুণ্যময়। অতএব ইহার বিবরণ হিন্দুমাত্রেরই পাঠ করা উচিত।

এলাহাবাদের যে স্থানে গঙ্গা ও যমুনা মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের নাম প্রয়াগ তীর্থ বা বেণীতীর্থ। এই কারণে সমস্ত এলাহাবাদকে কখন কখন প্রয়াগ বলা যায়। একটী প্রবাদ চলিত আছে যে "পৈরাগে মুড়ায়ে মাথা,মর্'গে পাপী যথা তথা"—অর্থাৎ প্রয়াগতীর্থে মস্তক মুণ্ডন করিয়া যে কোন স্থানে মৃত্যু হইলেও নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এই কারণে এস্থান হিন্দুদিগের এত আদরের বস্তু। এখানে পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে একটী মেলা আরম্ভ হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকে। এই মেলার নাম কুম্ভের মেলা। বার বৎসর অন্তর ইহার জাঁকজমক অত্যধিক হয়। তখন নানাদিগ্দেশ হইতে যাত্রীদিগের সমাগম হইতে থাকে। গত বৎসর অতি ধুমধামের সহিত কুম্ভ-মেলা হইয়া গিয়াছে। বেণীতীরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া অক্ষয় বট, নাগবাসুকি, বেণীমাধব প্রভৃতি দর্শন করিতে হয়। এখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম আছে। অন্যান্য দর্শনীয় বিগ্রহও বিস্তর আছে। কিন্তু সে

সকলের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রয়াগী পাণ্ডারা যাত্রীদিগের উপর বড়ই কঠোর ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন যাত্রীই ইহাঁদিগের অপরিমিত প্রাপ্তি-আশাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। এখানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম অতীব মনোরম। ইহা দেখিলে মনে কত ভাবেরই উদয় হয়! ইহার সৌন্দর্য্য কখনও ভুলিতে পারিব না। এই দৃশ্যে আমার মন যেরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা অদ্যকার এই অল্পায়তন পত্রেস্থান পাইয়া উঠিল না।

মা ও মেয়ে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠখণ্ড।—প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেলা ৩টা হইবে, এমন সময় রামচরণ ডাক্তার ধীরে ধীরে পূর্ব্ববর্ণিত সরকারদের বাটীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সতর্কভাবে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর হস্তস্থিত চাবি দ্বারা দরজার তালা খুলিয়া ফেলিল এবং দ্বার খুলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। রামচরণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার সাবধানে ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার পর সে ঘরের নিকটস্থ হইয়া দাঁড়াইল, এবং উৎকর্ণ হইয়া ঘরের ভিতর কোন শব্দ হইতেছে কি না শুনিল। তাহার পর হস্তস্থিত আর একটী চাবি দ্বারা ঘরের দরজা খুলিল। ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণস্বরে ক্ষীণপ্রাণে শব্দ হইল,—"আসিয়াছ? রামচরণ আসিয়াছ? এখনও মরি নাই। এমন করিয়া কত দিনে মরিব?"

রামচরণ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ ও গম্ভীরভাবে থাকিয়া তাহার পর বলিয়া উঠিল,—"কত দিনে মরিবে তাহা জানি না, কিন্তু তুমি না মরিলেও আমার মন কোন মতেই স্থির হইতেছে না।"

রুগ্না আবার উত্তর দিল,—"কেন রামচরণ—কেন আমাকে এমন গলগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ? আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি চলিয়া যাই। আমার অনাথিনী কন্যা।"—

সে কণ্ঠ হইতে আর কথা বাহিরিল না। শোকোচ্ছ্বাসে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। রামচরণ বলিল,—"কেন তোমাকে রাখিয়াছি তাহা কি জান না? কতদিন তো তোমাকে সে কথা বলিয়াছি। তোমাকে আনিয়াছিলাম তোমার রূপ দেখিয়া—তোমার যৌবন দেখিয়া। তোমাকে আনিয়া এখানে তোমার ভাব দেখিয়া আমার সে প্রবৃত্তি ছরিয়া গেল। আমার সে বাসনা লুকাইল। দেখিলাম তুমি কন্যার বিচ্ছেদে পাগলিনী, আর

দেখিলাম, তিনদিনের মধ্যেই তোমার সেই অপূর্ব্ব শ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমাকে যে জন্য আনিয়াছিলাম সে ইচ্ছা একটুও হইল না। এখন তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়ার মহাদায়। তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বনাশ। তুমি যে স্বাধীন হইলে যেখানে সেখানে আমার অত্যাচার না বলিয়া চুপ্ করিয়া থাকিবে, একথা আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করি না। কাজেই আমাকে এই পাপের বোঝা ঘাড়ে করিয়া বহিতে হইতেছে। এক্ষণে তুমি না মরিলে আমার নিষ্কৃতি নাই।"

গৃহমধ্যস্থা স্ত্রীলোক বলিল,—"আমাকে ছাড়িয়া দেও, রামচরণ, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি। এ কথা ইহজগতে আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না।"

রামচরণ বলিল,—"তোমার কথায় বিশ্বাস কি? তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি কি প্রাণে মারা যাইব, মনে করিয়াছ?"

স্ত্রীলোক আবার বলিল,—"তবে কি হইবে রামচরণ? মরণ তো ইচ্ছাধীন নহে। আমি তো এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না। আমাকে কেন অকারণ এত কষ্ট দিতেছ? যদি আমাকে ছাড়িয়া না দেও, তবে দয়া করিয়া কোন উপায়ে আমাকে মারিয়া ফেল। তাহাতে তোমারও উপকার হইবে, আমার সকল যন্ত্রণার শেষ হইবে।"

পাষণ্ড রামচরণ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল;—"কাজেই আমাকে তাহাই করিতে হইবে। এত উপবাস করিয়া, এত কষ্ট ভুগিয়াও যে তোমার কাঠ-প্রাণ বাহির হইবে না, তাহা আমি ভাবি নাই। এ দগ্ধানি আমি আর সহ্য করিতে পারি না। এমন কঠোর প্রাণও কোথায় দেখিনাই। বুঝিলাম তুমি আপনা আপনি মরিবে না। এখন কাজেই তোমাকে জোর করিয়া মারিয়া না ফেলিলে আমার শান্তি নাই।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তাহাই কর—আমাকে কাটিয়া ফেল। আমি তাহাতে একটুও দুঃখিত বা কাতর নহি। কিন্তু রামচরণ, তোমাকে একটা কথা বলি শুন। ভাবিও না যে, আমি প্রাণের মায়ায় বা মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বলিতেছি। প্রাণ তো আমার দেহ হইতে যাওয়াই সুখ, মৃত্যুই তো এখন আমার পরম সুখ। সেজন্য নহে, রামচরণ। ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা কখন একবারও ভাবিয়াছ কি? নরকের কথা একবারও মনে করিয়াছ কি? মাথার উপর সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর রহিয়াছেন তাহা জান কি, রামচরণ? এখানে তুমি যাহা যাহা করিলে পরকালে তাহার প্রত্যেকটির বিচার হইবে তাহা শুনিয়াছ কি, পাষণ্ড? তোমার সন্তোষ বা ক্রোধ—অনুগ্রহ বা নিগ্রহ আমার পক্ষে এখন উভয়ই সমান। আমি আজি যদি তোমার হস্তে নাও মরি, দুই চারিদিন পরে যে মরিব তাহার ভুল নাই। মরণান্তে যদি আত্মায় আত্মায় সাক্ষাৎ হয় তখন দেখিব পাপিষ্ঠ, তোমার পাপ আত্মা নিশ্চয়ই অগ্নিরাশির মধ্যে বিকট চীৎকার করিতে করিতে অনন্তকালের নিমিত্ত দগ্ধ হইতেছে। সে দিন, সে অবস্থা রামচরণ, একবার স্মরণ কর।"

স্ত্রীলোক নীরব হইল। দুর্ব্বল শরীরে বহুক্ষণ কথা কহিয়া সে কাতর হইয়া পড়িল। রামচরণ নীরব। তাহার চিত্তের তখন ভয়ানক অবস্থা। একদিকে ইহলোকে ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা, আর একদিকে স্ত্রীলোক পরলোকের যে চিত্র দেখাইল তাহা ভয়ানকের ভয়ানক। রামচরণের চিত্ত যার পর

নাই অস্থির। স্ত্রীলোক আবার বলিল,—"পাপিষ্ঠ রামচরণ, কি ভাবিতেছ? অসীম ভাবনাস্রোতেও তোমার এ পাপ-পর্ব্বত ধৌত হইবার নহে। ভাবিয়া দেখ রামচরণ, আমি একজন দুঃখিনী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা। আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি রামচরণ—যে তুমি আমাকে এই দুঃসহ যাতনা দিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে আমার জীবননাশ করিতেছ? ইহার কি উত্তর দিবে নরাধম? আমার সেই নিরাশ্রয়া দুঃখিনী 'মা, মা' বলিয়া যত আর্ত্তনাদ করিতেছে, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া তাহার চক্ষু হইতে যত বিন্দু জল পড়িতেছে, জানিও, সে সমস্তই ভগবানের পুস্তকে লিখিত হইতেছে—তোমাকে তাহার জবাব দিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ রামচরণ—তখন তোমার অবস্থা কি ভয়ানক হইয়া পড়িবে।"

স্ত্রীলোক আবার নীরব। স্ত্রীলোক-চিত্রিত চিত্র রামচরণের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। সে দুই একবার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে পাষাণহৃদয়ে স্থায়ীরূপে অঙ্কপাত করা অসম্ভব। রামচরণের হৃদয় তখনই অন্য পথে পরিচালিত হইল। সে বলিল,—"আমার ভাবনা তোমায় ভাবিতে হইবে না। তোমার অদৃষ্টে আপাততঃ কি আছে তাহাই ভাবিয়া দেখ।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"আমার অদৃষ্টে আর কি আছে রামচরণ? মৃত্যু—তাহা তো নূতন নহে! কিন্তু আমাকে মারিলেই যে তুমি ইহজগতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে মনে করিয়াছ, জানিও কখনই তাহা ঘটিবে না। আজি হউক বা কালি হউক এ কথা প্রচার হইবেই হইবে, তখন তোমার অদৃষ্টে কি হইবে?"

রামচরণ বলিল,—"সে ভয় আমাকে দেখাইতে হইবে না। তোমাকে আমি যেরূপ সাবধানে লুকাইয়া রাখিয়াছি, তাহাতে কাহারও সাধ্য নাই, যে একথা জানিতে পারে।"

স্ত্রীলোক একটু হাসির সহিত মিশাইয়া বলিল,—"কিন্তু ঈশ্বরের নিকট লুকাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই জানিবে। সেই অনাথনাথ ভগবান আমার এই দশা জানেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই অবরোধের মধ্যেও আমার বন্ধু জুটাইয়া দিয়াছেন। আজি যদি আমি মরি রামচরণ, জানিও কালি আমার সেই ঈশ্বরপ্রেরিত বন্ধুগণ তোমার সর্ব্বনাশ না করিয়া ছাড়িবে না। অতএব রামচরণ, তোমার নিস্কৃতি নাই। আমি মরি বা বাঁচি, তোমার সর্ব্বনাশ সম্মুখে।"

রামচরণ অনেকক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বুঝিল যে স্ত্রীলোকের কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। সে ভয় দেখাইবার জন্য এ কথা বলিতেছে। বলিল,—"রামচরণ কাঁচা ছেলে নহে যে, তোমার ঐ কথা সত্য বলিয়া মনে করিবে। আমাকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় হইবে না।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তোমাকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় করিতে চাহি না। যে মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে তাহার কোন কাজেই দরকার নাই তো। ধর্ম্ম আমার বন্ধুরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, এ কথা মিথ্যা নহে। বিশ্বাস না হয় এই দেখ,"—এই বলিয়া স্ত্রীলোক একটা মিঠাই ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"এ সামগ্রী এখানে কেমন করিয়া আসিল?"

রামচরণের মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিল, তবে তো সত্যই অপর লোকে ইহার সন্ধান পাইয়াছে। ক্রোধে তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে স্থির করিল এই সর্ব্বনাশস্বরূপিনী স্ত্রীলোককে এখনই বিনাশ করিতে হইবে।

তাহার পর উহার শব এমনি করিয়া লুকাইতে হইবে যে, ইহজগতে কেহই তাহার সন্ধানও পাইবে না। ইহাকে আর বাঁচিতে দিলে আরও সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। রামচরণ বলিল,—"সুলোচনা, তোমার আর রক্ষা নাই। তুই যখন আমার সর্ব্বনাশের পথ করিতেছিস্ তখন তোকে আর এক মুহূর্ত্তকালও থাকিতে হইবে না। আজি এক লাঠিতে তোর মাথা ফাটাইয়া অন্য কথা কহিব। দেখি তোর কোন্ বন্ধু রক্ষা করে।"

এই বলিয়া রামচরণ ঘরের চাল হইতে বাঁশ ভাঙ্গিতে গেল এবং যখন প্রকাণ্ড এক বাঁশ হস্তে সুলোচনার মস্তকচূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে গৃহপ্রবেশ করিবে, এমন সময় দেখিল সম্মুখে আলুলায়িতকুন্তলা এক উম্মাদিনীপ্রায় স্ত্রীলোক। রামচরণ প্রথমে অবাক্ হইল, তাহার পর চিনিল সে স্ত্রীলোক কামিনী। সে কামিনীর অসম্ভাবিত উপায়ে এস্থানে আগমনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার প্রদর্শন করিবে মনে করিতেছে এমন সময়ে কামিনী বলিল,—"রামচরণ, আজি সেই পদবিদলিতা বেশ্যা সম্মুখে উপস্থিত। সে অনেক সহিয়াছে, সে অনেক ভুগিয়াছে, আজি সকল কষ্টের অবসান করিতে সে এখানে আসিয়াছে। ভাবিয়াছ কি ডাক্তার বাবু, হস্তের বাঁশ দিয়া আমায় শাস্তি দিবে? হা হা, তাহাতে তোমার সাধ্য নাই। অনেক পদাঘাত করিয়াছ, অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছ, আজি আর কিছু বলিতে হইবে না। মনে করিয়াছ কি ঐ স্ত্রীলোককে মারিয়া ফেলিয়া তোমার কলঙ্ক লুকাইয়া রাখিবে? না না, ডাক্তার মহাশয়, তাহা হইবার নহে। তোমার যে পাপ—তোমার যে কলঙ্ক, তাহা লুকাইবার নহে।"

কামিনী নীরব হইল। ক্রোধে তখন ডাক্তারের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার সুলোচনাকে নিপাত করার কথা ভুলিয়া গিয়া তখন হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা কামিনীর মাথা বিচূর্ণ করিবার সংকল্প করিল। নিমেষের মধ্যে কামিনী রামচরণের নিকটস্থ হইল এবং তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—

"দেখ দেখি, ডাক্তার বাবু, হৃদয়ে আঘাত লাগে কি না। দেখ দেখি ও পাষাণ-হৃদয় বিদ্ধ হয় কি না।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কামিনী কটিদেশ হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিষ্কাশিত করিয়া তাহা রামচরণের হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া দিল। রামচরণ 'মাগো' শব্দে ভূমিতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

তখন কামিনী বিকট চীৎকার করিয়া বলিল,—"কি দেখিতেছ—বাহিরে আইস, আজি সকল জ্বালার শেষ করিয়া দিয়াছি।"

ধীরে ধীরে অতি কাতরভাবে এক অস্থিচর্ম্মাবশেষ রমণী-মূর্ত্তি দ্বারসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছে তাহারাও দেখিয়া অনুমান করিতে পারে না যে, এই সেই সুলোচনা। সুলোচনা দেখিয়া অবাক্।

তখন আর কোন কথা না কহিয়া বা আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া রামচরণের বাতনাক্লিষ্ট বক্ষ হইতে কামিনী বিদ্ধ ছুরিকা খুলিয়া লইল এবং বলিল,—"রামচরণ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়দেবতা! ভাবিও না তোমার এই চরণাশ্রিতা দাসী সুখে থাকিবে। দাসী তোমার চরণ ভিন্ন জানে না। ইহজগতে তোমার চরণে স্থান পাইবার আশা নাই দেখিয়া সে আজি এই উপায় অবলম্বন

করিয়াছে। তোমার চরণাশ্রিতা দাসী এই তোমার চরণছায়ার অনুবর্ত্তিনী হইল।" এই বলিয়া কামিনী সেই শোণিতাক্ত ছুরিকা স্বীয় বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল এবং হাসিতে হাসিতে রামচরণের দেহের উপর পড়িয়া গেল।

সুলোচনা বাক্যহীনা, সংজ্ঞাহীনা বলিলেও হয়। এ সকল স্বপ্ন না প্রকৃত ঘটনা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকের যখন এই অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে সেই স্থানে হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়, দেবেন্দ্রনারায়ণ, রাধারমণ এবং তাঁহাদের সমভিব্যাহারী আরও কয়েকজন লোক সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধারমণ অদ্য প্রাতে সুলোচনাসম্বন্ধীয় সংবাদ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কর্ণগোচর করে। তিনি সেই অচিন্তিতপূর্ব্ব শুভসংবাদ পিতার কর্ণগোচর করেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া লোকজন লইয়া এতদ্বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন ভয়ানক ব্যাপার! রামচরণ ডাক্তার শোণিতাক্ত কলেবরে ভূপৃষ্ঠে এবং তাহার বক্ষোপরে সমদশাপন্না এক স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে। তখন সুলোচনার প্রসঙ্গ ভুলিয়া গিয়া হেমেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,—"দেখ দেখি দেবেন্দ্র, ইহারা বাঁচিতে পারে কি না।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহাদের উভয়েরই আঘাত গুরুতর হইয়াছে। বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বোধ হইতেছে এই স্ত্রীলোকটা পুরুষটাকে মারিয়া স্বয়ং আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছে। যাহা হউক ইহাদের মুখে জলটল দিয়া একটু শুশ্রূষা করা মন্দ নহে।"

তখনই রাধারমণ জল সংগ্রহ করিয়া আনিল। ধীরে ধীরে বায়ু ও জল প্রয়োগ করিতে করিতে প্রথমে রামচরণের পরে কামিনীর জ্ঞানোদয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। রামচরণ একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল—তখনই আবার চক্ষু মেলিল। নিতান্ত কাতরভাবে বলিল,—"ওঃ নরক!—কি ভয়ানক—কামিনি—প্রাণেশ্বরি—প্রাণ যায় যে!"

কামিনীও চক্ষু মেলিল। চক্ষে চক্ষে সে অন্তিমকালে মিলন ঘটিল। রামচরণ আবার বলিতে লাগিল,—"কামিনি—প্রিয়তমে—ওঃ হায় আগে কেন জ্ঞান হয় নাই! প্রাণ যে—নরক! কি হইবে—কামিনি প্রাণেশ্বরি—আমাকে ক্ষমা কর। দেখ—আমার বক্ষ দেখ—সেখানে আর কিছুই নাই—কেবল তুমি। হা প্রিয়ে—কামিনি—এখন উপায়—ওঃ মরি—কোথায় তুমি? তোমাকে ছাড়িয়া—ওঃ কোথায় চলিলাম?"

রামচরণ নীরব হইল। কামিনীর চক্ষু দিয়া তখন জল পড়িতেছে। সমবেত লোক সকলের নয়নও জলভারাকুল। সুলোচনার নয়ন দিয়া অবিরলধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে।

কামিনী বলিল,—"রামচরণ—প্রাণেশ্বর—হৃদয়দেবতা—জীবনসর্ব্বস্ব, আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? তুমি কি মনে করিতেছ তুমি চলিয়া গেলেও দাসী এখানে পড়িয়া থাকিবে? দাসী তোমার সঙ্গেই যাইতেছে প্রাণনাথ!"

তখন রামচরণ বলিল,—"কামিনি—প্রিয়ে—তোমাকে কত কষ্টই দিয়াছি—তোমার দেবদুর্লভ—আহা—স্বর্গীয় প্রেমের কতই অবজ্ঞা করিয়াছি? কামিনি—প্রিয়তমে—আমি ক্ষমার

যোগ্য নহি—তথাপি—ওঃ—আমাকে ক্ষমা কর।"

কামিনী নীরব। তখন রামচরণ একে একে উপস্থিত লোক সকলের প্রতি নেত্রপাত করিল। ক্রমে তাহার নেত্র সুলোচনার সেই ক্ষীণ মূর্ত্তির সহিত সম্মিলিত হইল। সে নিতান্ত কাতর ও বিপন্ন হইয়া উঠিল। অত্যন্ত ভীত ভাবে বলিল,—"ওঃ—নরক—নরক—নরক! কি হইবে? কি করিব? নরক—নরক—নরক! সুলোচনা—মা আমার—তোমার এ অক্ষম—পাপিষ্ঠ সন্তানের গতি—না—গতি নাই—নরক! ওঃ—সুলোচনা—মা—আমাকে ক্ষমা—না—অসম্ভব—আমার নরক। আগে বুঝি নাই—পাপ ভাবি নাই—দুষ্কর্ম্মে ডরাই নাই! নরক—নরক—নরক! কিন্তু মা—সুলোচনা—আমি তোমার সন্তান—আমি তোমার দেহে—ওঃ—তোমার দেহে—জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞানতঃ—কখন হাত—নাই। তুমি সতী—সাবিত্রী—তোমার আশীর্ব্বাদে—তোমার প্রার্থনার অনেক ফল। কিন্তু—আর বলিতে পারি না। ওঃ মরি যে—একটু জল দিতে পার?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ রামচরণের বদনে একটু জল দিলেন। সে আবার বলিল,—"কিন্তু তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করিবে কেন? আমি তোমাকে—ওঃ ভাবিলে ভয় হয়—কত কষ্ট দিয়াছি—এমন অধমকে তুমি—ওঃ—আশীর্ব্বাদ করিবে কেন? কিন্তু মা—আমি যতই মন্দ হই—আমি তোমার সন্তান। সন্তানকে অন্তিম কালে ক্ষমা—ওঃ—যাই যে—ওঃ ক্ষমা কর মা!"

ক্ষীণ ও কাতর স্বরে অশ্রুসমাকুললোচনে সুলোচনা বলিলেন,—"রামচরণ! বুদ্ধির দোষে তুমি আমাকে কষ্ট দিয়াছ সত্য কিন্তু আমার দেহ তোমার দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই, ইহা আমি পরম লাভ বলিয়া মনে করিতেছি। আমি যে কষ্ট পাইয়াছি সে জন্য আমি এখন একটুও কাতর নহি জানিবে। তুমি আমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছ। আমিও জননীর ন্যায় তোমার সকল দোষ ক্ষমা করিয়া পূর্ণ হৃদয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

তখন রামচরণ আবার বলিল,—"তবে—ওঃ—তবে আইস মা, আমার মস্তকে চরণ—ধূলি দেও মা।" এই বলিয়া রামচরণ হস্ত বিস্তার করিয়া সুলোচনার পাদ-স্পর্শ করিল এবং সেই চরণরেণু স্বীয় মস্তকে সংস্থাপিত করিল। তাহার পর রামচরণ রাধারমণের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। রাধারমণ তাহাকে হৃদয় হইতে ক্ষমার আশ্বাস দিল। তাহার পর রামচরণ করযোড়ে হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল,—"আমার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে। তাহা সম্পূর্ণ—কি বলিব—ওঃ—সৎ পথে অর্জ্জিত হইলে—প্রিয়ভগ্নী শরৎকুমারীকে—দিতাম। তাহাতে কাজ নাই—ঐ সম্পত্তি—মহাশয়—কোন হিতকর কার্য্যে—ব্যয় করিবেন।"

তিনি অনুরোধ পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহার পর রামচরণ বলিল,—"কই—প্রিয়ে—কামিনি—প্রাণেশ্বরি—কোথায় তুমি? আইস—কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

কামিনীর তখন বাক্য কথনের ক্ষমতা ছিল না। সে উত্তর দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু উত্তর বাহিরিল না। একবার মস্তকান্দোলন করিল মাত্র। তখনই সে মস্তক রামচরণের বক্ষচ্যুত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। তাহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট চিরদুঃখময় জীবনের অবসান হইল। অবিলম্বে রামচরণের বদনে মৃত্যুচিহ্ন সমস্ত প্রকাশিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ ও আত্মার চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। নারকী রামচরণের পাপ প্রাণ ইহলোক হইতে

প্রস্থান করিল। ভবরঙ্গভূমে সে যে সকল লীলা দেখাইতে আসিয়াছিল অদ্য এই স্থানেই তাহা পরিসমাপ্ত হইয়া গেল। পাপেই তাহার বিলাস, পাপেই তাহার তৃপ্তি, পাপেই তাহার পূর্ণতা ছিল,—অদ্য পাপেই তাহার পতন ঘটিল। এরূপ পাপ-পঙ্কিল প্রাণে পরকালে কিরূপ ফলভোগ করিবে তাহা আলোচনা করিতে মানবের অধিকার নাই। কিন্তু ইহ-জন্মে সে যে সুখের আশায় তৃপ্তির লালসায় ছুট ছুটী করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহাতে কোনই সংশয় নাই। রামচরণ যতই পাষণ্ড হউক, তাহার মৃত্যু নিতান্ত অনৈসর্গিক ও ভয়ানক। পাপপরায়ণ রামচরণ ও কলঙ্কিনী কামিনীর এতাদৃশ মরণে সমবেত ব্যক্তিবর্গ নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। হায়, অন্তিম-কালে রামচরণের হৃদয়ে কামিনীর প্রতি যে উচ্চ ভাব প্রতিভাত হইয়াছিল, পূর্ব্বে কেন তাহা হয় নাই? তাহা হইলে এই যুগল জীবন নিশ্চয়ই সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত হইত এবং কখনই এবম্বিধ ভয়াবহ পরিণামে উপস্থিত হইত না। তাহা হইলে নিশ্চয়ই রামচরণের পাপ-ভারাবনত আত্মা বহুলাংশে নিষ্পাপ থাকিতে পারিত এবং সমাজ তাহার অত্যাচারে যাদৃশ প্রপীড়িত হইয়াছে কখনই সেরূপ হইত না। অন্তিম কালে রামচরণ হৃদয়কে যেরূপ প্রশস্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল জীবনকালে কেন তাহার মনে কখনও সেরূপ প্রশস্ততা স্থান পায় নাই?

(ক্রমশঃ)

সমাজ-সংস্কার।

১—বিলাত-প্রত্যাগত হিন্দু।

হিন্দুসমাজ যে অতিশয় দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা কাহাকেও আর নূতন করিয়া জানাইতে হইবে না। এই অবস্থায়, যাহাতে সমাজের আর অধোগতি না হয়, সে বিষয় সকলের চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। আমরা সমাজের আ-ভ্যন্তরিক দুই একটি বিষয়ের মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমার মত লোকের পক্ষে এই অবসন্ন সমাজকে বুঝাইবার আশয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচারিত করা আর প্রবাহে নিক্ষেপ করা প্রায় সমান। কত শত মহামহোপাধ্যায় এ বিষয়ে কত যত্ন করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, তখন আমার এ প্রলাপে কে কর্ণপাত করিবে!

হিন্দুর সমাজ-বন্ধন যত দৃঢ় ছিল, জগতের আর কোন জাতিরই তেমন নয়। প্রাচীন আর্য্যমহর্ষিগণ সমাজ-বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন সাহিত্যের উন্নতি, ধর্ম্মের তত্ত্বনিরূপণ প্রভৃতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি সমাজ বিজ্ঞানের প্রতিও দৃষ্টিহীন

ছিলেন না। প্রত্যুত হিন্দু-সমাজকে প্রতি-বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ করিয়া সমাজ-বন্ধনের দৃঢ়তা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

দেশ ও কাল ভেদে সমাজের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। সেই জন্য তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কালের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দুসমাজের সজীবতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর আচার ব্যবহার যত পবিত্র তত আর কোন জাতিরই নাই। হিন্দু স্বগোত্রীয় বরকন্যায় বিবাহ-প্রথা অনিষ্টকরী জানিয়া তাহা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু জগতের অপরাপর সমাজে অদ্যাপিও সে প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। ইউরোপীয়েরা এ নিষেধের তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়াছেন, তাই এখন আপন আপন সমাজে ঐ নিষেধ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। সকলে সকল কথার মর্ম্ম বুঝিবে না ও মানিবে না, এটি তাঁহারা সুন্দররূপ বুঝিয়াছিলেন, তাই কি সামাজিক আচার ব্যবহার কি স্বাস্থ্যরক্ষা, সমুদয় ব্যাপারেই ধর্ম্মের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা সেই মহা পুরুষদিগের অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের সমাজের যে বর্ত্তমান হীনাবস্থা, এইটি তাহার প্রধান কারণ।

প্রাচীন হিন্দুগণ বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারোপলক্ষে ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য অনেক দেশে গমনাগমন করিতেন। চীন রোম প্রভৃতি রাজ্যের গতিবিধি কথা মহাভারতেই উল্লিখিত আছে। সমুদ্রযাত্রা তৎকালে নিষিদ্ধ ছিল না; সিংহল, বালি, যব প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দু-নিবাস তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তখন যবন-দেশে গমন করিলে হিন্দুর কোন প্রত্যবায় হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু এখন হিন্দুর জাত্যভিমান শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া হিন্দু অর্ণবপোতে ভ্রমেও পদার্পণ করিতে চাহেন না—সিন্ধুর পরপারে গেলেই হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট হইয়া যায়!

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর বিলাত গমন লইয়া সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত। এ বিষয়ে কত কত সংবাদ পত্রে কত কত সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হইল। শতেকের মধ্যে পাঁচ জন হিন্দুরা আপন বন্ধুগণের সহিত বসিয়া পরামর্শ করিলেন, হিন্দু ধর্ম্মানুসারে বিলাত যাওয়ার কোন দোষ নাই। কিন্তু গুপ্ত পরামর্শ গোপনে দুই চারিটি হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্য খেলা করিয়া গোপনেই মরুত-প্রবাহে পড়িল—গোপনেই অনন্ত শূন্যে মিশাইল। তাহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শিল না। "সাধারণী" কয়েকবার এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। কহিয়াছেন, বিলাত হইতে আসিয়া হিন্দু যদি হিন্দু-সমাজের আদেশ মানেন, হিন্দুসমাজ অবশ্যই তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ফলে আমরা তাহার বিপরীতই দেখিতেছি।

ভারতের এ হিন্দু আর সে হিন্দু নাই। যে সময়ে হিন্দু জগতের শিক্ষকের কাজ করিতে পারিয়াছেন—সমস্ত জগৎ হিন্দুর পদে প্রণতি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে—সে সময়ও নাই সে হিন্দুও নাই। যে দিন মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত অভিনব ধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে জগৎ বিকম্পিত হইল, সেই দিন হইতে হিন্দুর হিন্দুত্ব ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া এই বর্ত্তমান দশায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মুসলমানেরা হিন্দুস্থান আক্রমণ ও পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠন করিয়াছে—হিন্দুধর্ম্ম বিলোপের চেষ্টা করিয়াছে। সেই সময় হইতে

হিন্দু নানা উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া ক্রমে আপন সমাজ ও ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন হিন্দুসমাজের যেন এই উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে যে, যে কোন অকার্য্য করিতে চাও, অঙ্গুলির অন্তরালে থাকিয়া কর, ক্ষতি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে সদুদ্দেশ্যে তুমি বর্ত্তমান প্রথার অণুমাত্র ব্যভিচার করিলে তখনই জাতিভ্রষ্ট ও সমাজচ্যুত হইবে। বাদসাহ আকবর সাহের সময়ে রাজা মানসিংহ রাজপুতসেনা সংভিব্যাহারে স্বচ্ছন্দে সিন্ধুনদ পার হইয়া কাণ্ডাহার রাজ্যে গমন করিলেন। তাঁহার কোন পাপ হইল না। কিন্তু আজ তুমি বিলাত যাইবে, তোমাকে যে কোন প্রকারেই হউক, জাতিভ্রষ্ট করিতে হইবে। একথা স্বীকার্য্য যে, মানসিংহ কাণ্ডাহারে গিয়াও হয়ত যাবনিক ভক্ষ্য ভোজন করেন নাই। আর তোমাকে বিলাতে তাহা অগত্যা করিতেই হইবে। কিন্তু যে সমস্ত হিন্দুরা পরশ্বমাত্র কাবুল ও মিসরযুদ্ধে গমন করিলেন, তাঁহাদের জাতিনাশ হইল না। বর্ম্মায় কত কত হিন্দু নানা কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের জাতি যাইবার কথা নহে। কেবল বিলাতগমনেই হিন্দুত্বভ্রষ্ট হিন্দুর যত সর্ব্বনাশ। যবনের জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রযাত্রা যদি শাস্ত্রানুসারে পাপ ও জাতিনাশের কারণ থাকে, তাহা হইলে কি শুধু বিলাতযাত্রীই অপরাধী হইবে? যদি বাস্তবিক সমুদ্রগমনে দোষ না থাকে, শুদ্ধ যবনান্ন ভোজনেই দোষ ও পাপ হয়, তাহা হইলেও, সত্যবাদী হিন্দুসম্প্রদায়! আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মধ্যে কতজন উইলসনের হোটেল পবিত্র করিয়াছেন ও প্রতিদিন করিতেছেন, সে কথা জানেন কি? অবশ্য এ বিষয় আপনাদের অবিদিত নাই। কিন্তু অকারণে স্বেচ্ছাক্রমে যিনি দেশে বসিয়া এরূপ অত্যাচার করিতেছেন, আপনারা বিনা প্রায়শ্চিত্তে কি বলিয়া তাঁহার সহিত অম্লানমুখে আহার ব্যবহার করিতেছেন? অথবা যবনান্নভোজনের আবার প্রায়শ্চিত্ত কি? যদি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধি শাস্ত্রে কিছু থাকে, তবে সে বিধি বিলাতযাত্রীর সম্বন্ধেও অবশ্য খাটিবে। আর এক কথা এতদ্দেশে থাকিয়া যাঁহারা যবনান্ন ভোজন করেন তাঁহাদের পাপ আরও গুরুতর। প্রথমতঃ, তাঁহারা স্বজাতির অন্ন অক্লেশে পাইবার সুবিধাসত্ত্বে যবনান্ন গ্রহণ করিয়া সমাজের ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদিগকে যবনান্নভোজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই, তাঁহারা অস্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং মিথ্যা কথনের অপরাধেও তাঁহারা প্রত্যক্ষ দোষী। আর বিলাতে গিয়া হিন্দুর অন্ন পাই না অথচ না খাইলেও প্রাণ যায়, এইমত অবস্থায় পড়িয়া যবনান্নভোজন করিয়াছি বলিয়া আমি সমাজচ্যুত হইব? আমি মিথ্যা কহিয়া আমার দোষের কথা গোপন করিলাম না। সুতরাং সত্যবাদী এবং অন্য উপায় না থাকাতে যবনান্নভোজী বলিয়া সমাজচ্যুত হইব? এরূপ হইলে সমাজের যে দশা অবশ্যম্ভাবী, আমাদের দীন হিন্দুসমাজের তাহাই ঘটিয়াছে। হিন্দুর অবিচারে হিন্দুর সোণার সমাজ আজ ছারখারে গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ভারতের এ হিন্দু আর সে হিন্দু নাই।

বিলাত গমন ভারতবাসীর যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা আমাকে আজ নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। বহু দিন ধরিয়া উন্নতচেতা হিন্দুগণ তৎসম্বন্ধে অনেক বিচার

করিয়াছেন। তবে যদি বিলাত গমন এতই প্রয়োজনীয় হইল, তাহা হইলে, আর অসার অভিমানে মত্ত হইয়া জন্মভূমির এ বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করিবার প্রয়োজন কি? আমি স্বয়ং হিন্দু—হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী। এ অবস্থায় হিন্দু যুবা হিন্দুধর্ম্মমতে যতদূর অচার ব্যবহার করিতে পারেন, আমি এতদ্বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করি না। আমি বিলাতগমন সম্বন্ধে এতদ্দেশের দুই এক জন নব্য স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপকের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়াছি। স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথের বিষম শোকজনক কারাবাসের সময় নানা কথার প্রসঙ্গে নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী বিল্বপুষ্করিণী-নিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ মহাশয় আমার সমক্ষে বলিয়াছেন, "বিলাত প্রত্যাগত হিন্দুকে সমাজে লওয়া বিশেষ আবশ্যক।" তাঁহারা কেবল প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভয়ে এই সুনিয়মের প্রবর্ত্তন বিষয়ে এখনও এতাদৃশ উদাসীন রহিয়াছেন।

বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজা মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর এবিষয়ে বঙ্গ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রধান শাস্ত্রব্যবসায়ী মহাশয়দিগের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত মতের সংকলন করিয়া মহারাজা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। সেই পুস্তক দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, মোট ৫৯ জন পণ্ডিতের মধ্যে ৩৩ জনের মত অনকূলে, অবশিষ্ট ২৬ জনের মত ইহার প্রতিকূলে। ব্রাহ্মণের সমাজস্থল গুপ্তিপাড়া ও ভাটপাড়ার সমস্ত অধ্যাপক মহাশয়েরাই কহিয়াছেন, বিলাত গেলে জাতিনাশ হইবে না। কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলিয়াছেন। নবদ্বীপের দুইজন প্রধান অধ্যাপক ইহার অনুকূলে মত দিয়াছেন। দিনাজপুর, বর্দ্ধমান কলিকাতা ও মুরশিদাবাদের অধ্যাপকবর্গও বিলাত গমনে জাতিনাশের কথা সরলভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে বঙ্গের শিরশ্চূড়ামণি অধ্যাপক মহাশয়েরা সরলভাবে স্ব স্ব অভিমতি ও সম্মতি প্রকাশ করিয়া আপনাদের পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে এ কার্য্য অনিষ্টকর ও পাপজনক হইলে, ইহাঁরা কখনই অনুকূল মত দিতেন না।

সম্প্রতি বঙ্গের অন্যতম শিরোরত্ন স্বর্গীয় লোকারাম শিরোরত্ন মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে সমবেত প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ, সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক প্রসিদ্ধনামা শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয়ের সহিত বিচারকালে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিলাত-প্রত্যাগত হিন্দুদিগকে সমাজে গ্রহণ করা যুক্তিসংগত ও আবশ্যক। এই সময়ে এ বিষয়ের স্থির মীমাংসা করিবার জন্য কলিকাতায় একটি সভা আহ্বান ও বঙ্গের নানা স্থানের অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করা বড় আবশ্যক হইয়াছে। বোধ হয়, কোন দেশহিতৈষী ধনাঢ্য মহাশয় মনে করিলেই এটি সম্পন্ন হইতে পারে।

এটি যতদিন কার্য্যে পরিণত না হইতেছে, তত দিন হিন্দুর প্রকৃত মঙ্গল সুদূরপরাহত। দেশের ও সমাজের হিতকাম কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা দলে দলে সমাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন—যাঁহারা একবার বিলাত যাইতেছেন, হিন্দুসমাজ আর তাঁহাকে পাইতেছেন না। এইরূপে হিন্দুসমাজ দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। হিন্দু-সমাজের হৃদয়ের এক একখানি পেশী ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। সুরেন্দ্র নাথ, লালমোহন প্রভৃতি

ভ্রাতৃবর্গকে ছাড়িয়া যে, হিন্দু কেমন করিয়া আজিও স্থির হইয়া থাকিতেছে, বলিতে পারি না। ইহাঁদিগকে সমাজে গ্রহণ করিলে, সমাজের সৌন্দর্য্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইবে সমাজের এই অবসন্ন ভাব একবারে দূরে যাইবে। ইহাঁরা অনেক বিফল চেষ্টা করিয়া পরিশেষে মিলনবিষয়ে হতাশ হইয়া সাহেবের দলে সাহেব হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু ভ্রাতৃস্নেহ এখনও পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। আমরা তাঁহাদের অজ্ঞান ভ্রাতৃবর্গ, তাঁহাদের জন্য কিছুই করিতে পারিতেছি না কিন্তু তাঁহারা প্রাণপণে আমাদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। তাই বলি, হিন্দুসমাজের নেতৃগণ! বৃথা জাত্যভিমান ছাড়িয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় যাহাতে মিলন হয় তাহার চেষ্টা করুন। তাহাতে দেশের ও সমাজের আশাতীত মঙ্গল হইবে। জাতিগত ও আচারগত অভিমান যখন সম্পূর্ণই প্রণষ্ট হইয়াছে, তখন আর অনর্থক উপযুক্ত ও কৃতবিদ্য কয়টি হিন্দুকে কেন সমাজচ্যুত রাখিয়া আপনাদের আশা ভরসার পথে কণ্টক রোপণ করা?

নরসিংহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক,—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ভাগ্যদেবের সভা।

ভাগ্যদেব সিংহাসনে উপবিষ্ট।

সম্মুখে করযোড়ে আত্মাগণ দণ্ডায়মান।

১ আ। যাঁহার আদেশে কাঁপে আকাশ, ধরণী—
জলধি উপরে কিবা নীরদ বাহনে
যান যিনি,—রাজদণ্ডে সসম্ভ্রমে মানি
যাঁর, পঞ্চভূত মিশে শূন্যে কি গগনে—

২ আ। ঝটিকা যাঁহার শ্বাসে কাঁপায় সাগরে,
যাঁহার কথায় হয় জলদ-গর্জ্জন;
রবিকরে যাঁর দৃষ্টি আভা দান করে,
ঈষৎ কম্পনে যাঁর পৃথিবী-কম্পন—

৩ আ। যাঁর পদস্পর্শে উঠে আগ্নেয় ভূধর,
ছায়া যাঁর মহামারী—যাঁর ক্রোধানল
ফেলে সদা শূন্য হতে দগ্ধ কলেবর
গ্রহ, ধূমকেতু কিম্বা নক্ষত্র মণ্ডল—

সকলে। ব্রহ্মাণ্ডজীবন যিনি ব্রহ্মাণ্ড-মরণ,
মানবের সুখ দুঃখ ইচ্ছায় যাঁহার,
অনুগত ভৃত্য যাঁর সমর, শমন—
নমি সেই ভাগ্যদেবে জগৎ-আধার।

(নিয়তিগণের প্রবেশ)

নি। (সকলে)—
কুবের, বরুণ যম, পবন, তপন,

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, চন্দ্রমা, গগন,
যেই ভাগ্যদেবে সবে সদাই সম্ভ্রমে,
নিয়তিরা আজি তাঁরে বিনয়ে প্রণমে।

(নরসিংহের প্রবেশ)

১ আ। একি!
মানব আইল হেথা কোন্ পুণ্যফলে?
ভাগ্যাধীন যম, নর যমের অধীন।—
কি সাহসে রে দুরাত্মা! পশিলি এদেশে—
কি প্রভাবে?—কোন্ বলে,বুঝিতে না পারি
সশরীরে ভাগ্যপুরে আইলি মানব?
জানু অবনত করি সম্ভ্রমের সহ
করযোড়ে সবিনয়ে, রে ভূতলবাসী
পাপী নর, ভাগ্য-দেব-চরণ-কমলে
এখনি প্রণাম কর—

২ আ। জানি আমি নরে
অসীম ক্ষমতা এঁর, বিদ্যা আমানুষী।

৩আ। রে পাপাত্মা, ভাগ্যদেবে এত তুচ্ছ বোধ?
প্রভুর ক্ষমতা তোর অজ্ঞাত কি তবে?
ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবে কর প্রণিপাত
শীঘ্র করি, এ বিলম্ব কিসের কারণে?

৪ আ। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত তোর পাপ দেহ আজি,
রে কলুষপূর্ণধরা-নিবাসী মানব,
নত কর ভাগ্যদেব-পদতলে ত্বরা—
নতুবা অদৃষ্টে তোর বিষম প্রমাদ।

নর। জানি; তবু দেখ মম—ভাগ্যের সম্মুখে
উন্নত মস্তক—জানু নহে অবনত।
জীবনে বিনত হ'তে শিখিনি কখন(ও),
কিন্তু কি করিব? এবে হয়েছি বিনত।
জীবের অথবা কোন(ও) আত্মার সম্মুখে
নহি অবনত কভু; নিষ্ফল, নিরাশ,
আত্ম-সর্ব্বনাশ, আমি এদেরি সম্মুখে
অবনত—হীনবল—এ কয় বৎসর।
নীচতার শেষ সীমা দেখিনু নয়নে,
অপমান এ জীবনে কি আছে এ হ'তে?

২ আ। সমস্ত পৃথিবী নমে যাঁহার সম্মুখে,
যাঁর নামে ত্রিভুবন সদা কম্পমান্—
কি সাহসে বল নর সেই ভাগ্যদেবে
পূজিতে বিরত তুমি?—প্রণম সম্ভ্রমে।

নর। ভাগ্যদেব যাঁর আজ্ঞা সতত সম্মানে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি অনন্ত, অনাদি,
অচিন্ত্য, তাঁহার পদে ভাগ্যদেব সহ
আইস সকলে মোরা নমি সসম্ভ্রমে।

১ আ। তুচ্ছ কীট নর,—এরে বিনাশ এখনি;
এত স্পর্দ্ধা নরে? ফেল খণ্ড খণ্ড করি!

১ নি। সর সবে—যাও দূরে—কার সাধ্য হেন—
নিয়তি-রক্ষিত নরে বিনাশ করিবে?
ভাগ্যদেব, এই নর সামান্য হইলে
আসিতে কি পারে হেথা? আমাদের মত
অমর্ত্ত্য যন্ত্রণারাশি ভুগেছে অসীম;
ধূলি-বিনির্ম্মিত-দেহ কোন(ও) নর কভু
এত শক্তি, এত জ্ঞান, করেনি ধারণ;
মহীতলবাসী কোন(ও) মানব কখন(ও)
এর মত উচ্চ আশা করেনি জনমে।—
সেই উচ্চ আশাবলে, বহু কাল পরে
বহু দুঃখ সহি, বহু সাধনার ফলে
জানিয়াছে জ্ঞানে সুখ নাহিক কখন(ও);
অজ্ঞানতা বাড়ে শুধু জ্ঞানের কারণ।
সুধু ইহা নহে দেব, সর্ব্ব রিপুচয়,
মায়ামন্ত্র, হৃৎপিণ্ড পিষেছে ইহার—
এ প্রদেশে কোন(ও) আত্মা নাহি এর মত,
কাহার(ও) ক্ষমতা নাই ইহার উপরে।

প্রতি। কেন তবে আসা হেথা?

১ নি। জিজ্ঞাস উহাঁরে।

নর। অজ্ঞাত নহে ত কিছু তোমাদের কাছে
জ্ঞাত যা আমার কাছে—কিন্তু শক্তি হেন
সবারই অজ্ঞাত যাহা, এসেছি বুঝিতে।
পৃথিবী ঘুরেছি আমি ইহার(ই) কারণে।

প্রতি। কি জানিতে আসিয়াছ?

নর। তুমি কি গো তাহা

পারিবে বলিতে মোরে? মৃত মানবেরে

পুনঃ বাঁচাইতে হবে, সেই যদি পারে।

প্রতি। (ভাগ্যদেবের প্রতি)

কি আজ্ঞা তোমার দেব? এই মর্ত্তবাসী

চাহে যাহা তব আজ্ঞা ব্যতীত কিরূপে

দিব তাহা? ভাগ্যদেব, কিবা অনুমতি?

ভাগ্য। তুষ্ট মানব সবে—

প্রতি। (নরসিংহের প্রতি)

বল তবে কারে

ডাকিব—

নর। ব্রহ্মময়ী—ডাক তারে আমার সম্মুখে।

প্রতি।

এস ব্রহ্মময়ি, ভাগ্যের সকাশে,

ধূলি-বিনির্ম্মিত শরীর তোমার,

মিশেছে যদিও মাটীতে আকাশে,

আত্মাতে তোমার আছে অধিকার।

যেরূপ আকৃতি, যেমন হৃদয়

আছিল তোমার অবনীতলে,

লইয়া আজিও সেই সমুদায়

মম ভাগ্যদেব-চরণ-তলে।

যে তোমারে সেই স্থানে করেছে প্রেরণ,

সেই তোমা আজি হেথা করে আবাহন।

(ব্রহ্মময়ীর আত্মার ব্রহ্মময়ীর

বেশে অবতরণ।)

নর।

এই কি মরণ? আহা বিমল কপোলে

সেই সে গোলাপী আভা তেমনি সুন্দর!

নয়নে, বদনে, বক্ষে, কোন(ও) স্থানে কিছু

পরিবর্ত্ত বিন্দুমাত্র পাই না দেখিতে।

সেই ব্রহ্মময়ী মম, ব্রহ্মময়ী কেন,

অভাগার প্রাণভূত সেই প্রেমময়ী।

এই কমনীয় কান্তি দেখিবার তরে

কত দুঃখ সহিয়াছি, কিন্তু হা কপাল!

চির শান্তিময়ী মূর্ত্তি, কৌমুদীরূপিণী,

এ মুরতি প্রতি আজি চাহিতে হৃদয়ে

হেন দুর্ব্বলতা কেন? রসনা অবশ?

কথা কহিবারে কিন্তু বলগো তোমরা,

এ পাপ কি ব্রহ্মময়ী ক্ষমিবে আমার?

১ নি। যে ক্ষমতা-বল রমণি, তোমারে

আনিয়াছে আজি শ্মশান হইতে,

সে ক্ষমতাবলে আদেশি তোমারে,

কথা কহ এই মানব সহিতে।

নর। তবু কথা কহিবে না? এই নীরবতা

তব মনোভাব কিন্তু করিছে জ্ঞাপন।

উঃ!

১ নি। মম শক্তি নাহি আর—প্রভু, ভাগ্যদেব

করুন আদেশ ওরে, কথা কহিবারে।

ভাগ্য। দেখ রাজদণ্ডে চাহি, রমণীমুরতি,

রাজাজ্ঞা পালনে এবে হও যত্নশীলা।

২ নি। এখন(ও) নীরব, দেব, আমাদের বশে

নহে এই আত্মা তবে। উচ্চতর কোন(ও)

ক্ষমতা-অধীন ইহা;—মানব, তোমার

বিফল প্রয়াস আজি, কি করিব বল?

নর। ব্রহ্মময়ি—প্রিয়তমে—দেখ নিরখিয়া

অভাগারে এত দুঃখ তোমার কারণে

সহিয়াও কেন বল রয়েছি বাঁচিয়া?

কতই বিকৃতি দেখ হয়েছে জীবনে!—

শ্মশান তোমারে তত করেনি বিকৃত,

তোমার ভাবনা যত করেছে আমারে।

অই চিন্তা ভিন্ন কিছু জানে না এ চিত—

কত কাল র'ব বল এ পোড়া সংসারে?

প্রেমময়ি! জানি তুমি আমারে জীবনে

কত ভালবেসেছিলে; উন্মত্ত হৃদয়

দোঁহার, দোঁহারে ছাড়া জানিত না মনে
অপরে ; দেখেনি কেহ তেমন প্রণয়।—

কিন্তু একি তার ফল ? উনমত্ত মনে
ভালবাসা পাপ কি গো ? তবে কেন বল,
দগ্ধ হইতেছি সদা এ শোকদাহনে,
মৃত্যু শান্তিদাতা মম—মরণ মঙ্গল।

কেন তবে বল আমি রয়েছি বাঁচিয়া
অভাগার প্রাণ তুমি গিয়াছ যখন,
এই তীব্রজ্বালা আমি সহিব বলিয়া ?
উঃ।—
ভালবাসা হৃদে মম কে কৈ'ল স্থাপন ?

আমার বিষাদে তুমি হও কি ব্যথিত ?
বল প্রিয়ে—এ কথাটী শুনি একবার,
বলিতে এ কথা দুঃখ পায় যদি চিত,
ব'ল না—ও মনে ব্যথা, সবে না আমার।

বল তুমি একবার সুমধুর স্বরে—
ঘৃণা নাহি কর মোরে—জীবনে আমরা
যে ভালবেসে'ছি দোঁহে, কে না জানে নরে
ভয়ঙ্কর পাপ তাহা—কলঙ্ক-পসরা ?

সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক করেছি,
জীবনে নরকভোগ হতেছে আমার—
তোমার কারণে আমি সকলি সহেছি—
সে দুঃখে পাগল মোরে করেছে সংসার।

মুহূর্ত্তেক সাধ মম নাহি এ জীবনে—
জগতের সকলেই অথচ আমার
মরণ-বারণে রত,—কল্পনানয়নে
চাহিলে ভবিষ্যে দেখি যন্ত্রণা অপার।

বল তুমি, কত দিন রহিব বাঁচিয়া ?—
বিরামলভিতে আমি পারি না এখন,
কি করি, কি দেখি সবি যাই যে ভুলিয়া,
তোমারে শুধুই হায় ভুলে না এ মন।

জীবনের ধ্রুবতারা কমলনয়ন,
তব কণ্ঠস্বর প্রিয়ে, সঙ্গীত আমার—
একবার সেই স্বর করিব শ্রবণ—
তাপদগ্ধ হৃদে বর্ষ অমৃত-আসার।

গভীর নিশীথে কত তব নাম ধরি
ডাকিয়াছি উচ্চৈঃস্বরে, চকিত হইয়া
ঘুমন্ত বিহঙ্গগণ, আতঙ্কে শিহরি
নীরব কানন মাঝে উঠেছে ডাকিয়া।

প্রতিধ্বনি তব নাম ডাকিতে ডাকিতে
কতবার তুলিয়াছে দিগঙ্গনাগণে—
আকাশ বিহ্বল তব নাম উচ্চারিতে—
প্রকৃতি জাগ্রত সদা সে নাম শ্রবণে।

তথাপি নীরব তুমি আছিলে তখন—
এখন(ও) নীরব কেন—দহিতে আমায় ?
তারাগণে কত দিন ক'র নিরীক্ষণ
খুঁজেছি তাদের মাঝে বৃথাই তোমায়।

ধরণীর সর্ব্বস্থান করেছি ভ্রমণ,
তোমার মতন কিছু পাইবার তরে,
অতুলনা তুমি প্রাণ, অমূল্য রতন,
কেমনে সে গুণ লাভ ঘটিবে গো নরে ?

শেষ ভিক্ষালাভে মোরে ক'র না বঞ্চিত—
এই অভিলাষ মোর করহ পূরণ ;
ক্রোধযুক্ত কিম্বা শুষ্ক বিরক্তি সহিত
ও মধুর স্বরসুধা কর বিতরণ।

ব্রহ্ম। নরসিংহ।

নর। বল বল, অই কণ্ঠস্বর
শুনিবার তরে আমি রহিব বাঁচিয়া।

ব্রহ্ম। নরসিংহ, কালি তব পার্থিব যাতন,
হবে অবসান, আমি চলিনু এখন।
নর। রহ, রহ, বল তুমি ক্ষমিলে আমায়?
ব্রহ্ম। যাই,—
নর। বল পুনঃ দেখা হবে কি দুজনে?
ব্রহ্ম। যাই আমি,—
নর। বল, তুমি ভালবাস মোরে?
ব্রহ্ম। নরসিংহ!

(ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তির তিরোভাব)

প্রতি। গেল চলি ব্রহ্মময়ী আসিবে না আর,
তার কথা মিথ্যা কভু হবে না নিশ্চিত,
পৃথিবীতে যাও ফিরি—
১ আ। উন্মাদের মত
চাহিতেছে দেখ নর—মানব হইয়া
অমর্ত্ত্য সামগ্রী-জ্ঞান লভিলে কি তার
এই ফল?
২ আ। দেখ কিন্তু সাধনার বলে
অসীম যন্ত্রণা সদা করিছে দমন।
এ মানব-আত্মা যদি আমাদের সহ
মিশে, জানি না তা হবে কত ভয়ঙ্কর।
প্রতি। আর কি জানিতে তব আছে গো বাসনা
ভাগ্যদেব-সন্নিধানে কিম্বা মম কাছে?
নর। কিছু না, ধরণীতলে যাব আবার—
কালি ত হৃদয় মম হইবে শীতল;
ভুলিব না তোমাদের এই উপকার—
তাপীর কেবল মাত্র মরণ(ই) সম্বল!

(প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক,—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নরসিংহের গৃহ।

নরসিংহ একাকী উপবিষ্ট।

নর। ভীষণ ঝটিকা শেষে ধরণী যেমন
প্রশান্ত মুরতি ধরে, আমার(ও) হৃদয়
আজি সেইমত ভাব করেছে ধারণ,
বহুকাল এ ভাবের হয়নি উদয়।

পার্থিব যাতনা মম হবে অবসান
আজিকে হৃদয় তাই হয়েছে শীতল,
ফুরাইবে দুঃখ আজি জুড়াইবে প্রাণ—
তাপদগ্ধ হৃদয়ের মরণ(ই) মঙ্গল।

(দীননাথ ঠাকুরের প্রবেশ)

আসুন——
দী। কুশলে সদা থাক পৃথিবীতে।
নর। তব পদার্পণে দেব, পবিত্র এ পুরী—
শান্তি দেবী আপনার চির সহচরী।
দী। নরসিংহ, জান তুমি তোমাদের তরে
কত চিন্তি, কত ভালবাসি তোমাদের;
তোমার জনক(ও) কত মানিতেন মোরে।
আজিকে হৃদয় বড় হইল ব্যথিত
শুনিয়া লোকের মুখে আশ্চর্য্য কাহিনী।
তোমাদের বংশ-জ্যোতিঃ চির সমুজ্জ্বল,
এ বংশের খ্যাতি সদা স্বদেশে বিদেশে।
সেই বংশ-ধুরন্ধর তুমিই এখন—
বংশের গৌরব যেন থাকে তব হাতে,
কুলের সম্মান যেন রহেগো অক্ষয়।
শুনিলাম মানবের যাহাদের সহ
নিষিদ্ধ আলাপ, তুমি সেই আত্মাসনে
রহ সদা—প্রেত সবে তব আজ্ঞাবহ।
নরকে নিবসে যারা—নর-অমঙ্গলে
সদা রত, তুমি নাকি তাহাদের সনে
নিয়তই কর বাস—একি কথা শুনি?
মানবের সহ তুমি মিশনা কখন(ও)
জানি আমি—ভালবাস নির্জ্জন প্রদেশে
বিহরিতে অহরহ, যোগী ঋষি মত—
কিন্তু যোগী ঋষি মত আচরণ তব

কই? দেবপূজা কোথা? ভক্তি, প্রীতি কই?
নর। একথা কাহার মুখে শুনিলা আপনি?
দী। সকলেই এই কথা বলিছে এখন।
তোমার মঙ্গল যারা সদা ইচ্ছাকরে,
দেখিয়া তোমার ভাব সবাই দুঃখিত।
নরসিংহ, আত্মা তব পতিত শঙ্কটে।
নর। নাশুন তাহারে—
দীন। আমি আসিনি নাশিতে।
রক্ষিবে জীবন তব ঐ মহাশঙ্কটে—
এই অভিপ্রায়ে আমি আসিয়াছি হেথা।
তোমার মনের ভাব চাহিনা জানিতে।
কিন্তু এই সব যদি সত্য হয়, তবে
হও সাবধান বৎস, এ সময় হ'তে।
পূর্ব্বকৃত পাপ তরে কর অনুতাপ,
পূজ দেবে—দরিদ্রেরে বিতরহ ধন।
অবশ্য তোমার পাপ হইবে খণ্ডিত।
নর। আমার উত্তর দেব, শুনুন আপনি।
যা কিছু করেছি আমি কিম্বা যাহা করি—
পাপ যদি হয় তাহা, তবু তার তরে
দেব পূজি—দরিদ্রেরে করি বিতরণ—
কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত করি সে পাপ মার্জ্জনা
না চাহি—ভ্রমান্ধ নর চাহে গো যেরূপে।
কি পাপ করেছি আমি? বলুন অমারে,
ন্যায়গত দণ্ড মোর করুন বিধান।
দীন। মানব মানবে বল দণ্ডিবে কেমনে
এ পাপে? অস্থির চিত্ত কেন তুমি এত?
দেখিয়া অধর্ম্ম তব যদি আমি তোমা'
নিবারণ নাহি করি—তা' হলে আমারে
পাপ স্পর্শে—আমি তব পিতৃমন্ত্রদাতা।
নর। বিবেচনা করি দেব, দেখুন আপনি—
প্রার্থনায়, প্রায়শ্চিত্তে, কিম্বা উপবাসে,
তিরস্কারে, শারীরিক যন্ত্রণা-বিধানে
কখন(ও) কি পাপী মনে হয় গো জীবনে
পাপের প্রতিমা তার গভীর অঙ্কিত?
কিন্তু দেব, ভাবি পুনঃ দেখুন আপনি
নিজ কৃত পাপ যেই জেনেছে জীবনে—
দোষে আপনারে সদা মহাপাপী ব'লে—
তার প্রায়শ্চিত্ত সেই—হৃদয়ে তাহার
নিজ পাপ-প্রতিমূর্ত্তি গভীর অঙ্কিত।
দীন। সেরূপ মানবমন পাইবে কোথায়?
নরসিংহ, দেখ ভাবি এখন(ও) তোমার
আশা আছে—ধীরভাবে শুন মোর কথা।
রাখ অনুরোধ মম—মিশ নর সহ।
নর। হায় দেব, কি হইবে সে কথা তুলিয়া?
মিশিতে মানব সনে কতই যতন
করেছি, সমাজ সহ মিলাইয়া মনে
নর-উপকার-ব্রতে হইতে দীক্ষিত
করেছিনু আয়োজন—ভেবেছিনু মনে
হয় ত সংসারে আমি নিজ কার্য্যবলে
লভিব উন্নত পদ, সমাজ সম্মান,
না হয় যতন মম হইবে নিষ্ফল—
হয় ত উঠিব আমি উন্নত বিমানে,
অতল জলধিগর্ভে না হয় পড়িব—
কুকার্য্য-সাধন যত্নে সে পতন মম
উন্নত হিমাদ্রি পরে গঙ্গোত্রী হইতে
জাহ্নবী-পতন সম হইবে নিশ্চিত—
কিম্বা মহীধরচূড়া বিমান ভেদিয়া
বিরাজিত, পড়ে যথা ভীম বজ্রাঘাতে
ভূমি পরে, ভূমি হতে তবু উচ্চ কত!—
আমার পতন হবে সেরূপ পতন।
কিন্তু সে সকল আশা ফুরা'যেছে এবে।
দীন। কেন বৎস?
নর। কেন আর? হৃদয় আমার
আপন মনের ভাব পারে নি বুঝিতে।
বুঝিলাম অবশেষে, প্রভুত্ব সমাজে
স্থাপিলে—নিয়ত মোর মানবের মন
বুঝিয়া চলিতে হবে,—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা
নূতন শিখিতে হবে—এ জনমে কভু

নরসিংহ পারিবে না এ সব সাধিতে।
নীচ মানবের মাঝে মহা শক্তিশালী
মান্য, গণ্য হইয়া বা কি হবে আমার?
চাহিনা সে আধিপত্য—মেষপাল সহ
চাহিনা ভ্রমিতে কভু পালক হইয়া।
মেষপাল নহে নর, দ্বিপি-পাল, তবু
অগ্রণী হইতে আমি চাহিনা তাদের।
কেশরী একাকী ভ্রমে গহন কাননে।

দীন। মানবের সহবাস এত কি ঘৃণিত?
শুন বৎস, দেখ ভাবি—

নর। কেন বৃথা আর?
সম্মানি জীবনে আমি সদা আপনারে।
বাসনা পবিত্র তব তাহাও বুঝেছি—
কিন্তু বৃথা এ সকল, সময় অতীত।
(প্রস্থান)

দীন। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) হায়!
এ সুন্দর হিয়া যদি না হ'ত বিকৃত,
সমাজ অমূল্য রত্ন পাইত ইহারে—
এত বুদ্ধি এত জ্ঞান একাধারে স্থিত,
এমন প্রতিভা নাহি মানব মাঝারে।

ন্যায়গত সদা সাধু হৃদয় ইহার
হইত শতেক গুণে আরো মনোহর;
এখন মিশ্রিত যেন আলো অন্ধকার—
এ চিন্তা হৃদয়ে মম মহা দুঃখকর।

রিপুচয় সহ সদা পবিত্র বাসনা
করিয়াছে সর্ব্বনাশ মিশ্রিত হইয়া—
পে'তেছে জীবনে এবে দুঃসহ যাতনা—
ফিরাই এ মনোগতি কেমন করিয়া?
এ আত্মার অধোগতি করি নিবারণ
কি উপায়ে, সদা আমি ভাবিতেছি তাই
দেখিব বারেক তরে করিয়া যতন—
হয় কি না হয় দেখি পুনর্ব্বার যাই।
(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০০—

নরসিংহের গৃহ।

নরসিংহ চিন্তিতভাবে উপবিষ্ট।
নিধিরামের প্রবেশ।

নি। সূর্য্যাস্ত সময়, প্রভু, জ্ঞাপন করিতে
আজ্ঞা ছিল—সে সময় হয়েছে আগত।

নর। যাও তুমি——
(নিধিরামের প্রস্থান)

গৃহের একটী জানালার নিকট নর-
সিংহের আগমন ও তাহার
কপাট উদ্ঘাটন।

নর। (সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া)
জ্যোতির্ম্ময়, অজ্ঞনর-পূজিত দেবতা,
জীবের জীবন তুমি, গ্রহগণ-পতি,
ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র তুমি—ধরণী-চালক।
তোমার অভাবে নর দিনেকের তরে
বাঁচিবেনা; হিমাবৃত পর্ব্বত-শিখর
তুমি না থাকিলে কভু নাহি ঝলসিত।
এত মনোহর চন্দ্র, তোমার(ই) প্রসাদে।
ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ আকাশে
ঈশ্বরের ছায়ারূপে বিরাজ সতত।
ঋতুগণ-পিতা তুমি, সময়ের পতি।
কি উজ্জ্বল বেশে উদি, জীবন্ত কিরণ
প্রদানিয়া নরলোকে কি মধুর বেশে
অস্তগামী হও আহা পশ্চিম গগনে!
সমগ্র বিমানে তব প্রভুত্ব স্থাপিত!
অসীম ক্ষমতা তব অনন্ত গৌরব।
হে দিনেশ, এই দেখা জনমের মত।
প্রথমে দেখিয়া তোমা' বিস্ময়ে উৎসবে
মেতেছিনু—আজি শেষ দেখিনু তোমারে।
অভাগা উপরে আর কিরণ বর্ষণ

করিতে হবে না তব—চলিল অভাগা।
দিনমণি অস্তগত, আমিও এখনি
তব অনুগামী হব—যাই তবে যাই।
(প্রস্থান)

——০০——

তৃতীয় অঙ্ক,—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নরসিংহের আবাসবাটী।
বহির্ব্বাটী।
নিধিরাম ও স্মৃতিধর উপবিষ্ট।

নি। কি আশ্চর্য্য প্রতিনিশি কত বর্ষ ধরি
অনিদ্রায় করিছেন একাকী যাপন।
এতদিন আমি হেথা রয়েছি সদাই
তথাপি কি কার্য্যে প্রভু এমন ব্যাপৃত,
কি পাঠে—কি শিক্ষালাভে নারিনু বুঝিতে।
বিরলে সে গুপ্ত কক্ষে বসিয়া বসিয়া
কি করেন, কেহ যদি কহে গো আমারে,
এ তিন বৎসর ধরি যা কিছু সঞ্চয়
করিয়াছি, সমুদয় প্রদানি তাহারে—
এত কৌতূহল মোর—
স্ম। বৃথা আশা তব।
জান যাহা সেই ভাল—
নি। সত্য বলিয়াছ।
যা জানি তাহাই ভাল—তুমিও এখানে
বহুকাল হইতে ত আছ অবিরত—
স্ম। নরসিংহ জন্মিবার কত পূর্ব্ব হ'তে
আছি আমি এই স্থানে—জনক ইহার
এঁর বিপরীত ঠিক—
নি। বল না গো শুনি,
আমাদের প্রভু পিতা ছিলেন কিরূপ।
স্ম। আকৃতিতে এঁরি মত—এঁরি মত তিনি
গর্ব্বিত, উন্নতমনাঃ সদাই আছিলা।
কিন্তু এঁর মত কভু একাকী বিজনে
নারিতেন থাকিবারে মুহূর্ত্তের তরে।
সদাই আমোদে রত—সদা হাসিমুখ।
নির্ভাবনা—দুঃখহীন—স্বাধীন সর্ব্বদা।
এঁর মত দিবানিশি পুস্তক লইয়া
জাগরণে বিভাবরী প্রভাত করিতে
কখন(ও) দেখিনি তাঁরে—যদি বা কখন(ও)
জাগিতেন নিশি, সে তা আমোদের তরে।
কত বন্ধুসনে তিনি ভ্রমিতেন সদা।
এই শিলাময় দেশে পশুর মতন
বিচরণ করিবারে নাহি ছিল সাধ।
সমাজ তাঁহার প্রাণ যেন বা আছিল।
মানবের মুখ তিনি না দেখিয়া কভু
নারিতেন থাকিবারে—পুত্র তাঁর ঠিক
বিপরীত; এঁর কথা স্মরিলে হৃদয়
তরতরি কাঁপি উঠে—
নি। কি কথা এমন?
স্ম। অদ্ভুত আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখেছি ইহাঁর।
নি। কি কাণ্ড, কি কার্য্য—তুমি কত দিন মোরে
বলিয়াছ এইরূপে; কিন্তু কি ঘটনা
ঘটিয়াছে বল নাই—বল আজি শুনি।
স্ম। বলিতে সে কথা বক্ষঃ উঠে যে কাঁপিয়া।
এক দিন সন্ধ্যাকালে—গোধূলি সময়ে—
অই যে রক্তিম মেঘ অই শৃঙ্গ'পরি
বিশ্রামিছে—অই রূপ ছিল সে সময়ে
রক্ত জলধর খণ্ড অই শৃঙ্গ পরি।
সে দিনে আজিকে বলি ভ্রম হয় মনে।
মৃদু সমীরণ ধীরে বহিতে লাগিল;
পর্ব্বততুষার-রাশি উদয়-উন্মুখ
শশীর কিরণে যেন হাসিয়া উঠিল।
নরসিংহ নিজ গৃহে ছিলেন বসিয়া;
কি কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহা তিনি বিনা কিসে
জানিবে অপরে বল? তখন একাকী
থাকিতে হ'তনা এঁর—ছিল ব্রহ্মময়ী।
এঁরি সহ সদা তারে ভ্রমিতে এখানে
দেখিতাম—দুইজনে বড় ভাব ছিল।

পৃথিবীতে নরসিংহ ব্রহ্মময়ী বিনা
বাসিত না ভাল কিছু—

নি। ব্রহ্মময়ী? কে সে?

হ। প্রভুর——কে আসে হেথা?

(দীননাথের প্রবেশ)

দী। কোথা প্রভু তব?

নি। অই গৃহে—

দী প্রয়োজন আছে তাঁর সহ।

নি। ক্ষণকাল এই স্থানে লভুন বিশ্রাম।
নির্জ্জনে আছেন তিনি, দেখা এ সময়ে
হইবে না কার(ও) সনে—

দী। যাও কহ তাঁরে
মোর কথা, যদি ইথে দোষ হয় তব
সে দোষ মার্জ্জনা আমি করাইব তোমা'।

নি। এই মাত্র প্রভু মম আপনার সহ
সাক্ষাৎ করিলা, পুনঃ কিবা প্রয়োজন?

দী। যাও তুমি, যাও ত্বরা, পাল আজ্ঞা মম—
যাও ত্বরা, দেহ তাঁরে আমার বারতা।

নি। কে এমন ভীতি শূন্য? পারিব না আমি।

দী। একেবারে যাই তবে—

নি। নহে এ সময়।
কিছুকাল এই স্থানে তিষ্ঠুন আপনি।

দী। না না না, এখনি মম তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে হবে—

নি। তা হ'লে এ দিকে
আসুন—এদিকে, তবে যান অই গৃহে।
অই গৃহে প্রভু মম র'য়েছেন এবে।

(সকলের প্রস্থান)

—০ঃ০—

তৃতীয় অঙ্ক,—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নরসিংহের ভবন।

একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে নরসিংহ
উপবিষ্ট।

নর। (গবাক্ষদ্বারে আকাশ পানে চাহিয়া)
একটী একটী করি উঠিল ফুটিয়া—
সুনীল গগন'পরে,
নীলজল সরোবরে,
তারকাকমল-রাশি ফুটিল হাসিয়া।
চন্দ্রমা উদিয়া শোভা দিল বাড়াইয়া।
চিরদিন নিশি সনে,
এইরূপে নিরজনে
দেখেতেছি এই শোভা তথাপি এ হিয়া,
এ নয়ন নহে তৃপ্ত দেখিয়া দেখিয়া।

গভীর নিশীথে বসি এরূপে বিজনে,
রজনীর এ মাধুরী দেখিয়া নয়নে,
ভুলিয়াছি আপনারে,
ভুলিয়াছি এ সংসারে,
ভুলেছি কি দুঃখ আমি সহেছি জীবনে।
এই রজনীতে বসি ডাকি আত্মাগণে
লভেছি অমর্ত্ত্যজ্ঞান,
পেয়েছি অমর্ত্ত্য প্রাণ,
শুনেছি অমর্ত্ত্য ভাষা প্রেতের বদনে।—
জীবনের ভাব আজি দেখাব মরণে।

আবার কখন(ও) বসি গভীর আঁধারে
ভাবিয়াছি এক মনে,
মানব-জীবন সনে
প্রকৃতির কার্য্যগতি বাঁধা কিবা তারে;
জ্যোছনা নিশির সহ কভু অন্ধকারে
দেখেছি তুলনা করি,
কিসে সুখী বিভাবরী,
উভয়েই মনোরম বিভিন্ন প্রকারে।
চন্দ্রমা বিতরে সুধা নিশি করে পান,
পাপিয়া মহীরে করে স্বরসুধা দান।

নিবিড় তমসাবৃত রজনীতে যেই
ধরণীর মাধুরিমা দেখেছে নয়নে,
আঁধার হিল্লোলে তরু নাচিছে পবনে

কর্কশ পেচকরব শুনিয়াছে যেই—
সেই জানে কি প্রভেদ আলোতে আঁধারে
(দীননাথ ঠাকুরের প্রবেশ।)

দীন। নরসিংহ, পুনরায় আগমন তরে
ক্ষম মোরে—শুন বৎস, পাল অনুরোধ।
শুনিয়া তোমার কথা হৃদয় আমার
ব্যথিত হয়েছে অতি—কুপন্থায় নীত
আত্মা তব; কিন্তু এবে যতন করিলে
এখন(ও) সুপথে তারে পারিবে ফিরাতে।
ছাড় প্রেত সহবাস—মিশ নর সহ—
শুন মোর কথা বৎস—

নর। কেন বৃথা আর?
ফুরা'য়েছে মম আয়ুঃ—এ সময়ে দেব,
এসেছেন কেন হেথা—যান—শীঘ্র যান।
অবিলম্বে যান, নতু বিপদ সম্ভব।

দীন। সে কি?

নর। যান শীঘ্র দেব, নতুবা এখনি
জীবন বিপদে তব পড়িবে নিশ্চিত।

দীন। কেন?

নর। কেন? তবে অই দেখুন ওখানে।

দীন। কি দেখিব? কিছুই ত না পাই দেখিতে।

(ধূম্রময় স্তম্ভের আবির্ভাব ও তন্মধ্য
হইতে একটী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির
উত্থান)

নর। অই দিকে এক দৃষ্টে দেখুন চাহিয়া।

দীন। তাইত, ভূতের মত বিকট আকৃতি
ভয়ঙ্কর, ধূম্রময় উঠিছে কে হোথা—
কোথা হ'তে? পৃথিবী কি বিদীর্ণ করিয়া?
নারকী প্রেতের দলে জননী পৃথিবী
রাখেন কি কোলে করি? না পারি বুঝিতে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ওর, তথাপি উহারে
কেন বা ডরিব আমি? কি ভয় আমার?

নর। ভয় নাই, আপনার কোন(ও) অপকার
করিবে না—কিন্তু ওর ভয়াল আকৃতি
কি জানি হৃদয়ে তব ভয়ের সঞ্চার
করে যদি, তাই বলি যা'ন হেথা হ'তে।

দীন। সে ভয় নাহিক বৎস,—কিন্তু কি কারণে
এসেছে পাপাত্মা হেথা, কিবা অভিপ্রায়ে?

ন। তাই ত। আমি ত ওরে ডাকিনি এখানে—
কেন যে এসেছে তবু নারিনু বলিতে।

দী। হায় হতভাগ্য নর, হেন সহবাসে
কেন পূত আত্মা তব কর কলঙ্কিত?
স্মরিলে তোমার দশা অন্তর আমার
আতঙ্কে শিহরি উঠে! তব প্রতি দেখ
কঠোর কটাক্ষপাত কেন বা করিছে?
তুমি বা চাহিছ কেন উন্মাদের মত?
উঃ একি!
ললাটে বজ্রের চিহ্ন গভীর অঙ্কিত
উহার, নয়ন হ'তে তীব্র অগ্নি-শিখা
নরকের, ছুটিতেছে কি ভীষণ বেগে!
রে নারকী প্রেত! কেন এসেছিস্ হেথা?
বা চলি—কি প্রয়োজন তোমার সহ?

নর। কি কারণে গতি তব এদেশে?—

মূর্ত্তি। আইস!

দী। জানি তুই ভূত, কিন্তু কে বল আমারে।

মূ। প্রতিভা ইহার আমি—আইস ত্বরায়—
সময় অতীত হয়, এস নর এস!

নর। সদাই প্রস্তুত—কিন্তু কভু নাহি মানি
আজ্ঞা কারো—কে তোমারে প্রেরিয়াছে
হেথা?

মূ। জানিবে এখনি, নর, এস শীঘ্র এস!

নর। কার আজ্ঞামতে আমি যাইব? কেন বা?
কি ক্ষমতা ধর তুমি? প্রভু বা তোমার
কি ক্ষমতা ধরে? আত্মা কত উচ্চতর,
আমার শাসন সদা সম্ভ্রমে সম্মানে।
কি ভয় তোমারে মম? যাও হেথা হ'তে।

মূ। মানব সময় তব হয়েছে আগত,

শুন মোর কথা, ত্বরা, আইস এখনি।
নর। জানি আমি কাল মম হয়েছে আগত—
কিন্তু তব সহ আমি যাইব না কভু—
তব হস্তে এ আত্মারে কেন সমর্পিব?
যাও তুমি চলি। আমি জীবনে যেরূপে
বাঁচিয়াছি, সেইরূপে মরিব একাকী।
মৃ। ডাকিতে হইল তবে সহচরগণে।
আবির্ভূত হও সবে—
(প্রেতদলের আবির্ভাব)
দীন। রে নিরয়বাসী
প্রেতগণ!—হেথা হ'তে কর্ পলায়ন—
পুণ্য ধর্ম্মরাজে যেথা কি করিবি তোরা
সেখানে, তোদের শক্তি কিছু নহে তথা।
আমিও—
১প্রেত। প্রাচীন নর, তোমার বচন
অজ্ঞাত নহেত; কেন বৃথা নিয়োজিবে
পূত শব্দমালা তব? কর্ত্তব্য মোদের
জানি ভালমতে মোরা—এ মানব-আয়ুঃ
ফুরা'য়েছে। পুনঃ মোরা ডাকিতেছি,এস।
নর। যাও চলি সবে শুন—যদিও হৃদয়
গমনে উদ্যত মম হয়েছে, তথাপি
তোমাদের আজ্ঞাধীনে যাব না কখন(৩)।
মৃ। এই কি সে নরসিংহ? হৃদয় যাহার
তুচ্ছ মানবেরে ঘৃণি আমাদের সনে
মিশিত গো নিশিদিন—অমর্ত্ত্য সকলে
যার আজ্ঞা নিয়তই পালিত বিনয়ে।
এই কি সে নরশ্রেষ্ঠ? মর্ত্ত্যপ্রাণ তবে
এত ভালবাসা-পাত্র কেন এর কাছে?
নরসিংহ, যে জীবনে এত দুঃখ তুমি
সহিয়াছ—তার প্রতি এত অনুরাগ?
নর। মিথ্যা কথা—রে দুরাত্মা, নরকের কীট,
জানি আমি আয়ুঃ মম হয়েছে নিঃশেষ—
চাহি না বাঁচিতে আমি মুহূর্ত্তের তরে—
শমনের সহ নাহি বিবাদ আমার—
কিন্তু তুই কিম্বা তোর্ এই সঙ্গিদল,
এসেছিস্ তোরা, কেন আমার সকাশে?
যে জ্ঞান যে শক্তি আমি লভিয়াছি তাহা
তোদের প্রসাদে নহে—নিজ বিদ্যা বলে।
দুঃসহ যাতনাফলে, অসীমসাহসী—
অমানুষী কার্য্যক্রমে, নিশি জাগরণে,
হৃদয়ের তেজে—আমি সেই শক্তিবলে
বলেছি, বলিব পুনঃ যা তোরা চলিয়া।
পদাঘাতে দূর নহে করিব এখনি।
মৃ। কিন্তু ভাবি দেখ নিজ কলুষের কথা—
কি পাপে হৃদয় তব কত কলঙ্কিত,
দেখ ভাবি—
নর। কিন্তু তাহে কি হইবে ফল
তোদের? তোরা কি মম পাপশাস্তিদাদা?
শতগুণে মহাপাপী নারকী পিশাচ
দণ্ডিবে কি পাপী নরে? যা চলি নরকে
উপযুক্ত ধাম তোর—জানি আমি কিছু
এ মোর হৃদয়ে তোর নাহিক ক্ষমতা।
এ আত্মা অধীনে তোর কভু না যাইবে।
আমার পাপের ফল আমিই ভুঞ্জিব।
মানসে যে জ্বালা আমি সহেছি জীবনে
সেইত নরকবহ্নি—তার চে'য়ে আর
ঘোরতর দণ্ড কিবা আছে পরলোকে?
তুই কি করিবি মোর? যা চলি এখনি।
আপন আত্মারে আমি করেছি বিনাশ—
এ হৃদে অনলকুণ্ডে দিয়াছি ফেলিয়া।
সহিব সকলি নিজে—যা চলি পামর!
শীঘ্র পলায়ন কর্, নতুবা এখনি
পাবি সমুচিত দণ্ড—দূর হ, আরকি!
(প্রেতগণের তিরোভাব)
দীন। হায়রে! মুরতি তব হয়েছে মলিন
ওষ্ঠাধর শ্বেত বর্ণ করেছে ধারণ—
কাঁপিতেছে বক্ষঃস্থল, চক্ষু তেজোহীন—
রুদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন না সরে বচন।

পূর্ব্বকৃত পাপ তরে এখন(ও) প্রার্থনা
কর বহু নরসিংহ,—ঘুচিবে যাতনা।

নর। আর কেন? চক্ষে আমি না পাই দেখিতে,
ঘুরিছে ধরণী যেন—কাঁপিছে চরণ—
চলিনু, থাকুন সদা সুখে পৃথিবীতে—
তাপদগ্ধ জীবনের শান্তিই মরণ?

দীন। হায়, হায়, শুনিলে না, এখন(ও) বারেক
কর পরমেশ নাম,—দয়াময় তিনি,
ক্ষমিবেন পাপ তব—মরণ সময়ে—
অনেক যন্ত্রণা তব হইবে লাঘব।

নর। মৃত্যু মর্ত্ত্য দুঃখ দেব, করে সংহরণ—
তাপীর কেবল মাত্র শান্তিই মরণ।

(নরসিংহের পতন ও মৃত্যু)

দীন।
নরসিংহ! নরসিংহ! প্রাণশূন্যদেহ
রয়েছে পড়িয়া, আত্মা গিয়াছে ছাড়িয়ে—
কিন্তু কোথা গেল, পারে বলিতে কি কেহ?
যাই এবে—এইরূপে কি হবে ভাবিয়া?

(প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

সমাপ্ত।

বিদ্যুল্লতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

চন্দননগরে ভাগীরথী-তীরস্থ কোন বাটীর কক্ষমধ্যে পর্য্যঙ্কোপরি একটী স্ত্রীলোক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার একপার্শ্বে সেই পালঙ্কে বসিয়া আর একটী স্ত্রীলোক নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। অপর পার্শ্বে হর্ম্ম্যতলে জানু পাতিয়া পর্য্যঙ্কের উপর বাহুদ্বয়ে ভর করিয়া পরিচিত সাহেব—বেশী শায়িত রমণীর মুখের দিকে একদৃষ্টে অতি বিষণ্ণভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। শায়িত রমণী পীড়িতা, পীড়িতার মুখমণ্ডল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; আর তাহার গ্রীবা হইতে পা পর্য্যন্ত একখানি বিলাতী কম্বলে ঢাকা রহিয়াছে। সে অসাড়, সজ্ঞাশূন্য! ঘরটী নিস্তব্ধ, ঘরের মধ্যস্থিত তিন ব্যক্তিই নিস্তব্ধ, ঘরের বাহিরেও নিস্তব্ধ, তখন জগতও নিস্তব্ধ, দ্বিপ্রহর রজনী অতীত হইয়াছে। শব্দের মধ্যে নিকটস্থ প্রবাহিনীর মৃদু কল্লোল নিস্তব্ধ শূন্যাকাশে মৃদু মৃদু প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

রোরুদ্যমানা রমণী ভাবিতেছে,—কালব্যাধি উপশম হইবার নহে, নির্দ্দয় কাল পীড়িতার জীবনপুষ্প অকালে ছিঁড়িয়া লইবার উপক্রম করিতেছে—ভাবিতেছে আর কি, হয়ত পরক্ষণেই সকল ফুরাইয়া যাইবে,—সে একবার করিয়া শায়িতা রমণীর মুখের দিকে চাহিতেছে, আর হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

সাহেবের চক্ষে একবিন্দুও বারি নাই সত্য কিন্তু তাঁহার চিত্ত কেমন এক অভাবনীয় শোকে নিমজ্জিত; কিসের জন্য রমণীর মুখ দেখিয়া অত অধীর হইয়াছেন তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না, রমণীকে বাঁচাইতে পারিবেন এই আশয়ে, আবার তাহার পরই সেই হেতু-শূন্য-শোকে তাঁহার হৃদয় ক্রমান্বয়ে ভাসমান ও নিমজ্জিত হইতেছে,—তিনি নীরবে থাকিয়া দূরচিন্তায় চিত্তের স্থৈর্য্য বিসর্জ্জন করিয়া দেখিয়াছেন, সকল চিন্তাই অসঙ্গত বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছে, অথচ কি যেন তাঁহার মনে আসিতে আসিতে আসিতেছে না, তাই তিনি অত অধীর হইয়াছেন বুঝিতে পারিতেছেন। উপবিষ্টা রমণীকে কহিলেন "ইহাঁর পরিচয় দিতে বাধা কি? পরিচয় পাইলে আমরা বরং লোক পাঠাইয়া ইহাঁর আত্মীয়গণের নিকট সংবাদ দিতে পারি, তুমি বল, ইনি কে,—তুমিই বা ইহাঁকে দেখিয়া অমন করিয়া আছাড়িয়া পড়িলে কেন?" রমণী উত্তর করিল না, আরও কাঁদিয়া উঠিল।

এমন সময় আরও দুইজন পুরুষ সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব অমনি ত্রস্তে গাত্রোত্থান করত আগন্তুক দ্বয়ের একজনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অতি কাতর স্বরে কহিলেন "ডাক্তার বাবু, ইহাঁকে আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি, দেখুন, যদ্যপি বাচাঁইতে পারেন, আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন, আর এই নীরাহারা রমণীও আপনার কৃতজ্ঞতাপাশে চির আবদ্ধ রহিবে।"

ডাক্তার বাবু সাহেবের কথায় কোন উত্তর না দিয়াই রমণীর নিকটে গিয়া বসিলেন, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অতি সতর্ক ভাবে পীড়িতার হাত দেখিলেন, হাত ছাড়িয়া দিয়া পার্শ্বস্থিত স্ত্রীলোকটীকে নিকটে প্রদীপ আনিতে বলিলেন। সে স্ত্রীলোকটী উঠিয়া প্রদীপ লইয়া নিকটে আসিতেছিল, পীড়িতার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, প্রদীপ পড়িয়া যায় দেখিয়া সাহেব স্বয়ং তাহার হাত হইতে দীপ লইলেন। স্ত্রীলোকটী সেই খানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। সাহেব দীপ নিকটে আনিলে ডাক্তার বাবু ধীরে ধীরে রমণীর মুখের আবরণ সরাইয়া দিয়া তাহার মস্তকে যে একখানি চেলির কাপর জড়ান ছিল আস্তে আস্তে তাহা খুলিয়া দেখিলেন। আঘাত সাংঘাতিক নহে, রক্তস্রাব বন্ধ হইয়াছে, ডাক্তারের মুখে কথা ফুটিল—তিনি বলিলেন "আপনারা অত চিন্তিত হইবেন না, আশঙ্কা প্রযুক্তই ইনি এত মুর্চ্ছান্বিত হইয়া থাকিবেন" এই বলিয়া পুনর্ব্বার মস্তকের যথা স্থানে সেই চেলীর বস্ত্রখানি জড়াইয়া দিলেন। বলিলেন "এই কাপড়খানি বাঁধিয়া দিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিলেন।" তাহার পর রমণীর পরিচয়সম্বন্ধে ইংরাজিতে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রাতে আবার আসিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী তাঁহারই সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

স্ত্রীলোকটী পালঙ্কে পূর্ব্ববৎ উঠিয়া বসিল, সাহেবও পূর্ব্ববৎ জানু পাতিয়া পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সাহেবের শুধু সেই রমণীর মুখ খানি মনে পড়িতেছে—হায়, সে মুখ খানি বিবর্ণ, বিকৃত, রক্তের লেশশূন্য! কে যেন ভিতরে ভিতরে মুখের স্বাভাবিক লাবণ্য শোষণ করিয়াছে! স্বচ্ছ কাচাবৃত

নির্ব্বাণোন্মুখ অনলশিখার ক্ষীণ জ্যোতি সেই কাচের উপর যেরূপ অনুজ্জ্বল প্রভাসিত হয়, রমণীর গৌরবর্ণ নির্ব্বাণোন্মুখ পরমায়ু-শিখার ক্ষীণতাবশতঃ উজ্জ্বলত্ব-শূন্য হইয়াছে; সে লাবণ্যের জীবন্তবৎ দশা আর নাই। পূর্ব্বে সাহেবের যে আশা বলবতী ছিল—ডাক্তারের মুখে রমণীর বাঁচিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে শুনিয়াও, সেই রক্তশূন্য, বিবর্ণ, বাক্‌শূন্য বদনখানি মনে করিয়া সাহেব এখন সেই আশা পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। সম্মুখে সে স্ত্রীলোকটী কাঁদিতেছিল, তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন—তখনই রুমাল দিয়া অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন—সে স্ত্রীলোক তাঁহার নীরব রোদন দেখিতে পাইল না। এখন সাহেবের একান্ত ইচ্ছা, যে কেহ হউক না, আসিয়া তাঁহাকে রমণীর পরিচয় প্রদান করুক—ঘোর চিন্তা এবং অনিশ্চিতহেতু শোক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করুক।

নিকটে যে স্ত্রীলোক বসিয়া রহিয়াছে সে রমণীর পরিচয় জানিয়াও তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতেছে না, তিনিও, তাঁহার প্রাণের ভিতর কেমন তেমন করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ সেইরূপ স্থির ভাবে থাকিয়া নীরবে একবার উঠিয়া আসিলেন, দেখিতে আসিলেন, রমণীর জন্য ঔষধি লইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী প্রত্যাগমন করিতেছেন কি না। মুক্ত বাতায়নে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। একখানি গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল।

যে ব্যক্তি ডাক্তারের সহিত চলিয়া গিয়াছিলেন—তিনিই ঔষধ লইয়া আসিয়াছেন—তিনিই সাহেবের সমভিব্যাহারী; রমণীকে ঐ বাটীতে রাখিয়া পূর্ব্বে ডাক্তার বাবুকে আনিতে গিয়াছিলেন, এখন ঔষধ লইয়া আসিলেন। সেবনের ঔষধ লইয়া রমণীকে সেবন করাইয়া দিলেন, আর সেই পরিমাণে প্রতিঘণ্টায় একবার করিয়া সেবন করাইতে স্ত্রীলোকটীকে বলিয়া দিলেন। আর যে একটী ঔষধ ছিল, মস্তকের সেই আহতস্থান খুলিয়া তাহাতে লেপন করিয়া দিয়া পূর্ব্বমত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। তখন উভয়ে সেই স্ত্রীলোককে সতর্ক থাকিতে বলিয়া সেই রমণী সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ।

খদ্যোৎপুঞ্জ।

বিফল চুম্বন-চেষ্টা।—তাড়িতের শক্তি দ্বারা নানাপ্রকার হিতকর ও অহিতকর কাণ্ড নিয়তই সংঘটিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি গ্রন্থবিশেষে তাড়িত-রহস্য বর্ণন প্রসঙ্গে এক কুটিল-স্বভাবা কামিনীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ঐ কামিনী পরমা সুন্দরী ও পূর্ণযুবতী অথচ নিতান্ত রহস্যানুরাগিণী। কামিনী ঘোষণা করিলেন যে, যে পুরুষ তাঁহার অধর

চুম্বন করিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহাকে তিনি নির্দ্দিষ্ট অর্থ দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন। এ অসম্বরণীয় লোভ অনেককেই আকর্ষণ করিল। চুম্বন-লোলুপ ব্যক্তিবৃন্দ সমবেত হইলে যুবতী অলক্ষিত উপায়ে তাড়িত-যন্ত্রের সাহায্যে স্বীয় দেহ তাড়িতপূর্ণ করিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। চুম্বন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণের একজন সর্ব্বাগ্রে মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তাঁহার গণ্ড যুবতীর গণ্ড-সমীপবর্ত্তী হইবা মাত্র তথা হইতে এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইয়া চুম্বনার্থীর গণ্ডে আঘাত করিল। তিনি সভয়ে পশ্চাৎ-পদ হইলেন। একে একে সকলেই এইরূপে ভগ্নমনোরথ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিলেন। যুবতীর জয় হইল।

—০০—

নিশ্বাস-বায়ু।—শ্বাসনালী হইতে নিক্রান্ত নিশ্বাসবায়ু যে বিশেষ অস্বাভাবিক অবস্থায় বহির্গত হয় তাহার একটী সুন্দর ও সহজ প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

যদি অর্দ্ধ গ্লাস পরিমিত সদ্যঃপ্রস্তুতীকৃত চূণের জল কোন প্রকার চোং বা নল মুখে লাগাইয়া শ্বাসনালী পরিত্যক্ত বায়ুর সহিত কিয়ৎকাল মাত্র সংলগ্ন করা যায় তাহা হইলে অবিলম্বে ঐ চূণের জল বিকৃত হইয়া যাইবে এবং তাহার নিম্নভাগে শ্বেত পদার্থ জমাট বাঁধিয়া যাইবে।

—০০—

শব্দবিদ্যা (Ventriloquism)।—নানাপ্রকার শব্দানুকরণ ও তত্তৎ শব্দ বিভিন্ন স্থান হইতে সমুৎপন্ন করিবার কৌশল ইংরাজিতে বেণ্ট্রিলকিজম্ (Ventriloquism) নামে খ্যাত। আমাদের দেশের হরবোলাগণ যত প্রকার শব্দ উৎপাদন করে, তৎসমুদায়ই তাহাদের মুখ হইতে আসিতেছে বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু বেণ্ট্রিলকিষ্টেরা এক স্থানে বসিয়া থাকিবে আর অন্য দিক হইতে শব্দ নির্গত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে বিস্মিত করিবে। আমাদের দেশের অনেক 'ভুতুড়ে রোঝা' এই শব্দবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল শুনা যায়। তাহারা ভূত নামাইবার পূর্ব্বে উপস্থিত লোকদিগকে ভূতের কথা শুনাইবার ছলে বেণ্ট্রিলকিজম্ করিয়া একবারে জ্ঞানশূন্য করিয়া দিত এবং তখন যাহা বলিত, কেহ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র করিতে পারিত না। ভূত যাহার আজ্ঞা অমান্য করিতে অক্ষম হইয়া সকলের সমক্ষে কথা কহিল, তাহার কথায় অবিশ্বাস করিতে কাহার ভরসা হয়? এই রূপে ভুতুড়ে রোঝার ভেকধারী বেণ্ট্রিলকিষ্টেরা লোকের নিকট হইতে অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। কোন কোন দেবালয়ের পূজকেরা এই বিদ্যার প্রভাবে লোককে দেবদেবীর প্রত্যাদেশ শুনাইয়া প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির প্রবল ভক্তি ও বহুল রস আকর্ষণ করিয়া আপনাদের অর্থলালসার তৃপ্তিবিধান করিতেন। এখন আর ভুতুড়েও নাই সুতরাং ভেকধারী বেণ্ট্রিলকিষ্টও নাই। ভূতের সঙ্গে সঙ্গে বেণ্ট্রিলকিজম্ও দেশ ছাড়িয়াছে।

বেণ্ট্রিলকিজম্ প্রতিধ্বনিমূলক মাত্র। মনে করুন, আপনি রাত্রিকালে গঙ্গার তীরে বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ দূরে একটী তোপধ্বনি হইল। আপনার কর্ণে সেই শব্দ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গঙ্গার স্থিরবক্ষ কাঁপাইয়া ঘোররবে প্রতিধ্বনি হইবে; আপনার বোধ হইবে গঙ্গার বক্ষেই যেন সেই শব্দটি উৎপন্ন হইল। বেণ্ট্রিলকিজম্ও ঠিক সেইরূপ। যেস্থান হইতে শব্দ উৎপাদন করা উদ্দেশ্য সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া সে যেমন

ইচ্ছা তেমনি শব্দ সেই উদ্দেশ্যস্থান হইতে শুনাইতে পারে। ইহাদ্বারা এককালে একস্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রকার শব্দ করা যায়।

মৃত জীবশরীর হইতে কঙ্কাল-বহিষ্করণের উপায়।—শারীর স্থান প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে, অখণ্ডিত জীবকঙ্কাল বিশেষ আবশ্যক। কোন জীবদেহের কঙ্কাল গ্রহণ করিতে হইলে, তাহা একটি বহুচ্ছিদ্র বাক্সের মধ্যে সাবধানে রাখিতে হইবে। বিশেষ সতর্ক হওয়া চাই যেন কোন প্রকার চাপ পড়িয়া ভিতরের জীবশরীর অস্বাভাবিক রূপে সঙ্কুচিত বা উহার কোন গ্রন্থী ছিন্ন না হয়। এই রূপ করিয়া বাক্সটি পিপীলিকার গর্ত্তের নিকটে রাখিবে। মৃতদেহের গন্ধ পাইয়া পিপীলিকারা দলে দলে বাক্সের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক, উহার মাংস, চর্ম্ম সমুদয় ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। ইহাতে কঙ্কালের কোনঅংশ বিকৃত বা কোন গ্রন্থী ছিন্ন হইবে না। এই উপায় অবলম্বনে কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল প্রাণীর অখণ্ডিত কঙ্কাল পাওয়া যাইবে।

—oo—

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সমিতি।—আমাদের নানা বিধ ক্লেশ ও অভাবের কথা যাহাতে বিলাতের রাজপুরুষ ও জনসাধারণের নিকট যথাযথ বিদিত হয় এবং যাহাতে আমরা উদারনৈতিক মহাত্মা লর্ড রিপনের সদনুষ্ঠানগুলির সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি, এই উদ্দেশে বিলাতের ন্যায়পরায়ণ কয়েকটি মহাপুরুষ আর এতদ্দেশের কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোকে মিলিত হইয়া বিলাতে উক্ত নামধেয় একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। স্বদেশের এই মহৎ হিতকর কার্য্যের জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন; বোধ করি এ বিষয়ে যথাসাধ্য যত্নও অর্থসাহায্য করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। উক্ত সমিতির সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানপত্র আমরা স্থানাভাব বশতঃ আমাদের খদ্যোৎপুঞ্জের মধ্যে নিবেশিত করিলাম। ভরসা করি, স্বদেশ-হিতৈষী পাঠকপাঠিকাবৃন্দের পবিত্র চক্ষুতে খদ্যোতপুঞ্জের অপেক্ষা ইহা অধিকতর দ্যুতিমান বলিয়া অনুভূত হইবে।

BRITISH INDIA COMMITTEE

AND

INDIAN REFORM ASSOCIATION

PROSPECTUS FOR INDIA.

The agitation raised in England this year by a body of Anglo Indians against the present enlightened policy of Lord Ripon resulted in the formation of the British India Committee, with the object of supporting that policy. Important public meetings were held under its auspices, and circulars and pamphlets were widely distributed. The Committee was joined by a large number of independent and fearless politicians, and much timely aid was thus given in strengthening the hands of the Home Government and that of Lord Ripon, in their favourable intentions towards the people of India.

The above more immediate object having been accomplished, the Committee's attention was at once turned towards the more general and vital question of the condition and wants of the people of India, and their ability to support the present expensive system of Government. It was felt that while, on the one hand, the views and interests of the Governing class are thoroughly represented before the Parliament, Press,

and people of England, not only by the body of retired Anglo-Indians who draw no less than Rs 4,00,00,000 yearly from the Indian Treasury, but by the Indian Council who continually propagate the same views and interests in the heart of Her Majesty's Government itself, on the other hand, the views and interests of the 254,000,000 of the Governed have not hitherto been represented at all either before the Parliament, Press, or people of Great Britain, or in the counsels of its Government. With such a state of things it is not surprising that the Government and people of England have little conception of the true position subsisting at this moment in their Indian Empire.

The British India Committee have determined to supply the want above indicated. For this purpose they have resolved to assume a permanent organization under the name of the Indian Reform Association, the objects of which are :—

1st. To support the present wise and progressive policy of Lord Ripon's Government.

2nd. To co-operate with the people of India in promoting their political progress and material interests, and

3rd. To inform the British public regarding the condition of India.

Firmly convinced that the welfare of the many can never in the long run be safely left to the arbitrament of the few, more especially when the latter consist of a class or race alien from the former, and possessing widely different interests, the Indian Reform Association will take systematic measures to enlighten and organize *English public opinion* on Indian questions, assured that the English people at large will give the natives of India that sympathy, good will, and disinterested justice which they cannot always expect from those who in India are there rivals and competitors.

The chief object of the Indian Reform Association will be to qualify the British nation for passing a sound judgment on Indian questions, independently of official direction. For this purpose it will collect and bring before them all important facts as to the condition and wants of the people of India, in such form as shall be intelligible to persons not acquainted with the technicalities of Indian life and administration. This will be done through the Press, Public Meetings, Conferences, Memorials, and other means calculated to influence Parliament and the Executive Government. The Association will urge the electors of Great Britain to demand that Candidates for Parliament should qualify themselves to represent the interests of India as well as of Great Britain. Finally, the Association will sedulously promote the view urged by the present Marquis of Salisbury in a speech in the House of Commons on 24 May, 1867 viz., that "our mission in India is to develop a system of Native Government." For this end the Association will support all schemes for providing efficient Local Self-Government, including that proposed by Sir C. Trevelyan, viz. that Representative Institutions should be conferred on India on the principle of "direct election within such limits as may be safe and expendient," thereby "putting the rais-

ing and spending of the revenues into the hands of the people themselves."

With these objects in view the Association proposes to entertain in London a small but regular and efficient working staff, to carry on the following among other duties under direction of its Executive Committee :—

1 To keep a journal of all important events connected with Indian affairs.

2 To collect and keep on record all Blue Books and important official and other papers and works of reference connected with India.

3 To correspond regularly with the Branches of the Association, and with affiliated and other Native Associations in India.

4 To read all Indian Blue Books, and make briefs, precis, and extracts, in a form intelligible to all, for the use of the Association and its Branches, and for publication.

5 To communicate with Members of Government and Parliament, with Parliamentary candidates, and Political Societies throughout Great Britain, under the guidance of the Executive Committee.

6 To frame and distribute widely to the London and provincial newspapers paragraphs, notices, and articles bringing before the public of Great Britain sound views and facts relating to all Indian questions as they arise. The most important work will be carried on to an extent proportionate to the funds at disposal.

It will thus be seen that the Association is undertaking functions of a most important character, never yet systematically performed for the people of India. Under the direction of the Executive Committee an immense work may thus be done for India with a comparatively small expenditure of funds.

At the same time it is obvious that a considerable amount of funds is necessary for the efficient carrying out of the above programme, which must specially commend itself to the support of the people of India, in their own interests ; and their aid is confidently invited in order to place the Association on a sound financial basis.

A separate organization has already been formed within the House of Commons, consisting of upwards of 26 members, under the style of the "India Committee," for the purpose of studying Indian questions. This body, which made its existence felt on various occasions during last session, will be ready to utilize in Parliament the facts furnished by the Indian Reform Association.

Before leaving England last September on my usual visit to my firm in Hyderabad, I was asked by the Association to represent them in this country, to establish Branches, hold meetings, and collect funds, These functions I agreed to perform, provided it was clearly understood that my services were in every respect entirely honorary, and that I would pay all my own travelling expenses.

The Provisional Executive of the

Association, whose office is at 38 Parliament Street, London, consists of the following gentlemen, five of whom are natives of India :—

Chairman

G. B. Clark M. D., F. R. C. S. E.

Vice-Chairmen

Major Evans Bell.
J. Seymour Keay.
Hodgson Pratt.

Members of Committee.

J. N. Bannerjee.
Henry Bowers.
M. M. Bownagree.
F. W. Chesson.
William Digby. C. I. E.
R. H. W. Dunlop C. B.
K. B. Dutt.
Alfred H. Haggard.
C. C. Macrae.
Abdul Mujid.
Parkinson Oates, M. D.
Colonel R. D. Osborn.
J. Rowland.
H. H. Rajah Rampal Singh.
W. Martin Wood.

Honorary Treasurer : George Foggo.

Honorary Secretaries :

George Foggo, S. R. Geddes.

Corresponding Secretary for India :

A. K. Settna.

The present time is very opportune for the inauguration of the present scheme. The attention of the English people has been so far awakened regarding India. A strong feeling has arisen among large masses of the electors of Great Britain against keeping the natives of India out of their just rights. There is a growing conviction that officials cannot be trusted to administer the Indian Government practically without check as hitherto, and that their opinion of their own achievements may not always form the most reliable evidence as to the state of the country under their administration. A body of able, earnest, disinterested, and fearless men have placed their time, talents, and influence gratuitously at India's disposal. The whole of the funds of the Association will be directly expended on its public objects. If the natives of India do not now unite to support the Association, they will lose an opportunity which it is difficult to hope will ever recur.

All persons interested in the movement and willing to join or assist should send their names to the undersigned, to whom all general references, suggestions regardiug Meetings &c., should also be addressed.

Subscriptions and Donations may be sent to the Bank of Bombay, for credit of "The Indian Reform Association."

J. Seymour Keay,
Vice-Chairman British India Committee,
and Indian Reform Association.

Hyderabad
November 1883. Deccan.

গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তিস্বীকার।

পরিমিতি (প্রথম শিক্ষা)। লীলাবতীর কঠিন প্রশ্ন পাটীকনিয়মে সমাধান সমেত। মধ্য ইংরাজি ও মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার্থীদিগের ব্যবহারার্থ। বাকুলা বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপরেশ নাথ দাস প্রণীত। Calcutta : Printed and Published by H. M. Mookerjea & Co., at the "New Sanskrit Press." 11, Simla Street. 1883. মুল্য ।৶০ ছয় আনা।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রণালী ও সূত্রাদি বিশদ ও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। এ বিষয়ের যে যে গ্রন্থ এক্ষণে বিদ্যালয়সমূহে পঠিত হইয়া থাকে সমালোচ্য গ্রন্থ সে সমস্ত অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। ইহার মুল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প। গ্রন্থকার শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় বালকদিগের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা সুন্দর রূপ অবগত আছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বাংশেই বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইবার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই গ্রন্থ বিদ্যালয়-সমূহে অধীত হইতেছে জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

—০:০—

নীতি-শিক্ষা। শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার প্রণীত। Calcutta : Printed by Behary Lall Bannerjee at Messrs. J. G. Chatteejee & Co's Press. 44, Amherst Street, Published by the Sanskrit Press Dipository, 148, Baranasi Ghosh's Street. 1883. মুল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

এই গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় একজন সুপণ্ডিত ও সুপরিচিত লেখক। পণ্ডিত মহাশয় বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—

"বাঙ্গালা ভাষায় নীতিগর্ভ প্রাঞ্জল পুস্তকের একান্ত অভাব। এ পর্য্যন্ত যে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত দুরূহ; অল্পবয়স্ক বালক বালিকারা কোন ক্রমেই তাহার মর্ম্ম-গ্রহ ও তাৎপর্য্য-বোধ করিতে সমর্থ হয় না।"

তাঁহার এ কথায় আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া "নীতি-শিক্ষা" প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নূতন। এরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তক পাঠে বালক বালিকারা যে বিশিষ্টরূপ উপকৃত হইবে তাহাতে সংশয় নাই। এই গ্রন্থ "শারীরিক কার্য্যাধ্যায়," "মানসিক কার্য্যাধ্যায়," "সাংসারিক কার্য্যাধ্যায়" ও "ব্যবহারিক কার্য্যাধ্যায়," এই কয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে তত্তৎবিষয়ক বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাঠ বিন্যস্ত হইয়াছে। ঐ সকল পাঠ অতি প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে বিশেষ

উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ পতিত দেশের শিক্ষাবিভাগের দেশীয় কর্ম্মচারিবর্গ গুণের পুরস্কার দিতে অগ্রসর হইবেন কি? আমরা এ বিভাগে এ বিষয়ের সতত সুবিচার দেখিতে পাই না; এজন্য বর্ত্তমান পুস্তক সম্বন্ধে যে সমাদর হইবে তাহার আশা করিতে পারি না। তবে যদি তাহার অন্যথা ঘটে, তাহা হইলে নিতান্ত সুখী হইব।

—০০—

মনুজ। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৪ নং ডক্ ষ্ট্রীট্, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীগোপাল চন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক লর্ড বাইরণের "ম্যানফ্রেডের" ভাবে লিখিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থ সে গ্রন্থ অপেক্ষা কত নিকৃষ্ট তাহা বলাই ভার। তথাপি আজি কালি বাঙ্গালায় যে সকল কাব্য প্রকাশিত হয়, এখানি সে সকল অপেক্ষা কোন ক্রমেই নিন্দনীয় নহে। ইহার স্থানে স্থানে অতি সুন্দর রচনা ও উচ্চ ভাব পরিলক্ষিত হয়।

—০:০—

সায়ংচিন্তা। শ্রীসরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত। Calcutta : H. M. Mookerjea & Co., 42, Zig-Zag Lane. মূল্য ৵০ দুই আনা।

সায়ংচিন্তার প্রবাহ সতেজ বটে, কিন্তু সুন্দর নহে। মধুরতা আছে কিন্তু সুনির্ম্মল নহে। শ্রীযুক্ত সরোজ বাবুর কবিতা প্রবাহে একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার পুস্তিকা সম্বন্ধে আর কিছু বলা শিষ্টাচারসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

—০:০—

ন্যাশন্যাল সারকস্—কলিকাতা।

বঙ্গে শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয় অদ্য যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ব্যায়াম-চর্চ্চা এ পতিত দেশে আকাশকুসুমবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। মহা উদ্যমশীল শ্রীযুক্ত নবগোপাল বাবু সেই শুভানুষ্ঠান ও সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পটুতার বীজ এ বঙ্গদেশে বপন করেন। তাঁহার শ্রম ও যত্নে ক্রমশঃ বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহে ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হয় এবং সর্ব্বত্রই এতদ্বিষয়ে অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয়। সম্প্রতি তাঁহার অমিত যত্নে ও অধ্যবসায়ে কলিকাতা মহানগরীতে কেবলমাত্র বঙ্গীয় যুবক ও যুবতী, বালক ও বালিকা অবলম্বনে "ন্যাশন্যাল সারকস্" নামে এক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অশ্বপৃষ্ঠে এবং দুল্যমান লৌহ-দণ্ডের উপর নরনারীর নানাপ্রকার ক্রীড়া দেখিয়া আমাদের মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইয়াছিল। অচিরে যে এই সারকস্ সমুন্নতি লাভ করিয়া ইংরাজি সারকস্ কোম্পানি সমূহকেও পরাভূত করিতে পারিবে, তাহাতে আমরা সংশয় করি না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সারকসের ক্রমোন্নতি ও কল্যাণ কামনা করি।

সম্প্রতি অর্থের অসচ্ছলতা নিবন্ধন এই সম্প্রদায়ের অনেকগুলি বাহ্য অভাব ও অপূর্ণতা আছে বলিয়া বোধ হইল। এরূপ শুভানুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সহায়তা করিলে দেশীয় ধনবানবর্গের অর্থের সদ্ব্যবহার করা হয়। ভরসা করি, তাঁহারা কৃপাকটাক্ষপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

—০:০—

শৈশব-মৃত্যু ও পীড়া।

(পূর্ব্ব প্রাকাশিতের পর।)

কলিকাতায় ১৮৭৯ সালের স্বাস্থ্য-বিষয়ক বিবরণ পাঠে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি জ্ঞাত হওয়া যায়। কলিকাতায় ১০ বৎসরে (১৮৬৯—১৮৭৮) হাজারকরা মৃত্যু = ২৮.৫; ১৮৭৯ সালে ৩০.৩;

তন্মধ্যে হিন্দু	,,	,,	৩০ ৩	জ্বর,	ওলাউঠা,	উদরাময়,	বসন্ত,	অন্যান্য
মুসলমান	,,	,,	৩০.৪	,,	,,	,,	,,	,,
এসিয়া-নিবাসী নহে	,,	,,	২২.১	,,	,,	,,	,,	,,
মিশ্রিত	,,	,,	৪৯.৩	,,	,,	,,	,,	,,
				১১.১	২.৭	৩ ৫	১.৭	১১.১

প্রত্যেক ১০০০ লোকের মধ্যে মোট শৈশব-মৃত্যু — ২২৯৪

	এক বৎসরের ন্যূন	১ বৎসর	২ বৎসর	৩ বৎসর	৪ বৎসর	মোট
হিন্দু শিশু	৪৩৮.৬					
মুসলমান ,,	৫৩৬.১					
এসিয়া-নিবাসী নহে ,,	৭৩.৬					৫৫.৯
মিশ্রিত ,,	৪৭৩.৪					
অন্যান্য ,,	৩৭.৮					

মোট ১৫ দিবসের মধ্যে	১ মাসের;	২ মা;	৩ মা;	৪ মা;	৫ মা;	৬ মা;	৭ মা;	৮ মা;	৯ মা;	১০ মা;	১১ মা;	১২ মা।
১২১৬	১৯০,	১৭৬,	১২১,	১০৩,	৬৯,	৬৮,	৯৩,	৩৮,	৬১,	৪৯,	৬১,	৪৬।

২২৯৪

মোট ২২৯৪
বালক ১২৬৩
বালিকা ১০৩১

১৮৬৮ সাল হইতে ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতার শৈশব মৃত্যু ও তাহার কারণ;

		১৮৬৮ হইতে ১৮৭৫	১৮৭৬	১৮৭৭	১৮৭৮	১৮৭৯
হিন্দু	ধনুষ্টঙ্কার	১৮৯	২০৪	৬৮০	৭১৬	৫৮১
	জ্বর	৩২৫	৩৪৭	৩৩৫	৩০৯	২০৫
	আক্ষেপ	১৮৯	৩৭৯	২২৭	২৭০	৭০১
	উদরাময়	৪২	৪৭	৩৫	৫৮	৫২
	মোট মৃত্যু	১৩২৩	১৫১৭	১৭৭৬	১৯২৭	১৪৪৪
মুসলমান	ধনুষ্টঙ্কার	৯৭	৯৩	২৮৫	২৬৬	২৪৯
	জ্বর	১৮১	১৮৬	২২৫	২২৮	১৫২
	আক্ষেপ (দড়কা)	৭৬	১৭৬	১০২	৯৬	৭৫
	উদরাময়	১৮	২০	১২	২১	১৯
	মোট মৃত্যু	৬৮৫	৭৩৪	৮৫১	৯২২	৬৯৭

অন্যান্য কারণের উল্লেখ করা হয় নাই।

ইহা হইতে বিলক্ষণ বোধ হইবে, এদেশে কি পরিমাণে শৈশব-মৃত্যু হয়, ও তাহার কারণ কি। ধনুষ্টঙ্কার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিশুর অকাল মৃত্যুর কারণ; তৎপরে জ্বর, আক্ষেপ ও দড়কা। এই শৈশব-মৃত্যুর কারণ যে নিবার্য্য তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহারা এসিয়া-নিবাসী নহে, তাহাদিগের মধ্যে শৈশব-মৃত্যুর হার অতি অল্প, এমন কি ইংলণ্ডে শৈশব-মৃত্যুর হার এদেশের অর্দ্ধেক। ডাক্তার পেন ও ডাক্তার ম্যাকলাউড উভয়েই বলিয়াছেন যে সূতিকাগৃহের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এই ভয়ানক শৈশব-মৃত্যুর কারণ। কলিকাতার বিষয় এইরূপ জ্ঞাত হওয়া গেল, কিন্তু কলিকাতার সহিত এদেশের অন্যান্য নগর বা গ্রামের শৈশব-মৃত্যুর তুলনা হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত অন্য কোন কোন স্থানে শৈশব-মৃত্যুর সংখ্যাদি নির্ণয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয় নাই।

এই সমুদয় পীড়ার কারণ কি? অযথোচিত, অপরিমিত ও অসাময়িক খাদ্য, অবিশুদ্ধ, অতি উত্তপ্ত ও অতি শীতল বায়ু সেবন; গৃহ ও শরীরের অপরিচ্ছন্নতা; অযথোচিত ও অপ্রচুর পরিচ্ছদ; সংক্রামক রোগের বীজস্পর্শ; ভয়, ক্রোধ, অভিমান ইত্যাদি প্রবৃত্তির উৎসাহ; দন্তোদ্গমের উত্তেজনা; এবং অন্ত্রমধ্যে কৃমি ইত্যাদিই ঐ সমুদয় ভয়ানক পীড়ার কারণ। এতদ্ব্যতীত উচ্চস্থান হইতে পতন ও ক্ষত ইত্যাদি ঘটনাও অনেক বালক বালিকার অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে।

শৈশব ও বাল্য-মৃত্যুর বিষয় যাহা লিখিত হইল, তাহা বিদেশীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দেশীয় কোন পুস্তকে তত্তদ্বিষয়ের কোন সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া জ্ঞাত হইলাম যে, বঙ্গদেশে শৈশব ও বাল্য-মৃত্যুর যে সমুদয় সংখ্যা সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। এ দেশীয় জন্মমৃত্যুর সংখ্যা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনী এখনও বিশ্বাসোপযোগী হয় নাই; তাহার কারণ পরে লিখিত হইবে। বিদেশীয় মৃত্যুর সংখ্যা দেশীয় মৃত্যুর সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে জ্ঞাত হওয়া যাইবে, এ প্রদেশে কোন্ কোন্ পীড়া অন্যান্য দেশাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং কোন্ রোগ হইতে কত শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করে। আপাততঃ এ অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায় নাই, এজন্য শৈশব-মৃত্যু সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। এই বিষয় ডাক্তার বার্চ ডাক্তার পেনের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। *

বঙ্গদেশে শৈশব ও বাল্যমৃত্যুর সংখ্যা অন্যান্য দেশাপেক্ষা কত অধিক, তাহা স্থির করিতে না পারিলেও ইউরোপ অপেক্ষা বঙ্গদেশে শৈশব ও বাল্যমৃত্যুর সংখ্যা যে অপেক্ষাকৃত অধিক এটি সহজে বুঝিতে পারা যায়। কোন একটী গ্রামের প্রত্যেক বাটীতে অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গমাতার গড়ে অর্দ্ধেক-সংখ্যক সন্তান ১৬ বৎসর বয়ক্রমের পূর্ব্বেই মরিয়া যায়। অর্থাৎ যত জীবিত শিশু জন্মে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার অর্দ্ধেক প্রাণ-

* "While in the native town of Calcutta infants die as they die in the most fatal countries, European infants with 5·8 per cent of death in the year, enjoy in Calcutta a degree of vitality which surpasses that of the most favoured spots elsewhere."

Birch-Goodeve's Hints.—P. 8.

ত্যাগ করে। ডাক্তার পেন প্রমাণ করিয়াছেন যে, কলিকাতায় ১০০০ নবপ্রসূত ইংরাজ-সন্তানের মধ্যে ৫৮টী, হিন্দুর মধ্যে ৩১৫টী ও মুসলমানের মধ্যে ৩৬৩টী সন্তান এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করে।

পিতা মাতার সামাজিক অবস্থা যে কতক পরিমাণে বঙ্গীয় শিশুর অকাল মৃত্যুর কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতি অল্প বেতনভোগী, ভদ্রজাতীয়, শিক্ষিত কর্ম্মচারী ও অতি নিকৃষ্টজাতীয় লোকেরই অবস্থা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশকর। অতি অল্প বেতনভোগী ভদ্রসন্তানগণ জাতীয়ত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত ২০।২৫।৫০ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিয়া সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিতে বাধ্য হন, অথচ পোষ্যবর্গের সংখ্যা হ্রাস না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং জীবন ধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত যে সমুদয় সামগ্রী নিতান্ত আবশ্যক, তাহাও অনেক সময় সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন না। অনেককেই অতি অস্বাস্থ্যকর বাটীতে বাস করিতে হয়; তদুৎপন্ন পীড়া সকল সর্ব্বদা সন্তানগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যকে একেবারে বিনষ্ট করে, কাহার প্রাণবিনাশ পর্যন্ত করে। পীড়িত হইলে অর্থাভাবে সুচিকিৎসক আনয়ন, উত্তম সেবনীয় ঔষধ বা সুপথ্যের আয়োজন করিতে সমর্থ হয়েন না। অনেক স্থলে, পীড়া যাবৎ সাংঘাতিক আকার ধারণ না করে, তাবৎ চিকিৎসার কোন উপায় অবলম্বিত হয় না। কখন কখন অজ্ঞতাহেতু ঐরূপ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু অনেক সময় দরিদ্রতাই উহার প্রধান কারণ। জাতীয় মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার নিমিত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীকে লইয়া যাইতেও পারেন না। ইংলণ্ডে বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ব্যতিরেকে প্রায় সকলেই আবশ্যকমত দাতব্য-চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত হইতে অপমান বোধ করেন না। আরও তথায় অধিকাংশ চিকিৎসকের দর্শনী এদেশের ইংরেজী চিকিৎসকের দর্শনী অপেক্ষা অল্প।

অতি নিকৃষ্টজাতীয় দরিদ্র ব্যক্তির সন্তানগণও অধিক সংখ্যায় অকালে প্রাণত্যাগ করে। তাহাদিগের পিতামাতার অজ্ঞতাই তাহার প্রধান কারণ। তাহারা দরিদ্র তাহা সকলেই অবগত আছে ও তাহারা দাতব্য চিকিৎসালয়ে গমন করিলেও কোন অপমানের ভয় নাই। তথাপি অজ্ঞতা হেতু তাহারা পীড়িত শিশুকে তথায় লইয়া যাইবে না; যদি যায়, সে শেষ অবস্থায় একবার চিকিৎসককে দেখাইবার নিমিত্ত মাত্র। এই দুই শ্রেণীস্থ শিশুগণের মৃত্যু সংখ্যা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহা আমি গতবৎসর নবদ্বীপের বহুব্যাপক জ্বরের সময় বিলক্ষণরূপে অবগত হইয়াছি।

দুর্ভিক্ষ এবং শস্যাদির অপ্রতুলতা শৈশব ও বাল্যমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পিতা মাতা কতক দিবস পর্য্যন্ত সাধ্যমত সন্তানগণের ভরণ পোষণ সমাধান করেন, পরে অসাধ্য হইয়া উঠিলে স্ব স্ব প্রাণরক্ষা করিতে ব্যস্ত হন। তখন সন্তানগণ অপ্রচুর অপুষ্টিকর সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া অযত্নে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

শীতাধিক্য শৈশব-মৃত্যুর এক প্রধান কারণ। বঙ্গদেশে সচরাচর শীত অধিক নাই, কিন্তু যে যে বৎসর শীতের আধিক্য হয়, সেই সেই বৎসর শৈশব-মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়িয়া উঠে। একথা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

পিতা মাতার অজ্ঞতা ও কুসংস্কার স-

সন্তানের অসুস্থতা ও অকাল মৃত্যুর কারণ। অধিকাংশ পিতা সন্তানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা অন্তঃপুরবাসিনীগণের উপর ঐ গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। পরে সন্তান কোন উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইলে সন্তানের মাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট সন্তানের পীড়ার সংবাদ পাইয়া দুই এক দিন টোট্‌কা ঔষধ দিতে আদেশ দেন। অনেক সময় তাঁহার ঐরূপ আদেশ হইবার পূর্ব্বেই সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষিণী বৃদ্ধারা ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিফল হইয়াছেন। তবুও দুই এক দিবস ঐরূপে গত হইলে, পিতার মনে কিঞ্চিৎ উদ্বেগ উপস্থিত হইল। চিকিৎসকের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন, এবং চিকিৎসক যে উপদেশ দিলেন, তাহা সম্পাদন করিবার ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে স্বকার্য্যে (রাজকীয়, জমিদারী, ব্যবসায় ইত্যাদি সক্রান্ত অন্তঃপুরবাসিনীগণের উপর) ব্যাপৃত থাকিলেন। ঐ সমুদয় পিতা সন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে আপনার কি কর্ত্তব্য তাহা অবগত না থাকিতেই স্নেহেরপাত্র শিশুগণ সর্ব্বদা অসুস্থ হইতে থাকে, পীড়িত হইলে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারে না, এবং সময়ে সময়ে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। এবিষয়ে উপর্য্যুপরি কতকগুলিন উদাহরণ দর্শন করিয়া ও ইহাতে দেশের বিশেষ অমঙ্গল করিতেছে বিশ্বাস করিয়াই আমরা এরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি, সকল পিতার সম্বন্ধে এরূপ বলিতেছি এমত নহে।

আধুনিক বঙ্গীয় প্রসূতীগণের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা (অবহেলা নহে) যে এদেশের শৈশব ও বাল্য-মৃত্যুর প্রধান কারণ তাহা আর কোন জ্ঞানী ব্যক্তির অবিদিত নাই। অল্প পরিমাণে শীত, তাপ বা বৃষ্টি লাগিলে সন্তানের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না বরং উপকারই হইবে এই বিশ্বাসে, সন্তানগণ শীত, উত্তাপ ও বৃষ্টির সময় অনাচ্ছাদিত শরীরে, অনাবৃত মস্তকে ও শূন্যপদে বাটীর বহির্ভাগে গমন করিলেও তাঁহারা তাহাদিগকে নিবারণ করেন না। আবার কতকগুলি মাতা শিশুর গাত্রে হিম ও বায়ু লাগিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা স্থির করিয়া, অহোরাত্র গৃহের দ্বার, বাতায়ন ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া রাখেন। এমন কি, প্রখর মধ্যাহ্ন রৌদ্রের সময়ও সন্তানকে ঐ গৃহের বহির্ভাগে আনয়ন করেন না। সেই শিশু অনুক্ষণ দূষিত ও দুর্গন্ধময় উত্তপ্ত বায়ু সেবন করিয়া শীঘ্রই দৌর্ব্বল্য ও স্ক্রফুলা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সম্প্রতি কিছুদিন হইল ঐরূপ একটী শিশু কাশী, উদরাময় ও জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। উহার বাসগৃহের বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ও তপ্ত ছিল, পরে দিবাভাগে ৭ ঘটিকার সময় হইতে অপরাহ্লে ৫ ঘটিকার সময় পর্য্যন্ত গৃহের সমস্ত দ্বার ও বাতায়ন মুক্ত রাখিয়া, শিশুকে গৃহের বহির্ভাগে আনয়ন করাতে উহার কাশীর হ্রাস হইল; ক্ষুধার উদ্রেক হইল; এমন কি প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে ঐ শিশু কিঞ্চিৎ স্থূলকায়ও হইয়া উঠিল, দেখিয়া উহার পিতা মাতার ভ্রম দূর হইল।

অতি শৈশবাবস্থায় পাতলা ফ্লানেল ও পরে বয়ঃক্রম কিঞ্চিৎ অধিক হইলে অর্থাৎ একবৎসর অতীত হইলে মেরিণো কাপড় দিয়া শিশুদেহ আবৃত রাখা উচিত। সন্তান যদি কোন কারণবশতঃ অতিশয় কৃশ হয়, তবে সর্ব্বদা ফ্লানেল ব্যবহার করা ব্যবস্থা। সঙ্গতি নাই বলিয়া সন্তানকে উপযুক্ত পরিচ্ছদ না দেওয়া

অতিশয় অন্যায় কর্ম্ম। উদর পূরণের নিমিত্ত আহার যেমন অঙ্গ আবরণের জন্য উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও সেইরূপ আবশ্যক। এক দিবস একবার কিঞ্চিৎ মাত্র বা অপুষ্টিকর খাদ্য আহার করিলে সচরাচর পীড়া হয় না, তদ্রূপ একদিন একবার শরীর অনাবৃত থাকিলেও পীড়া না হইতে পারে; কিন্তু অনেকবার অপ্রচুর ও অপুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিলে যেরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অনেক বার অনাবৃত শরীরে থাকিয়া শীত-বাত সহ্য করিলেও সেরূপ পীড়া হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ঐ কারণে অনেক সময় সন্তানের জ্বর, উদরাময়, আমাশয়, ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া (ফুস্ফুসের প্রদাহ), মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ, শোথ ইত্যাদি রোগ জন্মে। এ নিমিত্ত সন্তানের বক্ষঃস্থল ও উদর সর্ব্বদাই আবৃত থাকা আবশ্যক। গ্রীষ্মকালে গাত্রাবরণ ক্রমশঃ অল্প করিয়া দেওয়া উচিত।

নিম্ন, আর্দ্র, আলোক ও বায়ু সঞ্চালনোপায়-বিহীন ও অপ্রশস্ত গৃহ সন্তানের পীড়ার নিবার্য্য কারণ। সূতিকাগৃহের বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইলে প্রতিদিবস পূর্ব্বাহ্লে ও অপরাহ্নে কিয়ৎ কাল শিশুকে অপরিবেষ্টিত স্থানে বায়ু সেবন করান আবশ্যক। ছাদের উপর বা বাটীর সন্নিকটস্থ কোন শূন্যস্থানে, অভাবে বাটীর প্রাঙ্গণে সন্তানকে ক্রীড়া করিতে দেওয়া উচিত। আলোকাভাবে শিশুর শরীর ক্ষীণ ও বিবর্ণ, মাংসপেশী সমুদয় শক্তিহীন এবং মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এবিষয়ে ডাক্তার বুল্ যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল।* কোন বৃহৎ নগরের বায়ু-সঞ্চালোনপায় শূন্য এবং অন্ধকারময় গলির অশুদ্ধ বায়ু সচরাচর সেবন করিলে যে স্ক্রফুলা পীড়ার কুলক্রমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিম্বা ঐ পীড়া উৎপন্ন হইবার নূতন প্রকৃতি জন্মিতে পারে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই কারণে কন্ভলসান্ হইয়া থাকে।

পরিচ্ছন্নতাভাবে অনেক শিশু পীড়িত ও কখন কখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ত্বক-নিঃসৃত মলিন পদার্থ সমুদয় ধৌত করিবার ও লোমকূপদ্বার সমুদয় মুক্ত রাখিবার নিমিত্ত শিশুর সমস্ত শরীর ঈষৎ উত্তপ্ত জলে ধৌত করা আবশ্যক। উহার সহিত কোমল মার্জ্জনি দ্বারা শিশুর সমস্ত শরীর মার্জ্জনা করিলে শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়ারও সুবিধা হয়। বাহুমূল, গলদেশ ইত্যাদি শরীরের যে যে ভাগ সর্ব্বদা আবৃত থাকে ও যথায় মলিন পদার্থ একত্রিত হইয়া ক্ষত হইবার সম্ভাবনা, তত্তদ্ভাগ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা আবশ্যক। মস্তকের চুলেও অনেক সময় অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, তাহাও ধৌত করা উচিত। সাবান ব্যবহার করা উত্তম; উহাতে যে ক্ষার পদার্থ আছে, তাহাতে ঘর্ম্মের অম্লতা দূর করে, এবং উহার তৈলাক্ত পদার্থে চর্ম্মস্থ মলিন পদার্থ সমুদয় সংলিপ্ত করিয়া সমস্ত চর্ম্মকে নির্ম্মল করে। প্রতিদিবস একবার শিশুদের সমস্ত গাত্র পরিষ্কৃত করা উচিত। মস্তক দুই তিন দিবস অন্তর ধৌত করিয়া দেওয়া উচিত। শিশু হীনবল হইলে অধিক জল ব্যবহার করা অব্যবস্থা।

* The light of the sun has a powerful influence upon the growth and healthy development of the body &c; if children are immured in cheerless rooms looking into dark shrubberies or on the backyards and chimney of a town, their health must inevitably suffer.

Bull.—Management of Children P. 91.

এমতস্থলে আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা সমস্ত শরীর মার্জ্জনা করিলেই হইবে। এক বৎসরের অধিক বয়সের শিশুকে হইলে প্রতি দিবস স্নান অভ্যাস করান উচিত। তাহা হইলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঐ অভ্যাসমত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দাঁড়াইয়া যাইবে, সুতরাং পরিস্ছন্নতার প্রতি তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিবে। শরীরের ন্যায় বস্ত্রও পরিষ্কার রাখা উচিত। নচেৎ সমস্ত শরীর ধৌত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া মলিন পরিচ্ছদ ধারণ করিলে কোন ফলই হইবে না। গাত্র পরিষ্কৃত না থাকিলে, দাদ, খোস ইত্যাদি ত্বকের পীড়া জন্মে; ঐ সমুদয় পীড়া শিশুর শরীরকে একেবারে দুর্ব্বল ও অসুস্থ করিয়া ফেলে।

অযথোচিত ও অপুষ্টিকর সামগ্রী আহার দেওয়া যে শৈশব-মৃত্যুর এক প্রধান কারণ তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। অনেক স্নেহময়ী ও শুভানুধ্যায়িনী জননী সন্তানের পুষ্টি সাধনের জন্য ক্ষণে ক্ষণে দুগ্ধ-পোষ্য শিশুকে গুরুপাক খাদ্য দিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রথমে আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পান না, পরে ঐ রূপ আচরণ দ্বারা শিশুর উদরাময় ও আমাশয় রোগ উৎপন্ন হইলে, কতক পরিমাণে স্বীকার করেন যে, তাঁহাদিগের অজ্ঞতা হেতুই শিশুর পীড়া হইয়াছে। জগৎপিতা জগদীশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিলে অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব যাবৎ কঠিন ও দুষ্পাচ্য সামগ্রী জীর্ণ করিবার জন্য আবশ্যক যন্ত্রগুলিন কার্য্যক্ষম না হয়, যাবৎ শিশুর দন্তোদ্গম না হয়, তাবৎ মাতৃস্তন্য পান করাই তাহার পক্ষে সুব্যবস্থা। ক্রমে দন্তোদ্গম হইলে অল্প অল্প সাগু, এরারুট, যব প্রভৃতি শ্বেতসারময় পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে গোদুগ্ধ ও মিছরির সহিত সিদ্ধ করিয়া মধ্যে মধ্যে আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক; এইরূপে ক্রমশঃ অন্যান্য কঠিন পদার্থ চর্ব্বিত ও জীর্ণ করিবার ক্ষমতা হইলে, অন্ন ও কোমল মৎস্য দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সমুদয় খাদ্য দিবার কালেও শিশুকে দুগ্ধ খাওয়ান আবশ্যক। এইরূপে দুই বৎসর অতীত না হইলে কোন শিশুকে অন্ন এবং আর আর কঠিন ও অপেক্ষাকৃত দুষ্পাচ্য সামগ্রী ভোজন করিতে দেওয়া উচিত নহে। দিলে ঐ বয়সে শিশুর যে উদরাময় রোগ জন্মে, তাহা হইতে শিশুকে রক্ষা করা সুকঠিন। কোন কারণ বশতঃ মাতৃস্তন্যের পরিবর্ত্তে গাভীর দুগ্ধ পান করাইতে হইলে উহাতে কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত চূর্ণের জল ও শর্করা মিশ্রিত করা আবশ্যক।

অযথোচিত, অপরিমিত ও অসাময়িক আহার দ্বারা আবাল বৃদ্ধ সকলেরই অসুস্থতা জন্মে। কিন্তু শৈশবকালে উহার ফল গুরুতর হয়। তাহার কারণ এই যে, শিশু মনোমত খাদ্য আহার করিতে পারে না, এবং ক্ষুধামত আহার যুটে না। কতকগুলিন প্রসূতীর বিশ্বাস এই যে, সন্তানকে অধিক পরিমাণে ও অতি পুষ্টিকর সামগ্রী ভোজন করাইলে শরীর শীঘ্র স্থূল হইবে। তাঁহাদিগের এই শুভাকাঙ্ক্ষিতার ফল অনেক সময় শুভ না হইয়া অশুভই হয়। শিশুর ক্ষুধা বিবেচনা না করিয়া আহার দিলে কিম্বা উহার পাকযন্ত্র সকলের ক্ষমতার উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অতিশয় গুরুপাক খাদ্য খাওয়াইলে উদরাময়, বমি, আমাশয় ও উদরের স্ফীতি ইত্যাদি রোগ আসিয়া ক্ষুদ্র শিশুশরীর আক্রমণ ও সুযোগ পাইলে অকালে উহার ক্ষুদ্র প্রাণ হরণ করে। এই সমুদয় ক্লেশকর ঘটনা নিবারণ করিবার নিমিত্ত শিশুকে

নিরূপিত সময়ে কেবল মাতৃস্তন্য পান করান আবশ্যক। পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করা গিয়াছে, যে, নয় দশ মাস বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশু কেবল মাতৃস্তন্য পান করিবে। অবস্থাবিশেষে আরও কিছু অধিককাল পর্য্যন্ত ঐ খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। পরে চারিটী দন্ত উদ্গত হইলে সাগু, এরারুট ইত্যাদি শ্বেতসার বিশিষ্ট লঘু খাদ্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। দেড় বৎসরের হইলে, অল্প পরিমাণে মৎস্য বা মাংসের যূষ দেওয়া উচিত। ক্রমে ক্রমে লঘু মৎস্য ও অন্ন, পরে দাল ও অন্যান্য খাদ্য দিতে হইবে। দুই বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে অন্ন আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে কোন শিশুকে কোন কারণবশতঃ শ্বেতসারময় পদার্থ দেওয়া উচিত নহে। দন্তোদ্গম না হইলে শ্বেতসারময় পদার্থ অধিক পরিমাণে দেওয়া নিষিদ্ধ। অসময়ে শিশুসন্তানকে অন্ন ভোজন করিতে দেওয়ায় ভয়ানক ফল উৎপন্ন হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমুদয় শিশু শীর্ণ, ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, উদরাময় রোগে আক্রান্ত, বিবর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

সচরাচর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতৃস্তন্য পান করিতে পারে না। প্রায় তিন দিবস অতীত না হইলে মাতার স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধও জন্মে না। তৎকালের শিশুকে একভাগ গাভীর দুগ্ধ, দুই ভাগ জল ও কিঞ্চিৎ মিছরি একত্র অল্প উত্তপ্ত করিয়া অল্প পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক। মাতৃস্তনে দুগ্ধ হইলে অল্প অল্প করিয়া শিশুকে স্তন্যপান শিক্ষা করাইতে হইবে। এক সপ্তাহ অন্তে ক্রমে শিশুকে নিরূপিত সময়ে অল্প পরিমাণে স্তন্যপান করান উচিত। দিবারাত্রিতে গড়ে তিনঘণ্টা অন্তর একবার স্তনপান করান আবশ্যক; কিন্তু শিশুর পাকস্থলী অতি ক্ষুদ্র ও উত্তেজনাশীল সুতরাং দুগ্ধ কিঞ্চিৎ অধিক হইলেই বমন হইয়া উঠিয়া যায়। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, যে কোন কোন প্রসূতী শিশুর মুখে অনবরত স্তন দিয়াই থাকেন, আর কতকগুলিন সমস্ত দিনে শিশুকে দুইবার স্তন্যপান করাইবার অবসরও পান না। এই দুই অভ্যাসই নিন্দনীয় ও অমঙ্গলকর। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার সহিত একমত হইবেন। অসহায়, দুর্ব্বল ও অক্ষম শিশু সন্তানকে প্রতিপালন করা অতি দুরূহ কার্য্য; কিন্তু জগদীশ্বর যাহাদিগকে ঐ গুরু ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহাদিগের কর্ত্তব্য ঈশ্বরের ঐ অভিপ্রায় সাধ্যানুসারে সিদ্ধ করা। স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপণ করিতে ব্যস্ত হইয়া শিশুসন্তানের লালন পালনে অযত্ন করা মহাপাপ। সমস্ত দিন স্তন্যপান করাইতে পারিনাই বলিয়া একবারে শিশুর ক্ষুদ্র উদরে অধিকতর দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কোন মতেই হিতার্থিনীর কর্ম্ম নহে। পূর্ব্বাহ্নে আহার করি নাই বলিয়া আমরা অপরাহ্নে কখনও দুইবারের খাদ্য একবারে ভোজন করিতে পারি না, শিশুর পক্ষে উহা আরও অসম্ভব এবং অনিষ্টকর। আবার সর্ব্বদাই শিশুকে স্তন্যপান করাইলে অতিভোজন ও ক্ষণে ক্ষণে ভোজন-জনিত অনিষ্টের উৎপত্তি হয়।* এই বিষয়ে ডাক্তার বুলের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এ বিষয়ে ডাক্তার

* "As a result of this injurious and dangerous practice (irregular nursing) the food remains undigested, the stomach of the infant becomes overloaded, the bowels disordered, fever excited and by and by the infant is seriously ill and is perhaps eventually lost."

Bull.—Management of Children P. 25.

বার্চের মত তাঁহার পুস্তকের ৪৪ পৃষ্টায় লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

একমাস অতীত হইলে ক্রমে দুইবার মাত্র অর্থাৎ গড়ে চারিঘণ্টা অন্তর স্তন্যপান করান আবশ্যক। এইরূপ করিলে ক্রমে ক্রমে নিশ্চয় ক্ষুধার সময় স্থির হয় এবং নিয়মিত সময়ে ভোজন পানের অভ্যাস জন্মে। ইংরাজী পুস্তকে সন্তান ও মাতাকে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে শয়ন করিবার আদেশ আছে। তাহার একটী কারণ এই যে, সন্তান রাত্রিকালে মাতার নিকট থাকিলেই মাতাকে উহার নিমিত্ত রাত্রিজাগরণ করিতে হয়, সুতরাং সুনিদ্রার অভাবে মাতার শরীর ও মন রুগ্ন হইয়া পড়ে। বঙ্গীয় প্রসূতীগণ এখনও নবজাত শিশুকে ধাত্রীর নিকট রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে অভ্যাস করেন নাই, এজন্য তাঁহাদিগকে সন্তানের নিকট শয়ন করিয়া মধ্যে মধ্যে রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে, কিন্তু উহার অপকারিতা স্মরণ রাখিয়া, বোধ হয়, তাঁহারা এমত কোন উপায় অবলম্বন করিবেন, যে সন্তান সর্ব্বদা জাগরিত হইয়া স্তন্যপান করিতে না পারে। ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রসিদ্ধ ধাত্রী-শিক্ষার প্রসূতীদিগকে এ বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

তৃষ্ণার সময় শিশুসন্তানকে জলপান করিতে না দেওয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অহিতকর কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। পরিমিতরূপে জলপান করিলে শিশুর অনিষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

প্রথম বৎসর মাতৃস্তন্যই শিশুর একমাত্র খাদ্য, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় মাতার স্তনদুগ্ধ শিশুর অসেবনীয় হয়, আর কোন কোন অবস্থায় শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করান অনিষ্টকর, যথা—

(ক) মাতা পীড়িত হইলে শিশুকে মাতৃ স্তন্য পান করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ। পীড়িত মাতার দুগ্ধপান করিলে শিশুর প্রায়ই পীড়া হইয়া থাকে।

(খ) উগ্রস্বভাবা মাতার স্তন্যপান করান উচিত নহে। "ঐ প্রকার মাতা তাঁহার সন্তানকে স্তনপান করাইয়া উহার উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকার করিবেন। তাঁহার দুগ্ধ শিশুর পুষ্টির উপযোগী হইবে না; এক এক সময় উহার পরিমাণ অল্প হইবে; অন্য সময় স্তন্যের এমত গুণান্তর হইবে যে, তাহাতে শিশুর স্বাস্থ্যের ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিবেক।" (বুল—১৯ পৃষ্ঠা)। "যে সকল অবস্থায় মাতৃস্তন্য শিশুর পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া উঠে তন্মধ্যে স্বভাবের উগ্রতা, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা গুরুতর দৈহিক অপকর্ষ, স্ক্রুফুলা, টিউবার্কল, ক্যানসার, উপদংশ, মৃগী, বাতুলতা রোগের কৌসিক বা প্রাপ্ত প্রবণতা (tendency) অথবা অন্য কোন প্রবল পীড়া থাকাই প্রধান" (ট্যানার ২২ পৃঃ)। হঠাৎ ভীত হইলে, কঠিন পরিশ্রম করিলে কিম্বা ক্রোধান্ধ হইলে মাতার স্তনদুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস ও গুণের অপকৃষ্টতা জন্মে। তৎকালীন দুগ্ধ শিশুকে পান করাইলে শিশুর উদরাময়, কনভলসন্ ও অন্যান্য পীড়া জন্মিয়া থাকে।

(গ) স্ক্রুফুলা, টিউবার্কল, ক্ষয়কাস ইত্যাদি পীড়ার প্রবণতা।

(ঘ) মদ্যপানাসক্ত মাতার স্তন্য শিশুর অসেবনীয়। মদ্যপান করিলে মাতার পুষ্টির লাঘব হয়, সুতরাং শিশুর খাদ্যের গুণেরও অপকৃষ্টতা জন্মে।

(ঙ) গর্ভবতী মাতার স্তন্য শিশুকে পান করান অবিধেয়। উহাতে প্রায়ই শিশুর উদরাময় রোগ জন্মিয়া থাকে। এই কারণে দুইটী শিশু এতদূর পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে, অতি কষ্টে ও যত্নে ৬। ৭ মাস পরে তাহাদিগকে সুস্থ করা গিয়াছিল।

(চ) শিশুর বয়ঃক্রম একবৎসরের অধিক হইলে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। প্রায় কোন মাতার স্তন্যই এক বৎসরের অধিককাল আপন শিশুর পুষ্টিসাধক খাদ্য প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। একবৎসর গতে মাতৃস্তন্যের পরিমাণ হ্রাস হয় ও গুণের অপকর্ষ জন্মে। ঐ দুগ্ধ পান করিলে শিশুর শরীর কৃশ ও নিস্তেজ হইয়া, পরে মাতার স্বাস্থ্যও এককালে ভগ্ন হইয়া যায়। মাতা দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়েন, তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হয়, শিরোবেদনা, শীর্ণতা, মূর্চ্ছা ইত্যাদি পীড়াও উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশীয় প্রসূতীগণের বিশ্বাস এই যে, সন্তান যত অধিক কাল মাতৃস্তন্য পান করিবে ততই বলবান্ হইবে। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। বহুকাল পর্য্যন্ত উদরাময় বা শ্বাসরোগাক্রান্ত হইলে শরীর যেরূপ শীর্ণ হইয়া পড়ে, সন্তানকে বহুকাল স্তন্যপান করাইলেও মাতার সেইরূপ অবস্থা ঘটে। অধিকাংশ বঙ্গীয় মাতাই যে অল্প বয়সে অত্যন্ত কৃশী, দুর্ব্বলা ও অকাল-বৃদ্ধা হইয়া পড়েন, ইহা তাহার এক অতি প্রধান কারণ। আর শিশুর দন্তোদ্গম হইলে কেবল দুগ্ধ পান করাইয়া তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। প্রথমে শিশুর শরীর দেখিতে পরিপুষ্ট ও লাবণ্যময় থাকে বটে, কিন্তু কোন রোগাক্রান্ত হইলে অতি শীঘ্রই নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। অধিক দুগ্ধ পান করিয়া কোন কোন শিশুকে যকৃৎ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

শিশুর মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিবার সময় সম্বন্ধে ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মত প্রায়ই এক। সুস্থ সন্তানগণের মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিবার প্রশস্ত সময় ৯ মাস হইতে ১২ মাস বয়স পর্য্যন্ত। ঐকালে শিশুর দন্তোদ্গম এবং পাকস্থলীর শক্তি ও মাংশপেশীর বৃদ্ধি হওয়ায় অন্যান্য কঠিন খাদ্য প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া উঠে (ট্যানার ২৬ পৃষ্ঠা)। সাধারণতঃ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে যে, নয় মাস হইতে দশ মাস বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সুস্থকায় শিশুকে মাতৃস্তন্য ত্যাগ করান উচিত (বুল ২৪ পৃষ্ঠা)। মোটামুটি নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় যে, নয় মাস হইতে বার মাসের মধ্যে শিশু সন্তানের মাতৃস্তন্য বন্ধ করা উচিত। দ্বাদশ মাস অতীত হইলে শিশুকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে দেওয়া বিহিত নহে। অত্যন্ত বলবতী স্ত্রীর দুগ্ধও দ্বাদশ মাস গতে অনিষ্টকর হইয়া পড়ে; এবং আর অধিককাল সন্তানকে ঐ স্তন্য পান করাইলে, নিশ্চয়ই তাহার স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্য ঘটে (বার্চ ৮৩ পৃষ্ঠা)। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এদেশে শিশুগণ সচরাচর এক বৎসর হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্তও মাতৃস্তন্য পান করে; তাহাতে অপকার ব্যতীত উপকার নাই। উহাতে মাতার শরীর ক্রমে অধিক দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়ে; স্বাস্থ্যহীন ও বলহীন মাতার অপুষ্টিকর স্তন্যপান করিয়া সন্তানও পরিপুষ্ট হইতে পারে না।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের পরলোকগমনে।

শোকাচ্ছন্ন, শূন্য করি কমল কুটীর,
কান্দাইয়া বঙ্গ-ভূমি, কাঁন্দাইয়া শোকে
ভারতের কোটি কোটি নির্জ্জীব সন্তানে—
হায়! কান্দাইয়া শোকে সমস্ত জগতে—
কেশব অনন্ত ধামে করিলা প্রয়াণ।
অবিরত জনস্রোতঃ আজি অবারিত
পশিতেছে মহাবেগে কমল-কুটীরে—
হিন্দু, শিখ, জৈন, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, মুসলমান,
পশিতেছে লোক সব শোকভারে নত!—
হাহারবে পূর্ণ গৃহ, উদ্যান, বিমান;—
অচঞ্চল মরুতের স্রোতঃ, শব্দহীন
বিহঙ্গম যত; রবি নিশ্চল আকাশে।
পরিস্কৃত শ্বেত শয্যা'পরি সুবিস্তৃত
সুন্দর মুরতি খানি প্রাণ শূন্য এবে—
তথাপি জীবন্ত প্রায়, উজ্জ্বল, গম্ভীর!—
এক হস্ত বক্ষোপরে, অপর উদরে,
শিবনেত্র নেত্রদ্বয়, ভজনার কালে
যেন; চারি পাশে যত আত্মীয় স্বজন,
ঘোর শোকে অশ্রুধারা ক'রে বিসর্জ্জন!—
গুণেন্দ্র মহেন্দ্র লাল, আনন্দ মোহন,
শিবনাথ, বৃদ্ধতম সে কৃষ্ণমোহন,
জামাতা ভূপেন্দ্র, ভ্রাতা, আর ক'ব কত,
বিষাদ সাগরে হায় মগ্ন সবে আজি!
আস্তিক, নাস্তিক, ব্রাহ্ম, অব্রাহ্ম, খৃষ্টান,
মতের বৈষম্য ত্যজি, ত্যজি বিসম্বাদ
নীরবে করিছে আজি অশ্রু বরিষণ!
পতিপ্রাণা সতী মরি! পড়ি ধরাতলে,—
আলুথালু বেশ ভূষা, ধূলায় ধূসর
সোণার প্রতিমা আজি, শোকের তাড়নে;
পুত্র কন্যাগণ আহা! করিয়া চীৎকার
মর্ম্মভেদী ডাকিতেছে পিতা পিতা বলি;
অদূরে বিবশা বামা মরম-বেদনে,
হাহাকার রবে ঐ করিছে রোদন,—
কোথা গেলি বাপ মোর, কোথা প্রাণধন!
উপাসনা সমাপন করিয়া তখন,
ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ যত খট্টাঙ্গ তুলিয়া,
দাহ-স্থান অভিমুখে করিলা গমন।
ধীরে ধীরে চলে সবে, ধনী, মানী, জ্ঞানী,
নির্ধন, সম্ভ্রমহীন, অজ্ঞান—সকলে
চলে ঘোর শোকস্রোতে হ'য়ে নিমগন;
দুই ধারে শূন্য যান চলেছে নীরবে,
মাঝে চলে জনব্রজ নগ্নপদ সবে।
ব্রাহ্ম মন্দিরের পাশে কতক্ষণ পরে,
আসি সে মুরতি সহ খট্টাঙ্গ যতনে
নামাইলা ভূমিতলে, করিলা ভজনা
তাঁর তরে, যেই জন জগতের তরে
পরমেশ-পদপ্রান্তে করিত প্রার্থনা!
ক্ষণ কাল তরে সেই জনস্রোত হ'ল
স্থির, ক্ষণকাল তরে শূন্য যান গুলি
স্থির ভাবে দাঁড়াইল পথের দুধারে!
অনন্তর তুলি খট্টা ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণ,
চলিলা বিষাদ পূর্ণ, পশ্চাতে চলিল
শোকতপ্ত জনব্রজ ধীর, শব্দ হীন,—
দুই ধারে গাড়ি গুলি চলিল আবার
ধীরে ধীরে! দুধারের যত লোক জন
ক্ষণকাল তরে নিজ নিজ কর্ম্ম ছাড়ি,
অতর্কিতে করিলেক অশ্রু বরিষণ,
কি জানি কি ভাবি মনে, রহিল চাহিয়া

এক দৃষ্টে সবে সেই মহাশব পানে!
সাধারণ-মন্দিরের কাছে অনন্তর
উপনীত হ'ল সবে আসি, পুনরায়
খট্টাঙ্গ নামায়ে ভূমে, করি' উপাসনা
চলিল আবার সবে—ব্রাহ্মভগ্নী যত
শোকভক্তি-বিগলিত অশ্রুবিন্দুসহ
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন শবের উপরে—
ভক্তিপাত্রে দিলা শেষ ভক্তি উপহার!
এ সংসারে সেই ধন্য, আদরের ধনে,
যে করে আদর, শ্রদ্ধা হৃদয়ের সনে!
এই রূপে কতক্ষণে উত্তরিলা সবে
পূত জাহ্নবীর তীরে শ্মশান ভবনে,—
শ্মশান পবিত্র হ'ল দেহ পরশনে।
ধীরে ধীরে তরঙ্গের কল কল স্বরে
কান্দিয়া জাহ্নবী দেবী দিলা আশীর্ব্বাদ,
"যাও বাছা, বহু শ্রম করেছ ধরায়,
অনন্তে অনন্ত শান্তি লভিবে ত্বরায়।"
চন্দন কাষ্ঠের চিতা সাজায়ে তখন,
সে পবিত্র দেহ তার রাখিয়া যতনে
ভ্রাতৃগণ মিলি, পুনঃ করিলা প্রার্থনা।
অনন্তর জ্যেষ্ঠ পুত্র অধীর হৃদয়ে,
অগ্নিদান ক্রিয়া হায়! করিলা তখন!
কেশবের শোকে রবি লোহিতবরণ,
ধীরে ধীরে ডুবিলেন পশ্চিম সাগরে;
শোকে ধৈর্য্যহীনা হ'য়ে প্রকৃতি সুন্দরী
তমোরূপ কৃষ্ণবাসে ঢাকিলা বদন;
বিহঙ্গমকুল আজি আকুল হইয়া
কেশবের শোকে যেন, কান্দিয়া নীরব
হইল; সুদূর নভে তারকার দল
শোকে অবনত মুখে দেখিল চাহিয়া
নিম্নভাগে কেশবের ঊর্দ্ধদেহ-ক্রিয়া;
অশ্রু বিন্দু ছলে দুখে নীহার গলিল;
কান্দিয়া অনন্ত বিশ্ব নীরব হইল!
চিত্রার্পিত প্রায় হায়! দর্শকমণ্ডলী
রহিল স্তম্ভিত ভাবে—নীরব, গম্ভীর,
শোক অশ্রু বহে গণ্ডে, সুদীর্ঘ নিশ্বাস
বহিতেছে অবিরত। অন্ত্যেষ্টি করম
সমাপ্ত হইল ক্রমে। চিতাভস্ম ল'য়ে,
শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে ভ্রাতৃগণ তবে
ফিরিলা বিষম দুখে শূন্য গৃহ পানে।
কালের বিচিত্র লীলা! কে রোধিবে কালে?
কার মনে ছিল, আজি অকালে কেশব
করিবেন পলায়ন সংসার ছাড়িয়া?
ভারতের সুসন্তান, সুযোগ্য, সুধীর,
সুপণ্ডিত, সুপবিত্র, সুমধুর-ভাষী,
অকালে ভারত ছাড়ি, কান্দায়ে সংসার
চিরতরে—চিরতরে অনন্ত উদ্দেশে
করিলা গমন আজি অশুভের দিনে।
জ্ঞানহীন, শক্তিহীন ভ্রাতৃগণ তরে
সহিয়া অশেষ ক্লেশ, করিয়া সংগ্রাম
প্রতিকূল সংসারের সনে বীরদর্পে,
গেলেন কেশব আজি ভারত ছাড়িয়া।
তোমার অভাবে দেব! হে ভারতমণি!
কত যে সহিবে ক্লেশ ভ্রাতৃগণ তব,
কহিব কেমনে তাহা। হৃদয় বিহীন
আর্য্যের সন্তান মোরা—তথাপি তোমার
অভাবের পূর্ণ ক্লেশ বুঝেছি অন্তরে।
সুযোগ্য গৌরব তব আমরা কি জানি
দেব? জন্মভূমি মাঝে গৌরব তোমার
হায়, কে রাখিবে বল? ইংলণ্ড, জর্ম্মনি,
আমেরিকা, ফ্রান্সরাজ্যে গৌরব তোমার
হইবে প্রকৃত ভাবে; জ্ঞানের গৌরব
বুঝে তারা। আর্য্যজাতি সেই সুপ্রাচীন
থাকিত ভারতে যদি, তা' হ'লে বুঝিত
তোমার গৌরব তারা মরমে মরমে,
যোগ্যতার সমুচিত হইত আদর!
কিন্তু এ ভারত আজি ভীষণ শ্মশান,
শৃগাল কুক্কুরে পূর্ণ, পূতি-গন্ধময়,

জ্বলিতেছে চারি ধারে চিতা অবিরত!—
ভীষণ এ দৃশ্য! দেব! সে ভারত নাই—
দেখে'ছ ত সব তুমি, তবে আর কেন,
আর কেন অকারণ দ্বিগুণ যাতনা?—
তথাপি গৌরব দেব! রহিবে তোমার
এ ভারতে যতদিন ভারতীয় রবে।—
সংসার ভিতরে রবে মানব যাবৎ,
তাবৎ ধরণীতলে ইতিহাস পটে
তোমার মোহন মূর্ত্তি প্রদীপ্ত অক্ষরে
রহিবে লিখিত! ভাবী নরকুল দেব!
ভক্তি ভাবে নত হবে তোমার সম্মুখে।
যাও তবে, মহাযোগি! বিজয়ি কেশব!
ভাসাইয়া শোক-নীরে জন্মভূমি, মাতা,
অনুজ আত্মজগণ, পত্নী ভাগ্যহীনা,
আত্মীয়, স্বদেশবাসী যত ভ্রাতৃগণে,—
যাও তবে শান্তিময় অনন্ত উদ্দেশে!
যে বিপুল শুভকর্ম্ম করেছ সংসারে,
বিন্দুমাত্র তাহা কভু হ'ব না বিস্মৃত;
বিরলে বসিয়া সদা হৃদয়-দর্পণে
হেরিব মোহন মূর্ত্তি, কাঁদিব হেরিয়া।

কি লিখিব?

কি লিখিব তাহা জানিনা, তথাপি লিখিতেই হইবে; নচেৎ শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর প্রবাহ-সম্পাদক মহাশয় ছাড়েন না। তাঁহার সহিত আজন্মকালের আত্মীয়তা—আজি সামান্য দুই ছত্র লেখা না লিখিলে যদি সে আত্মীয়তা নষ্ট হয়, তবে সে দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই। কাজেই লিখিতে বসিলাম। কিন্তু কি লিখিব তাহা জানি না—না জানিলেও লিখিতে হইবে, এ বড় দায়! প্রবাহে লিখিয়াছি অনেক, প্রবাহ বাঁচিয়া থাকিলে লিখিতেও হইবে অনেক। যখন লিখিয়াছি তখন যাহা ভাবিয়াছি, বুঝিয়াছি ও জানিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি। ভবিষ্যতে যাহা লিখিব তাহাও যাহা ভাবিব, বুঝিব ও জানিব তাহাই লিখিব বলিয়া স্থির ছিল। কিন্তু এবারকার মত দায়ে পড়িয়া লিখিতে হইবে তাহা একদিনও ভাবি নাই। না ভাবিয়া, না বুঝিয়া, না জানিয়া লেখা বড় ঝকমারি। মাথায় কথা নাই তথাপি চেষ্টা করিয়া কথা তৈয়ার না করিলেই নহে—এ বড় মুস্কিলের কথা। আজি কালি বাজারে যে এরূপ হয় না, এমন নহে। চারিদিকে এরূপ ব্যাপার রাশি রাশি চলিতেছে বটে। বলিবার কথা নাই, বুঝিবার বিষয় নাই, মতের স্থিরতা নাই, ন্যায়ের বিচার নাই তথাপি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ সমূহ প্রায়ই অনেক সুদীর্ঘ সংবাদপত্রের সুদীর্ঘ স্তম্ভ অধিকার করিতেছে। না বুঝিয়া মত প্রকাশ, না পড়িয়া পুস্তক সমালোচনা, না জানিয়া সংবাদ ঘোষণা, না শিখিয়া শিক্ষাদান, এবং নূতনত্বের কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণ ও পুনরাবৃত্তি এ সকল তো আজি কালি হাজার হাজার চলিতেছে। তবে এ বাজারে কি লিখিব না জানিয়াও লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত দোষের কথা নহে, অসম্ভবও নহে। এই সকল বিবেচনা করিয়াই আত্মীয়প্রবর প্রবাহ-সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে বসিলাম। একটা আসরে বসিয়া খানিকটা অসার বকামি

যে না করা যায় এমন নহে। যদি খানিকটা অসার বকামি করা যায় তবে খানিকটা অসার লেখা কি আর চলে না ? ভাবনার বিষয় এই যে এতটা কালি, কলম, কাগজ ব্যয় করিয়া যে দুষ্কর্ম্ম করিব তাহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে তাহা কিন্তু কিছুই জানি না। হয়ত সম্পাদক মহাশয় আমার এই মস্তকহীন বকামি-ঘটিত প্রবন্ধ নিতান্ত অসার বিবেচনায় প্রকাশ না করিয়া চোতা কাগজের সামিল করিয়া ফেলিয়া দিতে পারেন। না—সেরূপ করিলে আমার বিশেষ ক্ষতি আছে, আপত্তিও আছে। কারণ আমার স্থির বিশ্বাস আমার এই চোতা বকামিও বর্ত্তমানকালের কোন কোন চল্‌তি খবরের কাগজওয়ালা হাসিতে হাসিতে, খোষামোদ করিয়া, স্তম্ভ প্রতি দশ টাকা হিসাবে নগদ দক্ষিণা দিয়া, মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া আপনাদের কাগজে বুক ফুলাইয়া ছাপাইয়া কৃতার্থ হইতে পারে। এরূপ স্থলে আমার এ প্রবন্ধ চোতা প্রবন্ধ, বাতিল মাল, ডামিশ সামগ্রী বলিয়া প্রবাহের (সুযোগ্য কি অযোগ্য জানিনা) সম্পাদক মহাশয় যদি লোকসান করেন, তাহা হইলে এ দীন হীন ভট্টাচার্য্যের অনেক ক্ষতি। প্রথম ক্ষতি, ইহা কোন কোন সংবাদ পত্রে দিলে নিশ্চয়ই যে টাকা পাইতাম তাহা পাইলাম না; দ্বিতীয় ক্ষতি, ইহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে সেই সংবাদপত্রের মালিকগণ আমার নিকট যাবজ্জীবন যেরূপ করজোড়ে ক্রীতদাসের ন্যায় থাকিত তাহা থাকিল না; তৃতীয় ক্ষতি, সে কাগজের জমাদার ও পাউণ্ডকীপার পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে মধ্যে আমি ক্রমে ক্রমে দিগ্‌গজ পণ্ডিতের ন্যায় যে পসার করিয়া লইতে পারিতাম তাহা পারিলাম না; চতুর্থ ক্ষতি, এইরূপ সংবাদপত্রে দুই একটা প্রবন্ধ বাহির করিতে করিতে কালে হয়ত আমি অমুক পত্রের প্রধান লেখক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া একখানা অতি বড় খবরের কাগজ বাহির করিয়া একজন মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইয়া দাঁড়াইতে পারিতাম, তাহার উপায় থাকিল না—ইত্যাদি। তথাপি হে প্রবাহ-সম্পাদক মহোদয়, তোমার সহিত বন্ধুত্ব আমি নষ্ট করিতে চাহি না, আমার সে সাধ্যও নাই তোমার অনুরোধে আমি যাহা পারিয়া উঠিলাম তাহা লিখিয়া দিলাম। যদি তোমার এ প্রবন্ধ মনোনীত না হয় কি করিব ? কিন্তু তুমি আমার এ প্রবন্ধ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমার সকল আশার পথে কণ্টক দিও না, আমার ভরা নৌকা কূলে ডুবাইও না। তুমি দয়া করিয়া প্রবন্ধটী আমাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিও, আমি ইহা একটু অদল বদল করিয়া দিয়া অতি বড় কোন সংবাদ পত্রে চালাইয়া দিব। অদল বদলের কথায় ছল ধরিয়া তুমি হয়ত বলিবে যে, 'তোমার এ প্রবন্ধ বিশেষ অদল বদল না করিলে জাঁকাল সংবাদপত্রও ইহা গ্রহণ করিবে না।' কথাটা একপক্ষে ঠিক বটে। দেখিয়া দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, জাঁকাল অতিবড় সংবাদ পত্র করিতে হইলে একটু বেশী মাত্রায় বেলয় ও অতিরিক্ত বেঠিক হওয়া আবশ্যক। যদি বল কিসে ? আমি তোমাকে দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া দিতেছি। তুমি জান বোধ হয়, (বোধ হয় বলিলাম কারণ তুমি ঐ সকল সংবাদ পত্র পড়িয়া সময় নষ্ট কর কি না জানি না; আমি ফলতঃ হাতে কোনই কর্ম্ম না থাকায় ঐরূপ সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে হাসিয়া কাল কাটাই) যখন লর্ড রীপণ কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন, তখন ঐ

শ্রেণীর সংবাদপত্র তাঁহাকে ধ্রুবলোকে বসাইল, তাঁহার সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করিল, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিল, পাঠ করিয়া বোধ হইল যেন তাহারা লর্ড রীপনের রাজীব চরণে প্রাণ-বলি দিতেও কাতর নহে। এত কথা যে তাহারা বলিল ভাবিওনা যে কেবল ইলবার্ট-বিল লর্ড রীপন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া। না—ইলবার্ট বিল একটা সামান্য কথা বলিয়া তাহারা জানে এবং তাহাই বলিল। তাহারা রাজপ্রতিনিধির যে স্তুতিবাদ করিল সে তাঁহার ভারতে পদার্পণের দিন হইতে সেই দিন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া, সমস্ত গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার অনেক স্থানের অনেক বক্তৃতার মত বুঝিয়া, চিবাইয়া, গিলিয়া ও হজম করিয়া। অতএব ভাই, তুমি হয়ত মীমাংসা করিবে যে এরূপ মত নিশ্চয়ই পাকা মত। না না, তাহা মনে করিলে তুমি প্রতারিত হইবে। তাহা যদি তুমি মনে কর তাহা হইলে এই সকল শ্রেষ্ঠ এবং শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রের মর্ম্মই তুমি বুঝিতে পার নাই। তাহার পর যে দিন লর্ড রীপন বুঝিয়া বা না বুঝিয়া, ভয়ে বা যুক্তিপথে, অবিচারে বা সুবিচারে ইলবার্ট বিলের বিরোধীদিগের মতের কিয়ৎপরিমাণ অনুবর্ত্তী হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন সেইদিন, ভাই, ঐ সকল উচ্চ সংবাদপত্র লর্ড রীপণের সমস্ত গুণগ্রাম ভুলিয়া গেল; সমস্ত কার্য্য কলাপ বিস্মৃত হইল, কোন বক্তৃতারই মর্ম্ম মনে রাখিল না, সমস্ত কৃতজ্ঞতা বমি করিয়া করিয়া ভুলিয়া ফেলিল, প্রাণবলি দূরে থাকুক তাঁহার নিমিত্ত মস্তকের একগাছি কেশ নষ্ট করাও পাপ বলিয়া জ্ঞান করিল এবং যাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছিল তাঁহাকে ভীত, কাপুরুষ, স্বার্থপর প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিতে লাগিল। মনুষ্য মাত্রেই যে ভ্রমপরায়ণ তাহাও কি ইহারা বুঝে না ভাই? যদি বুঝে তবে হঠাৎ মাথায় তুলিয়া নাচে কেন, তখনই আবার পায়ে নামাইয়া ছানে কেন? ইহাদের ব্যবহার দেখিলে ইহাদের বাতুল বলিয়াই বোধ হয়। অতএব ভাই, যদি ইহাদের কাগজে আমাকে স্থান লইতে হয় তবে কাজেই আমি পাগল হই বা না হই, আমার লিখিত প্রবন্ধকে কিয়ৎপরিমাণে বাতুলের লিখিতবৎ দাঁড় করাইতে হইবে, নচেৎ সে অঞ্চলে পসার জমিবে না, বুঝিলে? এই জন্যই অদল বদলের কথা বলিলাম। আমি আজি যাহা লিখিতেছি তাহাও পাগলামি বটে, কিন্তু এতটুকু লয়-দোরস্ত পাগলামিও সে রাজ্যে কলিকা পাইবে না। সেখানে খুব ভাল প্রবন্ধ-লেখক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হইলে প্রথম প্যারাগ্রাফে (এঃ প্যারাগ্রাফ লিখিয়া ফেলিলাম, তুমি হয়ত বাঙ্গালার মধ্যে ইংরাজি ফোড়ন দেখিয়া চটিয়া লাল হইবে। কিন্তু ভাই আমি ইহার বাঙ্গলা জানি না।) যাহা লিখিতে হইবে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের সহিত তাহার ঐক্য না থাকা আবশ্যক। আর শব্দ সকল বাছিয়া বাছিয়া এমনি স্থির করা ও সাজান আবশ্যক যে শুনিতে বড়ই মধুর হয় অথচ অর্থে বড় তফাৎ না হয়। একটা 'যথা' না দিলে তুমি হয়ত বুঝিতে পারিবে না, তাই একটা 'যথা' দিয়া বুঝাইয়া দিই।যথা; মহামনস্বী অমুক, অমুক স্থানে, অমুক বিষয়ে যে বক্তৃতা করিলেন তাহা প্রাবৃটকালের মেঘের ন্যায় ধ্বনিত, ঘোষিত, শব্দিত, গর্জ্জিত ও নিনাদিত হইল। শেষ

প্যাঁচটা কথা পড়িয়া হাসিও না ; এমন হয় না মনে করিওনা। ইহারই নাম ভাল বাঙ্গলা—জোর কলম—উৎকৃষ্ট রচনা। অতএব আমার প্রবন্ধ ঐরূপ সংবাদপত্রে পাঠাইতে হইলে, তোমার পছন্দ এ হতশ্রী ভাষায় চলিবে না তো। তোমার কাগজে বিনা পয়সায় লেখা—লাভ কেবল আত্মীয়তা। অতএব তোমাকে যা তা দিয়া চালাইয়া দেওয়া না যায় এমন নহে। কিন্তু তাহারা টাকা দিবে, আমার নিকট হইতে অবশ্যই কাণ মলিয়া ভাল মাল আদায় করিয়া লইবে। 'রোকা কড়ি, চোকা মাল।' জানত ? আর যে কেন কত অদল বদল করার আবশ্যক, বলিয়া ফুরাইতে পারি না। যদি তোমার তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়—ঐরূপ সংবাদপত্রের মহিমা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা সহজেই সাধিত হইবে। তোমাকে অধিক কষ্ট করিতে হইবে না, তুমি এক সপ্তাহের জাঁকাল সংবাদপত্র মনোযোগী হইয়া পাঠ করিও, তাহা হইলেই শিক্ষা সমাপ্ত হইবে।

যাক্, এখন কি লিখিব তাহাই যে ছাই বুঝিতে পারি না। কি জ্বালা! এই জ্বালায় পড়িয়া তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি রাগ করিওনা ভাই। আমি একটা পরামর্শের কথা বলিতেছি মাত্র। তুমি—বলিতে সাহস হয় না—কথা মন্দ নয়—তুমি তোমার প্রবাহ খানাকে খবরের কাগজ করিয়া ফেলিতে পার ? খুব দাম কম করিয়া, এমন কি বিনামূল্যের রকম করিয়া, যদি উহাকে খবরের কাগজ করিয়া ফেলিতে পার, তাহা হইলে ভাই, ওঃ! রাশীকৃত গ্রাহক হয়, আর আমাদেরও লিখিবার বিষয় খুঁজিয়া মাথা খুনোখুনী করিতে হয় না। আমি তো তোমার অনুগত লোক আছিই, 'প্রবাহ সংবাদ পত্রিকা' (কর যদি তো 'পত্রিকা' নাম দিও, নচেৎ ভাল শুনাইবে না। তোমার স্বর্গীয় মাতুল দেবের ব্যাকরণের গৎ এখন তো করিয়া রাখ। যাহা ভাল শুনায় তাহাই লিখিতে হইবে।) হইলে আমি তোমার আরও অনুগত হইয়া থাকিব এবং আমি হলপ করিয়া বলিতেছি. তোমার 'প্রবাহ সংবাদ পত্রিকার' দল ছাড়িয়া আমি এডুকেশন গেজেট পত্রিকা,' বা 'সোমপ্রকাশ পত্রিকা' বা অন্য কোন পত্রিকার দলে মিশিব না এবং জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ স্বয়ং বা বেনামী করিয়া কোন নূতন সংবাদ পত্রিকা প্রকাশ করিব না। যদি করি বা করে (কে তাহা জানি না) তাহা নামঞ্জুর। এতদর্থে বহাল তবিয়তে সর্ত্ত লিখিয়া দিলাম। অতএব ভাই, তুমি ত্বরায় 'প্রবাহ মাসিক পত্র' উঠাইয়া 'প্রবাহ সংবাদ পত্রিকা' প্রচার করিতে থাকহ। আমার অনুরোধ, তুমি আগামী বারের বঙ্গবাসীতে এতদ্বিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া দেও। বিজ্ঞাপন কাগজে পাঠাইবার পূর্ব্বে একবার আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে, আমি তাহা একবার দেখিতে চাহি। তাহাতে কতকগুলা লেখকের নাম থাকা আবশ্যক। তাহার তদ্বির করিবে। যত্ন করিয়া নিয়ত উচ্চশ্রেণীর সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া করিয়া এসম্বন্ধে আমার একটা ব্যুৎপত্তি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অতএব তুমি সংবাদ পত্র প্রচার করিতে ভয় পাইও না ; যখন আমি তোমার সহায় আছি তখন এ কার্য্যে তোমার জয় নিশ্চিত। উচ্চশ্রেণীর সংবাদ পত্রের কয়েকটী কথা উপরে লিখিয়াছি, নিম্নে আরও দুইটী সঙ্কেত লিখিয়া দিতেছি। সঙ্কেত কয়টী আলোচনা করিলে তুমি সহজেই বুঝিতে

পারিবে, সংবাদ পত্রিকা সম্পাদন নিতান্ত কঠিন কার্য্য সন্দেহ নাই. কিন্তু সম্পূর্ণ অসাধ্য নহে।

১। সংসারের হাজুক বা মজুক তাহার সহিত তোমার অন্তরের কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না। তুমি আপনার কাজ করিতে বসিয়াছ, প্রাণপণ যত্নে যাহাতে দু'পয়সা আয় হয় তাহার তদ্বির করিতে নিযুক্ত থাকিবে।

২। প্রজা কে বা তাহারা কিরূপ সামগ্রী ও কোথায় থাকে তাহা ভাল করিয়া জান বা না জান, তোমাকে প্রজাপক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। তাহাদের ক্ষতি বৃদ্ধিতে তোমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই তথাপি তোমাকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজার মুখপাত্র সাজিতে হইবে। কারণ ডাক-মুন্‌সি, পাউণ্ড-কীপার, বিল-সরকার, কনষ্টবল প্রভৃতি উপযুক্ত মহাপুরুষেরা তোমার কাগজের উপর রাজি না থাকিলে তোমার অন্ন হইবে না। তাহারাই তোমার গ্রাহক হইবে ইহা স্থির জানিবে। সে সকলই প্রজা। এতদ্ব্যতীত যদি কোন উচ্চশ্রেণীর লোক তোমার কাগজের গ্রাহক থাকেন, নিশ্চয় জানিবে, তিনি তোমার তালহীন কাগজ পড়িয়া Punch পাঠের বাসনা চরিতার্থ করেন। তাঁহার উপর তুমি ভরসা করিও না। তোমাকে প্রজাপক্ষ হইতেই হইবে।

৩। প্রজার কিসে ভাল হয় কিসে মন্দ হয় তাহা তোমার জানিবার দরকার নাই। যে কেহ বলিবে, 'এইরূপ ব্যবস্থা করিলে প্রজার সমূহ হিত হইবে'—তুমি অমনি সেই ব্যবস্থার অনুকূলে কলম ধরিবে ও ঘোর চীৎকারে গগন ফাটাইবে। বস্তুতঃ যদি সে ব্যবস্থায় প্রজার হিত না হইয়া অহিত হয় তাহা হইলেও তুমি প্রাণ থাকিতে আপনার সুর ছাড়িবে না। যেমন বর্ত্তমান কালে প্রজার হিত সাধনার্থে 'রেণ্ট বিল' হইতেছে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতেছেন, এই বিল আইন হইলে প্রজার বিশেষ অনিষ্ট হইবে। তুমি কিন্তু সে যুক্তি, সে তর্ক কখন শুনিবে না। কিসে রেণ্ট বিল ত্বরায় বিধিবদ্ধ হয় সে জন্য তুমি যতদূর পার কলম চালাইবে।

৪। কৃষ্ণদাস পালকে কারণে অকারণে প্রতিনিয়ত গালি দিবে। এক কারণ, কৃষ্ণদাস পালের মত জ্ঞান ও বুদ্ধি বাঙ্গালা খবরের কাগজসম্পাদকের প্রায় দেখা যায়না; কারণ, অপর সমস্ত বাঙ্গালী জ্ঞানে, পদে, প্রতিষ্ঠায়, ক্ষমতায় ও গুণে কৃষ্ণদাস পাল বাঙ্গালীর চূড়ামণি। তুমি যদি কাগজ করিয়া এহেন কৃষ্ণদাস পালকে নিয়ত গালি দিতে পার, তাহা হইলে তোমার বর্ব্বর পাঠকগণ মনে করিবে, না জানি আমাদের 'এডিটর' কত বড় লোক; সে কৃষ্ণদাস পালকেও নিয়ত গালি দেয়। তোমার পসার খুব জমিয়া যাইবে এবং পাউণ্ড-কীপার মহাশয়েরা তোমাকে ধন্য ধন্য করিবেন।

৫। মত লইয়া মারামারি করিয়া মরিও না, কেবল স্বার্থের চেষ্টায় ঘুরিবে। যেখানে স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা আছে সেখানে মতকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া বলিদান দিবে। একটা দৃষ্টান্ত দেখ। একজন গ্রন্থকার তোমার কাগজে দীর্ঘকালের নিমিত্ত একটা বিজ্ঞাপন দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুস্তকখানিও সমালোচন করিতে দিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পুস্তক নিতান্ত নিকৃষ্ট ও অপাঠ্য হইলেও তুমি বলিবে, এরূপ আশ্চর্য্য পুস্তক প্রায় দেখা যায় না। আর যিনি তোমার কাগজে কোন বিজ্ঞাপন দেন না অথবা তোমার স্বার্থসিদ্ধির কোন সহায়তাও করেন না, তাঁহার পুস্তক বাস্তবিক

অতি চমৎকার হইলেও বলিবে, এরূপ জঘন্য পুস্তক কেন প্রচার করা হইল, তাহা আমরা জানি না। আবার এই শেষোক্ত গ্রন্থকার যদি কিছুকাল পরে তোমার স্বার্থসিদ্ধির কোন উপায় করিয়া দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কোন গ্রন্থ তোমাকে সমালোচনা করিতে দেন, তখন বলিবে, এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ যে না পড়িল তাহার বৃথায় জন্ম।

৬। যাহা জান না, জানিবার সম্ভাবনাও নাই, তাহা লইয়াই অধিক গলাবাজি করিবে। যেমন, মিসরে যুদ্ধ হইতেছে। তুমি মিসর কোথায় জান না, যুদ্ধ কাহাকে বলে তাহাও বুঝ না, সৈন্য দেখিলে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া থাক। তুমি সেই সময় বৃটিশ সেনানায়ককে উপদেশ দিতে লাগিলে, যদি ইংরাজ সৈন্যগণ অমুক স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দুর্গ আক্রমণ করেন তাহা হইলে জয় নিশ্চিত। একথা যুদ্ধ-বিদ্যায় মহাপণ্ডিত কোন ইংরাজ সম্পাদক লিখিয়াছিলেন। তুমি তাঁহারই কথা চুরি করিয়া চালাইয়া দিলে। ইংরাজগণ সেই ইংরাজ সম্পাদকের মতানুসারে কার্য্য করিয়া জয়ী হইলেন। তুমি অমনি পরসপ্তাহে বলিয়া উঠিলে, আমাদের উপদেশানুসারে কার্য্য করায় ইংরাজগণ মিসর-সমরে জয়লাভ করিয়াছেন। তুমি কিন্তু মনে মনে জান, তোমার চোতা বাঙ্গালাকাগজ ইংরাজগণ দেখা দূরে থাকুক স্পর্শও করে না, এবং যে মত তুমি ব্যক্ত করিয়াছ তাহা কেবল তুমি কেন, সমস্ত বাঙ্গালী একত্র হইয়া ভাবিলেও স্থির করিতে পারে না। তাহা হইলে কি হয় ? তোমার পাহারাওয়ালা পাঠকেরা তো ভাবিল, আমাদের 'হেডিটার খুড়া সবজান্তা—দ্বিতীয় গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ'।

আজি ভাই তোমাকে মোটামুটি হাপ-ডজন সঙ্কেত লিখিয়া পাঠাইলাম। যদি তুমি প্রবাহ মাসিকপত্রকে প্রবাহ সংবাদ-পত্রিকা করিতে মত কর, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার যত জ্ঞান আছে, তাহা আমি ক্রমে ক্রমে তোমার পেটে ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। তুমি মন স্থির কর। সংবাদ-পত্র নিতান্ত কঠিন কথা বলিয়া ভয় পাইও না। চেষ্টায় কি না হয় ? চেষ্টা করিলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।' তোমার কাগজ হইলে আমি একটী উপযুক্ত লেখক দিব। তাহার নিবাস বম্বে নগরে। তিনি মোটে বাঙ্গালা জানেন না কিন্তু ইংরাজিতে 'এম, এ' পাশ করিয়াছেন, আর বড় সুপণ্ডিত। মোটে বাঙ্গালা না জানিলেও বাঙ্গালা কাগজে লেখা চলিতে পারে। ক্রমে তাহা জানিতে পারিবে; এই লোকটীরনাম মানিকজি কর্ষণজি। তুমি বিজ্ঞাপনে ইহাঁর নাম দিতে পার। এ নামে অনেক গ্রাহক ভুলিতে পারে।

পত্রখানা মাথামুণ্ড বকিতে বকিতে নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অথচ বিষয় স্থির করিয়া একটা প্রবন্ধ লেখা হইল না। বারান্তরে তোমাকে নিশ্চয়ই বিহিতরূপে প্রবন্ধ লিখিয়া দিব। এ যাত্রা মাপ ক'র ভাই। মাসিক পত্র ভাঙ্গিয়া সংবাদ-পত্রিকা করা মত হইল কিনা পত্রান্তরে লিখিবে, তাহা হইলে আমি তদনুরূপ প্রবন্ধ লিখিতে যত্নবান্ হইব। ইতি।

অভিন্ন

শ্রীযোগেশ্বর শর্ম্মা।

বিদ্যুল্লতা।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাকাশে কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশীর চন্দ্রমা মলিন হইয়া পড়িয়াছে। নভোমণ্ডল-প্রক্ষিপ্ত তারকানিচয় ক্ষীণ-প্রভ হইয়া একে একে একে গগনের গায়ে বিলুপ্ত হইতেছে। এখনকার আকাশের দিকে চাহিয়া কে বলিবে, যামিনী অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত তেমন ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, তেমন মুসলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল, তেমন ভীষণ বজ্রনাদে ধরণীকে কম্পিত করিয়াছিল। শেষ রাত্রির নির্ম্মল আকাশ দেখিয়া সে দুর্যোগের কথা কাহারও মনে আসিত না। এখন পক্ষিগণ কলরব করিতেছে, গৃহে গৃহে শিশু সন্তানগণ ক্রন্দন করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে, প্রাতঃস্নায়িগণ একে একে জাহ্নবী-তীরে উপস্থিত হইয়া স্নান ও ভাগিরথীর স্তব পাঠ করিতেছে, শান্ত প্রবাহে তরণী ভাসাইয়া দিয়া নাবিকেরা কলরব করতঃ সজোরে বাহিয়া যাইতেছে, রাজপথে কেঁ কোঁ শব্দে কাতার দিয়া শকট-সমূহ চলিয়া যাইতেছে, আর রজনীর তিমিরাবরণ ছিন্ন করিয়া পূর্ব্বাকাশে গৌরাঙ্গী ঊষা রূপসী সুষুপ্ত জগতের অচৈতন্য বিনাশ করিতেছে। এই মধুর, শীতল সময়ে মৃদুল সমীরণ যেন কুসুম-কলিকা প্রস্ফুটিত করিতেছিল—সকরুণ বিধাতার কৃপাকটাক্ষপাতে পীড়িতা রমণীর জীবন-পুষ্প চৈতন্য-সঞ্চারে তেমনি পুনর্জ্জীবিত হইতেছিল।

পীড়িতা রমণী নয়ন উন্মীলন করত তখনই আবার নিমীলিত করিল, পরক্ষণেই অতি কাতরস্বরে যাতনা-সূচক "মা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইল। পার্শ্বস্থ রমণী অমনি "কেন মা" বলিয়া অতি সাবধানে পাশ ফিরাইয়া দিল। এবং আস্তে আস্তে তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। পীড়িতা আবার "উঃ উঃ" করিয়া উঠিয়া যে পার্শ্বে পূর্ব্বে শয়িত ছিল সেই পার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে "আঃ—একটু জল দাও" বলিয়া মুখ ব্যাদান করিল। স্ত্রীলোকটী ত্রস্তভাবে উঠিয়া সাহেব ও তাহার সমভিব্যাহারীকে ডাকিয়া আনিল। পীড়িতার নয়ন তখন নিমীলিত—অথচ জল পান করিবার জন্য সে মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। বাবু দেখিতে পাইয়া তখনই একটু জল দিতে বলিলেন। জল পান করিয়া রমণী যেন একটু সুস্থ হইল—দেখিয়া সাহেব কহিলেন, "নগেন—তবে ইনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন—চৈতন্যের সঞ্চার হইয়াছে—আমাদের এখানে থাকা অবিধেয়—আমাদিগকে দেখিলে হয়ত আবার মূর্চ্ছিতা হইবেন—চল আমরা সরিয়া যাই।" এই বলিয়া পরিচারিকা স্বরূপ সেই স্ত্রীলোকটীকে আরও সাবধান করিয়া দিয়া তাঁহারা উভয়ে সরিয়া গেলেন।

প্রাতে ডাক্তার বাবু আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন—পীড়িতার অবস্থা দেখিয়া পুলকিত চিত্তে কহিলেন "আজিই ইনি মনের স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিবেন, আর কিঞ্চিৎমাত্র ভয়ের কারণ নাই—আপ-

বাবা যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন আমিও তদ্রূপ কাতর ছিলাম—যাহা হউক ভগবান এ যাত্রা ইহাঁকে রক্ষা করিলেন।” তাহার পর ডাক্তার বাবুর সহিত সাহেবের বিশেষ পরিচয় হইল, রমণী কে তাহা লইয়া আন্দোলন হইল, কেহই তাহার পরিচয় অবগত নহেন, সুতরাং ক্ষণকাল বৃথা আলোচনায় পরস্পর সৌহৃদ্য দৃঢ়তর করিয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক ডাক্তার বাবু বিদায় হইলেন। সাহেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারিদ্বয় পর্য্যন্ত ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আসিলেন, দ্বারে দাঁড়াইয়া সাহেব কহিলেন “নগেন্দ্র আর বিলম্ব করিও না এখনই যাও, নিকটস্থ স্থানে গিয়া রমণীর পরিচয় জানিয়া আইস। ইহাঁর আত্মীয়গণের সন্ধান পাইলে যেন আমাকে সংবাদ না দিয়া কাহাকেও সঙ্গে করিয়া আসিও না। আমাকে দেখিলে হয়ত হিন্দুরা এখানে আসিয়া আত্মীয়ের সংবাদ লওয়া দূরে থাকুক—পীড়িতার সহিত সকল সম্বন্ধই অস্বীকার করিবে।’ নগেন্দ্রও বিদায় হইলেন। সাহেব ফিরিয়া আসিয়া পীড়িতার কক্ষের পার্শ্বস্থ কক্ষে বসিয়া পূর্ব্ববৎ অকূল চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সে রমণীর জন্য কেন তাহার হৃদয় এত কাতর হইয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ জ্বলিয়া উঠিতেছে আর এমন কথা মনে হইতেছে যে, তিনি প্রকাশ করিতে সশঙ্ক সাহেব পাশের ঘরে বসিয়া এইরূপ কত ভাবনায় কত ভাঙ্গিতেছেন কত গড়িতেছেন। এ ঘরে পীড়িতা আবার নয়ন খুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন, পার্শ্বস্থ বাক্‌শূন্যা সজল নয়না স্ত্রীলোকটীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, সে দৃষ্টি কৌতূহল, বিস্ময়, কাতরতা ও কৃতজ্ঞতা-পরিপূর্ণ দেখিয়াই নয়ন মুদিত করিলেন, অমনি নয়নদ্বয়ের কোণ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইতে লাগিল, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বহিল, তিনি আবার চাহিয়া আস্তে আস্তে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি মা—তুমি কি স্বরূপা।” বলিতে বলিতেই তাহার নেত্রে আবার অশ্রু বহিল। নয়ন যুগল মুদিয়া আসিল। স্বরূপা উত্তর করিল না, শুধু কাঁদিয়া ফেলিল। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরব থাকিলে পর রমণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “স্বরূপা—এখানে আমাকে কে আনিল? ওঃ আমি যে একজনের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছি। স্বর্ণ! তুইও কি হতভাগী!” স্বরূপা বলিল “মা—একটু চুপ করিয়া থাক ডাক্তার বাবু বলিয়া গিয়াছেন’। “স্বরূপা আমি আর এখানে থাকিব না। স্বর্ণকে দেখিব—হায় হায় স্বর্ণ! তোর কি দুর্গতি করিয়াছি”

পাশের ঘর হইতে সাহেব কহিয়া উঠিলেন—“অত কথা কহিতে দিও না।” রমণী নীরব হইল—স্বরূপাও নীরব হইল।

[illegible] পরিচ্ছেদ।

“স্বরূপা” “স্বর্ণ” বলিয়া পীড়িতা রমণী যাহাকে সম্বোধন করিয়াছেন সে সেই গিরিশ চন্দ্রের পালিত কন্যা। পুনরায় তাহার বিবাহের কথা উত্থাপন করাতে সে স্বর্ণলতার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়াছিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে—তাহার কথা লইয়া বিদ্যুল্লতা স্বর্ণকে একটু তিরস্কার করিয়াছিলেন।

পীড়িতা রমণী বিদ্যুল্লতা, বিদ্যুল্লতা গিরিশকে হরাশাঁড়ের বাটীতে বদ্ধ করিয়া চিত্তের বিকলতা বশতঃ গত রাত্রেই স্বর্ণলতাকে লইতে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে দস্যুহস্তে পতিত

হইয়াছিলেন। দস্যু তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিবে বলিয়া সেই ভয়ঙ্কর স্থানে আনিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দেবতার কৃপায় পথিকদ্বয় কর্ত্তৃক তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। তাঁহার অচেতন অবস্থায় পথিকদ্বয় তাঁহাকে লইয়া সুরূপার মাসীর দোকানে আসিয়া সেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুর্য্যোগের রাত্রি বলিয়া সুরূপা জাগিয়াছিল, পথিকেরা একটা প্রদীপ ও একটু জল যাচঞা করাতে সুরূপা দ্বার খুলিয়া আলো ও জল দিয়া দূর হইতে দেখিতেছিল। বিদ্যুল্লতাকে চিনিতে পারিয়া সুরূপা একবারে আছাড়িয়া পড়িয়াছিল। পথিকদ্বয় সুরূপার ও বিদ্যুল্লতার পরিচয় জানিবার জন্য বারম্বার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুরূপার মাসী কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সুরূপার একান্ত অনুরোধে তাহাও আর প্রকাশ করে নাই। সাহেব অথবা তাঁহার সমভিব্যাহারী বঙ্গীয় যুবা এ পর্য্যন্ত তাহাদের কোন পরিচয় পান নাই।

বিদ্যুল্লতাকে উত্তর উত্তর সুস্থ দেখিয়া, তাঁহার ঔৎসুক্য নিবারণার্থে সুরূপা যাহা যাহা জানিত সকলই বিদ্যুল্লতার নিকট ব্যক্ত করিয়াছে। কোথা হইতে সেই রাত্রে সেই সাহেব ও বঙ্গীয় যুবা সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহারা কে—সুরূপা তাহা জানিত না, সুতরাং বলিতে পারে নাই। সে এ কথাও বলিয়াছে যে, সাহেব তাহাকে তাঁহার কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

বেলা হইয়াছে—বিদ্যুল্লতা সম্যক সুস্থতা লাভ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন, সুরূপা তাঁহার মস্তকের সেই ক্ষতস্থানে ঔষধি লেপন করিতেছে—সম্মুখে নিকটেই সেই বারাণসী চেলিখানি শুকাইতেছিল। বিদ্যুল্লতার দৃষ্টি অকস্মাৎ তাহার একটী অঞ্চলের দিকে পতিত হইল। তিনি সুরূপাকে বস্ত্রখানি নামাইতে বলিলেন—হাতে করিয়া সেই অঞ্চলভাগ দেখিলেন—দেখিতে দেখিতে তাঁহার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল, অদ্ভুত আনন্দ, শোক, দুঃখ, বিস্ময় এককালে উদিত হইয়া তাঁহাকে কেমন এক প্রকার বিহ্বল করিয়া ফেলিল। তিনি কেমন এক বিচিত্র দৃষ্টিতে সুরূপার মুখের দিকে চাহিলেন—চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে হর্ম্ম্যতলেই শুইয়া পড়িলেন। নয়নদ্বয় নিমিলিত করিলেন—নীরব হইলেন।

সুরূপা যারপরনাই কাতরভাবে তাঁহাকে ধরিয়া কহিল "মা—কেন মা—অমন হইলে?" তাঁহার অঙ্গ স্পন্দন করিতে লাগিল। সুরূপার মনে হইল হয়ত বিদ্যুল্লতা পুনরায় পূর্ব্ববৎ অসুস্থ হইলেন। সে কাঁদিতে লাগিল, ভাবিতে লাগিল গিয়া সাহেবকে ডাকিয়া আনিবে। সুপ্তোত্থিত-প্রায় বিদ্যুল্লতা কিয়ৎক্ষণ নীরবে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ সুরূপা—এ কাপড় কোথায় পাইলে?"

সুরূপা সে বস্ত্রের বিষয় কিছুই জানিত না জানিত না যে অঞ্চলে বিদ্যুল্লতার স্বাক্ষর রহিয়াছে, জানিত না যে, যে দুর্ঘটনার দিবস বিদ্যুল্লতার সহ বিদ্যুল্লতার শ্বশুরবংশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে রূপনারায়ণ নদে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। সেই দিন—সেই কাল রূপী চিরস্মরণীয় অলক্ষণ দিবসে বিদ্যুল্লতার স্বামী সেই বস্ত্র খানি পরিধান করিয়াছিলেন —সেই বস্ত্র পরিয়া হায়, তাঁহার স্বামী জলমগ্ন হইয়াছিলেন। আজ এত দিন পরে —পাঁচ বৎসর পরে সেই বস্ত্রখানি দেখিয়া

তাঁহার চিত্ত কতদূর উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, কে বলিতে পারে!

সুরূপা বিদ্যুল্লতাকে তাদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময় সহ উত্তর করিল "কেন মা—এ খানা যে সাহেব তোমার মাথায় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন—কেন কি হইয়াছে?"

তখনই বিদ্যুল্লতার ইচ্ছা হইল সাহেবকে একবার দেখিয়া আইসেন—আবার "সাহেব" এই ভাবিয়া অভিলাষ পূরণে নিরস্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে একটী গাঢ়চিন্তা বদ্ধমূল হইয়া গেল। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন "তিনি সাহেব—তুমি বেশ করিয়া দেখিয়াছ—কেমন সুরূপা?"

সুরূপা উত্তর করিল "হাঁ—"

"সাহেব তোমার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলেন না?"

"হাঁ—তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"

"সাহেব বাঙ্গালায় কথা কহিয়াছিলেন?"

"হাঁ—"

"তিনি এখন কোথায়?"

"ওঘরে আছেন—বুঝি।"

"একটা কাজ করিবে সুরূপা—জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবে এ কাপড় খানি কার? আর তিনি ইহা কোথায় পাইয়াছিলেন?"

সুরূপা উঠিল—দুই এক পা চলিয়াছে মাত্র—বিদ্যুল্লতা ব্যস্তভাবে ডাকিলেন "সুরূপা—সুরূপা—ফিরিয়া আইস মা!" বিদ্যুল্লতার মনে পড়িয়াছে তিনি বঙ্গমহিলা, কুলকামিনী, বিধবা—পতিপ্রাণা হইয়া তদ্বিষয়ে এত সন্দিহান চিত্ত কেন? ছি ছি ছি—সে চিন্তা কি মনে ঠাঁই দিতে আছে, সে আশা কি বাড়াইতে আছে, সে সাধ কি হইতে দিতে আছে?

সুরূপা ফিরিয়া আসিল। নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন মা, এসব কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেছিলে?"

বিদ্যুল্লতার চিত্তের আর সে ভাব নাই, সে চিন্তাও নাই, তিনি কহিলেন "আমি কি বলিয়াছিলাম?—আমার ঠিক—সুরূপা—ও কথা কাহাকেও বলিও না মা।" কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন "সুরূপা—তুমি একবার স্বর্ণের নিকটে গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া একবার এখানে আনিতে পারিবে?"

সুরূপা বলিল "এখন আমি কেমন করিয়া তোমাকে একলা রাখিয়া যাইব মা—কে তোমার সেবা সুশ্রূষা করিবে? আর সাহেবও হয়ত এখন আমার যাইবার কথা শুনিয়া বিরক্ত হইবেন—তোমার প্রতি উহাঁর যে যত্ন, কাল সারারাত্রি তোমার পালঙ্ক ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন—"

"আমি কে সাহেবকে বল নাই?" বলিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে বিদ্যুল্লতা সুরূপার মুখের দিকে চাহিলেন।

"অমন অবস্থায় তোমায় পরিচয় কেন দিব মা? আমি কি জানিনা—অপর পুরুষের কাছে কুলকামিনীর পরিচয় দিতে নাই?"

"তবে এখন আমার কি উপায় করিবে?" বলিয়া বিদ্যুল্লতা বিমর্ষ হইলেন—সুরূপাও তদ্দর্শনে অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র মনুষ্যের উরস-আগারে, সৃষ্টিকর্ত্তা কি অনন্তব্যাপি ভাব-প্রসূতী চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সসীম অস্থি-কারাগারে সঙ্কীর্ণ আকাশে পরিবেষ্টিত থাকিয়া মানবচিত্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ভাবের উপলব্ধি

করিতে সমর্থ হয়! যাহা চক্ষু কর্ণের অগোচর, যাহা সাধারণতঃ বোধাতীত, এমন কি অদৃশ্য ভবিষ্যচিন্তাও সেই মানব চিত্তে উদিত হইতেছে। সংসারচিন্তা, ঈশ্বর চিন্তা, পারত্রিক চিন্তা একই মনের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে! সংসারের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া মনুষ্য ঐহিক সুখ, সম্পদ, খ্যাতি, যশ, প্রণয়, আত্মীয়তা, আবার রোগ-যন্ত্রণা, শোক, দুঃখ ইত্যাদির পৃথক পৃথক অথবা যুগপৎ চিন্তায় পর্য্যায়ক্রমে উল্লাসিত এবং বিষণ্ণ হইতেছে। এবম্প্রকার প্রতিদ্বন্দি চিন্তার মধ্যে মধ্যে আবার অদৃশ্য ভবিষ্যচিন্তা সেই অনন্ত পারত্রিক চিন্তা, নিরাকার পরমেশ্বরের চিন্তা—সেই ক্ষুদ্রমনে উদিত হইতেছে! চিত্তের কি অসাধারণ প্রসবিনী শক্তি, প্রতিপালিনী সহিষ্ণুতা, বিসর্জ্জিনী উদাসীনতা! এই কতক্ষণ যে চিন্তা মন বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল, অপর চিন্তার উদয়েই তাহা জলবিম্ববৎ কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল, আবার আর একটী নূতন চিন্তার আবির্ভাবে সে চিন্তাও স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোথায় সরিয়া গেল! চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই মনের ঈদৃশ দশার সাক্ষিস্বরূপ।

চিত্তের অনুভূতিও বিচিত্র! প্রণয় চিন্তায় জগৎ আনন্দময়, সুখপ্রদ; আবার শোকের উদ্দীপনে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন, অসহ্য যন্ত্রণাময় বলিয়া বোধ হয়! আজীবন বিরহিনী যখন প্রিয়তম প্রাণেশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলনের কথা ভাবিতেছে—তাহার হৃদয় খুলিয়া দেখ—তখন সে হৃদয়ে শোক, দুঃখ, যন্ত্রণার লেশ মাত্র দেখিতে পাইবে না। সে হৃদয় অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়—সে হৃদয়ে যাহা কিছু দৃষ্ট হইবে সকলি যেন উল্লাসে বিকসিত—প্রাতঃ-প্রস্ফুটিত কুসুমসদৃশ পীযুষে পরিপূর্ণ। সে হৃদয়ে—সে চিত্ত-সরসীতে—আশা-সমীর-সঞ্চালনে—বিবিধ বর্ণে বিবিধ সাধ রূপ সরোজ বিকসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে! আবার সেই বিরহিনী শোক-চিন্তায় অধীর হইলে দেখিবে, তাহার হৃদয়াকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন, বিষাদরূপী অগ্নিশেল অশনি সম ভীষণ নাদে সেই আকাশে গর্জ্জন করিতেছে, নিরাশ ঝটিকা প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতেছে—সেই অন্ধকারের মধ্যে শত শত যন্ত্রণা বিকট চীৎকারে ক্ষুদ্র হৃদয়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

আমাদিগের বিদ্যুল্লতা আযৌবন বিরহিনী—বাল-বিধবা। চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে যিনি বিধবা হইয়াছেন তাঁহাকে বাল-বিধবা বলিব না ত কি বলিব? তাঁহার পক্ষে ইহ জন্মে স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলন অভাবনীয়। তিনি পূর্ব্বে কখন তদ্বিষয়ের কোন চিন্তাই হৃদয়ে উদিত হইতে দেন নাই—সে চিন্তায় কত সুখ, কত আনন্দ তাহাও অনুভব করেন নাই। বস্ত্রখানি দেখিয়া একবার তাঁহার হৃদয়ে,—স্বামীকে হয়ত আবার দেখিতে পাইবেন, এই সুখকরী আশার উদয়ে, এক কালে কত আনন্দপ্রদা চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। আবার তখনি সে আশা দুরাশা মাত্র ভাবিয়া পুলকিত চিত্তকে বৈধব্যজনিত শোকের চিন্তায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত সাধ্বীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন—সন্দেহ নাই, কিন্তু এমন মনোহর, চিত্তরঞ্জিনী আশার একবার পুলকিত হইয়া, আশা-বর্দ্ধক পদার্থ সম্মুখে থাকিতে—সে আশায় কোন্ বিধবা এককালে জলাঞ্জলি দিতে সক্ষম হয়েন? তিনিও সে চিন্তা হৃদয় হইতে এক বারে তিরোহিত করিতে পারেন নাই! বাস্তবিক

তিনি এখন সেই চিন্তায় অধীর,। বাহিরে উদাসিনী, কিন্তু অন্তরে অন্তরে স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলন আশার পোষকতা করিয়া আসিতেছেন।

আরও একটী চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে—তিনি গিরিশের মুক্তি সাধন করিতে এখনও সক্ষম হয়েন নাই। কোন কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না—অথচ সেবিষয় গোপনে রাখিয়া অভিলাষ পুরণে অকৃতকার্য্য হওয়ায় যারপর নাই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। শরীরে এখনও এত সামর্থ হয় নাই যে স্বয়ং গিয়া স্বর্ণকে ডাকিয়া আনেন—সঙ্গে লইয়া সেই বিজন বনস্থলীতে গমন করেন। স্বরূপাকে পাঠাইতে গেলে পাছে কোন কথা প্রকাশ করিতে হয়, সেই আশঙ্কায় তাহাকে পাঠাইবার কথা আর মুখে আনিতে পারিতেছেন না।

অপরাহ্ণে, স্বকৃত পাপ হেতু অনুতাপে এত দগ্ধ হইলেন—স্বর্ণলতার দুঃখে এত কাতর হইলেন, তখনই গিরিশকে মুক্ত করিয়া স্বর্ণলতার প্রেমময় বক্ষে অর্পণ করিতে এত ব্যাকুল হইলেন যে, আপনার অভিলাষ গোপন রাখিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। স্বরূপাকে ডাকিয়া কহিলেন "মা—তুমি আমায় স্বর্ণের নিকট লইয়া চল। [illegible] সাহেবকে বলিয়া আইস—আমি সুস্থ হইয়াছি—আমায় বিদান দেন—"

স্বরূপা কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সাহেবকে বলিতে গেল। বিদ্যুল্লতা সিহরিয়া উঠিলেন—সাহেবের নিকট হইতে যাইতে হইবে। বিস্মৃতি সাগর মন্থন করতঃ ভূতপূর্ব্ব আনন্দদায়িনী চিন্তাকে পুনরুদ্ধার করিলেন—বিমনা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—তাঁহার চিত্তের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! এক দিকে গিরিশকে মুক্ত করিবেন এই অভিলাষ—অপরদিকে কিয়ৎকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া আরোগ্য লাভ করুন নাই করুন চিত্তের উৎকণ্ঠা দুর করিবেন এই বাসনা।

(ক্রমশঃ)।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

কাশী।

পূর্ব্বাবধি কাশীদর্শনের অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নানা কারণে যাইবার কালে সে বাসনা চরিতার্থ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য এলাহাবাদ হইতে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাশী-প্রবাসী একজন বাঙ্গালীর সহিত গাড়ীতে মিলন হইল। তিনি এলাহাবাদ কলেজের একজন অধ্যাপক। শীতাবকাশে কাশীর বাটীতে যাইতে ছিলেন। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। এলাহাবাদের কোন কোন বন্ধু নানা ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে কাশী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে রাস্তার সঙ্গী পাইয়া মন কতক সুস্থির হইল। দেখিতে দেখিতে আমরা যমুনা পার হইয়া নাইনি-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। নাইনি হইতে জব্বলপুর লাইন বাহির হইয়াছে। নাইনি হইতে ঝব্বলপুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে-লাইন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত। তৎপরে গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলওয়ে আরম্ভ হইয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। আমরা শকটমধ্যে উপবেশন করত নানাবিষয়ের কথোপকথনে নিযুক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলাম। এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই নানাবিধ শস্য-শোভিত শ্যামল ক্ষেত্র সকল নয়ন পথে পতিত হইতে লাগিল। "পৃথিবী শস্য উৎপাদন না করিলে, ধন কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না" এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই ভারতবর্ষের প্রতি বিলক্ষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এ দেতদ্দেশজাত দ্রব্যাদি লইয়া পৃথিবীর অনেক দেশ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। এই কারণে ভারতবর্ষ করতলস্থ করিবার জন্য অনেকেই লোলুপ।

ক্রমে কয়েকটী ষ্টেশন ছাড়িয়া আমরা মির্জ্জাপুর-ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। মির্জ্জাপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অবিচ্ছিন্ন পর্ব্বত-শ্রেণী আমাদিগের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। এতদিন যে বিন্ধ্যাগিরির নাম শ্রুত হইয়া আসিতেছিলাম, যে বিন্ধ্যগিরি বিস্তৃত মানদণ্ডের ন্যায় থাকিয়া ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে, সেই বিন্ধ্যাচল অদ্য স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। কত সময়ের কত ঘটনা মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই বিন্ধ্যাগিরি আজও অটল ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কালে ইহার কিছুই করিতে পারে নাই। বিন্ধ্যাচলে, বিন্ধ্যবাসিনী যোগমায়া প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই সকল দেবীর মন্দিরে অনেক সন্ন্যাসী অবস্থিতি করেন। মির্জ্জাপুর ষ্টেশন হইতে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির তিন ক্রোশ হইবে। একারণ সময়ের অল্পতা বশতঃ বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করিয়া আমর মনোভিলাষ চরিতার্থ করিতে পারিলাম না। কেবল গাড়ীর উপরে থাকিয়া রক্তপতাকা শোভিত মন্দিরের অবয়ব মাত্র দর্শন করিলাম। মির্জ্জাপুর একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে নানারূপ কার্য্যে ব্যবসায় সম্পন্ন হয়। পিত্তলের বাসনাদি নির্ম্মাণের জন্য মির্জ্জাপুর বিখ্যাত। যখন মির্জ্জাপুর ছাড়িয়া চলিলাম, তখনও সেই বিস্তৃত পর্ব্বত-শ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল। দিবাভাগেও পর্ব্বতশ্রেণীর শোভা অতীব মনোরম।

এলাহাবাদে শকটারোহণ সময়ে আর আর কতকগুলি লোকও আমাদিগের গাড়ীতে উঠিয়াছিল। এক্ষণে কথায় কথায় অবগত হইলাম তাহারা বরদা রাজ্যের অধিবাসী, আমাদিগের ন্যায় কাশী দর্শনে গমন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীও পুরুষ উভয়ই আছে। স্ত্রীলোকেরা আমাদিগের অবয়ব দৃষ্টে মনে করিয়াছিল যে, আমরা বোম্বাই-নিবাসী। কারণ আমরা প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে আবার পশ্চিম-দেশীয়দিগের ন্যায় মস্তকে টুপি ধারণ করিয়াছি। বাস্তবিক তাহাদের সে সিদ্ধান্ত অন্যায় হয় নাই। এই রূপে নানা বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া আমরা চূণার নামক ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। চূণার ষ্টেশনের অনেক দূর হইতে একটী

প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার দুর্গ দেখিতে পাইলাম। দুর্গটীর নির্ম্মাণ-কৌশল আধুনিক প্রণালীর অনুযায় নহে। পূর্ব্বে মালদহ জেলার প্রাচীন গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষমধ্যে যে প্রণালীর দুর্গ দেখিয়াছিলাম ইহাও সেইরূপ। চতুর্দ্দিকে উচ্চ পাহাড়ে বেষ্টিত, মধ্যস্থলে দুর্গোপযোগী গৃহাদি রহিয়াছে। আমরা যে অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত গমন করিতেছিলাম, তাঁহার প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, এই দুর্গটী রাজা শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। আমরা সর্চরাচর যে শ্রীহর্ষ-চরিত পুস্তক দেখিতে পাই, বোধ হয় এই দুর্গও সেই শ্রীহর্ষ-রচিতই হইবে। মুসলমান-রাজত্ব কালে সেরসাহ চুণার দুর্গে কতকগুলি সৈন্য আবদ্ধ রাখিয়া বাঙ্গালা জয় করিবার নিমিত্ত গমন করেন। মোগল বাদসাহ হুমায়ুন তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে তিনি সুযোগক্রমে চুণারে প্রত্যাবর্ত্তন করত এস্থান অধিকার করিয়া লয়েন। তখন ইহার নাম চণ্ডালগড় ছিল। চুণার ঐতিহাসিক ঘটনার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। এখনও চুণার মির্জাপুর জেলার একটী প্রধান নগর।

চুণার পরিত্যাগ করিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে মঙ্গলসরাই-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা কাশী যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম। অনেকক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িল। কাশীধাম দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব ভাবিয়া স্বতই আমাদিগের মনে আহ্লাদ সঞ্চার হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে গঙ্গার উপর যে সেতু হইতেছে তাহার চিহ্নাদি দেখিতে পাইলাম। দেড় মাইল অন্তর হইতে যেরূপ যমুনা-ব্রীজের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এই ব্রীজের কার্য্যও সেইরূপ দুই বা ততোধিক মাইল অন্তর হইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে। ব্রীজের কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত যে কত প্রকার যন্ত্রাদির একত্র সমাবেশ হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। গঙ্গার গর্ভে ইহার মধ্যেই দুই তিনটী 'পিলার' প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ ব্রীজের কার্য্য সম্পন্ন হইলে, অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের সহিত, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান লাইন সংযুক্ত হইয়া যাইবে এবং হুগলীর নিকট গঙ্গার পোলের কার্য্য সম্পন্ন হইলে, এক হাবড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে চড়িয়া অবরোহণ ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই একেবারে যাওয়া যাইবে। পুরাণে উক্ত আছে, মত্ত হস্তী গঙ্গার অসহ্য বেগ সহ্য করিতে পারে নাই এবং অমরগণও তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই গঙ্গাকে ইংরাজের নিকট পরাভূত হইতে হইল! ধন্য ইংরাজের কার্য্য-কৌশল!

দেখিতে দেখিতে আমরা রাজঘাটে উপস্থিত হইলাম। রাজঘাটের নাম তোমার অগোচর নাই। ঐ রাজঘাটে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজ্যধন প্রভৃতি সমস্ত হারাইয়া শেষে স্ত্রী, পুত্র ও আত্মবিক্রয় দ্বারা ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। রাজঘাটের পর পারেই কাশী। একটী বিস্তৃত নৌসেতু দ্বারা রাজঘাট ও কাশী পরস্পর সংযুক্ত। রাজঘাট হইতে কাশীর শোভা বড় চমৎকার। সারি সারি নানাবর্ণের অট্টালিকাশ্রেণী অর্দ্ধ-মণ্ডলাকারে শোভা পাইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন কে বিস্তৃত এক ছড়া ফুলের মালা যত্নপূর্ব্বক পৃথিবীর গলদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা নয়ন ভরিয়া এই শোভা দেখিতে দেখিতে দশাশ্বমেধের ঘাটে উত্তীর্ণ হইলাম। এবং তথা হইতে আমাদিগের পরিচিত একজন ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। রাজঘাট হইতে

একজন গঙ্গাপুত্র তীর্থ স্থানের প্রণালী অনুসারে আমাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল এবং নানা প্রকারে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা হউক সে দিন অন্য কিছু নূতন হইল না। পথ-শ্রান্তিতে সমস্ত রাত্রি অপগত হইল।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে পূর্ব্বদিনের সেই গঙ্গাপুত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে একজন যাত্রা-ওয়ালাও আসিল। ইহারা ভাল লোক নহে। যাত্রীদিগকে ফাঁকি দিতে পারিলে ইহারা অন্য কিছু চায় না। গঙ্গাপুত্রের কার্য্য, যাত্রীদিগকে মণিকর্ণিকায় স্নান করান; যাত্রা-ওয়ালা তাহাদিগকে কাশী দর্শন করাইয়া থাকে। ইহাদিগের ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত অসুখী হইয়াছি এবং ইহাদিগের প্রতি আমাদের অত্যন্ত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। বিদায় হইতে আসিয়া ইহারা আমাদিগের জুতা চুরি করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। আমাদিগের সঙ্গেই যখন এইরূপ ব্যবহার, তখন গ্রাম্য লোকদিগের প্রতি ইহারা যে বিরূপ অত্যাচার করে তাহা বলা যায় না। যাহা হউক অনেক বাগ্বিতণ্ডার পরে আমরা ইহাদিগের সহিত বহির্গত হইয়া মণিকর্ণিকায় স্নান, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দর্শন ও পূজা করিয়া আসিলাম। কাশীর বিগ্রহের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমরা অধিকাংশ দর্শন করিতে যত্নের ত্রুটি করি নাই। কিন্তু যে যে স্থানে গিয়াছি সর্ব্বত্রই সমান পরিমাণে অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। তীর্থ স্থানের অত্যাচার ও উৎপীড়ন বশতঃ ভদ্রলোকেরা তথায় যাইতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ এ সময়ে লোকের মনের যেরূপ ভাব ও হিন্দুধর্ম্মের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে তীর্থস্থানে লোকে এইরূপ উৎপীড়িত হইল শীঘ্রই ধর্ম্মের মূলোৎপাটন হইবার সম্ভাবনা। পাণ্ডারা একটু ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করেন, ইহা আমাদের একান্ত অনুরোধ। যদি তীর্থ স্থানে যাইয়া যাত্রিগণের মনে ভক্তির উদয় হয় এবং যথাশক্তি খরচ পত্র করিয়া তাহারা সমুদায় তীর্থ সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন, তবে পাণ্ডাদিগের লাভের অংশ বর্দ্ধিত হইবারই সম্ভাবনা। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মে লোকের মনও দৃঢ় হইতে পারে। কারণ তীর্থ স্থানে দৈব শক্তি সমুদায় প্রত্যক্ষ করিলে লোকের মন সহজেই দ্রবীভূত হয়। অতঃপর আমরা পাণ্ডাদিগকে সুসভ্য ও দয়ালু স্বভাব দেখিতে বাসনা করি। কাশীর সমস্ত বিগ্রহের বিষয় বলিতে গেলে অনেক লিখিতে হয় এবং তাহা সকলের ভাল না লাগিতে পারে। এই নিমিত্ত নিম্নে প্রধান প্রধান বিগ্রহের বিষয় লিখিত হইল।

কাশীর অধিষ্ঠাতা, সর্ব্ব প্রধান ও পূজনীয় দেবতা বিশ্বেশ্বর। কেবল ইহাঁর মন্দিরমধ্যে যাত্রিগণের প্রতি অত্যাচার নাই। যে কোন হিন্দু ইহাঁর মন্দিরের মধ্যে গমন করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই দক্ষিণা দিয়া পূজা করিতে পারে। বিশ্বেশ্বরের মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই বম্ বম্ শব্দ শ্রবণ ও শান্ত ভাব দর্শনে মন পুলকিত হইয়া উঠে এবং ভক্তি-রসে আর্দ্র হইতে থাকে। যথার্থ সাত্বিক ভাবের উৎপত্তি এই স্থানেই হয়। মন্দিরটীর চূড়া স্বর্ণে মণ্ডিত; প্রথিত আছে মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইহার বর্ত্তমান আকার প্রদান করেন।

কাশীর দ্বিতীয় দেবতা অন্নপূর্ণা। এখানে নির্দ্দিষ্ট দর্শনী না দিয়া কেহই অন্নপূর্ণার আসল মূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হয় না। এ নিয়ম

অতীব অন্যায়। যে ব্যক্তি মনের সহিত অন্নপূর্ণার ধ্যান করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সামান্য অর্থের অভাবে তিনি ইহাঁর আসল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনোবাসনা চরিতার্থ করিতে পারেন না, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। যতশীঘ্র সম্ভব এ নিয়ম উঠিয়া যাওয়া উচিত। আমরা পাণ্ডাদিগের নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, যেন তাঁহারা এই নিয়ম উঠাইয়া দিয়া অন্নপূর্ণা নামের ও কাশীধামের মাহাত্ম্য রক্ষা করেন। অন্নপূর্ণার বাটী হইতে অনেক লোক দিন দিন অন্ন পাইয়া থাকে। এ নিয়ম প্রশংসনীয়।

অন্যান্য দেবতাগণের মধ্যে ধুন্ধু গণেশ, কাল ভৈরব, ও দুর্গাবাড়ীর দুর্গাঠাকুরাণী প্রভৃতি প্রধান। কাশীতে একজন তৈলঙ্গ স্বামী বাস করেন। সকলেই বলে তাঁহার বয়ক্রম ২০০ বৎসরের ন্যূন নহে। আমরাও তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহাকে দেখিলে কিন্তু ২০০ বৎসরের মানুষ বলিয়া বোধ হয় না। শুনিলাম তিনি কথা কহেন না, স্বয়ং আহারও করেন না। তবে কেহ আহার করাইয়া দিলে করেন।

কাশীতে যাত্রিগণ ইচ্ছানুসারে দণ্ডিভোজন ও কুমারীভোজন করাইয়া থাকেন। সধবার পূজা করা নিয়মও চলিত আছে। ইহার মধ্যে অনেক রহস্য লক্ষিত হয়। কোন কোন বিধবা অথবা বেশ্যা সধবা সাজিয়া পূজাগ্রহণ করে। শুনিয়াছি তীর্থ-স্থানে গোপনে গোপনে অনেক পাপকার্য্য সাধিত হয়। কাশীতে ইহরা যাথার্থ্য প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে। এতদ্দেশের ভদ্র মহিলাদিগের 'হাওয়া বদলানর' অনেক ফলও কাশীতে দেখিতে পাওয়া যায়। আর অনেক অসচ্চরিত্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেশে নানারূপ পাপাচরণ করিয়া লোক-লাঞ্ছনা ভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করত কাশীবাস করিয়া থাকে। এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। ফলতঃ এক্ষণে কাশী নানা দেশের পাপাসক্ত লোকের পাপাচরণ দ্বারা পাপ-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কোন্ দিন বিশ্বেশ্বরের ক্রোধে কাশীধাম গঙ্গাজলে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে।

বাহির হইতে কাশীর শোভা যেরূপ মনোহর ভিতর তদ্রূপ নহে। সমুদায় রাস্তাই অতি অপ্রশস্ত, অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়। দুই একটী বড় রাস্তা ভিন্ন আর কোন রাস্তাতেই গাড়ী চলে না। গৃহ সমস্ত অতি সঙ্কীর্ণ এবং তাহাতে বায়ু সঞ্চালনের প্রকৃষ্ট উপায় নাই। অতএব লোকের স্বাস্থ্যও উৎকৃষ্ট নহে। গলিগুলির মধ্যে রাত্রিকালে আলো দেওয়া হয় না। সুতরাং চোরের উৎপাত ও খুনের সংখ্যা হ্রাস করিতে হইলে অগ্রে এই সমস্ত গলিতে আলো দিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কাশীর গুণ্ডার দল বিখ্যাত। ইহাদিগের দ্বারা অনেক দুষ্কর্ম্ম সাধিত হয়।

কাশীতে বহুতর বাঙ্গালী বাস করেন। তাঁহাদিগের বালকগণের মাতৃভাষা শিক্ষার্থে বঙ্গবিদ্যালয়ও সংস্থাপিত আছে। তাঁহাদিগের সামাজিক অবস্থা উৎকৃষ্ট নহে। তাহার কারণ, সকলেই সুবিদ্বান ও সৎকর্ম্মান্বিত নহেন। অনেকেই তীর্থবাস করিতেছেন, কেহ কেহ পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে অন্য কোথাও স্থান না পাইয়া কাশীবাস করিতেছেন। এই সকল লোকের দ্বারা সমাজের কোন প্রকার উপকার সাধিত হইবার আশা করাও যায় না। তবে সকলেই এরূপ স্বভাবের লোক নহেন, তাহাই সুখের বিষয়।

কাশীতে প্রায় প্রত্যেক হিন্দু রাজারই

এক একটী বাড়ী ও অন্নছত্র আছে। এই সকলের কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদিত হয়।

সহরের মধ্যভাগে 'চক'। এখানে নানাবিধ দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় কার্য্য সমাহিত হয়। বাজার সমূহ কলিকাতার বাজারের ন্যায়। কাশী একটী বিস্তৃত বাণিজ্য স্থান। এখানে বারাণসী চেলী উৎপন্ন হয়।

কাশী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সিক্‌রোল। এখানে ইংরাজগণ বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং এই মহল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কাশীর যে অংশ ইংরাজ অধিকৃত সেই অংশের কার্য্য প্রণালী উত্তম। মিউনিসিপালিটী ইংরাজাধিকৃত সমুদায় রাস্তাতেই আলো দিয়া থাকেন। কাশীতে কলেজগৃহ অতীব মনোরম। এখানে জয়পুরের রাজা জয়সিংহের নির্ম্মিত একটী পর্য্যবেক্ষণিকা আছে।

কাশী সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান স্থান। এখানে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ বাস করেন। তাঁহাদের অনেকে অনেক বিষয়ে প্রসিদ্ধ দয়ানন্দ সরস্বতী (অধুনা পরলোকগত) মহাশয়ের সমকক্ষ। কাশীতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপারও সম্পন্ন হয়। একজন ভট্টাচার্য্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার নিকট অবগত হইলাম, একব্যক্তি দণ্ডী হইবার সময় জীবিত পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। শ্রাদ্ধ শেষ হইলে সে ব্যক্তি প্রকাশ করে যে, তাহার পিতা বর্ত্তমান আছেন। এ বিষয় অতীব হাস্যজনক। অনুসন্ধান করিলে, এরূপ অদ্ভুত রহস্য অনেক জানিতে পারা যায়।

মুসলমান সম্রাটদিগের সময়ে কাশীর অনেক নিগ্রহ হইয়াছিল। দুরন্ত সম্রাট আরাঞ্জিব অনেক হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রথিত আছে মুসলমানদিগের অত্যাচারে বিশ্বেশ্বর 'জ্ঞানবাপীতে' প্রবেশ করেন। এখনও হিন্দুমন্দিরের পার্শ্বে অনেক মস্‌জিদাকৃতি মুসলমানী অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। এখন যাহাকে বেণীমাধবের ধ্বজা বলে, তাহা মহম্মদীয় হর্ম্ম্যপ্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত। এই প্রাসাদ অতীব উচ্চ। ইহার উপরে আরোহণ করিয়া সমুদায় কাশী একেবারে দৃষ্ট হয়; এই প্রকারে দৃষ্টি করিলে কাশীর শোভা সমধিক মনোমোহন করে। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, এই অত্যুচ্চ প্রাসাদ সম্রাট আরাঞ্জিব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। অতএব ইহাকে আরাঞ্জিবের 'মিনার' বলা যাইতে পারে।

প্রাতে ও সায়াহ্ণে কাশীর গঙ্গার ঘাট বড় মনোহর ও ধর্ম্মভাব পূর্ণ দেখায়। প্রাতঃকালে অসংখ্য লোক প্রাতঃস্নানে ব্যাপৃত ও সমস্ত গঙ্গাতীর 'হর হর' 'বম্ বম্' শব্দে পরিপূরিত। যেন কেহই পাপ কর্ম্মের লেশ মাত্রও অবগত নহেন। সায়াহ্ণে সকলেই সান্ধ্য ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত। কোন স্থানে বেদ পাঠ হইতেছে, কোথাও হিন্দি ভাষায় 'কথকতা' হইতেছে, কোথাও বা ভাগবত পাঠ হইতেছে। নিম্নে পবিত্রসলিলা সুরতরঙ্গিণী কুল কুল স্বরে প্রবাহিত। এখানে গঙ্গাদেবী কাশী-মাহাত্ম্যে উত্তরবাহিনী। তীরে নহবতের সুমিষ্ট শব্দ দর্শকবৃন্দের মন প্রাণ হরণ করিতেছে। নহবতের এরূপ চিত্তরঞ্জক শ্রুতিমধুর শব্দ আর কোথাও শুনি নাই। এই সময়ে গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান হইলে শোকাতুর জনের চিত্তও প্রফুল্ল ভাব ধারণ করে এবং ঈশ্বর প্রেমে মন উন্মত্ত হইয়া উঠে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও যে কিরূপে কাশীবাসীর মন পাপ-পথে অগ্রসর হয় তাহা অনুমানের

কার্য্যসূত্রে আমার বন্ধুবার এসম্বন্ধে কথার অন্যথা ঘটিয়াছে। অন্যান্যবারের অপেক্ষা এবার কঠোর শাস্তির কেন ব্যবস্থা?"

শরৎকুমারী মনে মনে বলিলেন,—'তোমাকে শাস্তি? এ প্রাণ তোমার ঐ দেব চরণে সমস্ত দিন লুঠিয়া লুঠিয়া বেড়ায়। তোমাকে শাস্তি!'

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"অপরাধ যতই বারে অধিক হয়, ততই তাহার শাস্তি গুরুতর হয়, একথা যিনি এত জানেন তিনি কি জানেন না?"

দেবেন্দ্রনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন,—

"খোকাবাবু, তুমি কাহারও কথা শুনিওনা। এস—সোণা ছেলে—লক্ষ্মীছেলে—যাদু ছেলে—এসতো।"

খোকাবাবু পিতার সোহাগপূর্ণ ক্রোড়ে যাইবার জন্য অভিলাষী হইল। শরৎ, 'মা যায় না—যেতে নাই' ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টিত রহিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণও নানা প্রকার মধুর সম্ভাষ। খোকাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবেন্দ্রনারায়ণেরই জয় হইল। খোকা দেবেন্দ্রের ক্রোড়ে গমন করিল। তখন শরৎকুমারী ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,—

"আচ্ছা থাক তুমি—তোমাদের সহিত আমার আড়ি।" শিশুর অস্থির চিত্ত তখনই চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আবার মাতার ক্রোড়ে আসিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা দেখাইতে লাগিল। কিন্তু শরৎ বলিলেন,—

"কেন—সাধ করিয়া যাহার কোলে যাইলে সেখানেই থাক। আমি কোলে লইব না।"

শিশু যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইল। দেবেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থির করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তখন অগত্যা শরৎকুমারী খোকাকে কোলে না লইয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে খোকা কোলে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সকল বিবাদের শেষ হইয়া গেল।

তাহার পর তাঁহারা তত্রত্য আসনে উপবেশন করিলেন। নবনীত পুত্তলী নরেন্দ্রনারায়ণ একবার পিতার ও একবার মাতার ক্রোড়ে যাতায়াত করিয়া খেলা করিতে লাগিল। সুস্নিগ্ধ বাসন্ত বায়ু ধীরে ধীরে তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিতে লাগিল। প্রস্ফুটিত কুসুমাবলীর সুগন্ধ তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল। খোকার স্বর্গীয় শব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহর পবিত্র করিতে লাগিল। প্রেমিকের পার্শ্বে প্রেমিকা এবং প্রেমিকার পার্শ্বে প্রেমিক, উভয়ের মধ্যে প্রেমবন্ধন—নবনীত পুত্তলী—নয়নানন্দ সন্তান। তাঁহাদের সংসার প্রেমময়, আনন্দময় ও সুখময়।

দম্পতী যখন বাহিরে এই ভাবে উপবিষ্ট তখন প্রকোষ্ঠ মধ্যে সুলোচনা এক বাতায়ন মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার লোচনে দুই বিন্দু জল—আনন্দের জন্য। এত সুখ, এত সৌভাগ্য, এত আনন্দ! সকলই আশার অতীত; সকলই কল্পনার অগোচর। সুলোচনা সেই আনন্দের মধ্যে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কোথায় প্রাণেশ্বর, এমন দিনে হৃদয়েশ, তুমি কোথায় রহিলে?" সুলোচনার নয়নে দুই বিন্দু জল—বিষাদ জন্য।

সমাপ্ত।

খদ্যোৎ-পুঞ্জ।

নিস্তল তরণী।—তলহীন তরণী এ কথাটী আপাততঃ শুনিলে বোধ হয় যে, পুরাতন, জীর্ণ এবং নিতান্ত অকর্ম্মণ্য একখান নৌকা। অথবা নূতন একখানি নৌকা গড়িতে আরম্ভ করিয়া, তলভাগ ব্যতীত অপর অংশগুলি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, এমত অবস্থায় তাহাকেও তলহীন নৌকা বলা যায়। নৌকার তলা না থাকিলে তাহাতে কোনই কর্ম্ম চলে না। নৌকার তলায় একটি মাত্র ছিদ্র থাকিলে সে নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইতে যাওয়া কত ভয়ানক, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর যদি ভগ্নতল নৌকায় উঠিয়া বর্ষাকালীন প্রবল বেগবতী স্রোতস্বতীর তরঙ্গাকুল জলরাশি অতিক্রম করিতে হয়, সেটি আরও কত বিপজ্জনক! জানিয়া শুনিয়া কালের হাতে গলা বাড়াইয়া দেওয়া, আর এ প্রকার নৌকায় চড়া, এতদুভয়ের প্রভেদ অতি সামান্য। আর যদি জীর্ণতল নৌকায় চড়িয়া সগভীর বিশাল সাগরে পড়া যায়, তাহা হইলে, মানুষের হৃদয়ে প্রাণের কোন আশা ভরসা থাকে কি? অতি দৃঢ়গঠিত জাহাজে, ষ্টিমারে চড়িয়া সমুদ্র-যাত্রায় যেমানুষ কত ভীত হয়, নৌকায় করিয়া সমুদ্রবক্ষে বিচরণে সেই মানুষের সাহস হইবে কেন? জীর্ণতল নৌকার ত কথাই নাই। আবার ভগ্নতল নৌকা! সে ত সকল কর্ম্মের বাহিরে। ভাঙ্গিলে জ্বালানি কাষ্ঠ হয়, না ভাঙ্গিলে ক্রমে পচিয়া, উই লাগিয়া মাটি হইয়া যায়। নৌকায় উঠিতে হইলে তাহার তলভাগই প্রথম দ্রষ্টব্য। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে কতই নূতন কথা জানা যাইতেছে। বিজ্ঞানবলে মানুষ ভৌতিক শক্তি সমুদায়কে করায়ত্ত করিয়া আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ক্রমিক উন্নতি বিধান করিতেছে। বাষ্পীয় পোত, তাড়িত বার্ত্তা, গ্যাস ও বিদ্যুতের আলোকের কথা সভ্যজগতে কাহারও অবিদিত নাই। ইতিপূর্ব্বে বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ীও চলিয়াছে। সংপ্রতি বিলাতে তলহীন নৌকার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ঐ নৌকার পার্শ্বদ্বয় কর্ক প্রভৃতি লঘু উপাদানে নির্ম্মিত এবং খুব পুরু। পাছে কোন কারণে টলিয়া আরোহীরা জলে পড়িয়া যায় এই ভয়ে, নৌকার নিম্নভাগে দড়ির জাল আঁটা থাকে। ঐ নৌকার তলা না থাকার আরও একটি কারণ আছে। যদি ঝড় তুফানে নৌকার উপরে জল উঠে, তাহা হইলে ঐ জল বাহির হইতে না পাইলে, ভারে ক্ষুদ্রনৌকা ডুবিয়া যায়। কিন্তু তলা ফাঁক থাকাতে সে বিপত্তির কোন সম্ভাবনাই থাকেনা। উত্থিত জলরাশি নৌকার তলভাগ সংবদ্ধ জালের মধ্য দিয়া সহজেই জলে পড়িয়া যায়। আর এক কথা এই যে, এ তলহীন নৌকা কোন ক্রমে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় না। এই নূতন আবিষ্ক্রিয়াটি, অতীব অসামান্য সন্দেহ নাই। এ আবিষ্ক্রিয়াতে মানবসংসারের প্রভূত উপকার হইবে।

আমেরিকা ও ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মহাশয়েরা বর্ত্তমানকালে যে সকল হিতকর আবি-

ক্রিয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা দেখিয়া শুনিয়া মনে কি অপূর্ব্ব বিস্ময় ভাবেরই সঞ্চার হয়। যাহা কখন দেখি-নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই, এমন সকল কর্ম্ম তাঁহারা আপনাদের অপরিমেয় বিদ্যা বুদ্ধির বলে বিজ্ঞান সহায়ে প্রতিদিন সম্পন্ন করিয়া সমস্ত জগতকে আনন্দরসে পরিপ্লুত করিতে-ছেন। বিজ্ঞানের প্রশস্ত ক্ষেত্র ইউনাইটেড্ ষ্টেটস প্রদেশে ইতিপূর্ব্বে যে কাগজের নৌকা, গৃহের গুম্বজ, রেল গাড়ীর চাকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। শুনা যায়, অতি নিকট হইতে পিস্তলের গুলি করিলেও সে কাগজের নৌকা বিদ্ধ হয় না। কাগজ নির্ম্মিত গৃহের গুম্ব-জের উপর গ্রীষ্মের সূর্য্যরশ্মি, বর্ষার বারি-ধারা পড়িয়াও শীঘ্র তাহার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এক এক খানি রেল গাড়ীর এক এক খানি চাকার উপর কতটা ভার পড়ে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। রেল গাড়ীর চাকা লৌহেই নির্ম্মিত হয়। বিজ্ঞানবলে কাগজও লৌহের ভার বহন করিলে! এই সংবাদ দেখিয়া শুনিয়াই বলিতে ইচ্ছা করে, ভারতবাসি! জাত্যভিমান ছাড়। পুণ্যভূমি ইউরোপ আমে-রিকায় যাও। তথায় মানবের জীবন-যাত্রা ও সুখোন্নতির প্রধান অবলম্বন বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া জন্ম ভূমিতে প্রত্যাগমন করত মনুষ্য নাম ও মনুষ্য জীবন সার্থক কর।

—•০—

দুই-মুখো মেয়ে মানুষ।—নিউ ইংলণ্ডের প্রদর্শনীতে একটী অত্যাশ্চর্য্য দুই-মুখো যুবতী প্রদর্শিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্কন্ধদেশে অতি সুন্দর দুইটী মস্তক ও মুখ সংস্থিত ছিল। তিনি যখন তখন দুই মুখে সুর মিলাইয়া সুন্দর গান করিতেন। স্ত্রীলোক বকিতে না পাইলে পেট ফাঁপিয়া মরে। এই দ্বিমস্তকযুক্তা সুন্দরীর সে অসুবিধা ছিল না। এমন কি তাঁহার এক মুখ যৎকালে আহার করিত, অপর মুখ তখন গল্প চালাইত এবং যখন তাঁহার কোন মুখই কোন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিত তখন তিনি দুই মুখে গল্প করিতেন। এই দুই-মুখো সুন্দরীর এক যুবকের সহিত ভালবাসা ছিল। এই প্রণয়ী যুবক সময়ে সময়ে বড় দুর্দ্দশাপন্ন হইতেন। যুবতীর এক মুখ হয়ত তাঁহাকে হৃদয়ের হৃদয় হইতে প্রেম বিলাইয়া সুখী করিত, আর এক মুখ সেই সময়েই তাঁহার প্রতি ঘৃণা-সূচক বাক্য বলিয়া তাঁহার মর্ম্মদাহ ঘটাইত। কোন্ মুখের কথা কখন বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। যুবক একদা এই যুবতীর বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দাবি দিয়া উপযুক্ত আদালতে নালিশ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; কিন্তু সে আশা সফলিত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় অগত্যা নিরস্ত হইয়া-ছিলেন। কারণ যুবতীর অর্দ্ধদেহ মাত্র প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী; অবশিষ্ট অর্দ্ধ কোন দোষের দোষী নহে। একের অপরাধে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ চলে না। এই যুবতীর দুই মস্তক, চারি বাহু, চারি পা, কিন্তু এক মাত্র মূল শরীর ছিল। এই যুবতীকে এক-জন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে কি না, ইহা সমস্যার কথা। এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টী প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে;—

এই যুবতী কি আপনিই আপনার ভগ্নী?

তাঁহাকে কি যমজ বলা আবশ্যক?

অথবা এক দেহ সুতরাং এক হৃদয় থাকায় তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে একই মানুষ বলিয়া গণ্য হইবেন?

যদি ঐ প্রণয়ী যুবক এই সুন্দরীকে বিবাহ করেন তাহা হইলে তিনি কি বহু বিবাহ অপরাধে অপরাধী হইবেন ?

এই যুবতী একই নামে পরিচিতা এবং একই স্ত্রীলোক বলিয়া পরিগণিতা। সময়ে সময়ে তিনি তাঁহার দুই মুখে যথেষ্ট গল্প করেন। সে সময়ে তিনি গল্প করিতেন বলা আবশ্যক, না আপনি আপনি কথা কহিতেছেন বলা আবশ্যক ?

কোন সভায় তাঁহার মতের প্রয়োজন হইলে তৎপ্রদত্ত মত একমত কি দুইমত বলিয়া গণ্য হইবে ? ইত্যাদি।

ইভ ফ্লিগেন।—জর্ম্মানির অন্তঃপাতী ক্লীভ রাজ্যে ইভ ফ্লিগেন নাম্নী এক সুন্দরী বাস করিতেন। কথিত আছে এই সুন্দরী কেবল কুসুমের সুরভি আঘ্রাণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, কোন পদার্থ আহার করিতেন না। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে নিম্নলিখিত পঁক্তি কয়েকটী লিখিত আছে :—

"'T was I that pray'd I never might eat more,
'Cause my step-mother grutched me my food;
Whether on flowers I fed, as I had store,
Or on a dew that every morning stood
Like honey on my lips, full seventeen year.
This is a truth, if you the truth will hear."

উল্লিখিত বৃত্তান্ত পাঠে বুঝা যাইতেছে যে, বিমাতার দুর্ব্যবহার হেতু এই সুন্দরী ক্রমশঃ অনাহারে থাকিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। যাহাই হউক বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশের যে সকল কবি 'সিঁদূরে মেঘের' উপর সোয়ার হইয়া 'শূন্যমার্গে' ঘুরিতে চাহেন এবং ক্ষুধা বোধ হইলে দুই চারি খান 'চাঁদের কিরণ ভাজিয়া' জলযোগ করিতে ভাল বাসেন, এই সুন্দরী তাদৃশ কোন কবির পত্নী হইলে কবির লড়াই বাধিয়া যাইত, অথবা মধুরে মধুর মিলিত।

প্লিনি বলিয়াছেন আস্তোমি নামক জাতি কেবল ফলমূল ও কুসুমের আঘ্রাণ লইয়া জীবিত থাকে, তাহাদের মুখ নাই সুতরাং কিছুই আহার করে না। আরও কথিত আছে ; চীন দেশীয় অবিবাহিতা সুন্দরীগণ কখন কখন গোলাপের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়াই অন্তর্ব্বত্নী হইতেন।

যাহা হউক "সৌরভে আকুল করে প্রাণ, আমরি গোলাপ রে," এ গীত আমাদের দেশের কবিকুল-পুঙ্গবেরা রচনা করিয়াছেন। অতঃপর 'সৌরভে পুরে গেল পেট, আমরি গোলাপ রে,' এরূপ গীত রচিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে!

কেশের স্পর্শজ্ঞান।—প্যারিস নগরের রয়াল গার্ডন হস্পিটালে একটী পীড়িত সৈন্য ছিল ; এই ব্যক্তির মাথার চুলে বিজাতীয় বেদনা জন্মিয়াছিল। তাহার কেশ ছেদন বা স্পর্শ করিলে সে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিত। এক চিকিৎসক এই রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার এক গোছা চুল কাটিয়া লইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে রোগী যাতনায় নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিয়াছিল এবং চিকিৎসক মহাশয়কে কটুকাটব্য বলিয়া গালি দিয়াছিল। নিরন্তর তাহার দেহের শোণিত ক্ষয় করায় সে এই অসীম যন্ত্রণার হস্ত হইতে ক্রমশঃ অব্যাহতি লাভ করে।

দন্তরোগ।—দন্তশূল (tooth-ache) নিতান্ত ক্লেশ জনক হইলেও মারাত্মক নহে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি এতদ্দেশীয় একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে একজন জমি-

দন্তর দন্তশূল হেতু প্রাণহীন হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে!

—০ঃ০—

পৈশিক শক্তি।—মানব পেশীর শক্তি অসাধারণ। নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে মনুষ্য দেহে যে কত শক্তি থাকে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তুরুক্ক মুটে প্রায় আটমোণ ভার মাথায় করিয়া দৌড়িতে পারে, এবং কথিত আছে ক্রটোনার এক ব্যক্তি প্রায় ১৩ মোণ ভারী একটী বলদ হস্ত দ্বারা উথিত করিয়াছিল। একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি কেবল হস্তের একটী অঙ্গুল বাঁকাইয়া এক শিকল ধরিয়াছিল। তাহার দেহের ভার প্রায় দুই মণ। ঐরূপ অবস্থাতে সে ৬০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। তাহার অঙ্গুলির অদ্ভুত শক্তি সন্দেহ নাই! মৎস্যজাতির মধ্যে পৈশিক শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিমি মৎস্য যেরূপ বেগে পর্য্যটন করিতে পারে তাহাতে তাহার পক্ষে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে এক পক্ষের অধিক সময় লাগে না। অসি মৎস (Sword-fish) অর্ণব-যানের পার্শ্ব বিদার করিয়া দিতে পারে ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

—০ঃ০—

ভূ-পোত।—বিশপ উইলকিন্স্ প্রণীত গাণিতিক বাজি (Mathematical Magic) নামক গ্রন্থে এক অত্যাশ্চর্য্য পাইল-বিশিষ্ট গাড়ীর বিবরণ লিখিত হইয়াছে। জাহাজ যেমন পাইলের সাহায্যে জলের উপর চলে, ঐ গাড়ি সেইরূপ সমতল ভূমির উপর চলে। স্লেটার (Slater) নামক এক সাহেব ঐরূপ এক গাড়িতে চড়িয়া আরবদেশীয় মরুভূমি অতিক্রম করিয়াছিলেন। উহা ঘণ্টায় ১০ দশ ক্রোশ হিসাবে গমন করিয়াছিল। ঐ গাড়ির গতি-বিধানের জন্য অশ্ব, বলীবর্দ্দ বা বাষ্প কিছুই লাগে না। বিশপ উইলকিন্স্ বলেন, উহার আকার প্রায় নৌকারই মত। গাড়ির নীচে চারিখানি সমান মাপের চাকা এবং উপরে দুইখানি পাইল থাকে।

হলণ্ডদেশে বরফ রাশির উপর দিয়া যাতায়াত করিবার নিমিত্ত পাইল-বিশিষ্ট অথচ চক্রহীন এক প্রকার যান সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার তলদেশ মসৃণ থাকায় বরফের উপর গতির ব্যাঘাত জন্মে না। এই সকল বরফ-যানের আকার নৌকার প্রণালীতে গঠিত এবং তৎসমস্ত পাইলের সহায়ে বায়ু দ্বারা চালিত। যদি দৈবাৎ কোন স্থানে বরফ বিগলিত হইয়া যায়, তথাপি এই সকল যানারোহীর কোন অনিষ্ট ঘটে না। পূর্ব্বে যাহা শকটের ন্যায় কার্য্য করিতেছিল, তাহা তখন নৌকার ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে।

সম্পাদকীয় উক্তি।

বিগত ২৫শে পৌষ মঙ্গলবার মহামনস্বী কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি, বঙ্গবাসীর শিক্ষা এবং বঙ্গসমাজের সংস্কার-সাধনার্থ উক্ত মহাশয় যৎপরোনাস্তি আয়াস স্বীকার করিয়া বঙ্গীয় নর-নারীকে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। এই শোক-সংবাদ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রের বক্ষে ধারণ করা আবশ্যক বিবেচনায় ইহা এই স্থানে প্রকটিত হইল।

গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তিস্বীকার।

কিরণ। মাসিক পত্র। নাস্নার। ভারত-সুহৃদ যন্ত্র। প্রিণ্টার—শ্রীরামচন্দ্র দে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴১০ আনা।

এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্র কবিতাময়। ইহাতে উচ্চ শ্রেণীর কোন কবিতা একবারও আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। এরূপ কবিতাপূর্ণ মাসিক পত্রের কি সার্থকতা তাহা আমরা বুঝি না।

বঙ্গবীর চরিত। প্রথম সংখ্যা। রাম দাস বাবু। শ্রীরাজ রাজেন্দ্র চন্দ্র প্রণীত। শ্রীবাটী চিত্ত-রঞ্জিনী সহিত্য সভা। কলিকাতা। সাহিত্য প্রেসে—শ্রীশ্যামাচরণ কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত—১২৮৮।

এই গ্রন্থের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে,—

"অনেকের বিশ্বাস আছে যে, বাঙ্গালি জাতি মাত্রেই বলহীন, তন্নিবন্ধন তাহারা সুচির-কাল পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ থাকিবে; বস্তুত বালক প্রায় অন্য জাতির কথা ছাড়িয়া দেও—উহাদের শ্রীমুখে তো স্বতঃ পরতঃ ওরূপ কথা শুনিয়া অবিরত জ্বালাতন হইতেছি। তদ্ব্যতীত আর এক সম্প্রদায় বাঙ্গালীকে ভীরুতা দুর্ব্বলতা অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জন করে, এই অসাধারণ ভ্রান্তিমূলক অপবাদ বিমোচনের উপায় কি?"

পত্রান্তরে লিখিত হইয়াছে,—

"বঙ্গবীর চরিতে প্রকৃত বীরবত্তার সত্তা উপলব্ধি করাইব; স্বাভাবিক জন্ম গ্রহণ ও জীবন ধারণ করিয়া অলৌকীক বাহুবল সম্পন্ন হওয়া চাহি। প্রস্তাবিত জীবন চরিতে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে স্বজাতি কলঙ্কাপনোদনের চেষ্টা পাইব। কৃতকার্য্যতা চিন্তাশীল ও গুণগ্রাহীর মুখে, ফলতঃ তদর্থে মহাআশ্বস্থ হইয়া রহিলাম।"

গ্রন্থকার এইরূপ কদর্য্য বাঙ্গালায় মেটেবির বিখ্যাত বলশালী রামদাসবাবুর কয়েকটী গল্প লিখিয়া কিয়ৎপরিমাণে স্বজাতি কলঙ্কাপনোদনের চেষ্টা পাইয়াছেন। এ চেষ্টা কত দূর ফলবতী হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। কখন কখন দুই এক জন বাঙ্গালী পুরুষ শক্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন, এ কথা প্রমাণ করিতে পারিলেই যে জাতীয় কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইবে তাহা আমাদের বোধ হয় না। রামদাস বাবুর যথেষ্ট বীরত্ব ছিল তাহা আমরা অস্বীকার করি না।

শ্মশান ও জীবন। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। কলিকাতা ৯৭ কলেজ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। Sarachchandra Deva, Printer, The Vina Press,—37 Machuabazar Street. মূল্য ৵০ আনা।

রাজকৃষ্ণ বাবু যে বিষয় অবলম্বন করিয়া এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই অতি উচ্চ ও অতি গাঢ়। এরূপ বিষয়ের যেরূপ আলোচনা হওয়া আবশ্যক এ ছন্দোময় গ্রন্থে

তাহা হয় নাই। রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের বর্ত্তমান পুস্তকে ভাবের অপেক্ষা শব্দের প্রাচুর্য্য এবং চিন্তার অপেক্ষা ভাষার কৌশলাধিক্য পরিদৃষ্ট হইল। এরূপ বিষয় লিখিতে হইলে ওয়াডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কবি যেরূপ সংক্ষেপে বহু ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠককে ভাব সাগরে ডুবাইয়া দিতে পারিতেন রাজকৃষ্ণ বাবু তাহা পারেন নাই। অধিক বিশ্লেষ করিলে কবিতার মাধুর্য্য যে এককালে নষ্ট হইয়া যায়, একথা রাজকৃষ্ণ বাবুকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ এই ;—

"পবিত্রশীতলজলা গঙ্গা সুরধুনী
ভিজা'য়ে ভূতল-দেহ মৃদুল প্রবাহে
চলি'ছে সাগর পানে, মধুরনাদিনী,
কলকণ্ঠে তালে তালে কল-গান গাহে।
তর তর বেগ হয় কভু বায়ু যার,
লঘু লহরীর নৃত্য হয় নীর'পরি ;
আবার যখন বায়ু আকাশে লুকায়,
তখন সুধীর বেগ—না খেলে লহরী।
অবিরাম গতি, নদী বাধা নাহি মানে ;
বিরাম যে কি, তা' গঙ্গা কভু নাহি জানে।"

এ অংশের মধ্যে কবিতা কোথায়—ভাব কৈ? গঙ্গা চিরপ্রবাহিনী—যখন বায়ু বহে তখন গঙ্গা লহরী নৃত্য করে ও বায়ু না থাকিলে তাহা করে না—এই সাদা কথা—সাদা ভাব—সাদা বিষয় লিখিত হইয়াছে মাত্র। কবিত্ব যে এরূপ বর্ণনাকে বলে না তাহা নিশ্চয়ই রাজকৃষ্ণ বাবুর অবিদিত নাই। ইহার দ্বিতীয়াংশ এই ;—

"কোথায় জনম লভি' কোথায় গমন?
কি মনস্থ করি' গঙ্গা সাগরে মিশায়?
শত শত ক্রোশ পথে অনন্ত ভ্রমণ
কি হেতু গঙ্গার?—মোরে কই বা বুঝায়?
যে ইহা বুঝাবে মোরে—সে নহে মানব,
মানব-নিয়তি-নীতি-বিজ্ঞ সেই জন,
সে জানে জীবের স্থিতি,—মরণ—উদ্ভব,
সে জানে জগত-গতি কুটিল কেমন ;
প্রত্যেক নরের চিত্ত জানা আছে তা'র,
চিত্ত যে কি, তা'ও জ্ঞাত র'য়েছে আবার।"

কি হেতু গঙ্গা অনন্তকাল শত শত ক্রোশ পর্য্যটন করিতেছেন তাহা কি যে জন 'মানব-নিয়তি-নীতি-বিজ্ঞ'—তিনি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারেন না? বিজ্ঞান কি এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অক্ষম?

পদ্যে যত টুকু মার্জ্জনীয় এ গ্রন্থের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক পুনরুক্তি দোষ আছে।

পুস্তকের মধ্যে স্থানে স্থানে চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতারও বিশেষ পরিচয় আছে। নিম্নে এক স্থান উদ্ধৃত হইল ;—

"কিন্তু কর প্রণিধান, অবিশ্বাসী মন,
কথা কহা—নড়া চড়া
বুঝ বুঝি জীবন্ত জীবন?
তা' নয়—তা' নয়!
(নিশ্চয় নিশ্চয়!)
না—না—তা' নয়—
জীবন্ত-জীবন যা'র নাম,
সে জীবনে এ ব্রহ্মাণ্ড-ধাম
অবিরাম—অবিরাম—অবিরাম শূন্যময়,
জীবন্ত-জীবন, ভাই? হেথা থাকিবার নয়।
এ ব্রহ্মাণ্ড-ধাম,
এ ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরিমাণ
এই যে ধরণী
দিবস রজনী
নিজ্জীব জীবনপূর্ণ ; জীবন্ত-জীবন
নাহি হেথা—থাকিতেও পারে না কখন।
শোকের প্রভুত্ব যেথা সদা,
বিষাদের ডোরে প্রাণ বাঁধা,

নিদারুণ রোগের পীড়ন,
নীরাশার দারুণ তাড়ন,
যন্ত্রণার নিরয় যেথায়,
জীবন্ত জীবন কি সেথায়
থাকিবারে পারে ?
তুমি আমি নড়ি চড়ি—কথা কই বটে,
জীবন্ত জীবন কিন্তু আছে কি এ ঘটে
মানব-সংসারে ?
নাই নাই—কভু নাই, ভ'রেছে সংসার, ভাই,
নিৰ্জ্জীব জীবনে ;
জীবন্ত জীবন হেথা এসে ম'রে গেছে, ব্যথা
পাইয়ে জীবনে !"

বাঙ্গালায় চিন্তাপূর্ণ বিষয়াবলম্বনে কবিতা লিখিতে, আমাদের বোধ হয়, এই প্রথম চেষ্টা। আমরা এ জন্য রাজকৃষ্ণ বাবুকে ধন্যবাদ দিই।

ভার্গববিজয় কাব্য।—ঢাকা জয়দেবপুর সা, স, এবং কলিকাতা জ্ঞা, দী, সভার অন্যতম সভ্য শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত এবং প্রকাশিত। কলিকাতা, ৩৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, আলবার্ট প্রেসে আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত। আশ্বিন, ১২৮৪। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় কি তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে:—

"দেবদৈত্যনরাতঙ্ক, জামদগ্ন্য, ঋষি,
ক্ষত্রকুলান্তক, বীর পরশুরামের
নাশিলা বিষম-দর্প বিপুল-বিক্রমে
অযোধ্যা-কুমুদকুল-কুমুদসুহৃদ,
রাঘবেন্দ্র, বলী নাম,—কেমনে তা' কহ,
সর্ব্বশুক্লে, সরস্বতি, অগ জগন্মাতঃ!
বৈদেহী-শুভোপযাম-ক্রিয়া সুনির্ব্বাহি',
পরম-প্রমোদে যবে সোৎসব-প্রয়াণে
প্রত্যাবর্ত্তিতেছিলা স্বজন-সংহতি
সাকেতপত্তন-বর্ত্মে, কহ, হে ভারতি!"

এই কাব্যের ভাষা নিতান্ত কঠিন। কবির দীর্ঘ সমাসাসক্তি, বহুবিশেষণ প্রয়োগানুরাগ, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ বাহুল্য এবং জটিল সুদীর্ঘ-পদ স্থাপন পদ্ধতি গ্রন্থখানিকে নিতান্ত ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। এমন কি; প্রথম কিয়দংশ পাঠের পর গ্রন্থ মধ্যে অধিকদূর অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। কিন্তু যদি সাহসে ভর করিয়া দাঁত, মুখ ও অন্ত্র বাঁচাইয়া গ্রন্থখানি পড়িয়া ও বুঝিয়া ফেলিতে পারা যায়, তাহা হইলে পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল হয় না। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে লেখকের বর্ণনাশক্তির ও ভাবুকতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু ভাষার দোষে সকলই মাটী হইয়া রহিয়াছে। গ্রন্থকার যদি বর্ত্তমান কাব্য অপেক্ষাকৃত সরলভাষায় লিখিতেন তাহা হইলে নিশ্চই তিনি আশার অতিরিক্ত ফললাভ করিতে পারিতেন। ভাষার নমুনা দেখাইবার নিমিত্ত গ্রন্থের একস্থান উদ্ধৃত করিলাম। বলা আবশ্যক যে আমরা এস্থান বাছিয়া বাহির করি নাই।

"কণ্ডীন-সমুদ্রে-ভব অমৃত-ময়ূখ!
প্রাচ্যজয়দেব যথা বঙ্গ বিশোভিলা
মাধবের গোপগীতে, তথা, হে বৈদর্ভ্য!
রাঘবের বীরগানে, অয়ে দক্ষিণাত্য!
দ্যুতিলা দক্ষিণাপথ তুমি, জয়দেব!
যেমতি বিদূরভূমি নবঘন-স্বনে
রতনশলাকাঙ্কুরে তেজঃ সমন্বয়ে,
তব বীণারব শুনি' তথা মমঃ মনঃ।"

কাব্যখানি এত দুরূহ হইয়াছে যে কাব্যকার মহাশয় ইহার স্থানে স্থানে টীকা লাগা-

ইয়া দিয়াছেন। সে টীকাও ইহাকে সুখ-বোধ্য করিতে সমর্থ হয় নাই। গ্রন্থকার বলিয়াছেন প্রথমাংশ অপেক্ষা শেষাংশ সরল হইয়াছে। এই জন্য আমরা গ্রন্থের শেষ সর্গ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অশেষ-সুধীর-ভাল-শোভন-তিলক,
কোবিদ নৃপতি-শ্রেণী-মস্তক মুকুট-
অলংকার-হীরাবর গৌড়-কবিবৃন্দ!
প্রভূত ভকতি-ভরে, কায়-মনো-বাক্যে,
আরাধি' ভারতি-পদ (ত্রিজগত্-অর্চ্চ),
হৃদয়-সরোজে স্থাপি' পরম যতনে,—
সংসার-শোভন-সার মহামূল্য মণি,
উপদেশ-যশো-ধন-আনন্দ-আকার,
চিন্তা-রোগ-মুকতির এক দীর্ঘ-মার্গ,
ভাষা-ব্যবহার-বৃত্তি-ব্যুৎপত্তির হেতু,
সৎপথ-প্রবর্ত্তক, পর-নিবর্ত্তক,
বিমুখবনিতা-কৃত-কটাক্ষ-কঙ্কণ,
সদয়কামিনী-মৃদু-হসিত-সন্নিভ,
তোমা'দের হেন কাব্য-চয়ে শিক্ষা পে'য়ে—
লভিলে অভীষ্ট বর ইষ্টদেবী-কাছে
যেমত সাধক, অহ! উল্লাসে তেমত
সান্দ্রানন্দ-সন্দোহের মহাম্ভোরাশিতে,
সমান্দোলি' ভঙ্গ-সংঘে (গিরিশৃঙ্গ-তুঙ্গ),—
এ' সামান্য ক্ষুদ্র-'কাব্য' বিরচি' শেষিল
'গ্রহ-অব্ধি পক্ষ-শশী'-সংখ্যা-পরিমিত
বঙ্গ-সংবৎসরে, বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে,
আজি সেই জটিল-ধী পরম অধম
(নরেন্দ্রনন্দিনীদেবী-হৃদয়-নন্দন),
অসম হরষে পে'য়ে পৌত্র-রূপে যা'রে
স্থাপিলা স্ব শেষকাল অশোক-অন্তরে,
যথা দীন পে'লে নিধি স্ব-করে সহসা
শ্রীমদ্দিগম্বর চন্দ্র, দ্বিজ-চক্রবর্ত্তী,
স্বভাব-সুন্দরবুদ্ধি, পরমজ্যোতিষী।
সুকবি-বসুধা-অধীশ্বর-সার্ব্বভৌম
হে বঙ্গ-কোবিদবৃন্দ! থাক ইথে সাক্ষী;
তোমা'দের শিক্ষকতা-কার্য্য-নৈপুণ্যের
গৌরব কিঞ্চিত্ কি, গো, বর্দ্ধিত হ'বে না?
অস্থানে পড়িলে মণি স্ব-গুণ কি ত্যজে?"

গ্রন্থের আর একটী দোষ—ইহাতে প্রাচীন ও নবীন ভাবের খিচুড়ি করা হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি নিরবচ্ছিন্ন প্রাচীন রীতি পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন, অথবা কেবল মাত্র বর্ত্তমান রুচির অনুবর্ত্তী হইতেন, তাহা হইলে এ অংশে আমাদের আপত্তি করিবার কারণ থাকিত না।

গ্রন্থের তৃতীয় দোষ কল্পনা, বীণাপাণি ও পূর্ব্বগত কবিকুলের নিকট পুনঃ পুনঃ করুণা প্রার্থনা। এতদ্বিষয়ক বাহুল্য বিরক্তিকর হইয়া থাকে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

ইত্যাদি দোষ পরিহার করিলে 'ভার্গব বিজয়' উৎকৃষ্ট কাব্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা অনুরোধ করি লেখক এই সকল দোষবিহীন করিয়া গ্রন্থান্তরে আপনার গুণপনার পরিচয় দিবেন। তাঁহার সমালোচ্য কাব্য যে ঐ সকল দোষের নিমিত্ত বিশেষ সমাদৃত হয় নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এবং ঐ সকল দোষশূন্য কাব্য লিখিতে পারিলে তিনি যে যথেষ্ট যশস্বী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মন্দারকুসুম। বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য। কলিকাতা, ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট বীণাযন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত ও অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সংবৎ ১৯৪০—৪১। মূল্য ১৲ টাকা।

কাশীরাজতনয়া অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার চরিত্র ও প্রেম অবলম্বনে এই নাটক লিখিত হইয়াছে। যে যে গুণ থাকিলে ভাল নাটক হয় ইহাতে তাহা নাই। চিরকাল যেরূপ কুসুম ও হরিণ হরিণীর বিবাহ দিয়া, বিদূষক বেষ্টিত রাজার বর্ণনা করিয়া, চিত্র দ্বারা প্রেম জন্মাইয়া, এবং স্থানে স্থানে নায়িকা বা সহচরীর গান লাগাইয়া নাটক রচনা করা হয় এ নাটকেও তাহাই করা হইয়াছে। কথোপকথন যেমন সাজাইলে লোকে নাটক বলে ইহাতে তেমনই সাজান হইয়াছে। এরূপ নাটক পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তির আশা করিতে পারি না।

ইহার অধিকাংশ গদ্যে লিখিত। ভাষা নিতান্ত মন্দ নহে। গ্রন্থ মধ্যে রতি ও মদনের প্রসঙ্গ গ্রন্থকারের কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। ঐ প্রসঙ্গ নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

বেঙ্গল থিয়েটর। (ব্রজলীলা নাট্যগীতিকাভিনয়।)

এই রঙ্গভূমির নিতান্ত পতিত দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্রজলীলা নাট্যগীতির অভিনয় দেখিয়া আমরা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। এই গীতি-পুস্তিকা এক জন প্রণয়ন করিয়াছেন, দ্বিতীয় এক ব্যক্তি সংশোধন করিয়াছেন, তৃতীয় এক ব্যক্তি সুর লয়ে গঠিত করিয়াছেন, চতুর্থ এক ব্যক্তি মুদ্রিত করিয়াছেন এবং পঞ্চমে এক সম্প্রদায় (অন্ততঃ দশজন নরনারী সম্বলিত) প্রকাশিত করিয়াছেন। এত হাত ঘুরিয়া যে জিনিষ বাহির হইয়াছে পাঠক হয়ত তাহা কি অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছে বলিয়াই মনে করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে না আছে সুরুচির পরিচয়, না আছে ভাব ও অর্থ। তাহাতে আছে কেবল অশ্লীলতা, অর্থহীনতা এবং জঘন্যতা। কেন এরূপ দুর্ণর্হ, দুর্গন্ধময়, বীভৎস সামগ্রী অভিনয় করিয়া রঙ্গ রঙ্গভূমি কলঙ্ক ক্রয় করিতেছেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। একে এই কুৎসিত সামগ্রী তাহাতে আবার অভিনয় কালে অভিনেতৃগণ বিকৃত অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা ইহাকে কুৎসিতের একশেষ করিয়া থাকেন। এতদভিনয়ে লিপ্ত নরনারীগণ অভিনয় কাহাকে বলে তাহা জানেন না, এবং বুঝেনও না। তাঁহারা জানেন কেবল কদর্য্য অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া আপনাদের নিতান্ত কলুষিত রুচির পরিচয় দিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের নৈতিক উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতে। অশ্লীল অভিনয় সম্বন্ধে যে আইন আছে, আমরা বিবেচনা করি এ ক্ষেত্রে তাহা সুন্দর রূপ প্রযুজ্য। কেন এখানে সে আইনের প্রয়োগ ঘটিতেছে না তাহা আমরা বলিতে পারি না। আর কি বলিব? এরূপ অভিনয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করার অপেক্ষা অপর যে কোন নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করাও বহুগুণে শ্রেয়ঃ।

ন্যাশনাল থিএটার (ম্যাক্‌বেথাভিনয়।)

সে দিন এই রঙ্গভূমিতে মহাকবি শেক্সপীয়র প্রণীত 'ম্যাক্‌বেথ' নামক প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় অভিনয় করিবার নিমিত্ত নানা ছন্দোবন্ধে উক্ত ইংরাজি গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করা হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত নাম গুলি দেশীয় করা হইয়াছে। গ্রন্থের অনুবাদ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই।

এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্বর্গীয় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতা সংসারে যদি 'ছায়রে,' 'এবে' প্রভৃতি কয়েকটি কথার বহুল প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে ম্যাকবেথের এ অনুবাদ সম্পন্ন হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ। তাহার পর অভিনয়। অভিনয়ের কথা আর কি বলিব? আমরা সে দিন রঙ্গভূমিতে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিলাম, তাহা বলিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য। দর্শক মণ্ডলীর মধ্য হইতে প্রতিক্ষণে 'লাউডার' (Louder) 'বিচুটিফুল'(Beautiful) 'বেশ ভাই'! প্রভৃতি উৎসাহ সূচক, সুমধুর সম্ভাব শব্দ অভিনেতৃবর্গের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে দর্শকবৃন্দের নিয়ত অনুরোধে অর্দ্ধপথে অভিনয়ের পরিসমাপ্তি হইয়া গেল।

The Voice of India. Bombay: Printed at the Bombay Gazette Steam Press. Bombay: 16, Marine Street, Fort.

এই ইংরাজি সাময়িক পত্রখানি ভারতের মহোপকার সাধনার্থ আবির্ভূত হইয়া বৎসরাধিক কাল নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্ববিধ সমসাময়িক সাধারণ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষস্থ ইংরাজি, বাঙ্গলা, উর্দ্দু, তামিল্ প্রভৃতি ভাষার সংবাদ পত্র সমূহে যে যেরূপ মত ব্যক্ত হয়, এই ইংরাজি পত্রে তৎসমস্ত একত্র সঙ্কলিত হয়। রাজপুরুষগণ ও সর্ব্বসাধারণ এতৎপাঠে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ সমূহে ভারতবর্ষের সাধারণ মত কি তাহা অনায়াসেই অবগত হইতে পারেন। সুতরাং এই মাসিক পত্রের প্রয়োজনীয়তা অসীম। উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা অতীব দক্ষতা সহকারে ইহার সম্পাদন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। আমরা হৃদয়ের সহিত এই পত্রের ক্রমোন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনা করি।

বর্ত্তমান জানুয়ারি মাস হইতে এই পত্র পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ অনুষ্ঠান যে ইহার উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০৲, মাসিক ১৲ মাত্র।

ভারতীয় রাজকুল-দর্পণ।

সপ্তম অধ্যায়।

করৌলী বিবরণ।

এই রাজ্যের উত্তরে ভরতপুর, পূর্ব্ব দিকে ঢোলপুর, দক্ষিণে চম্বা নদী এবং পশ্চিমে জয়পুর-রাজ্য। পরিমাণ ফল প্রায় ৪১৭ বর্গ ক্রোশ, লোক সংখ্যা ১২৪০০০ হইবে। রাজস্ব ৫ লক্ষ টাকা। সৈন্যসংখ্যা—৪০০ অশ্বারোহী, ৩২০০ পদাতিক, ৪০টী কামান ও ৪০ জন গোলন্দাজ।

এই রাজ্যের প্রাচীন বিবরণ নিতান্ত তমসাচ্ছন্ন। যে সময়ে ইহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সংস্রবে আসিয়াছে, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইহার বিবরণ সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। অন্যান্য রাজপুত রাজ্যের ন্যায় ইহাও মোগলদিগের করাল কবল মধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া পরে মহারাষ্ট্রদিগের অধীনতা পাশে নিবদ্ধ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা হরবক্স পাল ২৫,০০০ পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক কর দিবার নিয়মে পেশোয়ার অধীনতা স্বীকার করেন। পুনা নগরীর বিখ্যাত সন্ধি-সূত্রে পেশোয়া নর্ম্মদা নদীর উত্তরদিকস্থ যাবতীয় ভূমি সম্পত্তির স্বত্ব ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সম্প্রদান করেন; সুতরাং করৌলী রাজ্যও ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। সময়ে সময়ে সাধ্যমত সেনা সাহায্যের নিয়মে সন্ধিবন্ধন পূর্ব্বক রাজা হরবক্স পাল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দেয় কর রহিত হইয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও রাজার আশা মিটিল না; তিনি ভাবিলেন, যখন বিনা প্রার্থনায় অর্থ পাইয়াছি, তখন প্রার্থনা করিলে অবশ্যই হস্তী প্রাপ্ত হইব। তাঁহার যে সকল প্রদেশ সিন্ধিয়া পূর্ব্বে অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ইংরাজদিগের আশ্রিত ভরতপুর সামন্তের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তিনি সেই বিরক্তি-চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বাঁচিয়া গেলেন।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় হরবক্স পালের মৃত্যু হইলে প্রতাপ পাল নামক জনৈক নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন। ইহাঁর রাজত্ব সময়ে রাজ্যমধ্যে বিবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব হইতেই ধনাগার ক্রমে ক্রমে শূন্য হইয়া আসিতেছিল, প্রতাপ পাল তৎপ্রতিবিধানে যত্নবান হইয়া কর-ভারে প্রজাগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। এবং বিদ্রোহী হইয়া রাজ-বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল। এই বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইবার জন্য ক্রমান্বয়ে চারিজন ব্রিটীশ কর্ম্মচারী প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ১৮৪৮ অব্দে এই তুমুল গোলযোগের সময়েই প্রতাপের মৃত্যু হইল। তিনি

নিঃসন্তান ছিলেন, রাজ-পরিজনেরা নরসিংহ পাল নামক জনৈক অপ্রাপ্ত-ব্যবহার কুটুম্ব বালককে রাজপদের উত্তরাধিকারী স্থির করিলেন; ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে এই কার্য্যে অনুমোদন করেন নাই। করৌলীরাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট ১,৫৪,৩১২ টাকা ঋণী ছিলেন; ঐ টাকা ক্রম-নিয়মে আদায় হইবার বন্দোবস্ত ছিল; কিন্তু উহার কিছুই পরিশোধ হয় নাই। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট জেদ করিলেন যে, দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বে অন্ততঃ প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করিতে হইবে। অনেক কষ্টে অর্থ সংগৃহীত হইল। এদিকে রাজ্যমধ্যে দিন দিন গোলযোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট নরসিংহের উত্তরাধিকারিত্বে অনুমোদন করিয়া এই আদেশ করিলেন, যেন ত্বরায় পূর্ব্বোক্ত ঋণ পরিশোধিত হয়। এই সময়েই শিশু সামন্তের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজন ব্রিটীশ এজেণ্ট তথায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৫২ অব্দে নরসিংহ পাল পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি ভরত পাল নামক জনৈক দূরসম্পর্কীয় কুটুম্ব বালককে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে ইহাতে অনুমোদন করেন, কিন্তু পরিশেষে অনুসন্ধানে অবগতি হয় যে, বিশুদ্ধ নিয়মানুসারে দত্তক গ্রহণ হয় নাই। কারণ তৎকালে গৃহীতা স্বয়ং অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন; দত্তক গ্রহণে যে সকল শাস্ত্রীয়-প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা সমিচীনরূপে সম্পাদিত হয় নাই; পক্ষান্তরে নয়জন ক্ষমতাশালী ঠাকুর, অধিকাংশ সামন্তগণ, ও প্রকৃতিপুঞ্জের অনুমোদিত নিকট-সম্পর্কীয় মদনপালকে অধিষীগণ দত্তক মনোনীত করিয়াছিলেন। এই কারণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভরতপালের উত্তরাধিকারিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া মদনপালের রাজপদ প্রাপ্তি বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। ১৮৫৪ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হইলে পরবৎসর ব্রিটীশ এজেণ্ট চলিয়া আসিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে মদনপাল সাধ্যমত ইংরাজদিগের উপকার করিয়াছিলেন; তাহার পুরস্কার স্বরূপে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া এক সম্মানসূচক রাজপরিচ্ছদ প্রদান করেন এবং তাঁহার সম্মানের জন্য যে ১৫ তোপ হইত তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ১৭ তোপ হইল। যদিও মদনপাল গবর্ণমেণ্টের ঋণদায় মুক্ত হইলেন, কিন্তু ধনাগারের অর্থ-কৃচ্ছ্রতা দূর হইল না। রাজার ঋণ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবার জন্য ইংরাজেরা একজন এজেণ্ট প্রেরণ করিলেন; তাঁহাকে বিশেষ করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়া দিলেন, যেন তিনি রাজাকে বন্ধুর মত পরামর্শ প্রদান করেন, কোন প্রকার ক্ষমতা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। ১৮৬১ অব্দে তিনি কার্য্য শেষ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহারাজা মদনপাল প্রথম শ্রেণীর নাইট উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৮৬৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভাগিনেয় রাও লছমন পাল উত্তরাধিকারিত্বে মনোনীত হইলেন বটে কিন্তু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই লীলা সংবরণ করিলেন। এই-রাজ-পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় পুত্র করথপালের বংশীয় জয়সিংহ পাল নামক জনৈক ব্যক্তি ক্ষমতাশালী ঠাকুরগণ কর্ত্তৃক রাজপদে মনোনীত হইয়া ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ১৮৭৫ অব্দের মে মাসে আগ্রা নগরে এবং মার্চ্চ মাসে অন্যান্য

রাজপুত রাজের সহিত দিল্লীনগরে আগমন পূর্ব্বক গবর্ণর জেনরেলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। শাসন কর্ত্তার অভ্যর্থনায় তিনি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৭৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে দ্বারাবতীর রাও অর্জ্জুন পাল রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দিল্লি নগরে ১৮৭৭ অব্দে ১লা জানুয়ারিতে যে বিক্টোরিয়া রাজস্থূয় হইয়াছিল তাহাতে মহারাজা অর্জ্জুনপাল উপস্থিত ছিলেন। প্রজার জীবন মরণের উপর তাঁহার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা আছে। তাঁহার সম্মানের জন্য ১৭টী তোপ হইয়া থাকে।

—০:০—

অষ্টম অধ্যায়।

ভরতপুর বিবরণ।

জয়পুরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে ভরতপুর রাজ্যের অবস্থান। পরিমাণফল ৪৯৪ বর্গক্রোশ, লোকসংখ্যা ৭৪৩,৭১০। রাজস্ব ২৮,৭৫,০০০ টাকা। সৈন্য সমিতি ৮,৫০০ পদাতিক, ৩,০০০ অশ্বারোহী, ৩৮ কামান, ২৫০ গোলন্দাজ।

ভরতপুরেশ্বর জাঠ বংশীয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যসময়ে জাঠেরা মুলতান হইতে আগমন পূর্ব্বক দোয়াবে বসতি বিস্তার করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে। ত্বরায় তাহারা হলচালনার পরিবর্ত্তে যুদ্ধ ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক দিগ প্রদেশের অন্তর্গত কতিপয় গ্রামের উপর আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপিত করে। মোগল সাম্রাজ্যের পতন-সময়ে ভারতবর্ষে যে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হয়, উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া জাঠেরা সেই সময়ে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করত নিকটবর্ত্তী বহুবিস্তৃত ভূভাগের উপর প্রাধান্য স্থাপিত করে।

প্রথমে সূর্য্যমল সমধিক খ্যাতি প্রতিপত্তি বিশিষ্ট হইয়া উঠেন; পূর্ব্বপুরুষদিগের বলবীর্য্য তাঁহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। তিনি অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে দুর্ভেদ্য ভরতপুর দুর্গ অধিকার করেন। এই দুর্গ হইতেই সমগ্র রাজ্যের নাম ভরতপুর হয়। দিল্লির বিপক্ষে সমর-যাত্রা-সময়ে ১৭৬৩ অব্দে সূর্য্যমল হত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জোয়াহির সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনতিকাল মধ্যে লীলা সম্বরণ করিলে তদীয় ভ্রাতা রতন সিংহ রাজা হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনিও গতাসু হইলে তদীয় পুত্র কেহরী সিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে ইনি অপ্রাপ্ত-ব্যবহার থাকায় তদীয় পিতৃব্য যুগল নিবাল সিংহ ও নমাল সিংহ দ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদিত হইতে লাগিল। নমাল সিংহের আধিপত্য সময়ে এমন একটী দুর্ঘটনা ঘটে যে, সেই সূত্রে রাজ্যমধ্যে এক ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সূর্য্যমলের কনিষ্ঠ পুত্র রণজিৎ সিংহ রাজপদ লোলুপ হইয়া মোগল সেনার অধিনায়ক মির্জা নাজফ্ খাঁর সাহায্যে অস্ত্রধারণ করেন। প্রার্থনামাত্রে নাজফ্ খাঁ সৈন্যসামন্ত সহ সজ্জিত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কেবল মাত্র ভরতপুর দুর্গ রণজিৎ সিংহকে দিয়া আর সমস্তই আপনি হস্তগত করিয়া লইলেন। পরিশেষে তিনি নয় লক্ষ টাকা লাভের ভূসম্পত্তি রণজিৎকে দিয়াছিলেন। ১৭৮২ অব্দে নাজফ্ খাঁর মৃত্যু হইলে ভরতপুর ও তদধীন প্রদেশ সিন্ধিয়ার হস্তে পতিত হয়। রণজিতের জন-

নীর অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া সিন্ধিয়া তাঁহাকে দশ লক্ষ টাকা লাভের ভূসম্পত্তি সম্প্রদান করেন। সেনানায়ক পেরণের সহকারিতা করায় রণজিৎ আরও চারি লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে নিকট সম্পর্কীয় কুটুম্বদিগের মরণ নিবন্ধন রণজিৎ ভরতপুরের রাজা বলিয়া প্রথিত হইলেন। ১৮০৩ অব্দে তিনি ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া আনুগত্যের প্রমাণ স্বরূপে সিন্ধিয়ার বিপক্ষে রণযাত্রী লর্ড লেকের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপে তিনি কিষণগড়, কথবার, রেবারি, গোকুল ও সাহের এই কয়টী প্রদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি অধিককাল ইংরাজদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে পারেন নাই। ইংরাজেরা হোলকারের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, রণজিৎ তাঁহাদিগকে সৈন্যসাহায্য না করিয়া গোপনে হোলকারের সহায়তা করেন এবং সমর সমাপ্তির পরে নিজরাজধানীতে হোলকারকে আশ্রয় দান করেন। এই সকল কারণে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়া ভরতপুর আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রণজিৎ যার পর নাই সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। ইংরাজেরা উপর্য্যুপরি চারিবার পরাজিত হন। যদিও রণজিৎ বিজয়ী হইলেন, কিন্তু দেখিলেন, তাঁহার ধনাগার শূন্যপ্রায় হইয়াছে। এখন ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুতা সংস্থাপন করাই শ্রেয়ঃ এ বিবেচনা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপে রাজা ২০ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন; পরিশেষে তাহার মধ্যে সাত লক্ষ টাকা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল। ১৮০৫ অব্দে রাজা রণজিতের মৃত্যু হইল; তাঁহার দুই পুত্র রণধীর সিংহ ও বলদেব সিংহ ক্রমান্বয়ে ১৯ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৮২৫ অব্দে যখন বলদেবের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র বলবন্ত সিংহের বয়ঃক্রম ছয় বৎসর মাত্র। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে ঐ বালক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বালকের পিতৃব্যপুত্র দুর্জ্জনসাল সিংহাসন অধিকার করিয়া বালককে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেন। দুরাশাগ্রস্ত দুর্জ্জন সাল এক্ষণে স্বকরে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া অস্ত্র সাহায্যে নিজ পদ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। এই দুরভিসন্ধি সংপূরণ করিবার জন্য তিনি দুর্গ সকল দৃঢ়বদ্ধ ও সেনা সংগ্রহ করিয়া গোপনে প্রতিবেশবাসী সামন্তবর্গের সাহায্য পাইবার উপায় করিতে লাগিলেন। এই সকল সমাচার গবর্ণর জেনরেলের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি রাজ্যাপহারককে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ভরতপুরের বিপক্ষে ২৫,০০০ পঁচিশ সহস্র সেনা প্রেরণ করিলেন। প্রধান সেনাপতি লর্ড কম্বরমিয়ার স্বয়ং সৈন্য চালনার ভার গ্রহণ করিয়া সমর যাত্রা করিলেন। যে ভরতপুরের দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া এত দিন সাধারণের সংস্কার ছিল, ১৮২৬ অব্দের ১৮ই জানুয়ারি দিবসে ইংরাজ সেনাপতি তাহা হস্তগত করিয়া দুর্জ্জনসালকে কারারুদ্ধ করিলেন। বলবন্ত সিংহ সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হইলে তদীয় জননী রাণী মীরৎকুমারী তত্ত্বাবধায়িকা হইলেন; রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার জন্য একজন পোলিটিকল এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। অনতিকাল মধ্যে চক্রান্তকারিণী বলিয়া রাণীকে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া

একটী মন্ত্রি-সভা সংস্থাপিত হইল। ১৮৩৫ অব্দে রাজা বলবন্ত সিংহ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সাতিশয় দক্ষতার সহিত প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তিনি অতি দয়ালু-স্বভাব ছিলেন; তাঁহার সময়ে ভরতপুর আবার পূর্ব্বমত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮৫৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় একমাত্র পুত্র ষোড়শবর্ষীয় যুবক যশোবন্ত সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত এজেন্টের তত্ত্বাবধানে সামন্ত-পঞ্চকের দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল।

১৮৬৯ অব্দে মহারাজা যশোবন্ত সিংহ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় সদাশয় এবং ক্ষমাবান রাজা ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার রিলিফ ফণ্ডে দুই সহস্র ও মেয়ো কালেজে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৭৩ অব্দের জানুয়ারি মাসে মহারাজা বলবন্ত সিংহ আগ্রায় আগমন পূর্ব্বক রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজকুমার তদ্বিনিময়ে ভরতপুর রাজধানীতে শুভাগমন পূর্ব্বক প্রতি সাক্ষাৎ দ্বারা মহারাজের সম্মাননা করেন। দিল্লি নগরে যে বিক্টোরিয়া-রাজসূয় হইয়াছিল, মহারাজা তাহাতেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজা রাজেন্দ্র সওয়াই সর্ যশোবন্ত সিংহ বাহাদুর জজ্ জি, সি, এস, আই এক্ষণে ৩১ বৎসর বয়স্ক। প্রজার জীবন মরণের উপর তাঁহার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা আছে। তাঁহার সম্মানের জন্য ১৭ তোপ হইয়া থাকে।'

মন্ত্রিসভার প্রধান সভ্য গঙ্গারাম, পদ্ম সিংহ, রাবণ রাও এবং বকাবর সিংহ।

(ক্রমশঃ)

ন্যায়-দর্শন।

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলি টীকা সম্মত।

বাঙ্গালা

ভাষা পরিচ্ছেদ।

নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক পণ্ডিতদিগের বিচার সম্মত যে সাত প্রকার পদার্থ মাত্রের যোগ ও বিয়োগ এই উভয় কার্য্যের বলেই এই অসীম দুরবগম্য প্রপঞ্চ জগত-প্রবাহ অহরহ প্রবাহিত হইতেছে, সেই পদার্থ সকল সকল অবস্থাপন্ন লোকেরই অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেই পদার্থ সকলের বিষয় সংক্ষেপে বাঙ্গালায় বিবৃত করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

পদার্থ সাত প্রকার। যথা—

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব।

ইহার মধ্যে কোন্ পদার্থ কত প্রকার ক্রমে বলা যাইতেছে।

দ্রব্য পদার্থ।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহী ও মন—দ্রব্য পদার্থ এই নয় প্রকার।

গুণ পদার্থ।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সঙ্খ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব,

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং শব্দ—গুণ পদার্থ এই চব্বিশ প্রকার।

কর্ম্ম পদার্থ।

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন—কর্ম্ম পদার্থ এই পাঁচ প্রকার।

সামান্য পদার্থ।

নিত্য অথচ সমবায় সম্বন্ধে অনেক আশ্রয়ে বর্ত্তমান যে পদার্থ তাহার নাম সামান্য। সামান্যের নামান্তর জাতি।

সেই সামান্য আবার দুই প্রকার। পর সামান্য ও অপর সামান্য।

দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া এই তিন পদার্থেই বর্ত্তমান যে সত্তা তাহার নাম পর সামান্য। দ্রব্য সৎ, গুণ সৎ, ক্রিয়া সৎ এইরূপ প্রতীতি সত্তা জাতির প্রমাণ। এবং এই পরসামান্য ভিন্ন অর্থাৎ পৃথিবীত্ব, ঘটত্ব আদি যে জাতি তাহার নাম অপরসামান্য। আর দ্রব্যত্ব, গুণত্ব আদি জাতি পরাপরসামান্য। যে হেতু, যে ব্যাপক তাহাকে পর আর যে ব্যাপ্য তাহাকে অপর কহে। যে অধিকতর স্থান অধিকার করে তাহার নাম ব্যাপক এবং যে স্বল্পতর স্থান অধিকার করে তাহার নাম ব্যাপ্য। অতএব পৃথিবীত্ব আদি জাতি সত্তাজাতি অর্থাৎ পরসামান্য এবং দ্রব্যত্ব অর্থাৎ পরাপর সামান্য অপেক্ষা ব্যাপ্য। এবং দ্রব্যত্ব আদি জাতি পৃথিবীত্ব আদি জাতি অর্থাৎ অপর সামান্য অপেক্ষা ব্যাপিকা ও সত্তাজাতি অপেক্ষা ব্যাপ্য।

বিশেষ পদার্থ।

নিত্য অথচ নিত্য দ্রব্যে বর্ত্তমান যে পদার্থ তাহার নাম বিশেষ পদার্থ। ঘট পট আদি বস্তু সকলের অবয়বের ভেদে পরস্পর ভেদজ্ঞান জন্মায় কিন্তু যদ্দ্বারা অবয়ব রহিত পরমাণু সকলের পরস্পর ভেদজ্ঞান জন্মায় তাহাকেই বিশেষ পদার্থ কহে। যথা পার্থিব পরমাণুর সমষ্টিতে মৃত্তিকা এবং জলীয় পরমাণুর সমষ্টিতে জলই জন্মায়। জলীয় পরমাণুতে মৃত্তিকা কিম্বা পার্থিব পরমাণুতে জল কখনই জন্মাইতে পারে না। এইরূপ সমস্ত বস্তুর পরমাণু সকলের পার্থক্যের প্রতীতিই বিশেষ পদার্থের প্রমাণ। যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই তাহার নাম নিত্য।

সমবায় পদার্থ।

ঘটেতে কপাল কপালিকার যে সম্বন্ধ, দ্রব্যেতে গুণ এবং ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ এবং দ্রব্য গুণ কর্ম্ম এই তিনেতে জাতি অর্থাৎ সামান্য পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহাকেই সমবায় সম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায় পদার্থ কহে।

অসমবায় পদার্থ।

ভাব পদার্থ ভিন্ন যে পদার্থ তাহার নাম অভাব।

সেই অভাব পদার্থ দুই প্রকার। যথা; অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব। ঘট পট হইতে ভিন্ন, পট ঘট হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ঘট পট নহে এবং পট ঘট নহে ইত্যাদি প্রতীতি অন্যোন্যাভাবের প্রমাণ। সেই অন্যোন্যাভাব ভিন্ন যে অভাব তাহার নাম সংসর্গাভাব। সেই সংসর্গাভাব তিন প্রকার। যথা; প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। যাহার অভাব ধরা যায় তাহাকে ঐ অভাবের প্রতিযোগী কহে। প্রতিযোগীর জন্ম হইলে যে অভাবের নাশ হয়, তাহাকে প্রাগভাব আর প্রতিযোগীর নাশ হইলে যে অভাবের উৎপত্তি হয় তাহাকে ধ্বংসাভাব এবং নিত্য যে অভাব তাহাকে অত্যন্তাভাব কহে।

* এই কপালে ঘট হইবে ইত্যাদি প্রতীতি প্রাগভাবের প্রমাণ। এই কপালে ঘট নষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি প্রতীতি ধ্বংসাভাবের প্রমাণ। এবং এই ভূতলে ঘট নাই ইত্যাদি প্রতীতি অত্যন্তাভাবের প্রমাণ।

(ক্রমশঃ)

হৃদয়ের দুর্ব্বলতা।

এমন অনেক কথা আছে যাহা সকলেই ব্যবহার করে কিন্তু কেহই মানে বুঝে না। 'হৃদয়ের দুর্ব্বলতা' এই কথাটী ঐ জাতীয়। ইহাতে কি বুঝায় তাহা আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। শব্দটার কোন বিশেষ অর্থ নাই স্বীকার কর, অথবা আমার বুদ্ধি কোন কর্ম্মের নয় বল, কিম্বা আর যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল, আমি ফলতঃ কথাটার মানে বুঝি না। কথাটা আমি স্বয়ং নিয়ত ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং অপরকে সদাসর্ব্বদা ব্যবহার করিতে শুনিতে পাই। জগৎ জুড়িয়া এতলোক যে কথা ব্যবহার করে তাহার একটা মানে থাকা সম্ভব—দরকার। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমার গোঁফদাড়ি পাকিয়া উঠিল কিন্তু ঐ একটা সামান্য কথার মানে শিখিতে পারিলাম না।

কথাটা পূর্ব্বকালে এ দেশে ছিল না। পলাশির যুদ্ধের পর ইংলণ্ড হইতে জাহাজযোগে যখন বস্তা বস্তা সভ্যতা এদেশে আমদানি হইয়াছে, সেই সময় সেই সঙ্গে ঐ কথাটাও এদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। কথাটা ইংরাজী সভ্যতার একটা অঙ্গ। আমরা যে বিদ্যার বলে সেক্‌হ্যাণ্ড করিতে শিখিয়াছি, স্ত্রীর হাত ধরিয়া গড়ের মাঠে হাওয়া খাইবার জন্য কপ্‌চাইতেছি, বোতলবাসিনী সুধা সেবন করিয়া অ(?)মরত্ব লাভ করিতেছি, ক্ষুদ্র প্রাণ বাঙ্গালা ভাষার সহিত পনের আনা ইংরাজী মিশাইয়া কথা না কহিলে সুখ পাইতেছি না, বৃদ্ধকে হতাদর করিতে, সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিতে, প্রাচীন প্রথামাত্র পদবিদলিত করিতে এবং বলিয়া শেষ করা যায় না এমন কত কি করিতে শিখিয়াছি, সেই অদ্ভুত বিদ্যার সহিত ঐ অদ্ভুত কথাটা আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। কথাটা প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজি কথা।

এই ইংরাজি কথাটা আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়ায় আমাদের কোন লাভ হইয়াছে কি? হইয়াছে বই কি। ইংরাজি সভ্যতার অনেক অংশই অকারণ অহঙ্কার, প্রবঞ্চনা, আপনাকে আপনি ফাকি দেওয়া, লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা এবং অকারণে কারণের সৃষ্টি করা। এ সকল বিদ্যা শিখিলে যদি লাভ থাকে তবে অবশ্যই ঐ ইংরাজি কথাটা আমাদের মধ্যে চলিত হওয়ায় আমাদের যথেষ্ট লাভ হইয়াছে।

কোন কোন পাঠক হয়ত বলিবেন ইংরাজি সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যে মত প্রকাশ করিলাম তাহা নিতান্ত কঠিন, উহার একটা বিশদ ভাষ্য না হইলে উহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভাল, আমি একটা ভাষ্য-লাগা-

ইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। এক গাড়িতে উঠিয়া কলিকাতা হইতে দুই জনে দিল্লি পর্য্যন্ত চলিলেন কিন্তু কেহ কাহারও নাম ধাম জানিলেন না। ইহা ইংরাজী সভ্যতার চিহ্ন। এখন বল দেখি, ইহার মানে কি? ইহার মানে আমার মোটা বুদ্ধিতে যতদূর বুঝি, তাহাতে বোধ হয় কেবল ভ্রান্ত, অসার অহঙ্কার ও ছেলেমানুষী। তাহার পর একটা দেখ, ইংরাজি সভ্যতায় শিখাইতেছে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর অভিন্ন, এক মন, এক প্রাণ হওয়া আবশ্যক। তবে ভাই, ইংরাজ স্বামী ইংরাজনী স্ত্রীর এবং ইংরাজনী স্ত্রী ইংরাজ স্বামীর চিঠি পত্র দেখিবার অধিকার পায় না কেন? ইহাতে কি বুঝায় না, যে তাহাদের কথায় ও কাজে সাম্য নাই? বোধ হয় কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে কি জানি সাপ বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কাই এই নিয়মের কারণ। তাহার পর আরও দেখ, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র ও হৃদয় কখনই এক ভিন্ন দুই নহে। তাহার সদর মফস্বল, উল্টা সদর সম্ভবে কি? তবে সাহেবদের সমাজে, শাসনে, ব্যবহারে কথায় কথায় মফস্বল চরিত্র (Private character) ও সদর চরিত্রের (Public character) উল্লেখ কেন? আরও কি টীকা চাই? না এরূপ অপ্রিয় কথা আর পল্লবিত করিয়া কাজ নাই। তবেই দেখা গেল, ইংরাজি সভ্যতার বাহির ভাল, ভিতর বড় ফাঁক এবং উহা হিঁদুর দেবতার মত উপরে রঙ্গচঙ্গে ভিতরে কেবলই খড় ও মাটী। এই খড় ও মাটী বহুল পরিমাণে ম্লেচ্ছ রাজ্য হইতে রপ্তানি হইয়া এই আর্য্যরাজ্যে আমদানি হইয়াছে। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কথাটাও সেই সঙ্গে আসিয়াছে। এখন এই সকল খড়মাটীর প্রাবল্যে ভারত-মাতার কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না, তাহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিবেচ্য নহে। প্রস্তাবান্তরে তাহা আলোচনা করা যাইবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, বঙ্কিম বাবুর মনোরমার ন্যায় ইংরাজি সভ্যতারও দুই মূর্ত্তি—কখন তিনি বড়ই মধুর আবার কখন তিনি বড়ই দুর্ব্বোধ্য। আর আমরা ইহাও বলিয়াছি যে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কথাটাও ইংরাজি সভ্যতার একটা ভূষণ, প্রবঞ্চনার, আপনাকে আপনি ভুলাইবার অথবা সাধারণের চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপের একটা উপায়। সুতরাং আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাতে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কথাটা বলিতে, কহিতে ও শুনিতে বড় ভাল কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা অর্থহীন এবং ঐ সভ্যতার অপরাপর অঙ্গের ন্যায় ইহাও একটা ফাকি মাত্র।

কথাটার যেরূপ অর্থে ব্যবহার হয় তাহা বিচার করিয়া দেখিলে আমাদের অভিপ্রায় পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে। যখন দেখি, কোন মানব ঘোরতর ইন্দ্রিয়-পরায়ণ আমরা তখন তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া তাহার ঘোর অপরাধকে লঘু করিয়া দিবার চেষ্টা করি; যখন দেখি লোকটা নেশার দাস তখন তাহার দুর্ব্বলহৃদয়তার উল্লেখ করিয়া আমরা তাহাকে ক্ষমা করি। এইরূপ শতসহস্র স্থলে হৃদয়ের দুর্ব্বলতার ঘাড়ে ঝোঁক চাপাইয়া দিয়া মানুষটাকে প্রায় সাধু করিয়া লইয়া থাকি। তবেই দেখা যাইতেছে এ কথাটা একটা ফাকির কথামাত্র। ইংরাজি সভ্যতায় অপরাপর নীতির ন্যায় ইহাও নিতান্ত অন্তঃসার-শূন্য।

আর একটু বিশ্লেষ করিয়া দেখিলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়া আসিবে। আমরা কিরূপ স্থলে দুর্ব্বলহৃদয়তার উল্লেখ করি

তাহা ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, বিষয় বিশেষে মানবের অত্যধিক অনুরাগ, কোন কার্য্যে হৃদয়ের নিরতিশয় আসক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলিয়া খ্যাত। কিন্তু যখন স্বদেশ-বৎসল বীরপুরুষ দেশহিতার্থে সমরে প্রাণদান করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন তখন তাঁহার সে অত্যনুরাগকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলা হয় না; যখন সতীত্বরূপ অমূল্য সম্পত্তি-রক্ষার জন্য সাধ্বী কামিনী জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিতেও কাতর হন না, তখন তাঁহার সে প্রেমময়তা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলিয়া অভিহিত হয় না; যখন শিক্ষার্থী প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণায় উন্মত্ত হইয়া অত্যধিক মানসিক শ্রম করিয়া ধীরে ধীরে পরমায়ুক্ষয় করিতে থাকেন তখন তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ হৃদয়ের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নহে। ইত্যাদি সহস্র স্থলে বৎপরোনাস্তি আসক্তি দেখিতেছি কিন্তু তাহাকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলি না। কিন্তু কেন যে এ সকল স্থলে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলি না, তাহা জানি না ও বুঝি না। যদি বল মন্দ কার্য্যে মানবের নিরতিশয় আসক্তির নাম হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, তাহা হইলে আবার একটা বিশেষ বিচারের কথা উঠিয়া পড়িতেছে। কোন্ কার্য্য ভাল ও কোন্ কার্য্য মন্দ তাহার মীমাংসা করে কে? সমাজভেদে দেশ কাল পাত্রভেদে কার্য্য ভাল মন্দ হয়। দার্শনিক মহাশয়েরাও এ বিষয়ে বিশেষ মতের একতা দেখাইতে পারেন নাই। তবেই কি ভাল কি মন্দ, অগ্রে তাহার বিচার করিতে হয়। কিন্তু সে বিচারের এ স্থল নহে। তাহা ছাড়িয়া দিলেই দেখিতে পাইবে, এক জন মানুষ আর একজন মানুষকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসে। সে ভাল বাসাও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। কিন্তু কেমন করিয়া বলিব ভালবাসা — স্বর্গীয়—পবিত্র—জীবসংস্থিতির নিদান—সমাজের প্রধান বন্ধন ভালবাসা মন্দ কার্য্য? ভালবাসা যদি মন্দ কার্য্য নহে, তবে ভাল বাসিয়া হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অপরাধে অপরাধী হই কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। কথাটার মানে নাই—কথাটা বৃথা কথা।

দেখা গেল, বলি বা না বলি, বিষয় বিশেষে মানবের অত্যাসক্তি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। তাহা যদি হয় তবে স্বদেশ বৎসল বীর, পতি-পরায়ণা স্বাধ্বী, উন্নতি-লিপ্সু যুবক প্রভৃতি সকলেই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অপরাধে অপরাধী। কারণ মোট কথায় তাঁহাদের সকলেরই কার্য্য ভালবাসা। কেহ কোন যুবতীকে ভাল বাসে, কেহ কোন শিশুকে ভাল বাসে, কেহ কোন স্থানকে ভাল বাসে, কেহ শাস্ত্রালোচনা ভাল বাসে, কেহ সংগীত ভাল বাসে, কেহ দেশকে ভাল বাসে। যিনি যতই বলুন এ সকলই ভাল বাসা—আসক্তি—অনুরাগ; সুতরাং হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। কিন্তু এসকল স্থলে আমরা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কথাটা লাগাই না; অধিকন্তু ইহার অনেক স্থলে হৃদয়ের সবলতা এই সম্পূর্ণ উল্টা কথা ব্যবহার করি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও হৃদয়ের সবলতা কথা দুইটার একই অর্থ। অর্থাৎ উভয়ই ভালবাসা বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। এখন এই দুই সমান বাক্য হইতে হৃদয় কথাটা বাদ দিলে বাকী থাকে এক পক্ষে 'সবলতা' ও অপর পক্ষে 'দুর্ব্বলতা'। আমরা সকলেই জানি এই দুই কথার অর্থ পরস্পর বিপরীত। কিন্তু এই স্থানে ইহারা সমার্থ হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ উভয়েই এখানে অনুরাগ, আসক্তি বা ভালবাসা বুঝাইতেছে।

ভাষার এবম্বিধ বিসদৃশ ব্যবহার কেবল বাহ্য আড়ম্বরের জন্য করা হইয়াছে। কেবল লোককে ফাকি দিবার জন্য, আপনি আপনাকে ছলনা করিবার জন্য, এবং অলীক সভ্যতার চাকচিক্যে ধাঁধা লাগাইবার জন্য এ স্থলে ভাষাদেবীর সর্ব্বনাশ ঘটান হইতেছে। আমরা মাতৃভাষার সমাদর দেখিতে সাধ করি। এরূপ অকারণ আড়ম্বরের অনুরোধে ভাষার মস্তক চর্ব্বণ করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

শৈশব-মৃত্যু ও পীড়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এস্থলে অন্নপ্রাশন-প্রথার বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। প্রায় ৬ মাস বয়ঃক্রম হইলেই শিশুর অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে; উহার উদ্দেশ্য কি, তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয় না। বোধ হয় ছয় মাস বয়সের পূর্ব্বে শিশুকে অন্ন আহার দিলে তাহার পীড়িত হইবার সম্ভাবনা বলিয়া এবং ঐ বিষয়ে লোকের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রকর্ত্তারা ঐরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন। ছয় মাস বয়সের পরেই যে সকল শিশুকে প্রতিদিবস অন্নাহার দিতে হইবে এরূপ মত ছিল না। এক্ষণে ধনী ব্যক্তির সন্তানের ছয় মাস বয়ঃক্রমে অন্নপ্রাশন হইলেও তাহারা ছয় বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধপান ও মিষ্ট দ্রব্য আহার করিয়াই আসিতেছে। দরিদ্রের সন্তানেরা ছয় মাস বয়সের পর হইতেই প্রতিদিবস কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্নাহার করে। পিতা মাতারা এতদুভয়ের কোন দোষই দেখিতে পান না। শিশু সন্তানের দন্তোদ্গম, লালা নিঃসরণ, পাকস্থলীর আয়তন বৃদ্ধি ও পাচক রস নিঃসরণ হইবার পূর্ব্বে অন্ন ইত্যাদি শ্বেতসারময় বা কঠিন পদার্থ উদরস্থ হইলেও যেরূপ অপকার হইবার সম্ভাবনা, দুই বৎসরের সন্তানের ঐ সমুদায় ঘটনা হইলে, অন্নের পরিবর্ত্তে কেবল দুগ্ধ ও মিষ্টদ্রব্য উদরস্থ হওয়াও সেইরূপ অপকারী। ক্ষুধামান্দ্য, উদরাময়, আমাশয়ের পীড়া, দুর্ব্বলতা, স্ক্রফুলা ইত্যাদি রোগ সকল ঐ দুই প্রকার ক্রিয়ার ফল। অতএব অন্নপ্রাশনের যথার্থ উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া, যথা সময়ে সন্তানকে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে সাগুদানা, এরারুট, সুজি ইত্যাদি লঘু শ্বেতসারময় পদার্থ, পরে অন্ন, মৎস্য, মাংসাদি গুরুপাক সামগ্রী আহার করিতে দিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত কোন কারণ বশতঃ যদি মাতৃস্তন্য শিশুর অব্যবহার্য্য হয় তাহা হইলে ধাত্রীর স্তন্যপান করাইতে হইবে। সেই ধাত্রীর বয়ঃক্রম ১৮ বৎসরের অল্প বা ৩০ বৎসরের অধিক হওয়া উচিত নহে। ধাত্রীর সন্তান থাকিলে তাহার বয়স শিশুর বয়সের প্রায় সমান হওয়া আবশ্যক। ধাত্রীর শরীর সুস্থ ও সবল হইবে, উপস্থিত সময়ে বা পূর্ব্বে কোন সংক্রামক রোগের সংস্রব থাকিবেনা, গলদেশে স্ক্রফুলা বা কোন চিহ্ন থাকিবে না; উহার অন্তঃকরণ দয়ালু, স্বভাব ধীর,

মন প্রফুল্ল, ও বাস্তবিক কার্য্যে অনুরাগী হইবে। উহার স্তন দুগ্ধপূর্ণ ও ক্ষত-রহিত হইবে; ঐ দুগ্ধের পরিমাণ কত অর্থাৎ একবারে সন্তানকে সমস্ত স্তনাপান করাইয়া কতক্ষণ পরে পুনর্ব্বার দুগ্ধ-পূর্ণ হয় ও সন্তান আগ্রহ পূর্ব্বক ঐ দুগ্ধ পান করে কি না তাহা পূর্ব্বেই স্থির করা আবশ্যক।

যদি উপযুক্ত ধাত্রী প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাহা হইলে শিশুকে গর্দ্দভীর দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত; এবং উক্ত দুগ্ধাভাবে গাভীর দুগ্ধে চতুর্থাংশ চূর্ণের জল ও কিঞ্চিৎ শর্করা মিশ্রিত করিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া পান করাইবে। সুইটজরলণ্ড দেশীয় টীনের দুগ্ধও মন্দ নহে; তাহা অধিককাল ব্যবহার করিলে শিশুর শরীর স্থূল হইলেও বলিষ্ঠ হইবে না। কারণ উহাতে শর্করার ভাগ স্বাভাবিক দুগ্ধাপেক্ষা অধিক।

ভয়, ক্রোধ, অভিমান ইত্যাদি মানসিক বৃত্তি সকলের বশীভূত হইলে মস্তিষ্কের উত্তেজনা হেতু কনভলসন, এপিলেপ্সি (মৃগী) হিষ্টিরিয়া, মেনিঞ্জাইটিস, (মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ) প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া জন্মে। অতএব যাহাতে ঐ দুর্ঘটনা না ঘটে এরূপ উপায় অবলম্বন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। অর্থাৎ সন্তানকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল, সন্তুষ্ট ও নির্ভয় রাখিতে চেষ্টা করিবে। অনেক সময় মাতা পিতা সন্তানের উপর বিরক্ত হইয়া অত্যন্ত প্রহার করিয়া থাকেন; কখনও বা গালি দিয়া স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশ করেন; কেহ বা ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্তানের মনকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলেন। তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, ঐরূপ আচরণে সন্তানের ও আপনাদিগের অমঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই হয় না।

অন্ত্রের মধ্যে কৃমি থাকিলে শিশুদিগের নানা পীড়া জন্মে, ও তদ্দ্বারা অনেক শিশুর প্রাণ বিয়োগও হইয়া থাকে। কৃমির বীজ শরীরে প্রবেশ করিলেই কৃমি জন্মিতে পারে, নচেৎ স্বয়ং উৎপন্ন হইতে পারে না। ঐ বীজ খাদ্য পানীয় ইত্যাদির সহিত উদরস্থ হইতে পারে, এ নিমিত্ত আহারাদি করাইবার পূর্ব্বে বিলক্ষণ সাবধান পূর্ব্বক দেখিতে হইবে যেন খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীতে কোন প্রকার দূষণীয় পদার্থ না থাকে। নদীয়ার অন্তর্গত মুড়াগাছা গ্রামের আবাল বৃদ্ধ সকলেরই উদরে কতকগুলি গোল কৃমি (রাউণ্ড ওয়ার্ম) আছে; তাহার প্রধান কারণ এই যে ঐ গ্রাম্য-লোক যে খালের জল ব্যবহার করেন, তাহা অতি অপ্রশস্ত, স্রোতোহীন ও মলিন পদার্থে পূর্ণ এবং তাহাতে গো মহিষাদি পশুগণকে স্নান করান হইয়া থাকে।

দন্তোদ্গমের সময় প্রায় সকল শিশুরই অল্প বা অধিক অসুস্থতা জন্মে। ঐ সময় শিশুর ইন্দ্রিয়-শক্তি ও ক্লেশানুভূতির আধিক্য হয়; সুতরাং যে কারণে অন্য সময়ে কোন পীড়া জন্মে না, ঐ সময়ে সেই সমান্য কারণে গুরুতর রোগ হইতে পারে। ক্রোধ, অভিমান, বিরক্তি ইত্যাদির বৃদ্ধি হয়, এ নিমিত্ত যাবৎ প্রথম ৪।৫ টী দন্ত বহির্গত না হয়, তাবৎ শিশুকে কোন প্রকারে উত্তেজিত বা ভীত হইতে দেওয়া উচিত নহে। ঐ সময় শিশুর খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। যাহাতে শিশুর কোষ্ঠ বদ্ধ, উদরাময় বা কাশী ইত্যাদি পীড়া জন্মিতে না পায়, আরও যাহাতে শিশুর স্বাভাবিক নিদ্রার ব্যাঘাত না জন্মে, এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে।

সংক্রামক রোগের বীজ স্পর্শ করিলে শিশুর বসন্ত, হাম, পাণিবসন্ত, টাইফস, টাইফয়েড্ ফিবার, ডিপ্থেরিয়া, এরিসিপেলাস, হুপিংকফ, মম্পস্ (কর্ণমূলের প্রদাহ) ইত্যাদি পীড়া জন্মিতে পারে। ঐ সমুদায় পীড়ার প্রত্যেকের স্ব স্ব বীজ আছে; সেই বীজ স্পর্শ বা অন্য কোন প্রকারে শিশুর শরীরে প্রবেশ করিলে (জল, বায়ু বা খাদ্যের সহিত) ঐ সমুদায় পীড়া জন্মিয়া থাকে। কিরূপে ঐ সমুদায় পীড়া নিবারণ করিতে পারা যায় তাহা পরে লিখিত হইবে। এক্ষণে কেবল এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, যত্নপূর্ব্বক কোন প্রকারে শিশুদিগকে ঐ সমুদায় রোগের বীজ হইতে দূরে রাখিবে।

১।—সামাজিক আচার ব্যবহার পীড়া, অকাল মৃত্যু ও জাতীয় ও বলহীনতার নিবার্য্য কারণ।

২।—অধিকাংশ লোক এক মত হইলে ঐ সমুদায় কুপ্রথা ও নিবার্য্য কারণ সকল দূর করিতে পারা যায়; একাকী কেহই ঐরূপ করিতে সক্ষম নহে।

৩।—ঐ সমুদায় কারণ মনুষ্যকে জরায়ুজীবন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অনবরত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

৪।—জরায়ুস্থ জীবের স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত গর্ভিণী নারীর কর্ত্তব্য নিরূপণ আয়ুর্ব্বেদ মতে।

৫।—অভিলাষের বশীভূত হওয়া উচিত নহে; মাতার ও জরায়ুস্থ জীবের মঙ্গল কামনায় দুষ্টাভিলাষ দূর করা উচিত। ঐ বিষয়ে ডাক্তার বুলের ও ডাক্তার টানারের মত।

৬।—(ক) গর্ভিণী নারীর মন হর্ষযুক্ত ও আশাপূর্ণ, প্রকৃতি ধীর এবং ইচ্ছা ন্যায়সঙ্গত হইবে। চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার অপ্রিয় পদার্থ দর্শন, শ্রবণ বা ঘ্রাণ করিবেন না।

(খ) গর্ভিণী নারীর মল মূত্রের বেগধারণ করা অবিধেয়।

(গ) যানারোহণ নিষিদ্ধ ও অনিষ্টকারী।

(ঘ) অল্প পরিমিত পরিশ্রম উপকারী।

(ঙ) রাত্রি জাগরণ নিষিদ্ধ।

(চ) খাদ্য লঘু ও পুষ্টিকর হইবে। অল্পভোজন ও অতিভোজন এতদুভয়ই অনিষ্টকারী। সাধভক্ষণের উদ্দেশ্য।

৭।—সন্তান পিতা মাতার কোন কোন পীড়ার উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের সেই প্রকৃতিও পাইয়া থাকে।

৮।—সূতিকাগৃহের আয়তন যত বৃহৎ হয় ততই মঙ্গল, পাকা সূতিকাগার ১২৫০, কাঁচা ৮১২ ঘন ফুটের কম হওয়া উচিত নহে।

৯।—সূতিকাগার শুষ্ক, উচ্চ, বায়ু ও আলোক প্রবেশের উপায়-বিশিষ্ট ও জনরবশূন্য হইবে।

১০।—বঙ্গদেশীয় সূতিকাগৃহ সম্বন্ধে ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায়ের মত, ডাক্তার পেনের মত—

১১।—সূতিকাগৃহের অস্বাস্থ্যকর অবস্থাই বঙ্গীয় প্রসূতি ও শিশুর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ।

১২।—সূতিকাগৃহের শয্যা ও বস্ত্রাদির উন্নতি অতি আবশ্যক।

১৩।—সূতিকাগৃহ বেশ পরিষ্কৃত ও শুষ্ক রাখিতে হইবে।

১৪।—প্রজ্বলিত অগ্নি প্রয়োজনানুসারে গৃহের ভিতরে বা বাহিরে রাখা উচিত। ধূম উৎপাদক আর্দ্র কাষ্ঠ জ্বালান অত্যন্ত অহিতকর। অগ্নি রাখিবার উদ্দেশ্য দুষ্ট বায়ুকে সমান উত্তপ্ত রাখা ও বায়ুর গতি উৎপাদন করা।

১৫।—অশৌচের কাল নিরূপণ;—জরায়ু ইত্যাদি যন্ত্র সকল প্রসবের পর দুই মাস গত না হইলে সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঐ সকল যন্ত্র হইতে এক প্রকার ক্লেদ নির্গত হয়; সুতরাং ঐ সময়ের পূর্ব্বে সূতিকাগৃহ ত্যাগ করা প্রসূতির অতি নিষিদ্ধ এবং আধুনিক নানা প্রকার পীড়ার মূলীভূত।

১৬।—শৈশব ও বাল্য মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইংলণ্ডে শতকরা প্রায় ১৫। ১৬টী শিশু এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং ২৪ র্থাংশের অধিক শিশু ৫ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

১৭।—এই বহুল শৈশব মৃত্যুর কারণ সমুদায় নিবার্য্য। এসম্বন্ধে ডাক্তার ট্যানার এবং বুলের মত।—

১৮। শৈশব মৃত্যুর ক্রম ও কারণ—(১) পিতা মাতার সামাজিক অবস্থা; (২) জারজ সন্তানের মৃত্যু সংখ্যার বাহুল্য; (৩) জন্ম ও মৃত্যু-সংখ্যার ক্রমিক সমতা; (৪) শস্যাদির অপ্রাচুর্য্য ও মৃত্যু সংখ্যার আধিক্য। (৫) বালিকা অপেক্ষা বালকের মৃত্যু সংখ্যার আধিক্য; (৬) ভূমির কর ও শৈশবমৃত্যুর বৃদ্ধি-ক্রমের সমতা; (৭) শিশুর খাদ্য ও পোষণ সামগ্রীর অনুপযোগিতা। শিশুরা মাতৃস্তন্য পান করিলে সুস্থ থাকে; অস্বাভাবিক কৃত্রিম খাদ্য ভোজন করিলে উত্তমরূপ বলিষ্ঠ ও পরি-পুষ্ট হইতে পারে না।

১৯।—বঙ্গদেশে শৈশব মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; তাহার স্থানিক, সামাজিক, ও জাতীয় কারণ আছে। ডাক্তার পেনের মতে কলিকাতায় শতকরা ৩০টীরও অধিক শিশু এক বৎসরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

২০।—দরিদ্র ভদ্র লোক ও নীচ জাতীয় সন্তানগণ অধিক অসুস্থ; তাহাদিগের অকাল মৃত্যু হইবার কারণ;—(ক) শস্যাদির অপ্রতুলতা; (খ) শীতাধিক্য; বিষম শীত বা উত্তাপ শৈশব মৃত্যুর কারণ। শিশুগণ শীত সহ্য করিতে পারে না, এজন্য উত্তাপ-রক্ষক পরিচ্ছদ দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত রাখা আবশ্যক। অগ্নি ও রৌদ্রের উত্তাপ অপকারী। (গ) পিতা মাতার অজ্ঞতা ও কুসংস্কার; (ঘ) অবিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও আলোকাভাব; (ঙ) অপরিচ্ছন্নতা শৈশব পীড়ার এক প্রধান কারণ। শিশুগণকে নিয়মিত রূপে স্নান করান অতি আবশ্যক। (চ) অযথোচিত ও অপ্রচুর খাদ্য; মাতৃস্তন্যই শিশুর স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যজনক খাদ্য। ৯।১০।১২ মাস পর্য্যন্ত উহা-দিগকে কেবল মাতৃস্তন্য পান করান উচিত। প্রথম দন্তোদ্গম হইলে কিঞ্চিৎ লঘু শ্বেত-সারময় পদার্থ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া উচিত; অনন্তর ক্রমে ক্রমে ঘন দ্রব্য দিতে হয়। দুই বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে শিশুকে মাংস ভক্ষণ করিতে দেওয়া অবিধেয়। শিশু সন্তানকে নিয়মিত রূপে যথা সময়ে মাতৃস্তন্য পান করান একান্ত আবশ্যক।

২১।—মাতা পীড়িতা, উগ্রস্বভাবা, কিংবা স্ক্রফুলা, টিউবার কি কুলিসিস রোগ-প্রবণ-প্রকৃতিযুক্তা হইলে, অথবা মদ্যপায়িনী, গর্ভ-বতী বা ঋতুমতী হইলে সন্তানকে মাতৃস্তন্য ত্যাগ করাইতে হইবে। এক বৎসরের অধিক কাল মাতৃস্তন্য পান করান অমঙ্গলকর; উহাতে মাতা ও শিশু উভয়েরই পীড়া জন্মে। ৯ হইতে ১২ মাসের মধ্যে শিশুকে মাতৃস্তন্য ছাড়াইবার উপযুক্ত সময়।

২২।—মাতৃস্তন্য অব্যবহার্য্য হইলে শিশুকে ধাত্রী, গর্দ্দভী বা গাভীর দুগ্ধ খাওয়াইতে হইবে।

২৩।—সন্তানগণকে ভয়, ক্রোধ, অভিমান ইত্যাদি বৃত্তিসকলের বশীভূত হইতে দেওয়া অনুচিত।

২৪।—মধ্যে মধ্যে কৃমিনাশক ঔষধ ব্যবহার করান উচিত।

২৫।—সংক্রামক রোগের বীজ স্পর্শ করিয়া সন্তানকে স্পর্শ করা অত্যন্ত নিষিদ্ধ। ঐ সমুদায় রোগ মাতা বা ধাত্রীকে আক্রমণ না করিয়া সন্তানকে আক্রমণ করিতে পারে। তিন মাসের মধ্যে সকল শিশুকে গোবীজের টীকা দেওয়া উচিত।

বিদ্যুল্লতা।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক! তুমি কি কখন পরিবার হইতে পৃথক থাকিয়া দেখিয়াছ? বিচ্ছেদ কালে দূরস্থ আত্মীয়ের কোন অমঙ্গলের সংবাদ না পাইয়াও অন্তরে অন্তরে তাহা কখন অনুভব করিতে পারিয়াছিলে? দূরদেশে থাকিয়া আত্ম পরিবার অন্তর্গত ব্যক্তি বিশেষের পরোলোক প্রাপ্তির সংবাদ না পাইয়াও তুমি কি মনে মনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলে? তোমার সহধর্ম্মিণী কোন দিন তোমার বিরহে ব্যাকুল হইলে তুমি কি প্রবাসে থাকিয়া তাঁহার সেই যন্ত্রণা তখনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলে? ঈদৃশ সাম্নুভূতি-সম্পন্ন হৃদয় লইয়া—বলিতে পার—যখন বিদ্যুল্লতা সেই বস্ত্রখানি অবলম্বন করত স্বামীর জন্য যার পর নাই বিষণ্ণ-চিত্ত—সাহেব তখন অপর কক্ষে বসিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন কেন?

সাহেবের নাম নাম নরেন্দ্র—৺রাধাকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র,—রাজেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর—পতিপরায়ণা বিধবা-বেশিনী বিদ্যুল্লতার স্বামী! কাঁথিতে রাধাকান্ত বাবুর জমিদারী ছিল—রাজেন্দ্র এখন সেই জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিতেছেন। রাধাকান্ত শারদীয় পূজা উপলক্ষে সপরিবারে নৌকারোহণে দেশে আসিতেছিলেন। রাত্রিযোগে প্রচণ্ড ঝটিকার আঘাতে নৌকাখানি রূপনারায়ণের মোহানায় জলমগ্ন হইয়া যায়। পরমায়ু সত্ত্বে কবে কাহার প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে? যাহারা বাঁচিবার তাহারা যে প্রকারে হউক বাঁচিয়াছিল—যাহারা দেশে আসিবার তাহারা দেশে আসিয়াছিল। রাজেন্দ্র, রাজেন্দ্রের জননী এবং বিদ্যুল্লতা দেশে আসিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র ভাসিতে ভাসিতে একখানি ইংলণ্ডগামী জাহাজবদ্ধ একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি ধরিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তখন জাহাজ চলিতেছিল, ডিঙ্গিতে কেহই ছিল না। তিনি যে ডিঙ্গিতে উঠিয়াছিলেন, অন্ধকার প্রযুক্ত জাহাজের আরোহীরা তাহা দেখিতে পায় নাই। তখন নরেন্দ্রের বয়ঃক্রম ঊনবিংশতি বৎসরের ন্যূন ছিল, তরুণ যুবা অতীত দুর্ঘটনা ও সর্ব্বনাশের কথা ভাবিতে ভাবিতে উদাসীন চিত্তে সারা রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, অপর সকলেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপ নৈরাশ্য বশতই হউক—আর সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা বশতই হউক—কাহাকেও তাঁহার দুর্দ্দশার কথা কহেন নাই। প্রভাত হইলে এক জন নাবিক তাঁহাকে ডিঙ্গি হইতে জাহাজে লইয়া যায়। সেই জাহাজে লেডী ট্রিভিলিয়ান নাম্নী এক জন রমণী আরোহী ছিলেন—তিনি নরেন্দ্রকে দেখিয়া অতি কাতর চিত্তে তাঁহার বিপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র সেই রমণীর সস্নেহ বচনে পুলকিত হইয়া আপনার বিপদের কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়াছিলেন। রমণী আপন ব্যয়ে তাঁহাকে দেশে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু নরেন্দ্র অভিলাষী হয়েন নাই। সুতরাং সেই রমণী তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া আপনার আবাসে রাখিয়া, আপন ব্যয়ে তাঁহাকে বিদ্যাধ্যায়ন করাইয়াছিলেন। নরেন্দ্র বারিষ্টর হইলে পর সেই রমণী তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন তুমি একবার মাতৃভূমি দর্শন করিতে যাও, আত্মীয়ের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকেন, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সম্মতি লইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলে এই খানে তোমার বিবাহ দিব। সেই বুদ্ধিমতী রমণীর আন্তরিক অভিলাষ, নরেন্দ্র স্বদেশে থাকিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করেন—দেশে আসিলে মাতৃভূমির মায়া বলবতী হইয়া তাঁহাকে বিদেশ বাসে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে, আর যদ্যপি ভাগ্যক্রমে তাঁহার পত্নী জলমগ্ন হইয়াও রক্ষা পাইয়া থাকেন, নিরাশচিত্ত নরেন্দ্রকে পাঠাইয়া দিলে, রমণীর যোগ্য কার্য্য করা হইবে। তিনি নরেন্দ্রকে যখন তখন দেশের সংবাদ লইতে বলিতেন, নরেন্দ্র ভুলিয়াও একবার কাহাকে পত্র লিখেন নাই। রমণী তাঁহাকে দেশে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া আত্মীয় ও পাঠদ্দশার বন্ধু হরিপালের জমিদার পুত্র নগেন্দ্রকে পত্র লিখিবেন মনে করিলেন, আবার কি ভাবিয়া তাহা হইতেও বিরত হইলেন। অনন্তর দেশে আসিয়া অন্য কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই নগেন্দ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তিনি নগেন্দ্রের মুখে শুনিয়াছেন, তাঁহার জননী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভার্য্যা বিদ্যুল্লতা সে দুর্ঘটনায় রক্ষা পাইয়া এখনও জীবিত রহিয়াছেন।—কে কোথায় প্রিয়তম আত্মীয়ের মুখ বিস্মৃত হয়েন? তবে বহুকাল না দেখিতে পাইলে, শারীরিক গঠনের পরিবর্ত্তন হেতু আত্মীয়কে দেখিয়াই চিনিতে না পারিলেও পারেন। কিন্তু দেখিবা মাত্র মনে হয়, তিনি তাঁহারই আত্মীয় হউন আর না হউন, তাঁহার মুখ পরিচিত। মুখ দেখিয়া হৃদয়ে এই পরিচিত ভাবের উদ্রেকে স্মৃতি মথিত হইতে থাকে, সে ব্যক্তি প্রিয়তম আত্মীয় বা সুহৃদ বলিয়া হৃদয়ে আর এক প্রকার অদ্ভূত আনন্দপ্রদ ভাবের উদয় হয়—উদ্দিষ্ট আত্মীয়কে মনে হইতে থাকে, আবার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

বিদ্যুল্লতা তখন ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন, এখন পরিপুষ্ট, এই পরিপুষ্টতার আনুসঙ্গিক অঙ্গসৌষ্ঠব বা লাবণ্য তখন ছিল না,—মুখের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ণ যৌবনবশতঃ বিদ্যুল্লতা সুকুমার বদনে অলৌকিক চাকচিক্য বিকাশ পাওয়ায় নরেন্দ্র তাঁহাকে এই পাঁচ বৎসর পরে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু সাহেব নরেন্দ্রের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। মনে হইতেছে, তিনি তাঁহার সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা,

অথচ নিশ্চিত পরিচয় না পাইয়া হিন্দুকুলকামিনীকে স্বীয় পত্নী বলিয়া সম্বোধন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। এমন স্থলে তাঁহার হৃদয়ে চিন্তার বেলা কেনই বা না উত্থিত হইবে, কেন তাঁহার প্রাণ আকুল না হইবে, কেনই বা তাঁহার নেত্র দিয়া অশ্রু প্রবাহ বহিতে না থাকিবে?

তিনি একাকী সেই কক্ষ মধ্যে একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া রোদন করিতে করিতে রুমালে নেত্র মার্জ্জনা করিতেছিলেন—আর অকূল চিন্তায়, বিস্ময়ে, উৎকণ্ঠায় একান্ত কাতর ছিলেন—এমন সময় বিদ্যুল্লতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সুরূপা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সাহেবকে রোদন করিতে দেখিয়া সুরূপা সবিস্ময়ে ফিরিয়া যাইতেছিল—তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া সাহেব চাহিয়া দেখিলেন —এবং "কি গা—কেমন আছেন?—কিছু বলিতে আসিয়াছ কি?" বলিতে বলিতে নেত্র মুছিয়া সুরূপার মুখের দিকে চাহিলেন। সুরূপা থতমত খাইয়া একটু নীরব রহিল—তাহার পর কহিল "আপনি কি এমন ব্যস্ত রহিয়াছেন?—মা একটা কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন।"

"কি বলিয়াছেন" বলিয়া নরেন্দ্র শয়ান অবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলেন। সুরূপা হেঁট মুখে ধীরে ধীরে অতি নম্রভাবে বলিল "মা যাবেন বলিতেছেন—"

অতি বিষণ্ণ ভাবে "কেন? কোথায় যাবেন?" বলিয়া সাহেব সুরূপার মুখের দিকে চাহিলেন। সুরূপা, কোথায় যাইবেন বলিতে থতমত খাইয়া একবার সাহেবের মুখের দিকে তাকাইয়া অপ্রতিভ ভাবে সরিয়া গেল।

পাঠক! তখন নরেন্দ্রের চিত্তের দশা ভাবিয়া দেখ!—মুখের দিকে চাহিয়া দেখ! যেন কোন মর্ম্মান্তিক বেদনায় দেখিতে দেখিতে তাঁহার বদন বিশুষ্ক, মলিন ও বিমর্ষ হইয়া আসিল!

এই দুইটি পাশাপাশি কক্ষ, মধ্য দিয়া একটী দ্বার। সেই দ্বারের নিকটে আসিয়া অপর কক্ষ হইতে সুরূপা কহিল "ভগ্নীকে দেখিতে যাইবেন।"

"ভগ্নি কে?"—বলিয়া নরেন্দ্র চৌকি হইতে উঠিয়া আপনার কক্ষের ভিতরে সেই দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিদ্যুল্লতা সুরূপাকে শিখাইয়া দিলেন—বল "আপনি এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হইয়া হিন্দুমহিলার পরিচয়-প্রার্থী হইতেছেন কেন? আমিত এখন সুস্থ ও সবল হইয়াছি, এখন আমায় বিদায় দিন। আমায় পুনর্জ্জীবন দিয়াছেন—তৎজন্য এ দুঃখিনী যাবজ্জীবন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। আপনার এ সুকীর্ত্তি ভারতবর্ষে চিরকাল ঘোষিত হইবে।"

দেখ, নরেন্দ্রের চক্ষু দিয়া আবার অশ্রু প্রবাহ বহিতে লাগিল, হৃদয় প্রস্রবণ উথলিয়া উঠিল—তিনি কাঁদিতেছেন!—সুরূপা দুই একটী কথা না বলিতে বলিতেই নরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ ও ভগ্নস্বরে কহিয়া উঠিলেন—"আমাকে কেন দায়গ্রস্ত করিবেন? আত্মীয় স্বজন ব্যতীত আমি আপনাকে কাহার সঙ্গে কোথায় পাঠাইব? বিপত্তির সময়ই বিপদ ঘটিয়া থাকে—ভগবান রক্ষা করুন। আপনাকে এখন পাঠাইয়া দিই, কিন্তু পরে আপনার কোন আত্মীয় আসিয়া আমাকে

আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তখন কি বলিব? বিশেষতঃ আপনি এখনও সম্যক রূপে সুস্থ হন নাই, গত রাত্রের যে অবস্থা, তাহাতে কোন কোমল-প্রাণা কোমল-কলেবর-বিশিষ্টা বঙ্গমহিলা অষ্ট প্রহরের মধ্যে এতদূর আরোগ্য লাভ করিতে পারেন না যে, তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দিতে পারা যায়! আপনি সুধু ভগ্নীকে কেন—যাহাতে সকলকে শীঘ্র দেখিতে পান তাহার উপায় করিব। আরও দুই এক দিন এই খানে অবস্থিতি করুন, কোথায় কাহার নিকট সংবাদ পাঠাইলে আপনার আত্মীয়গণ সংবাদ পাইবেন বলিয়া দিন—এখনই তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করিব!"

"তা বলিও না সুরূপা,"—বিদ্যুল্লতা কাঁদ কাঁদ ভাবে কহিতে লাগিলেন "এখন আর আমাকে কেহ আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। সে পথে গিয়া কাজ নাই, এখান হইতে বিদায় হইতে চাহি; ইহ জন্মে যে একটি দুষ্ক্রিয়া করিয়া ফেলিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব—তাহার পর আর আমার অস্তিত্বে প্রয়োজন কি?" সুরূপা বিদ্যুল্লতার কথা শুনিয়া অবাক্ হইল।

নরেন্দ্রের মুখে বিষম বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল। 'দুষ্ক্রিয়া!' 'এখন আর আমায় কেহ আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবেনা,' তাহার পর 'আর আমার অস্তিত্বে প্রয়োজন কি!' কি বিষম কথা—রমণীর সম্বন্ধে কি বিষম কথা! বিশেষতঃ দুষ্ক্রিয়ান্বিতা রমণীই আপন মুখে ব্যক্ত করিল—কি ভয়ানক কথা, কি ঘৃণাই ব্যাপার!

নরেন্দ্রের চক্ষের জল শুকাইয়া আসিল, অন্তর জ্বলিয়া উঠিল, মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল; শরীরে ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।—তাঁহার মনে হইতে লাগিল, কোন্ পাপিয়সীকে আশ্রয় দান করিয়াছেন—কোন্ পাপিয়সীকে তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা বিদ্যুল্লতা বলিয়া মনে করিতেছিলেন, এখন তিনি দেখিতেছেন এই দুষ্ক্রিয়ান্বিতার সহিত বিদ্যুল্লতার কোন সাদৃশ্য নাই, কিছুতেই এ রমণী বিদ্যুল্লতার মত নহে,—এ কখনই বিদ্যুল্লতা হইতে পারে না। তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল—যায় যাউক সে রমণী, তাহাকে রাখিয়া সুধু কলঙ্কভাজন হইতে হইবে। বলিলেন "ভাল, তোমরা যাইবে—যাও"। পথ খরচ স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেন। নরেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন না, পাপের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে গিয়া ভ্রান্তি বশতঃ কি বিষম কার্য্য করিয়া ফেলিলেন; বুঝিলেন না—তিনি আপনার চরণে আপনি কুঠার আঘাত করিলেন!

সুরূপাকে সঙ্গে করিয়া বিদ্যুল্লতা বিদায় হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ সেই স্থানে পড়িয়া রহিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্র অতি প্রত্যূষে নরেন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া পীড়িতা রমণীর আত্মীয়বর্গের সন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। সে রমণী যে ভদ্রকুলসম্ভূত তদ্বিষয়ে নগেন্দ্রের কিঞ্চিৎ মাত্র সংশয় ছিলনা, সুতরাং তৎসম্বন্ধে যে কিছু অনুসন্ধান, সাবধানে ও গোপনভাবে সাধিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমেই সুরূপার মাসীর দোকানে গিয়া কৌশলে তত্ত্ব লইবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু সুরূপার মাসী কিছুতেই কোন

কথা প্রকাশ করিল না। সুতরাং নগেন্দ্রকে তথা হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। তিনি ভাবিলেন, হয়ত সে রমণী তারকেশ্বরের যাত্রী; তারকেশ্বরে গিয়া অনুসন্ধান করিলে তাঁহার সম্পর্কীয় কোন না কোন ব্যক্তির সন্ধান করিতে পারিবেন। তারকেশ্বরে প্রত্যহ কত শত যাত্রী যাতায়াত করিতেছে, তন্মধ্যে তিনি কাহার কথা কি বলিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং কেই বা তাহা বলিয়া দিতে সক্ষম হইবে এ চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল না। ঔদ্ধত্য বশতই হউক, অথবা রমণীর পরিচয় প্রাপ্তে পরম আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন এই চিত্তবিনোদন আশা-প্রলোভনেই হউক, তিনি তারকেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। নিরাশ অন্তঃকরণে চন্দননগরে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় তাঁহার গাড়ী আসিয়া ব্যাজড়ায় পঁহুছিল। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল কাশীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নরেন্দ্রের প্রত্যাগমনবার্ত্তা কহিয়া যান। কাশীনাথ ও বিদ্যুল্লতার জননী এমন অভাবনীয় শুভ সংবাদ পাইয়া কত আনন্দলাভ করিবেন, কত সুখী হইবেন—একবার গিয়া একটা কথা বলিয়া আসা মাত্র—ভাবিয়া নগেন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। অধিক দূর যাইতে না যাইতে দেখিলেন একটা স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে বলিতেছে "কায়েত বামনের ঘরে হ'চ্চে—তা আমরা ত ছোটলোক।"

পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল "কে বে'র ক'রে নিয়ে গেল—জানিস্?" স্ত্রীলোকটা উত্তর করিল "তা বলিব কেন?"

নগেন্দ্র চমকিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাহারা দুইজনে সরিয়া গেল, তিনিও অগ্রসর হইলেন—কিয়দ্দূর গিয়াই শুনিলেন, পথের দুই পার্শ্বস্থ অট্টালিকার প্রাসাদ হইতে দুইটী রমণী বলাবলি করিতেছে—"কিন্তু পিসিমা—তার রকম সকম তেমন ছিল না ত!" "আর না—কাশীর মুখে কালি দিয়া গেল!" নগেন্দ্র সন্দিহানচিত্তে আর একটু অগ্রে গিয়া দেখিলেন একখানা চণ্ডীমণ্ডপে মহা গোল হইতেছে—"কাশীনাথের বড় মাৎসর্য্য হ'য়েছিল"—"মেয়ের না বড় সুখ্যাতি করিত?"—"স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"—"এখন সময় না করিলে কাশীনাথের বাড়ী কেহই জলগ্রহণ করিব না"।

নগেন্দ্রের বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, চরণ চলৎশক্তিহীন হইয়া জড়াইয়া আসিতে লাগিল, তিনি চক্ষে অণুআকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। "সর্ব্বনাশ! এ কি কথা শুনিতেছি!" ভাবিয়া সজ্ঞাশূন্য, স্পন্দবিহীন, নির্জ্জীবের মত কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। কে এক জন পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে গা?" নগেন্দ্র থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন "আমি—কাশীবাবুর বাটীতে যাইব।" "ঐ যে যাও না, সুসংবাদ শুনিতে পাইবে, যাও যাও" বলিয়া উপহাস করিয়া সে চলিয়া গেল।

নগেন্দ্রের চরণ চলে না, প্রাণ চাহে না যে কাশীনাথের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিতে যান। কিন্তু তত দূর আসিয়া আত্মীয় হইয়া সাক্ষাৎ না করিয়া যাওয়া, বিশেষতঃ এমন দুঃসময়ে—অবিধের বিবেচনা করিলেন। তাঁহার মনে হইতেছে, তাঁহারা যাঁহাকে চন্দন-

নগরে লইয়া গিয়াছেন—তিনিই বিদ্যুল্লতা।—বিদ্যুল্লতার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে কাশীনাথকে এ সংবাদ দেওয়া আবশ্যক—কেন না, বিদ্যুল্লতা কাশীনাথের স্নেহ প্রতিমা—পরম আদরের ধন প্রিয়তমা দুহিতা,। নগেন্দ্র বিষণ্নভাবে কাশীনাথের দ্বারে গিয়া অনেক বার ডাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্ধকারে একজন শীর্ণকায় পুরুষ আসিয়া দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি—কা'কে ডা'কৃছ?

নগেন্দ্র কহিলেন "কাশীনাথ বাবুকে—তিনি বাড়ী আছেন কি?"

পুরুষ অতি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

নগেন্দ্র কহিলেন "বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব"—

"কি বল—আমিই কাশীনাথ।"

"আপনার কন্যার কোন সংবাদ"—

কথা শেষ না হইতেই পুরুষ কহিয়া উঠিলেন "আর কোন কথা আছে—না?"—এবং দ্বার রুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন।

নগেন্দ্র অতি কাতরভাবে কহিলেন "এ কি! দ্বার রুদ্ধ করিতেছেন কেন?—আপনি আমায় চিনিতে পারেন নাই?—আমি যে নগেন্দ্র—"

কাশীনাথ তখন রুক্ষ ভাব ছাড়িয়া, কাঁদ কাঁদ স্বরে "নগেন?—এস বাবা এস" বলিয়া হাত ধরিয়া বাটীর মধ্যে লইলেন এবং "ব্যাটারা জ্বালাতন ক'রে মা'চ্চে" বলিতে বলিতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

কাশীনাথের বাটী নিস্তব্ধতা পরিপূর্ণ—যেন জনশূন্য—পরিত্যক্ত আবাস। শুধু শোকে এক এক বার বিদ্যুল্লতার জননী থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন—শব্দের মধ্যে সেই শব্দ।

নগেন্দ্র কাশীনাথের মুখে শুনিলেন—কোথায় বড়ায় বিদ্যুল্লতার শ্বাশুড়ীর উৎকট পীড়া বশতঃ গত সন্ধ্যাকালে বিদ্যুল্লতাকে বড়া লইয়া যাইতে পাল্কী আসিয়াছিল, তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে—আজ প্রাতে শ্যামনগর হইতে তত্ত্ব আসিয়াছে—সে তত্ত্ব বিদ্যুল্লতার শ্বাশুড়ী প্রেরিত—তাই দেখিয়া বিদ্যুল্লতার জননী আছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। পাড়ার রমণীরা আসিয়া সেই কথা শুনিয়া গিয়াছিল—গ্রামে বিদ্যুল্লতা সম্বন্ধে কলঙ্ক রটিয়াছে। গ্রামে কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোক আছেন, তাঁহারা শুধু পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া, পরের কুৎসা গাইয়া, পরকে বিপদগ্রস্ত করিয়া দিনপাত করেন, তাঁহাদিগের সহিত কাশীনাথ মিশিতেন না—তজ্জন্য কাশীনাথের উপর তাঁহাদের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল, এখন সুযোগ পাইয়া যাহা তাহা বলিতেছে।

একে প্রাণসম দুহিতার কোন উদ্দেশ নাই, শোকে দুঃখে কাশীনাথের মন ব্যাকুল—তাহার উপর কলঙ্ক ও লোকগঞ্জনা! ভাবিয়া ভাবিয়া কাশীনাথের মুখের উপর কালিমা পড়িয়াছে, রোদন করিয়া নয়নদ্বয় স্ফীত হইয়াছে, ললাটের দুই প্রান্তে দুটি স্থূল শিরা উঠিয়াছে। কাশীনাথের শীর্ণ শরীর আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কাতরতা দর্শনে নগেন্দ্র অতিশয় বিষণ্ন হইলেন। বিদ্যুল্লতার চরিত্র তখনও নিষ্কলঙ্ক আছে কিনা—না জানিয়া, কাশীনাথকে বিদ্যুল্লতা সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। মনে মনে বুঝিতে পারিলেন—কৌশলে বিদ্যুল্লতার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে, যে কেহই হউক না, চেষ্টা

পাইয়াছিল, সে কৌশল গ্রামস্থ কোন সুচতুরা, দুশ্চরিত্রা রমণীর উদ্ভাবিত। এ প্রকার অনিষ্টের মূলে সর্পিণী-স্বরূপা, কুলত্যাগিনী কোন রমণীর বিচিত্র কার্য্যকুশলতার ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, সেই গ্রামের মধ্যেই কালফণিনীস্বরূপা কোন রমণী বাস করিতেছে। কথায় কথায় কাশীনাথের নিকট কামিনীর উল্লেখ শুনিলেন,—শুনিলেন, সে হরিপাল হইতে আসিয়া গ্রামের অন্তর্ভাগে বাস করিতেছে। তৎসম্বন্ধীয় আনুসঙ্গিক পরিচয়ে বুঝিতে পারিলেন, এ সেই কামিনী যাহাকে তিনি স্বহস্তে বেত্রাঘাত করত হরিপাল হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তখন ক্রোধে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল—মনে ধারণা হইল—এ কার্য্য নিশ্চয়ই তৎকর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে। অনন্তর কাশীনাথকে যথোচিত প্রবোধ দিয়া তিনি বিদায় হইলেন।

নগেন্দ্র পথ হইতেই দেখিতে পাইলেন কামিনীর ঘরে আলো জ্বলিতেছে, দ্বার খোলা রহিয়াছে। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া সেই পাপিনীর পাপ-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। কামিনী দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল,—"কেগা,—এস' বলিয়া অভ্যর্থনা করিল। নগেন্দ্র কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কামিনি, বিদ্যুল্লতাকে তুই কোথায় লইয়া গিয়াছিলি?"

"সে কি গো!" বলিয়া সুচতুরা কামিনী একটু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আর বলিল "এমন কথা আমায় বল্‌বেন না—আমি কি এমন কাজ করিতে পারি?" নগেন্দ্র দাওয়ায় উঠিলেন। কামিনী হুঁকা রাখিয়া প্রদীপ আনিয়া প্রশ্নকারীর মুখ দেখিবে মনে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। নগেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন। কামিনী নগেন্দ্রের মুখ দেখিতে পাইল, জানিতে পারিল তাহার কাল উপস্থিত,—ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল—তখন সে আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য কহিয়া ফেলিল "আমি আরও দীনেকে মানা করেছিনু, এমন কাজে হাত দিস্‌নে,—পা'কে হ'য়ে যাস্‌নে!"

গন্ধক মিশ্রিত লৌহচূর্ণে কে যেন অগ্নি সংযোগ করিল—নগেন্দ্রের হৃদয়ে ক্রোধানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া "মানা করিয়াছিলি! তবেরে পাপীয়সি—" বলিয়া কেশাকর্ষণ করত কামিনীকে ভূতলশায়িনী করিলেন। "বাবু গো, তোমার পায়ে পড়ি—মের না মের না—আমার দোষ নাই' বলিয়া কামিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নগেন্দ্র তখন ক্রোধে অধীর হইয়া হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা দুই চারিঘা প্রহার করিলেন। পথের লোক আসিয়া কামিনীর বাটীতে সমবেত হইল। নগেন্দ্র কহিলেন 'সর্ব্বনাশি, হরিপালের বেত খাওয়া ভুলিয়া গিয়া এখানে আসিয়া আবার সেই নরকানল প্রজ্জ্বলিত করিতে বসিয়াছিস্?" কামিনী নগেন্দ্রের পায়ে পড়িয়া সংক্ষেপে বিদ্যুল্লতার ব্যাজড়া ত্যাগ হইতে গিরিশের বন্দী হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিল। গিরিশের নাম বলিল না, জিজ্ঞাসা করাতে কহিল "বাবু, এত লোকের সাক্ষাতে বলিব না—।" লোকগুলি শুনিয়া অবাক্ হইল, কেহ বা ক্ষুণ্ণ হইল, কেহ বা গ্রামের পুলিশে সংবাদ দিতে দৌড়িল।

নগেন্দ্র কামিনীকে লইয়া আপনার গাড়িতে উঠিলেন, গ্রামের লোক গ্রামে ফিরিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গয়া।

প্রত্যূষে কাশীর ঘাটে স্নানাদি করিয়া নৌকাযোগে রাজ-ঘাটে উপনীত হইলাম। রাজ-ঘাট ষ্টেশন হইতে একেবারে গয়ার টিকিট পাওয়া যায়। আমরা গয়ার টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। কাশীতে একটী স্বদেশীয়া বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ হয়; তিনিও আমাদিগের সঙ্গে আসিলেন। মজল-সরাই ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন হইল। পরে পশ্চিম হইতে গাড়ী আসিলে, আমরা তাহাতে আরোহণ করিলাম। বাঁকিপুর ষ্টেশনে আসিয়া আমাদিগকে গয়া-রেলওয়েতে যাইতে হইবে। বৃদ্ধাও আমাদিগের সহিত গয়া যাইবেন এইরূপ স্থির ছিল। এই জন্য তাঁহারও গয়ার টিকিট লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল। অতএব দানাপুর ষ্টেশনে নামিয়া তাঁহার টিকিট পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম। দানাপুরের ষ্টেশন-মাষ্টার উদার প্রকৃতির লোক। পূর্ব্বে মজল-সরাই ষ্টেসনে এক সাহেব দেখিয়াছিলাম, আর এক্ষণে দানাপুরেও সাহেব ষ্টেশন-মাষ্টার দেখিলাম। দুই জনের প্রকৃতি পর্য্যায়ক্রমে নরক ও স্বর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সাহেব মহোদয় অতি যত্নের সহিত আমাকে টিকিট পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। ক্রমে আমরা বাঁকিপুর ষ্টেশনে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। ষ্টেশনে নামিয়াই দেখি, যে যম-দূতের ন্যায় গয়ালীদিগের অসংখ্য দূত আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং বিধিমতে বিরক্ত করিয়া তুলিল। কাশীর গঙ্গাপুত্র ও যাত্রাওয়ালাদিগের দৌরাত্ম্য এখনও ভুলি নাই। ইহার মধ্যেই আবার নূতন অত্যাচারে উৎপীড়িত হইবার সম্ভাবনা দেখিলাম। যাহা হউক বহুক্ষণ বাদানুবাদের পর, পূর্ব্ব পুরুষের নির্দ্ধারিত পাণ্ডা স্থির করিয়া, তাঁহার দূতের সমভিব্যাহারে গয়া যাত্রা করিলাম। রাত্রি দশটার সময় গয়া ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। এখানকার পাণ্ডাদিগের গোলযোগের বিষয় বক্তব্য নহে। এইরূপ নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় বলিয়াই লোকে সকল আর তীর্থযাত্রায় মনোযোগী হয় না। গয়াতে আমাদিগের পরিচিত লোক কেহ ছিল না। এই হেতু গয়ালীদিগের প্রদত্ত বাসাতেই থাকিতে হইল। গাড়ীতে আসিবার সময় এ দেশের লোকেও আমাদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগকে নেপালের লোক বলিয়া মনে করিয়াছিল। গয়াতে আসিয়া কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই যেরূপ উৎপীড়নের সূত্রপাত দেখিলাম, পরে কিরূপ দাঁড়াইবে এই ভাবিতে ভাবিতে সে রাত্রি গত হইল।

পর দিন পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ড দানের উদ্যোগ হইতে লাগিল। গয়ায় তিন প্রকারে পিণ্ডদান কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। প্রথম তিন দিনের মধ্যে যে পিণ্ডদান কার্য্য সমাধা হয় তাহাকে 'পুরাগয়া' কহে। দ্বিতীয় সাতদিনের মধ্যে সমাধা হইলে 'আধাগয়া'

ও তৃতীয় ৪২ দিনের মধ্যে হইলে 'পুরাগয়া' কহে। ইহার মধ্যেও আবার অবান্তর ভেদ আছে। আমাদিগের সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত তিন দিনের মধ্যেই কার্য্য শেষ করিতে হইল। প্রথমে ফল্গু নদীতে স্নানানন্তর তথায় পিণ্ডদান, তৎপরে বিষ্ণু-পাদপদ্মে ও অবশেষে অক্ষয় বটের তলায় পিণ্ডদান করিয়া গয়ার কার্য্যশেষ করিলাম; ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোক অল্পই বিরক্ত করিয়াছিল। শেষে 'সুফল' অর্থাৎ গয়া তীর্থের কার্য্য-সফলতা বিষয়ে অনুমতি লইবার সময় পাণ্ডামহাশয় নানা প্রকার শপথ করাইয়াও তাঁহার প্রাপ্য বিষয় অতিরিক্ত আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য কারণ না থাকিলেও কেবল এই পীড়াপীড়ির জন্যই পাণ্ডাদিগের উপর অশ্রদ্ধা জন্মে। গয়ার পাণ্ডারা ধনকুবের বিশেষ, প্রয়াগীদিগের অপেক্ষাও ইঁহারা অধিক ধনী। ইহাঁদের অন্য কোন কার্য্য নাই। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে ইহাঁদের অত্যন্ত অবহেলা। আমি একজন পাণ্ডাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনাদিগের বালকগণকে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে দেন না কেন?' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে 'লেখা পড়া শিক্ষা করিলে বালকগণ এ ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না; এই হেতু তাহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা করান উচিত নহে।' যাহাহউক পাণ্ডাগণ প্রাণ ভরিয়া 'ভাঙ্গ' সেবন করতঃ অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে রাজ-বাটী তুল্য দ্বিতল ও ত্রিতল অট্টালিকায় উপবেশন পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়াও ধনলোভ চরিতার্থ করিতে সমর্থ হন নাই। তাহা না হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু যাত্রিগণকে উৎপীড়ন করিয়া যাহা তাঁহাদের দিবার ক্ষমতা আছে তদতিরিক্ত আদায় করা অতীব অন্যায়। এরূপ হইলে শীঘ্রই পাণ্ডাদিগের উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইবে। অতএব তাঁহাদের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা এই যে, যেন তাঁহারা পূর্ব্বের ভাব বিস্মৃত হইয়া কাল অনুযায়ী ভাব ধারণ করেন। আমরা ত কোন প্রকারে পাণ্ডাদিগের খর্পর হইতে উদ্ধার পাইলাম। যে যে বিষয়ে তাঁহারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে অযথামত অর্থ আদায় করেন, সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা লিখিতেছি।

পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগের অবস্থানের নিমিত্ত কতকগুলি গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। গৃহগুলি ভদ্রলোকের বাসোপযোগী নহে। তাঁহারা কথায় বলেন ইহার ভাড়া দিতে হয় না; কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে হইবে, বলিয়া প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে বার আনা করিয়া আদায় করেন। আমি ইহার তথ্য জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলাম এবং অনুসন্ধানের পর একখানি 'সাইন বোর্ড' দেখিতে পাইলাম। সাইনবোর্ড খানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। তাহার মর্ম্ম এই যে, গয়ালীদিগকে প্রত্যেক বাটীর জন্য বাৎসরিক ১৷৹ টাকা হিসাবে ট্যাক্স দিতে দিতে হইবে এবং প্রত্যেক বাটীতে ১৯ জনের অধিক যাত্রী লইতে পারিবে না। গয়ালিগণ দুই তিন দিনের জন্য হইলেও প্রত্যেক যাত্রীর নিকট ৸৹ আনা আদায় করেন। ইহাতে নির্দ্ধারিত ট্যাক্সের কত গুণ অধিক আদায় করা হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কয়েক মাস গত হইল, গয়ালীদিগকে এই ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দেওয়াইবার নিমিত্ত, এক ব্যক্তি গেজেটে লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি সমুদায় বিষয় স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই। গয়ালিগণ এই ছলে গরিব যাত্রী-

দিগের নিকট হইতে অর্থ শোষণ করেন। এরূপ কর স্থাপন ভাল কি মন্দ হইয়াছে, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। ইহা উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত যাত্রীদিগকে কষ্ট না দিয়াও পাণ্ডারা যে অনায়াসে বাৎসরিক ১৪।০ টাকা দিতে পারেন এটি বলা বাহুল।

পাণ্ডারা দুই তিন পয়সার পিণ্ডের দ্রব্যাদি দিয়া চারি, অনেক স্থলে আট আনা পর্য্যন্ত লইয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত অন্যায়। আরও কত বিষয়ে ইহাঁরা অন্যায় রূপে পয়সা আদায় করেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাঁ-দের মাহাত্ম্যগুণে, চৌকিদার, পেয়াদা প্রভৃতি লোকেরাও যাত্রীদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কিছু কিছু আদায় করিয়া লয়। এই সকল অত্যাচারের তিরোধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগের ভয় হয়, পাছে এ সকল অত্যাচারের প্রতিবিধানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে তীর্থ স্থানের কার্য্য প্রণালীতে হস্তার্পণ করিতে হয়।

গয়ালীদিগের যে সকল কর্ম্মচারী অত্য-ধিক পরিশ্রম করে তাহারা রীতিমত পারি-শ্রমিক প্রাপ্ত হয় না। যে পুরোহিত আমা-দিগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট অবগত হইলাম যে, দক্ষিণাস্বরূপে যাত্রীদিগের নিকট হইতে যাহা আদায় হয় তাহার অতি সামান্য অংশই তাঁহাদিগের প্রাপ্য। গয়ালিগণ পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করিলে আমরা সুখী হইব। তাঁহাদিগকেই গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। গয়াতে গদাধরের মন্দিরে প্রসিদ্ধ অহল্যা বাইয়ের প্রতিমূর্ত্তি আছে। এখানে যে সকল দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহাদের ভাস্করীয় শিল্প অতীব প্রশংসনীয়।

গয়ায় অধিকাংশ লোকই জুয়াচুরিতে অত্যন্ত নিপুণ; এমন কি কলিকাতার জুয়া-চোরদিগকেও ইহাঁদের নিকট পরাস্তব স্বীকার করিতে হয়। দুই তিনজন বস্ত্র-বিক্রেতার আচরণ দৃষ্টে আমরা চমকিত হইয়াছি। অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও নিতান্ত সামান্য নহেন। পাণ্ডাদিগের কার্য্য যে এক প্রকার জুয়াচুরি তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশ পাঠে বোধ হইবে। যদি যাত্রীদিগের প্রতি যথা-রীতি ব্যবহার করা তাঁহাদের অভ্যাস হইত ও বিবধবিষয়ে তাহাদিগের সহিত প্রবঞ্চনা না করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে অদ্য এরূপ কথা লিখিয়া দুঃখিত এবং পবিত্র তীর্থ-স্থানের গ্লানিকরণজন্য পাপ-পঙ্কে পতিত হইতে হইত না।

গয়াসহর দেখিতে বড় সুন্দর। ইহার চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত। একদিকের পর্ব্বত ভেদ করিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী প্রবাহিতা। সমু-দায় সহর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত। জলবায়ু মন্দ নহে। কূপের জল তত ভাল নহে কিন্তু ফল্গুর বালি খুঁড়িয়া যে জল পাওয়া যায় তাহা নির্ম্মল, শীতল ও স্বাস্থ্যপ্রদ। এ সহরের লোক সকল স্বাস্থ্য-বান্। গয়া বৌদ্ধদিগেরও পরম পবিত্র স্থান। এখানে বুদ্ধগয়া নামে একটী স্বতন্ত্র স্থান আছে। সুতরাং হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নানা-দেশের লোক এখানে আসিয়া থাকে। আমরা এখানে রেঙ্গুনের লোক আসিতে দেখিয়াছি।

গয়ার ফল্গুনদীর শোভা বড় চমৎকার। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই কেবল লোহিতবর্ণ বালুকারাশি ধু ধু করিতেছে। কোথাও এক-বিন্দু জল নাই, কিন্তু বালি সরাইলেই জল পাওয়া যায়। কিজগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! তিনি মরুভূমিতে বিন্দুমাত্র জলের সংস্থান রাখেন নাই। আবার এখানে

বালির নীচে কি মহৎ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে সুনির্ম্মল সলিল সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন! তাঁহার শক্তি অসীম! তীর ভূমিতে নীলবর্ণ পাহাড় থাকাতে ফল্গুর সৌন্দর্য্য সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর নদীর গর্ভে লক্ষ লক্ষ লোক একমনে ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত রহিয়াছে। দেখিলে মন অপূর্ব্ব আনন্দরসে পরিপ্লুত হয় এবং হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে।

বিস্তৃত গয়াজেলা পর্ব্বতাকীর্ণ। অহিফেন এখানকার প্রধান উৎপন্নদ্রব্য। রবিশস্যও প্রচুর উৎপন্ন হয়। গয়াসহরে অনেক ইংরেজ বাস করেন। অনেক বাঙ্গালীও এখনে থাকেন। বাঙ্গালীদিগের সাধারণ অবস্থার বিষয় ভালরূপ অবগত নহি। গয়াসহরে একপ্রকার পয়সা প্রচলিত আছে; তাহার নাম গোলকপুরী পয়সা। টাকায় ১৯ গণ্ডা করিয়া বিক্রয় হয়। চলিত কথায় এই পয়সাকে 'ছিদাম' বলে। এ পয়সা গয়াসহর ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি চলে না। গয়ার অধিবাসীদিগের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা কেবল অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্তই মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনে গণনীয় অন্য কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না।

গয়ার কোন কোন পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া পিণ্ডদান করিতে হয়। আমরা কখন পর্ব্বতারোহণ করি নাই বলিয়া, এখানে রামশিলা নামক পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। এই পাহাড়ের উপর হইতে সমুদায় গয়াসহর এককালে দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া শোভায় দর্শকের নয়ন মনকে বিমোহিত করে। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতারোহণে অনুপম সুখভোগের অধিকারী হওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্তরূপে আমরা গয়ার কার্য্য সমাধা করিয়া বাটী গমনের উদ্যোগ করিলাম। ৬ই পৌষ প্রত্যুষে শকটারোহণ করিয়া বাঁকিপুরে প্রত্যাগমন করিলাম। বাঁকিপুরে কেবল গয়ালীদিগের লোক, যাত্রী ধরিবার নিমিত্ত অবস্থান করে এরূপ নহে। বৈদ্যনাথের পাণ্ডারাও এখানে বৈদ্যনাথের যাত্রী সংগ্রহের নিমিত্ত লোক রাখিয়া থাকেন। কখন কখন পাণ্ডারা স্বয়ং অবস্থান করেন। আমরা এরূপ একজন পাণ্ডার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমাদের বৈদ্যনাথ যাওয়া হইল না। বাঁকিপুরে পুনরায় গাড়িতে উঠিলাম। এবারে আমরা লুপলাইন দিয়া চলিলাম। লুপলাইনের মধ্যে জামালপুর একটি প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। এখানে রেলওয়ে কোম্পানির বিস্তৃত কারখানা আছে। রেলওয়ের ট্রাফিক্ ম্যানেজার এই স্থানে অবস্থিতি করেন। এখান হইতে মুঙ্গের যাইবার ব্রাঞ্চ্ লাইন বাহির হইয়াছে। মুঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে মুসলমানদিগের নির্ম্মিত একটি দুর্গ আছে। এই নগর নবাব মীরকাশিমের রাজধানী ছিল। এখানকার সীতাকুণ্ড নামক উষ্ণপ্রস্রবণ অতি বিখ্যাত। এখানে ও জামালপুরে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী বাস করেন। জামালপুরের ষ্টেশন হইতে অল্প দূরে জামালপুর টনেল্। এই টনেল্ অর্থাৎ পর্ব্বতের সুরঙ্গ দিয়া রেলওয়ে ট্রেন যাতায়াত করে। অতি সুকৌশলে পর্ব্বত ভেদ করিয়া রেলওয়ের রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে।

লুপলাইনের মধ্যে ভাগলপুর, কাহালগাঁ, পীরপৈঁতি, সাহেবগঞ্জ ও তিনপাহাড় প্রভৃতি আরও কয়েকটি বড় বড় ষ্টেশন আছে। তিনপাহাড় হইতে রাজমহল ব্রাঞ্চ্ বাহির

হইয়াছে। রাজমহল একটি প্রাচীন নগর। এখানে জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা অবস্থিতি করিতেন। রাজমহলের ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া প্রাচীন গৌড় নগরে যাওয়া যায়। তিনপাহাড়ের শোভা মন্দ নহে। এখানে তিনটি পাহাড় আছে বলিয়া ইহার নাম তিনপাহাড়। ষ্টেশনের পশ্চাতে সেই তিনটী পাহাড় অবস্থিত। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ইহাদের দৃশ্য পরম রমণীয়। আমি এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া, নলহাটী ষ্টেশন হইতে নামিয়া বাটী গমন করিলাম। ভারতের কত স্থানে কতই দর্শনীয় বস্তু আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দুঃখের বিষয় আমরা তাহাদের এক অংশ দেখিয়াও মনোবাসনা চরিতার্থ করিতে পাই না। ভ্রমণ না করিলে মন বিস্তৃত হয় না এবং শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এই নিমিত্ত ইউরোপীয়গণ বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কিছুদিন ধরিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। শিক্ষার উন্নতি ও জ্ঞানের বৃদ্ধিই এতদ্দেশ-প্রচলিত তীর্থ পর্যটনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল।

সমাপ্ত।

নিশা-বন্দনা।

(১)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
দিনকর খর করে, বিরাজিয়া অনম্বরে,
শাসিয়া ভুবন যবে হয় অস্তগত,—
কমলিনী দুখে নিমীলিত;
ধরাধাম তবে, তোমার প্রভাবে,
ক্রমে স্থিরভাব পায়—
শান্তিময়ী নিশাদেবি, প্রণাম তোমায়!

(২)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
ধরণী তপন তরে, শোকে কৃষ্ণবাস প'রে,
নীরবে কান্দয়ে যবে তাপিত অন্তরে,
নয়নে নীহার-অশ্রু ঝরে;
তুমি গো তখন, হরিষিত মন,
আইস তুষিতে তা'য়;
সন্তাপ-হারিণী নিশে! প্রণাম তোমায়।

(৩)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।—
কপালে সিন্দুর-ফোটা, সুরাগ-রঞ্জন-ঘটা!—
রতন-জড়িত বাস করি' পরিধান,
(কেবা ভবে তোমার সমান?)
জুড়া'তে নয়ন, শীতলিতে মন,
প্রত্যহ এস ধরায়,—
তারাময়ী নিশাদেবি! প্রণাম তোমায়।

(৪)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
ভবে তব আগমনে, শক্তিহীন জীবগণে
আপন আপন বাসে করয়ে প্রয়াণ,
তুমি কর বিরাম প্রদান!
যতেক তাপস, প্রফুল্ল-মানস,
পরমেশ-গুণ গায়,
শ্রান্তি-বিনাশিনী নিশে! প্রণাম তোমায়।

(৫)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
শোকার্ত্ত-মরম-জলে, তব সমাগম হ'লে,
বিগত-মুরতি-ছায়া পড়ে ধীরে ধীরে,
কান্দে দুখী বিকল অন্তরে—
কত পূর্ব্বকথা, স্মরি' পায় ব্যথা,
হৃদয় ফাটিয়া যায়—
শোক-সঞ্জীবনী নিশে! প্রণাম তোমায়।

(৬)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
বহে মন্দ সমীরণ, ধীরে নড়ে তরুগণ—
প্রণতি করয়ে যেন বিভুর চরণে,
হেরি' ভক্তি উপজয়ে মনে—
শান্তির সরসে, ম'জে প্রেমরসে,
নর কত সুখ পায়—
ভক্তি-বিকাশিনী নিশে! প্রণাম তোমায়।

(৭)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
যে দিন পূর্ণেন্দু ভালে, আ'স তুমি মহীতলে,
সে দিন কতই শোভা তোমার বদনে,
বাঞ্ছা হয় চিরদরশনে!—
চকোর চকোরী, সুধাপান করি',
কত পরিতৃপ্তি পায়!—
সুধাংশু-ভূষণা নিশে! প্রণাম তোমায়।

(৮)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
আ'সে অমাবস্যা যবে, ঘোর তমো-বাসে তবে
আবরিয়া নিজদেহ দেহ দরশন,
সে মুরতি ভীষণ কেমন!—
বিশ্ব অধিপতি—ভীষণ-মুরতি—
প্রতিচ্ছায়া যেন তা'র!—
ভীমা, তমোময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।

(৯)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
বিরাম তোমার করে, পাইবার আশা ক'রে—
রহে যত জীব, তা'রা সুখী এ সময়,
কান্দে শুধু দুখিত হৃদয়;
কিন্তু তব বলে, দস্যু চৌরদলে,
বড়ই পিরীতি পায়,—
তস্কর-তোষিণী নিশে! প্রণাম তোমায়!

(১০)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
ভবে তব আগমনে, কবি পুলকিত মনে,
মনে মনে মধুময় ভাবেতে মগন,
তব তাঁ'র দিবের তুলন!—
তাঁহার অন্তরে, বসন্ত বিচরে,
সুমন্দ মলয়-বায়!—
মধুময়ী নিশাদেবি! প্রণাম তোমায়!

(১১)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
তরুকুল ফুল-বাসে, দেহ আবরিয়া হাসে,
এ হেন সুভাবে নাহি মজে কার মন?—
দেখে' হই হরষে মগন!—
তব আগমনে, সুখী ছাত্রগণে,
পাঠে স'পি মনঃ কায়;—
কুসুম-শোভিনী নিশে! প্রণাম তোমায়।

(১২)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
দিবাভাগে শিশুগণ সদা পুলকিত মন,
অধীর ভাবেতে কত করে ধূলা-খেলা,
ক্রমে যবে অবসন্ন বেলা,
মাতার কোলেতে, দিবস শ্রমেতে,
নীরবে সুনিদ্রা যায়—
শান্তি-বিধায়িনী নিশে! প্রণাম তোমায়!

(১৩)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
ঘুমে অচেতন সবে, কেহ যেন নাহি ভবে,
নীরব ধরণীতল চেতনা-বিহীন!—
নিদ্রাদেবী তোমার অধীন!
তোমার কিঙ্করী, নিদ্রা সুখকরী,
তব গুণ ভবে গায়,—
বিশ্ব-বিমোহিনী নিশে! প্রণাম তোমায়।

(১৪)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
নিদ্রাবেশে স্বপ্ন কত মানস মাঝে উদিত,
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে করি'ছে প্রয়াণ,
কভু সিন্ধু জলে ভাসমান—
কভু শূন্যে উড়ে, কভু ভূমে পড়ে,
কভু ধন-রাশি পায়।—
ধন্য কুহকিনী নিশে! প্রণাম তোমায়।

(১৫)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে! প্রণাম তোমায়।
চিন্তাশীল যত জন করে তত্ত্ব-নিরূপণ,
শাস্ত্রীয় চিন্তায় ঘোর হরষে মগন!—
শুভ ভাবে তব আগমন।—
ভুবন-ভিতরে, পণ্ডিতে আদরে
পূজিছে তোমার পায়—
ধন্য মায়াবিনী নিশে! প্রণাম তোমায়!

(১৬)

অয়ি শান্তিময়ী নিশে। প্রণাম তোমায়।
যেই শিল্পকর তোমা ক'রেছেন মনোরমা
বড় সাধ মনে মম হেরিতে তাঁহারে,
তাই আজি কহিনু তোমারে—
নিত্য আ'স হেথা, রাখ মোর কথা,
অধমে দেখাও তাঁ'য়—
বিরাম-দায়িনী নিশে! প্রণাম তাঁহায়।

সমাজ-সংস্কার।

২—স্ত্রী শিক্ষা।

বহুকাল পরকীয় শাসনে থাকিয়া এক-ভাবে পরের দাসবৃত্তি করিয়া, আমাদিগের রীতি প্রকৃতি অনেক অংশেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আমরা যাহা ছিলাম তাহার সহিত তুলনা করিতে পারিলে, আমরা যে কত দূর হীন হইয়া পড়িয়াছি তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। কালের আবর্ত্তনে মানব-সমাজের বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে সত্য, কিন্তু হিন্দুর সমাজে যে বিষম বিবর্ত্ত ঘটিয়া গিয়াছে, এটি সর্ব্বাংশে কাল মাহাত্ম্যে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বহু কালব্যাপী অধীনতার জন্যই হিন্দুর সমাজে এ ভয়ানক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। আমাদের প্রাচীন ভাব এতই দূরে পড়িয়া গিয়াছে যে, আমরা তাহাকে আর আমাদের বলিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। কালধর্ম্মে এই রূপই হইয়া থাকে। যে ভাবকে বহু দিন আমাদের ভাব বলিয়া জানা ও মানা যাইবে, সেই ভাবটিই ক্রমে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে।

মানবের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনুকরণশীল।

যেটি নিত্য নিত্য দেখা যায়, বিশেষ প্রিয় না হইলেও ক্রমে সেটির প্রতি কতকটা আস্থা দাঁড়াইয়া যায়। প্রথমে যদি সম্পূর্ণ আস্থা নাও দাড়ায়, তথাপি তাহার প্রতি পূর্ব্বের সে অনাস্থাটুকু আর থাকে না। ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাত ভাবে পূর্ব্বের অপ্রিয় ভাবটি হৃদয় হইতে সরিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতভাবে তাহার প্রতি প্রীতি ও আস্থার সঞ্চার হয়। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি পরের অধীন, তাহার অনুকরণ বৃত্তি আরও প্রবল। সে প্রভুতে যাহা দেখে, তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহার মনে ধারণা হয়; সুতরাং ক্রমে তাহারই অনুকরণ করিয়া বসে। কোন জাতি বা সমাজ-বিশেষের সম্বন্ধেও এ কথাটি বেশ খাটে। হিন্দুর বেশ ভূষা দেখ। যে সময়ে ভারতে হিন্দুর গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল, যখন মহম্মদের জয় পতাকা লইয়া মুসলমানবীরগণ ঘন গভীর হুঙ্কার রবে প্রাচ্যজগৎ বিকম্পিত করিয়া তুলে নাই, তখন হিন্দু যে, আপন রাজন্য ও উচ্চ শ্রেণীস্থ পণ্ডিত বর্গের বেশ-ভূষার অনুকারী ছিলেন, এ কথা আর বুঝাইতে হইবে না। যদি সেই ভাবই অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিত, যদি হিন্দুসূর্য্য অকালে অস্তমিত না হইতেন, যদি কুক্ষণে ত্রি-অরির সংগ্রামক্ষেত্রে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বীরকুল-গৌরব, হিন্দুর পূজার সামগ্রী পৃথ্বীরাজের পরমায়ুর সঙ্গে ভারতের সুখ-দিবার চিরাবসান না হইত, তাহা হইলে, হিন্দুর বেশ-ভূষা সম্বন্ধে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠিত, বোধ হয় না। কিন্তু হিন্দুর উপর কি ঘোর অভিশাপ ছিল, হিন্দু [illegible] অস্ত হইলেন—সুমেরু শিখর টলিল—মধ্যাহ্ন সূর্য্য নিষ্প্রভ হইল, অম্বুনিধি শুকাইয়া গেল! হিন্দুর উপরে মুসলমানের অধীনতা বন্ধনক্রমে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গেই হিন্দু আপনার প্রাচীন আচার ব্যবহার এক একটু করিয়া ত্যাগ ও তত্তৎস্থলে মুসলমানী পদ্ধতি অবলম্বন করিতে লাগিলেন। হিন্দু কি ছাড়িয়া কি লইতেছেন, তাহা দেখিতে পাইলেন না, অথবা দেখিতে পাইয়াও দেখিলেন না; কিন্তু জগৎ দেখিল, হিন্দু ক্রমে মুসলমানী আচারকে আপনার আচারের সঙ্গে মিশাইলেন এবং আপনার ধরণ ছাড়িয়া কত কত স্থলে মুসলমানী ধরণ ধরিলেন। আবার এখন মুসলমানের হস্ত হইতে ইংরেজের হস্তে হিন্দুর শাসন-দণ্ড গিয়াছে, হিন্দু অজ্ঞাত ভাবে কত কত ইংরাজী আচার আপন আচারের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতেছেন। এখন হিন্দু মুসলমানী ছাড়িয়া ইংরেজী বেশভূষা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন।

যাহারা পরের অধীন, তাহারা অনেক বিষয়ের জন্যই পরের মুখপ্রেক্ষী। এ দেশে তন্তুবায় জাতির এত বাহুল্য সত্ত্বেও আমরা সামান্য বস্ত্র খণ্ডের জন্য মাঞ্চেষ্টরের উপকূল ভাগের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছি; তুলা পাট আমাদের দেশে প্রচুর জন্মিয়া থাকে, তথাপি অধীনতার এমনি গুণ, বস্ত্র না থাকিলেই বিলাতি তাঁতির উপাসনা করিতে হইবে। ঘরের সামগ্রী দিয়া, ঘরের পয়সা দিয়া, কত তোষামোদ করিয়া তবে এক খানি কাপড় মিলিবে, তবে ভারতীয় হিন্দুর লজ্জা রক্ষা হইবে। এই রূপ দীন দশায় পড়িয়াই হিন্দু আপনার সামগ্রী ছাড়িয়া তাহার স্থানে পরেরটিকে বসাইয়াছেন। তখন জানিতে পারেন নাই—দেখিবার অবসর পান নাই, তিনি কি মূল্যের সামগ্রী সকল হারাইতেছেন। এই রূপে অল্পে অল্পে হিন্দুর অমূল্য ভাণ্ডারের বহুতর অমূল্য রত্নমণি অমনোযোগে অপসরণ করিয়াছে।

জাতীয় স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে কিছুই থাকে না। প্রায় আটশত বৎসর ধরিয়া নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া আসিতে আসিতে হিন্দু-সমাজের প্রায় অধিকাংশ বন্ধনই ছিন্ন হইয়াছে—যে দুই একটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহারাও বিলক্ষণ শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় তৎসমুদায়ের যথাবিধ সংস্কার করিতে পারিলে হিন্দুর-সমাজ কোন ক্রমে তিষ্ঠিতে পারে। নতুবা পাশ্চাত্য রীতি-নীতি প্রভৃতির যে প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভারতের উপকূলে প্রবল অভিঘাত করিতেছে, এই অভিঘাতেই হিন্দুর সমাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোথায় চলিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের এমনি স্বভাব, আমরা সংস্কারের নাম মাত্র সহিতে পারি না। এটিও বহুকাল-ব্যাপী পর-শাসনের দোষ সংশয় নাই। কিন্তু যখন আমাদের অভাব আমাদের চক্ষুতে বেশ দৃষ্ট হইতেছে, তখন সে পরিদৃশ্যমান অভাবের দূরীকরণে আমরা যে যত্নবান হই না, সে দোষ কাহার? যে সমস্ত প্রথা আমাদের ছিল, মধ্য-অবস্থার ঘোর বিপ্লবে দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার একটি যদি আমাদের সমাজে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিবে, অমনি চারি দিক হইতে ঘোরতর প্রতিবাদ ধ্বনি শুনা যাইতে থাকিবে। কেহ বিচার করিবেন না, যে প্রথা প্রবর্ত্তনের কথা কহিতেছে, সেটিতে বাস্তবিক উপকার আছে কি না। তাঁহারা কেবল বলিবেন, "যাহা আমাদের কখন নাই, তাহা কেন সমাজে প্রবেশিত করা? এ যাবনিক প্রথায় অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। ইহাকে কোন মতেই গ্রহণ করা হইবে না।" প্রত্যুত এরূপ না করিয়া ধীর ভাবে অগ্রে দেখা উচিত যে, এ প্রথাটি বাস্তবিক হিন্দুর বটে কি না। যদি সে হিন্দুর প্রথা হয়, বিনা আপত্তিতে অবনত শিরে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। আর যদি সেটি বাস্তবিক হিন্দুর প্রথা নাই হয়, তাহা হইলেও দেখিতে হইবে, সে প্রথার প্রবর্ত্তনে আমাদের উপকার কি অপকারের সম্ভাবনা। যদি বাস্তবিক তাহাতে অপকারের সম্ভাবনা থাকে, তাহা গ্রহণ করিয়া কাজ কি? কিন্তু যদি তাহাতে ক্ষতি না হইয়া বরং উপকারেরই সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে, সেটি হিন্দুর প্রথা না হইলেও সাদরে গ্রহণীয়। যাহা যাহা হিন্দুর ছিল না, তাহার মধ্য হইতে ভাল জিনিষ বাছিয়া লইয়া হিন্দুর উপকার করিতে পারিলে তাহাতে হানি কি?

সংস্কারের নাম আমাদের কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় কঠোর ও ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয়। আমরা বুঝিতেছি, অমুক কাজে কোন দোষ নাই আর সেটি করিতে পারিলে দেশের ও সমাজের বড় উপকার হয়, তথাপি সেটি যদি একটু বর্ত্তমান প্রথার বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে কিছুতেই তাহা লওয়া হইবে না। সে বিষয়-টির জন্য যিনি প্রস্তাব করিবেন, সমাজের মুখপাত্র মহাশয়েরা তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার না করিয়া ছাড়িবেন না। যদি হিন্দু-সমাজের কোন অভাবের উল্লেখ ও তাহার পূরণের প্রস্তাব কেহ করে, কোথায় দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা তাহাতে উৎসাহ দিবেন, তাহা না হইয়া, তাঁহারাই তাহার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান। হিন্দুসমাজের প্রচলিত কোন কুপ্রথার উল্লেখ করিলে, তাঁহারা তাহাতে বড় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। সুতরাং সে কুপ্রথার নিবারণ বা অপর একটি সুপ্রথার প্রবর্ত্তন হইয়া উঠে না। হা হতভাগ্য ভারত! তোমাকে আর কত দিন এরূপ ভীষণ যাতনা সহিতে হইবে?

হিন্দুকুলের সপত্নী-যাতনা-পীড়িতা বধূ ও ভাগ্যহীনা বালবিধবাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সমাজের ঐ দোষ দুইটির সংস্কারার্থ ভারতের অকাল-প্রসূত সুসন্তান, হিন্দুকুল-গৌরব, পণ্ডিত-প্রবর, পূজনীয় শ্রীযুক্ত বিদ্যা-সাগর মহাশয় যখন বহু-বিবাহ-নিষেধ ও বিধবা-বিবাহ প্রচারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন, তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের ক্ষমতা দেখে কে? তাঁহারা কৃতসংকল্প হইলেন, কিছুতেই ও দুইটি প্রথা আমরা সমাজে আসিতে দিব না। অধিকাংশ লোকেই তাঁহাদের কথায় ভুলিলেন, সুতরাং যেরূপ উদ্যমে বিদ্যাসাগর মহাশয় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ ফল ফলিল না। কত কত ভট্টাচার্য্যের শিরো-মণি মহাশয়েরা বিধবা-বিবাহ-ব্যবস্থায় অনু-মোদন ও স্বাক্ষর পর্য্যন্ত করিয়া, পরে নীচ স্বার্থের মমতায়—দেশের সমাজের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তৎসমুদায় একবারে অস্বীকার করিলেন! তথাপি অকাতরে অর্থ ব্যয় ও বিশেষ ক্লেশ স্বীকারে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার উদ্দেশ্য কতক দূর সিদ্ধ করিয়া তুলিলেন। যে প্রবল বিরোধ-বাত্যা উঠিয়া-ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন অন্য কেহ হইলে সেই বাত্যার আঘাতে এত দিন কোথায় উড়িয়া যাইতেন! কিন্তু তিনি নাকি এক জন প্রকৃত বলশালী পুরুষ (এ বল শরীরের নহে—এ হৃদয়ের বল), তাই অনায়াসে এ বাত্যা সহিয়াও তিনি অটল ভাবে যথাস্থানে দাঁড়া-ইয়া রহিলেন। এককালে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের তৎকালীন নেতা কৃষ্ণনগরের অধিপতি কৃষ্ণ-চন্দ্র রায় বাহাদুর এই প্রকারে নিজের স্বার্থ ও আত্মগরিমা রক্ষার নিমিত্ত ঢাকার রাজা রাজবল্লভের বিধবাবিবাহ-সম্ব-ন্ধীয় পরম হিতকর প্রস্তাবে বাধা দিয়া আপনার নামে অনপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া গিয়াছেন। আবার ভারতাকাশের দীপ্তনক্ষত্র স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র, হিন্দুরমণী-গণের অজ্ঞানতা ও সামাজিকী ক্লেশ দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া যখন তাঁহাদিগের সেই সেই দুঃখ-বিমোচনের জন্য এক প্রাণমনে চেষ্টা করি-লেন, তখনই বা কত প্রতিবাদ! তখনও ভারতবাসী আপনাদের অভাব সকল ভাল বুঝিয়া উঠেন নাই, তাই এই দুই মহাত্মার নিকট নতশির হইয়া শিক্ষা গ্রহণ এবং ইহাঁদের উপদেশ মতে কার্য্য করিতে বিমুখ হইলেন। জীবনে ইহাঁদিগকে অনেক বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে হইল বটে, কিন্তু ভারতের ভাবী নরকুল ইহাঁদের আদেশ পরম আনন্দে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বহন করিবে এবং স্বর্ণাক্ষরে ইহাঁদের পবিত্র নাম পবিত্র ইতিহাস-পটে লিখিয়া রাখিবে। যত দিন হিন্দুকুলের ইতিবৃত্ত থাকিবে তত দিন ইহাঁদের যশঃপ্রভা সভ্য জগতের সর্ব্বাংশে বিকীর্ণ রহিবে। ভারতের ভাগ্যহীনা রম-ণীকুলের অভাব পূরণ ও দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহারা প্রাণপণে যে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া-ছেন, ইহাতে তাঁহারা চিরকাল জগতের বরণীয় হইয়া রহিবেন।

এ আর্য্যভূমিতে স্ত্রী-শিক্ষা নূতন কথা নহে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই স্থানে নারী-কুলের শিরোমণি আত্রেয়ী, জানকী প্রভৃতি কত শত বররমণী লীলা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দেহ প্রাণ অনন্তে বিলীন হইয়া গি-য়াছে। কিন্তু আজি পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রাতঃস্ম-রণীয় নাম কাহারও স্মৃতি হইতে লুপ্ত হয় নাই। আধুনিক কালের অহল্যা বাইয়ের কথা কে না জানে? কিন্তু এই সমস্ত নারীরত্নের জন্ম-

ভূমিতে স্ত্রীশিক্ষা আজ নূতন সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আজ এখানে স্ত্রীশিক্ষা-প্রথার পুনরায় মূল পত্তন করিতে হইতেছে। হায়! যে দেশের রমণীরা আপনাদিগের বিদ্যা, জ্ঞান, সতীত্ব ও সহৃদয়তার জন্য জগতের পূজিতা হইয়া গিয়াছেন, হিন্দুর এ পতিত দশা পর্য্যন্ত যাঁহাদের নাম সভ্য জগৎ কত আদরে গ্রহণ করিতেছে, সেই দেশের রমণী আজ ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত! ভারতীয় হিন্দুগণ! আপনারা আপনাদের অভাব ও তৎসমুদয়ের প্রতীকারোপায় ত অনেক দূর বুঝিতে পারিতেছেন। তথাপি আপনাদের ভগিনী, ভার্য্যা প্রভৃতির উপরে এত নিষ্ঠূরাচরণ কেন?

স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অবহেলা করিলে, যে যে কুফল ভোগ করিতে হয়, আপনাদের সম্বন্ধে তৎসমস্তই ঘটিয়া গিয়াছে। এখন স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা আপনারা বিশেষ রূপে বুঝিয়াছেন, প্রত্যক্ষও করিতেছেন। আপনাদিগের রমণীগণের শিক্ষার অভাবে সাংসারিক কার্য্যে কত বিশৃঙ্খলা, শিশুগণের পালন বিষয়ে কত ক্লেশ ও অসুবিধা এবং তাহাদিগের প্রথম শিক্ষার পক্ষে কতই ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহা আপনারা বেশ দেখিতে পাইতেছেন। প্রসূতির ও শিশুর প্রতি যথাবিহিত ব্যবহার না হওয়াতে কত কত প্রসূতি আজীবন দুর্নিবার রোগ ভোগ করিয়া অকালে লীলা সংবরণ করিতেছেন। কত কত শিশু অভিভাবকবর্গের অবিহিত আচরণে সূতিকাগৃহেই দেহত্যাগ করিতেছে। সামাজিক আচার ব্যবহার, বিবাহ, সন্তানপালন ও তাহাদিগের উপযুক্ত শিক্ষাদান বিষয়ে কত অনিয়ম ও অপব্যবহার হইতেছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। ইতিপূর্ব্বেও এ বিষয়ের অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও আমাদের চক্ষু নিস্ক্রা বোধ জন্মিল না এটি অতিশয় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বতঃসিদ্ধ; তাহার জন্য অন্য তর্কের অবতারণা করিতে হয় না। কিন্তু কেহ কেহ এ সুপ্রথাকে বিহিত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের এইরূপ মত যে, সংসারে যে সমস্ত সুখের জিনিষ আছে, সে সকলই পুরুষের জন্য, স্ত্রীগণ শুদ্ধ পুরুষদিগের দাসীবৃত্তির নিমিত্ত সৃষ্টি হইয়াছেন। জ্ঞানে ও বিদ্যাতে বিশেষ সুখ আছে, সুতরাং রমণীদিগের তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। তাঁহাদের শঙ্কা, পাছে স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে আপনাদের সমুদয় স্বত্ব বুঝিয়া লন; কেহ কেহ এতদূর ভয় করেন, পাছে তাঁহারা পুরুষদিগের হইতে সকল বিষয়েই স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ান। এ শঙ্কা নিতান্ত অমূলক। স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টিবিষয়ে জগৎপিতা এমনি সুকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের এক শ্রেণীর অভাবে অন্য শ্রেণীর আদৌ চলিতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নারীগণ কঠিন কঠিন কর্ম্মে অশক্ত; সে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পৌরুষের নিতান্ত প্রয়োজন। আবার সন্তান প্রতিপালন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য স্ত্রীলোক ব্যতীত সম্পন্নই হইয়া উঠিবে না। কোন কোন স্থলে অল্প বয়সে শিশুর মাতৃবিয়োগ হইলে, অন্য অভিভাবিকা না থাকাতে পিতাকেই সেই শিশুর লালন পালনের সম্পূর্ণ ভার লইয়া কৃতকার্য্য হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সেরূপ কয়টি ঘটে? তাহাতে অনভ্যাস বশতঃ পিতার ক্লেশেরও পরিসীমা থাকে না। এ দিকে

শিশুর পালন ভার জননীর উপর দিয়া নিতান্ত আশক্তাবস্থায় শিশুর জীবনের এক মাত্র অবলম্বন যে দুগ্ধ, করুণানিধান পরমপিতা, মাতার শরীরেই তাহার সংস্থান করিয়া দিয়া আপন অভিপ্রায় কেমন স্পষ্টাভিধানে জগৎকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। এইরূপ যে কোন বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতি পরস্পর অন্যন্যসাপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতে নিতান্ত বাধ্য। পুরুষ স্ত্রীর অপেক্ষায় অধিক শক্তিশালী বলিয়া যে তিনি স্ত্রীজাতির উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, এ কথা নিতান্ত অন্যায়। যদি স্ত্রীর নিকট হইতে সংসার-সম্বন্ধীয় আনুকূল্য পাইতে বাসনা থাকে, তাঁহাকেও বিদ্যা এবং জ্ঞানে পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। কাহারও প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হইবার অতি অল্পই সম্ভাবনা।

এতদ্দেশে শৈশব পীড়া ও মৃত্যুর সংখ্যা যে এত অধিক, প্রসূতি ও অপরাপর পুরস্ত্রীদিগের অজ্ঞানতা তাহার এক প্রধান কারণ। সন্তানের প্রতি কিরূপ আচরণ করিলে, সে সুস্থ ও সবল হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা নিতান্ত জ্ঞানহীনা। সুতরাং প্রতিপদে তাঁহারা আদরের ধনের প্রতি অজ্ঞাতভাবে ঘোরতর অনাদর করিয়া ফেলেন এবং তাহার পরিণাম স্বরূপে, হয় স্নেহের পুত্তলী দুই দশ দিনের মধ্যেই জন্মের মত আত্মীয় স্বজনবর্গকে ফাঁকি দিয়া সোণার সংসার আঁধার করিয়া চলিয়া যায়, নয়, যাবজ্জীবন দুর্ব্বল ও অপুষ্টাঙ্গ থাকিয়া অপর আত্মীয়গণের গলগ্রহ হয়। অজ্ঞানতার জন্য অনেক প্রসূতিও অতিকষ্টে দশ মাস গর্ভভার বহন করিয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পকাল পূর্ব্বে বা পরেই জীবলীলা সংবরণ করেন। স্ত্রীলোকেরা যদি এই দুরবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া উপযুক্তরূপে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে, আমাদিগকে এ সকল দুর্দ্দৈব ও সংসারিক ক্লেশ অতি অল্পই সহিতে হয়।

বিদ্যা শিক্ষার ফল ভাল ভিন্ন মন্দ হইতে পারে না। শিক্ষার অভাবে তাঁহারা যে কুসংস্কারে আবিষ্ট হইয়া অতি দুঃখের অবস্থায় কাল কাটাইতেছেন, যদি তাঁহাদের এই দুঃখ মোচন ও জ্ঞান বৃদ্ধির বিশেষ বিশেষ উপায় করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রখর-রবি-কর-তপ্ত, সুদূর-বিস্তৃত, বারি-বিন্দু-হীন, ভয়ানক মরুভূমিতে ফল-পুষ্প-শোভিত তরু-লতা-বেষ্টিত, পূত সলিলা-তটিনী-বিধৌত, সুমন্দ-মলয়ানিল-সেবিত, সুচারু-হর্ম্ম্যরাজি-বিভূষিত, জনাকীর্ণ জনপদের আবির্ভাব হইবে। নারীজনের অন্তঃকরণ দয়া বাৎসল্যাদি কোমল বৃত্তি সমুদায়ের একাধার, সেই অন্তঃকরণে বিদ্যার বিমল-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইলে কি রমণীয়ভাবই উৎপন্ন হয়! মানস সরোবরের কবি-কল্পিত চিরসুন্দর কোকনদ-রাজি পরিদৃশ্যমান পদার্থে পরিণত হইয়া বিশ্বকৌশলীর অনন্ত মহিমার পরিচয় প্রদান করিতে থাকে। কিন্তু হায়! এ হতভাগ্য দেশে এমন সুদিন হইবে কি?

ভারতীয় ভ্রাতৃগণ! যাঁহারা আপনাদের মুখপাত্র স্বরূপ তাঁহারা সকলেই স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ অনুকূল। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। শুদ্ধ তাহাদের দ্বারায় এই প্রকাণ্ড মহাদেশের রমণীকুলের বিদ্যাশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা বিধান হইয়া উঠা অসম্ভব। এজন্য আপনাদের প্রত্যেকের এ মহৎ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করা আবশ্যক।

আপনারা আপনাদের পুত্র ও ভ্রাতাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যেমন একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া তাহার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেন, কন্যা ও ভগিনীদিগের জন্য সেরূপ করিলে অনেক দূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়টি নূতন কথা নহে। ভগবান মনু এ সম্বন্ধে স্ব-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ আদেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব সংস্কার নাম শুনিয়াই আপনারা বিরক্ত হইবেন না। প্রধান প্রধান নগরে স্ত্রী-শিক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ পল্লীগ্রামে এখনও ইহার কিছুই হয় নাই। আমি হিন্দু-সন্তান, হিন্দুর হিতেই আমার হিত। অনর্থক হিন্দু-সমাজকে গালাগালি দিলে আমার কোনই স্বার্থলাভের আশা নাই। আর হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে যে কোন নিন্দাবাদ হয়, আমি ও ঐ নিন্দার আংশিক ভাজন। সুতরাং স্থলবিশেষে কথাচ্ছলে যদি হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে অযথা নিন্দাবাদ করিয়া থাকি, সে কোন দুরভিসন্ধিবশতঃ নহে, বরং একান্ত শুভকল্পে জানিবেন।

পাট।

বহু দিন হইল 'প্রবাহে' তুলার যৎসামান্য বিবরণ লিখিয়াছিলাম। তৎকালে কয়েকটি বন্ধু ঐ বিবরণ পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল ভারতের অন্যান্য কৃষিজাত সামগ্রীর বিষয় যথাক্রমে আলোচনা করিব। কিন্তু নানা কারণে এতদিন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিয়া উঠিতে পারি নাই। বহুদিন পরে, পাটের যৎসামান্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়া অদ্য পাঠকমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিলে আশাতিরিক্ত আনন্দ লাভ করিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় পাট ভিন্ন দেশে রপ্তানি হইত কি না তাহা এক্ষণে স্থির করা সহজ নহে। ইহা স্থির যে, পাটের প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষীয়গণ চিরদিনই জানিতেন, এবং এতদ্দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পন্ন না করিলেও দেশ মধ্যে ইহা যে নানা প্রকারে ব্যবহৃত হইত তাহার সন্দেহ নাই।

আজি কালি ইংরাজগণ নানাকার্য্যে পাটের ব্যবহার করিতেছেন। নিকৃষ্ট পাটের দ্বারা থলে, চট, দড়ি, দড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর পাটে কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। রেশম, তুলা ও পশমের সামগ্রীর সহিত অধুনা প্রচুর পরিমাণে পাট মিশ্রিত হইতেছে। কাগজ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তও বহুল পরিমাণে পাট অবশ্যক হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশই পাটের প্রকৃত জন্মভূমি। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের মধ্যে বঙ্গ-

দেশই পাটের প্রিয় নিকেতন। যদিও গ্রীষ্মমণ্ডলে পাট অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, তথাপি অন্য মণ্ডলে ইহা জন্মে না এমন নহে। প্রত্যুত ইহা সর্ব্ব স্থানে এবং সর্ব্ব প্রকার ক্ষেত্রেই জন্মিতে পারে। যে মৃত্তিকায় লবণাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে তাহাই পাট উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। পাট সম্বন্ধে আবাদ কার্য্যের নিতান্ত অল্প প্রয়োজন দেখা যায়। বীজ বপনে পর হইতে কর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত ইহাতে কোন বিশেষ যত্ন করিবার আবশ্যক ঘটে না। পাট গাছ ৫৭। হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে এবং ইহার শাখা প্রশাখা প্রায়ই থাকে না। বৃক্ষমূলের নিকটে কাটিয়া প্রথমতঃ তাহার পাতা প্রভৃতি ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়, পরে আটি বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। পাটের গাছ কাটিয়া ২।১ দিন রৌদ্রে রাখিলেই তাহার পত্রগুলির বৃন্ত শিথিল হইয়া যায়; অনন্তর গাছগুলি ঝাড়িয়া আটি বাঁধিলেই প্রায় সমস্ত পাতা ঝরিয়া পড়ে। আট দশ দিন জলে ডুবিয়া থাকিলে ইহার উপরকার ত্বক্ পচিয়া শিথিল হইয়া যায়, তখন পাটের আঁশ নরম হইয়া আইসে এবং তাহা গাছ হইতে সহজে ছাড়াইয়া লইবার সুবিধা হয়। তাহার পর ঐ সকল গাছ জল হইতে উঠাইয়া ক্রমাগত আঘাত করিতে করিতে ইহার কাষ্ঠাংশ (পাকাটি) বাহির হইয়া যায়, কেবল আঁশ অর্থাৎ পাট অবশিষ্ট থাকে। এই পাট রৌদ্রে শুকাইয়া প্রকাণ্ড ঢাকের আকারে এক একটি গাঁইট বাঁধা হয়। ঐ সকল গাঁইটের আকার জয়ঢকার ন্যায় হওয়ায় ইংরাজিতে উহাকে 'ড্রম' (Drum) বলে। ঐ সকল ড্রম ওজনে সময়ে সময়ে এক মণ ভারী হইয়া থাকে। ভিন্ন দেশে রপ্তানি করিবার নিমিত্ত পাটের আর এক প্রকার গাঁইট বাঁধা হয়, তাহাকে 'বেল' বলে। ঐ বেল ওজনে প্রায় তিন মণ হয়। পাট যত শক্ত এবং লম্বায় যত অধিক হয় ততই তাহার আদর অধিক হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট পাট দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা দেখিতে রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃণ ও কোমল।

পাট বহির্বাণিজ্যের প্রধান সম্বার আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রাচীনকালে পাট এদেশ হইতে ভিন্ন দেশে রপ্তানি হইত না। সম্ভবতঃ তৎকালে ভারতের পাট কেবল ভারতেই ব্যবহৃত হইত। ইদানীং প্রচুর পরিমাণে পাটের রপ্তানি হইতেছে—এবং এই পাট হইতে প্রতিবৎসর ভারতের আশাতিরিক্ত অর্থাগম হইতেছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—বঙ্গদেশই পাটের প্রধান জন্মস্থান। প্রত্যুত পাট পৃথিবীর সকল দেশেই জন্মিতে পারে। কিন্তু বঙ্গদেশে যেরূপ যথেষ্ট পরিমাণে সুন্দররূপ জন্মে এমন আর কুত্রাপি নহে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতেও পাট জন্মে। ইংলণ্ডের পাট ভাল হয় না, সুতরাং লাভজনক হয় না। আমেরিকার পাট অপেক্ষাকৃত লাভপ্রদ বটে। তুলা সম্বন্ধে আমেরিকা ভারতের যে প্রকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে পাট সম্বন্ধে আজও সেরূপ হইতে পারে নাই। এ বিষয়ে ভারতের প্রাধান্য অদ্যাপি অপ্রতিহত রহিয়াছে।

পাটের রপ্তানির পরিমাণ ও তদুৎপন্ন অর্থের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে কিয়ৎপরিমাণে বোধগম্য হইতে পারিবে। খৃষ্টীয় ১৮২৯ সালে কলিকাতা হইতে মোট ২০ টন পাট রপ্তানি হইয়াছিল।

উহার মূল্য প্রায় ছয় শত টাকা। ১৮৬৩ সালে রপ্তানি প্রায় ১৬ গুণ বাড়িয়া উঠে। ১৮৭২—১৮৭৩ সালে ৩০০,০০০ টন পাট কলিকাতা হইতে রপ্তানি হয়। উহার মূল্য প্রায় ৩৫,০০০,০০০ টাকা। উত্তরোত্তর এই রপ্তানির পরিমাণ এবং এতৎসম্ভূত আয় বাড়িয়া আসিতেছে।

বরাহনগর এবং গৌরীপুরের পাটের কলে পাট হইতে যে থলিয়া প্রস্তুত হয়, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে তাহা যথেষ্ট আদৃত হইয়া থাকে সুতরাং তাহা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। আমেরিকার তুলা বঙ্গদেশের এই থলিয়ায় বাঁধা হইয়া দেশান্তরে রপ্তানি হয়, সুতরাং আমেরিকায় প্রতি বর্ষে বঙ্গদেশ হইতে বহুসংখ্যক থলিয়া রপ্তানি হয়। চীন, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশেও সহস্র সহস্র থলিয়া বর্ষে বর্ষে বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এই সকল থলিয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম নং, ২য় নং এবং ৩য় নম্বর। ১নং থলিয়া সূক্ষ্ম সূত্রে ঘন বুনানি করিয়া তৈয়ার করা হয়। তাহাতে চিনি এবং ক্ষুদ্র দানাবিশিষ্ট শস্যাদি রক্ষিত হয়। ২ নং থলিয়া ১ নং অপেক্ষা পাতলা, তাহাতে চাউলাদি থাকিতে পারে। ৩ নং থলিয়া মোটা এবং ফাঁক ফাঁক। তাহা প্রায়ই ১নং থলিয়ার আবরণস্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

অনেক জেলখানাতে কয়েদীর দ্বারা থলিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু সে উপায়ে যে থলিয়া উৎপন্ন হয় তুলনায় তাহার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য। বঙ্গের নিম্নশ্রেণীয় অধিবাসিবৃন্দের পরিশ্রম ও যত্নেই এত থলিয়া জন্মিয়া থাকে। পরিণতবয়স্ক নরনারী এবং অল্পবয়স্ক বালকবালিকা সকলেই এই কার্য্য করিয়া থাকে। মাঝি, কৃষক, পাল্কি-বেহারা সকলেই তাহাদের অবকাশ কাল এই কার্য্যে ক্ষেপণ করে। এমন কি, যে যে স্থানে এই কার্য্যের আদর আছে তথাকার নিরন্না হিন্দু-বিধবারাও এই কার্য্য দ্বারা দিন পাত করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে রয়লি (Royle) সাহেব ভারতের সূত্রোৎপাদক উদ্ভিজ্জাবলীর বিবরণ (Tibrows Plants of India) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—

"Gunnybag forms the neverfailing resource of that most humble, patient, and despised of created beings, the Hindu widow, saved by law from the pile, but condemned by opinion and custom for the remainder of her days, literally to sack-cloth and ashes, and the lowest domestic drudgery in the very household where once, perhaps, her will was law."

সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই কার্য্যে লিপ্ত থাকাতে ইহার উৎপত্তি অধিক হয় অথচ খরচ কম পড়ে, সুতরাং বঙ্গের থলিয়ার আর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। বঙ্গদেশের এই সকল থলিয়া ভূমণ্ডলের সকল স্থলেই আদৃত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাটের সহিত তুলা মিশাইয়া একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়। হিমালয়-সন্নিহিত প্রদেশবাসিগণ তাহা পরিধান করে।

বহু শতাব্দী হইতে এদেশে পাটের সহিত চূণ মিশ্রিত করিয়া, পরে তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত করার রীতি আছে। ঐ কাগজ শুষ্ক হওয়ার পর শঙ্খ অথবা প্রস্তর দ্বারা পিটাইয়া তাহাকে মসৃণ করা হয়।

পাট দ্বারা ভারতবাসী শিল্পিগণ দড়ি, দড়া, নিকৃষ্ট কাগজ, কাপড় এবং থলিয়া

ব্যতীত অপর কোন বিশেষ কার্য্য করিতে জানেন না। কিন্তু ডণ্ডী, লণ্ডন, মাঞ্চেষ্টর, গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানে পাট নানাবিধ কার্য্যোপযোগী করিয়া লইবার কারখানা আছে। বহু যত্নে রেশমের রঞ্জিত বস্ত্রাদির কার্য্যে পাটকে ব্যবহৃত করিবার অনেক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্যারো-ইন্-ফরনেস্ নামক স্থানে পাটে ভাল পাকা রঙ্গ করিবার উপায়বিশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পাট সম্বন্ধে আমাদের দেশে ঐ সকল প্রণালী অবলম্বিত হইয়া অধিকতর লাভের উপায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটের প্রয়োজনীয়তা বর্দ্ধিত হইলে দেশের প্রকৃত হিত সংঘটিত হইবে। দেশীয় অর্থ সম্মিলিতমূলধন (Joint stock) রূপে একত্রিত হইয়া এই কার্য্যে নিয়োজিত হইলে যথেষ্ট ইষ্টলাভের সম্ভাবনা আছে।

খদ্যোত-পুঞ্জ।

বৈজ্ঞানিক না ভূতুড়ে?—পাশ্চাত্য-প্রদেশের সকলই অদ্ভুত। বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতির নানাপ্রকার শক্তি আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা সংসারের অশেষ উপকার এবং সভ্য জগতের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মধ্যে মধ্যে এমনি এক একটি অদ্ভুত প্রসঙ্গের প্রস্তাবনা তাঁহারা উপস্থিত করেন যে, তাহা শুনিলে হৃৎকম্প হয়। পূর্ব্বকালের 'ভূতুড়ে রোঝারা' যে সমস্ত আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দেখাইয়া জনসাধারণকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিতেন বলিয়া শুনা যায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়দিগের এ সকল কথা বিস্ময়কারিতায় তদপেক্ষা কম হইবে, বোধ হয় না। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা আমাদের সেই পুরাণ ভূতুড়েদের কথা মানিব না পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক (ভূতুড়ে নয় ত?) মহাশয়দের কথা শুনিব?

সংপ্রতি একখানি ইংরাজি সংবাদপত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের এক অতীব বিস্ময়কর বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে যাহা লেখা আছে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, এক ধর্ম্মশালায় ভজন গান হইতেছিল, এমন সময়ে সেই ধর্ম্মশালার উপরে বজ্রাঘাত হইল। তত্রস্থ একটি কোমলাঙ্গী কুমারী ঐ ভীমগর্জ্জনে ক্ষণেকের জন্য মূর্চ্ছিতা হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর দেখা গেল, তাঁহার অঙ্গাবরণসংযুক্ত ঘটিকাযন্ত্রখানি ও তৎসংবদ্ধ শৃঙ্খল গাছটি নাই। এই ঘটনাটি খৃঃ ১৮৫৩ অব্দে ঘটে। তদনন্তর কয়েক মাস ঐ কুমারী পীড়িত হইয়া রহিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। কালে সে বেদনা সারিয়া গেল। উক্ত কুমারী এখন পূর্ণবয়স্কা হইয়াছেন, কিন্তু কি অদ্ভুত ঘটনা, তাঁহার দেহের আয়তন অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। সংপ্রতি কিয়দ্দিবস হইতে তাঁহার বাহুতে অকস্মাৎ একটা স্ফীতি লক্ষিত হইল। স্ফীতি এক স্থানে স্থির না

থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত ও অধোভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে লাগিল। অবশেষে ঐ স্ফীত স্থান হইতে তাঁহার সেই ঘটিকা এবং তৎসংলগ্ন অনধিক এক গজ পরিমিত শৃঙ্খল-গাছটি অনুসন্ধানের দ্বারা বাহির করা হইল। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সশৃঙ্খল ঘটিকাটি রমণীর সর্ব্ব শরীরে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বাহির হইয়া পড়িল।

এই উপকথার উত্তরে সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের সম্পাদক মহাশয় কহিয়াছেন, "চল্লিশ বৎসর হইল, একদা একজন ভদ্রলোক গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া কোন ধর্ম্মালয়ের সম্মুখ দিয়া যান, এমন সময়ে ঐ ধর্ম্মালয়ের চূড়ায় বজ্রাঘাত হইল। গরু দুইটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল, এবং গাড়িখানি ও গরুর গলার শিকলগাছি একবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল। আরোহী ব্যক্তি ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত থাকিয়াই সচেতন হইলেন, এবং তৎপরে পুস্তকের কারবার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ হইল তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডে একটি স্ফীতি দেখা দিল। তাহাতে বেদনা ছিল না। ক্রমে ঐ স্থান হইতেই সেই গাড়িখানি এবং ৪ গজ দীর্ঘ লোহার শিকল গাছটি বাহির হইয়া পড়িল। গাড়ি বা শিকলের কোন অংশ নষ্ট হয় নাই, কেবল একখানি চাকার পতরের সামান্য একটু ক্ষয় হইয়াছে মাত্র।"

সম্পাদক মহাশয় কহিয়াছেন, অতঃপর বিদ্যুতের কথায় তামাসা না করিয়া যেন সকলে যথার্থ বিবরণ প্রকাশিত করিতে যত্নবান হন।

অদ্ভুত আসামি চালান।—বিশ্বনাথ রায় জঙ্গিপুরে পুলিসের দারোগা ছিলেন। একদা তথাকার একজন লোক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করাতে, তাঁহাকে তদারক করিতে হয়। তিনি সুরথালের সাক্ষী সকলের উক্তি শুনিয়া এবং অপরাপর অবস্থা দেখিয়া রিপোর্ট লিখিতে বসিলেন। যে সর্পটির দংশনে সে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল, তথাকার লোকেরা কৌশলক্রমে সেটিকে ধরিয়া একটি মাটীর কলসীর ভিতরে রাখিয়াছিল। দারোগাবাবু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া শুনিয়াছিলেন যে, সর্পটি ধরা পড়িয়াছে। এই সংবাদে তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; তাঁহার এ আহ্লাদ অধিকক্ষণ চাপা রহিল না। রিপোর্ট লিখন সমাপ্ত করিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'খুনি আসামী যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন আর অধিক আড়ম্বরের কি প্রয়োজন?' অনন্তর তিনি ঐ সর্পটি এবং সর্পদষ্ট মৃত দেহটি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে চালান দিলেন। সাহেব তাঁহার সেই রিপোর্ট শুনিয়াই অবাক্। পরে কলসীর ভিতরে কি আছে যখন জানিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সাপটি মারিয়া ফেলিতে বলিয়া, মৃতব্যক্তির অভিবাবকদিগকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য মৃতদেহ লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সেই সঙ্গে ঐ সুপ্রকৃতিস্থ দারোগা বাবুর উপর তিনি যে সুন্দর মন্তব্যটি লিখিলেন, তাহার কথা আর কি বলিব?—বলিতে হইবে না যে, দারোগা বাবু শীঘ্রই বিনা পেন্সনে যাবজ্জীবন অবসর-লাভ করিলেন। ইহার পর আর তাঁহার কথা বড় কিছু বেশি শুনা যায় নাই। এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি পথে বাহির হইলেই বালকবালিকারা 'বিশে পাগলা যাইতেছে!' বলিয়া তাঁহার পাছে পাছে ধূলা লইয়া দৌড়িত।

সাহেবেরাও বুঝি শেষে ভেক লন!—ইউরোপের মধ্যেও নাকি শবদাহের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে পর্টুগালের রাজধানী লিসবন মহা নগরের মিউনিসিপাল কমিটি এক নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন—তথায় নাকি ঐ প্রথার আরও বহুল প্রচার করা হইবে। এখন হইতে উক্ত মহানগরের যে অংশে মহামারী প্রবল হইবে, সেই অংশে শবের দাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে সৎকার করা আইন অনুসারে বিশেষ নিষিদ্ধ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। তত্রত্য মিউনিসিপালিটির সভ্য মহাশয়দিগের মত যে, শবদাহ করিলে, মৃতদেহ হইতে রোগবীজোৎপত্তির শঙ্কা সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইবে।

ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সাধারণের হিতকর জানিয়া যে সকল প্রথা আপনাদের সমাজে প্রবেশিত করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখন তৎসমুদয়ের এক একটির সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যের অবধারণও আপনাদের সমাজে সেই সেই প্রথার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে, শেষে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পাছে পেণ্টেলুন কোট ফেলিয়া ঝুলি কাঁথা ধরিয়া বসেন!

কামিনী না ডাকিনী!—জর্জ্জিয়া প্রদেশে একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা প্রচারিত হইয়াছে। তথায় জনৈক কৃষিজীবীর মিস্ লুলা নামে এক কুমারী আছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর। তাঁহার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, তিনি যে পদার্থ স্পর্শ করেন, তাহাতেই তৎক্ষণাৎ গতির সঞ্চার হয়। এমন তেমন গতি নয়, সে গতি অতি প্রবল। এই সকল কথা শুনিয়া একজন কর্ণেল, একজন ডাক্তার এবং অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত নাগরিক সুবিখ্যাতা সেই কুমারীর ভবনে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের অনুরোধ ক্রমে বিনীতস্বাভাবা কুমারী নিকটস্থ একখানি কেদারার পৃষ্ঠদেশে হস্ত প্রদান করিলেন। হস্ত স্পর্শমাত্র কেদারাখানি ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ হইল। কুমারী তখন উপস্থিত ডাক্তর মহাশয়কে ঐ কেদারা ধরিতে কহিলেন। ডাক্তরও ধরিলেন—কিন্তু কেদারা স্থির হইল না; প্রত্যুত তাহার বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অনন্তর আর দুই তিনজন লোকে জোরে কেদারা চাপিয়া ধরিল, তথাপি তাহা থামিল না। অথচ তাহার পৃষ্ঠে ঐ কুমারী সহজভাবে হাত দেওয়া ব্যতীত কিছুমাত্র বল প্রয়োগ করিতেছেন, এরূপ বোধ হইল না। শুনা যায়, ইতিপূর্ব্বে সেই কুমারীর প্রতিবেশিবর্গের মধ্যে চারিজন বিশেষ বলিষ্ঠ পুরুষও কেদারা ধরিয়া স্থির রাখিতে পারে নাই। আর একবার নাকি একটি শয্যাধার মিস লুলা স্পর্শ করিবামাত্র ভূমি হইতে উঠিয়া গৃহের কোণে খাড়া হইয়াছিল এবং তদুপরিস্থ শয্যাটি নাকি ভূমি হইতে ২ ফুট উর্দ্ধে গৃহের চারিদিকে দ্রুতবেগে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল! আমাদের দেশের কড়িচালা, হাত চালা ও গাছচালা বুঝি আবার সত্য হয়! ইনি কামিনী না ডাকিনী?

ন্যাকড়ার চিনি!—ডাক্তার বল্‌গেল্ ছেঁড়া ন্যাকড়া হইতে চিনি বাহির করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। গান্ধকাম্ল প্রয়োগে এই কার্য্য হইয়া থাকে। ডাক্তার সাহেব কেবল ন্যাকড়ার চিনি বাহির করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। কাঠ, ছেঁড়া ও লেখা কাগজ,

করাত-গুঁড়া এবং ঘাস ও বিচালি হইতেও ডাক্তার মহাশয় চিনি বাহির করিয়া ছাড়িয়াছেন। বৃক্ষ বিশেষ হইতে নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা চিনি বাহির করা যায়। কিন্তু নানাপ্রকার অকর্ম্মণ্য ও স্বাদহীন সামগ্রী হইতেও যে চিনি বাহির করা যায় ইহা শুনিলেও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। কিন্তু রসায়ন বিদ্যার আশ্চর্য্য প্রভাবে সেই কল্পনার অতীত বিস্ময়কর ব্যাপার সম্প্রতি সম্পাদিত ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

——oo——

বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত।—তাড়িত সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন, লর্ড ষ্ট্যানহেপ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে সকল অপরিজ্ঞাত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অমূল্য। বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত কালে বিদ্যুতের লক্ষণ সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন মানবের সাবধানতার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা অত্যুচ্চ ও সূক্ষ্মাগ্র পদার্থেই অধিক বজ্রপাত হয়। পর্ব্বত, বৃক্ষ, মন্দিরও সৌধচূড়া, জাহাজের মাস্তুল প্রভৃতি পদার্থেই বজ্রপাতের অধিক সম্ভাবনা। অতএব যে সকল দ্রব্য পরিচালক, ও সূক্ষ্মাগ্র তাহাতেই অতি সহজে বজ্রপাত ঘটে। এবম্বিধ লক্ষণ সমূহ দেখিয়া ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন্ মীমাংসা করিয়াছেন যে, বজ্রপাত সময়ে শুষ্ক বস্ত্রাপেক্ষা আর্দ্রবস্ত্র ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ। বাসগৃহের পার্শ্ব দেশাপেক্ষা মধ্যস্থলে থাকা ভাল। যদি কার্য্যসূত্রে তৎকালে গৃহমধ্যে অবস্থান না ঘটে তাহা হইলে কোন উচ্চ পদার্থের নিকটে না থাকিয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকা সৎপরামর্শ।

——o:o——

বজ্রাঘাত হেতু মৃত্যু।—বজ্রাঘাত হেতু অর্দ্ধদগ্ধ বা পূর্ণদগ্ধ অবস্থায় মৃত্যু ঘটে ইহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু সময়ে সময়ে বজ্র না লাগিলেও মানুষ মরিয়া যায়। তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত হইবার সময়ে তাহার গন্তব্য পথ সমস্ত বায়ুবিহীন হইয়া যায়। সেই শূন্য স্থান পরিপূর্ণ করিবার জন্য সন্নিহিত প্রদেশ হইতে সজোরে বায়ু সমাগত হয়। তজ্জন্য সন্নিহিত স্থানস্থ মনুষ্যাদি জীবের বায়ুকোষে যে বায়ু থাকে, তাহাও কিছুক্ষণের নিমিত্ত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। সেইরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহাদের মৃত্যু হয়। তত্তৎস্থলে অঙ্গে বিদ্যুৎ আঘাত না করিলেও ইহাই মৃত্যু হইবার কারণ। সময়ে সময়ে বাহ্যবায়ু এরূপ প্রবল বেগে বিচলিত হয় যে তাহাতে অস্থি চূর্ণ হইয়াও মৃত্যু ঘটিতে পারে।

——::——

চূণের নিদ্রাজনক শক্তি।—ইংলণ্ডে এক-ব্যক্তি শীতে নিতান্ত কাতর হইয়া এক জ্বলন্ত চূণের ভাঁটির নিকটস্থ হয়। তথায় সমস্ত রাত্রি পুড়িবে বলিয়া যে সমস্ত প্রস্তর ভাঁটির মধ্যে দেওয়া হইয়াছিল ঐ ব্যক্তি তন্মধ্যে একখানি প্রস্তরে স্বীয় শীতল পদদ্বয় স্থাপন করিয়া উপবেশন করিল। ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যক্তি প্রস্তরে পা রাখিয়া পার্শ্বে শয়ন করে এবং অল্পকাল মধ্যেই গভীর নিদ্রার অভিভূত হইয়া পড়ে। এদিকে তাহার পদতলস্থ প্রস্তরখণ্ডে ক্রমশঃ আগুন ধরিয়া আইসে। তখন সেই উত্তপ্ত প্রস্তরে পদ সংলগ্ন থাকায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ না হইয়া বরং শীতল অঙ্গে উত্তাপ লাগিয়া নিদ্রা আরও গাঢ় হইয়া আইসে। ক্রমে ঐ প্রস্তর পুড়িয়া চূণ হইয়া উঠিল। তখনও সে ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তাহার পর অল্প অল্প তাহার পদ-

ঘরের ভূরিভাগ পুড়িয়া গেল তথাপি তাহার চৈতন্ত নাই। রাত্রি কাটিয়া গেল, আগুনও নিবিয়া গেল। পরদিন প্রাতে চুণের অধিকারী আসিয়া দেখিল, একব্যক্তি চুণের উপর পা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে ব্যক্তি লোকটির ঘুম ভাঙ্গাইল। তখন ঐ ব্যক্তি যেমন উঠিয়া চলিতে যাইবে অমনি তাহার পদদ্বয় গুঁড়া হইয়া গেল—দেখা গেল তাহার পা পুড়িয়া চুণ হইয়া গিয়াছে। আরও বিস্ময়ের বিষয়, এতাদৃশ আশ্চর্য্য ও অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হেতু ঐ ব্যক্তির একটুও কষ্ট হয় নাই, তখনও সে কোন কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ করিল না। সপ্তাহ পরে এই ব্যক্তির শরীরের অন্যান্য স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং ইহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। Somniferous Effects of Lime নামক প্রবন্ধে এই বিবরণ বর্ণিত আছে।

প্রেত-তত্ত্ব।

পূর্ব্বে প্রেতের আবির্ভাব প্রভৃতির সম্বন্ধে বহুবিধ অদ্ভুত উপন্যাস শুনা যাইত। এ কালে নানা কারণে আমাদের দেশীয় লোকেরা তৎসমুদয়ের উপর নিতান্ত অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছেন। আমরাও এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন ব্যাপার দর্শন করি নাই। সুতরাং জানিনা, প্রেতের উপাখ্যান সর্ব্বাংশে বাস্তবিক কি না। আমরা জানিনা বলিয়া কোন বিষয়ে নিতান্ত অবিশ্বাস করা ততটা সঙ্গত বোধ হয় না। সংসারে কত কত অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে, দেখিনাই বলিয়া তাহাতে অবিশ্বাস করা সুসঙ্গত হইবে কি? বিশেষতঃ আমরা নিতান্ত অলস ও অনুৎসাহী। আমরা আপনারা পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে নিতান্ত অপারগ। ইংরেজি সাহিত্যে ইংরেজি বিজ্ঞানে যাহা বলিতেছে, এখন আমরা তাহারই কথঞ্চিৎ প্রতিধ্বনি করিতেছি মাত্র। তাই কি আমরা ইংরাজি বিজ্ঞান ভালরূপ জানি, না জানিতে চেষ্টা করি? ইংরেজি বিজ্ঞানের যতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, আমার তাহার অর্দ্ধাংশও আয়ত্ত করিতে পারিলে, আমাদের এ দুর্দ্দশা অনেক অংশে অপনীত হইত। আমাদের দেশের প্রেততত্ত্ব বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছি। কিন্তু আমেরিকা মহাদেশের এক জন প্রধান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এ তৎসম্বন্ধে রাশি রাশি পুস্তক রচনা করিয়া সাধারণের কত উপকার করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার প্রেততত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি অপূর্ব্ব উপাখ্যানমালায় পরিপূর্ণ। ইয়ুরোপেও প্রেততত্ত্ব এবং ওকল্ট-বিজ্ঞানের কতদূর উন্নতি হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে যে সকল অত্যদ্ভুত উপাখ্যান সমূহ শ্রুত হয়, সে সকলের যথাযথ বর্ণনা করা অনেক আয়াসসাধ্য। তৎসমুদয় একত্র সঙ্কলিত করিতে পারিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠে।

বারান্তরে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ সাধারণ পাঠক-পাঠিকাবর্গের গোচর করিব বলিয়া বিশেষ ইচ্ছা রহিল। এবারে প্রেত-তত্ত্ব-বিষয়ক দুইটি বিস্ময়-জনক উপাখ্যান এক-খানি প্রসিদ্ধ ইংরেজি সংবাদ পত্র হইতে সংগৃহীত করিয়া দিলাম।

স্কটলণ্ড দেশের কোন স্থানে খৃঃ ১৭৪৯ অব্দের ২৮এ সেপ্টেম্বর দিবস, গাইজেস রেজিমেণ্ট নামক সৈন্য দলের সর্জ্জেণ্ট আর্থর ডেভিস নিহত হন। ডনকান ক্লার্ক ও আলেকজাণ্ডর ম্যাকডনাল্ড নামক দুই জন স্কটলণ্ডের পর্ব্বতাবাসী উক্ত হত্যার অপ-রাধে অপরাধী হইয়া খৃঃ ১৭৫৪ অব্দের ১০ই জুন দিবস এডিনবরা নগরের প্রধানতম কৌজদারি বিচারালয়ে আনীত হয়। সার্জ্জে-ণ্ট ডেভিসের সঙ্গে অনেক টাকা ও মূল্যবান অঙ্গুরীয় থাকা বিশেষ প্রকাশিত ছিল। তৎ-সমুদায়ের কতক ঐ দুই জন আসামির নিকট ধরা পড়ে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, ঐ অর্থের লোভ বশতই তাহারা উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইতে ডেভিসের কোন খোজ খবর ছিল না। অবশেষে ইন্‌ভার্ণারি-বাসী আলেকজাণ্ডর ম্যাকফার্শন নামা জনৈক কৃষক-ভৃত্যের কথায় এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আলেকজাণ্ডর ম্যাকফার্শনের বয়ঃ-ক্রম ন্যূনাধিক ছাব্বিশ বৎসর এবং তিনি বিশুদ্ধ গেলিক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন।

তিনি বলিলেন, "একদা রাত্রিকালে কুটীরের মধ্যে শুইয়া আছি, এমন সময়ে একটা প্রেত-মূর্ত্তি আসিয়া হঠাৎ আমার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইল। সেই প্রেত-মূর্ত্তি আমাকে শয্যা হইতে উঠিয়া তাহার সঙ্গে ঘরের বাহিরে যাইতে কহিলে, আমি তাহাকে ফার্ক হার্শন নামক আমার এক জন প্রতি-বাসী বন্ধু মনে করিয়া বিছানা হইতে উঠি-লাম। অনন্তর কুটীরের বাহিরে আসিলে, সে আমাকে কহিল, আমি সার্জ্জেণ্ট ডেভিসের প্রেত আত্মা। আজ পাঁচ বৎসর হইল, আমায় মারিয়া ফেলিয়াছে। আমার মৃতদেহ অদ্যাপি অমুক স্থানে গুপ্তাবস্থায় রহিয়াছে, তুমি তো-মার প্রতিবেশী ফার্কহার্শনকে সঙ্গে লইয়া আমার শব সমাহিত কর। এই বলিয়া সেই প্রেত-মূর্ত্তি আমাকে 'হিল অব ক্রাইষ্টি' নামক একটি জঙ্গলময় জলাভূমি দেখাইয়া দিল। পর দিন আমি আমার পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাসীর সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া একটি নরকঙ্কাল দৃষ্টি করিলাম। কঙ্কালের অনেক অংশ তখন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা সে সময়ে কঙ্কালটি সমাহিত করি নাই বলিয়া ডেভিসের প্রেত আত্মা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া আমাকে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের নিমিত্ত অনেক তিরস্কার করিল। তখন আমি সেই প্রেতকে হন্তার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এই উপস্থিত আসা-মিদ্বয়ের নাম করিল। অনন্তর আমি পুনরায় সেই হত্যার স্থানে উপস্থিত হইয়া ফার্ক-হার্শনের সাহায্যে ডেভিসের সেই ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থিগুলি সমাধিস্থ করিলাম।"

তাহার পর ফার্ক হার্শনের সাক্ষ্য গৃহীত হইল। তিনি কহিলেন, "ম্যাক্‌ফার্শন আমাকে ঐ অস্থিগুলি সমাধিস্থ করিতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ম্যাক্‌ফার্শন অদ্য বিচারলয়ে যাহা যাহা বলিলেন, আমাকেও তখন ঠিক ঐ সকল কথাই বলিয়াছিলেন।"

আইজাবেল মেকার্ডাই নামক অপর এক জন সাক্ষী কহিলেন,—"আমিও ঐ কৃষি-কা-কার্য্যালয়ের এক জন চাকর। যে রাত্রিতে

ম্যাকফার্শন প্রেত-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন বলিলেন, সেই রাত্রিতেই উলঙ্গ একটি লোক হামাগুড়ি দিয়া আমার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল, আমি গায়ের চাদর দিয়া মুখ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে যে কি পদার্থ তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না। পরদিন প্রাতঃকালে আমি ম্যাক্‌ফার্শনকে গত রাত্রির ঘটনার কথা সুধাইলে, ম্যাক্‌ফার্শন উত্তর করিলেন, 'আর আমাদের উপর কোন উৎপাত হইবে না; অতঃপর তুমি ভাবিও না'।

এই সকল প্রমাণ গৃহীত হইলে, প্রতিবাদি-পক্ষের উকিল ম্যাকফার্শনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে প্রেত-মূর্ত্তি কোন্ ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়াছিল? ম্যাক্‌ফার্শন কিছুমাত্র ইংরেজি জানিতেন না। সুতরাং তাঁহাকে বুঝাইতে হইলে ইংরেজি বলা নিতান্ত অসঙ্গত, এ দিকে নিহত সর্জেণ্ট নিজে ইংরেজ ছিলেন। ম্যাক্‌ফার্শন উত্তর করিলেন, 'প্রেত অতি বিশুদ্ধ গেলিক ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়াছিল।' প্রেত-তত্ত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে একথা অসঙ্গত হয় নাই। কেন না প্রেতেরা সকল ভাষাই জানে বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে। কিন্তু প্রতিবাদিদ্বয়ের উকিল এই ছল অবলম্বন করিয়া উক্ত ব্যাপারের অলীকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ চাতুরী সহকারে জুরি এবং বিচারককে সম্বোধন করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। জুরিরা সেই বক্তৃতার পর সকলে একমত হইয়া প্রতিবাদীদিগের দোষ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইলেন এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়া স্বীকার করিলেন। আসামীদ্বয় মুক্তি পাইল। কিন্তু বিচারালয়ে তৎকালে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই এমন কি, প্রতিবাদি-পক্ষীয় উকিল, মোক্তার পর্য্যন্ত আসামিদ্বয়কে উক্ত হত্যাপরাধে সম্পূর্ণ অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

উপরি উক্ত হত্যাকাণ্ডের এক শতাব্দী পূর্ব্বে আর একটি হত্যাব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

ডরহাম প্রদেশে চেষ্টর-লি ষ্ট্রীটে ওয়াকার নামা জনৈক সম্পত্তিশালী কৃষিজীবী বাস করিতেন। তথায় আন ওয়াকার নাম্নী তাঁহার একটি অল্পবয়স্কা আত্মীয় কামিনী তাঁহার গৃহ-কর্ত্রী স্বরূপে ছিলেন। একদা অব্যক্তব্য কোন কারণে ওয়াকার, আন্‌কে মার্ক শার্পনামক এক ব্যক্তির সহিত স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিলেন। পাঠাইবার পূর্ব্বে তিনি শার্পকে গোপনে পরামর্শ দিলেন যে, "আনের সম্বন্ধে এমন কোন ব্যবস্থা করিবে, যেন এ পাপতাপময় সংসারে আর আমাকে উহার সঙ্গে একত্র বাসের ক্লেশ পাইতে না হয়।"

অনন্তর আনের সম্বন্ধে আর কিছুই শুনা গেল না। জেমস্ গ্রেহাম নামে এক জন যন্ত্রাধ্যক্ষ ওয়াকারের বাসস্থান হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেন। পর বৎসর শীতকালে এক দিন রাত্রে গ্রেহাম পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক তথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার কেশ-কলাপ মস্তকের চারিদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার মস্তকের উপরে গ্রেহাম পাঁচটি শোণিতাক্ত ক্ষত দেখিতে পাইলেন। বিচারালয়ে সাক্ষ্য দান কালে গ্রেহাম বলিয়াছিলেন, "তিনি

কে এবং কি জন্য তথায় সেরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এই কথা আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, 'শার্প-নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে আমি ভ্রমণ করিতেছিলাম, পথিমধ্যে সে আমাকে এক খানি খনিত্রের দ্বারা প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। আমার মৃত দেহ নিককটবর্ত্তী কয়লার খাতে ফেলিয়া দিয়া, খনিত্রখানি এবং তাহার তৎকাল-পরিহিত বস্ত্রগুলি আমার রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল বলিয়া, সে একটি বাঁধের নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছে। অতএব তুমি আমার এই হত্যার কথা প্রচারিত করিয়া, যাহাতে হত্যাকারী উপযুক্ত শাস্তি পায় তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা কর। তাহার পরও কিছুদিন আমি সে বিষয়ের কিছু করি নাই; এজন্য সেই প্রেতমূর্ত্তি আমার সম্মুখে আর দুইবার আবির্ভূত হইয়াছিল এবং শেষবারে আমাকে বিশেষ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল।

"অনন্তর আমি সেই কামিনীর দেহ, সেই খনিত্র এবং হত্যাকারীর শোণিতাক্ত বস্ত্রগুলি প্রেত-বর্ণিত স্থানেই পাইলাম। সুতরাং ওয়াকার ও শার্পের দ্বারাই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সংশয়মাত্র রহিল না।"

অপরাধীরা ধৃত ও খৃঃ ১৬৩১ অব্দের অগষ্ট মাসে ডরহামের ধর্ম্মাধিকরণে (Assizes) বিচারার্থ আনীত হইল। তথায় প্রাড়্বিবাক্ ডেভেনপোর্টের সম্মুখে সেই মোকদ্দমার বিচার হইয়া অপরাধিদ্বয় আপন আপন অপরাধের যথাবিধি শাস্তি পাইল।

এতদ্দেশে এরূপ না হউক, প্রেত সম্বন্ধে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপাখ্যান সকল আজ পর্য্যন্ত শুনা যায়। কিন্তু প্রেতের কথায় বিশ্বাস করার বিবরণ বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিবার সময় কেহ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রেত-তত্ত্ববিৎ আণ্ড্রু জাক্সন ডেভিস এ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের বর্ণিত উপাখ্যানগুলি তিনি অতি সুযুক্তি সহকারে সমর্থিত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ ও তাহাতে বিশ্বাস করিলে মানবাত্মার অমরত্ব বিষয়ে সন্দেহমাত্রও থাকে না। শুনা গিয়াছে, ঐ সকল প্রেত-তত্ত্বজ্ঞ মহাশয়েরা নাকি আত্মীয়-বিয়োগ কাতর কোন কোন ব্যক্তিকে তাঁহাদের সেই মৃত আত্মীয় ব্যক্তির কথা পর্য্যন্ত শুনাইয়াছেন। মনুষ্য প্রত্যক্ষ বস্তুতেই বিশ্বাস করে, অপ্রত্যক্ষ বিষয় তাঁহাদের প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারিলে সংসারের যে কত কত মহোপকার সাধিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তিস্বীকার।

এলাহাবাদ-বৈবাহিক কুরীতি-নিবারিণী সভার বিবরণ। শ্রীশীতলপ্রসাদ গুপ্ত প্রণীত। সাহস যন্ত্রে মুদ্রিত।

বঙ্গদেশে কন্যার বিবাহ পিতার সর্ব্বনাশের সোপান। বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষীয়গণ কন্যাকর্ত্তার নিকট দাবি দাওয়া করিয়া যেরূপ সম্পত্তি আদায় করিয়া থাকেন তাহা সর্ব্বথা সামাজিক নীতির বিরোধী

এবং অনেক সময় শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এই ভয়ানক কুপ্রথা বিদূরিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সুখের বিবাহ উভয় পক্ষেই সুখময় হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালী এক পক্ষে আনন্দজনক হইলেও অপরপক্ষে অনেক সময়ে যৎপরোনাস্তি বিষাদ-জনক এবং হয়ত, যাবজ্জীবনব্যাপী ক্লেশের কারণ। দেশহিতৈষিগণ যদি সর্ব্বাগ্রে এবম্বিধ সামাজিক কুরীতিসমূহ বিদূরিত করিতে বদ্ধ-পরিকর হন তাহা হইলে দেশের সমূহ হিত সংসাধিত হইতে পারে। যে সমাজের রীতি নীতি নীচ ও জঘন্য এবং যে সমাজের বিধি ব্যবস্থা কীট-সমাকুল ও ঘৃণার্হ, সে সমাজের কোন উন্নতিই সম্ভাবিত নহে। অতএব যদি দেশকে উন্নত করিতে বাসনা থাকে তাহা হইলে সমাজকে সর্ব্বপ্রকার কুনীতি-কলুষ হইতে প্রক্ষালিত করা প্রথম কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ গুপ্ত নামক একজন যথার্থ দেশহিতৈষী ব্যক্তি পুণ্যভূমি প্রয়াগ নগরে বৈবাহিক কুরীতি বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানা স্থানে এতদ্বিষয়ের বিশেষ আন্দোলন উত্থাপন করিয়াছেন। এই উদ্যমশীল মহাশয় সমালোচ্য কুপ্রথা বিদূরিত করিতে যেরূপ চেষ্টিত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যদি তদ্রূপ উৎসাহবান ও ক্ষমতাবান আরও কয়েকব্যক্তি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান স্থান হইতে যোগ দান করেন এবং বিহিত বিধানে শীতল বাবুর অনুকরণ করিয়া কার্য্য করেন তাহা হইলে, অচিরে এই কলঙ্ক বঙ্গমাতার অঙ্গ হইতে প্রক্ষালিত হইতে পারে।

আমরা এই সভার প্রতিজ্ঞাপত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি—এতদ্দ্বারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার পুত্রের বিবাহ সময়ে প্রাচীন কৌলীন্যমূলক দান পণ ইত্যাদির অতিরিক্ত অর্থ আভরণাদি কন্যাকর্ত্তার স্থানে তাঁহার ক্ষমতা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাবি করিয়া লইব না এবং আমার ভ্রাতা কি ভগিনী কিম্বা আত্মীয় স্বজন, যাহাদের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাদের সন্তানের বিবাহ সময়ে ঐরূপ অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের নিবারণ চেষ্টা সাধ্যমত করিব। যদি এই প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করি, ধর্ম্মতঃ পতিত এবং জনসমাজে নিন্দনীয় হইব।"

এই বিবরণ পুস্তিকার উপসংহার ভাগে বঙ্গমাতার খেদ শীর্ষক একটী কবিতা আছে। কবিতাটী অবশ্যই বহু দোষ পূর্ণ। কিন্তু লেখক হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্যই এ কবিতা লিখিয়াছেন—ভাষার নির্দ্দোষিতা, বা কল্পনার প্রগাঢ়তা দেখাইবার জন্য ইহা রচিত হয় নাই। পদ্যের শত শত দোষসত্ত্বেও একথা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, ইহার বর্ণিত বিষয়টি অনেকাংশেই সত্য। পুত্রের কিছু লেখাপড়া জানা থাকিলেই বরকর্ত্তা সঙ্কল্প করিয়া বসেন, কন্যাকর্ত্তার কন্যার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিতে হইবে। হতভাগ্য কন্যাকর্ত্তার কোন উপায় নাই—বরকর্ত্তার মনস্তুষ্টি করিতে না পারিলে জাতি রক্ষা করা দায়। কুলীনসম্বন্ধে এ নিয়ম আরও কঠিন। পাত্র লেখা পড়া জানুন বা না জানুন, তাঁহার কোন সদ্গুণ থাকুক বা নাই থাকুক, হয় তাঁহাতে বরকর্ত্তার মনোবাঞ্ছার অনুরূপ অর্থদান করিতে হইবে, না হয়,

তাঁহার কন্যার সঙ্গে বিবাহ হইল না। কন্যাকর্ত্তার প্রচুর অর্থ না থাকিলেও সুতরাং তাঁহাকে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ দিয়া মূর্খ পাত্রের হস্তে প্রাণপ্রতিমা দুহিতাকে সমর্পণ করিতে হইবে! এ কি সামান্য দুঃখের বিষয়? আমরা সেই কবিতাটির মধ্য হইতে এক স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কুক্ষণে ইস্কুলে হোল পাশের সঞ্চার।
পাশ নহে এটি মোর আশা ভঙ্গ মূল,
ইহার জ্বালাতে আমি হয়েছি ব্যাকুল।
প্রথম পাশের সৃষ্টি হইল যখন,
সবাই পাশ করা জামাই করে অন্বেষণ।
সুতরাং পেশো ছেলের বাড়িল সম্ভ্রম,
হয়ে উঠলো তাহাদের বাজার গরম।
তাহাদের কর্তৃপক্ষ পিতা কিম্বা ভ্রাতা,
কিম্বা জ্যেষ্ঠ খুড়া মামা যে হোক অন্নদাতা।
ভাবিল এমন কাল না হইবে আর,
ভাঙ্গিব মনের সুখে বৈবাহিকের ঘাড়।
কোটা বালাখানা হবে বেয়াইয়ের ধনে,
গিন্নিরও রূপর পৈঁচে ঘুচবে এত দিনে।
পেশো ছেলেদের হোল অসাধারণ গুণ,
স্বেচ্ছাচারী স্বেচ্ছাহারী বাবুগিরির ঘুন,
টেরি দাড়ি হিরের অঙ্গুরী আর ঘড়ি,
গাড়ি হোলেই হইল চূড়ান্ত বাবুগিরি।
নাহি ব্যয় আত্ম ব্যয় হয় অনায়াসে,
অন্তু ত্রয় জন্য সদা থাকে মন ক্লেশে।
হিরের আংটি ঘড়ির চেনের বড় সাধ মনে,
বাপের নাই অস্টরম্ভা কি দিয়ে বা কেনে।
পেশো ছেলে পিতৃ বাধ্য কোন কালে নয়,
হয়েন কলির পরশুরাম বিবাহ সময়।
বিবাহের পর দিনে টেঁকে ঝুলান ঘড়ি,
ভাবেন না যে ঘড়ি ও নয় শ্বশুর জিবরি।
পূর্ব্বে পুত্রে বিদ্যা শিখাত যত্নেতে,
যাতে পারে রাজ কার্য্যে অর্থ উপার্জ্জিতে।
এখন আর পিতার তা নহে মনভাব,
যেন তেন প্রকারেন কৌক অর্থ লাভ।
কসাইয়েরা খাসি যেমন গ্রামফেড করে,
যাহাতে বাজারে বিক্রি হয় উচ্চ দরে।
তদ্রূপ পিতারা এখন বহু যত্ন করে,
এল এ, বিএ, এম এ, পাশ করাণ ছেলেরে।
মনে মনে এই তাদের প্রধান উদ্দেশ,
বিবাহ বাজারে যাতে মূল্য হয় বেশ।
কন্যাকর্ত্তা বিবাহ প্রসঙ্গ যেই করে,
অমনি বলে কত দিবে বল পষ্টাক্ষরে।
ক'শ ভরি সোণা দিবে টাকা ক'হাজার,
জানত কেমন মার্গ পাশের বাজার।
স্বর্ণ রৌপ্য দান-সামগ্রী কয় প্রস্তু দিবে,
কেমন হিরের অঙ্গুরি বরেরে বরিবে।
কোন্ মেকারের ঘড়ি দেবে কোন্ রূপ চেন,
এ না দিলে তোমার সঙ্গে কথা কহা ত্যেন।

—০০—

কেশব-বিয়োগ। (স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পরলোক প্রাপ্তি উপলক্ষে) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। কলিকাতা, ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, বীণাযন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে মৃত মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের একটি গদ্যময় সংক্ষিপ্ত জীবনী বিন্যস্ত হইয়াছে। এই জীবনীর পর পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। কবিতা পাঁচটির কোন কোনটিতে রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। একস্থান নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কাঁদে ভাগীরথী—
কেন রে আমার বুকে শোকের শ্মশান ঘোর!
এ শ্মশানে কে আনিল প্রাণের বাছারে মোর!

হরির চরণ হ'তে
বহি আমি স্রোতে স্রোতে,
হরির চরণ হ'তে কেশব রে এসেছিলি!
আমারে ফেলিয়ে আজ কোথায় কোথায় গেলি!
অন্ধ যে আমি, আয় বাপ! বোস্ রে তাপিত কোলে
জুড়া রে আতুর প্রাণ সুমধুর হরিবোলে!
মায়ে পোয়ে প্রাণ ভরে গা'ব হরিনাম-গান,
জুড়াইব নিজে নিজে, জুড়াইব কোটি প্রাণ।
গেরুয়া বসন পোরে একতারা ল'য়ে করে,
নেচে নেচে হরিবোল বল রে মধুর স্বরে।
শুনে তোর হরিনাম,
ধাই আমি অবিরাম,
হরিনাম শুনিবারে সাগর রয়েছে দূরে।
হায় হায়, একি শুনি—শ্মশানের হরি-রব!
কেশব নীরব মোর!—হা কেশব!—হা কেশব!"

ইহার পরিশিষ্টে কেশবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কেশব সম্বন্ধে সাধারণের মত সঙ্কলিত হইয়াছে।

গ্রন্থের পরিসমাপ্তিকালে রাজকৃষ্ণ বাবু বলিয়াছেন, কেশবচন্দ্রের "জীবনী বা তৎ-সম্বন্ধীয় সাধারণ মত সংগ্রহ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। শোক প্রকাশ করিয়া কয়েকটি কবিতা লেখাই উদ্দেশ্য।" তদনন্তর তিনি প্রতাপ বাবুকে উক্ত মহাত্মার একখানি সুবৃহৎ জীবন-চরিত লিখিয়া সাধারণকে উপকৃত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বাস্তবিক প্রতাপবাবুর মত লোক, যাঁহারা বহুকাল হইতে কেশব বাবুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারাই একার্য্য সুসম্পাদিত হইবে। আর এরূপ মহাপুরুষের একখানি প্রকৃত জীবনী রচিত হওয়া দেশের পক্ষে বিশেষ হিতজনক। সে জীবনচরিতে তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, বংশাবলীর উল্লেখ এবং তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার ও বাগ্মিতার বিচার মাত্র করিলেই যথেষ্ট হইবে না। কেশবচন্দ্রের জীবনচরিতে তাঁহার সেই উদার, উন্নত প্রাণ, জ্বলন্ত ও জীবন্ত স্বজাতিপ্রেম ও প্রবল ঈশ্বরভক্তির প্রত্যক্ষ চিত্র আমরা দেখিতে চাই।

গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট কাগজে যত্ন সহকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার প্রথমে কেশব বাবুর একখানি প্রতিরূপ প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি মৎপ্রণীত এই "কেশব-বিয়োগ" পুস্তকখানির গ্রন্থ স্বত্ব (CopyRight) ৫০৲ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় করিলাম। স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের স্মরণার্থ যে চিহ্ন স্থাপিত হইবে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় সাহায্যার্থ, এই টাকা আপাততঃ গুরুদাস বাবুর নিকট গচ্ছিত রাখিলাম। যথা সময়ে স্মৃতি-সমিতির হস্তে এই ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা অর্পণ করিব।"

সুতরাং এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সাধু। বঙ্গবাসিগণ সামান্য ব্যয়ে এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড ক্রয় করিবেন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ইটালি বান্ধব পুস্তকালয়ের বাৎসরিক বিবরণ।

আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ের বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। এরূপ সদনুষ্ঠান উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, ইহাই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

কি কর্ত্তব্য। শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা,

মুকর্জ্জি কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা প্রেস ৮৪নং রাধাবাজার। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

বহুকাল পরে বহু আবর্জ্জনার মধ্য হইতে একখানি ভাল পুস্তক পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। লেখক কৃতকার্য্য হউন বা না হউন তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যম প্রশংসনীয়। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—

"আমাদিগের সমাজ-মধ্যে আমার প্রস্তাবিত প্রণালী-অনুযায়িক একটি প্রশস্ত সমিতির আবশ্যকতা বহুদিন হইতে আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; কিন্তু গত কয়েক মাস হইতে দেশমধ্যে যে কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য এবং অননুভাবনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা অবলোকন করিয়া, আমার হৃদয়ের বিশ্বাস সহস্রগুণে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যে যে একপ্রণালীবদ্ধ এবং একত্রীভূত কার্য্যের কতদূর প্রয়োজন, তাহা এই কয়েকটি ঘটনা আমাদিগকে অতি চমৎকাররূপে বুঝাইয়া দিতেছে।"

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত গ্রন্থকার স্বীয় যুক্তি-সমূহ ও উপায়-সমূহ গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার সকল যুক্তি ও সকল প্রণালী আমরা অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নহি বটে, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ যে যথেষ্ট চিন্তা-শক্তির পরিচায়ক ও সদুদ্দেশ্য পরিপূর্ণ তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকামণ্ডলী এ গ্রন্থখানি পাঠ ও আলোচনা করেন ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। আমরা এই গ্রন্থের এক স্থান হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"তাহার পর, আর একটা মত আমাদের মধ্যে এইরূপ প্রচারিত আছে যে, লোকের অবস্থা আজি কালি এরূপ মন্দ, জীবিকা নির্ব্বাহ করা আজি কালি এরূপ কঠিন যে, তাহা করিয়া আর দেশের উপকার করিবার কাহারও অবকাশ থাকে না। পেটের ভাতের যোগাড়ই করিয়া উঠিতে পারি না, তাহাতে আবার দেশের উপকার কখন করিব? এই মত যে কি প্রকার অযুক্তিসঙ্গত এবং নির্ব্বুদ্ধিতা-পরিপূর্ণ, তাহা আর বাক্যের দ্বারা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। দেশের উপকার কাহাকে বলে? দেশ এবং আপনার মধ্যে কি কিছু পার্থক্য আছে? তবে দেশের উপকার করিলে কি আপনার উপকার করা হয় না? এরূপ কথা বলা কি নিতান্ত ক্ষুদ্রমনের পরিচয় দেওয়া নহে? দেশের সাধারণ উপকারের জন্য কোন কার্য্যে একটু সময় কাটাইলে, তাহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে এবং তখনই আমার নিজের কোন উপকার হইল না; সুতরাং আমি অমনি বলিলাম যে, এ সময়টা একেবারেই বৃথা নষ্ট হইল; ততক্ষণ নিজের কোন একটা কর্ম্ম রিতে পারিলে কার্য্যে আসিত! কিন্তু এরূপ চিন্তা করা কত বড় ক্ষুদ্র অল্পায়ত্ত এবং সঙ্কুচিত হৃদয়ের কার্য্য! দেশের উপকারের সঙ্গে আমার নিজের উপকারের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই; তবে কথা এই যে, সে উপকারটা আত্মসম্বন্ধে তখনই উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু গৌণ ভাবে সে উপকারের সঙ্গে যে আমার কত দূর সম্বন্ধ, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মনে কর, রাজা কোন একটা অন্যায় কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন; সে কার্য্যে দেখিতেছি সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার কোন অপকার নাই; হয় ত অম-

জীবী দরিদ্র শ্রেণীর লোকদিগের উপর সে কার্য্যের কুফল প্রসবিত হইবে; হয় ত তজ্জন্য তাহাদের অর্থহানি হইবে, কিম্বা তাহাদের জীবনোপায় সম্বন্ধে কোন প্রকার ভয়ানক অসুবিধা উপস্থিত হইবে। আমি ভাবিলাম, হয় হউক, তাহারাই কষ্ট পাইবে, আমার ত কোন কষ্ট হইবে না; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সমাজের গঠন এরূপ চমৎকার, ইহার মধ্যস্থিত প্রত্যেক শ্রেণী, এবং প্রত্যেক লোক পরস্পর শৃঙ্খলের ন্যায় এরূপ কার্য্যকারণ-সূত্রে আবদ্ধ যে, একের অপকার হইলে, সেই অপকার সহস্র সহস্র রাস্তা দিয়া, সহস্র সহস্র প্রকারে অপর প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ক্রমান্বয়ে পতিত হইবে। তাহার শনৈঃশনৈঃ অগ্রগতি অল্প-বুদ্ধি লোকের অবোধ্য; এবং একটি নদী যেরূপ পর্ব্বত-গুহা হইতে নিঃসৃত হইয়া আপনার অগ্রগতির সময় আরও সহস্র সহস্র নদী নালা পরিখা জলাশয় ইত্যাদিকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ দেখিতে দেখিতে আপনার দেহ, অবয়ব, এবং বিক্রম বর্দ্ধিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ সমাজমধ্যে একের অপকার হইলে সেই অপকার ক্রমশঃ নানাপ্রকার অবস্থার সঙ্গে মিলিত হইয়া সময়ে ভয়ানক প্রবলতার সহিত অপর সকলকে আপনার আয়ত্ত মধ্যে লইয়া আইসে। অদ্য অপরের হইতেছে বলিয়া আমি উপেক্ষা করিলাম; কিন্তু দশ দিন পরে আবার দেখিতে হয় যে, যে বিষয় প্রথমে আমার সঙ্গে কোন সংস্রব নাই বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই বিষয়েরই জন্য হয় ত আমাকে ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হইতেছে।”

গ্রন্থের শেষভাগে লেখক মহাশয় আমাদের দেশ সম্বন্ধে ভবিষ্যতের সুখময় কল্পনা করিয়া কহিয়াছেন,—“জগৎপিতা জগদীশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে কিছুই বিচিত্র নহে; এমন (বিলাতের মত) দিন যে আমাদিগের কখন আসিবে না, আমাদের স্বদেশীয় প্রথা সম্বন্ধে আমরা যে কখন এমন করিয়া গৌরব প্রকাশ করিতে পারিব না, এ কথা কে বলিতে পারে?” আমরাও গ্রন্থকারের সহিত একমত হইয়া এই রূপ সুখময় কালের আগমন কামনা করি। কিন্তু যে আমাদের প্রকৃতি, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যে আমাদের সামাজিক রীতিনীতির সংস্কার হইয়া উঠা অসম্ভব। মন্দই হউক আর ভালই হউক, আমরা যে সংস্কারের নামে মূর্চ্ছা যাই!

বিদ্যুল্লতা।

ত্রিংশ* পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। চন্দননগরস্থ উল্লিখিত বাটীর সেই কক্ষ মধ্যে নরেন্দ্র অকুল চিন্তায় নিমগ্ন, অত্যন্ত বিমর্ষ ও নীরব। তাঁহার পার্শ্বে নগেন্দ্রও বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। তৎকালে উভয়কে দেখিলে বোধ হইত, যেন কোন সাধারণ বিপৎপাতে উভয়েই ম্রিয়মাণ। আর বিপদও যেন অতি ঘোর এবং দুর্নিবার। পর্য্যায় ক্রমে দুই জনের ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে সেই কক্ষের নিস্তব্ধতা বিকম্পিত হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ উভয়ে এই রূপে নীরব থাকিলে পর, নগেন্দ্র অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "নরেন, আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হইল না, তুমি অনায়াসে পুণ্যবতী, পতিপরায়ণা ভার্য্যার চরিত্রে দোষারোপ করিতেছ! তাঁহার সতীত্ব-প্রভাবের প্রশংসা না করিয়া এবং তাঁহাকে অধিকতর আদরের সামগ্রী না ভাবিয়া ঘৃণা করিতেছ, মুখ কুটিয়া বলিতেছ তিনি দুষ্ক্রিয়ান্বিতা! যদি বিদ্যুল্লতাকে পরিত্যাগ করিবে, কেন তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলে! কেন না ইংলণ্ডে অজ্ঞাতবাসে অবস্থিতি করিলে, কেন দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, কেন আমাকে দেখা দিয়া পরম পুলকিত করিয়া, আবার এই গভীর শোক-সাগরে ডুবাইতে বসিয়াছ? বিদ্যুল্লতা শুনিলে কি আর জীবিত থাকিবেন?—কেন তাঁহাকে আত্মহত্যা-পাপে পরিলিপ্ত করত নরক-গামিনী করিবে? যাও, তুমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাও—আমি যেমন করিয়া পারি, অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তোমার জীবিত থাকা এবং প্রত্যাগমন বার্ত্তা সকলের অগোচর রাখিব!" নগেন্দ্র নীরব হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র নেত্রমার্জ্জনা করত কহিলেন "ভাই নগেন, আমার উপর ক্রুদ্ধ হইওনা। তোমার মুখে বিদ্যুল্লতা জীবিত আছে শুনিয়া প্রথমে আহ্লাদে বাক্যস্ফুরণ করিতে পারি নাই, তাহা তুমি দেখিয়াছ। মৃতপ্রায় বিদ্যুল্লতাকে কোলে তুলিয়া, তখনই প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিয়াছিল, আলোকে তাহার মুখ দেখিয়া অবধি আমি যে কত আহ্লাদে, কত সাধের কত কথা মনে করিতেছিলাম—কিন্তু সে যে নিজমুখে ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছে—সে দুষ্ক্রিয়ান্বিতা। আর কি তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়? কোন্ পুরুষ—কোন্ স্বামী পারে, তুমি পারিতে কি?

অবশ্য, আমার দেশে না আসাই শ্রেয় ছিল, অজ্ঞাত থাকাই উভয় পক্ষের শুভকর ছিল—আমি জানিতাম সে বাঁচিয়া নাই। তাহাকে মনে হইলে শুধু শোকের যন্ত্রণায় অধীর হইতাম—এখন হইতে আমাকে মর্ম্মান্তিক জ্বালায় জ্বলিতে হইবে! উঃ—নগেন, বিদ্যুল্লতা দুশ্চরিত্রা হইল, তাহা আবার তাহা-

* গতসংখ্যক প্রবাহে প্রকাশিত বিদ্যুল্লতার ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদের স্থানে ভ্রমক্রমে ঊনবিংশ লিখিত হইয়াছে। প্রঃ সং।

ঘই মুখে, স্বকর্ণে শুনিতে হইল।" নরেন্দ্রের স্বর ভগ্ন হইয়া আসিল, কণ্ঠে আর কথা সরিল না তিনি মুখে রুমাল দিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন "তিনি দুষ্ক্রিয়াম্বিতা, একথা মুখে আনিও না,—তাঁহার প্রকৃতিতে পাপ কখনই স্পর্শ করিতে পারিবে না। অনুমান করি, অজ্ঞাত স্থানে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়া রাত্রি বাস করিয়াছেন, নয় সেই পামর পুরুষকে কারারুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, অথবা তুমি সাহেব হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছ- এই ভাবিয়া অনুতাপ প্রযুক্তই দুষ্ক্রিয়ার কথা উচ্চারণ করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক এই তিনটির কোন একটি তাঁহাকে অনুতপ্ত করিয়াছে সন্দেহ নাই। অপরিচিত স্থানে তিনি একাকিনী কখন রাত্রিবাস করেন নাই, পরপুরুষ বিশেষতঃ ম্লেচ্ছ সাহেব তাঁহাকে কখন স্পর্শ করে নাই; আর তাঁহা-দ্বারা কখন কাহারও মন্দ ঘটে নাই। কাহা-কেও কোন প্রকারে অসুখী করা তাঁহার প্রকৃতি নহে। নরেন—বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ, ভাগ্যক্রমে এমন নারীরত্নকে ভার্য্যারূপে পাইয়াছিলে, পরম সৌভাগ্যবশতই সে কাল দুর্ঘটনার উভয়েই রক্ষা পাইয়াছিলে—এখন কোথায় সুখের মিলনে পরস্পরে পরস্পরকে কৃতার্থ করিবে—আমাদিগকে সুখী করিবে, কোথায় নির্ব্বাণ অনল পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া দিতে উদ্যত হইতেছ! ভাল, আমার কথা শুনিয়া কাজ নাই, মায়ের মুখে, তোমার শ্বশুরের মুখে, পাড়ার দশজনের মুখে—আর কি বলিব, পামরী কামিনীর মুখে বিদ্যুল্লতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রশংসা শুনিয়া দেখ। বিদ্যুল্লতা নিষ্কলঙ্ক না হইলে সকলেই কখন একমত হইয়া তাঁহার প্রশংসাবাদ করিবে না। আর যদি সেই সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি, সঙ্গে যাইতে চাহ যাইও, তিনিও সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি কি কথা বলেন তাহাও শুনিবে। যদি এক ব্যক্তিও বিদ্যুল্লতাকে কুচরিত্র বলিয়া ঘৃণা করে—অথবা সেই সন্ন্যাসী যদি এমন কোন কথা কহেন, যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ জন্মিতে পারে তখন আমিই তোমায় বিদ্যুল্লতাকে বিসর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিব। কিন্তু স্বীকার কর, সর্ব্বত্র বিদ্যুল্লতার নির্ম্মল চরিত্রের কথা শুনিলে উপস্থিত কুচিন্তা এবং তাঁহার প্রতি ঘৃণা ও সন্দেহ বিহীন হইয়া তাঁহাকে অকপটে গ্রহণ করিবে,—বল তাঁহাকে আর কোন প্রকারে সন্দেহ করিবে না—"

নরেন্দ্র আক্ষেপ করিয়া কহিলেন "হয়, আমার মন হইতে বিদ্যুল্লতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীভূত হউক, নয় আমার প্রাণ এখনই বাহির হউক।"

নগেন্দ্র নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া "এস গঙ্গা-তীরে একটু পদচারণ করিয়া আসি"—বলিয়া তুলিলেন এবং উভয়ে চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ের বিষাদভার পুণ্যসলিলা ভাগীরথী প্রবাহে বিসর্জ্জন দিতে গেলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশীর দিবস প্রাতে হরাসাঁড়ীর বাটীর দ্বারে বসিয়া সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন—বিদ্যুল্লতার কালরাত্রি ত প্রভাত হইয়া গিয়াছে, তিনি সকল প্রকার বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ তাঁহার যে কলঙ্ক রটিয়াছিল তাহাও জনসমাজে স্থায়িত্ব

লাভ করিতে পারে নাই। এখন তিনি একবার আসিয়া এই সৎকুলোদ্ভব; পাপমন্ত্র হতবুদ্ধি আত্মীয়কে কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া যান,—তাহা হইলেই তাঁহার কার্য্যের শেষ হইবে, তাঁহার সুখ চন্দ্রমা উদিত হইবে, আর মহিলামণ্ডলীতে, একদিকে বৈধব্যের কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া চিত্তের প্রশান্ত ভাব, অন্য দিকে নীচ-প্রবৃত্তি পুরুষের কৌশলজাল ছিন্নভিন্ন করতঃ সতীত্ব প্রভাবে স্বর্গীয় প্রকৃতির সাক্ষ্য দিয়া, আদর্শ সতী বলিয়া বিদ্যুল্লতা জনসাধারণের আদরণীয়া হইবেন।

সন্ন্যাসী আক্ষেপ করিতেছেন—হায়! রাধাকান্ত, কেন তুমি হিমাচলে বাস করিতেছ? বলিয়াছিলাম, তোমার সংসার পুনরায় পূর্ণসংসার হইবে, কিন্তু তুমি আমার ভবিষ্যদ্বচনে বিশ্বাস কর নাই! শিষ্য হইয়া গুরুবাক্যে অন্তরে অন্তরে অবহেলা করিয়াছিলে! তোমার দোষ আমি কখনই অন্তরে গ্রহণ করি না, আমি তোমাকে আজীবন আশীর্ব্বাদ করিব, তুমি আমার আশীর্ব্বাদেরই পাত্র। এখন আমি গণনা দ্বারা যাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছি, আর তোমাদিগের জন্য পত্র সম্বন্ধীয় যে যে কথা আমার মনে পড়িতেছে, আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তোমার সংসারের পূর্ণ শ্রী হইতে আর বিলম্ব নাই। হায়, তুমি এমন সময় এখানে নাই, এখানে থাকিয়া পুনর্ম্মিলনের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতে পাইলে না। তুমি জলমগ্ন হইয়া বাঁচিলে—দেশে ফিরিলে না কেন—দেশে যাইলেই ত অনেককেই দেখিতে পাইতে! আমিই অন্যায় করিয়াছিলাম, যে সময় হরিদ্বারে গিয়াছিলাম, যাইবার সময় তোমাকে সাবধান করিয়া যাই নাই। এবার আসিবার সময় সঙ্গে আসিতে তোমাকে অনুরোধ করিলাম—তুমি সে অনুরোধ রক্ষা করিলে না। তোমার ভাগ্যে এসুখ নাই, তুমি কি করিবে! যে নরেন্দ্রের শোকে এখনও এক একবার অশ্রু-বিসর্জ্জন কর- সেই নরেন্দ্র দেশে আসিয়াছেন—নয় তাঁহার আসিতে আর বিলম্ব নাই। সেই নরেন্দ্র ভাগ্যবতী বিদ্যুল্লতার সহিত আবার পুনর্ম্মিলিত হইবেন! হায় এ সুখের অবস্থা উপভোগ করা তোমার ভাগ্যে নাই! তাই তুমি আসিলে না—

সম্মুখেই একখানি পাল্কী আসিয়া লাগিল। পাল্কী হইতে একটি পুরুষ ও আর একটি স্ত্রীলোক বাহির হইলেন। পুরুষ অতি তরুণ-বয়স্ক, শ্মশ্রুবিহীন। তাঁহার পরিচ্ছদ—অঙ্গে একটী দীর্ঘ জামা—চরণে চর্ম্মপাদুকা—শিরে মোল্লাদিগের ন্যায় পাগড়ী বাঁধা। রমণী, পূর্ণযৌবনা—লক্ষ্মীমন্তের কুলমহিলার ন্যায় অলঙ্কারভূষিতা, কিন্তু অবগুণ্ঠনবতী, রোরুদ্যমানা। পুরুষ রমণীর হাত ধরিয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়াই আস্তে আস্তে দুটি দুই কথা কহিলেন—সন্ন্যাসী শশব্যস্তে "আসিয়াছ?" বলিয়াই বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুকেরাও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। চলিতে পুরুষ ও রমণীর পায় জড়াইয়া যাইতে লাগিল।

সম্মুখেই প্রাঙ্গন—প্রাঙ্গনের পূর্ব্ব দিকে উচ্চ প্রাচীর, পশ্চিম দিকে সেই কক্ষ, বিদ্যুল্লতা তথায় বসিয়া রোদন করিয়াছিলেন। প্রাঙ্গনের উত্তর দিকে আর দুইটি কক্ষ, পশ্চাৎ দিক দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে হয়। প্রাঙ্গনের দিকে সেই কক্ষদ্বয়ের শুধু দুইটি জানালা—লৌহদণ্ডে কঠিনরূপে নির্ম্মিত। এই দুইটির একটি কক্ষে বিদ্যুল্লতা গিরিশচন্দ্রকে বন্দী করিয়াছিলেন। এই দুইটি

কক্ষের সম্মুখে বসিবার একখানি বেঞ্চ পাতা ছিল। আগন্তুক পুরুষ সেই কামিনীর সহিত তদুপরি উপবেশন করিলেন—সন্ন্যাসী পুনরায় দ্বারে ফিরিয়া গেলেন।

পুরুষ কহিতে লাগিলেন "দেখ প্রিয়ে, দেখ, দেখ, এ বেশ নির্জ্জন স্থান, এখানে আমরা অনায়াসে অবস্থিতি করিতে পারিব। কেহই এপথে আইসে না, লোকে জানিতে না পারিলে আমাদের কোন আশঙ্কাও থাকিবে না; ঐ সন্ন্যাসীকে বাড়ীতে রাখিয়া দিব, যদিও কেহ কখন এখানে আসিয়া উপস্থিত হয় উনিই তাহাদিগকে বিদায় করিবেন।" পুরুষ স্বর পরিবর্ত্তন করত পুনরপি কহিতে লাগিলেন "ওকি ভাই, বাড়ীর উপর এখনও এত মায়া যে রোদন করিতেছ, যে স্বামী পরগতপ্রাণ, তাহার জন্য আবার ক্রন্দন! তবে বুঝি আমায় প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে না—তবে আসিলে কেন?"

পশ্চাদ্ভাগের কক্ষমধ্যে কঙ্কালসার, শীর্ণ, মলিন, অতি বিশ্রী—একজন পুরুষ ধুলায় ধুসরিতকায় হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। তাহার চক্ষু আরক্ত, লোচন উর্দ্ধগত—সে বিকট ভাবে সেই পুরুষ ও রমণীর দিকে চাহিতে লাগিল।

আগন্তুকপুরুষ তখনও কহিতেছিলেন—"তবে আসিলে কেন, না ভাই—তোমার সহিত প্রণয় করিয়া আমি শুধু সারা হইব। ছি প্রিয়ে—একি? মুখের বসন খুলিয়া ফেল—আর ত কেহ নাই।—এস দুজনে আহ্লাদ আমোদ করি" বলিতে বলিতে পুরুষ রমণীর অবগুণ্ঠন সরাইয়া মুখ চুম্বন করিতে যাইতেছিলেন—দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া "তবে রে পাপীয়সি" বলিয়া সেই পশ্চাতের কক্ষস্থিত পুরুষ চীৎকার করিয়া উঠিল—নবাগত পুরুষ চমকিয়া দাঁড়াইলেন ও বিহ্বল নেত্রে সেই শীর্ণকায় চীৎকারকারীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রমণীও উঠিয়া সেই বিকটভাষী পুরুষের দিকে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সেই কক্ষস্থিত পুরুষ গিরিশ চন্দ্র। রমণী তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা স্বর্ণলতা। গিরিশ স্বর্ণলতার ক্রন্দনে কাতর হওয়া দূরে থাকুক, ক্রোধানলে—ঈর্ষ্যানলে প্রজ্বলিত হইয়া "সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী—দ্বার খুলিয়া দাও" বলিয়া চীকার করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী আসিলেন না—দেখিয়া সেই লৌহদণ্ড সমুদয়ে সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু লৌহদণ্ড ভাঙ্গিবার নয়। অবশেষে হতাশ হইয়া "উঃ উঃ" করত নিজ বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তখন নবাগত পুরুষ শোক-দুঃখ-লজ্জায় কাতর স্বর্ণলতার হাত ধরিয়া দ্রুতপদে গিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন, স্বর্ণলতাকে বসাইয়া, মূর্চ্ছাগত গিরিশের মস্তক তাঁহার কোলে তুলিয়া দিলেন। অঞ্চল দিয়া ব্যজন করিতে বলিয়া ছুটিয়া সন্ন্যাসীর নিকট হইতে জল লইয়া গিয়া গিরিশের মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। জল সিঞ্চনে গিরিশের মূর্চ্ছা দূর হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সেই পাপিয়সী স্বর্ণলতার কোলে মস্তক রাখিয়াছেন। পুনর্ব্বার দন্ত কিড়িমিড়ি করত উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বর্ণলতা এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী তাঁহাকে উঠিতে দিলেন না। ক্রোধের সময় দেহের বল দ্বিগুণ হইয়া উঠে—গিরিশ জোর করিয়া উঠিলেন। পুরুষ তখনই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া, মস্তকের পাগড়ী, অঙ্গের জামা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহি-

লেন. 'গিরিশবাবু—স্বর্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হই-বেন না। আমি পুরুষ নহি, 'আমি সেই হতভাগিনী বিদ্যুল্লতা।' বিদ্যুল্লতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। গিরিশ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণে পড়িতে গেলেন, বিদ্যুল্লতা আরও সরিয়া গেলেন। স্বর্ণলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন 'নাথ! আমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই ঘটিল—কিন্তু ভাবিয়া দেখ দিদির দশা কি করিলে?'

বিদ্যুল্লতার চক্ষের জল আরও উথলিয়া উঠিল, তিনি এতক্ষণ অশ্রুপাত না করিয়া-ছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না। তাহার চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া একেবারে কয়েক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। তিনি থর থর কলেবরে ত্রস্তভাবে সে কক্ষ হইতে নির্গত হইয়া বহির্দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। একে তখন তাঁহার হৃদয় ব্যাপিয়া শোকদুঃখানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে দ্বারে তাঁহার প্রাণ রক্ষা কর্ত্তা সেই সাহেব-বেশী অপর একজন পুরুষ, সেই কাল-রূপিণী কুট্টিনী কামিনী আবার তাহাদের সঙ্গে তাঁহার পিতা কাশীনাথকে দণ্ডায়মান দেখিয়া আত্মগ্লানি ও লজ্জাতিশয্য বশতঃ "বাবা গো—" বলিয়া চীৎকার করত কাশীনাথের চরণতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। তখনই তাঁহার চেতনার লোপ হইল!

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বর্ণলতা কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মাদবেশী গিরিশের হাত ধরিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। বিদ্যুল্লতাকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া, কোলে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। সাহেববেশী নরেন্দ্রের চক্ষে অশ্রু, নগেন্দ্রের চক্ষে অশ্রু, কাশীনাথের চক্ষে অশ্রু, সন্ন্যাসীর চক্ষে অশ্রু; অহো! কি শোচনীয় অবস্থা—গিরিশের চক্ষে অশ্রু, আর অধিক কি বলিব—বিদ্যুল্লতার অবস্থা দেখিয়া সকল অনিষ্টের মূল দুষ্টা কামিনীর চক্ষেও অশ্রুধারা বহিতে লাগিল!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চন্দননগরস্থ সেই বাটীর সেই কক্ষ মধ্যে সন্ন্যাসী পুরুষোত্তম এবং নরেন্দ্র বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। পুরুষোত্তম বলি-তেছেন—'নরেন্দ্র—আজ শুভ দিন—আজিই তোমার বাটী যাওয়া কর্ত্তব্য। আর অধিক বিলম্ব করিও না, অপরাহ্ণে ত্রয়োদশী গিয়া চতুর্দ্দশী পড়িবে। নগেন্দ্র ও কাশীনাথকে বলিয়া দিয়াছি, তাঁহারা তোমার সহধর্ম্মিণীকে শুদ্ধ তাঁহার গর্ভধারিণীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া বরাবর শ্যামনগরে লইয়া যাইবেন, আমিও তখনই শ্যামনগরে গমন করিব। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতাম, কিন্তু পথে প্রয়োজন বশতঃ কোথাও অল্প-ক্ষণের জন্য আমাকে অবস্থিতি করিতে হইবে, তাই লইয়া যাইব না। তুমি শ্যামনগরে গিয়া বাটী প্রবেশ মাত্র অগ্রে বিশ্বধাত্রী-স্বরূপা জননীকে প্রণাম করিও; তাহা হইলেই সর্ব্বদুঃখ-বিনাশিনী ভগবতী তোমার প্রতি সদয়া হইবেন, দেখিও যেন ভুলিও না। তবে আমি আসি' বলিয়া সন্ন্যাসী বিদায় হইতে চাহিলেন। নরেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিলেন।

না জানিয়া না শুনিয়া বিনা অপরাধে কাহা-কেও অপরাধী করিয়া আবার সেই ব্যক্তির নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাইলে যার পর নাই অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ

প্রিয়তমা ভার্য্যার প্রেমে বঞ্চিত বিবেচনা করিয়া ক্রোধের উত্তেজনায় কেহ কেহ নিরপরাধিনী সহধর্ম্মিণীর প্রতি কুব্যবহার করিয়া ফেলেন, এবং ক্রোধ শমিত হইলে শান্ত প্রকৃতিতে তাঁহাকে নির্দ্দোষী জানিয়া অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া পড়েন। নরেন্দ্র বিদ্যুল্লতার প্রতি প্রকৃত কোন কুব্যবহার করেন নাই, কিন্তু এ সময়ে তাঁহার মনে হইতেছে যে, তিনি যে প্রকার নীচ কর্ম্ম করিয়াছেন, কোন সহৃদয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক সে প্রকার অমানুষী পাপ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

নরেন্দ্রের হৃদয়ে সেই ঘোর অনুতাপ উপস্থিত—তিনি সাধ্বী সতী বিদ্যুল্লতার সতীত্বে সন্দেহ করিয়াছিলেন, মনে ঠাঁই দিয়াছিলেন—সেই পুণ্যবতী ভার্য্যা দুষ্ক্রিয়ান্বিতা। ক্রোধের দাস হইয়া তাঁহাকে নিঃসহায়া দেখিয়াও অনায়াসে আপনার আশ্রয়চ্যুত করিয়াছিলেন, মনে মনে কত কুচিন্তার উদয়ে তাঁহাকে কত অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ হইবার পূর্ব্বে বিদ্যুল্লতার যত গুণের কথা—যত প্রণয়ের কথা—যত সরল স্বভাবের কথা এক্ষণে মনে পড়িতে লাগিল; আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব বিপদের কথা স্মৃতিপথে আসিয়া যত দুঃখ বৃদ্ধি করিতে লাগিল—নরেন্দ্রের চক্ষু দিয়া ততই দরবিগলিত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

'হায় আমি কি বলিয়া বিদ্যুল্লতাকে মুখ দেখাইব! কি বলিয়া তাঁহার পবিত্র প্রেমালিঙ্গনে এই পাপচিন্তা-পরবশ আত্মদেহ সমর্পণ করিতে সমুদ্যত হইব! যদি তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া থাকেন, আর আমার অবৈধ ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া থাকেন, কেমন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে সে বিষাদ দূরীভূত করিতে পারিব! আমি তাঁহার প্রতি যার পর নাই নির্দ্দয় নির্ম্মম ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছি! আর যদি নাই চিনিতে পারিয়া থাকেন—দেখা হইলে চিনিতে পারিবেন, আমিই সেই নিষ্ঠুর-হৃদয়! কোথায় তিনি এত দিন পরে স্বামী দর্শনে তাঁহার বিরহ-বিদগ্ধ হৃদয়কে উল্লাসিত করিবেন, শান্তি-বারি সিঞ্চনে শীতল করিবেন, মনে করিতেছেন—কোথায় আমাকে দেখিবামাত্র হয়ত তাঁহার উল্লাসে বিকাশোন্মুখ হৃদয় জড় সড় হইয়া যাইবে, আনন্দ ও সুখের আশা সকল মুকুলেই শুকাইয়া যাইবে, নৈরাশ্যে হৃদয় ফাটিয়া উঠিবে! হায়! আমি কেমন করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইব!' এই বলিয়া নরেন্দ্র নীরব হইলেন এবং মুখে রুমাল দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে গুরুর আজ্ঞা শীরোধার্য্য আজই বাটী যাইতে হইবে, এখনই যাইতে হইবে। একবার গুরুর আজ্ঞা অবহেলা করিয়াই পিতা স্বীয় সংসারকে বিষাদে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন—আবার তিনি সেই গুরুর কথা অবজ্ঞা করিলে, হয়ত জীবন্ত সংসার ভস্ম হইয়া যাইবে! তাহাতে কাজ নাই—বিদ্যুল্লতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবেন ভাবিয়া, নরেন্দ্র মুখ হইতে রুমাল অপসৃত করিলেন, এবং নেত্র মার্জ্জনা করত, পকেট হইতে ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন, বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে।

তখন শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করত বাটী হইতে বাহির হইলেন। এদিকে এতাবৎকাল অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া অকস্মাৎ আত্মীয় সন্দর্শনের আনন্দ, সকলকে দর্শন

দিয়া পরম সুখী করিবেন সে আনন্দ, শোকাতুরা জননীর অঙ্কে বসিয়া তাঁহার হৃদয় শীতল করিবেন সে আনন্দ, স্নেহাস্পদ অনুজ রাজেন্দ্রকে আবার দেখিতে পাইবেন সে আনন্দ—আর আযৌবন বিরহিণী বিষাদ-বিপন্ন-হৃদয়া ভার্য্যা বিদ্যুল্লতার সহিত প্রেমালিঙ্গন করিবেন সে আনন্দ—;আর সেই আনন্দের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অনুতাপ বহ্নির জ্বলন্ত শিখারূপ যন্ত্রণা মিশিয়া তাঁহার হৃদয়কে বিচিত্র ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে—বদনে তাহার প্রতিবিম্ব বিভাসিত হইতেছে। কুসুমিত উপবনের একদিকে মেঘের ছায়া, অন্য দিকে সূর্য্যরশ্মি পাতে যেরূপ শোভা হইয়া থাকে—নরেন্দ্রের বদনে, নরেন্দ্রের নয়ন যুগলে সেই শোভা সপ্রকাশ হইয়াছে।

—··০০——

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামনগরে রাধাকান্তের বাটীতে আজ হুলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। প্রতিবাসীরা বহির্ব্বাটীতে অনবরত যাতায়াত করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিতে, যে নরেন্দ্র জীবিত নাই বলিয়া সকলেই বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিল—কত রোদন করিয়াছিল, রাধাকান্তের যে যোগ্যপুত্রের মরণ হেতু পল্লীর সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল—সেই নিরুদ্দেশ—আত্মীয়প্রবর পুনরায় বাটী আসিতেছেন, তাহাদের আহ্লাদ রাখিবার ঠাঁই নাই। বহির্ব্বাটীর কক্ষে পল্লীর কতিপয় বৃদ্ধ, কতকগুলি যুবা, আর নগেন্দ্র ও কাশীনাথ এবং পুরুষোত্তম সন্ন্যাসী রাজেন্দ্রের সহিত বসিয়া নরেন্দ্রের পুনরাগমন সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন।

রাজেন্দ্রের হৃদয় কি প্রভূত আনন্দে বাহ্যানুভূতি-হীন হইয়া এক এক বার উথলিয়া উঠিতেছে!—কথা কহিতে কহিতে অন্তমনস্কতা বশতঃ তাঁহার রসনা জড়াইয়া যাইতেছে, নয় তিনি এক কথা কহিতে অন্য কথা কহিয়া ফেলিতেছেন, এবং এক এক বার তথা হইতে উঠিয়া বহির্দ্বারে আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন—জ্যেষ্ঠ কত দূরে আসিতেছেন।

অন্তঃপুরে ততোধিক আনন্দরোল। পল্লীস্থ রমণীমণ্ডলী আসিয়া কৃপাময় ভব তারক ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতেছে—পরম পূজ্য তারকেশ্বরের নিকট পূজা মানসা করিতেছে, সর্ব্বশক্তিরূপা বিশ্বধাত্রী কালিকাকে ধন্য ধন্য করিতেছে, এবং যথা সুবাদে নরেন্দ্রের জননীকে, বিদ্যুল্লতাকে, রাজেন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ বা ধন্যবাদ করিতেছে। সকলেই বলিতেছে—নরেন্দ্রের জননীর শোকোচ্ছ্বাস, বিধবা বিদ্যুল্লতার বিরলে বসিয়া রোদনধ্বনি সুর-লোকে দেবাদিদেবের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল—তাই তিনি কৃপা করিয়া সাক্ষাৎ মৃতজনকেও পুনর্জ্জীবিত করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। কেহ যাইতেছে কেহ আসিতেছে, সকলেই পুলকিত চিত্ত—সকলেই হর্ষোৎফুল্ল-নেত্র। চক্ষে চক্ষে আনন্দাশ্রু, সকলের মুখে ঔৎসুক্য-সূচক 'কই' 'আসিয়াছেন', 'কখন আসিবেন' ইত্যাদি বাক্য।

নরেন্দ্রের জননী নিম্নতলস্থ কক্ষতলে অধোমুখে পতিত হইয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। সুরূপা ও অন্যান্য কয়জন রমণী তাঁহাকে ধরিয়া রোদন করিতেছে। দোতালার উপর স্বর্ণলতা একটী গবাক্ষদ্বারে বসিয়া প্রাঙ্গন বহির্দ্বারের দিকে চাহিয়া রোদন করিতেছেন। অন্য গবাক্ষে সেই শুভ্রবসনা বিধবাবেশিনী বিদ্যুল্লতা

নিস্পন্দভাবে প্রাঙ্গনের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার বদন-কমলের বিচিত্র ভাব বর্ণনার অতীত। নেত্রে অশ্রুর লেশ মাত্র নাই, অথচ নয়নদ্বয়ে আন্তরিক অনুরাগ, বিস্ময় ও আনন্দ, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে কথঞ্চিৎ দুঃখও সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সেই বিবিধ-ভাবাপন্ন মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া কে না বলিবে—তাঁহার হৃদয়-সাগরে বিবিধ বর্ণে বিবিধ চিন্তার বেলা উত্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক চিন্তাই বলবতী, প্রত্যেক চিন্তাই সুখকরী, প্রত্যেক চিন্তাই বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। হায়, তাঁহার চিত্ত কোন চিন্তাকেই পূর্ণতা লাভ করিতে দিতে পারিতেছে না—সুতরাং একপ্রকার বিহ্বলবৎ নিষ্পন্দনয়নে নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

বহির্ব্বাটীতে তখনি উচ্চৈরবে কোলাহল উঠিল—অন্তঃপুরে নরেন্দ্রের জননী "বাবা এলি রে!" বলিয়া উচ্চে রোদন করিয়া উঠিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রমণীবৃন্দও কাঁদিয়া উঠিল!

তখনই সাহেববেশী নরেন্দ্র হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করত "মা—আমি এসেছি" বলিয়া চরণ-তলে প্রণত হইলেন। তাঁহার জননী শশব্যস্তে উঠিয়া দৃষ্টিহীন অন্ধের ন্যায় হস্ত সঞ্চালনে নরেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। সুরূপা কাঁদিতে কাঁদিতে শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল। স্বর্ণলতা উপরতালা হইতে ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—বিদ্যুল্লতা ত্রস্তে গবাক্ষদ্বার হইতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার ঠেসাইয়া দিলেন।

নরেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজেন্দ্র ও নগেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন—নরেন্দ্র জননীর অঙ্কস্থ থাকিয়া উভয়ের হাত ধরিয়া সেইস্থানে বসাইলেন। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে ক্রন্দন-রোল শমিত হইল—সকলে একদৃষ্টে চাহিয়া নরেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের জননী "বাবা—নরেন,—এত দিন এ দুঃখিনী অভাগিনীকে কেমন করিয়া ভুলিয়া ছিলি'—বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের নয়ন অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। তাঁহার জননী পুনরপি কহিলেন, "বাছা—আমার প্রাণ শীতল হইল—যাও—একবার গিয়া অনাথিনী বাছা বিদ্যুল্লতাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর'। কিন্তু তখনই নরেন্দ্র উঠিতে পারিলেন না—মনে আসিল না কি বলিয়া বিদ্যুল্লতার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইবেন। তাঁহার জননী আবার তাঁহাকে উঠিতে বলিলেন—তিনি উঠিলেন—উপরে যাইতে যাইতে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি ধীরে ধীরে পদসঞ্চালন করত বিদ্যুল্লতার সেই কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বারের উপর তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিধবা-বেশে, সজল নয়নে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছেন—তাঁহার ভুজদ্বয় একত্রিত হইয়া বিলম্বিত, একটী পদ অগ্রে অপর পদ কিঞ্চিৎ পশ্চাতে বক্রীভূত—যেন পরক্ষণেই মূর্চ্ছিতা হইয়া তিনি পতিত হইবেন। নরেন্দ্রের হৃদয়ের সে অনুতাপ ঘুচিয়া কাতরতা উপস্থিত হইল—পতনোন্মুখ বিদ্যুল্লতাকে জড়াইয়া ধরিয়া "প্রিয়ে—" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।—বিদ্যুল্লতাও নরেন্দ্রের স্পর্শে যেন চমকিয়া উঠিয়া নরেন্দ্রের উরসে মস্তক রাখিয়া "তবে নাথ, কেন তখনই পরি—চয়—দাও নাই" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উপসংহার।

রাজেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল; রাজেন্দ্র এখন গৃহশূন্য। বিদ্যুল্লতার ভগ্নি হেমলতা বিবাহ যোগ্য হইয়াছে শুনিয়া নরেন্দ্র হেমলতার সহিত কনিষ্ঠের পুনরায় বিবাহ স্থির করিলেন। ইংলণ্ড গমন হেতু যথা বিহিত সামাজিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করণানন্তর নরেন্দ্র কনিষ্ঠের শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। কন্যার দায়ে কাশীনাথকে আর ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল না। তদনন্তর কুলগুরু পুরুষোত্তমকে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে হিমাচলে গিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন।

গিরিশচন্দ্র অনুতাপে দগ্ধ হইয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু বিদ্যুল্লতা ও নরেন্দ্রের চরণে ধরিলেন। নরেন্দ্র ও বিদ্যুল্লতাও তাঁহাকে সাদরে ও সস্নেহে পূর্ব্বমত আত্মীয় ও সুহৃদ বলিয়া পরিগণিত করিয়া লইলেন,—সেই অবধি গিরিশ ও স্বর্ণ তাঁহাদের চিরাগানুগত হইয়া রহিলেন।

বিদ্যুল্লতা গিরিশ ও স্বর্ণলতার সহযোগে উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করত সুপ্রপার বিধবা বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিয়া দিলেন।

কামিনী আপনার দোষ স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া নরেন্দ্র তাহাকে অন্য কোন কঠিন শাস্তি না দিয়া এবং অন্যত্র গিয়া পাছে বিদ্যুল্লতা সম্বন্ধে কুৎসা আন্দোলন করে ভাবিয়া, আপন জমীদারীর অন্তর্গত একটী অতিথিশালার দাসী করিয়া রাখিয়া দিলেন। কামিনীও কুপন্থা পরিত্যাগ করত ক্রমে ক্রমে বিলাসে উদাসিনী হইয়া উঠিল।

রমণী মণ্ডলীতে বিদ্যুল্লতার যশঃকীর্ত্তি, সহিষ্ণুতা এবং পাতিব্রত্যের ভূয়সী প্রসংশা রহিয়া গেল।

বিলাতে লেডী টি্ভিলিয়াম নরেন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর সহিত পুনর্ম্মিলন বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভে দম্পতি যুগলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠাইলেন।

স্বাধীনতা, সাম্য, সাম্প্রদায়িকতা।

(LIBERTY, EQUALITY, FRATERNITY.)

সম্প্রতি ইলবার্ট বিলের উপলক্ষে ভারতবাসী আর কিছু বুঝুক বা নাই বুঝুক ইহা তাহারা স্থির বুঝিয়াছে যে ইংরাজগণ মুখে যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতা, সাম্য এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। ইংরাজগণ এই কথা তিনটির বড় ভক্ত এবং এই অমূল্য মন্ত্র জগতে প্রচার করিতে নিতান্ত উৎসুক বলিয়া নিয়ত অভিমানী। ইংলণ্ডীয় চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলী এই মন্ত্রের গুরু এবং তত্রত্য জন সাধারণ তাঁহাদের শিষ্য। কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলনে আমরা জানিতে পারিলাম যে, এই মন্ত্র তাঁহাদের অনেকেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই—অনেকেই ইহা অভ্যাস করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সকলে এই স্বর্গীয় নীতি সুন্দররূপে বুঝিতে সক্ষম হউন বা না হউন, এই নীতি

অপূর্ব্ব উদারতায় পরিপূর্ণ এবং ইহা অসীম উচ্চতার নিকেতন।

এই ত্রিপদাত্মক নীতির মধ্যস্থ 'সাম্য' পদই সমগ্র নীতির মূল ও আধার। অপর দুই পদ ঐ পদের সহকারী মাত্র। দেখা যাইতেছে, মনুষ্য-সমাজ ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা বা শাসনের অধীন থাকিলে সে সমাজে সাম্য থাকে না। সকলের সাধারণ কার্য্যে ও সাধারণ ব্যাপারে সমান অধিকার থাকিলে সে সমাজে সাম্য হয়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সাম্য-নীতি বিস্তৃত করিবার জন্য অবশ্যই মনুষ্য-সমাজের ও মনুষ্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শাসন-ব্যাপারকে সমাজস্থ সকলেরই সমায়ত্ত করিয়া দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অতঃপর কাজেই এই সাম্য-নীতি হইতে স্বাধীনতার, অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য্য পরিচালিত করিবার অধিকার আপনিই আসিয়া পড়িতেছে। এই প্রসঙ্গ আমরা নিম্নে আরও বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

তাহার পর 'সাম্প্রদায়িকতার' কথা। এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম, মনুষ্য-সমাজ পরস্পর সম মতের বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ হওয়া। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ইহাও সাম্য-নীতির অন্যবিধ প্রয়োগস্থল মাত্র। কেননা প্রত্যেকে অপরকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতে হইলে অবশ্যই অগ্রে সে হীন কি মহৎ, উচ্চ কি অধম এ চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে; সুতরাং এ নীতির বিস্তারের সহিত প্রত্যেকের অপরকে সমান ভাবিতে হইবে। মত-সাম্যও সাম্যনীতির প্রকারভেদ মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাম্যই এই সমগ্র নীতির মূল মন্ত্র।

এই স্বাধীনতা, সাম্য, সাম্প্রদায়িকতা-নীতি যে স্বর্গীয় উদারতায় গঠিত তাহা আর পাঠক মহাশয়কে বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। মনুষ্য মনুষ্যকে সমান স্তরে দেখিবে, সমান বলিয়া ভাবিবে এবং আপনারই একজন বলিয়া জ্ঞান করিবে, ইহা প্রকৃতই অতি সুখের অবস্থা। আমরা যেরূপ কেন বুঝি না, আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্যদেব এই মহন্নীতি আংশিকরূপে বিবৃত করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রদত্ত উপদেশ ও শিক্ষার মধ্যে এই উদার নীতির 'স্বাধীনতা' অংশ পরিগৃহীত হয় নাই, কিন্তু তদ্ব্যতীত ইহার অন্যান্য অংশ প্রায়ই আধুনিক নীতির সহিত সমান ছিল। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী, স্বধর্ম্মাক্রান্ত বা বিধর্ম্মী নির্বিশেষে সকলকে সমান জ্ঞান করা, তাঁহার প্রধান উপদেশ—প্রধান শিক্ষা। সুতরাং এই নীতিই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের মূলমন্ত্র হইয়াছিল।

এই নীতির উদারতা ও উচ্চতা পরম প্রশংসনীয় হইলেও ইহা যে সকল স্থলেই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, আমরা এমন বিবেচনা করি না। প্রত্যুত সকল স্থলে সকল মনুষ্য এই নীতির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী হওয়া সম্ভব নহে। কারণ এই নীতি বুঝাইতে ও বলিতে যত মিষ্ট ও সহজ কার্য্যতঃ সেরূপ নহে। বিশেষতঃ ইহার সহিত স্বাধীনতা নীতির সম্মিলনে ইহাকে অনেক স্থলেই কার্য্যকালে অনুপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকাখণ্ডে এই নীতি বিস্তৃতরূপে পরিগৃহীত ও অবলম্বিত হইয়াছে বোধ হয়। কিন্তু এই প্রবর্ত্তনা অধিকদিনের নহে। আর কিছু দিন অতিবাহিত না হইলে ইহার ফল কি দাঁড়াইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না।

চৈতন্যদেবের অনুকরণে কেশব চন্দ্র সেন

মহাশয়ও এই নীতি রূপান্তরিত করিয়া প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা যে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

এই নীতি হইতে শুভাশুভ উভয়বিধ ফলই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইতে যে যে রূপ শুভ ফল সমুৎপন্ন হইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু ইহা হইতে কিরূপ অশুভ ফল জন্মে তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক। এই নীতি অবলম্বন করিয়া সময়ে সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজদ্রোহ এবং গুপ্তহত্যা ইত্যাদি কার্য্য ঘটিয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের সর্ব্বতোমুখী প্রাধান্য, অননুমোদিত রাজনৈতিক ব্যবহার বিশেষের আবির্ভাব, স্থল বিশেষে লোক বিশেষের বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রভৃতি এই নীতির বিপরীত হইলে এতদবলম্বিগণ তাদৃশ ব্যক্তি ও ব্যবহারের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইয়া উঠে। সুতরাং তাহার ফল নিতান্ত বিষময় হইয়া পড়ে এবং সময়ে সময়ে তাহা বহু শোণিত ক্ষয় ও সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। ইউরোপে, বিশেষত ফরাসী রাজ্যে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব (Revolution) সংঘটিত হয় তাহার বিবরণ ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণের অবিদিত না থাকিতে পারে। এই নীতিই সেই ভয়ানক কাণ্ডের প্রধান কারণ এবং শাসন ও সমাজ বিষয়ে বর্ত্তমান প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনই ঐ বিপ্লবের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

ইদানীন্তন কালে এই নীতির সমধিক আন্দোলন ও এতৎপ্রতি অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শিত হইতেছে, বলিয়া এই নীতি যে নিতান্ত আধুনিক তাহা বলা যায় না। বহুকাল পূর্ব্বে হবস্ (Hobbess), স্পিনোজা (Spinosa), রুসো (Rousseau), হেলভেসস্ (Helvetius), এবং ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ অল্প বা অধিক পরিমাণে এই নীতির উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় হবসের যুক্তি মূলেই ভ্রমাত্মক। তাঁহার মত যে মানবমাত্রেই কেবল বাল্যকালে নহে, তাহারা যাবজ্জীবন প্রধানতঃ সমানই থাকে। এ যুক্তি নিতান্ত ভ্রমময় তাহা সামান্য [illegible] ভজ্ঞতাও বুঝাইয়া দিতে পারে। তিনি এ[illegible]স্থলে বলিয়াছিলেন যে, প্রকৃতি পরিণত [illegible] ব্যক্তিদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্বন্ধে অল্প [illegible]র্থক্য ঘটাইয়াছে। ("Nature has ma[illegible] [illegible]ttle odds among men of mature ag[illegible] as to strength and knowledge.") কিন্তু [illegible]দের ও বুদ্ধির বিভিন্নতা ও তারতম্য অনবরতই নেত্রগোচর হয় না কি? পণ্ডিতবর হবস্ এস্থলে নিতান্ত সামান্য ভ্রমে পতিত হওয়ায় তাঁহার প্রস্তাব তাদৃশ লোকরঞ্জন হয় নাই, সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রুসো হবসের ভ্রান্তি সংশোধিত করিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনিও ভ্রমাত্মক যুক্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি প[illegible]রণত বয়স্ক ব্যক্তিগণের অসাম্যের বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়াছেন এবং জন্মকালে কিয়ৎপরিমাণে অসাম্য ঘটিয়া থাকে তাহাও তিনি এক প্রকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু মানবপ্রকৃতির ও মানবসমাজের নীচ রুচি ও জঘন্য স্বভাব এবং শিক্ষার তারতম্য তাদৃশ ব্যক্তিগত বৈষম্যের

কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজশাসনের এবম্বিধ বিরুদ্ধ কারণ সমূহের প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এবম্বিধ যুক্তি সমূহ প্রবর্ত্তিত হইবার বহুদিন পূর্ব্বে আমেরিকায় এই নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। তথায় ১৭৭৬ খৃঃ অব্দের 'স্বাধীনতাপ্রচার পত্রে' (Declaration of Indipendence) নিম্নোদ্ধৃত মতে উক্ত স্থান পাইয়াছিল,—'that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness &c.' ইহার মর্ম্ম এই যে, সকল মনুষ্যই সমানরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। সকলেই স্রষ্টার নিকট হইতে কতকগুলি অপরিহার্য্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই সকল অধিকারের মধ্যে জীবন, স্বাধীনতা, সুখানুসরণ প্রণালী ইত্যাদি প্রধান। কিন্তু কি পূর্ব্বলিখিত দার্শনিকগণের মত, কি আমেরিকার স্বাধীনতা প্রচার পত্রের মত কিছুই যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও বিশুদ্ধ নহে তাহা পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ রাজ্যের দ্বিতীয় নায়ক (Second President) জন এডামস্ (John Adams) মহাশয় এই ভ্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাহসিকতা ও দৃঢ়তাসহকারে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মার পশ্চাতোদ্ধৃত উক্তি আলোচনা করিলে ইহা আরও সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।—'That all men are born to equal rights is true. Every being has a right to his own as clear, as moral, as sacred, as any other being has. This is as indubitable as a moral government in the universe. But to teach that all men are born with equal powers and faculties, to equal influence in society, to equal property and advantages through life, is as gross a fraud, as glaring an imposition on the credulity of the people, as ever was practised by monks, by Druids, by Brahmans, by preists of the immortal Lama, or by the self-styled philosophers of the French Revolution. For honor's sake * * for truth and virtue's sake, let American philosophers and polititians despise it.' এই উক্তি দ্বারা উক্ত মহাত্মা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সকল লোকে সমান কৃতিত্ব ও সমান ক্ষমতা সহকারে জন্মপরিগ্রহ করত সমাজে আজীবন সমান প্রতিপত্তি ও পদপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, এবম্বিধ শিক্ষা ও উপদেশ নিরতিশয় অসার ও ঘৃণার্হ। তিনি আমেরিকার দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞগণকে ধর্ম্ম ও সম্মানের দোহাই দিয়া এই অসার মীমাংসা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) অনেকাংশে এই প্রকার মতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মানবের জন্মব্যাপার সমান হইলেও তাহাদের জীবনের ঘটনাপুঞ্জ ও কার্য্যপ্রণালী কখনই সমান নহে। মানবের পদ, গৌরব, ক্ষমতা, শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন, মান সকলের সমান হয় না, এবং বহু চেষ্টা বা যত্নেও মানব-সমাজ কখনই সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত হইতে পারিবে না, ইহা একপ্রকার স্থির কথা। ভারতীয় আর্য্যগণের জাতিভেদ প্রথা সামাজিক বৈষম্যের প্রধান কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু পৃথিবীর যে যে সমাজে আদৌ

জাতিভেদ নাই, তদ্রূপ সমাজেও বৈষম্যের কোন অভাব নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মানব-সমাজে বৈষম্য বিধিলিপি, সুতরাং অপরিহার্য্য। বৈষম্য যখন অপরিহার্য্য তখন সাম্য-নীতির সহিত স্বাধীনতা মিশাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। কারণ যদি মানব বল, বিদ্যা, বুদ্ধি আদিতে পরস্পর সমান না হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রত্যেকে স্বাধীনতা লাভে ও তৎপরিচালনে কিরূপে সমর্থ হইবে। যাহার ক্ষমতা নিতান্ত সামান্য সে বিশেষ সক্ষম ব্যক্তির সমান অধিকার কেমন করিয়া বজায় রাখিবে? অতএব এরূপ প্রণালীতে এ প্রশ্নের আলোচনা করিলে স্বাধীনতাকেও সাম্যের ন্যায় কাল্পনিক অবস্থা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু সমাজের যে সকল মানুষ হীনবল বা নির্ব্বোধ, তাহাদিগকে যদি কোন বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর মানবের সহিত সমান অধিকার দেওয়া যায় এবং তাহারা যদি উচ্চজ্ঞান সম্পন্ন মানবকে আপনাদের কল্যাণ চিন্তা করিবার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, তাহা হইলে কিয়ৎপরিমাণে সাম্য ও স্বাধীনতায় মিশিয়া চলিতে পারে। বর্ত্তমান কালে আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডেও কিয়ৎপরিমাণে এই প্রণালীতে কার্য্য চলিতেছে এবং তাহার ফল আপাততঃ নিতান্ত মন্দ ফলিতেছে না। এই উভয় সমাজেই সমাজভুক্ত মানববর্গ আপনাদের শাসন ও হিতসাধন ভার কতকগুলি নির্ব্বাচিত পারদর্শী ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছে। এই নির্ব্বাচনে তাহারা সকলেই সমান অধিকারী। এই স্থলে সাম্যের সহিত স্বাধীনতার মিশ্রণ হইল? কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা স্বাধীনতা তাহা এস্থলেও ঘটিল না—এস্থলে ঘটাও সম্ভবপর নহে। এরূপ স্থলে সমাজ ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছার অধীন রহিল না বটে, কিন্তু কয়েকজন নির্ব্বাচত ব্যক্তির শাসনের অধীন হইয়া পড়িল এবং সেই নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ তখন তাহাদের বিধি ব্যবস্থার কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। এইরূপ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্মিলন বহুফল প্রদ ও রাজোপাধিধারী ব্যক্তি বিশেষের সর্ব্বতোমুখী শাসনের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ এস্থলে সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের মত সমূহ শাসনকালে যেরূপ আলোচিত হইবার সম্ভাবনা এবং তাহাদের ইচ্ছার প্রাধান্য বিচার করিয়া কার্য্য হইবার যেরূপ সুবিধা, অপর স্থলে সেরূপ নাই। অতএব বর্ত্তমান কালে স্বাধীনতা, সাম্য ও সাম্প্রদায়িকতার যতদূর সম্মিলন সাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই প্রণালী যে সর্ব্বপ্রকারে অনুমোদনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা বহুকাল হইতে পরাধীনতার কঠিন ভারে নিপীড়িত—নিষ্পেশিত। এ সকল স্বর্গীয় অবস্থা—এ সকল অপার্থিব সৌভাগ্য আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই কল্পনার অতীত। আমরা যদি এই দেবদুর্ল্লভ অবস্থা লাভের জন্য লোলুপ হই, তাহা হইলে জগতের অন্যান্য জাতি হয়ত আমাদিগকে স্পর্দ্ধিত বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বভাগ্য-নিয়ন্তা ভগবান আমাদিগকে যে জাতির অধীনতায় পরিস্থাপিত করিয়া সুখী হইয়াছেন, তাঁহারা এই মহা সৌভাগ্যের অধিকারী—তাঁহারাসাম্য স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িকতা মন্ত্রের উপাসক। আজি তাঁহারা যদি চেষ্টা করিয়া—উপযুক্ত শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া, এবং আমাদিগের অস্থির ও শিশুবৎ চঞ্চল স্বভাবকে স্থির ও বলীয়ান

করিয়া সমাবস্থায় লইয়া না যান, তাহা হইলে ইহ পরত্র তাঁহারাই তিরস্কারভাগী হইবেন না কি? হে কর্ত্তব্যপরায়ণ, সাম্যাবতার রাজপুরুষগণ! আপনারা একবার—একবার মাত্র আপনাদিগের প্রসাদলোলুপ, একদা অশেষ সুখ-সৌভাগ্যশালী, অধুনা দীনহীন আর্য্য-সন্তানের এই বিনয়-নম্র প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া জগৎ সমক্ষে আপনাদিগের মহামহিমান্বিত নামের পরিচয় দিবেন কি?

শৈশব-মৃত্যু ও পীড়া।

শৈশবাবস্থায় কি উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে স্থূল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে বাল্যাবস্থার ও যৌবনের প্রারম্ভে স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার নিমিত্ত কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহার আলোচনা করা যাইবে। যে সমুদায় ঘটনা বা অবস্থা শিশু শরীরকে রুগ্ন করে বা শিশু প্রাণকে অকালে বিনষ্ট করে, তৎসমুদয় কিয়ৎপরিমাণে বালক বালিকারও শরীরকে অসুস্থ করে এবং তাহাদিগের অকাল মৃত্যুর কারণ হয়; কিন্তু সে সমুদায় বিষয়ের পুনরুল্লেখ না করিয়া, তৎসমুদায় কারণ ব্যতীত যে যে ঘটনা বাল্যাবস্থায় ও যৌবনের প্রারম্ভে শরীর ও মনের অসুস্থতা সম্পাদন করে, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

দেশীয় আচার ব্যবহার, সেই সমুদায় কারণের মূল বা তাহাদিগের পোষকতা করে, এবং দেশীয় লোকে এক মত হইয়া চেষ্টা করিলে ঐ সমুদায় কারণ দূরীভূত হইতে পারে; এ নিমিত্ত এ বিষয়টি এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। শিক্ষা ও বিবাহ এই দুইটিই বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থার প্রধান ঘটনা। ঐ দুই কার্য্যের জন্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। এই দুইটির মধ্যে শিক্ষার আরম্ভ প্রথমেই হয়, অতএব প্রথমে শিক্ষার বিষয়ই প্রথমে লেখা গেল।

শিক্ষা বিষয়ের সম্পূর্ণ প্রবন্ধ লেখা মাদৃশ ব্যক্তির সাধ্যাতীত, এ নিমিত্ত শিক্ষার অন্যান্য ফলাফলের বিষয় উল্লেখ না করিয়া শিক্ষার সময় কি পরিমাণে ও কি কারণে স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে শিক্ষার দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হইতে পারে তাহাই লিখিত হইবে।

অবান্তর ভেদে শিক্ষা ত্রিবিধ, যথা—জ্ঞান-শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা ও ব্যায়াম-শিক্ষা। শিক্ষার কিয়দংশ গৃহজাত কিয়দংশ বিদ্যালয়জাত, আর কিয়দংশ সংসর্গজাত। জ্ঞানশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও ব্যায়ামশিক্ষা এই তিন প্রকার শিক্ষা সামঞ্জসীভূত না হইলে যথার্থ উন্নতি হইতে পারে না। গৃহজাত, বিদ্যালয় জাত ও সংসর্গজাত শিক্ষার মধ্যে প্রথমোক্ত সর্ব্বপ্রধান। সর্ব্বাগ্রে উহার আরম্ভ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান। অনু-

পযুক্ত শিক্ষা দ্বারা যে নানাপ্রকারে শরীর ও মনের অনিষ্ট সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালী এপর্য্যন্ত দোষশূন্য হয় নাই। এনিমিত্ত অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বদেশের হিতসাধনের নিমিত্ত আধুনিক প্রথার দোষ প্রদর্শন করিতেছেন ও উন্নতির উপায় দর্শাইতেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ও কি উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; শরীর ও মনের সম্বন্ধ কি তাহাও অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? কেবল অর্থোপার্জ্জন করা, বা যশস্বী হওয়া, বা বিদ্যাবান্ হওয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। মানব জন্মের সফলতা সম্পাদন করা ও মনুষ্যের সমুদায় অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে সক্ষম হওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশীয় লোকের অবস্থা এতদূর শোচনীয় যে, প্রায়স কলেই অর্থোপার্জ্জন দ্বারা দরিদ্রতা মোচন করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে যে শিক্ষা (যেরূপ শিক্ষা সচরাচর দেওয়া হইয়া থাকে) লাভ করিয়াও অনেকে কি পিতা মাতার, কি আপনার দুঃখও দূর করিতে সক্ষম নহেন; এবং অনেকে অশিক্ষিত থাকিয়াও ধনবান হইতেছেন ও অর্থের সদ্ব্যবহারও করিতেছেন। কেহ কেহ শিক্ষিত হইয়াও যশস্বী না হইয়া দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতি হইতেছেন এবং আপনাকে ও স্বজনবর্গকে চিরকালের নিমিত্ত শোক-সাগরে নিপতিত করিতেছেন। আর কতকগুলি ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্যাতি লাভ করত জনসমাজে বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত হইয়াও পরে নিশ্চেষ্ট ও নির্জ্জীব প্রায় হইয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। এই সমুদায় নৈরাশ্যজনক ঘটনার মূল কারণ কি? শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য বিষয়ে অজ্ঞতাই ইহার মূল কারণ। ঐ বিষয়ে সুবিখ্যাত মহামতি স্পেন্‌সার সাহেব তাঁহার শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "শরীরের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়; কি প্রকারে বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়; কি প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়; কি প্রকারে পৌরজনের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়; সুখের নৈসর্গিক কারণ সমূহকে কি রূপে ব্যবহার করিতে হয়; আপনার ও অন্যের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত মনোবৃত্তি সমুদায়কে কি প্রকারে নিয়োজিত করিতে হয়, অর্থাৎ কি প্রকারে সম্পূর্ণ রূপে জীবন ধারণ করিতে পারা যায় এই সমুদায় বিষয় আমাদিগের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; অতএব ঐ সমুদায় বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মান অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ রূপে জীবিত থাকিতে প্রস্তুত করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

কি উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? যে শিক্ষা-প্রণালী শরীর ও মনের উন্নতি সাধন না করিয়া তাহাদিগকে জীর্ণ ও রুগ্ন করে এবং যাহা বালক বালিকার অকাল মৃত্যুর সহায়তা করে, সে শিক্ষা-প্রণালী কখন সুপ্রণালী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এদেশীয় শিক্ষা-প্রণালীই শিক্ষিতগণের চির রোগ, অকর্ম্মণ্যতা, শরীর ও মনের নিশ্চেষ্টতা এবং ভয়ানক বাল-মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকে অপরিপুষ্ট দেহ ধারণ

করেন; এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অতি অল্প কালের মধ্যে কোন না কোন গুরুতর রোগগ্রস্ত হইয়া, কঠোর পরিশ্রম সহ বিদ্যাভ্যাসের ক্লেশজনক ফলভোগ করিতে থাকেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষাই এদেশের প্রধান শিক্ষা; এবং এদেশীয় বিদ্যালয় সমূহের নিয়মাবলী প্রায়ই স্বাস্থ্য সঙ্গত নহে।

বিদ্যালয় ও শিক্ষকের উপর সন্তানের শিক্ষার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া পিতা মাতাগন নিশ্চিন্ত থাকেন; মনে করেন সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার সহিত তাঁহাদিগের বুঝি আর কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ঐরূপ মনে করাই যে মহা অনিষ্টের মূলীভূত তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। সন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে মহামান্য স্পেনসার সাহেব বলিয়াছেন যে, "সহস্র সহস্র সন্তান যাহারা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, আর লক্ষ লক্ষ যাহারা দুর্ব্বল ও রুগ্নশরীর লইয়া জীবিত থাকে, এবং কোটি কোটি যাহারা যতদূর বলিষ্ঠ হওয়া উচিত তদপেক্ষা অল্প বলিষ্ঠ হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, এই সমুদয় একত্র করিলে শরীর বিধানাজ্ঞ মাতা পিতা দ্বারা সন্তানের কি পরিমাণ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ অনুমান হইতে হইবে।"

"যখন পুত্র কন্যাগণ দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হয়," পিতামাতাগন মনে করেন যে ঐ রূপ ঘটনা কেবল দুর্ভাগ্যের ফল; বিধাতার শাপ। তাঁহারা সাধারন মতানুসারে বিবেচনা করেন যে, এই সমুদায় ঘটনার কারণ নাই, যদি কোন কারণ থাকে তাহা অস্বাভাবিক; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কখন কখন সন্তানগণ জনক হইতে উহার কারণ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অধিক জননীর অজ্ঞতা জনিত আচরণই তাহাদিগের কারণ হইয়া উঠে।" নীতি বিষয়ক শিক্ষা ও ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে পিতা মাতার অজ্ঞতার ফল নিশ্চয়ই ফলিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিক্ষা ত্রিবিধ, তন্মধ্যে গার্হস্থ শিক্ষাই সর্ব্ব প্রধান। পিতা মাতার নিকট ব্যতীত যথার্থ শিক্ষার আরম্ভ হয় না, অতএব সন্তানকে বাস্তবিক শিক্ষাদান করিতে হইলে প্রত্যহ কতক সময় আপনার নিকট বসাইয়া শিক্ষা দেওয়া অতি আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। প্রায় সকল পিতা মাতাই আপনার সন্তানকে কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন, ও বিশেষ বিদ্বান ও বিদ্যাবতী হইলে অনায়াসেই অল্প বয়স্ক বালক বালিকার উপযুক্ত শিক্ষাদান করিতে পারেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। পিতা অপেক্ষা মাতার দ্বারাই শিশু সন্তানের শিক্ষাদান সুসম্পন্ন হইতে পারে। যখন পিতা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হেতু বাটী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তৎকালে সন্তানগণ কেবল মাতার নিকটে থাকে এবং মাতা যেরূপ কার্য্য করেন, যেরূপ উপদেশ দেন, যেরূপ আদেশ করেন, সন্তানগণ তাহারই অনুসরণ বা তদনুসারেই কার্য্য করে। অতএব সন্তানের শিক্ষার সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিশেষ কঠিন ও অধিকতর দায়যুক্ত।

বাল্যশিক্ষার উপায় সম্বন্ধে বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মত নিম্নে সংগৃহীত হইল। স্বাভাবিক নিয়মের সহিত ঐক্য রাখিয়া শিক্ষাদান করাই পিতা মাতার পক্ষে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা; অর্থাৎ শরীর-বিধান শাস্ত্রের "আজ্ঞানুবর্ত্তী" হওয়া কর্ত্তব্য; তদ্দারা সন্তান নীরোগ ও বলিষ্ঠ

এবং সুস্থচিত্ত হইয়া যথানিয়মে বর্দ্ধিত হইতে পারে। এ নিমিত্তঅতি অল্প বয়সেই সন্তানের শিক্ষারম্ভ করা আবশ্যক। এই সময়েই অতি ধীর ভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রত্যেক বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে হইবে, অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে শিক্ষার কঠিন আকার থাকিবে না।" (ট্যানার, বাল-চিকিৎসা, ৩৫ পৃঃ)।

"যে সমুদায় শিক্ষা-প্রণালীতে শিশুগণের মনের বিকাস হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে পাঠাভ্যাস করিতে বাধ্য করে, সে সমুদায়ই মন্দ এবং যাহাতে শিশুগণের বোধগম্য বিষয় না বুঝাইয়া কেবল শিখিতে আদেশ করে তাহা আরও মন্দ।" (ডাক্তার লিনকন বক্, স্বাস্থ্যরক্ষা ২য় পুস্তক, ৬১৫ পৃঃ)।

ডাক্তার চভ্যাসি "জননীর প্রতি উপদেশ" নামক পুস্তকের ১৩১ পৃষ্ঠায় শিশু পাঠশালার পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন যে, "শিশু-পাঠশালার বিদ্যার অপেক্ষা স্বাস্থ্য বিষয়ে অধিকতর দৃষ্টি করা হইলেই বড় উত্তম হয়। শিশুগণকে কেবল ৩। ৪ ঘণ্টা মাত্র পাঠশালায় রাখিবে ও তাহারা যে অতি অল্প অপরিমাণে শিক্ষা করিবে, তাহা যেন পরিশ্রমের সহিত না হইয়া আমোদচ্ছলে শিক্ষিত হয়।' বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা বাটীতে শিক্ষা দেওয়া অধিক আদরণীয় ও বাঞ্ছনীয়, কারণ বাটীতে সন্তান সতত তোমার (মাতার) চক্ষের উপর থাকে। পাঠশালায় দুষ্ট শিশুগণের সহিত মিলিয়া সেও দুষ্ট হইতে পারে; এবং বিদ্যালয়ে মস্তিষ্কের অধিক ও পাক-যন্ত্রস্থ পেশীর অল্প চালনা হইবার সম্ভাবনা।" অর্থাৎ পাঠশালায় বদ্ধ থাকিয়া শিশুরা যথেচ্ছ অঙ্গচালনা করিতে ও ক্ষুধার সময় আহার করিতে পায় না এবং অযথোচিত মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর রুগ্ন করিয়া ফেলে।

শিশুর শরীর যেরূপ ক্রমে ক্রমে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহার মনও তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন শিশুকে দুই তিন বৎসর অবধি ক্রমাগত শয্যায়, ক্রোড়ে বা দোলনায় শায়িত রাখিলে যেরূপ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না, সে শিশু যেমন উপযুক্ত সময়ে চলিতে পারে না, সে যেমন আপন হস্তপদাদির নির্ভর দিতে পারে না, সেই রূপ তাহার মনও ঔৎসুক্যহীন, নিশ্চেষ্ট ও স্থূল বুদ্ধি হইয়া পড়ে, এবং সে কোন বিষয় শীঘ্র বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শিশুর দৈহিক পুষ্টির নিমিত্ত যেমন উপযুক্ত ভোজন পান ব্যতীত অঙ্গ সকলের চালনা আবশ্যক, তদ্রূপ মানসিক পুষ্টির নিমিত্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশুদ্ধ বায়ু ব্যতীত মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের চালনাও আবশ্যক, অর্থাৎ সুদৃশ্য দর্শন, সুশ্রাব্য শ্রবণ, সুগন্ধ আঘ্রাণ ও পদার্থের গুণ গ্রহণ, এবং ভক্তি, দয়া, স্নেহ, আনন্দ ইত্যাদি সুবৃত্তি সকল চালনার উদাহরণ পাওয়া আবশ্যক। ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু যেমন চলিতে বা দৌড়িতে পারে না, উহার মনও সেইরূপ শীঘ্র কোন বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। প্রথমে কয়েক দিবস পরে শিশুর বর্ণজ্ঞান জন্মে এবং স্বাদ গ্রহণ করিতে ক্ষমতা হয়। প্রথমে সকল বিষয়েই তাহার স্থূল জ্ঞান জন্মে, ক্রমে মস্তিষ্ক যেমন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে, জ্ঞানও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ভ্রম সকলও সংশোধিত হয়। অতএব শৈশবাবস্থায় সন্তান অধিক বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিল না, মনে করিয়া ক্ষুব্ধ বা রাগান্বিত না হইয়া, বরং যাহাতে তাহার শরীর

স্বল ও সুস্থ থাকে এবং মস্তিষ্কের অধিক চালনা না হইতে পায় এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শৈশবে কোন শিক্ষাই দিতে হইবে না এমত নহে; ধীরে ধীরে তাহাদিগের মনে বহুবিধ বিষয়ের সাধারণ ও স্থূল জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বোধ হয় সকল মাতা পিতাই কতক পরিমাণে তাহা করিতে পারেন; কেবল ক্রোধ রিপুর দমন করিতে পারিলেই এটি সুসম্পন্ন হয়।

ক্রমশঃ।

ন্যায়-দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য বিচার।

জ্ঞেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব এবং বস্তুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্রব্যআদি সপ্ত-পদার্থেরই সধর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞেয়ত্ব আদি ধর্ম্ম এই সাত প্রকার পদার্থেই বিদ্যমান আছে।

জ্ঞেয়ত্ব অর্থ জ্ঞানের বিষয়ত্ব, অর্থাৎ এই সমস্ত পদার্থেতে যে ধর্ম্ম থাকাতে সমস্ত পদার্থই আমরা জানিতে পারি তাহার নাম জ্ঞেয়ত্ব। যে বস্তু জ্ঞানের বিষয় হয় তাহার নাম জ্ঞেয়। জ্ঞেয় পদার্থের যে ধর্ম্ম তাহার নাম জ্ঞেয়ত্ব।

বাচ্যত্ব অর্থে বাক্যের বিষয়ত্ব বুঝায়। অর্থাৎ বস্তু সকলের যে ধর্ম্ম থাকাতে এই সমস্ত বস্তুকেই বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারা যায় তাহার নাম বাচ্যত্ব। যে বস্তু বাক্যের বিষয় তাহাকে বাচ্য এবং তাহার ধর্ম্মের নাম বাচ্যত্ব কহে।

প্রমেয়ত্ব অর্থে প্রমার বিষয়ত্ব; অর্থাৎ পদার্থ সমুদায়ের যে ধর্ম্ম থাকাতে সমুদায় পদার্থই আমরা যথার্থরূপে অনুভব করিতে পারি তাহার নাম প্রমেয়ত্ব। প্রমা অর্থে যথার্থ অনুভব বুঝায়। সেই প্রমার যে বিষয় তাহার নাম প্রমেয় এবং তাহার যে ধর্ম্ম তাহার নাম প্রমেয়ত্ব।

অভিধেয়ত্ব অর্থে অভিধা বিষয়ত্ব। অর্থাৎ পদার্থ সমুদায়ের যে ধর্ম্ম থাকাতে সেই সেই পদার্থের নামে সেই সেই পদার্থ চিনিতে পারা যায় তাহার নাম অভিধেয়ত্ব। অভিধার অর্থ শব্দ-শক্তি। যাহাতে অভিধা অর্থাৎ শব্দের শক্তি আছে তাহাকে অভিধেয় এবং তাহার যে ধর্ম্ম তাহাকে অভিধেয়ত্ব কহে।

বস্তুত্ব অর্থে বস্তুর ধর্ম্ম, অর্থাৎ যাহাদ্বারা বস্তুকে বস্তু বলিয়া প্রতীতি জন্মায়।

এই জ্ঞেয়ত্ব আদি ধর্ম্মের একটি সাধারণ নাম কেবলান্বয়ী। কেবলান্বয়ী অর্থে অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী; অর্থাৎ সর্ব্বত্র স্থায়ী বুঝাইবে।

দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য এবং বিশেষ এই পঞ্চবিধ ভাব-পদার্থের সাধর্ম্ম্য অনেকত্ব এবং সমবায়িত্ব; অর্থাৎ ইহারা অনেক ও সমবায় সম্বন্ধের বিষয়।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থের সাধর্ম্য সত্তাশ্রয়ত্ব, অর্থাৎ ইহারা সত্তা অর্থাৎ পরা জাতির আশ্রয়।

গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্য গুণ-রহিতত্ব এবং ক্রিয়া-রহিতত্ব। অর্থাৎ এই ছয় পদার্থেতে গুণ কিম্বা ক্রিয়া থাকিতে পারে না।

সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই চারি পদার্থের সাধর্ম্য সামান্য-রহিতত্ব অর্থাৎ সামান্যাদি পদার্থে সামান্য পদার্থ থাকিতে পারে না।

পারিমাণ্ডল্য ভিন্ন সমস্ত পদার্থের সাধর্ম্য কারণত্ব। অর্থাৎ পারিমাণ্ডল্য ভিন্ন সমস্ত বস্তুই অন্য কোন না কোন বস্তুর কারণ হইতে পারে, কিন্তু পারিমাণ্ডল্য কাহারও কারণ হইতে পারেনা। পারিমাণ্ডল্য অর্থে পরমাণুর পরিমাণ। যে পদার্থ ভিন্ন যাহা হইতে পারেনা তাহাকে ঐ পরবর্ত্তী পদার্থের কারণ কহে। পরমাণুর পরিমাণ যে অন্য কোন পদার্থের কারণ হইতে পারে না কেন তাহা পরে বলা যাইবে।

কারণত্বের নিরূপণ।

অন্যথাসিদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল হইতে ঐ কার্য্যের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত তৎকার্য্যের অধিকরণে নিয়ত অভাবের অপ্রতিযোগী যে পদার্থ তাহার নাম কারণ; অথবা অন্যথা-সিদ্ধিরূপ দোষরহিত অথচ নিজের কোন ব্যাপার-বত্তা হেতুক কার্য্য সামানাধিকরণে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী যে পদার্থ তাহারই নাম কারণ। বস্তুতঃ যে পদার্থের বিদ্যমানে ও অবিদ্যমানে কার্য্যের বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা হয় সেই পদার্থই কারণ; ঐ কারণের যে ব্যাপারে অর্থাৎ যে ধর্ম্ম থাকাতে ঐ কারণকে তত্তৎ কার্য্যের কারণ বলিয়া প্রতীতি জন্মায় সেই ধর্ম্মকে কারণত্ব কহে।

সেই কারণ তিন প্রকার। যথা;—সমবায়ী কারণ, অসমবায়ী কারণ এবং নিমিত্ত কারণ।

যাহাতে সমবেত হইয়া, অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহার নাম সমবায়ী কারণ, এবং তাহার ধর্ম্মের নাম সমবায়িকারণত্ব। যেমন ঘটের উৎপত্তি কার্য্যে কপাল কপালিকা সমবায়ী কারণ; বস্ত্রের উৎপত্তি কার্য্যে সূত্র সমবায়ী কারণ।

ঐ সমবায়ী কারণে আসন্ন অর্থাৎ মিলিত যে অপর কারণ তাহার নাম অসমবায়ী কারণ এবং তাহার ধর্ম্মের নাম অসমবায়ী কারণত্ব। যেমন ঘটের উৎপত্তি কার্য্যে সমবায়ী কারণ যে কপাল কপালিকা, এবং সেই কপাল কপালিকাতে আসন্ন অপর কারণ যে ঐ কপাল কপালিকার সংযোগ, সেই সংযোগই অসমবায়ী কারণ। সেইরূপ বস্ত্রাদির উৎপত্তি কার্য্যে সূত্র প্রভৃতির সংযোগাদি অসমবায়ী কারণ।

উক্ত উভয় কারণ ভিন্ন অন্য যে কারণ তাহার নাম নিমিত্ত কারণ এবং তাহার ধর্ম্ম নিমিত্ত কারণত্ব। ঘটের প্রতি দণ্ড আদি এবং বস্ত্রের প্রতি তন্ত্র আদি নিমিত্ত কারণ এবং দণ্ডত্ব, তন্ত্রত্বাদি নিমিত্ত কারণত্ব।

অন্যথাসিদ্ধ অর্থ।

যাহার কারণত্ব কল্পনা ব্যতিরেকেও অন্য প্রকারে কার্য্য সিদ্ধ হয় তাহার নাম অন্যথা-সিদ্ধ এবং উহার, ধর্ম্মের নাম অন্যথাসিদ্ধি।

অন্যথাসিদ্ধের প্রকারভেদ।

সেই অন্যথাসিদ্ধ পাঁচ প্রকার। কারণের যে ধর্ম্মের সঙ্গে একত্র এক সময়েই কারণের প্রতি কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তিতা অর্থাৎ কারণতা জ্ঞান হয়, অথবা যে ধর্ম্ম কারণতাবচ্ছেদক হয় অর্থাৎ যে ব্যাপারবশতঃ কারণকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় সেই ব্যাপার রূপ ধর্ম্মই প্রথম অন্যথাসিদ্ধ। যথা—ঘটের উৎপত্তি কার্য্যে চক্র কারণ, এখানে চক্রত্বরূপ চক্রের ঘূর্ণন ব্যাপার অন্যথাসিদ্ধ। যেহেতু ঘট নির্ম্মান কার্য্যে চক্রের যে ঘূর্ণন ব্যাপার আছে, সেই ব্যাপারের অর্থাৎ চক্রের চক্রত্বরূপ সেই ঘূর্ণন ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই চক্রের পূর্ব্ববর্ত্তিতা হয়; কিন্তু চক্রের কারণতা কল্পনাতেই কার্য্য সিদ্ধি হয়, চক্রত্বের কারণতা কল্পনা গৌরবমাত্র। অতএব অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া তাহাকে কারণ শ্রেণী হইতে পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

কারণের পূর্ব্ববর্ত্তিতা দ্বারা যাহার পূর্ব্ববর্ত্তিতা হয় তাহার নাম দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ, যথা, দণ্ডের রূপ। যেহেতু দণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তিতা দ্বারাই দণ্ডরূপের পূর্ব্ববর্ত্তিতা হয়, কিন্তু তাহার কারণতাকল্পনায় প্রয়োজনের অভাব জন্মে অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া তাহাকে কারণের মধ্যে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

অন্যের প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতা জ্ঞান হইলে যাহার প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতা জ্ঞান হয় তাহার নাম তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ. যথা—আকাশ, আকাশ শব্দের সমবায়ী কারণ বলিয়া শব্দের প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতা জ্ঞান না হইলে আকাশের প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতা জ্ঞান হয় না বা হইতে পারে না। অতএব ঐ আকাশকেও ঐ ঘটোৎপত্তি কার্য্যের কারণ কল্পনা করিলে কোন ফলাফল নাই, সুতরাং কারণের লক্ষণে 'অন্যথাসিদ্ধ ভিন্ন' এই বিশেষণ পদটি থাকাতে ঘট নির্ম্মাণ কার্য্যে আকাশ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিয়াও কারণের শ্রেণী হইতে তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কারণের প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতা-জ্ঞান ব্যতিরেকে যাহার প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতা জ্ঞান না হয় তাহার নাম চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ; যেমন ঐ ঘটনির্ম্মাণে কুলালের জনক, কিম্বা দণ্ডের জনক অথবা চক্রের জনক ইত্যাদি। যেহেতু ঐ ঘটাদি কার্য্যে কুলালাদির জনক প্রভৃতি নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিলেও ঐ কার্য্যে কুলাল প্রভৃতির জনকের পূর্ব্ববর্ত্তিতা জ্ঞান ঐ কুলাল কিম্বা দণ্ড প্রভৃতির কারণের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান ব্যতিরেকে হইতে পারে না, অতএব ইহারও কারণতা কল্পনা অপ্রয়োজন এবং গৌরব হেতু চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া ইহাকেও কারণতার লক্ষণের লক্ষ্যতা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

উক্ত অন্যথাসিদ্ধ চতুষ্টয় হইতে অতিরিক্ত এবং নিয়ত আবশ্যক পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেও ভিন্ন অথচ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী যে পদার্থ, তাহার নাম পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ। যথা—ঘটাদি কার্য্যে রাসবাদি। এই পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধই প্রধান। যেহেতু ঘটাদি কার্য্যে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের এই লক্ষণ ঐ কার্য্য সামাধিকরণে কোন প্রকারে রাসবেরও পূর্ব্ববর্ত্তিতা ঘটিলে অর্থাৎ রাসব নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে ঐ কার্য্য নিষ্পাদন বিষয়ে রাসবের কোন অপেক্ষা না থাকিলেও কার্য্যতঃ না হউক, লক্ষণের অর্থে রাসবের প্রতিও কারণতার জ্ঞান জন্মাইয়া লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়া যায়। অতএব ঐ কারণের লক্ষণে 'অন্যথাসিদ্ধ ভিন্ন' এই বিশেষণ দিয়া ঐ লক্ষণকে নির্দ্দোষ করা হইয়াছে।

কোন্ কোন্ পদার্থের কি কি সাধর্ম্ম্য,

এই কথার বিচার করিতে করিতে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরিমাণত্ব ভিন্ন সমস্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য কারণত্ব; তদনন্তর প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে কারণতার অর্থ জানা গেল।

আবার ঐ কারণতার মধ্যে সমবায়ী কারণতা দ্রব্য-পদার্থের সাধর্ম্ম্য, এবং অসমবায়ী কারণতা গুণ ও কর্ম্ম এই উভয় পদার্থেরই সাধর্ম্ম্য।

নিত্যদ্রব্য ভিন্ন আশ্রিতত্ব সকল পদার্থেরই সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য কাহারও আশ্রিত হয় না, কিন্তু অন্যের আশ্রয় হয়।

পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্‌ ও আত্মা এই পাঁচটি নিত্যদ্রব্য; এবং পৃথিবী আদি নয়টি দ্রব্য-পদার্থের সাধর্ম্ম্য দ্রব্যত্ব ও গুণাশ্রয়ত্ব।

পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি পদার্থের সাধর্ম্ম্য পরত্ব, অপরত্ব, মূর্ত্তত্ব, ক্রিয়াশ্রয়ত্ব ও বেগাশ্রয়ত্ব।

যে পদার্থের পরিমাণের সীমা হয় তাহার নাম মূর্ত্ত।

কাল, আকাশ, আত্মা ও দিক্‌ এই চারি দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য সর্ব্বগতত্ব অর্থাৎ বিভুত্ব এবং পরম মহত্ত্ব।

সর্ব্ব মূর্ত্তের সংযোগ বিশিষ্ট যে পদার্থ তাহার নাম বিভু। পরমমহত্ব অর্থে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিমাণবত্ত্ব।

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্ম্য ভূতত্ব, অর্থাৎ ইহারা ভূত নামে খ্যাত।

যে বাক্য দ্বারা লক্ষ্য এবং লক্ষ্যেতরের ভেদের অনুমান জন্মায় তাহার নাম লক্ষণ। সেই লক্ষণ দুই প্রকার;—স্বরূপজ্ঞাপক ও পারিভাষিক। লোমযুক্ত লাঙ্গুলবত্ত্ব পশুত্ব, গলকম্বলাদি বিশিষ্টত্ব—গোত্ব, এক খুরবত্ত্ব অশ্বত্ব এবং শাখাপল্লবাদি বিশিষ্টত্ব—বৃক্ষত্ব ইত্যাদি লক্ষণ ঐ পশুত্ব প্রভৃতির স্বরূপজ্ঞাপক। ভূতত্ব আদির লক্ষণ পারিভাষিক।

ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য স্পর্শবত্ত্ব অর্থাৎ ইহারা স্পর্শ গুণের আশ্রয়।

উক্ত ক্ষিতি আদি চারি দ্রব্যেরই আর একটি সাধর্ম্ম্য দ্রব্যারম্ভকত্ব, অর্থাৎ এই চারি দ্রব্য হইতেই দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হইতে পারে। স্থূল কথায় এরূপ বলা যায় যে, দ্রব্যারম্ভকত্ব অর্থে দ্রব্যান্তর উৎপন্ন করিবার শক্তি। ঐ শক্তি অর্থাৎ দ্রব্যারম্ভকতা শক্তি উল্লিখিত দ্রব্য-পদার্থচতুষ্টয়ের সাধর্ম্ম্য।

আকাশ ও আত্মা এই দুই পদার্থের সাধর্ম্ম্য অব্যাপ্য বৃত্তি অথচ ক্ষণিক বিশেষ গুণের আশ্রয়ত্ব—অর্থাৎ আকাশ ও আত্মার যে বিশেষ গুণ সে গুণ অব্যাপ্যবৃত্তি অথচ ক্ষণিক। এক দেশাবচ্ছেদে যাহার উৎপত্তি ও অন্যদেশাবচ্ছেদে অভাব অর্থাৎ যে এক নির্দ্দিষ্ট ব্যাপ্য স্থানে বর্ত্তমান না থাকে তাহার নাম অব্যাপ্যবৃত্তি। এবং যাহার প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংস হয় তাহার নাম ক্ষণিক। যেমন—আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ; আকাশের কোন দেশাবচ্ছেদে শব্দের উৎপত্তি হয় ও কোন দেশাবচ্ছেদে অভাব থাকে, এবং শব্দের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে বিনাশ হয়। অতএব শব্দকে অব্যাপ্যবৃত্তি ক্ষণিক বিশেষ গুণ বলা যায়।

সেইরূপ আত্মার বিশেষ গুণ যে জ্ঞানাদি, ঐ জ্ঞান আদিরও আত্মাতে শরীরাবচ্ছেদে উৎপত্তি, ঘটাবচ্ছেদে অভাব এবং প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি এবং তৃতীয় ক্ষণে বিনাশ হয়।

ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ এই তিন দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য রূপবত্ত্ব, দ্রবত্ববত্ত্ব ও প্রত্যক্ষ্যবিষয়ত্ব; অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি তিন দ্রব্য রূপবিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষের বিষয়।

ক্ষিতি এবং অপ এই দুই দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য গুরুত্ব ও রসবত্ত্ব, অর্থাৎ এই দুই দ্রব্য ভার-বিশিষ্ট ও রসবিশিষ্ট হয়।

ক্ষিতি এবং তেজ এই দুই দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য নৈমিত্তিক দ্রব্য অর্থাৎ এই দুই দ্রব্য কারণবশতঃ দ্রব হইতে পারে।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা এই ছয় দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য বিশেষ গুণা-শ্রয়ত্ব অর্থাৎ ইহারা প্রত্যেকেই এক এক বিশেষ গুণের আশ্রয় হয়।

এই সাধর্ম্ম্য কথন প্রকরণে যাহার যাহার যে সাধর্ম্ম্য বলা গেল তদ্ভিন্ন অপরের তাহা বৈধর্ম্ম্য বুঝিতে হইবেক।

এক্ষণে কোন্ দ্রব্যের কত প্রকার গুণ আছে, তাহা বলা যাইতেছে।

স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও গন্ধ ক্ষিতির এই চতুর্দ্দশ গুণ।

উক্ত চতুর্দ্দশের মধ্যে গন্ধ ভিন্ন অপর ত্রয়োদশ এবং স্নেহ, এই চতুর্দ্দশ গুণ জলের।

পূর্ব্বোক্ত স্পর্শ অবধি অপরত্ব পর্য্যন্ত আট এবং রূপ, দ্রবত্ব ও বেগ এই একাদশ গুণ তেজের।

উক্ত একাদশের মধ্যে রূপ ও দ্রবত্ব ভিন্ন অবশিষ্ট নয়টি গুণ বায়ুর।

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ ও শব্দ, আকাশের এই ছয়টি গুণ।

শব্দ ভিন্ন উক্ত অবশিষ্ট পাঁচটি গুণ কাল ও দিকের।

দেহী অর্থাৎ আত্মা দুই প্রকার,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা; তাহার মধ্যে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবকত্ব, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জীবাত্মার এই চতুর্দ্দশ গুণ। এবং সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও যত্ন পরমাত্মার এই আট গুণ।

পরত্ব, অপরত্ব, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ ও বেগ মনের এই আট গুণ।

দ্রব্য-পদার্থ সকলের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

ক্ষিতি।

যে দ্রব্য গন্ধগুণের সমবায়ী কারণ অর্থাৎ যে দ্রব্যের বিশেষ গুণ, গন্ধ, তাহার নাম ক্ষিতি। সেই গন্ধ দুই প্রকার; সৌরভ ও অসৌরভ। সেই ক্ষিতিতে শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত নানাপ্রকার রূপ অর্থাৎ বর্ণ আছে এবং মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত, অম্ল ও কষায় এই ছয় প্রকার রসই আছে। ক্ষিতির স্পর্শ পাকজ ও অনুষ্ণাশীত। অর্থাৎ পাক জন্য কখন কঠিন, ও কখন কোমল এবং না উষ্ণ না শীত বোধ হয়।

সেই ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী দুই প্রকার, নিত্যা ও অনিত্যা। তাহার মধ্যে পরমাণু-রূপা পৃথিবী নিত্যা এবং দ্ব্যণুকাদি অবয়ব-বিশিষ্টা ঘটাদিরূপা পৃথিবী অনিত্যা।

সেই অবয়ব-বিশিষ্টা পৃথিবী আবার তিন প্রকার। যথা—দেহ, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। সেই দেহ আবার দুই দুই প্রকার,—যোনিজ ও অযোনিজ। যোনিজ আবার দুই প্রকার,—জরায়ুজ ও অণ্ডজ। স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ আদিকে অযোনিজ কহা যায়।

ঐ অনিত্যা পৃথিবীর ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পার্থিব ইন্দ্রিয় কহে, যেহেতু

ঘ্রাণেন্দ্রিয় রূপাদির ব্যঞ্জক না হইয়া কেবল গন্ধের ব্যঞ্জক।

যাহা উপভোগের কারণ, তাহার নাম বিষয়। অতএব দ্ব্যাণুক অবধি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত পার্থিব দ্রব্য সমস্তই অনিত্য। পৃথিবীর বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় আদি দ্বারা তৎসমস্তই উপভোগ করা যাইতে পারে।

জল।

যে দ্রব্য স্নেহ ও স্বাভাবিক দ্রবত্ব এই উভয় গুণের সমবায়ী কারণ—অর্থাৎ স্নেহ ও স্বাভাবিক দ্রবত্ব, যে দ্রব্যের বিশেষ গুণ তাহার নাম অপ্ অর্থাৎ জল। ফলতঃ জল স্নেহ ও স্বাভাবিক দ্রবত্ব এই বিশেষ গুণ-দ্বয় বিশিষ্ট। জলের বর্ণ শুক্ল, রস মধুর এবং স্পর্শ শীতল হয়। সেই জলও নিত্য এবং অনিত্য এই দুই প্রকার। পরমাণুরূপ জল নিত্য ও দ্ব্যানুকাদি জল অনিত্য। সেই অনিত্য জলও আবার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে তিন প্রকার। জলীয় দেহ অযোনিজ, ইহা বরুণ লোকে প্রসিদ্ধ। জলের ইন্দ্রিয় রসনা, এবং হিমকণা অবধি মহাসাগর পর্য্যন্ত ইহার বিষয়।

তেজ।

যে দ্রব্য উষ্ণস্পর্শের সমবায়ী কারণ অর্থাৎ উষ্ণস্পর্শ যাহার বিশেষ গুণ, তাহার নাম তেজ। চন্দ্রকিরণ আদিতেও এ লক্ষণের অব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই; যেহেতু চন্দ্রকিরণ ও রত্নাদি কিরণেও উষ্ণস্পর্শ আছে। কিন্তু চন্দ্রকিরণে উষ্ণস্পর্শ জলীয়স্পর্শে এবং রত্নকিরণে উষ্ণস্পর্শ পার্থিবস্পর্শে আচ্ছন্ন, একারণ তত্তৎস্থলে উষ্ণস্পর্শের জ্ঞান হয় না। তেজের রূপ শুক্ল ও ভাস্বর, অর্থাৎ তেজে দীপ্তিবিশিষ্ট শুক্লবর্ণ আছে। বহ্নি, সুবর্ণাদি ধাতু কিম্বা মরকত আদি মণি পার্থিবরূপে আচ্ছন্ন আছে বলিয়া তাহাতে শুক্লরূপের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু চন্দ্রকিরণে তাদৃশ আচ্ছাদকের অভাব আছে এজন্য তাহাতে শুক্লরূপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। তেজে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে এবং উহাও পূর্ব্ববৎ নিত্য ও অনিত্য এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে পরমাণুরূপ নিত্য ও দ্ব্যাণুকাদি রূপ অনিত্য। সেই অনিত্য তেজও আবার পূর্ব্ববৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার। তেজের দেহ অযোনিজ। যেমন জলীয় দেহ বরুণলোকে প্রসিদ্ধ তেমনি তেজের দেহও সূর্য্যলোকে প্রসিদ্ধ। তেজের ইন্দ্রিয় চক্ষু, এবং সুবর্ণ অবধি বহ্নি পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্যের তেজই অনিত্য তেজের বিষয়।

মরুৎ।

যে দ্রব্য অপাকজ অনুষ্ণ ও অশীত স্পর্শ গুণের সমবায়ী কারণ হয় তাহার নাম মরুৎ অর্থাৎ মরুতের স্পর্শ না উষ্ণ না শীত অথচ ইহাতে পাকজন্য কোমলত্বের কি কঠিনত্বের কোন প্রভেদ নাই।

এই মরুৎ অর্থাৎ বায়ু বক্রগতি বিশিষ্ট। স্পর্শাদিদ্বারা বায়ুর জ্ঞান জন্মে। বায়ুও পূর্ব্ববৎ নিত্য ও অনিত্য এই প্রকার। পরমাণুস্বরূপ বায়ু নিত্য এবং দ্ব্যাণুকাদিস্বরূপ বায়ু অনিত্য। এই অনিত্য বায়ুও আবার পূর্ব্ববৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার। বায়ুর দেহ অযোনিজ; পিশাচাদির দেহ বায়ুলোকে প্রসিদ্ধ। বায়ুর ইন্দ্রিয় ত্বক্, এবং প্রাণ অবধি মহা বায়ু পর্য্যন্ত সমস্তই অনিত্য বায়ুর বিষয়।

বোম।

যে দ্রব্য শব্দের আশ্রয় হয়, তাহার নাম বেোম অর্থাৎ আকাশ। বস্তুতঃ শব্দ নামক গুণ-পদার্থের আশ্রয় বলিয়াই আকাশের দ্রব্যত্ব স্বীকার করা যায়। এই আকাশ নিত্য এবং আকাশের ইন্দ্রিয় শ্রোত্র। যদিও আকাশ এক, তথাপি কর্ণরন্ধ্র প্রভৃতি কেবল ইহার উপাধি-ভেদ মাত্র অর্থাৎ ঐ প্রকার উপাধি ভেদে আকাশ আশু অনেক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ফলিতার্থে আকাশ অনেক নয়।

কাল।

যে দ্রব্য পরত্ব ও অপরত্ব নামক গুণদ্বয়ের আশ্রয় অর্থাৎ পরত্ব জ্ঞান ও অপরত্ব জ্ঞানের অসাধারণ নিমিত্ত কারণ তাহার নাম কাল। ফলতঃ পরত্ব ও অপরত্ব এই গুণ-দ্বয়ের আশ্রয়ত্বই কালের দ্রব্যত্বের প্রমাণ। এই কাল জন্য বস্তু মাত্রেরই জনক, অর্থাৎ সমস্ত জন্য বস্তুই কালে জন্মাইতেছে এবং এই কালই জগতের আশ্রয় অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে জগতের সমস্ত বস্তুই কালের আশ্রিত রহি-য়াছে। জগতের তাবৎ বস্তুর সঙ্গে কালের যে সম্বন্ধ তাহার নাম কালিক সম্বন্ধ। এই জগতের যাবদীয় বস্তুরই পরস্পর কালিক সম্বন্ধ আছে, এবং জন্য বস্তু মাত্রেরই কাল উপাধি আছে যথা গত ঘট, বর্ত্তমান ঘট, ও ভবিষ্যৎ ঘট ইত্যাদি। কাল নিত্য ও এক, তথাচ ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, প্রহর, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ইত্যাদি উপাধি ভেদে অনেক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নচেৎ কাল এক মহাকাল মাত্র। যে কাল অথবা যে দ্রব্য বর্ত্তমান ধ্বংসের প্রতিযোগী হয় তাহার নাম ভূত কাল অথবা ভূতদ্রব্য, যথা গত দিবস, গত অর্থাৎ গত ঘট। যে কাল অথবা দ্রব্য বর্ত্তমান প্রাগ-ভাবের প্রতিযোগী হয় তাহার নাম ভবিষ্যৎ; যথা—আগামি অর্থাৎ ভাবি দিবস অথবা ভাবি ঘট। আর যে কাল বা দ্রব্য বিনষ্ট প্রাগভাবের ও ভাবিধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী তাহার নাম বর্ত্তমান; যথা—অদ্য অর্থাৎ বর্ত্তমান দিবস, অথবা উপস্থিত অর্থাৎ বর্ত্তমান ঘট।

ক্রমশঃ।

বৎসরান্তে।

১

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আর এক বর্ষকাল,
অনন্ত কালের গর্ভে তিমিরে মিশা'ল ভাল!
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, মনোহর মূর্ত্তি ধ'রে,
সতেজে উঠিতেছিল আশার মুকুল যত,
ঝরিয়া পড়িল সবে কালেতে হইয়ে হত!

২

মুকুল-উদ্গম-ভাব নিরখিয়া মনে হ'ত,
দিব্য ফল ফুলে তা'রা হইবে রে সুশোভিত!
ঘটনার অভিঘাতে, বিপদ-বজ্রের পাতে,
একে একে কিন্তু সবে, কুটিল কালের সনে
নীরবে শুকা'য়ে গেল নিভৃত হৃদয়-কোণে!

৩

ভে'ঙ্গে গেল হৃদযন্ত্র, মর্ম্ম স্থান হ'ল ক্ষত,
কেবল যাতনা বৃদ্ধি হইতেছে অবিরত ;
কোথা আশা—কোথা তুমি, সব শূন্য, মরুভূমি,
আকাশে মিশা'য়ে যায় অনন্ত আকাশ-মত,
ভগ্ন মনোরথ কিন্তু যন্ত্রণা নিদান যত !

৪

প্রবল ঘটনা স্রোতে পড়িয়া মানব হায় !
ব্যতিব্যস্ত—ছিন্ন ভিন্ন, বিষম সংসার-দায় !
এক বর্ষকাল, যেন হ'য়ে মহা কাল—
ভীষণ, গম্ভীর রবে, স্তম্ভিত ক'রে সকলে,
শেষেতে ঘটনা-স্রোতে কোথায় লইয়া ফেলে !

৫

সুখ-তৃষ্ণা, অভিলাষ, প্রণয়-পিপাসা কত
উদিত বর্ষের সনে, বর্ষ সনে পুনঃ গত ;
বিষম চিন্তার জ্বরে, পরাণ আকুল করে,
লাভালাভ যাহা বল—এক মাত্র দেখা যায়—
'বিলাপ', 'আক্ষেপ-উক্তি' আর-'হায়, হায়' !

৬

কত পিতামাতা আহা ! জীবনের ধ্রুব-তারা,
হৃদয়-সর্ব্বস্ব নিধি পুত্র-বরে হ'ল হারা।
পুত্র কত দীন হীন, হ'ল পিতৃ মাতৃ হীন,
জন্মতরে শেষ দেখা,—তা'ও ঘটিল না তা'র,
ইহার অধিক দুঃখ কি আছে রে অভাগার !

৭

কত পতি কাঁদে আহা ! পত্নী-শোকে অহরহ,
কত পত্নী, পতি-শোকে অপগণ্ড শিশুসহ—
হৃদয়ের বেগভরে, অতি সকরুণ স্বরে—
কাঁদিয়া ভাসায় মহী—শুনি'সে করুণ-ধ্বনি
পাষাণ গলিয়া যায়, পরাণে ঔদাস্য গণি' !

৮

বাল্যকাল হ'তে হায় ! বান্ধব রতন-দ্বয়,
(সরলতাধার মরি ! অতুল সুষমাময়)
এক বৃন্তে অবস্থিত, সুন্দর কুসুম মত—
বিকসিত হ'তেছিল, কুটিল কালের বশে—
দহিয়া মরমে একে, অপর পড়িল খ'সে।

৯

প্রেমিক সুজন কোন প্রণয়-আবেগ-ভরে
পুষেছিল 'ভালবাসা' হৃদয়ের স্তরে স্তরে ;
নাহি পে'লে প্রতিদান, উপজিল অভিমান,
হতাশ হইয়া প্রাণে, নিভৃত গিরি-গহ্বরে
জীবনের শেষ লীলা সমাপিল সকাতরে !

১০

কা'রে জিজ্ঞাসিব আমি, কে বুঝায়ে দিবে মোরে,
মানব অদৃষ্ট-চক্র কেন এইরূপে ঘোরে ?
রাজা হয় রাজ্যভ্রষ্ট, প্রণয়ীর মনঃকষ্ট,
শোক-দুঃখ-তাপে কেহ কাঁদিতেছে সর্ব্বক্ষণ !
কেঁদেছিল শেষ দিনে অন্তরে 'রোম' যেমন।

১১

তুমি ইচ্ছাময় নাথ ! অখণ্ড জগতীতলে,
সুখ-দুঃখ বিধায়ক, অসীম ক্ষমতা-বলে।
স্বগুণে সৃজিলে ভবে, কেন দুঃখময় তবে
করিলে হে মানবের সারহীন এ জীবন ?
দেখিলে কি সুখী নাথ ! হও বিশ্বের পীড়ন ?

১২

তাহা নহে ; জগদীশ, দয়ার সাগর তুমি,
মানবের কর্ম্মফলে দুঃখাগার মর্ত্ত্যভূমি।
আমি নিজ কর্ম্ম ফলে, বেষ্টিত যন্ত্রণাজালে ;
বর্ষ মধ্যে শুনিলাম দুঃখের কাহিনী কত,
ললাট-লিপির তরে ভুগিলাম বিধিমত !

১৩

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আর এক বর্ষকাল,
অনন্তকালের গর্ভে তিমিরে মিশা'ল ভাল !
পট-পরিবর্ত্ত হ'ল, অভিনব দৃশ্য এল,
কে জানে কেমন হ'বে জীবনের অভিনয়,
হয় ত এরূপে ইহা বৃথায় হইবে ক্ষয় !
কিম্বা গ্রন্থি ছিন্ন হ'বে, আশা, তৃষ্ণা ভেসে যা'বে,
নামমাত্র নাহি র'বে কোথায় হইবে লয় !

ভারতে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পর্য্যটক।

প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিবৃত্ত নাই। এ দেশে এরূপ কোন গ্রন্থ বিশেষ কোন সময়ে বিদ্যমান ছিল কিনা তাহার অবধারণ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ অদ্যাপি আছে, তৎসমুদায় হইতে এ দেশের কোন সময়ের ধারাবাহিক পুরাবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহারও কোন অংশ পরিত্যক্ত, কোন অংশ বা অতিরঞ্জিত। এককালে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতিগণকে আসমুদ্রকরগ্রাহী রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া নানা গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রত্যেকেই দিগ্বিজয়ে নির্গত হইতেন, প্রত্যেকেই অপর ভূপতিবর্গকে সমরে পরাভূত করিয়া মণ্ডলেশ্বর সম্রাট হইতেন বলিয়া ঐ সমস্ত গ্রন্থে বর্ণনা আছে। কিন্তু হিন্দুদিগের কোন প্রামাণিক ইতিহাস আদৌ ছিল না, এরূপ অনুমানও হইয়া উঠে না। যে জাতি মানব-সমাজের শৈশবাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া, সকল বিষয়েই অপর সকল জাতির শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছে; যে জাতি কাব্য, অলঙ্কার, গণিত, দর্শন, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি বিধান করিয়া সংসারে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে, সে জাতি যে আপনার ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে নাই, একথা ধারণা করা যায় না। বহুকাল হইতে হিন্দু-সমাজের উপর যে বিপ্লবের উপর বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহার অনেক বহুমূল্য গ্রন্থ এককালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কি দৈবশক্তিবলে যে এজাতি অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বিদ্যমান থাকিতে পারিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ধর্ম্ম-বিপ্লব বল, সমাজ বিপ্লব বল, রাষ্ট্রবিপ্লব বল, এ প্রাচীন জাতির উপর দিয়া এমন বিপ্লব কত সহস্র সহস্র চলিয়া গিয়াছে তাহার নির্ণয় হয় না। এই সমুদায় বিপ্লবে ইহার কোন অংশে যে হানি হয় নাই, এমত নহে; প্রত্যুত ইহার অনেক প্রধান প্রধান অঙ্গ ঐ সকল বিপ্লবের প্রবল তরঙ্গপ্রতিঘাতে কোথায় কোথায় ছুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার সামাজিক ও নৈতিক গঠন নাকি অত্যন্ত দৃঢ়, তাই এ সকল প্রবল বাত্যার আঘাত সহিয়াও এই জাতি এখন পর্য্যন্ত টিকিয়া রহিয়াছে।

খৃষ্টের জন্মের কিঞ্চিদধিক পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে হিমাচলের পাদদেশস্থ কপিলবাস্তু নামক ক্ষুদ্র রাজ্যে যে একটি অপরিণত-বয়স্ক যোগী ধর্ম্ম-বিপ্লবের ঘোর অন্দোলনে সমস্ত আসিয়া ভূখণ্ডের অধিকাংশ এককালে আন্দোলিত করিয়াছিলেম, প্রথিত আছে, সেই মাহাপুরুষের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির প্রায় দুই শতাব্দী পরে মগধরাজ্যের অধিঅধিপতি মহাত্মা প্রিয়দর্শী, অশোক নাম ধারণ পূর্ব্বক কপিলবাস্তুর সেই নবীন যোগীর প্রচারিত নবীন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ব্যতীত সুদূর সাগরপারস্থ সিংহল প্রভৃতি দ্বীপে এবং অত্যুন্নত হিমগিরির অপরপারস্থ চীন প্রভৃতি রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারার্থ যতীদিগীকে প্রেরণ করেন। এমন কি, তাঁহার পুত্রই তৎ-

কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রচারার্থ সিংহলদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতির শেষ সীমা হইয়াছিল বলা যায়। কান্যকুব্জ প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ব্যতীত এই সুবিস্তৃত ভারত-ভূমির অন্য কোথাও তৎকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল না। অশোকের কিছু কাল পরে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হয়। ক্রমে ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া, নানা উপায়ে বৌদ্ধদিগকে কতক নিহত, কতক বিদূরিত এবং কতক আপনাদের মতে পুনরানীত করেন। এবিষয়ে পুরাবিদ্‌গণের মত পরস্পর বিভিন্ন। কেহ কহেন শ্রীমৎ শঙ্করার্য্যের যুক্তির বলে এদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্মূলিত এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কেহ বলেন 'বিপুল-শোণিতবর্ষী বহুল সংগ্রামের পর হিন্দুদিগের দৌরাত্মে বৌদ্ধেরা অনেকে নির্ব্বাসিত ও অধিকাংশ নিহত হন এবং ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রবল হইয়া উঠে'। যাহা হউক খৃঃ দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এদেশের স্থান বিশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং আশ্রমাদির কতক কতক অংশ বিদ্যমান ছিল, স্থানে স্থানে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ২০০ পূঃ খৃঃ অব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম চীন দেশে প্রথম প্রচারিত হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্বে চীনরাজ্যে ঐ ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হইয়া উঠে নাই। সমস্ত চীনরাজ্য ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, চীনদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে নানা সম্প্রদায় গঠিত হয়। তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সহিত নানা বিষয়ে ভিন্ন মত হইতে থাকে। অতএব চীনের দুই এক জন বৌদ্ধ-মতাবলম্বী পণ্ডিত ঐ ধর্ম্মের মূলনীতি ও যুক্তির প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন। চি-তা-ওন নামক একজন চীন দেশীয় বৌদ্ধ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে এতদ্দেশে প্রথম আগমন আগমন করেন; তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত অদ্যাপি বিদ্যমান নাই। তাঁহার এক শতাব্দী পরে ফা-হিয়ান নামা জনৈক পণ্ডিত ভারতে আগমন ও নানাস্থানে ভ্রমণ করতঃ বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নাদি করিয়া যান। তাঁহার পর হোই-সেঙ্ ও সঙ-ইয়ুন নামক দুই জন চীনবাসী কয়েক বৎসর আর্য্যাবর্ত্তে পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান; কিন্তু তাঁহারা আপনাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে হিউ-এন্-থসঙ্গ এতদ্দেশে আগমন করেন। তিনি অনেক দিন এখানে অবস্থান ও নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রথমে ফরাসি পণ্ডিত এম, এবেল রমসৎ কর্ত্তৃক ফরাসি ভাষায় এবং তাহা হইতে খৃঃ ১৮৪৮ অব্দে লেডলে সাহেব কর্ত্তৃক কলিকাতা নগরে ইংরেজিতে অনুবাদিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি হিন্দুকুশ পর্ব্বতের নিকট দিয়া কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক ক্রমে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমায় আসিয়া উপনীত হন। তিনি প্রধানতঃ তক্ষশীলা, বৈশালী, কপিলবাস্তু, শ্রাবস্তি, মথুরা, সঙ্কাশ্য, পাটলীপুত্র, গয়া, গৃধ্রকূট প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের বিবরণ আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বারাণসীর কথা লিখিত আছে। তিনি বারাণসীর নিকটস্থ কতকগুলি অন্তঃশৈল মন্দিরের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বারাণসী হইতে

পাটলীপুত্র নগরে আগমন করিয়া তথায় তিন-বৎসর কাল অবস্থিতি এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তৎসমুদায়ের প্রতি লিপি করিয়া লন। তিনি লিখিয়াছেন, উত্তর প্রদেশস্থ বৌদ্ধ উপাধ্যায় মহাশয়েরা ঐ সমস্ত গ্রন্থ মুখে মুখেই অভ্যস্ত রাখিতেন, লিপিবদ্ধ করিতেন না; সেই জন্য তাঁহাকে ঐ সকল গ্রন্থের প্রতিলিপি সংগ্রহার্থ মধ্যভারত পর্য্যন্ত আসিতে হইয়াছিল। অনন্তর বারাণসী হইতে ফা-হিয়ান নৌকারোহণে চাম্পা নগরে এবং তথা হইতে তাম্রলিপ্তে গমন করেন। তথায় দুই বৎসর বাস করিয়া সিংহলদ্বীপে যাত্রা করেন। সিংহলেও তিনি দুই বৎসর থাকিয়া ফান ভাষায় লিখিত বহুসংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। সিংহলদ্বীপে তৎকালে বুদ্ধদেবের দন্তের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ প্রতিবর্ষে একটি প্রকাণ্ড মেলা হইত। সিংহল হইতে স্বদেশ প্রতিগমন কালে ফা-হিয়ান যবদ্বীপ দর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, ঐ দ্বীপে তখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই বিশেষ প্রবল ছিল। এই শেষোক্ত বিবরণ হইতে এরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচীন কালে হিন্দুরা অর্ণবযানযোগে সাগর পার হইয়া অপরাপর দেশেও গমন এবং তত্তৎ স্থানে আপনাদের ধর্ম্মের স্থাপনা করিতেন। চীন পর্য্যটকদিগের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে এদেশের তত্তৎকালের বিবরণ অনেক দূর [illegible]কৃত হইয়াছে। হিউ-এন-থসাঙ্গের পরে খি-নাই নামক জনৈক চীনবাসী তিন শত সন্ন্যাসী সঙ্গে লইয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার লিখিত কোন বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয় না।

হিউ-এন-থসঙ্গ লিখিত বৃত্তান্ত হইতে ভারতবর্ষের তাৎকালিক অবস্থা কতকদূর অবগত হওয়া যায়। হিউএন-থসঙ্গ বৌদ্ধ ছিলেন, এবং ফা-হিয়ানের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের নানাবিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তই তাঁহার এদেশে আগমন; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের যেরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়াযায়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সেরূপ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি অনেক স্থলেই বৌদ্ধতীর্থ স্থান, তথাকার ভজনালয় ও ঐ ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা বিষয়ক কথা লিখিয়াই তথাকার বিবরণের উপসংহার করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে তক্ষশীলা, মথুরা, সংকাশ্যা, কান্যকুব্জ, কোশল, শ্রাবস্তি, কপিলবাস্তু, বৈশালী প্রভৃতি স্থানের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি কৌশাম্বী, তাম্রলিপ্ত, প্রয়াগ, বারাণসী, সরনাথ, চম্পা, উৎকল, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, মহান্ধ্র, চোল, বিদর্ভ, বরোচ বল্লভি, মালব, গুজরাট, দ্রাবিড়, কঙ্কন, কাঞ্চীপুর, কচ্ছ, মুলতান, স্থানেশ্বর, অহিচ্ছত্র, জঝোতি, রামগ্রাম, ব্রাহ্মপুর, কোয়োধ, বঙ্গ, মহিপুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, একপ ভ্রমণবৃত্তান্তেও ইতিবৃত্তের অভাব পূরণ করিতে পারে না। কিন্তু আদৌ যেখানে ইতিবৃত্ত নাই, সে স্থলে এইরূপ একটি বিস্তৃত ভ্রমণবৃত্তান্তও প্রচুর বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

হিউ-এন-থসঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন কালে চীন দেশের উত্তর পশ্চিম ভাগের মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া নানা দেশ পর্য্যটন করতঃ ওকিনিও, তথা হইতে অক্ষু প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে তিনি লিঙ্-চান (মুস্বর এওলা) নামক পর্ব্বত অতিক্রম করেন, সেই সময়ে তাঁহার অধিকাংশ সঙ্গীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিল। সেই শৈলরাজী

অতিক্রম করিতে তাঁহার প্রায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। শীতে, ক্ষুধায় কাতর হইয়া, সেই বান্ধববিহীন স্থানে তাঁহাকে যে কতই অসহ্য ক্লেশ সহিতে হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা ও সত্যানুসন্ধিৎসা এতই প্রবল ছিল, এবং বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত নানা বিষয়ে এতই কৌতূহল জন্মিয়াছিল যে, তিনি সেই সমুদায় ক্লেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। অনন্তর হিউ-এন-থসঙ্গ তাস্কন্দ প্রদেশে উপনীত হন। তথাকার অধিবাসীরা অগ্নির উপাসক ছিল। তথা হইতে আসিয়া তিনি টুখারা (বোখারা?) রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং তথায় অক্ষনদ পার হইয়া বামিয়ান প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করতঃ কপিশ দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। হিউ-এন-থসঙ্গ কহেন, তৎকালে ঐ দেশ জনৈক ক্ষত্রিয় নৃপতির অধীন ছিল। পূর্ব্বোক্ত দেশগুলির মধ্যে অধিকাংশেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য হইয়াছিল। কপিশ দেশে অনেক ভিন্ন মতাবলম্বী লোকও ছিল। উক্ত পর্য্যটক তাহাদের কথঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, উহাদের অনেকে অঙ্গে ভস্মলেপন ও শরীরশোভার জন্য নরকপাল ধারণ করিত। উক্ত রাজ্যের রাজধানীর সন্নিহিত প্রদেশে পিলুসর শৈলের উপরিভাগে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বৌদ্ধযতীদিগের শবরাজির উপরে মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের নির্ম্মিত বহুসংখ্যক স্তুপ বিদ্যমান ছিল। হিউ-এন-থসঙ্গ কপিশ প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বভাগে একটি শৈলশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক চলতরঙ্গবাহী সিন্ধু ও পূতসলিলা জাহ্নবী যমুনা-বিধৌত পবিত্র আর্য্যাবর্ত্ত মহাদেশে প্রবেশ করেন।

যে সময়ে হিউ-এন-থসঙ্গ এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন, সে সময়ের পূর্ব্বেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল এ দেশে অনেক অংশে শিথিল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন যেখানে শত সংখ্যক বৌদ্ধ মঠ, সেই খানেই অন্ততঃ ঐ সংখ্যক হিন্দুভজনালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লোকের বৌদ্ধ ধর্ম্মে আর পূর্ব্ববৎ আস্থা ছিল না। এক কালে যে ধর্ম্মের জন্য কত শত রাজপুত্র রাজ্যসুখ সমুদায়কে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া অকাতরে দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন; যে ধর্ম্মের প্রচারার্থ ভারতের লোকে এককালে হিংস্রজন্তুসংকুল নিবিড় অরণ্য, তুষারধবলিত, সমুন্নত, দুর্গম গিরিশিখর, প্রচণ্ড আতপতপ্ত, ভীষণ মরুস্থল, এবং পর্ব্বতাকার তরঙ্গময়, নক্রাদির চিরবাস, সুগভীর জলনিধি অতিক্রম করিয়া দূর হইতে দূরতর প্রদেশে মহর্ষি গৌতমপ্রকাশিত নবীন ধর্ম্মের গুণগান করিয়াছিলেন; সে ধর্ম্ম তখন আপনার জন্মভূমি হইতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। যে ধর্ম্মের বলে বলীয়ান হইয়া সামান্য প্রজা এককালে অতি দোর্দ্দণ্ড রাজার মহিয়সী রাজশক্তিকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে তেজোহীন ও নির্জ্জীব হইয়া বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইতে চলিতেছিল, এইরূপ অবস্থায় মহাত্মা হিউ-এন-থসঙ্গ এদেশে আসিয়া তৎকালের বিবরণ যথাসাধ্য সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর পশ্চিম ভাগস্থ নানা দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক হিউ-এন-থসঙ্গ মগধরাজ্যে আগমন করিয়া তথাকার রাজধানী পাটলীপুত্র নগর সন্দর্শন করেন। তথা হইতে তিনি নালন্দ, গৃধ্রকূট, রাজগৃহ এবং গয়ায় গমন করেন। গয়া এক কালে বৌদ্ধদিগের

অতি পবিত্র তীর্থস্থান ছিল; ভারতবর্ষের নানা দিগ্দেশ হইতে তখনও অনেক বৌদ্ধ যাত্রী ঐস্থানে আগমন করিত। কিন্তু তিনি গয়াতে সে সময়ও ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ প্রভুত্ব থাকার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৎকালে ঐস্থানে একবংশোদ্ভব সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গয়ার রাজা ঐ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সাধারণ প্রজার ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। ইহাতে অনুমিত হয়, যে গয়ার তৎকালীন রাজা হিন্দু ছিলেন। কেননা হিন্দুরাজারাই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি আপনার মাননীয় গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। গয়া বৌদ্ধদিগেরও একটি বিশেষ পবিত্র তীর্থস্থান, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধগয়া ও ব্রহ্মগয়া একই; কারণ বুদ্ধগয়ার বিবরণ মধ্যে যে বোধি বৃক্ষের কথা আছে, তাহা ব্রহ্মগয়াতেই বিদ্যমান ছিল, সংপ্রতি খৃঃ ১৮৮০ অব্দে ঐ বৃক্ষটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। ঐ বৃক্ষের ভগ্ন অংশবিশেষ ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। হিউএন-থসঙ্গ কহিয়াছেন, তৎকালে ঐ বোধি বৃক্ষের দক্ষিণে ন্যূনাধিক এক ক্রোশ পরিমিত দূরস্থ একটি স্থানে বহুসংখ্যক কীর্ত্তিস্তম্ভ বিরাজমান ছিল। একটি বোধিবৃক্ষ নষ্ট হইলে, তৎস্থলে আর একটি রোপিত হইয়া থাকে।

প্রতিবৎসর বর্ষাকালে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ যতী ও আচার্য্যগণ তথায় উপস্থিত হইয়া, মস্রেকের গীতবাদ্যের সঙ্গে নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম লইয়া তত্রত্য মঠের চতুর্দ্দিকস্থ বনের ভিতর দিয়া ঐ মঠ প্রদক্ষিণ করিতেন। সাত দিবস ধরিয়া এইরূপ চলিত, এবং সেই মঠে যে সমস্ত বৌদ্ধ মহাপুরুষদিগের মৃতদেহ সমাহিত ছিল, ঐ সময়ে প্রত্যেকেই সেই সকল শবের নিকট নানামত উপহারাদি উৎসর্গ করিত। হিউ-এন-থসঙ্গ আরও কহিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় যতীরা শ্রাবণ মাসের প্রথম দিনে নির্দ্দিষ্ট আবাস গ্রহণ করিয়া আশ্বিনের শেষ দিনে উহা হইতে পুনরায় বহির্গত হইতেন। কোন কোন গ্রন্থে বর্ণনা আছে যে, গয়ায় ঐ বোধিবৃক্ষের তলে বসিয়া শ্রীমদ্‌বুদ্ধদেব অনেক দিন সমাধি করিয়াছিলেন, সেই জন্যই বৌদ্ধেরা ঐ বৃক্ষের এতাদৃশ সমাদর করিত। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগের স্থান বিশেষে লিখিয়াছেন,—

"হিন্দুদিগের গয়ামাহাত্ম্যে গয়াযাত্রীদিগের প্রতি বৌদ্ধদের বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করিবার ব্যবস্থা লিখিত আছে। এক্ষণে যে স্থানকে বুদ্ধগয়া বলে, তাহারই মধ্যে বোধিবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। সুতরাং গয়ামাহাত্ম্যে যে গয়ার বিষয় বর্ণিত আছে, ঐ বোধিবৃক্ষ সেই গয়ারই মধ্য-স্থিত।" অতএব পূর্ব্বে এক গয়াই ছিল; এক্ষণকার গয়া ও বুদ্ধগয়া তাহারই অন্তর্গত।

"উল্লিখিত ব্যবস্থা মধ্যে ধর্ম্মকে প্রণাম করিবারও বিধান আছে। বৌদ্ধদের মতে ধর্ম্ম কিরূপ পদার্থ, পূর্ব্বে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। ধর্ম্ম তাহাদের ত্রিমূর্ত্তির একটি মূর্ত্তি। বিশেষতঃ যখন ঐ বিধানটি বৌদ্ধদিগের বোধিবৃক্ষের প্রণামব্যবস্থার মধ্যে বিনিবিষ্ট হইয়াছে, তখন উহা বৌদ্ধমতানুযায়ী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উহার একটি শ্লোকের পরেই ঐ বৃক্ষের গুণ-প্রতিপাদনস্থলে উহা বৌদ্ধ-সমাজে প্রচলিত একটি প্রধান বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব শব্দটি বৌদ্ধদিগের একটি অতি প্রধান উপাধি। বুদ্ধ স্বয়ংই ভূরি ভূরি স্থলে বোধিসত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ বচনে

উল্লিখিত বোধিবৃক্ষকেও বোধিসত্ত্ব বলিয়া স্তব করা হইয়াছে।

"চলদ্দলায় বৃক্ষায় অশ্বত্থায় নমোনমঃ।
বোধিসত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমোনমঃ॥"
গয়ামাহাত্ম্য। ৭। ৩২।

চঞ্চল-দল অশ্বত্থ বৃক্ষকে বার বার নমস্কার করি। যজ্ঞ স্বরূপ ও বোধিসত্ত্ব-স্বরূপ অশ্বত্থকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।"

গয়া যে বৌদ্ধদিগের কর্ত্তৃক প্রথমে তীর্থ-স্থানে পরিণত, এবং বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব বিলুপ্ত হইলে যে তথায় হিন্দুদিগের তীর্থস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে, এই বিষয় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন,

"গয়া নামের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই সমাজে দুই প্রকার উপাখ্যান প্রচলিত আছে। বৌদ্ধেরা বলেন, গয় কশ্যপ নামে এক ব্যক্তি অগ্নি-উপাসক ছিলেন; বুদ্ধ তাঁহাকে এই স্থলে বিচারে পরাস্ত করেন এই নিমিত্ত ইহার নাম গয়া হয়। হিন্দুদের উপাখ্যান প্রসিদ্ধই আছে। সেটি এই,—গয় নামে একটি অসুর ঘোরতর তপস্যা করিয়া নিজ দেহ পবিত্র করে। কি জানি সে তপোবলে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া দেবগণের অনিষ্টাচরণ করে এই আশঙ্কায় তাঁহারা কৌশল ক্রমে তাহার উপর ধর্ম্ম-শিলা নামে একখানি বৃহৎ শিলা সংস্থাপন ও আপনারা সেই শিলার উপর নিজ নিজ শক্তির সহিত উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে নিশ্চল করিয়া রাখেন। গয়া-মাহাত্ম্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সেই গয়ের প্রার্থনানুসারে এই স্থানের নাম গয়া হয়। প্রথম উপাখ্যান অনুসারে, গয়াটি বৌদ্ধ-ক্ষেত্র এবং দ্বিতীয় উপাখ্যান অনুসারে উটি হিন্দুদের ধর্ম্মক্ষেত্র হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শাক্য-বুদ্ধ এই স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক ধ্যানারূঢ় হইয়া জ্ঞান লাভ করেন এই নিমিত্ত এটি বৌদ্ধদের একটি সুপ্রাচীন প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এক্ষণে যে স্থান বুদ্ধগয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার মধ্যে অনেকানেক পুরাতন বিষয় বিদ্যমান আছে। যে বৌদ্ধ-কুল-তিলক অশোক রাজা খৃ, পূ, তৃতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, ঐ স্থানে তাঁহারও বহুতর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তথায় তাঁহার সময়ের অক্ষরে বিরচিত খোদিতলিপিও অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদৃশ পূর্ব্বে যে হিন্দু-গয়া বিদ্যমান ছিল, তাহার কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রত্যুত:, এক্ষণে তাহাতে যত মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদায়ই অপ্রাচীন; একটিও প্রাচীন নয়; কিন্তু প্রাচীন গৃহ-বিশেষের স্থানে পুরাতন গৃহের প্রস্তরাদি উপকরণে প্রস্তুত হইয়াছে। কোন কোন মন্দিরের নিম্নভাগ পুরাতন ও উপরিভাগ আধুনিক। রামশিলা পর্ব্বতের উপরিভাগে পাতালেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। তাহাতে একটি লিঙ্গ ও শিব-পার্ব্বতীর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের নিম্নভাগ পুরাতন ও উপরিভাগ ইদানীন্তন। কিন্তু সেই উপরিভাগ নানা প্রকার পুরাতন প্রস্তর-খণ্ড নির্ম্মিত। এমন কি, সেগুলি পরস্পর মিলিতও হয় নাই। তাহার মধ্যে প্রাচীন মন্দিরে যে খণ্ডগুলি যে ভাবে ছিল, ঐ নব্য মন্দিরে তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া বিন্যস্ত করা হইয়াছে। গয়ার নানা স্থানে বিশেষতঃ প্রধান প্রধান দেবালয়ের প্রাচীরে বা তাহার

অঙ্গন-স্থিত ছোট ছোট মন্দিরে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় প্রকার দেবতারই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়।

"এই গয়ার নানা স্থানে ইতস্ততঃ বিস্তর খোদিতলিপি বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহার অনেকগুলি এখন যথাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সে সমুদায় প্রথমে যে স্থানে যে বিষয়ের বর্ণন উদ্দেশে খোদিত হয়, এখন আর সে স্থানে সে বিষয়ের বিবরণ-উদ্দেশে সংস্থাপিত নাই; স্থানান্তরে পরিচালিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে লিপি কোন বৌদ্ধ দেবালয়ে বিনিবিষ্ট ছিল, এখন তাহা হিন্দু দেবালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপদের সন্নিকটেই বৌদ্ধদিগের খোদিতলিপি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। বিষ্ণুপদের সম্মুখে সূর্য্য কুণ্ড; সেই সূর্য্য কুণ্ডের পশ্চিম পার্শ্বে সূর্য্যমন্দির; সেই সূর্য্য-মন্দিরে ঐ লিপি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে বারম্বার এরূপ কলিচূণ লেপন করা হইয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয়, ঐ লিপি প্রভৃতি বৌদ্ধ-বিষয় ও বৌদ্ধ চিহ্ন সমুদায় গোপন করাই তাহার উদ্দেশ্য। শ্রীমান্ কনিংহেম্ একটি ঋজুস্বভাব ব্রাহ্মণের নিকট তাহা অবগত হইয়া প্রতিলিপি করিয়া লন।" * * *

"এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, গয়াটি এক সময়ে বৌদ্ধদিগেরই তীর্থ-বিশেষ ছিল; পরে হিন্দুরা তাহা অধিকার পূর্ব্বক আপনাদের তীর্থ-বিশেষ করিয়া লন এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন, হিন্দুগয়ার দেবালয় সমুদায়ের নিতান্ত আধুনিকত্ব, পুরাতন দেবালয়াদির উপকরণে সেই সমুদায় নির্ম্মাণ, হিন্দু দেবালয়ে বৌদ্ধ-প্রতিমা ও বৌদ্ধ-খোদিতলিপির অস্তিত্ব ইত্যাদি পরস্পর-বিরুদ্ধ বিষয় সমুদায়ের অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভব ও সঙ্গত হয় না।"

কিন্তু উপরি উক্ত যুক্তিদ্বারাই গয়া বৌদ্ধদিগের স্থাপিত তীর্থ বলিয়া সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইয়া উঠিতেছে না। হিন্দুদিগের এ দেশে আগমনের বহুকাল পরে বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়; সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, গয়াতে যে সকল হিন্দুতীর্থ বৌদ্ধাধিকার কালে বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধেরা তৎসমুদায়ের উপরেই আপনাদের তীর্থ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং হিন্দুতীর্থের চিহ্নও কতক অংশে রহিয়া যায়। পুনরায় কালক্রমে বৌদ্ধদিগের তিরোভাব হইলে, হিন্দুরাও বৌদ্ধাধিকৃত স্থানে আপনাদের প্রাচীন তীর্থ গুলির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথা হইতে বৌদ্ধদিগের প্রস্তরলিপি বা অন্যান্য চিহ্নগুলি একবারে পরিত্যক্ত না হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। বৌদ্ধাধিকার কালের প্রকৃত ইতিবৃত্ত থাকিলে জানা যাইত, বাস্তবিক হিন্দু কি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের দ্বারা গয়াতে প্রথম তীর্থ স্থাপন হইয়াছিল। কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী জাতি অপর এক ধর্ম্মাবলম্বী জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের উপরে প্রভুতা স্থাপন করিতে পারিলে, বিজিতদিগের অধিকারস্থল সকল বিজেতৃবর্গের অধিকারে আইসে, এবং বিজেতৃ জাতি অনেক স্থলেই বিজিত জাতির প্রধান প্রধান স্থানে আপনাদের চিহ্ন সংস্থাপনের চেষ্টা পায়। গয়ার বৌদ্ধমন্দির সকল হিন্দুমন্দিরে এবং বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া হিন্দুরাই তাহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যখন ভারতবর্ষে বিশেষ প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন, তখন যে তাঁহারা হিন্দুতীর্থ গয়ার

মন্দির ও মূর্ত্তি সকল কতক ফেলিয়া দিয়া, কতক আপনাদিগের স্থাপিত মন্দির ও মূর্ত্তির সহিত মিলাইয়া বৌদ্ধতীর্থ স্থান করিয়া লইয়াছিলেন, এমত অনুমানও করা যাইতে পারে। হিন্দুদিগের শ্রাদ্ধ ও দান কালে যে মন্ত্রটী প্রথমে উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহাতে গয়ার নাম উল্লিখিত এবং তথায় দানের প্রশস্ততা সূচিত হইয়াছে। সে মন্ত্রটি এই,—

"কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দান-কালে ভবন্ত্বিহ॥"

উক্ত মন্ত্রটি বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এ অনুমান সত্য হইলে, গয়া যে প্রাচীন হিন্দুতীর্থ ছিল এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার মহাভারতের মধ্যেও স্থানে স্থানে এ সকল তীর্থের পবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা রহিয়াছে। সুতরাং গয়াকে মহামহাভারত রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অবধারণ করাও অসঙ্গত বোধ হয় না। উক্ত প্রাচীন গ্রন্থের স্থানবিশেষে শ্রাদ্ধ প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"—বহু পুত্রের কামনা করা উচিত; কারণ উহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও অক্ষয়বটসমালঙ্কৃত গয়ায় গমন করিতে পারে।"

৺কালীপ্রসন্নসিংহের বঙ্গানুবাদ, আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায়, অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

এরূপ প্রমাণ সত্ত্বে গয়াকে প্রাচীন হিন্দুতীর্থ বলিয়া স্থির করা কোন ক্রমে অযৌক্তিক নহে। মহাভারতের যে যে স্থানে গয়ার উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানকে আধুনিক বলিয়া অনুমান করতঃ বিচার করিলে, সেটি কতদূর সঙ্গত হইবে, বলিতে পারি না। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এবিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিবার বিশেষ বাসনা রহিল। তবে হিউএন-থসঙ্গের সময় পর্য্যন্তও ঐ স্থান যে অতি প্রধান ও পবিত্র বৌদ্ধ-তীর্থস্থান ছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। গয়াতে বৌদ্ধতীর্থ স্থাপন সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। উইল্‌কিন্স সাহেব গয়া পরিদর্শন করিতে গিয়া যে একখানি প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে লিখিত ছিল, মহেশ্বরের উপাসক জনৈক ব্রাহ্মণ আপন ইষ্টদেব কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত বোধিবৃক্ষের নিকটে একটি বিহার (বৌদ্ধ আশ্রম) নির্ম্মাণ করিয়া দেন *। হিউএন-থসঙ্গের সময়েও সেই বিহার বিদ্যমান ছিল এবং অনেক বৌদ্ধকুমার-কুমারীগণ তৎকাল-পর্য্যন্ত তথায় অধিবাস করিতেন।

(ক্রমশঃ)

* Asiatic Researches, Vol. I.

পাট।

গত মাসের প্রবাহে 'পাট' এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় আপনার নাম প্রকাশ না করিয়া কেবল 'বণিক' এই সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন। প্রবন্ধটির বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে আমার যে দুই চারিটি কথা আছে, তাহা নিম্নে প্রকটিত করিব ইচ্ছা করিয়াছি। তুলা, পাট প্রভৃতি কৃষিজাত সামগ্রী অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং লাভপ্রদ। ভারতের ন্যায় নির্ধন দেশের

পক্ষে এই সকল সামগ্রী উৎপাদন ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার প্রণালীর বিশেষ আলোচনা করা বড়ই আবশ্যক। এক্ষণে আমাদের দেশের কৃষিজাত সামগ্রী সকল অন্যান্য দেশে নীত হইয়া কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে লাগিতেছে; কিরূপে ঐ সকল সামগ্রী এদেশেই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিদেশীয়দিগের নিকট বিক্রীত হইতে পারে; কিরূপে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া শস্য এবং এই প্রকার পণ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারে; এবং কি রূপেই বা উহা দ্বারা নানা উপায়ে দেশের শূন্য ধনভাণ্ডারের পূরণ করা যাইতে পারে, তৎসমুদায়ের যথাবিধি আলোচনা করা বিশেষ মঙ্গলকর সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্ব প্রবন্ধের লেখক বণিক মহাশয় পাটের বিষয় লিখিতে গিয়া অনেক প্রয়োজনীয় কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন। সে সমস্ত কথা প্রকটিত হইলে, পাটের সম্বন্ধে লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞান হইতে পারিত। একথা স্বীকার্য্য যে, এরূপ বিষয় সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা না দেখাইয়া কেবল লিখিয়া প্রচারিত করিলে, তত ভাল ফল হয় না। অনেক কথা পাঠকবর্গ স্পষ্ট বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু এতদ্দেশে কৃষি-বিদ্যালয় নাই, যে জাতি পুরুষপরম্পরাক্রমে কৃষিকার্য্য করিয়া আসিতেছে, উহা তাহারাই করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের অনেক ভদ্র লোকেও কৃষাণ রাখিয়া চাষ করেন সত্য, কিন্তু অনেক স্থলেই নিজে উহার কিছুই বুঝেন না। যাঁহারা কিছু বুঝেন, তাঁহারাও সেই প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির অণুমাত্র ব্যতিক্রম করেন না। যে সময় হইতে কৃষিকার্য্যের এই রূপ প্রথা চলিত হইয়াছে, সে সময়ে ভূমির যে অবস্থা ছিল, এখন তাহা নাই; তৎকালে কৃষি ও বাণিজ্যের যেরূপ অবস্থা ছিল, এখন তাহার ভূয়সী উন্নতি ও বৃদ্ধি হইয়াছে; সুতরাং তৎকালের সংকীর্ণ প্রণালী অনুসারে এখনকার কৃষিকার্য্য চলা নিতান্ত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর কৃষিকার্য্য যে সকল লোকের হস্তে প্রধানতঃ ন্যস্ত রহিয়াছে তাহারা উহার কোন প্রকার উন্নতি বিধান করিতে বাস্তবিক অশক্ত। সুতরাং কৃষিকার্য্যের অবস্থা উন্নত না হইয়া বরং দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থায় ঈদৃশ বাস্তবিক হিতকর বিষয়ের প্রস্তাব লিখিতে হইলে, বিশেষ সতর্কতার সহিত সে বিষয়টির আদ্যোপান্ত অগ্রে অনুসন্ধান করিতে হয়। নতুবা প্রবন্ধের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক অনেক কথা পরিত্যক্ত হইতে পারে। উপরি উক্ত প্রবন্ধের লেখক বণিক মহাশয়ও বোধ করি নিজে পাটসংক্রান্ত কোন কথা না জানিয়া গ্রন্থবিশেষ এবং জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই প্রবন্ধটি রচনা করিয়া থাকিবেন। বণিক মহাশয় পাটের উৎপাদন সম্বন্ধীয় অংশ অপেক্ষা উহার বাণিজ্যবিষয়ে বরং কিছু বেশি অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন বলিতে হয়। যাহা হউক, তাঁহার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়াতেই সমুৎসাহিত হইয়া আমি উহার স্থলবিশেষে দুইএকটি কথা যোগ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছি। ভরসা আছে, ইহাতে তাঁহার বা তাঁহার প্রবন্ধের প্রতি কোন অংশে আমার সম্মানের অণুমাত্র ত্রুটি করা হইবে না। তিনিই এ বিষয়ের পথপ্রদর্শক, সুতরাং সর্ব্বাংশে ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ পাটের বীজ বপনের পক্ষে কোন্

সময় বিশেষ উপযোগী এবং পাট গাছ কত দিন ক্ষেত্রে থাকে বণিক্ মহাশয় তদ্বিষয়ের কিছুই উল্লেখ করেন নাই। বর্ষার পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈশাখ মাসেই পাটের বীজ বপন করিতে হয়। বীজ উপ্ত হইয়া ৫। ৬ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। ঐ সময়ে একটু সতর্ক থাকিতে হয়, পাছে গো মেষাদি জন্তুগণ ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া পাটের অঙ্কুর ও চারা ভাঙ্গিয়া নষ্ট করে। অনন্তর পাটের গাছ একটু বড় হইলে আর বেশি কিছু করিতে হয় না; শুদ্ধ এইটি দেখিতে হয়, গাছ কোন ক্রমে না ভাঙ্গে। গো মেষের উৎপাত ব্যতীত পাটের চারার আরও একটি অনিষ্টাশঙ্কা আছে; লোকে উহার অগ্রভাগের কচি কচি পাতা ছিঁড়িয়া ভাজিয়া খায়। আমরা শুনিয়াছি ভর্জ্জিত পাটপত্রই দিনাজপুর অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ লোকদিগের বর্ষাকালের প্রধান ব্যঞ্জন। তাহারা মূল্য দিয়া প্রয়োজনমত লবণ ক্রয় করিতে পারে না, এজন্য কদলীবল্কল (কলার বাকূড়া) হইতে এক প্রকার লবণ প্রস্তুত করিয়া উহার সঙ্গে মিশাইয়া আহার করে। পাটের শাক একটু উপকারীও বটে। যে চারার পাতা বা অগ্রভাগ ভাজিয়া লওয়া যায় উহার গায় চারি দিকে শাখা প্রশাখা জন্মে। শাখা প্রশাখা জন্মিলেই, সে গাছ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল, জানিতে হইবে। কেন না তাহা হইতে আর সরল সুদীর্ঘ আঁশ বাহির হইবে না। ঐ গাছ ৪।৫ মাস ধরিয়া ক্ষেত্রে থাকে। এই ৪। ৫ মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই উহার অগ্রভাগে ছোট ছোট ফুল দেখা দেয়। পাটের বীজ প্রস্তুত করিতে হইলে সে গাছ হইতে পাট উৎপন্ন হইবে না। যত দিন বীজ পাকিয়া না উঠে, তত দিন ঐ সকল গাছ ক্ষেত্রে থাকিলে, উহার অনেক শাখা প্রশাখা বাহির হয়, এবং উহার ত্বকও পাকিয়া শক্ত হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ উহার বীজ কি রূপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও লিখিত হয় নাই। পাটের বীজ পাকিয়া উঠিলে গাছের অগ্রভাগ মাত্র কাটিয়া লইতে হয়; কারণ প্রধানতঃ অগ্রভাগেই ফল জন্মিয়া থাকে। গাছগুলির গোড়ায় কাটিয়া লইলে, উহা শুষ্ক করিয়া উহার ত্বক্ হইতে এক প্রকার অপরিচ্ছন্ন মোটা সূত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নিত্য প্রয়োজন-সাধন বিষয়ে এ সূত্র অনেক সময়ে বিশেষ কাজে লাগে। অনন্তর ঐ কর্ত্তিত অগ্রভাগগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ উপরি উপরি করিয়া মাটীতে সাজাইতে হয়। তাহার পর ঐ গুলি মাড়িলেই ফলের আবরণত্বক ভিন্ন হইয়া বীজগুলি নির্গত হইয়া পড়ে। সেই গুলি ঝাড়িয়া লইলেই বীজ হইল। পাটের বীজ সর্ষপের মত ক্ষুদ্র, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল হয় না। ইহার বর্ণ ঈষৎ নীলাভ।

বণিক মহাশয় লিখিয়াছেন, পাট কাটিয়া ২।১ দিন ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিলে রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া উহার পত্রের বৃন্ত সকল শিথিল হয়, এবং তখন ঐ গাছগুলি তুলিয়া ঝাড়া দিলেই পত্রগুলি খসিয়া পড়ে। ঐ পাতাগুলি পচিয়া মাটী হইয়া গেলে ভূমির উর্ব্বরতা একটু বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু উহা শুষ্ক করিয়া তুলিয়া রাখিলে, উহা হইতে অনেক সময় অনেক উপকার পাওয়া যায়। ঐ পাতার কাথ ক্রিমিরোগের উত্তম ঔষধ। উহা কতক পরিমাণে জ্বরঘ্নও বটে। মধ্যে মধ্যে উহা কিঞ্চিৎ জলে ভিজাইয়া সেই কাথ পান করিলে অনেক সময় জ্বরের সম্ভাবনা কম থাকে, এবং উহাতে

পিত্তনাশ করে। এই জন্য হিন্দু বিধবারা দ্বাদশীর দিন সর্ব্বাগ্রে পাটপত্রের একটু ক্বাথ পান করিয়া থাকেন। শুকতনি প্রভৃতি ব্যঞ্জনে ইহার দ্বারা তিক্ত স্বাদ জন্মান মন্দ নহে। এতদ্ভিন্ন উদরের পীড়া হইলে, ঐ পাতা গোটা কতক, একটু সর্ষপ তৈল ও কিঞ্চিৎ লবণের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে, পেটের দোষ সারিয়া যায়। এইরূপ শুষ্ক অবস্থায় পাটের পাতাকে নালিতা বলে।

তৃতীয়তঃ পাটের বীজ বপনের পরেই একটু বৃষ্টি হইলে অঙ্কুরোদ্গমের বিশেষ সুবিধা হয়। পাটের পক্ষে বৃষ্টি বড় আবশ্যক। এই জন্যই বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বেই উহার বীজ ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। পাটের ভূমি সমতল হওয়া চাই। নতুবা বীজবপন বা অঙ্কুরোৎপত্তির পরে বৃষ্টি হইলে, সমস্ত বীজ বা অঙ্কুর ধুইয়া ভূমির নিম্ন ভাগে আসিয়া জমে। তাহাতে কোথাও আদৌ গাছ থাকে না, কোথাও অতি অল্পই হয়, কোথাও বা এত অধিক জন্মিয়া যায় যে, সে গাছ আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। পাটের গাছ একটু ঘন হওয়া ভাল; কেন না তাহা হইলে ঐ গাছের শাখা প্রশাখা প্রায় জন্মিতে পারে না। বীজবপন কালেই এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। নচেৎ কোন কোন সময়ে সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় একবারে নিষ্ফল হইয়া যাইতে পারে।

চতুর্থতঃ জলের মধ্যেই পাট হইতে সূত্র বাহির করিতে হয়। উহার গাছ ৬।৭ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। সুতরাং সূত্র বাহির করিবার সময় উহার মধ্যভাগ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। মধ্যভাগ ভগ্ন হইলে সেই সঙ্গে পাটের আঁশ ছিঁড়িয়া যাইবার কোন শঙ্কা নাই। অনন্তর জলের ভিতরে একটু জোর করিয়া ঝাঁকড়াইলে উহার কাটিগুলি সহজে খুলিয়া পড়ে এবং সূত্রাংশ হাতে থাকিয়া যায়। তখন ঐ পাট তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। মাঠে বা অন্য কোন প্রশস্ত অনাবৃত স্থানে ঘরের মত চারি ধারে বাঁশের খুঁটি প্রোত করিয়া, ঐ সকল খুঁটির উপর দিয়া বাঁশের লম্বা লম্বা আড বা এড়্‌নি দিতে হয়। সেই এড়্‌নির উপরে পাট লম্বমান করিয়া দিলে উহা রৌদ্রে ও বাতাসে প্রায় দুই প্রহরের মধ্যেই শুকাইয়া যায়। শুষ্ক হইলে এক একবার ঝাড়িয়া গাঁইট বাঁধিয়া রাখিয়া দিতে হয়। পাট শুকাইতে দিয়া একটু সাবধান থাকিতে হয়, যেন বৃষ্টি আসিয়া অর্দ্ধশুষ্ক পাট ভিজাইয়া না দেয়। সে অবস্থায় জলসিক্ত হইলে, উহার আঁশ নরম হইয়া যায়, এবং পূর্ব্ববৎ মূল্যও হয় না। শ্রাবণের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাদ্রের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত পাট প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত সময়। ঐসময় রৌদ্রের তেজ যেমন একটু প্রখর থাকে, তেমনি ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিও হয়। গ্রামের মধ্যে না করিয়া মাঠেই পাট শুষ্ক করিবার স্থান নিরূপিত করা ভাল। পাট জলে পচিলে উহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়। ঐ দুর্গন্ধ, ঘ্রাণ করিলে নানা মত পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

পাট সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহাই আপাততঃ যথেষ্ট বলিতে হইবে। পাটের বাণিজ্যে এদেশের অনেক অর্থলাভ ও নিরন্নদিগের ভরণ পোষণ হইতেছে বলিয়া বণিক মহাশয় আপন প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, সে কথা প্রকৃত বটে, কিন্তু যে প্রণালীতে বর্ত্তমান সময়ে এদেশে পাট প্রস্তুত হইতেছে, তাহা অতীব

দূষণীয়। অনেক পল্লীগ্রামে একটি মাত্র নদীর ছাড়ি খাল বা বিল আছে। তাহা হইতেই পল্লীস্থ লোকেরা ব্যবহারার্থ আবশ্যক মত জল গ্রহণ করিয়া থাকে। এ অবস্থায় ঐ খাল বা বিলের জলে পাট পচিতে দিলেই সর্ব্বনাশ! আর বাস্তবিক পল্লীগ্রামে তাহাই ঘটিয়া থাকে। অনেক স্থানে নদী দূরে, সুতরাং পল্লীবাসীদিগকে অগত্যা সেই দূষিত জল পান ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। পাট পচিলে জলের বর্ণ বিকৃত হইয়া যায় এবং উহা হইতে অতি অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ বহির্গত হইতে থাকে। কোন কোন অবস্থায় পাটপচা জলে বহুসংখ্যক কীট উৎপন্ন হয়। একে ভাদ্রমাস বর্ষার শেষ, সে সময়ে হতভাগ্য বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে রোগ, আবার তাহাদের ব্যবহার্য্য জলটুকু এইরূপে বিকৃত হইয়া পড়িলে, তাহাদের নিস্তারের আর উপায় থাকে না। লোকে জ্বালাইবার জন্য পাটের পরিত্যক্ত কাটিগুলি (পাট-কাটি বা পাকাটি) তুলিয়া আনে, বাড়ির চারিধারে ফেলিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লয়। ইহাতেও গ্রামের বায়ু বিলক্ষণ দূষিত হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অনিষ্ট সহজে পরিহার করা যাইতে পারে। ভিজা কাটি এক বারে বাড়িতে না আনিয়া মাঠে কিংবা যে জলাশয়ে পাট পচিয়াছে, তাহার ধারে ফেলিয়া শুষ্ক করিয়া আনিলেই চলে। শুষ্ক হইলে উহার পূর্ব্বের সে দুর্গন্ধ প্রায়ই থাকে না। গ্রামের মধ্যে পাট না শুকাইবার আর একটি বিশেষ কথা আছে। শুকাইবার এবং ঝাড়িবার সময় উহার যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র ছিন্ন হইয়া উড়িয়া যায়, গ্রামের মধ্যে হইলে উহা অনেকের নিশ্বাসের সঙ্গে শ্বাসনালীর মধ্যে উপনীত হইয়া কাশ প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বলেন, সিমুল-তুলা নাড়িতে হইলে, অগ্রে মুখ ও নাসিকা কাপড় দিয়া বা অন্য কোন উপায়ে বন্ধ করিতে হয়, নচেৎ উহা উদরস্থ হইলেই যক্ষ্মা রোগ জন্মে। একথাটি বিশেষ যুক্তি সঙ্গত। পাটের সূক্ষ্ম সূত্রাংশেও (ফেঁসো) ঐরূপ অতি কঠিন কঠিন হৃদ্-রোগের উৎপাদন করিতে পারে। আমরা এই রূপ একটি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। রোগের প্রথমাবস্থাতেই সতর্ক হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করাতে সে ব্যক্তি আপাততঃ সারিয়া গিয়াছে। অতএব পাট যাহাতে গ্রামের বাহিরে শুষ্ক ও গাঁইট-বন্ধ হইয়া আইসে, এমত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আর লোকের ব্যবহার্য্য জলে যাহাতে পাট পচান না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। সামান্য অর্থলোভে শত সহস্র লোকের স্বাস্থ্য ও প্রাণ নষ্ট করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। যে যে স্থানে পাট জন্মে, সেই সেই স্থানের পানীয় জল যে জলাশয় হইতে গৃহীত হয়, তদ্ব্যতিরেকে শুদ্ধ এই প্রয়োজন সাধনার্থ আর এক একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে, ঐ জলাশয়টি গ্রাম হইতে দূরে মাঠের মধ্যে হইবে। নতুবা যতদিন এপ্রথার পরিবর্ত্ত না হইতেছে, তত দিন এই ম্যালেরিয়া-প্লাবিত দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়া উঠা একান্ত দুরূহ ব্যাপার। বাণিজ্য কার্য্যের সমুন্নতি যেমন প্রার্থনীয় লোকের স্বাস্থ্য এবং প্রাণ রক্ষা করা তদপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। এ বিষয়টির প্রতি সাধারণের বিশেষ মনোযোগী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

কলিকাতা অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী।

কলিকাতা অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কাল-সমুদ্রে মিশিয়া গেল। কতদিনের উৎসাহ, কতদিনের আশা, কতদিনের অনুরাগ এক্ষণে নিভিয়া গেল। গড়ের মাঠের ভূরিভাগ অধিকার করিয়া যে সকল দেশ দেশান্তরের সামগ্রী এতদিন শোভা বিকাশ করিতেছিল তাহা এক্ষণে চলিয়া গেল। যে প্রদর্শনীর জন্ম গবর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ভূতলে অতুল ব্যাপার ঘটাইবার আশা করিয়াছিলেন, স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর যাহার ঋত্বিক, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যাহার পুরোহিত, বিদেশী নিঃসম্পর্ক জুবেয়ার সাহেব যাহার যাজ্ঞিক এবং বহুসংখ্যক স্বদেশী ও বিদেশী, আত্মীয় ও অনাত্মীয়, পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তি যাহার তন্ত্র-ধারক এক্ষণে সেই মহাযজ্ঞের পরিসমাপ্তি হইল। কত শ্রমে, কত কত অর্থ ব্যয়ে, কত যত্নে যে সাধের সৌধ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে ভগ্ন হইতে চলিল। শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের দ্বারা দুর্গের ভৈরবনিনাদী তোপধ্বনি সহকারে যে কাণ্ডের আরম্ভ হইয়াছিল, পুনরায় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের দ্বারাই তাহার পরিসমাপ্তি হইল, আবার কোর্টউইলিয়মের পরিখা হইতে বজ্রবৎ তোপধ্বনি হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাধের মেলা শেষ হইল। এ ব্যাপার যে দেখিল না সে পস্তাইতে লাগিল; যে দেখিয়াছে সে না জানি কতই চিন্তা করিতে লাগিল। কোটি লোকের চরণরেণু সংস্পর্শে যে ভূমি বিগত মাসত্রয়কাল পবিত্রীকৃত হইল, বঙ্গের লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা, নরনারী যে স্থলে গমন করিয়া আপনাদের অদমনীয় কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছিল, যাহা মহাশিক্ষার মন্দির, মহোন্নতির নিকেতন বলিয়া উন্মুক্ত হইয়াছিল, মানবজীবনে যাহা দ্বিতীয়বার দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতি বিরল—সেই অসামান্য ব্যাপার—সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মহামেলা শেষ হইয়া গেল। এ নশ্বর জগতে ক্ষুদ্র মানবসৃষ্ট সীমাবদ্ধ কার্য্য অনন্তকালগর্ভে বিলীন হইয়া গেল। কার্য্য শেষ হইলেও তাহার ফল অনন্তকাল স্থায়ী হইতে পারে। সে রাম নাই, সে সীতা নাই, সে লক্ষ্মণ নাই; কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র, তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা, তাহাদের লীলাস্থলের স্মৃতি কখন বিলুপ্ত হইবে কি? জগতে কেহই স্থায়ী নহে। কিন্তু কার্য্যের শুভাশুভ ফল ও পরিণাম দীর্ঘকাল স্থায়ী। এই অন্তর্জাতিক-প্রদর্শনী,—এই অসামান্য ব্যাপার হইতে তাদৃশ কোন স্থায়ী ফল সম্ভাব্য কি না তাহা আলোচনা করিবার এই প্রকৃষ্ট সময়। এটি একবার ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয় না কি? এই মহামেলায় কি দেখিলাম, কি দেখিলাম না; কি হইল, কি হইল না তাহার গণনায় প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেয়ঃ। প্রথমতঃ এই ব্যাপারে কি দেখিলাম না ও কি হইল না তাহাই বিচার্য্য।

এই মহামেলা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানের রাজন্যবর্গ স্ব স্ব দলবল সহ সমাগত হইবেন। কলিকাতায় তাঁহাদের স্থান হইয়া উঠিবে না বলিয়া যে আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা হইল না। লোক সমাগম হেতু কলিকাতায় স্থান থাকিবে না, বাসা পাওয়া যাইবে না, খাদ্য মিলিবে না, চাল মিলিবে না, মহামারীর উদ্ভব হইবে, ইত্যাকার যে জনরব উঠিয়াছিল তাহার এক বর্ণও সফলিত হইল না। গবর্ণমেণ্ট লোকের স্থান সংকুলনার্থ ময়দানে যে পান্থনিবাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা শূন্য থাকিয়া এ তিন মাসকাল মেলার বিদ্রূপ স্থলরূপে দাঁড়াইয়া রহিল। গ্রেট্ ইষ্টারণ হোটেল কোম্পানি প্রভৃতি সমাগত লোকের স্থান মিলাইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নে আপনাদের অবয়ব বাড়াইয়া তুলিলেন, কত আশা করিয়া কত বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন, ফল কিছুই হইল না, সে সকল বিজ্ঞাপন পরিহাসের সামগ্রী হইয়া রহিল। মেলা খুলিল। ইহার আরম্ভেই দেব-নিগ্রহ। ঘোর ঘনঘটায় আকাশ সমাচ্ছন্ন। অসময়ে প্রাবৃট্ কালের ন্যায় বারি-ধারায় কলিকাতা প্লাবিত। তাহা না মানিয়া, দৈব নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, লর্ড রিপন বাহাদুর, রাজকুমার সহ মিলিত হইয়া মেলা খুলিয়া দিলেন। বঙ্গের শাসক পীড়িত, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর অনাদৃত, জয়পুররাজ আপ্লুত, সকলেই বারিধারায় প্রপীড়িত, বিদ্যুতালোক চেষ্টায় বা অচেষ্টায় নির্ব্বাপিত। মেলার প্রারম্ভ-মহোৎসবে সুখ হইল না—যে আনন্দ জন্মিবার কথা তাহা জন্মিল না—হৃদয় ব্যথিত হইল মাত্র। তাহার পর মেলায় লোক সমাগম আরম্ভ হইল। বঙ্গের পৌরকামিনীরাও অবরোধ ভঙ্গ করিয়া মেলায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। দ্বারে পয়সার ঝন্ঝনা, চরকির কট্ কট্, ধ্বনি, পুলিসের তাড়না, লোকের হৈ হৈ, শুকটের নির্ঘোষ চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই সুখের হইল না। সমাগত লোক সকল অপমানিত, কখন বা প্রহারিত, কখন বা তিরস্কৃত হইতে লাগিল। তাহারা পয়সা দিয়া অপমান ক্রয় করিতে লাগিল। বঙ্গীয় সংবাদপত্র দেশ দেশান্তরে এই বিষাদ-কাহিনী বহন করিতে লাগিল। হৃদয়ের দীর্ঘ নিশ্বাস ব্যতীত যাহাদের মনস্তাপের অন্য ঔষধ নাই তাহারা আর কি করিবে?

তাহার পর মেলার দ্রষ্টব্য সামগ্রীর মধ্যেও শিক্ষিতব্য, বিশেষ উপকারজনক সামগ্রীর প্রচুর আয়োজন দেখিলাম না। যাহা যাহা দেখিলাম তাহাও অসম্পূর্ণ। যে সকল কলকৌশল, নানা প্রয়োজন সাধনোপযোগী যে সকল যন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার কার্য্যপ্রণালী, যাহাদের উপকারের ও হিতের জন্য এই মহামেলার অবতারণা, সেই দীনহীন, অশিক্ষিত, অনুন্নত, পরপ্রসাদলোলুপ ভারত-সন্তান দেখিতে পাইল না। যাঁহারা প্রদর্শক তাঁহারা অনেকেই সাহেব। তাঁহাদের চক্ষে দেশীয়গণ ক্ষুদ্র কীট মাত্র। তাহাদিগকে তাঁহারা যত্ন করিয়া কোন সামগ্রীই দেখাইলেন না, কিছুই বুঝাইলেন না। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই সকল দেবকীর্ত্তি দেখিল এবং বিষাদের নিশ্বাস ছাড়িয়া মেলা হইতে চলিয়া আসিল। তাহারা দেখিয়া আসিল, গোঁয়ারা, মাটীর হাতী, অস্লারের ঝাড়, মাটীর সাপ, হ্যামিল্টনের ঘড়ি, লেজারসের চেয়ার, জলের ফুয়ারা, সোণার খেলানা, হীরকের গহনা, মদের বোতল, দোচাকার গাড়ী ইত্যাদি। তাহারা অপদার্থ—তাই

এই সকল অপদার্থ দেখিয়া ফিরিয়া আসিল। হুড়া পাইল, গুঁতা খাইল কাজ কিছুই হইল না। সেই ঢেঁকি, সেই ঘানি, সেই ভুট্টা, সেই ধান, সেই চরকা, সেই লাঙ্গল তাহাদের চিরপরিচিত সেই সেই সামগ্রী মেলায় সাজান দেখিল। আর যাহা দেখিল তাহার মহিমা তাহারা বুঝিল না, কেহ তাহাদিগকে বুঝাইল না। বাঙ্গালির মেলা দেখা নিষ্ফল হইল।

তাহার পর মেলা স্থলে অত্যাশ্চর্য্য বিশেষ হিতজনক পদার্থের সমাগম হইয়াছিল কি না, তাহাও বিচার্য্য। মেলায় ছেলে ভুলান, রঙ্গ-চঙ্গের সামগ্রীর আমদানিই অধিক হইয়াছিল। যে দিয়াসলাই পয়সায় দুইটা করিয়া পথে পথে বিক্রীত হয় তাহা অবশ্যই মুল স্থানে পয়সায় চারিটা করিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। কেমন করিয়া এই অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত হয় ও এত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা এই মেলা দেখিয়া শিখিয়াছ কি ভাই? শুনিয়াছি বিলাতে এক একটা কাগজ তিন আনা মূল্যে বিক্রীত হয়, এখানে তাহা পাঁচ সিকার কমে পাওয়া যায় না। কেমন করিয়া বিলাতে ঐ জিনিষ এত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় মেলা দেখিয়া তাহার কোন জ্ঞান জন্মিয়াছে কি? দেশ দেশান্তরের নানা প্রকার তৈল মেলায় আমদানি হইয়াছে কিন্তু দেশ ভেদে তৈল প্রস্তুত করণের যে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহা তুমি দেখিয়াছ কি? ভাই বঙ্গবাসি, তোমার অদৃষ্টে সেই ঘানি কেঁা কেঁা করিতেছে। ডিকেন্সের আগা গোড়া ছবি দেওয়া একখানি পিক্ উইক পেপার বিলাতে তিন আনায় পাওয়া যায়। এ দেশে একখানি বোধোদয়ের দাম তিন আনা। কেমন করিয়া বিলাতে এমন সস্তা দামে পুস্তক বিক্রীত হইতে পারে, মেলা দেখিয়া তাহার কোন জ্ঞান লাভ করিয়াছ কি? বস্তুতঃ মেলায় বিশেষ প্রয়োজনীয় অনেক ব্যাপার আইসে নাই। যাহা আসিয়াছিল তাহাও বাঙ্গালিদিগের জন্য এই মেলা তাহাদিগকে দেখান হয় নাই বুঝান হয় নাই। এ হিসাবে কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী নিষ্ফল।

মেলা দেখিবার জন্য মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা আদৌ মিথ্যা কথা। সে মূল্য দিয়া মেলায় প্রবেশ করিলে সমস্ত মেলা দেখা যায় কৈ? বঙ্গের—ভারতের অবস্থা স্মরণ করিয়া চারি আনা মূল্য আমরা অন্যায় বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু মেলায় গিয়া বুঝিলাম চারি আনায় এ মেলা দেখা হয় না। কাচের কারখানা ও মোমের পুতুল দেখিতে আর চারি আনা লাগে, বালকলাভার যুদ্ধ-পট দেখিতে আর দুই আনা, মগের নাচ দেখিতে আর দুই আনা, বৈদ্যুতিক বাজনা শুনিতে আর দুই আনা, কই মাগুর মাছ ও ঢোঁড়া সাপ দেখিতে আর এক আনা, মেলার রেলে চড়িতে দুই আনা, ইত্যাদি নানা রকমে এক টাকার উপর ব্যয় করিতে না পারিলে পুরাপুরি মেলা দেখা হয় না। ভারতের অধিকাংশ লোকের অবস্থা চিন্তা করিলে এ মূল্য নিতান্ত অধিক বলিয়া বোধ হইবে। যদি বল তাহাদের এত কাজ কি? সেটা কি কথা? তাহা না হইলে পূর্ণ মেলা দেখা হইল কি? অতএব এ হিসাবে কলিকাতার অন্তর্জাতিক-প্রদর্শনীর অধ্যক্ষগণ লোকের অবস্থা চিন্তা করিয়া কার্য্য না করায় অপরাধী।

মেলায় সাহেব ও দেশীয়ের পার্থক্যটা

কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল। মেলায় সাহেবদিগের বিশ্রাম ও আরামের জন্য যেমত ব্যয়সাধ্য আয়োজন করা হইয়াছিল দেশীয়গণের নিমিত্ত তাহার কিছুই হয় নাই। কিন্তু মেলার অনুষ্ঠাতৃগণ নিশ্চয়ই জ্ঞাত ছিলেন যে, মেলায় সাহেব অপেক্ষা দেশীয় লোকেরই সমাগম অধিক হইবে। যখন তাঁহারা জানিয়াও এ বিষয়ে বন্দোবস্তের কৃপণতা করিয়াছিলেন তখন এটি তাঁহাদের ঔদাস্য ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? দুর্ভাগ্য দেশীয়গণের জীবন বিড়ম্বনার সামগ্রী।

তাহার পর মেলায় প্রদর্শিত পদার্থ সমূহের প্রসঙ্গে আমরা আশ্চর্য্য পদার্থের নিতান্ত অভাব বলিয়াছি। এক্ষণে তাহা আরও একটু আলোচনা করা যাউক। বৃটিশ উপনিবেশ সমূহের দ্রব্যই মেলায় অধিক আসিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে আশ্চর্য্য কি ছিল? কোন্ জিনিষ দেখা যায় নাই, আর কোন্ জিনিষই বা অত্যদ্ভুত তাহা আমরা বুঝিলাম না। দ্রব্য সমস্ত সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল, তজ্জন্য দর্শনমাত্র দর্শকের নেত্র বিনোদন করিয়াছিল। সাজাইবার কৌশল ব্যতীত তাহাতে সামগ্রীর মহিমা প্রকাশ পায় নাই। ইংলণ্ডের স্পটিস উড্ কোম্পানির খেলানা, ট্রুবনার কোম্পানির কতকগুলি পুস্তক ইত্যাদি ইংলণ্ডীয় সামগ্রী মেলায় উপস্থিত ছিল। কিন্তু এই সামান্য কয়েক প্রকার মাত্র দ্রব্য দ্বারা ইংলণ্ডীয় সামগ্রী প্রদর্শিত হইল, ইহা ছেলেমানুষী ভিন্ন আর কি? ফরাসি দ্রব্য সামগ্রী যাহা প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া কাহার না হাসি পায়? হিন্দুরমণী কৃত শিল্প বলিয়া যে সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাই কি সে সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ও প্রচুর? কয়েক প্রকার চা ও কয়েকটী বাক্স দেখাইয়া সিংহলের সামগ্রী প্রদর্শিত হইল—এ সকল বালক-ক্রীড়া। অন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রধান সামগ্রী রত্নাগার। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রদর্শনীর রত্নাগারে কয়েকখানি সামান্য হীরক ও মৌক্তিকালঙ্কার, সোণার তানজাম ও রূপার আসন দেখিয়া কে পরিতৃপ্ত হইতে পারে? যে ভারত মণি-মুক্তার ভাণ্ডার, সেখানে রত্নাগারের এ দুর্দ্দশা কেন? বোধ হয়, মেলার অধ্যক্ষগণ এ বিষয়ে যথাবিহিত যত্ন করেন নাই। যাহা হউক রত্নাগার বলিয়া যে গৃহের নাম করণ করা হইয়াছিল, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে চিত্রাগার। কারণ তথায় রত্নাপেক্ষা চিত্রের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হইয়াছিল।

তাহার পর প্রদর্শনীর ভারতাগারের কথা। প্রদর্শনীর এ অংশ দেখিয়া অনেকে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিবেন, আমরা কিন্তু আন্তরিক ব্যথা পাইয়াছি। ভারতাগারের ভূরিভাগ অস্লরের ঝাড়, লেজারসের কাঠের জিনিষ, বেকারের পোষাক, মনটিথের ঘোড়ার সাজ, ষ্টিউয়ার্ট ও ডেশচাম্পের গাড়ি ও হামিল্টনের জিনিষে পরিপূর্ণ। এ সকল সামগ্রী যাঁহারা ভারতীয় সামগ্রী বলিয়া বুঝাইতে চাহেন, বা বুঝিতে চাহেন তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের মতের একতা নাই। ঐ সকল সামগ্রী ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে, ইংরাজি কারুকরের মতলবে, ইংরাজি ধরণে, ইংরাজি মিস্ত্রির দ্বারায় প্রস্তুত। সত্য বটে অনেক স্থলে ঐ সকল কার্য্যে দেশীয় মিস্ত্রি নিযুক্ত হয়। কিন্তু কার্য্যের সহিত সে দেশীয় মিস্ত্রীর সম্পর্ক অতি সামান্য মাত্র। প্রভুপুত্রের লালন পালনে ভৃত্যের যে অধিকার এস্থলে উক্ত কার্য্য সমূহের সহিত দেশীয় মিস্ত্রিরও তাদৃশ অধিকার মাত্র। তাহারা খাটিয়া খালাস, হুকুম তামিল করা তাহাদের কার্য্য।

ভারতবর্ষের জলবায়ুতে তাহা প্রস্তুত; সেই সকল কার্য্যের সহিত ভারতবর্ষের এই মাত্র সম্বন্ধ। এবং এই সম্বন্ধ হেতু যদি তৎ-সমুদায় ভারতবর্ষীয় শিল্প বলিয়া উল্লিখিত হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, আমরা কিন্তু সে গর্ব্বের অংশ চাহি না, সে প্রশংসায় মিশিতে সাধ করি না। আমরা ঐ সকল সামগ্রীকে স্পটিস উডের সামগ্রীর ন্যায় বিলাতি সামগ্রী বলিয়াই মনে করি। এই সকল ইংরাজ-প্রদর্শিত, ইংরাজি সামগ্রী ভিন্ন ভারতাগারে আর যাহা যাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা দেখিলে হাসিও পায় দুঃখও হয়। হাসি পায়, মেলার অনুষ্ঠাতৃগণের অকর্ম্মণ্যতা স্মরণ করিয়া। দুঃখ হয়, এই ক্ষুদ্রায়োজন—হীন সংগ্রহ ভারতীয় সামগ্রীর পরাকাষ্ঠা রূপে প্রদর্শিত হওয়ায়। তথায় আছে, গোঁয়ারা, মাটীর পুতুল, মাটীর সাপ, তালপাত ও কলাপাতে লেখা, জঘন্য পশমের কার্য্য, এবং জয়পুর, উদয়পুর, কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের কয়েক প্রকার সামান্য সামগ্রী। ধিক্ ভারতাগার, ধিক্ কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী! কেন—দেখাইবার উপযুক্ত, সংগৃহীত হইবার উপযুক্ত অন্য সামগ্রী কি ভারতে ছিল না? ভারতে উচ্চ শিল্প-বিজ্ঞান-সঙ্গত কার্য্য কি এককালে অপ্রাপ্য? সিমলা, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের বস্ত্র মেলায় সংগৃহীত হইয়া এক দিকে কেন রক্ষিত হয় নাই? কাশ্মীরের উৎকৃষ্ট শাল কৈ মেলায় দেখিলাম না তো, হস্ত লিখিত প্রাচীন মহামূল্য সংস্কৃত পুঁথি সকল মেলায় সংগৃহীত হয় নাই কেন? দীননাথ বাবুর কল মেলায় আইসে নাই কেন? ভারতের সামরিক অস্ত্র সমূহ সংগৃহীত হয় নাই কেন? বাঙ্গালি কারুকরকৃত বঙ্গনারীর ভূষণ মেলায় স্থান পায় নাই কেন? দেশীয় কারুকরকৃত জুতা, গাড়ি, ঘোড়ার সাজ, প্রভৃতি নানা প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেলায় সংগৃহীত হয় নাই কেন? কিরূপে দেশীয়গণ দড়ি দড়া প্রস্তুত করে, পাটের আঁশ বাহির করে, তাহা দেখান হয় নাই কেন? হিন্দু বৈদ্যগণ ঔষধে নানা ধাতুর ব্যবহার করিবার জন্য যে আশ্চর্য্য প্রক্রিয়ার দ্বারা শোধিত ও প্রস্তুত করিয়া লন তাহা দেখান হয় নাই কেন? খণ্ড খণ্ড করিয়া-পৃথক পৃথক করিয়া কত দেখাইব? সংক্ষেপে মেলার ভারতাগারে ভারতবাসী[illegible] নিতান্ত অবিচার করা হইয়াছে [illegible] গার সাজান হইয়াছিল ভাল, অ[illegible] সমস্ত আগারের অপেক্ষা ভারতাগার দেখিতে জাঁকাল হইয়াছিল। বাহার দেখিয়াই যাঁহারা মুগ্ধ হইতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্যই ভারতাগার দেখিয়া প্রীত হইয়া থাকিবেন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি ভারতাগার দেখিয়া আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। ভারতাগার কলিকাতা অন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর কলঙ্ক; ভারতের মহাকলঙ্ক। এখন আমরা বিবেচনা করিতেছি, এমন হীনভাবে ভারতীয় সামগ্রী সংগৃহীত হওয়ার অপেক্ষা মেলা না হওয়া ভাল ছিল সন্দেহ নাই।

মেলার কল কৌশলাংশ ভাল হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে ফল কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঐ সকল যন্ত্রের কার্য্য দরিদ্র ভারতবাসীর বুঝিবার সুযোগ হয় নাই। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া মাটীতোলা কলের কার্য্য দেখিয়াছে, পাথর ভাঙ্গা কলের কার্য্য দেখিয়াছে, ফুয়ারায় জল কেমন করিয়া উঠিতেছে তাহা দেখিয়াছে, বায়ু-যন্ত্রের

পাখা কেমন করিয়া ঘুরিতেছে তাহা দেখিয়াছে, জল লাগিয়া কেমন করিয়া চাকা ঘুরিতেছে তাহা দেখিয়াছে, সংক্ষেপতঃ যাহা যাহা দূরে দাঁড়াইয়া দেখা যায় তাহাই দেখিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে কি? জানিয়াছে কি? শিখিয়াছে কি? কিছুই না। বুঝিতে, জানিতে ও শিখিতে তাহারা পায় নাই। কারণ এ সকল আশ্চর্য্য, অদৃষ্টপূর্ব্ব সামগ্রী তাহাদিগকে না বুঝাইলে তাহারা বুঝিবে কিরূপে?

মেলার মধ্যে যে কলের লাঙ্গল আসিয়াছিল তাহার কার্য্যও সাধারণে দেখিতে পায় নাই। সাধারণে যাহাতে দেখিতে পায় তাহার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতরূপে করা হয় নাই। কয়েকখানি উচ্চ শ্রেণীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল বটে যে নিয়মিত দিনে নিয়মিত সময়ে গড়ের মাঠে ঐ লাঙ্গলের কার্য্য প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু মহাত্মা জুবেয়ার বিশেষ জানিতেন যে, সেরূপ বিজ্ঞাপন সাধারণের নিকটে পোঁছে না। ধনী সম্প্রদায় তাহা জানিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এ সকল বিষয়ে উদাসীন। যাহাদের তাহা জানা আবশ্যক তাহারা তাহা টের পায় নাই। তবে কার্য্যকালে দুই দশজন পথপ্রবাহী লোক তথায় দাঁড়াইয়াছিল মাত্র। সুতরাং তাহার উদ্দেশ্যও সুসিদ্ধ হয় নাই।

তাহার পর মেলায় হয় নাই জুবেয়ার সাহেবের পকেট পূরণ। জুবেয়ার সাহেব বলিতেছেন তাঁহার একলক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে। তিনি এত পরিশ্রম করিয়া, এত যত্ন করিয়া অবশ্যই বিশেষ লাভের আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু লাভ না হইয়া তাঁহার লোকসান ঘটিয়াছে, ইহা বস্তুতই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। সুতরাং এ হিসাবেও মেলা কিছুই হয় নাই।

জুবেয়ার সাহেবের যদি লোকসান হইয়া থাকে তাহা হইলে মীমাংসা করা সঙ্গত যে যেরূপ লোক সমাগম হইবে আশা করিয়া মেলা আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা হয় নাই। সুতরাং এ দেশের লোক মেলার উপকারিতা আশানুরূপ হৃদয়ঙ্গম করে নাই, অতএব মেলার আশানুরূপ ফল হয় নাই।

এরূপ মেলার প্রধান তাৎপর্য্য নানাস্থানের সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও ব্যবহার দর্শকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই সামগ্রীর বহুল প্রচারের পথ উদ্ঘাটন করা। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য মেলার অধ্যক্ষগণ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা কাজের হয় নাই। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে ভারত প্রচলিত ভাষা সমূহে, অন্ততঃ হিন্দি ও বাঙ্গালায়, সংগৃহীত সামগ্রী সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল। তাহা না করায় সাধারণ লোকে কোন সামগ্রীরই বিশেষ মর্ম্মগ্রহ করিতে পারে নাই।

মেলায় যে দশ লক্ষ লোক সমাগত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই তামাসা দেখিতে যুটিয়াছিল। মেলার উপকারিতা স্মরণ করিয়া জ্ঞানার্জ্জন আশায় তাহারা যায় নাই। উইলসন্-সারকাস্ প্রভৃতি স্থানে যে কারণে লোক-সমাগম হয়, কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতেও সেইরূপ কারণে লোক-সমাগম হইয়াছিল।

মেলায় বাঙ্গালা ভাষার বড় আশ্চর্য্য ব্যবহার হইয়াছিল। কোর্ট শব্দের বাঙ্গালা আদালত ধরিয়া, মেলার অধ্যক্ষগণ তাহাই ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাকে

আদালত বলে তাহা মেলার কোর্ট হইতে কতই বিভিন্ন তাহা যাঁহারা বাঙ্গালা ও ইংরাজি উভয়ই জ্ঞাত আছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

বালাকৃলাতার যুদ্ধপট মেলায় দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। মেলায় মৎস্যপ্রদর্শনী যে হইয়াছিল তাহা না করিলেই ভাল হইত।

মেলার অভাব ও অপূর্ণতার কথা অতি সংক্ষেপে বলিলাম। অতঃপর মেলায় কি হইয়াছে ও কি দেখিয়াছি তাহার বিবরণ সহজেই করা যাইবে।

মেলার প্রধান ঘটনা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আস্ফালন। মেলার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে, ইহার গৌণ ফল কালে দেখিতে পাওয়া যাইবে, গবর্ণমেণ্টের একার্য্যে কিছুই ক্ষতি হয় নাই, ইত্যাদি নানাপ্রকার আশ্বাসজনক মধুর বাক্য আমরা বঙ্গেশ্বর বাহাদুরের বদন হইতে বক্তৃতারূপে ধ্বনিত হইতে শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি, সকলই হইয়াছে কিন্তু কথাগুলি প্রাণে স্থান পায় নাই। কেমন করিয়া বলিব মেলার উদ্দেশ্য সফলিত হইয়াছে? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মেলাই নিষ্ফল হইয়াছে সুতরাং তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিতেছেন, ইহার ফল কালে দেখিতে পাইবে, একদিনে ইহার ফল প্রত্যাশা করিও না। কিন্তু আমরা তাদৃশ আশা মনে স্থান দিই না; কারণ মেলায় এমন কোন ঘটনা, কি কার্য্য, কি সামগ্রী কেহ দেখে নাই যাহা লোকের হৃদয়ে স্থায়ী অঙ্কপাত করিয়াছে, বা যাহার অনুকরণ করিতে লোকের স্পৃহা জন্মিয়াছে অথবা যাহার ব্যবহার মেলাস্থলে লোকে নূতন শিখিয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত প্রকারে যদি দ্রব্য বিশেষ বা কার্য্য বিশেষ লোকের হৃদয় অধিকার করে তাহা হইলে সময়ে তাহা হইতে বিশেষ শুভ ফল ঘটে। কারণ লোক পুনঃ পুনঃ সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করে, বা তাহার ব্যবহার হেতু আপনাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারে, অথবা তথাবিধ নানা প্রকার উপকার ঘটিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। কা[illegible] যে দেশের ক্রমশঃ উন্নতি হইবে তা[illegible] কিন্তু সে উন্নতি যে সমালোচ্য [illegible] প্রদর্শনীর ফল স্বরূপে ঘটিবে [illegible] স্থির। গবর্ণমেণ্টের কে[illegible] হই-য়াছে কি না তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পুলিষ যে এই তিন মাস কাল মেলায় নিযুক্ত থাকিল, গবর্ণমেণ্টের আফিষ সকল যে সাতদিন করিয়া বন্ধ হইল এ সকল কথা লেপ্টেনেণ্ট মহাশয় আদৌ উত্থাপন করেন নাই। কেমন করিয়া বলিব ও বুঝিব যে, এই মহামেলায় গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হয় নাই। আমরা দেখি-তেছি এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় নানা কথার অবতারণা করিয়া-ছেন। আমাদের বিবেচনা হয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের কথায় অন্তরের সজীবতা নাই—হৃদয়ের তৃপ্তি নাই থাকিবার কথা নহে। অতি ধীর ভাবে, যেন অনিচ্ছায়, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর লেপ্টেনেণ্ট মহোদয়ের কথার অনুমোদন [illegible]য়াছেন। তিনি যেন অপার্য্যমাণে—যেন না বলিলে ভাল দেখায় না বলিয়া, বঙ্গীয় লাটের মতের ও উক্তির

সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার কথায় যথোপযুক্ত বাঁধনি নাই।

মেলা উপলক্ষে জুবেয়ার-প্রমুখ কতকগুলি উপনিবেশবাসী সাহেবের সহিত এ দেশের পরিচয় ঘটিল। এ দেশের সহিত পরিচয় ঘটিল—এ দেশের লোকের সহিত নহে। কারণ আমরা দেখিতেছি তাঁহারা এদেশবাসীর সহিত কোন কার্য্যেই যোগ দেন নাই, অথবা কোন কার্য্যেই দেশীয়গণের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। এই বৈদেশিক পুরুষেরা এদেশের অধিবাসিবৃন্দের প্রতি ব্যবহার করিবেন না, তাহার নমুনা দেখিয়াছি। ইহাঁরা যদি এ রাজ্যে স্থ. তাহা হইলে এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইউরে. ডিফেন্স এসোসিয়েশনের দলপুষ্টি হইবে এবং তাহাতে ভারতের যেরূপ উপকার সম্ভাবিত তাহা ভারতবাসী বেশ বুঝিতেছে।

শুনিতেছি, অষ্ট্রেলিয়ার সহিত এই সূত্রে ভারতের সম্পর্ক আরও নিকট হইতে চলিল। ইংলণ্ডের ন্যায় অষ্ট্রেলিয়াতেও নিয়মিত রূপে ভারতীয় জাহাজ যাতায়াত করিবে। তাহার ফল কি হইবে, তাহা বিচার করিবার কথা বটে। মোটামুটি দেখিতে গেলে ইহাতে অলস ভারত সন্তানের অধঃপতনের আর একটু সহজ উপায় হইবে ইহাই তো বোধ হয়। এতদুপায়ে বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইবে এবং বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইলে প্রজাগণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, এ চিরপ্রচলিত কথা সকলেই জানেন। আমরাও তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সকল স্থলে এ নিয়ম সমান খাটেনা। ভারতের প্রতি বিধাতা অপ্রসন্ন। যে যে রাজ্যের প্রতি ভগবান সদয় সে সে রাজ্যের সকল নীতি যে এ পতিত ভারতে খাটিবে আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে মতামত আমরা হঠাৎ প্রকাশ করিতে পারিনা। আমাদের বিশ্বাস ঔপনিবেশিক রাজ্যের সহিত বাণিজ্য আরম্ভ হইলে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু সে অনেক কথা—অনেক বিচার—অনেক যুক্তি। বর্ত্তমান সমালোচনা সেরূপ প্রসঙ্গের স্থল নহে। এজন্য আমরা আপাততঃ সে বিচারের অবতারণা করিলাম না। আমাদের অনুমান হইতেছে প্রস্তাবিত বাণিজ্য সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে আমাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না।

বঙ্গীয় পুরমহিলাগণ অনেকেই এই পুরুষসমাকীর্ণ মহামেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উন্মত্ত, অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি বরহিত, উন্নতিশীল যুবকেরা ইহা সময়ের একটা শুভচিহ্ন বলিয়া মনে করিতে পারেন। আমরা কিন্তু এ ঘটনা সেরূপ চক্ষে দেখিতেছি না। আমাদের বোধ হয়, রাজপুরুষগণ এই ঘটনার স্বতন্ত্র রূপ মীমাংসা করিতে পারেন। তাঁহারা হয়ত মনে করিতে পারেন যে, প্রলোভনে পড়িয়া বঙ্গাঙ্গনা যখন এতদূর অবগুণ্ঠন-ত্যাগ করিতে পারেন, তখন জোর করিলে কোন্ আর একটু না হইবে? এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যদি তাঁহারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমাদের অনেক অধিকার ও শান্তিসুখ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিথিল সমাজ-বন্ধন আরও শিথিল হইয়া এককালে ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

জিত ও জেতা জাতিদ্বয়ের মধ্যে সম্প্রতি খাদ্যখাদক সম্বন্ধ চলিতেছে। এরূপ সম্বন্ধ চিরদিনই আছে এবং হয়ত চিরদিনই থাকিবে। সম্প্রতি ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে এবং

কয়েকজন অবিমৃষ্যকারী ইংরাজের ও কয়েক জন অপরিণামদর্শী বঙ্গীয় যুবকের বুদ্ধির ভ্রমে এই পার্থক্যভাব—এই মনোমালিন্য আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। যে টুকু বাড়িয়াছে কত কালে যে সে টুকু কমিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থায় উপস্থিত হইবে তাহা বলিয়া উঠা ভার। মেলায় এই মনোমালিন্য একটু কম করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া ইহা সেই বর্দ্ধিত মনোমালিন্য আরও সম্বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে। সাহেবেরা নিরপরাধ বঙ্গসন্তানের প্রতি যে কিরূপ অত্যাচার করেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলাস্থলে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি এবং মনে মনে বিধাতাকে শত ধিক্কার দিয়া নয়নের জল নয়নেই শুষ্ক করিয়াছি।

অবরোধবাসিনী বঙ্গসীমন্তিনীগণের দেখিবার নিমিত্ত এক রবিবার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শুনিলাম, সে দিন মেলার নায়ক জুবেয়ার সাহেব ললনাকুলের বদনশ্রী দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এমন স্থলে এমন ভাবে বসিয়া ছিলেন যে, তাহা তাঁহার অসৎ রুচির পরিচায়ক এবং বঙ্গবাসিগণের মহা মনস্তাপের কারণ হইয়াছে।

মেলা উপলক্ষে দেশের অনেক অর্থ অপব্যয়িত হইয়া গেল। ইহার উদ্দেশ্য সফলিত হইলে এত অর্থব্যয় আমরা অপচয় বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কিন্তু যখন আমরা বুঝিতেছি, মেলায় কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই, তখন তজ্জন্য দরিদ্র ভারতবাসীর সংকীর্ণ অর্থকোষ যে ক্ষয় পাইয়াছে তাহা বস্তুতঃই দুঃখের বিষয়। এই মেলা দেখা উপলক্ষে আমাদের বোধ হয় গড়ে লোকের পাঁচ টাকা করিয়া খরচ পড়িয়া গিয়াছে। রেলের ভাড়া, ট্রামওয়ের ভাড়া, খাওয়ার খরচ, মেলা দেখার খরচ ইত্যাদি সকল রকমেই সকলের যথেষ্ট ব্যয় হইয়া গিয়াছে। দরিদ্র প্রজার এরূপ ব্যয় নিতান্ত অসঙ্গত। ইহার ফল ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে এবং অন্য কারণে হউক বা না হউক, অন্ততঃ এই কারণে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের কথিত মেলার গৌণফল ক্রমশঃ ফলিত হইবে।

সংক্ষেপে মেলার আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। ইহাতে অনিষ্ট ভিন্ন কোনই ইষ্টসম্ভাবনা দেখিলাম না। অনেক আশ্বাসের কথা শুনিলাম, অনেক তোপধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, অনেক জাঁকজমক দেখিলাম, সংবাদপত্র সমূহে অনেক লেখালেখি পাঠ করিলাম, অনেকবার মেলাস্থলে উপস্থিত হইলাম, অনেকের অনেক যুক্তি, অনেক তর্ক শ্রবণ করিলাম কিন্তু কিছুই হৃদয়ে স্থান পাইল না। ভ্রমে মেলার আরম্ভ হইয়াছিল, ভ্রমে ইহার অবসান হইল। এ বাণিজ্যে দরিদ্র ভারতের কোনই উপকার হইল না। এত যত্ন, এত অর্থব্যয়, এত আয়োজন সকলই বৃথা হইল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের অদূরদর্শীতার পরিচয়স্বরূপে চিরকাল ঘোষিত হইবে।

গ্রন্থাদির উল্লেখ, সমালোচন ও প্রাপ্তিস্বীকার।

পাক্ষিক সমালোচক। সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান, অর্থব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচক। ১ম ও ২য় সংখ্যা। ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

নূতন সামরিক পত্রখানি বিগত ফাল্গুন ... প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহ... খ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদে... ইতেছে যে, এই নূতন সহযোগী ... রূপে চলিতে পারিবেন না। এখন সময় আছে—এখনও সুযোগ আছে। আমরা এই পত্রের অনুষ্ঠাতৃগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সময় থাকিতে সাবধান হউন। বঙ্গীয় সাময়িক পত্রের এই মহাকলঙ্ক প্রক্ষালিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

পাক্ষিক সমালোচক (Fortnightly Review) বোধ হয় বঙ্গদেশে ও বঙ্গভাষার এই প্রথম। সময় হিসাবে পাক্ষিক সমালোচকের অধ্যক্ষগণ অনধিকৃত স্থান অধিকার করিয়া বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

সমালোচকের বিষয়গত নূতনত্ব আছে বলিয়া বোধ হইল। সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র এতদুভয়ের কার্য্য প্রণালী, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অনেক বিভিন্নতা আছে। উভয়ের কার্য্য পরস্পর বিভিন্ন। বর্ত্তমান পাক্ষিক সমালোচক দেখিয়া বোধ হয় যেন সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রের মধ্যস্থ রূপে ইহার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার প্রথম সংখ্যা সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র উভয় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইল। ইহাও এদেশে নূতন বটে। বিলাতি একাডেমি, এথিনিয়ম প্রভৃতি কাগজ কতকটা এই রকমের বটে কিন্তু তৎসমুদায়ের প্রণালী ও আলোচ্য বিষয় বিশেষ উচ্চদরের। যত্ন করিলে ইহাও হয়ত কালে তাহার নিকটস্থ হইতে পারে।

ইহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে দুই একটি প্রবন্ধ সুলিখিত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। ইহার লেখকমণ্ডলীর মধ্যে দুই একজন যশস্বী লেখকের নাম দেখিলাম। আপাততঃ ইহা যেরূপ ভাবে আরব্ধ হইয়াছে তাহাতে অধিক স্পর্দ্ধিত ভাব ইহার পক্ষে শ্রেয়ঃ নহে।

এই পত্র আদৃত হইবার উপযুক্ত। আমরা ইহার ক্রমোন্নতি দেখিলে পরিতুষ্ট হইব।

Hindostan (a monthly Journal edited by His Highness Raja Rampal Singh) Printed and Published for the Proprietor by Eyre and Spottiswoode, at Great New Street, in the Parish of Saint Bride, in the city of London. Price each copy in England 6*d*., India 6 *as*.

ইংলণ্ড হইতে প্রকাশিত এই অভিনব পত্রের কয়েক সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত

হইয়াছে। এই পত্রের প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন। ইহার প্রতি পত্রে তিন স্তম্ভ। প্রথম স্তম্ভে হিন্দি প্রবন্ধ, দ্বিতীয় স্তম্ভে ঐ প্রবন্ধ ইংরাজিতে লিখিত, এবং তৃতীয় স্তম্ভে তাহাই উর্দুতে লিখিত। ইহা ভারতবাসীর হিত সাধন উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইতেছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। মতামত অতি সারবান। ইহাতে নানাবিষয়ক সাময়িক প্রসঙ্গ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইতেছে। এদেশে এই পত্রের বহুল প্রচার হইলে যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীযুক্ত রাজা রামপাল সিংহ বাহাদুর ইংলণ্ডে থাকিয়া স্বদেশের হিতকল্পে নানা প্রকার যত্ন করিতেছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে সমালোচ্য পত্রের কল্যাণ কামনা করি।

---

৮ যামিনী-সঙ্গীত। (পদ্য) শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বিরচিত। প্রথম সংস্করণ। শ্রীরামপুর "তমোহর" যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত শশিভূষণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত মূল্য এক আনা।

এই পদ্যে, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন হইলে রামের খেদ ও হনুমান আনীত ঔষধ দ্বারা লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন লাভ প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। মেঘনাদ-বধ কাব্যে ঐ স্থানে যে সকল ভাব আছে ইহাতে তৎসমস্ত খারাপ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এ গ্রন্থের প্রশংসা করিবার কোন কথাই খুঁজিয়া পাইলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম।

বর্দ্ধমান স্ত্রীশিক্ষা সাধিনী সভার প্রথম বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। সন ১২৮৯ সাল।

এই সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী নিম্নস্থ অংশ পাঠে জানা যাইবে।

"এই সভার উদ্দেশ্য, বর্দ্ধমান জেলার স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতির উন্নতি সাধন করা, সভা হইতে নিয়ম করা হয়, প্রতিবৎসর যে সকল বালিকা সভার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগকে পারিতোষিক প্রদান করা হইবে। গত সন সভা-কর্ত্তৃক যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে কয়েকটি বালিকা উত্তীর্ণা হইয়াছেন—তাঁহাদিগকে পারিতোষিকও প্রদান করা গিয়াছে।

সভার উদ্দেশ্য সাধু! ঈশ্বর সভার উদ্দেশ্য সফল করুন। কার্য্য বিবরণের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে,—

"এইরূপে পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক প্রদান করা বহু অর্থ না থাকিলে হইতে পারে না। এজন্য সভা বর্দ্ধমান জেলার বড়লোকদিগের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় কেহ একটি টাকা দিয়াও সাহায্য করেন নাই।"

এ দুঃখ নূতন নহে।